রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দ্বাদশ খণ্ড

VISVA-BHARATI
296560
LIBRARY

বিশ্বভারতী

৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ
অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ : ১৯১০ শক

বিশ্বভারতী

প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭
ফোটোটাইপ সেটিং : প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
৭ জওহরলাল নেহরু রোড। কলিকাতা ১৩
মুদ্রক স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণী। কলিকাতা ৯

বিষয়সূচী

কবিতা ও গান

প্রহাসিনী

ধূমকেতু মাঝে মাঝে হাসির ঝাঁটায়
দ্যুলোক ঝাঁটিয়ে নিয়ে কৌতুক পাঠায়
বিস্মিত সূর্যের সভা ত্বরিতে পারায়ে—
পরিহাসচ্ছটা ফেলে সুদূরে হারায়ে,
সৌর বিদূষক পায় ছুটি।

আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু,
মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু—
তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি,
ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি
নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।

এ জগৎ মাঝে মাঝে কোন্ অবকাশে
কখনো বা মৃদুস্মিত কভু উচ্চহাসে
হেসে ওঠে, দেখা যায় আলোকে ঝলকে—
তারা কেহ ধ্রুব নয়, পলকে পলকে
চিহ্ন তার নিয়ে যায় মুছে।

তিমির-আসনে যবে ধ্যানমগ্ন রাতি
উল্কাবরিষনকর্তা করে মাতামাতি—
দুই হাতে মুঠা মুঠা কৌতুকের কণা
ছড়ায় হরির লুঠ, নাহি যায় গনা,
প্রহর-কয়েকে যায় ঘুচে।

অনেক অদ্ভুত আছে এ বিশ্বসৃষ্টিতে,
বিধাতার স্নেহ তাহে সহাস্য দৃষ্টিতে।
তেমনি হালকা হাসি দেবতার দানে
রয়েছে খচিত হয়ে আমার সম্মানে—
মূল্য তার মনে মনে জানি।

এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি
হাসি-তামাশারে যবে কব ছ্যাব্‌লামি।
এ নিয়ে প্রবীণ যদি করে রাগারাগি
বিধাতার সাথে তারে করি ভাগাভাগি
হাসিতে হাসিতে লব মানি।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
পৌষ ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রহাসিনী

আধুনিকা

চিঠি তব পড়িলাম, বলিবার নাই মোর,
তাপ কিছু আছে তাহে, সন্তাপ তাই মোর।
কবিগিরি ফলাবার উৎসাহ-বন্যায়
আধুনিকাদের 'পরে করিয়াছি অন্যায়
যদি সন্দেহ কর এত বড়ো অবিনয়,
চুপ ক'রে যে সহিবে সে কখনো কবি নয়।
বলিব দু-চার কথা, ভালো মনে শুনো তা;
পূরণ করিয়া নিয়ো প্রকাশের ন্যূনতা।
পাঁজিতে যে আঁক টানে গ্রহ-নক্ষত্তর
আমি তো তদনুসারে পেরিয়েছি সত্তর।
আয়ুর তবিল মোর কুষ্ঠির হিসাবে
অতি অল্প দিনেই শূন্যেতে মিশাবে।
চলিতে চলিতে পথে আজকাল হর্‌দম
বুকে লাগে যমরথচক্রের কর্দম।
তবু মোর নাম আজো পারিবে না ওঠাতে
প্রাত্নিক তত্ত্বের গবেষণা-কোঠাতে।
জীর্ণ জীবনে আজ রঙ নাই, মধু নাই—
মনে রেখো, তবু আমি জন্মেছি অধুনাই।
সাড়ে আঠারো শতক এ. ডি., সে যে বি. সি. নয়;
মোর যারা মেয়ে-বোন নারদের পিসি নয়।
আধুনিকা যারে বল তারে আমি চিনি যে,
কবিযশে তারি কাছে বারো-আনা ঋণী যে।
তারি হাতে চিরদিন যৎপরোনাস্তি
পেয়েছি পুরস্কার, পেয়েছিও শাস্তি।
প্রমাণ গিয়েছি রেখে, এ-কালিনী রমণীর
রমণীয় তালে বাঁধা ছন্দ এ ধমনীর।
কাছে পাই হারাই-বা তবু তারি স্মৃতিতে
সুরসৌরভ জাগে আজো মোর গীতিতে।
মনোলোকে দূতী যারা মাধুরীনিকুঞ্জে
গুঞ্জন করিয়াছি তাহাদেরি গুণ যে।
সেকালেও কালিদাস-বররুচি-আদিরা
পুরসুন্দীরদের প্রশস্তিবাদীরা .

যাদের মহিমাগানে জাগালেন বীণারে
তারাও সবাই ছিল অধুনার কিনারে।
আধুনিকা ছিল নাকো হেন কাল ছিল না,
তাহাদেরি কল্যাণে কাব্যানুশীলনা।
পুরুষ কবির ভালে আছে কোনো সুগ্রহ,
চিরকাল তাই তারে এত মহানুগ্রহ।
জুতা-পায়ে খালি-পায়ে স্লিপারে বা নূপুরে
নবীনারা যুগে যুগে এল দিনে দুপুরে,
যেথা স্বপনের পাড়া সেথা যায় আগিয়ে,
প্রাণটাকে নাড়া দিয়ে গান যায় জাগিয়ে।
তবু কবি-রচনায় যদি কোনো ললনা
দেখ অকৃতজ্ঞতা, জেনো সেটা ছলনা।
মিঠে আর কটু মিলে, মিছে আর সত্যি,
ঠোকাঠুকি ক'রে হয় রস-উৎপত্তি।
মিষ্ট-কটুর মাঝে কোনটা যে মিথ্যে
সে কথাটা চাপা থাক কবির সাহিত্যে।
ওই দেখো, ওটা বুঝি হল শ্লেষবাক্য।
এরকম বাঁকা কথা ঢাকা দিয়ে রাখ্য।
প্রলোভনরূপে আসে পরিহাসপটুতা,
সামলানো নাহি যায় অকারণ কটুতা।
বারে বারে এইমতো করি অত্যুক্তি
ক্ষমা করে কোরো সেই অপরাধমুক্তি।

আর যা-ই বলি নাকো এ কথাটা বলিবই,
তোমাদের দ্বারে মোরা ভিক্ষার থলি বই।
অন্ন ভরিয়া দাও সুধা তাহে লুকিয়ে,
মূল্য তাহারি আমি কিছু যাই চুকিয়ে।
অনেক গেয়েছি গান মুগ্ধ এ প্রাণ দিয়ে—
তোমরা তো শুনেছ তা, অন্তত কান দিয়ে।
পুরুষ পরুষ ভাষে করে সমালোচনা,
সে অকালে তোমাদেরি বাণী হয় রোচনা।
করুণায় ব'লে থাক, "আহা, মন্দ বা কী।"
খুঁটে বের কর না তো কোনো ছন্দ-ফাঁকি।
এইটুকু যা মিলেছে তাই পায় কজনা,
এত লোক করেছে তো ভারতীর ভজনা।
এর পর বাঁশি যবে ফেলে যাব ধূলিতে
তখন আমারে ভুলো পার যদি ভুলিতে।
সেদিন নূতন কবি দক্ষিণপবনে
মধু ঋতু মুখরিবে তোমাদের স্তবনে—
তখন আমার কোনো কীটে-কাটা পাতাতে
একটা লাইনও যদি পারে মন মাতাতে

তা হলে হঠাৎ বুক উঠিবে যে কাঁপিয়া
বৈতরণীতে যবে যাব খেয়া চাপিয়া।

এ কী গেরো। কাজ কী এ কল্পনাবিহারে,
সেন্টিমেন্টালিটি বলে লোকে ইহারে।
ম'রে তবু বাঁচিবার আবদার খোকামি,
সংসারে এর চেয়ে নেই ঘোর বোকামি।
এটা তো আধুনিকার সহিবে না কিছুতেই;
এস্‌টিমেশনে তার পড়ে যাব নিচুতেই।
অতএব, মন, তোর কলসি ও দড়ি আন্‌,
অতলে মারিস ডুব মিড্‌-ভিক্‌টোরিয়ান।
কোনো ফল ফলিবে না আঁখিজল-সিচনে;
শুকনো হাসিটা তবে রেখে যাই পিছনে।
গদ্‌গদ্‌ সুর কেন বিদায়ের পাঠটায়,
শেষ বেলা কেটে যাক ঠাট্টায় ঠাট্টায়।

তোমাদের মুখে থাক্‌ হাস্যের রোশনাই—
কিছু সীরিয়াস কথা বলি তবু, দোষ নাই।
কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী
শুধু এ কালিনী নয়, যারা চিরকালিনী।
এ কথাটা ব'লে যাব মোর কন্‌ফেশানেই
তাদের মিলনে কোনো ক্ষণিকের নেশা নেই।
জীবনের সন্ধ্যায় তাহাদেরি বরণে
শেষ রবিরেখা রবে সোনা-আঁকা স্মরণে।
সুর-সুরধুনীধারে যে অমৃত উথলে
মাঝে মাঝে কিছু তার ঝ'রে পড়ে ভূতলে,
এ জনমে সে কথা জানার সম্ভাবনা
কেমনে ঘটিবে যদি সাক্ষাৎ পাব না।
আমাদের কত ত্রুটি আসনে ও শয়নে,
ক্ষমা ছিল চিরদিন তাহাদের নয়নে।
প্রেমদীপ জ্বেলেছিল পুণ্যের আলোকে,
মধুর করেছে তারা যত কিছু ভালোকে।
নানারূপে ভোগসুধা যা করেছে বরষন
তারে শুচি করেছিল সুকুমার পরশন।
দামি যাহা মিলিয়াছে জীবনের এ পারে
মরণের তীরে তারে নিয়ে যেতে কে পারে।
তবু মনে আশা করি মৃত্যুর রাতেও
তাহাদেরি প্রেম যেন নিতে পারি পাথেয়।
আর বেশি কাজ নেই, গেছে কেটে তিনকাল,
যে কালে এসেছি আজ সে কালটা সিনিকাল!
কিছু আছে যার লাগি সুগভীর নিশ্বাস
জেগে ওঠে— ঢাকা থাক্‌ তার প্রতি বিশ্বাস।

একটু সবুর করো, আরো কিছু বলে যাই,
কথার চরম পারে তার পরে চলে যাই।
যে গিয়েছে তার লাগি খুঁচিয়ো না চেতনা,
ছায়ারে অতিথি ক'রে আসনটা পেতো না।
বৎসরে বৎসরে শোক করা রীতিটার
মিথ্যার ধাক্কায় ভিত ভাঙে স্মৃতিটার।
ভিড় ক'রে ঘটা-করা ধরা-বাঁধা বিলাপে
পাছে কোনো অপরাধ ঘটে প্রথা-খিলাপে,
ভারতে ছিল না লেশ এই-সব খেয়ালের—
কবি-'পরে ভার ছিল নিজ মেমোরিয়ালের।
"ভুলিব না, ভুলিব না" এই ব'লে চীৎকার
বিধি না শোনেন কভু, বলো তাহে হিত কার।
যে ভোলা সহজ ভোলা নিজের অলক্ষ্যে
সে-ই ভালো হৃদয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে।
শুষ্ক উৎস খুঁজে মরুমাটি খোঁড়াটা,
তেলহীন দীপ লাগি দেশালাই পোড়াটা,
যে-মোষ কোথাও নেই সেই মোষ তাড়ানো,
কাজে লাগিবে না যাহা সেই কাজ বাড়ানো—
শক্তির বাজে ব্যয় এরে কয় জেনো হে,
উৎসাহ দেখাবার সদুপায় এ নহে।
মনে জেনো জীবনটা মরণেরই যজ্ঞ—
স্থায়ী যাহা, আর যাহা থাকার অযোগ্য,
সকলি আহুতিরূপে পড়ে তারি শিখাতে,
টিকে না যা কথা দিয়ে কে পারিবে টিকাতে।
ছাই হয়ে গিয়ে তবু বাকি যাহা রহিবে
আপনার কথা সে তো আপনিই কহিবে।

লাহোর
১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

নারীপ্রগতি

শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল
পথের মাঝেই করেছিল ফেল,
তবু তুমি গাড়ি ধরেছ দৌড়ে—
হেন বীরনারী আছে কি গৌড়ে।
নারীপ্রগতির মহাদিনে আজি
নারীপদগতি জিনিল এ বাজি।

হায় কালিদাস, হায় ভবভূতি,
এই গতি আর এই-সব জুতি
তোমাদের গজগামিনীর দিনে
কবিকল্পনা নেয় নি তো চিনে;
কেনে নি ইস্‌টিশনের টিকেট;
হৃদয়ক্ষেত্রে খেলে নি ক্রিকেট;
চণ্ড বেগের ডাণ্ডাগোলায়—
তারা তো মন্দ-মধুর দোলায়
শান্ত মিলন-বিরহ-বন্ধে
বেঁধেছিল মন শিথিল ছন্দে।

রেলগাড়ি আর মোটরের যুগে
বহু অপঘাত চলিয়াছি ভুগে—
তাহারি মধ্যে এল সম্প্রতি
এ দুঃসাহস, এ তড়িৎগতি;
পুরুষেরে দিল দুর্দাম তাড়া,
দুর্বার তেজে নিষ্ঠুর নাড়া।
ভূকম্পনের বিগ্রহবতী
প্রলয়ধাতার নিগ্রহ অতি
বহন করিয়া এসেছে বঙ্গে
পাদুকামুখর চরণভঙ্গে।

সে ধ্বনি শুনিয়া পরলোকে বসি,
কবি কালিদাস, পড়িল কি খসি
উষ্ণীষ তব; দুরুদুরু বুকে
ছন্দ কিছু কি জুটিয়াছে মুখে।
একটি প্রশ্ন শুধাব এবার—
অকপটে তারি জবাব দেবার
আগে একবার ভেবে দেখো মনে,
উত্তর পেলে রাখিব গোপনে—
স্নিগ্ধচ্ছায়া ছিলে যে অতীতে
তেয়াগিয়া তাহা তড়িৎগতিতে
নিতে চাও কভু তীব্রভাষণ
আধুনিকাদের কবির আসন?
মেঘদূত ছেড়ে বিদ্যুৎ-দূত
লিখিতে পাবে কি ভাষা মজবুত।

রঙ্গ

'এ তো বড়ো রঙ্গ' ছড়াটির অনুকরণে লিখিত

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিঠে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোন-পাপড়ি—
তাহার অধিক মিঠে, কন্যা, কোমল হাতের চাপড়ি।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার সাদা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
ক্ষীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি—
তাহার অধিক সাদা তোমার পষ্ট ভাষার দাবড়ি।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের সুক্ত—
তাহার অধিক তিতো যাহা বিনি ভাষায় উক্ত।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার কঠিন দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা—
তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ি চলা।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিথ্যে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
মিথ্যে ভেলকি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাঁচের পান্না—
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না।

পরিণয়মঙ্গল

তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা,
অক্ষয় হয়ে থাক্ সিঁদুরের কৌটা।
সাত চড়ে তবু যেন কথা মুখে না ফোটে,
নাসিকার ডগা ছেড়ে ঘোমটাও না ওঠে;
শাশুড়ি না বলে যেন 'কী বেহায়া বৌটা'।

'পাক প্রণালী'র মতে কোরো তুমি রন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব-সেরা বন্ধন।
চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত ব'লে দাবি নাহি করে মুচিটা;
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন।

যা-ই কেন বলুক-না প্রতিবেশী নিন্দুক
খুব ক'ষে আঁটা যেন থাকে তব সিন্দুক।
বন্ধুরা ধার চায়, দাম চায় দোকানি,
চাকর-বাকর চায় মাসহারা-চোকানি—
ত্রিভুবনে এই আছে অতি বড়ো তিন দুখ।

বই-কেনা শখটারে দিয়ো নাকো প্রশ্রয়;
ধার নিয়ে ফিরিয়ো না, তাতে নাহি দোষ রয়।
বোঝ আর না-ই বোঝ কাছে রেখো গীতাটি,
মাঝে মাঝে উলটিয়ো মনুসংহিতাটি;
'স্ত্রী স্বামীর ছায়াসম' মনে যেন হোঁশ রয়।

যদি কোনো শুভদিনে ভর্তা না ভর্ৎসে,
বেশি ব্যয় হয়ে পড়ে পাকা রুই মৎস্যে,
কালিয়ার সৌরভে প্রাণ যবে উতলায়,
ভোজনে দুজনে শুধু বসিবে কি দু'তলায়।
লোভী এ কবির নাম মনে রেখো, বৎসে।

দ্রুত উন্নতিবেগে স্বামীর অদৃষ্ট
দারোগাগিরিতে এসে শেষে পাক্ ইষ্ট।
বহু পুণ্যের ফল যদি তার থাকে রে,
রায়বাহাদুর-খ্যাতি পাবে তবে আখেরে;
তার পরে আরো কী বা রবে অবশিষ্ট।

প্রয়াগ।১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

ভাইদ্বিতীয়া

সকলের শেষ ভাই
সাতভাই চম্পার
পথ চেয়ে বসেছিল
দেবানুকম্পার।
মনে মনে বিধি-সনে
করেছিল মন্ত্রণ,
যেন ভাইদ্বিতীয়ায়
পায় সে নিমন্ত্রণ।
যদি জোটে দরদি
ছোটো-দি বা বড়ো-দি
অথবা মধুরা কেউ
নাতনির র‍্যাঙ্কে,

উঠিবে আনন্দিয়া,
দেহ প্রাণ মন দিয়া
ভাগ্যেরে বন্দিবে
সাধুবাদে থ্যাঙ্কে।

এল তিথি দ্বিতীয়া,
ভাই গেল জিতিয়া
ধরিল পারুল দিদি
হাতা বেড়ি খুন্তি।
নিরামিষে আমিষে
রেঁধে গেল ঘামি সে,
ঝুড়ি ভ'রে জমা হল
ভোজ্য অগুন্তি।
বড়ো থালা কাংসের
মৎস্য ও মাংসের
কানায় কানায় বোঝা
হয়ে গেল পূর্ণ।
সুঘ্রাণ পোলায়ে
প্রাণ দিল দোলায়ে,
লোভের প্রবল স্রোতে
লেগে গেল ঘূর্ণো।
জমে গেল জনতা,
মহা তার ঘনতা
ভাই-ভাগ্যের সবে
হতে চায় অংশী।
নিদারুণ সংশয়
মনটারে দংশয়—
বহুভাগে দেয় পাছে
মোর ভাগ ধ্বংসি।
চোখ রেখে ঘন্টে
অতি মিঠে কণ্ঠে
কেহ বলে, "দিদি মোর?"
কেহ বলে, "বোন গো,
দেশেতে না থাক্ যশ,
কলমে না থাক্ রস,
রসনা তো রস বোঝে,
করিয়ো স্মরণ গো।"
দিদিটির হাস্য
করিল যা ভাস্য
পক্ষপাতের তাহে
দেখা দিল লক্ষণ।

ভয় হল মিথ্যে,
আশা হল চিত্তে,
নির্ভাবনায় ব'সে
করিলাম ভক্ষণ।

লিখেছিনু কবিতা
সুরে তালে শোভিতা—
এই দেশ সেরা দেশ
বাঁচতে ও মরতে।
ভেবেছিনু তখুনি,
একি মিছে বকুনি।
আজ তার মর্মটা
পেরেছি যে ধরতে।
যদি জন্মান্তরে
এ দেশেই টান ধরে
ভাইরূপে আর বার
আনে যেন দৈব—
হাঁড়ি হাঁড়ি রন্ধন,
ঘষাঘষি চন্দন,
ভগ্নী হবার দায়
নৈবচ নৈব।
আসি যদি ভাই হয়ে
যা রয়েছি তাই হয়ে
সোরগোল পড়ে যাবে
হুলু আর শঙ্খে—
জুটে যাবে বুড়িরা
পিসি মাসি খুড়িরা,
ধুতি আর সন্দেশ
দেবে লোকজনকে।
বোনটার ধ'রে চুল.
টেনে তার দেব দুল,
খেলার পুতুল তার
পায়ে দেব দলিয়া।
শোক তার কে থামায়,
চুমো দেবে মা আমায়,
রাক্ষুসি বলে তার
কান দেবে মলিয়া।
বড়ো হলে নেব তার
পদখানি দেবতার,
দাদা নাম বলতেই
আঁখি হবে সিক্ত।

ভাইটি অমূল্য,
নাই তার তুল্য,
সংসারে বোনটি
নেহাত অতিরিক্ত।

ভাইদ্বিতীয়া। ১৩৪৩

ভোজনবীর

অসংকোচে করিবে ক'ষে ভোজনরসভোগ,
সাবধানতা সেটা যে মহারোগ।
যকৃৎ যদি বিকৃত হয়
স্বীকৃত রবে, কিসের ভয়,
নাহয় হবে পেটের গোলযোগ।

কাপুরুষেরা করিস তোরা দুখভোগের ডর,
সুখভোগের হারাস অবসর।
জীবন মিছে দীর্ঘ করা
বিলম্বিত মরণে মরা
শুধুই বাঁচা না খেয়ে ক্ষীর সর।

দেহের তামসিকতা ছিছি মাংস হাড় পেশি,
তাহারি 'পরে দরদ এত বেশি।
আত্মা জানে রসের রুচি,
কামনা করে কোফ্‌তা লুচি,
তারেও হেলা বলো তো কোন্ দেশী।

ওজন করি ভোজন করা, তাহারে করি ঘৃণা,
মরণভীরু, এ কথা বুঝিবি না।
রোগে মরার ভাবনা নিয়ে
সাবধানীরা রহে কি জিয়ে—
কেহ কি কভু মরে না রোগ বিনা।

মাথা ধরায় মাথার শিরা হোক-না ঝংকৃত,
পেটের নাড়ি ব্যথায় টংকৃত।
ওডিকলোনে ললাট ভিজে—
মাদুলি আর তাগা-তাবিজে
সারাটা দেহ হবে অলংকৃত।

যখন আধিভৌতিকের বাজিবে শেষ ঘড়ি,
গলায় যমদৌতিকের দড়ি।
হোমিয়োপ্যাথি বিমুখ যবে,
কবিরাজিও নারাজ হবে,
তখন আবধৌতিকের বড়ি।

তাহার পরে ছেলে তো আছে বাপেরই পথে ঢুকে
অম্লশূলসাধনকৌতুকে।
কাঁচা আমের আচার যত
রহিবে হয়ে বংশগত,
ধরাবে জ্বালা পারিবারিক বুকে।

খাওয়া বাঁচায়ে বাঙালিদের বাঁচিতে হলে ঝোঁক
এ দেশে তবে ধরিত না তো লোক।
অপরিপাকে মরণভয়
গৌড়জনে করেছে জয়,
তাদের লাগি কোরো না কেহ শোক।

লঙ্কা আনো, সর্ষে আনো, সস্তা আনো ঘৃত,
গন্ধে তার হোয়ো না শঙ্কিত।
আঁচলে ঘেরি কোমর বাঁধো,
ঘণ্ট আর ছেঁচকি রাঁধো,
বৈদ্য ডাকো— তাহার পরে মৃত।

অপাক-বিপাক

চলতি ভাষায় যারে ব'লে থাকে আমাশা
যত দূর জানা আছে, সেটা নয় তামাশা।
অধ্যাপকের পেটে এল সেই রোগটা তো,
তাহার কারণ ছিল গুরু জলযোগটা তো।

বউমার অবারিত অতিথিসেবার চোটে
কী কাণ্ড ঘটেছিল শুনে বুক ফুলে ওঠে।
টেবিল জুড়িয়া ছিল চর্ব্য ও কত পেয়;
ডেকে ডেকে বলেছেন, "যত পার তত খেয়ো।"
হায়, এত উদারতা সইল না উদরের—
জঠরে কী কঠোরতা বিজ্ঞানভূধরের;
রসনায় ভূরি ভূরি পেল এত মিষ্টতা,
অন্তরে নিয়ে তারে করিল না শিষ্টতা।
এই যদি আচরণ হেন খ্যাতনামাদের,
তোমাদেরি লজ্জা সে, ক্ষতি নেই আমাদের।
হেথাকার আয়োজনে নাই কার্পণ্য যে,
প্রবল প্রমাণে তারি পরিবার ধন্য যে।
বিশ্বে ছড়াল খ্যাতি; বিশ্ববিদ্যাগৃহে
করে সবে কানাকানি, "বলো দেখি, হল কী হে।"
এত বড়ো রটনার কারণ ঘটান যিনি
তাঁর কাছে কবি রবি চিরদিন রবে ঋণী।।

গরঠিকানি

বেঠিকানা তব
আলাপ শব্দভেদী
দিল এ বিজনে
আমার মৌন ছেদি।
দাদুর পদবী
পেয়েছি, তাহার দায়
কোনো ছুতো করে
কভু কি ঠেকানো যায়!
স্পর্ধা করিয়া
ছন্দে লিখেছ চিঠি;
ছন্দেই তার
জবাবটা যাক মিটি।
নিশ্চিত তুমি
জানিতে মনের মধ্যে—
গর্ব আমার
খর্ব হবে না গদ্যে।
লেখনীটা ছিল
শক্ত জাতেরই ঘোড়া;
বয়সের দোষে
কিছু তো হয়েছে খোঁড়া।
তোমাদের কাছে
সেই লজ্জাটা ঢেকে
মনে সাধ, যেন
যেতে পারি মান রেখে।
তোমার কলম
চলে যে হালকা চালে,
আমারো কলম
চালাব সে ঝাঁপতালে;
হাঁপ ধরে, তবু
এই সংকল্পটা
টেনে রাখি, পাছে
দাও বয়সের খোঁটা।
ভিতরে ভিতরে
তবু জাগ্রত রয়
দর্পহরণ
মধুসূদনের ভয়।
বয়স হলেই
বৃদ্ধ হয়ে যে মরে

বড়ো ঘৃণা মোর
সেই অভাগার 'পরে।
প্রাণ বেরোলেও
তোমাদের কাছে তবু
তাই তো ক্লান্তি
প্রকাশ করি নে কভু।

কিন্তু একটা
কথায় লেগেছে ধোঁকা,
কবি বলেই কি
আমারে পেয়েছ বোকা।
নানা উৎপাত
করে বটে নানা লোকে,
সহ্য তো করি
পষ্ট দেখেছ চোখে—
সেই কারণেই
তুমি থাক দূরে দূরে,
বলেছ সে কথা
অতি সকরুণ সুরে।
বেশ জানি, তুমি
জান এটা নিশ্চয়—
উৎপাত সে যে
নানা রকমের হয়।
কবিদের 'পরে
দয়া করেছেন বিধি—
মিষ্টি মুখের
উৎপাত আনে দিদি।
চাটু বচনের
মিষ্টি রচন জানে;
ক্ষীরে সরে কেউ
মিষ্টি বানিয়ে আনে।
কোকিলকণ্ঠে
কেউ বা কলহ করে;
কেউ বা ভোলায়
গানের তানের স্বরে।
তাই ভাবি, বিধি
যদি দরদের ভুলে
এ উৎপাতের
বরাদ্দ দেন তুলে,

শুকনো প্রাণটা
মহা উৎপাত হবে।
উপমা লাগিয়ে
কথাটা বোঝাই তবে।—
সামনে দেখো-না
পাহাড়, শাবল ঠুকে
ইলেক্‌ট্রিকের
খোঁটা পোঁতে তার বুকে;
সন্ধেবেলার
মসৃণ অন্ধকারে
এখানে সেখানে
চোখে আলো খোঁচা মারে।
তা দেখে চাঁদের
ব্যথা যদি লাগে প্রাণে,
বার্তা পাঠায়
শৈলশিখর-পানে—
বলে, "আজ হতে
জ্যোৎস্নার উৎপাতে
আলোর আঘাত
লাগাব না আর রাতে"—
ভেবে দেখো, তবে
কথাটা কি হবে ভালো।
তাপের জ্বলন
আনে কি সবারই আলো।

এখানেই চিঠি
শেষ ক'রে যাই চলে—
ভেবো না যে তাহা
শক্তি কমেছে ব'লে;
বুদ্ধি বেড়েছে
তাহারই প্রমাণ এটা;
বুঝেছি, বেদম
বাণীর হাতুড়ি পেটা
কথারে চওড়া
করে বকুনির জোরে,
তেমনি যে তাকে
দেয় চ্যাপটাও ক'রে।
বেশি যাহা তাই
কম, এ কথাটা মানি—

চেঁচিয়ে বলার
চেয়ে ভালো কানাকানি।
বাঙালি এ কথা
জানে না ব'লেই ঠকে;
দাম যায় আর
দম যায় যত বকে।
চেঁচানির চোটে
তাই বাংলার হাওয়া
রাতদিন যেন
হিস্‌টিরিয়ায় পাওয়া।
তারে বলে আর্ট
না-বলা যাহার কথা;
ঢাকা খুলে বলা
সে কেবল বাচালতা।
এই তো দেখো-না
নাম-ঢাকা তব নাম;
নামজাদা খ্যাতি
ছাপিয়ে যে ওর দাম।

এই দেখো দেখি,
ভারতীয় ছল কী এ।
বকা ভালো নয়,
এ কথা বোঝাতে গিয়ে
খাতাখানা জুড়ে
বকুনি যা হল জমা
আর্টের দেবী
করিবে কি তারে ক্ষমা।
সত্য কথাটা
উচিত কবুল করা—
রব যে উঠেছে
রবিরে ধরেছে জরা,
তারই প্রতিবাদ
করি এই তাল ঠুকে;
তাই ব'কে যাই
যত কথা আসে মুখে।
এ যেন কলপ
চুলে লাগাবার কাজ—
ভিতরেতে পাকা,
বাহিরে কাঁচার সাজ।

ক্ষীণ কণ্ঠেতে
জোর দিয়ে তাই দেখাই,
বকবে কি শুধু
নাতনিজনেরা একাই।
মানব না হার
কোনো মুখরার কাছে,
সেই গুমোরের
আজো ঢের বাকি আছে।

কালিম্পং
৫ আষাঢ় ১৩৪৫

অনাদৃতা লেখনী

সম্পাদকি তাগিদ নিত্য চলছে বাহিরে,
অন্তরেতে লেখার তাগিদ একটু নাহি রে
মৌন মনের মধ্যে
গদ্যে কিংবা পদ্যে।
পূর্ব যুগে অশোক গাছে নারীর চরণ লেগে
ফুল উঠিত জেগে—
কলিযুগে লেখনীরে সম্পাদকের তাড়া
নিত্যই দেয় নাড়া,
ধাক্কা খেয়ে যে জিনিসটা ফোটে খাতার পাতে
তুলনা কি হয় কভু তার অশোকফুলের সাথে।

দিনের পরে দিন কেটে যায়
গুন্‌গুনিয়ে গেয়ে
শীতের রৌদ্রে মাঠের পানে চেয়ে।
ফিকে রঙের নীল আকাশে
আতপ্ত সমীরে
আমার ভাবের বাষ্প উঠে
ভেসে বেড়ায় ধীরে,
মনের কোণে রচে মেঘের স্তূপ,
নাই কোনো তার রূপ—
মিলিয়ে যায় সে এলোমেলো নানান ভাবনাতে,
মিলিয়ে যায় সে কুয়োর ধারে
শজনেগুচ্ছ-সাথে।

এদিকে যে লেখনী মোর
একলা বিরহিণী;

দৈবে যদি কবি হতেন তিনি,
বিরহ তাঁর পদ্যে বানিয়ে
নীচের লেখার ছাঁদে আমায়
দিতেন জানিয়ে—

বিনয়সহ এই নিবেদন অঙ্গুলিচন্দ্রপাসু,
নালিশ জানাই কবির কাছে, জবাবটা চাই আশু।
যে লেখনী তোমার হাতের স্পর্শে জীবন লভে
অচলকূটের নির্বাসন সে কেমন ক'রে সবে।
বক্ষ আমার শুকিয়ে এল, বন্ধ মসী-পান,
কেন আমায় ব্যর্থতার এই কঠিন শাস্তি দান।
স্বাধিকারে প্রমত্তা কি ছিলাম কোনোদিন।
করেছি কি চঞ্চু আমার ভোঁতা কিংবা ক্ষীণ।
কোনোদিন কি অপঘাতে তাপে কিংবা চাপে
অপরাধী হয়েছিলাম মসীপাতন-পাপে।
পত্রপটে অক্ষর-রূপ নেবে তোমার ভাষা,
দিনে-রাতে এই ছাড়া মোর আর কিছু নেই আশা।
নীলকণ্ঠ হয়েছি যে তোমার সেবার তরে,
নীল কালিমার তীব্ররসে কণ্ঠ আমার ভরে।
চালাই তোমার কীর্তিপথে রেখার পরে রেখা,
আমার নামটা কোনো খাতায় কোথাও রয় না লেখা।
ভগীরথকে দেশবিদেশে নিয়েছে লোক চিনে,
গোমুখী সে রইল নীরব খ্যাতিভাগের দিনে।
কাগজ সেও তোমার হাতের স্বাক্ষরে হয় দামি,
আমার কাজের পুরস্কারে কিছুই পাই নে আমি।
কাগজ নিত্য শুয়ে কাটায় 'টেবিল-'পরে লুটি,
বাঁ দিক থেকে ডান দিকেতে আমার ছুটোছুটি।
কাগজ তোমার লেখা জমায়, বহে তোমার নাম—
আমার চলায় তোমার গতি এইটুকু মোর দাম।
অকীর্তিত সেবার কাজে অঙ্গ হবে ক্ষীণ,
আসবে তখন আবর্জনায় বিসর্জনের দিন।
বাচালতায় তিন ভুবনে তুমিই নিরুপম,
এ পত্র তার অনুকরণ; আমায় তুমি ক্ষমো।
নালিশ আমার শেষ করেছি, এখন তবে আসি।
—তোমার কালিদাসী।

পলাতকা

কোথা তুমি গেলে যে মোটরে
শহরের গলির কোটরে,
এক্‌জামিনেশনের তাড়া।
কেতাবের 'পরে ঝুঁকে থাকো,
বেণীর ডগাও দেখি নাকো,
দিনে রাতে পাই নে যে সাড়া।
আমার চায়ের সভা শূন্য,
মনটা নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ,
সুমুখে নফর বনমালী।
'সুমুখ' তাহারে বলা মিছে,
মুখ দেখে মন যায় খিচে,
বিনাদোষে দিই তারে গালি।
ভোজন ওজনে অতি কম—
নাই রুটি, নাই আলুদম,
নাই রুইমাছের কালিয়া।
জঠর ভরাই শুধু দিয়ে
দু-পেয়ালা Chinese tea-য়ে
আধসের দুগ্ধ ঢালিয়া।
উদাস হৃদয়ে খাই একা
টিনের মাখন দিয়ে সেঁকা
রুটি-তোস্‌ শুধু খান-তিন।
গোটা-দুই কলা খাই গুনে,
তারই সাথে বিলিতি-বেগুনে
কিছু পাওয়া যায় ভিটামিন।
মাঝে মাঝে পাই পুলিপিঠে,
পার করে দিই দু-চারিটে
খেজুর গুড়ের সাথে মেখে।
পিরিচে পেড়াকি যবে আনে
আড়চোখে চেয়ে তার পানে
'পরে খাব' বলে দিই রেখে।
তার পর দুপুর অবধি
না ক্ষীর, না ছানা সর দধি,
ছুঁই নেকো কোফতা কাবাব।
নিজের এ দশা ভেবে ভেবে
বুক যায় সাত হাত নেবে,
কারে বা জানাই মনোভাব।

করছি নে exaggerate—
কিছু আছে সত্য নিরেট,
কবিত্ব সেও অল্প না।

বিরহ যে বুকে ব্যথা দাগে
সাজিয়ে বলতে গেলে লাগে
পনেরো-আনাই কল্পনা।
অতএব এই চিঠি-পাঠে
পরান তোমার যদি ফাটে
খুব বেশি রবে না প্রমাণ।
চিঠির জবাব দেবে যবে
ভাষা ভরে দিয়ো হাহারবে
কবি-নাতনির রেখো মান।

পুনশ্চ

বাড়িয়ে বলাটা ভালো নয়
যদি কোনো নীতিবাদী কয়
কোস্ তারে, "অতিশয় উক্তি—
মসলার যোগে যথা রান্না,
আবদারে ছল ক'রে কান্না,
নাকি সুর-যোগে যথা যুক্তি।
ঝুমকোর ফুল ফোটে ডালে,
চোরেও চায় না কোনোকালে,
কানে ঝুমকোর ফুল দামি।
কৃত্রিম জিনিসেরই দাম,
কৃত্রিম উপাধিতে নাম,
জমকালো করেছি তো আমি।"
অতএব মনে রেখো দড়ো,
এ চিঠির দাম খুব বড়ো,
যে-হেতুক বাড়িয়ে বলায়
বাজারে তুলনা এর নেই—
কেবলই বানানো বচনেই
ভরা এ যে ছলায় কলায়।
পাল্লা যে দিবি মোর সাথে
সে ক্ষমতা নেই তোর হাতে,
তবুও বলিস প্রাণপণ
বাড়িয়ে বাড়িয়ে মিঠে কথা—
ভুলিবে, হবে না অন্যথা,
দাদামশায়ের বোকা মন।
যা হোক, এ কথা চাই শোনা,
তাড়াতাড়ি ছন্দে লিখো না,
না হয় না হলে কবিবর—
অনুকরণের শরাহত
আছি আমি ভীষ্মের মতো,
তাহে তুমি বাড়িয়ো না স্বর।

যে ভাষায় কথা কয়ে থাকো
আদর্শ তারে বলে নাকো,
আমার পক্ষে সে তো ঢের-
flatter করিতে যদি পার
গ্রাম্যতাদোষ যত তারো
একটু পাব না আমি টের।

শান্তিনিকেতন
৮ মাঘ ১৩৪১

কাপুরুষ

নিবেদনম্ অধ্যাপকিনিসু—
কর্তা তোমার নিতান্ত নন শিশু,
জানিয়ো তো সেই সংখ্যাতত্ত্বনিধিকে,
ব্যর্থ যদি করেন তিনি বিধিকে,
পুরুষজাতির মুখ্যবিজয়কেতু
গুম্ফশ্মশ্রু ত্যজেন বিনা হেতু,
গণ্ডদেশে পাবেন ক্ষুরের শাস্তি
একটুমাত্র সংশয় তায় নাস্তি।
সিংহ যদি কেশর আপন মুড়োয়
সিংহী তারে হেসেই তবে উড়োয়।
কৃষ্ণসার সে বদ্‌খেয়ালে হঠাৎ
শিং জোড়াটা কাটে যদি পটাৎ
কৃষ্ণসারনি সইতে সে কি পারবে—
ছী ছি ব'লে কোন্ দেশে দৌড় মারবে।
উলটো দেখি অধ্যাপকের বেলায়—
গোঁফদাড়ি সে অসংকোচে ফেলায়,
কামানো মুখ দেখেন যখন ঘরনী
বলেন না তো 'দ্বিধা হও, মা ধরণী'।

গৌড়ী রীতি

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই,
ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার 'পরে মহারাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি।

বহু সাধনায় যার কাছে পায়
কালো বিড়ালের ছানা,
লোকে তারে বলে নয়নের জলে,
"দাতা বটে ষোলো-আনা।"

বিপুল ভোজনে মনের ওজনে
ছটাক যদি-বা কমে
সেই ছটাকের চাঁটিতে ঢাকের
গালাগালি-বোল জমে।

দেনার হিসাবে ফাঁকিই মিশাবে,
খুঁজিয়া না পাবে চাবি—
পাওনা-যাচাই কঠিন বাছাই,
শেষ নাহি তার দাবি।

রুদ্ধ দুয়ার বহুমান তার
দ্বারীর প্রসাদে খোলে।
মুক্ত ঘরের মহা আদরের
মূল্য সবাই ভোলে।

সামনে আসিয়া নম্র হাসিয়া
স্তবের রবের দৌড়,
পিছনে গোপন নিন্দারোপণ—
ধন্য ধন্য গৌড়।

অটোগ্রাফ

খুলে আজ বলি, ওগো নব্য,
নও তুমি পুরোপুরি সভ্য।
জগৎটা যত লও চিনে
ভদ্র হতেছ দিনে দিনে।
বলি তবু সত্য এ কথা—
বারো-আনা অভদ্রতা
কাপড়ে-চোপড়ে ঢাক তারে,
ধরা তবু পড়ে বারে বারে,
কথা যেই বার হয় মুখে
সন্দেহ যায় সেই চুকে।

ডেস্কেতে দেখিলাম, মাতা
রেখেছেন অটোগ্রাফ-খাতা।
আধুনিক রীতিটার ভানে
যেন সে তোমারই দাবি আনে।
এ ঠকানো তোমার যে নয়
মনে মোর নাই সংশয়।
সংসারে যারে বলে নাম
তার যে একটু নেই দাম
সে কথা কি কিছু ঢাকা আছে
শিশু ফিলজফারের কাছে।
খোকা বলে, বোকা বলে কেউ—
তা নিয়ে কাঁদ না ভেউ-ভেউ।
নাম-ভোলা খুশি নিয়ে আছ,
নামের আদর নাহি যাচ।
খাতাখানা মন্দ এ না গো
পাতা-ছেঁড়া কাজে যদি লাগ।
আমার নামের অক্ষর
চোখে তব দেবে ঠোক্কর।
ভাববে, এ বুড়োটার খেলা,
আঁচড়-পাঁচড় কাটে মেলা।
লজঞ্জুসের যত মূল্য
নাম মোর নহে তার তুল্য।
তাই তো নিজেরে বলি, ধিক্,
তোমারই হিসাব-জ্ঞান ঠিক।
বস্তু-অবস্তুর সেন্স্
খাঁটি তব, তার ডিফারেন্স্
পষ্ট তোমার কাছে খুবই—
তাই, হে লজঞ্জুস-লুভি,
মতলব করি মনে মনে,
খাতা থাক্ টেবিলের কোণে।
বনমালী কো-অপেতে গেলে
টফি-চকোলেট যদি মেলে
কোনোমতে তবে অন্তত
মান রবে আজকের মতো।
ছ বছর পরে নিয়ো খাতা,
পোকায় না কাটে যদি পাতা।

শান্তিনিকেতন
১ পৌষ ১৩৪৫

মাল্যতত্ত্ব

লাইব্রেরিঘর, টেবিল-ল্যাম্পো জ্বালা—
সেগেছি প্রুফ-করেক্‌শনে গলায় কুন্দমালা।
ডেস্কে আছে দুই পা তোলা, বিজন ঘরে একা,
এমন সময় নাত্‌নি দিলেন দেখা।

সোনার কাঠির শিহরলাগা বিশবছরের বেগে
আছেন কন্যা দেহে মনে পরিপূর্ণ জেগে।
হঠাৎ পাশে আসি
কটাক্ষেতে ছিটিয়ে দিল হাসি,
বললে বাঁকা পরিহাসের ছলে
"কোন্ সোহাগির বরণমালা পরেছ আজ গলে।"
একটু থেমে দ্বিধার ভানে নামিয়ে দিয়ে চোখ
বলে দিলেম, "যেই বা সে-জন হোক
বলব না তার নাম—
কী জানি, ভাই, কী হয় পরিণাম।
মানবধর্ম, ঈর্ষা বড়ো বালাই,
একটুতে বুক জ্বালায়।"
বললে শুনে বিংশতিকা, "এই ছিল মোর ভালে—
বুক ফেটে আজ মরব কি শেষকালে,
কে কোথাকার তার উদ্দেশে করব রাগারাগি
মালা দেওয়ার ভাগ নিয়ে কি, এমনি হতভাগি।"
আমি বললেম, "কেনই বা দাও লাজ,
করোই-না আন্দাজ।"
বলে উঠল, "জানি, জানি, ওই আমাদের ছবি,
আমারই বান্ধবী।
একসঙ্গে পাস করেছি ব্রাহ্ম-গার্‌ল্‌-স্কুলে,
তোমার নামে চোখ পড়ে তার ঢুলে।
তোমারও তো দেখেছি ওর পানে
মুগ্ধ আঁখি পক্ষপাতের কটাক্ষ সন্ধানে।"
আমি বললেম, "নাম যদি তার শুনবে নিতান্তই—
আমাদের ওই জগা মালী, মৃদুস্বরে কই।"
নাতনি বলে, "হায় কী দুরবস্থা,
বয়স হয়ে গেছে ব'লেই কণ্ঠ এতই সস্তা।
যে গলাটায় আমরা গলগ্রহ
জগামালীর মালা সেথায় কোন্ লজ্জায় বহো।"
আমি বললেম, "সত্য কথাই বলি,
তরুণীদের করুণা সব দিলেম জলাঞ্জলি।
নেশার দিনের পারে এসে আজকে লাগে ভালো,
ওই যে কঠিন কালো।

জগার আঙুল মালা যখন গাঁথে
বোকা মনের একটা কিছু মেশায় তারই সাথে।
তারই পরশ আমার দেহ পরশ করে যবে
রস কিছু তার পাই যে অনুভবে।
এ-সব কথা বলতে মানি ভয়
তোমার মতো নব্যজনের পাছে মনে হয়—
এ বাণী বস্তুত
কেবলমাত্র উচ্চদরের উপদেশের ছুতো,
ডাইডাক্‌টিক্‌ আখ্যা দিয়ে যারে
নিন্দা করে নতুন অলংকারে।
গা ছুঁয়ে তোর কই,
কবিই আমি, উপদেষ্টা নই।
বলি-পড়া বাকলওয়ালা বিদেশী ওই গাছে
গন্ধবিহীন মুকুল ধরে আছে
আঁকাবাঁকা ডালের ডগা ধূসর রঙে ছেয়ে—
যদি বলি ওটাই ভালো মাধবিকার চেয়ে,
দোহাই তোমার কুরঙ্গনয়নী,
ব্যঙ্গকুটিল দুর্বাক্য-চয়নী,
ভেবো না গো, পূর্ণচন্দ্রমুখী,
হরিজনের প্রপাগ্যান্ডা দিচ্ছে বুঝি উঁকি।
এতদিন তো ছন্দে-বাঁধা অনেক কলরবে
অনেকরকম রঙ-চড়ানো স্তবে
সুন্দরীদের জুগিয়ে এলেম মান—
আজকে যদি বলি 'আমার প্রাণ
জগামালীর মালায় পেল একটা কিছু খাঁটি',
তাই নিয়ে কি চলবে ঝগড়াঝাঁটি।"
নাতনি কহেন, "ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিচ্ছ কথা,
আমার মনে সত্যি লাগায় ব্যথা।
তোমার বয়স চারি দিকের বয়সখানা হতে
চলে গেছে অনেক দূরের স্রোতে।
একলা কাটাও ঝাপসা দিবসরাতি,
নাইকো তোমার আপন দরের সাথি।
জগামালীর মালাটা তাই আনে
বর্তমানের অবজ্ঞাভার নীরস অসম্মানে।"
আমি বললেম, "দয়াময়ী, ওইটে তোমার ভুল,
ওই কথাটার নাইকো কোনো মূল।
জান তুমি, ওই যে কালো মোষ
আমার হাতে রুটি খেয়ে মেনেছে মোর পোষ,
মিনি-বেড়াল নয় বলে সে আছে কি তার দোষ।
জগামালীর প্রাণে
যে জিনিসটা অবুঝভাবে আমার দিকে টানে

কী নাম দেব তার,
একরকমের সেও অভিসার।
কিন্তু সেটা কাব্যকলায় হয় নি বরণীয়,
সেই কারণেই কণ্ঠে আমার সমাদরণীয়।"
নাতনি হেসে বলে,
"কাব্যকথার ছলে
পকেট থেকে বেরোয় তোমার ভালো কথার থলি,
ওটাই আমি অভ্যাসদোষ বলি।"
আমি বললেম, "যদি কোনোক্রমে
জন্মগ্রহের ভ্রমে
ভালো যেটা সেটাই আমার ভালো লাগে দৈবে,
হয়তো সেটা একালেরও সরস্বতীর সইবে।"
নাতনি বলে, "সত্যি বলো দেখি,
আজকে-দিনের এই ব্যাপারটা কবিতায় লিখবে কি।"
আমি বললেম, "নিশ্চয় লিখবই,
আরম্ভ তার হয়েই গেছে সত্য করেই কই।
বাঁকিয়ো না গো পুষ্পধনুক-ভুরু,
শোনো তবে. এইমত তার শুরু।—
'শুক্ল একাদশীর রাতে
কলিকাতার ছাতে
জ্যোৎস্না যেন পারিজাতের পাপড়ি দিয়ে ছোঁওয়া,
গলায় আমার কুন্দমালা গোলাপজলে ধোওয়া'—
এইটুকু যেই লিখেছি সেই হঠাৎ মনে প'ল,
এটা নেহাত অসাময়িক হল।
হাল ফ্যাশানের বাণীর সঙ্গে নতুন হল রফা,
একাদশীর চন্দ্র দেবেন কর্মেতে ইস্তফা।
শূন্যসভায় যত খুশি করুন বাবুয়ানা,
সত্য হতে চান যদি তো বাহার-দেওয়া মানা।
তা ছাড়া ওই পারিজাতের ন্যাকামিও ত্যাজ্য,
মধুর করে বানিয়ে বলা নয় কিছুতেই ন্যায্য।
বদল করে হল শেষে নিম্নরকম ভাষা—
'আকাশ সেদিন ধুলোয় ধোঁয়ায় নিরেট করে ঠাসা,
রাতটা যেন কুলিমাগি কয়লাখনি থেকে
এল কালো রঙের উপর কালির প্রলেপ মেখে।'
তার পরেকার বর্ণনা এই— 'তামাক-সাজার ধন্দে
জগার থ্যাবড়া আঙুলগুলো দোক্তাপাতার গন্ধে
দিনরাত্রি ল্যাপা।
তাই সে জগা খ্যাপা
যে মালাটাই গাঁথে তাতে ছাপিয়ে ফুলের বাস
তামাকেরই গন্ধের হয় উৎকট প্রকাশ।'"

নাতনি বললে বাধা দিয়ে, "আমি জানি জানি,
কী বলে যে শেষ করেছ নিলেম অনুমানি ।
যে তামাকের গন্ধ ছাড়ে মালার মধ্যে, ওটায়
সর্বসাধারণের গন্ধ নাড়ীর ভিতর ছোটায় ।
বিশ্বপ্রেমিক তাই তোমার এই তত্ত্ব—
ফুলের গন্ধ আলংকারিক, এ গন্ধটাই সত্য ।"
আমি বললেম, "ওগো কন্যে, গলদ আছে মূলেই,
এতক্ষণ যা তর্ক করছি সেই কথাটা ভুলেই ।
মালাটাই যে ঘোর সেকেলে, সরস্বতীর গলে
আর কি ওটা চলে ।
রিয়ালিস্‌টিক্‌ প্রসাধন যা নব্যশাস্ত্রে পড়ি—
সেটা গলায় দড়ি ।"

নাতনি আমার ঝাঁকিয়ে মাথা নেড়ে
এক দৌড়ে চলে গেল আমার আশা ছেড়ে ।

শ্যামলী । শান্তিনিকেতন
৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৮

সংযোজন

নাসিক হইতে খুড়ার পত্র

কলকত্তামে চলা গয়ো রে সুরেনবাবু[1] মেরা,
সুরেনবাবু, আসল বাবু, সকল বাবুকো সেরা।
খুড়া সাবকো কায়কো নহি পতিয়া ভেজো বাচ্ছা—
মহিনা-ভর্ কুছ খবর মিলে না ইয়ে তো নহি আচ্ছা।
টপাল্,[2] টপাল্, কঁহা টপাল্‌রে, কপাল হমারা মন্দ,
সকাল বেলাতে নাহি মিলতা টপাল্‌কো নাম গন্ধ!
ঘরকো যাকে কায়কো বাবা, তুম্‌সে হম্‌সে ফর্‌খৎ।
দো-চার কলম লীখ্ দেওঙ্গে ইস্‌মে ক্যা হয় হর্‌কৎ!
প্রবাসকো এক সীমা পর হম্ বৈঠ্‌কে আছি একলা—
সুরিবাবাকো বাস্তে আঁখ্‌সে বহুৎ পানি নেক্‌লা।
সর্বদা মন কেমন কর্‌তা, কেঁদে উঠ্‌তা হির্দয়—
ভাত খাতা, ইস্কুল যাতা, সুরেনবাবু নির্দয়!
মন্‌কা দুঃখে হুহু কর্‌কে নিক্‌লে হিন্দুস্থানী—
অসম্পূর্ণ ঠেকতা কানে বাঙ্গলাকো জবানী।
মেরা উপর জুলুম কর্‌তা তেরি বহিন বাই,[3]
কী করেঙ্গা কোথায় যাঙ্গা ভেবে নাহি পাই!
বহুৎ জোরসে গাল টিপ্‌তা দোনো আঙ্গুলি দেকে,
বিলাতী এক পৈনি বাজ্‌না বাজাতা থেকে থেকে,
কভী কভী নিকট আকে ঠোঁটমে চিম্‌টি কাটতা,
কাঁচি লে কর কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুলগুলো সব ছাঁটতা,
জজসাহেব[4] কুছ বোল্‌তা নহি রক্ষা করবে কেটা,
কঁহা গয়োরে কঁহা গয়োরে জজসাহেবকি বেটা!
গাড়ি চড়্‌কে লাঠিন পড়্‌কে তুম্ তো যাতা ইস্কিল্,
ঠোঁটে নাকে চিম্‌টি খাকে হমারা বহুৎ মুস্কিল!
এদিকে আবার party হোতা খেল্‌নেকোবি যাতা,
জিম্‌খানামে হিম্‌ঝিম্ এবং থোড়া বিস্কুট খাতা।
তুম ছাড়া কোই সমজে না তো হম্‌রা দুরাবস্থা,
বহিন তেরি বহুৎ merry খিল্‌খিল্ কর্কে হাস্তা!
চিঠি লিখিও মাকে দিও বহুৎ বহুৎ সেলাম,
আজকের মতো তবে বাবা বিদায় হোকে গেলাম।

১ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২ চিঠির ডাক।
৩ ইন্দিরা দেবী।
৪ অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথের পিতা।

পত্র

সৃষ্টি-প্রলয়ের তত্ত্ব
লয়ে সদা আছ মত্ত,
দৃষ্টি শুধু আকাশে ফিরিছে ;
গ্রহতারকার পথে
যাইতেছ মনোরথে,
ছুটিছ উল্কার পিছে পিছে ;
হাঁকায়ে দু-চারিজোড়া
তাজা পক্ষিরাজ-ঘোড়া
কলপনা গগনভেদিনী
তোমারে করিয়া সঙ্গী
দেশকাল যায় লঙ্ঘি,
কোথা প'ড়ে থাকে এ মেদিনী।
সেই তুমি ব্যোমচারী
আকাশ-রবিরে ছাড়ি
ধরার রবিরে কর মনে—
ছাড়িয়া নক্ষত্র গ্রহ
একি আজ অনুগ্রহ
জ্যোতির্হীন মর্তবাসী জনে।
ভুলেছ ভুলেছ কক্ষ,
দূরবীন ভ্রষ্টলক্ষ্য,
কোথা হতে কোথায় পতন।
ত্যজি দীপ্ত ছায়াপথে
পড়িয়াছ কায়াপথে—
মেদ-মাংস-মজ্জা-নিকেতন।

বিধি বড়ো অনুকূল,
মাঝে মাঝে হয় ভুল,
ভুল থাক্ জন্ম জন্ম বেঁচে—
তবু তো ক্ষণেকতরে
ধূলিময় খেলাঘরে
মাঝে মাঝে দেখা দাও কেঁচে।
তুমি অদ্য কাশীবাসী,
সম্প্রতি লয়েছ আসি
বাবা ভোলানাথের শরণ ;
দিব্য নেশা জমে ওঠে,
দু বেলা প্রসাদ জোটে,
বিধিমতে ধূমোপকরণ।
জেগে উঠে মহানন্দ
খুলে যায় ছন্দোবন্ধ,
ছুটে যায় পেন্সিল উদ্দাম—

পরিপূর্ণ ভাবভরে
লেফাফা ফাটিয়া পড়ে,
বেড়ে যায় ইস্টাম্পের দাম।
আমার সে কর্ম নাস্তি,
দারুণ দৈবের শাস্তি,
শ্লেষ্মা-দেবী চেপেছেন বক্ষে—
সহজেই দম কম,
তাহে লাগাইলে দম
কিছুতে রবে না আর রক্ষে।
নাহি গান, নাহি বাঁশি,
দিনরাত্রি শুধু কাশি,
ছন্দ তাল কিছু নাহি তাহে ;
নবরস কবিত্বের
চিত্তে জমা ছিল ঢের,
বহে গেল সর্দির প্রবাহে।
অতএব নমোনম,
অধম অক্ষমে ক্ষম,
ভঙ্গ আমি দিনু ছন্দরণে—
মগধে কলিঙ্গে গৌড়ে
কল্পনার ঘোড়দৌড়ে
কে বলো পারিবে তোমা-সনে।

বনক্ষেত্র। শিমলাশৈল
শনিবার। ১৮৯৮

সুসীম চা-চক্র

শান্তিনিকেতনে চা-চক্র প্রবর্তন উপলক্ষে

হায় হায় হায়
দিন চলি যায়।
চা-স্পৃহ চঞ্চল
চাতকদল চল
চল চল হে!
টগবগ উচ্ছল
কাথলিতল জল
কল কল হে!
এল চীন-গগন হতে
পূর্বপবনস্রোতে
শ্যামল রসধরপুঞ্জ,
শ্রাবণবাসরে
রস ঝরঝর ঝরে
ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ
দলবল হে!

এস পুঁথিপরিচারক
তদ্ধিতকারক
তারক তুমি কাণ্ডারী,
এস গণিত-ধুরন্ধর
কাব্য-পুরন্দর
ভূবিবরণ ভাণ্ডারী।
এস বিশ্বভার-নত
শুষ্ক-রুটিনপথ
মরুপরিচারণ ক্লান্ত!
এস হিসাব'পত্তর'ত্রস্ত
তহবিল-মিল-ভুলগ্রস্ত
লোচনপ্রান্ত
ছল ছল হে!

এস গীতিবীথিচর
তম্বুরকরধর
তানতালতলমগ্ন,
এস চিত্রী চটপট
ফেলি তুলিকপট
রেখাবর্ণবিলগ্ন।
এস কনস্‌টিট্যুশন
নিয়ম-বিভূষণ
তর্কে অপরিশ্রান্ত,
এস কমিটি-পলাতক
বিধানঘাতক
এস দিগ্‌ভ্রান্ত
টলমল হে।

[শান্তিনিকেতন
শ্রাবণ ১৩৩১]

চাতক

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিমন্ত্রণে শান্তিনিকেতন চা-চক্রে আহূত অতিথিগণের প্রতি

কী রসসুধা-বরষাদানে মাতিল সুধাকর
তিব্বতীর শাস্ত্র গিরিশিরে!
তিয়াষিদল সহসা এত সাহসে করি ভর
কী আশা নিয়ে বিধুরে আজি ঘিরে!

পাণিনিরসপানের বেলা দিয়েছে এরা ফাঁকি,
অমরকোষ-ভ্রমর এরা নহে।

নহে তো কেহ সারস্বত-রস-সারসপাখি,
　　　　গৌড়পাদ-পাদপে নাহি রহে ।

অনুস্বরে ধনুঃশর-টংকারের সাড়া
　　　　শঙ্কা করি দূরে দূরেই ফেরে ।
শঙ্কর-আতঙ্কে এরা পালায় বাসাছাড়া,
　　　　পালি ভাষায় শাসায় ভীরুদেরে ।

চা-রস ঘন শ্রাবণধারাপ্লাবন লোভাতুর
　　　　কলাসদনে চাতক ছিল এরা—
সহসা আজি কৌমুদীতে পেয়েছে এ কী সুর,
　　　　চকোর-বেশে বিধুরে কেন ঘেরা !

নিমন্ত্রণ

প্রজাপতি যাঁদের সাথে
　　　　পাতিয়ে আছেন সখ্য,
আর যাঁরা সব প্রজাপতির
　　　　ভবিষ্যতের লক্ষ্য,
উদরায়ণ উদার ক্ষেত্রে
　　　　মিলুন উভয় পক্ষ,
রসনাতে রসিয়ে উঠুক
　　　　নানারসের ভক্ষ্য ।
সত্যযুগে দেবদেবীদের
　　　　ডেকেছিলেন দক্ষ
অনাহূত পড়ল এসে
　　　　মেলাই যক্ষ রক্ষ,
আমরা সে ভুল করব না তো,
　　　　মোদের অন্নকক্ষ
দুই পক্ষেই অপক্ষপাত
　　　　দেবে ক্ষুধার মোক্ষ ।
আজো যাঁরা বাঁধন-ছাড়া
　　　　ফুলিয়ে বেড়ান বক্ষ
বিদায়কালে দেব তাঁদের
　　　　আশিস লক্ষ লক্ষ—
"তাদের ভাগ্যে অবিলম্বে
　　　　জুটুন কারাধ্যক্ষ ।"
এর পরে আর মিল মেলে না ।
　　　　য র ল ব হ ক্ষ ।

[? ১৯২৮]

নাতবউ

অন্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জিত
সুপ্রকাশিত সুন্দর হাতে সন্দেশে।
লুব্ধ কবির চিত্ত গভীর গুঞ্জিত,
মত্ত মধুপ মিষ্টরসের গন্ধে সে।
দাদামশায়ের মন ভুলাইল নাতিত্বে
প্রবাসবাসের অবকাশ ভরি আতিথ্যে,
সে কথাটি কবি গাঁথি রাখে এই ছন্দে সে।

সযতনে যবে সূর্যমুখীর অর্ঘ্যটি
আনে নিশান্তে, সেও নিতান্ত মন্দ না।
এও ভালো যবে ঘরের কোণের স্বর্গটি
মুখরিত করি তানে মানে করে বন্দনা।
তবু আরো বেশি ভালো বলি শুভাদৃষ্টকে
থালাখানি যবে ভরি স্বরচিত পিষ্টকে
মোদক-লোভিত মুগ্ধ নয়ন নন্দে সে।

প্রভাতবেলায় নিরালা নীরব অঙ্গনে
দেখেছি তাহারে ছায়া-আলোকের সম্পাতে।
দেখেছি মালাটি গাঁথিছে চামেলি-রঙ্গনে,
সাজি সাজাইছে গোলাপে জবায় চম্পাতে।
আরো সে করুণ তরুণ তনুর সংগীতে
দেখেছি তাহারে পরিবেশনের ভঙ্গিতে,
স্মিতমুখী মোর লুচি ও লোভের দ্বন্দ্বে সে।

বলো কোন ছবি রাখিব স্মরণে অঙ্কিত—
মালতীজড়িত বঙ্কিম বেণীভঙ্গিমা ?
দ্রুত অঙ্গুলে সুরশৃঙ্গার ঝংকৃত ?
শুভ্র শাড়ির প্রান্তধারার রঙ্গিমা ?
পরিহাসে মোর মৃদু হাসি তার লজ্জিত ?
অথবা ডালিটি দাড়িমে আঙুরে সজ্জিত ?
কিম্বা থালিটি থরে থরে ভরা সন্দেশে ?

বিজয়া দ্বাদশী। ১৬ আশ্বিন ১৩৩৮

মিষ্টান্বিতা

যে মিষ্টান্ন সাজিয়ে দিলে হাঁড়ির মধ্যে
শুধুই কেবল ছিল কি তায় শিষ্টতা।
যত্ন করে নিলেম তুলে গাড়ির মধ্যে,
দূরের থেকেই বুঝেছি তার মিষ্টতা।
সে মিষ্টতা নয় তো কেবল চিনির সৃষ্টি,
রহস্য তার প্রকাশ পায় যে অন্তরে
তাহার সঙ্গে অদৃশ্য কার মধুর দৃষ্টি
মিশিয়ে গেছে অশ্রুত কোন্ মন্তরে।
বাকি কিছুই রইল না তার ভোজন-অন্তে,
বহুত তবু রইল বাকি মনটাতে—
এমনি করেই দেব্‌তা পাঠান ভাগ্যবন্তে
অসীম প্রসাদ সসীম ঘরের কোণটাতে।
সে বর তাঁহার বহন করল যাদের হস্ত
হঠাৎ তাদের দর্শন পাই সুক্ষণেই—
রঙিন করে তারা প্রাণের উদয় অস্ত,
দুঃখ যদি দেয় তবুও দুঃখ নেই।

হেন গুমর নেইকো আমার, স্তুতির বাক্যে
ভোলাব মন ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়,
জানি নে তো কোন্ খেয়ালের ক্রূর কটাক্ষে
কখন বজ্র হানতে পার অত্যাশায়।
দ্বিতীয়বার মিষ্ট হাতের মিষ্ট অন্নে
ভাগ্য আমার হয় যদি হোক বঞ্চিত,
নিরতিশয় করব না শোক তাহার জন্যে
ধ্যানের মধ্যে রইল যে ধন সঞ্চিত।
আজ বাদে কাল আদর যত্ন না হয় কমল,
গাছ মরে যায় থাকে তাহার টবটা তো।
জোয়ারবেলায় কানায় কানায় যে জল জমল
ভাঁটার বেলায় শুকোয় না তার সবটা তো।
অনেক হারাই, তবু যা পাই জীবনযাত্রা
তাই নিয়ে তো পেরোয় হাজার বিস্মৃতি।
রইল আশা, থাকবে ভরা খুশির মাত্রা।
যখন হবে চরম শ্বাসের নিঃসৃতি।

বলবে তুমি, 'বালাই! কেন বকছ মিথ্যে,
প্রাণ গেলেও যত্নে রবে অকুণ্ঠা।'
বুঝি সেটা, সংশয় মোর নেইকো চিত্তে,
মিথ্যে খোঁটায় খোঁচাই তবু আগুনটা।

অকল্যাণের কথা কিছু লিখনু অত্র,
বানিয়ে-লেখা ওটা মিথ্যে দুষ্টুমি।
তদুত্তরে তুমিও যখন লিখবে পত্র
বানিয়ে তখন কোরো মিথ্যে রুষ্টুমি।

১ জুন ১৯৩৫

নামকরণ

দেয়ালের ঘেরে যারা
গৃহকে করেছে কারা,
ঘর হতে আঙিনা বিদেশ,
গুরুভজা বাঁধা বুলি
যাদের পরায় ঠুলি,
মেনে চলে ব্যর্থ নিদেশ,
যাহা কিছু আজগুবি
বিশ্বাস করে খুবই,
সত্য যাদের কাছে হেঁয়ালি,
সামান্য ছুতোনাতা
সকলই পাথরে গাঁথা,
তাহাদেরই বলা চলে দেয়ালি।

আলো যার মিট্‌মিটে,
স্বভাবটা খিট্‌খিটে,
বড়োকে করিতে চায় ছোটো,
সব ছবি ভুষো মেজে
কালো ক'রে নিজেকে যে
মনে করে ওস্তাদ পোটো,
বিধাতার অভিশাপে
ঘুরে মরে ঝোপে-ঝাপে
স্বভাবটা যার বদখেয়ালি,
খ্যাক্ খ্যাক্ করে মিছে,
সব-তাতে দাঁত খিচে,
তারে নাম দিব খ্যাক্‌শেয়ালি।

দিনখাটুনির শেষে
বৈকালে ঘরে এসে
আরাম-কেদারা যদি মেলে—
গল্পটি মনগড়া,
কিছু বা কবিতা পড়া,
সময়টা যায় হেসে খেলে—

দিয়ে জুঁই বেল জবা
সাজানো সুহৃদসভা,
আলাপ-প্রলাপ চলে দেদারই—
ঠিক সুরে তার বাঁধা,
মূলতানে তান সাধা,
নাম দিতে পারি তবে কেদারি ।

শান্তিনিকেতন
৭ মার্চ ১৯৩৯

ধ্যানভঙ্গ

পদ্মাসনার সাধনাতে দুয়ার থাকে বন্ধ,
ধাক্কা লাগায় সুধাকান্ত, লাগায় অনিল চন্দ ।
ভিজিটর্‌কে এগিয়ে আনে ; অটোগ্রাফের বহি
দশ-বিশটা জমা করে, লাগাতে হয় সহি ।
আনে ফটোগ্রাফের দাবি, রেজিস্টারি চিঠি,
বাজে কথা, কাজের তর্ক, নানান খিটিমিটি ।
পদ্মাসনের পদ্মে দেবী লাগান মোটরচাকা,
এমন দৌড় মারেন তখন মিথ্যে তাঁরে ডাকা ।
ভাঙা ধ্যানের টুকরো যত খাতায় থাকে পড়ি ;
অসমাপ্ত চিন্তাগুলোর শূন্যে ছড়াছড়ি ।

সত্যযুগে ইন্দ্রদেবের ছিল রসজ্ঞান,
মস্ত মস্ত ঋষিমুনির ভেঙে দিতেন ধ্যান—
ভাঙন কিন্তু আর্টিস্‌টিক ; কবিজনের চক্ষে
লাগত ভালো, শোভন হত দেব্‌তাদিগের পক্ষে ।
তপস্যাটার ফলের চেয়ে অধিক হত মিঠা
নিষ্ফলতার রসমগ্ন অমোঘ পদ্ধতিটা ।
ইন্দ্রদেবের অধুনাতন মেজাজ কেন কড়া—
তখন ছিল ফুলের বাঁধন, এখন দড়িদড়া ।
ধাক্কা মারেন সেক্রেটরি, নয় মেনকা-রম্ভা—
রিয়লিস্‌টিক আধুনিকের এইমতোই ধরম বা ।
ধ্যান খোয়াতে রাজি আছি দেবতা যদি চান তা—
সুধাকান্ত না পাঠিয়ে পাঠান সুধাকান্তা ।
কিন্তু, জানি, ঘটবে না তা, আছেন অনিল চন্দ—
ইন্দ্রদেবের বাঁকা মেজাজ, আমার ভাগ্য মন্দ ।
সইতে হবে স্থূলহস্ত-অবলেপের দুঃখ,
কলিযুগের চালচলনটা একটুও নয় সূক্ষ্ম ।

রেলেটিভিটি

তুলনায় সমালোচনাতে
জিভে আর দাঁতে
লেগে গেল বিচারের দ্বন্দ্ব,
কে ভালো কে মন্দ।
বিচারক বলে হেসে,
দাঁতজোড়া কী সর্বনেশে
যবে হয় দেঁতো।
কিন্তু, সে সুধাময় লোকবিশেষে তো
হাসিরশ্মিতে,
যাহারে আদরে ডাকি 'অয়ি সুস্মিতে'
পাণিনির শুদ্ধ নিয়মে।

জিহ্বায় রস খুব জমে,
অথচ তাহার সংস্রবে
দেহখানা যবে
আগাগোড়া উঠে জ্বলি
রস নয়, বিষ তারে বলি।

স্বভাবে কঠিন কেহ, মেজাজে নরম—
বাহিরে শীতল কেহ, ভিতরে গরম।
প্রকাশ্যে এক রূপ যার
ঘোমটায় আর।
তুলনায় দাঁত আর জিভ
সবই রেলেটিভ।
হয়তো দেখিবে, সংসারে
দাঁতালো যা মিঠে লাগে তারে,
আর যেটা ললিত রসালো
লাগে নাকো ভালো।
সৃষ্টিতে পাগলামি এই—
একান্ত কিছু হেথা নেই।

ভালো বা খারাপ লাগা
পদে পদে উলোটা-পালোটা—
কভু সাদা কালো হয়,
কখনো বা সাদাই কালোটা,
মন দিয়ে ভাবো যদ্যপি
জানিবে এ খাঁটি ফিলজফি।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
৩০।১২।৩৮ সকাল

নারীর কর্তব্য

পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে,
মনু-পরাশরদের সাধ্য নাই টানে তারে পিছে।
বুদ্ধি মেনে চলা তার রোগ ;
খাওয়া ছোঁওয়া সব-তাতে তর্ক করে, বাধে গোলযোগ।

মেয়েরা বাঁচাবে দেশ, দেশ যবে ছুটে যায় আগে।
হাই তুলে দুর্গা ব'লে যেন তারা শেষরাতে জাগে ;
খিড়কির ডোবাটাতে সোজা
ব'হে যেন নিয়ে আসে যত এঁটো বাসনের বোঝা ;
মাজা-ঘষা শেষ করে আঙিনায় ছোটে—
ধড়্‌ফড়ে জ্যান্ত মাছ কোটে
দুই হাতে ল্যাজামুড়ো জাপটিয়ে ধ'রে
সুনিপুণ কবজির জোরে,
ছাই পেতে বঁটির উপরে চেপে ব'সে,
কোমরে আঁচল বেঁধে ক'ষে।
কুটিকুটি বানায় ইঁচোড় ;
চাকা চাকা করে থোড়,
আঙুলে জড়ায় তার সুতো ;
মোচাগুলো ঘস্ ঘস্ কেটে চলে দ্রুত ;
চালতারে
বিশ্লেষণ করে খরধারে।
বেগুন পটোল আলু খণ্ড খণ্ড হয় সে অগুন্তি।
তার পরে হাতা বেড়ি খুন্তি ;
তিন-চার দফা রান্না সে
নানা ফরমাশে—
আপিসের, ইস্কুলের, পেট-রোগা রুগির কোনোটা,
সিদ্ধ চাল, সরু চাল, ঢেঁকিছাঁটা, কোনোটা বা মোটা।
যবে পাবে ছুটি
বেলা হবে আড়াইটা। বিড়ালকে দিয়ে কাঁটাকুটি
পান-দোক্তা মুখে পুরে দিতে যাবে ঘুম ;
ছেলেটা চেঁচায় যদি পিঠে কিল দেবে ধুমাধুম,
বলবে "বজ্জাত ভারি"।
তার পরে রাত্রে হবে রুটি আর বাসি তরকারি।

জনার্দন ঠাকুরের
পানাপুকুরের
পাড়ের কাছা ঢাকা কলমির শাকে।
গা ধুয়ে তাহারই এক ফাঁকে,
ঘড়া কাঁখে, গায়েতে জড়ায়ে ভিজে শাড়ি
ঘন ঘন হাত নাড়ি

খস্‌খস্‌-শব্দ-করা পাতায় বিছানো বাঁশবনে
রাম নাম জপি মনে মনে
ঘরে ফিরে যায় দ্রুতপায়ে
গোধূলির ছম্‌ছমে অন্ধকারছায়ে।
সন্ধেবেলা বিধবা ননদি বসে ছাতে,
জপমালা ঘোরে হাতে।
বউ তার চুলের জটায়
চিরুনি-আঁচড় দিয়ে কানে কানে কলঙ্ক রটায়
পাড়াপ্রতিবেশিনীর— কোনো সূত্রে শুনতে সে পেয়ে
হন্তদন্ত আসে ধেয়ে
ও-পাড়ার বোসগিন্নি ; চোখা চোখা বচন বানায়ে
স্বামীপুত্র-খাদনের আশা তারে যায় সে জানায়ে।

কাপড়ে-জড়ানো পুঁথি কাঁখে
তিলক কাটিয়া নাকে
উপস্থিত আচার্যি মশায়—
গিন্নির মধ্যমপুত্র শনির দশায়—
আটক পড়েছে তার বিয়ে ;
তাহারই ব্যবস্থা নিয়ে
স্বস্ত্যয়নের ফর্দ মস্ত,
কর্তারে লুকিয়ে তারই খরচের হল বন্দোবস্ত।

এমনি কাটিয়ে যায় সনাতনী দিনগুলি যত
চাটুজ্যেমশা'র অনুমত—
কলহে ও নামজপে, ভবিষ্যৎ জামাতার খোঁজে,
নেশাখের ব্রাহ্মণের ভোজে।

মেয়েরাও বই যদি নিতান্তই পড়ে
মন যেন একটু না নড়ে।
নূতন বই কি চাই। নূতন পঞ্জিকাখানা কিনে
মাথায় ঠেকায়ে তারে প্রণাম করুক শুভদিনে।
আর আছে পাঁচালির ছড়া,
বুদ্ধিতে জড়াবে জোরে ন্যাশনাল কাল্‌চারের দড়া।
দুর্গতি দিয়েছে দেখা ; বঙ্গনারী ধরেছে শেমিজ,
বি· এ· এম· এ· পাস ক'রে ছড়াইছে বীজ
যুক্তি-মানা ঘোর ম্লেচ্ছতার।
ধর্মকর্ম হল ছারখার।
শীতলামায়ীরে করে হেলা ;
বসন্তের টিকা নেয় ; 'গ্রহণের বেলা
গঙ্গাস্নানে পাপ নাশে'
শুনিয়া মূর্খের মতো হাসে।

তবু আজও রক্ষা আছে, পবিত্র এ দেশে
অসংখ্য জন্মেছে মেয়ে পুরুষের বেশে।

মন্দির রাঙায় তারা জীবরক্তপাতে,
সে-রক্তের ফোঁটা দেয় সন্তানের মাথে।
কিন্তু, যবে ছাড়ে নাড়ী
ভিড় ক'রে আসে দ্বারে ডাক্তারের গাড়ি।
অঞ্জলি ভরিয়া পূজা নেন সরস্বতী,
পরীক্ষা দেবার বেলা নোটবুক ছাড়া নেই গতি।
পুরুষের বিদ্যে নিয়ে কলেজে চলেছে যত নারী
এই ফল তারই।
মেয়েদের বুদ্ধি নিয়ে পুরুষ যখন ঠাণ্ডা হবে,
দেশখানা রক্ষা পাবে তবে।

বুঝি নে একটা কথা, ভয়ের তাড়ায়
দিন দেখে তবে যেথা ঘরের বাহিরে পা বাড়ায়
সেই দেশে দেবতার কুপ্রথা অদ্ভুত,
সবচেয়ে অনাচারী সেথা যমদূত।
ভালো লগ্নে বাধা নেই, পাড়ায় পাড়ায় দেয় ডঙ্কা।
সব দেশ হতে সেথা বেড়ে চলে মরণের সংখ্যা।

বেস্পতিবারের বারবেলা
এ কাব্য হয়েছে লেখা, সামলাতে পারব কি ঠেলা।

মধুসন্ধায়ী

পাড়ায় কোথাও যদি কোনো মৌচাকে
একটুকু মধু বাকি থাকে,
যদি তা পাঠাতে পার ডাকে,
বিলাতি সুগার হতে পাব নিস্তার;
প্রাতরাশে মধুরিমা হবে বিস্তার।
মধুর অভাব যবে অন্তরে বাজে
'গুড়ং দদ্যাৎ' বাণী বলে কবিরাজে।
দায়ে পড়ে তাই
লুচি-পাউরুটিগুলো গুড় দিয়ে খাই;
বিমর্ষমুখে বলি 'গুড়ং দদ্যাৎ',
সে যেন গদ্যের দেশে আসি পদ্যাৎ।
খালি বোতলের পানে চেয়ে চেয়ে চিত্ত
নিশ্বাস ফেলে বলে, সকলই অনিত্য।
সম্ভব হয় যদি এ বোতলটারে
পূর্ণতা এনে দিতে পারে
দূর হতে তোমার আতিথ্য।
গৌড়ী গদ্য হতে মধুময় পদ্য
দর্শন দিতে পারে সদ্য।

১৩ ফাল্গুন ১৩৪৬

২

তল্লাস করেছিনু, হেথাকার বৃক্ষের
চারি দিকে লক্ষণ মধু-দুর্ভিক্ষের ।
মৌমাছি বলবান পাহাড়ের ঠাণ্ডার,
সেখানেও সম্প্রতি ক্ষীণ মধুভাণ্ডার—
হেন দুঃসংবাদ পাওয়া গেছে চিঠিতে ।
এ বছর বৃথা যাবে মধুলোভ মিটিতে ।
তবু কাল মধু-লাগি করেছিনু দরবার,
আজ ভাবি অর্থ কি আছে দাবি করবার ।
মৌচাক-রচনায় সুনিপুণ যাহারা
তুমি শুধু ভেদ কর তাহাদের পাহারা ।
মৌমাছি কৃপণতা করে যদি গোড়াতেই,
জাস্তি না মেলে তবু খুশি রব থোড়াতেই ।
তাও কভু সম্ভব না হয় যদিস্যাৎ
তা হলে তো অবশেষে শুধু গুড় দদ্যাৎ ।
অনুরোধ না মিটুক মনে নাহি ক্ষোভ নিয়ো,
দুর্লভ হলে মধু গুড় হয় লোভনীয় ।
মধুতে যা ভিটামিন কম বটে গুড়ে তা,
পূরণ করিয়া লব টমেটোয় জুড়ে তা ।
এইভাবে করা ভালো সন্তোষ-আশ্রয়—
কোনো অভাবেই কভু তার নাহি নাশ রয় ।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

মধুমৎ পার্থিবং রজঃ

শ্যামল আরণ্য মধু বহি এল ডাক-হরকরা—
আজি হতে তিরোহিতা পাণ্ডুবর্ণী বৈলাতী শর্করা
পূর্বাহ্ণে পরাহ্ণে মোর ভোজনের আয়োজন থেকে
এ মধু করিব ভোগ রোটিকার স্তরে স্তরে মেখে ।
যে দাক্ষিণ্য-উৎস হতে উৎসারিত এই মধুরতা
রসনার রসযোগে অন্তরে পশিবে তার কথা ।
ভেবেছিনু, অকৃতার্থ হয় যদি তোমার প্রয়াস
সস্নেহ আঘাত দেবে তোমারে আমার পরিহাস ;
তখন তো জানি নাই, গিরীন্দ্রের বন্য মধুকরী
তোমার সহায় হয়ে অর্ঘ্যপাত্র দিবে তব ভরি ।
দেখিনু, বেদের মন্ত্র সফল হয়েছে তব প্রাণে ;
তোমারে বরিল ধরা মধুময় আশীর্বাদ-দানে ।

মার্চ ১৯৮

৪

দূর হতে কয় কবি,
'জয় জয় মাংপবী,
কমলাকানন তব না হউক শূন্য।
গিরিতটে সমতটে
আজি তব যশ রটে,
আশারে ছাড়ায়ে বাড়ে তব দানপুণ্য।
তোমাদের বনময়
অফুরান যেন রয়
মৌচাক-রচনায় চিরনৈপুণ্য।
কবি প্রাতরাশে তার
না করুক মুখভার,
নীরস রুটির গ্রাসে না হোক সে ক্ষুণ্ণ।'
আরবার কয় কবি,
'জয় জয় মাংপবী,
টেবিলে এসেছে নেমে তোমার কারুণ্য।
রুটি বলে জয়-জয়,
লুচিও যে তাই কয়,
মধু যে ঘোষণা করে তোমারই তারুণ্য।'

৭ মার্চ ১৯৪০

মাছিতত্ত্ব

মাছিবংশেতে এল অদ্ভুত জ্ঞানী সে
আজন্ম ধ্যানী সে।
সাধনের মন্ত্র তাহার
ভন্‌ভন্‌-ভন্‌ভন্‌কার।
সংসারে দুই পাখা নিয়ে দুই পক্ষ—
দক্ষিণ-বাম আর ভক্ষ্য-অভক্ষ্য—
কাঁপাতে কাঁপাতে পাখা সূক্ষ্ম অদৃশ্য
দ্বৈতবিহীন হয় বিশ্ব।
সুগন্ধ পচা-গন্ধের
ভালো মন্দের
ঘুচে যায় ভেদবোধ-বন্ধন;
এক হয় পঙ্ক ও চন্দন।
অঘোরপন্থ সে যে শবাসন-সাধনায়
ইঁদুর কুকুর হোক কিছুতেই বাধা নাই—
বসে রয় স্তব্ধ,
মৌনী সে একমনা নাহি করে শব্দ।

ইড়া পিঙ্গলা বেয়ে অদৃশ্য দীপ্তি
ব্রহ্মরন্ধ্রে বহে তৃপ্তি।
লোপ পেয়ে যায় তার আছিত্ব,
ভুলে যায় মাছিত্ব।

মন তার বিজ্ঞাননিষ্ঠ ;
মানুষের বক্ষ বা পৃষ্ঠ
কিংবা তাহার নাসিকান্ত
তাই নিয়ে গবেষণা চলে অক্লান্ত—
বার বার তাড়া খায়, গাল খায়, তবুও
হার না মানিতে চায় কভু ও।
পৃথক করে না কভু ইষ্ট অনিষ্ট,
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ;
সমবুদ্ধিতে দেখে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট।
সংকোচহীন তার বিজ্ঞানী ধাত ;
পক্ষে বহন করে অপক্ষপাত।
এদের ভাষায় নেই 'ছি ছি',
শৌখিন রুচি নিয়ে খুঁতখুঁত নেই মিছিমিছি।

অকারণ সন্ধানে মন তার গিয়াছে ;
কেবলই ঘুরিয়া দেখে কোথায় যে কী আছে।
বিশ্রামী বলদের পিঠে করে মনোযোগ
রসের রহস্যের যদি পায় কোনো যোগ,
ল্যাজের ঝাপট লাগে পলকেই পলকেই,
বাধাহীন সাধনার ফল পায় বলো কে-ই !

চারি দিকে মানবের বিষম অহংকার,
তারই মাঝে থেকে মনে লেশ নেই শঙ্কার।
আকাশবিহারী তার গতিনৈপুণ্যেই
সকল চপেটাঘাত উড়ে যায় শূন্যেই।
এই তার বিজ্ঞানী কৌশল,
স্পর্শ করে না তারে শত্রুর মৌশল।
মানুষের মারণের লক্ষ্য
ক্ষিপ্র এড়ায়ে যায় নির্ভয়পক্ষ।
নাই লাজ, নাই ঘৃণা, নাই ভয়—
কর্দমে নর্দমা-বিহারীর জয়।
ভন্-ভন্-ভন্‌কার
আকাশেতে ওঠে তার ধ্বনি জয়ডঙ্কার।

মানবশিশুরে বলি, দেখো দৃষ্টান্ত—
বার বার তাড়া খেয়ো, নাহি হোয়ো ক্ষান্ত।

অদৃষ্ট মার দেয় অলক্ষ্যে পশ্চাৎ
কখন অকস্মাৎ—
তবু মনে রেখো নির্বন্ধ,
সুযোগের পেলে নামগন্ধ
চ'ড়ে বোসো অপরের নিরুপায় পৃষ্ঠ,
ক'রো তারে বিষম অতিষ্ঠ।
সার্থক হতে চাও জীবনে,
কী শহরে, কী বনে,
পাঠ লহ প্রয়োজনসিদ্ধের
বিরক্ত করবার অদম্য বিদ্যের-
নিত্য কানের কাছে ভন্‌ভন্‌ ভন্‌ভন্‌
লুব্ধের অপ্রতিহত অবলম্বন।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

কালান্তর

তোমার ঘরের সিঁড়ি বেয়ে
যতই আমি নাবছি
আমায় মনে আছে কি না
ভয়ে ভয়ে ভাবছি।
কথা পাড়তে গিয়ে দেখি,
হাই তুললে দুটো;
বললে উসুখুসু করে,
"কোথায় গেল নুটো।'
ডেকে তারে বলে দিলে,
"ড্রাইভারকে বলিস,
আজকে সন্ধ্যা নটার সময়
যাব মেট্রোপলিস।"
কুকুরছানার ল্যাজটা ধরে
করলে নাড়াচাড়া;
বললে আমায়, "ক্ষমা করো,
যাবার আছে তাড়া।"

তখন পষ্ট বোঝা গেল,
নেই মনে আর নেই।
আরেকটা দিন এসেছিল
একটা শুভক্ষণেই—
মুখের পানে চাইতে তখন,
চোখে রইত মিষ্টি;

কুকুরছানার ল্যাজের দিকে
পড়ত নাকো দৃষ্টি ।
সেই সেদিনের সহজ রঙটা
কোথায় গেল ভাসি ;
লাগল নতুন দিনের ঠোঁটে
রুজ-মাখানো হাসি ।
বুটসুদ্ধ পা-দুখানা
তুলে দিলে সোফায় ;
ঘাড় বেঁকিয়ে ঠেসেঠুসে
ঘা লাগালে খোঁপায় ।
আজকে তুমি শুকনো ডাঙায়
হালফ্যাশানের কূলে,
ঘাটে নেমে চমকে উঠি
এই কথাটাই ভুলে ।

এবার বিদায় নেওয়াই ভালো,
সময় হল যাবার—
ভুলেছ যে ভুলব যখন
আসব ফিরে আবার ।

শান্তিনিকেতন
১৩ শ্রাবণ ১৩৪৭

তুমি

ওই ছাপাখানাটার ভূত,
আমার ভাগ্যবশে তুমি তারি দূত ।
দশটা বাজল তবু আস নাই ;
দেহটা জড়িয়ে আছে আরামের বাসনাই
মাঝে থেকে আমি খেটে মরি যে—
পণ্য জুটেছে, খেয়াতরী যে
ঘাটে নাই । কাব্যের দধিটা
বেশ করে জমে গেছে, নদীটা
এইবার পার ক'রে প্রেসে লও,
খাতার পাতায় তারে ঠেসে লও ।
কথাটা তো একটুও সোজা নয়,
স্টেশন-কুলির এ তো বোঝা নয় ।
বচনের ভার ঘাড়ে ধরেছি,
চিরদিন তাই নিয়ে মরেছি ;
বয়স হয়েছে আশি, তবুও
সে ভার কি কমবে না কভুও ।
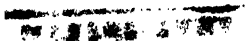
আমার হতেছে মনে বিশ্বাস—
সকালে ভুলাল তব নিশ্বাস
রান্নাঘরের ভাজাভুজিতে,
সেখানে খোরাক ছিলে খুঁজিতে,
উতলা আছিল তব মনটা,
শুনতে পাও নি তাই ঘণ্টা।

শুঁটকিমাছের যারা রাঁধুনিক
হয়তো সে দলে তুমি আধুনিক।
তব নাসিকার গুণ কী যে তা,
বাসি দুর্গন্ধের বিজেতা।
সেটা প্রোলিটেরিটের লক্ষণ,
বুর্জোয়া-গর্বের মোক্ষণ।
রৌদ্র যেতেছে চড়ে আকাশে,
কাঁচা ঘুম ভেঙে মুখ ফ্যাকাশে।
ঘন ঘন হাই তুলে গা-মোড়া,
ঘস্‌ঘস্‌ চুলকোনো চামোড়া।
আ-কামানো মুখ ভরা খোঁচাতে—
বাসি ধুতি, পিঠ ঢাকা কোঁচাতে
চোখ দুটো রাঙা যেন টোমাটো,
আলুথালু চুলে নাই পোমাটো।
বাসি মুখে চা খাচ্ছ বাটিতে,
গড়িয়ে পড়ছে ঘাম মাটিতে।
কাঁকড়ার চচ্চড়ি রাত্রে,
এঁটো তারি পড়ে আছে পাত্রে।
'সিনেমার তালিকার কাগজে
কে সরাল ছবি' ব'লে রাগো যে।

যত দেরি হতেছিল ততই যে
এই ছবি মনে এল স্বতই যে।
ভোরে ওঠা ভদ্র সে নীতিটা,
অতিশয় খুঁতখুঁতে রীতিটা।
সাফ্‌সোফ বুর্জোয়া অঙ্গেই
ধব্‌ধবে চাদরের সঙ্গেই
মিল তার জানি অতিমাত্র—
তুমি তো নও সে সৎ-পাত্র।
আজকাল বিড়িটানা শশুরে
যে চাল ধরেছ আটপহুরে,
মাসিকেতে একদিন কে জানে
অধুনাতনের মন-ভেজানে
মানে-হীন কোনো এক কাব্য
নাম করি দিবে অশ্রাব্য।

শান্তিনিকেতন
৪ অগস্ট ১৯৪০

মিলের কাব্য

নারীকে আর পুরুষকে যেই মিলিয়ে দিলেন বিধি
পদ্য কাব্যে মানবজীবন পেল মিলের নিধি।
কেবল যদি পুরুষ নিয়ে থাকত এ সংসার,
গদ্য কাব্যে এই জীবনটা হ'ত একাক্কার।
প্রোটন এবং ইলেক্‌ট্রনের যুগল মিলনেই
জগৎটা যে পদ্য তাহার প্রমাণ হল সেই।
জলে এবং স্থলে মিলে ছন্দে লাগায় তাল,
আকাশেতে মহাগদ্য বিছান মহাকাল।
কারণ তিনি তপস্বী যে বিশ্ব তাঁহার জ্ঞানে,
প্রলয় তাঁহার ধ্যানে।

সৃষ্টিকার্যে আলো এবং আঁধার
অনন্ত কাল ধুয়ো ধরায় মিলের ছন্দ বাঁধার।
জাগরণে আছেন তিনি শুদ্ধ জ্যোতির দেশে,
আলো-আঁধার-'পরে তাঁহার স্বপ্ন বেড়ায় ভেসে।
যারে বলি বাস্তব সে ছায়ার লিখন লিখা,
অন্তবিহীন কল্পনাতে মহান মরীচিকা।
বাস্তব যে অচল অটল বিশ্বকাব্যে তাই,
তড়িৎকণার নৃত্য আছে বাস্তব তো নাই।
গোলাপগুলোর পাপড়ি-চেয়ে শোভাটাই যে সত্য,
কিন্তু শোভা কী পদার্থ কথায় হয় না কথ্য।
বিশুদ্ধ ইঙ্গিত সে মাত্র, তাহার অধিক কী সে,
কিসের বা ইঙ্গিত সে জিনিস, ভেবে কে পায় দিশে।
নিউস্‌পেপার আছে পাবে প্রমাণযোগ্য বাক্য,
মকদ্দমার দলিল আছে ঠিক কথাটার সাক্ষ্য।
কাব্য বলে বেঠিক কথা, এক হয়ে যায় আর—
যেমন বেঠিক কথা বলে নিখিল সংসার।
আজকে যাকে বাষ্প দেখি কালকে দেখি তারা,
কেমন করে বস্তু বলি প্রকাণ্ড ইশারা।
ফোটা-ঝরার মধ্যখানে এই জগতের বাণী
কী যে জানায় কালে কালে স্পষ্ট কি তা জানি।
বিশ্ব থেকে ধার নিয়েছি তাই আমরা কবি—
সত্য রূপে ফুটিয়ে তুলি অবাস্তবের ছবি।
ছন্দ ভাষা বাস্তব নয়, মিল যে অবাস্তব—
নাই তাহাতে হাট-বাজারের গদ্য কলরব।
হাঁ-য়ে না-য়ে যুগল নৃত্য কবির রঙ্গভূমে।
এতক্ষণ তো জাগায় ছিলুম, এখন চলি ঘুমে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৯ জানুয়ারি ১৯৪১। সন্ধ্যা

লিখি কিছু সাধ্য কী

লিখি কিছু সাধ্য কী !
যে দশা এ অভাগার লিখিতে সে বাধ্য কি ।
মশা-বুড়ি মরেছিল চাপড়ের যুদ্ধে সে—
পরলোকগত তার আত্মার উদ্দেশে
আমারি লেখার ঘরে আজি তার শ্রাদ্ধ কি !
যেখানে যে কেহ ছিল আত্মীয় পরিজন
অভিজাতবংশীয় কেহ, কেহ হরিজন—
আমারি চরণজাত তাহাদের খাদ্য কি !
বাঁশি নেই, কাঁসি নেই, নাহি দেয় হাঁক সে,
পিঠেতে কাঁপাতে থাকে এক-জোড়া পাখ সে—
দেখিতে যেমনি হোক তুচ্ছ সে বাদ্য কি ।
আশ্রয় নিতে চাই মেলে যদি shelter,
এক ফোঁটা বাকি নেই নেবুঘাস-তেলটার—
মশারি দিনের বেলা কভু আচ্ছাদ্য কি !
গাল তারে মিছে দিই অতি অশ্রাব্য,
হাতে পিঠ চাপড়াব সেটা যে অভাব্য—
এ কাজে লাগাব শেষে চটি-জোড়া পাদ্য কি ।
পুজোর বাজারে আজি যদি লেখা না জোটাই,
দুটো লাইনের মতো কলমটা না ছোটাই—
সম্পাদকের সাথে রবে সৌহার্দ্য কি ।

[মংপু
আশ্বিন-কার্তিক ১৩৪৬]

মশকমঙ্গলগীতিকা

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা—
জানিতাম দীনতার এই শেষ দশা,
আমি স্বপ্নে দেখিলাম হয়ে গেছি মশা !
কী হল যে দশা—
মধ্যরাত্রে স্বপ্নে আমি
হয়ে গেছি মশা ।
দীন হতে দীন আমি
ক্ষীণ হতে ক্ষীণ—
একমাত্র নামজপ করেছি ভরসা ।

হিংস্র নীতি নাহি আর,
অতি শান্ত নির্বিকার
ভক্তের নাসাগ্র-'পরে স্তব্ধ হয়ে বসা—
কী হল যে দশা !

মধুর মাশবী বেণু নীরব সহসা ।
পাখা করি নাড়াচাড়া,
ভোঁ ভোঁ শব্দে নাই সাড়া—
শুধু 'রাম রাম' ধ্বনি ডানা হতে খসা,
হেন হীন দশা ।

জোড়াসাঁকো
৩০।১০।৪০

আকাশপ্রদীপ

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
কল্যাণীয়েষু

বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনি নি ! তাই, আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশপ্রদীপ

গোধূলিতে নামল আঁধার,
ফুরিয়ে গেল বেলা,
ঘরের মাঝে সাঙ্গ হল
চেনা মুখের মেলা।
দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা
নয়ন ছলোছলো,
এবার তবে ঘরের প্রদীপ
বাইরে নিয়ে চলো।
মিলনরাতে সাক্ষী ছিল যারা
আজো জ্বলে আকাশে সেই তারা।
পাণ্ডু-আঁধার বিদায়রাতের শেষে
যে তাকাত শিশিরসজল শূন্যতা-উদ্দেশে
সেই তারকাই তেমনি চেয়েই আছে
অস্তলোকের প্রান্তদ্বারের কাছে।
অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ-পানে-
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।

[শান্তিনিকেতন]
২৪।৯।৩৮

আকাশপ্রদীপ

ভূমিকা

স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা
বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা,
কী অর্থ ইহার মনে ভাবি।
এই দাবি
জীবনের এ ছেলেমানুষি,
মরণেরে বঞ্চিবার ভান ক'রে খুশি,
বাঁচা-মরা খেলাটাতে জিতিবার শখ,
তাই মন্ত্র প'ড়ে আনে কল্পনার বিচিত্র কুহক।
কালস্রোতে বস্তুমূর্তি ভেঙে ভেঙে পড়ে,
আপন দ্বিতীয় রূপ প্রাণ তাই ছায়া দিয়ে গড়ে।
"রহিল" বলিয়া যায় অদৃশ্যের পানে ;
মৃত্যু যদি করে তার প্রতিবাদ, নাহি আসে কানে।
আমি বদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের জালে,
আমার আপন-রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে,
এ কথা বিলয়দিনে নিজে নাই জানি
আর কেহ যদি জানে তাহারেই বাঁচা ব'লে মানি।

শান্তিনিকেতন]
১৬।৩।৩৯

যাত্রাপথ

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে
ঝুঁকে পড়ে যেতুম পড়ে তাহার পাতে পাতে।
কিছু বুঝি, নাই বা কিছু বুঝি,
কিছু না হোক পুঁজি,
হিসাব কিছু না থাক্ নিয়ে লাভ অথবা ক্ষতি,
অল্প তাহার অর্থ ছিল, বাকি তাহার গতি।
মনের উপর ঝরনা যেন চলেছে পথ খুঁড়ি,
কতক জলের ধারা আবার কতক পাথর নুড়ি।
সব জড়িয়ে ক্রমে ক্রমে আপন চলার বেগে
পূর্ণ হয়ে নদী ওঠে জেগে।

শক্ত সহজ এ সংসারটা যাহার লেখা বই
হালকা ক'রে বুঝিয়ে সে দেয় কই।
বুঝছি যত খুঁজছি তত, বুঝছি নে আর ততই—
কিছু বা হাঁ, কিছু বা না, চলছে জীবন স্বতই।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ সে বটতলাতে ছাপা,
দিদিমায়ের বালিশ-তলায় চাপা।
আলগা মলিন পাতাগুলি, দাগি তাহার মলাট
দিদিমায়ের মতোই যেন বলি-পড়া ললাট।
মায়ের ঘরের চৌকাঠেতে বারান্দার এক কোণে
দিন-ফুরানো ক্ষীণ আলোতে পড়েছি একমনে।
অনেক কথা হয় নি তখন বোঝা,
যেটুকু তার বুঝেছিলাম মোট কথাটা সোজা—
ভালোমন্দে লড়াই অনিঃশেষ,
প্রকাণ্ড তার ভালোবাসা, প্রচণ্ড তার দ্বেষ।
বিপরীতের মল্লযুদ্ধ ইতিহাসের রূপ
সামনে এল, রইনু বসে চুপ।

শুরু হতে এইটে গেল বোঝা,
হয়তো বা এক বাঁধা রাস্তা কোথাও আছে সোজা,
যখন-তখন হঠাৎ সে যায় ঠেকে,
আন্দাজে যায় ঠিকানাটা বিষম এঁকেবেঁকে।
সব-জানা দেশ এ নয় কভু, তাই তো তেপান্তরে
রাজপুত্তুর ছোটায় ঘোড়া না-জানা কার তরে।
সদাগরের পুত্র সেও যায় অজানার পার
খোঁজ নিতে কোন্ সাত-রাজা-ধন গোপন মানিকটার।
কোটালপুত্র খোঁজে এমন গুহায়-থাকা চোর
যাকে ধরলে সকল চুরির কাটবে বাঁধন-ডোর।

[আলমোড়া]
৯।৬।৩৭

স্কুল-পালানে

মাস্টারি-শাসনদুর্গে সিঁধকাটা ছেলে
ক্লাসের কর্তব্য ফেলে
জানি না কী টানে
ছুটিতাম অন্দরের উপেক্ষিত নির্জন বাগানে।
পুরোনো আমড়াগাছ হেলে আছে
পাঁচিলের কাছে,

দীর্ঘ আয়ু বহন করিছে তার
পুঞ্জিত নিঃশব্দ স্মৃতি বসন্তবর্ষার।
লোভ করি নাই তার ফলে,
শুধু তার তলে
সে সঙ্গরহস্য আমি করিতাম লাভ
যার আবির্ভাব
অলক্ষ্যে ব্যাপিয়া আছে সর্ব জলে স্থলে।
পিঠ রাখি কুঞ্চিত বল্কলে
যে পরশ লভিতাম
জানি না তাহার কোনো নাম ;
হয়তো সে আদিম প্রাণের
আতিথ্যদানের
নিঃশব্দ আহ্বান,
যে প্রথম প্রাণ
একই বেগ জাগাইছে গোপন সঞ্চারে
রসরক্তধারে
মানবশিরায় আর তরুর তন্তুতে,
একই স্পন্দনের ছন্দ উভয়ের অণুতে অণুতে
সেই মৌনী বনস্পতি
সুবৃহৎ আলস্যের ছদ্মবেশে অলক্ষিতগতি
সূক্ষ্ম সম্বন্ধের জাল প্রসারিছে নিত্যই আকাশে,
মাটিতে বাতাসে,
লক্ষ লক্ষ পল্লবের পাত্র লয়ে
তেজের ভোজের পানালয়ে।
বিনা কাজে আমিও তেমনি বসে থাকি
ছায়ায় একাকী,
আলস্যের উৎস হতে
চৈতন্যের বিবিধ দিগ্‌বাহী স্রোতে
আমার সম্বন্ধ চরাচরে
বিস্তারিছে অগোচরে
কল্পনার সূত্রে বোনা জালে
দূর দেশে দূর কালে।
প্রাণে মিলাইতে প্রাণ
সে বয়সে নাহি ছিল ব্যবধান ;
নিরুদ্ধ করে নি পথ ভাবনার স্তূপ ;
গাছের স্বরূপ
সহজে অন্তর মোর করিত পরশ।
অনাদৃত সে বাগান চায় নাই যশ
উদ্যানের পদবীতে।
তারে চিনাইতে
মালীর নিপুণতার প্রয়োজন কিছু ছিল নাকো।

যেন কী আদিম সাঁকো
ছিল মোর মনে
বিশ্বের অদৃশ্য পথে যাওয়ার আসার প্রয়োজনে ।

কুলগাছ দক্ষিণে কুয়োর ধারে,
পুবদিকে নারিকেল সারে সারে,
বাকি সব জঙ্গল আগাছা ।
একটা লাউয়ের মাচা
কবে যত্ন ছিল কারো, ভাঙা চিহ্ন রেখে গেছে পাছে ।
বিশীর্ণ গোলকচাঁপা-গাছে
পাতাশূন্য ডাল
অভুগ্নের ক্লিষ্ট ইশারার মতো । বাঁধানো চাতাল ;
ফাটাফুটো মেঝে তার, তারি থেকে
গরিব লতাটি যেত চোখে-না-পড়ার ফুলে ঢেকে ।
পাঁচিল ছ্যাৎলা-পড়া
ছেলেমি খেয়ালে যেন রূপকথা গড়া
কালের লেখনি-টানা নানামতো ছবির ইঙ্গিতে,
সবুজে পাটলে আঁকা কালো সাদা রেখার ভঙ্গিতে ।
সদ্য ঘুম থেকে জাগা
প্রতি প্রাতে নূতন করিয়া ভালো-লাগা
ফুরাত না কিছুতেই ।
কিসে যে ভরিত মন সে তো জানা নেই ।
কোকিল দোয়েল টিয়ে এ বাগানে ছিল না কিছুই,
কেবল চড়ুই,
আর ছিল কাক ।
তার ডাক
সময় চলার বোধ
মনে এনে দিত । দশটা বেলার রোদ
সে ডাকের সঙ্গে মিশে নারিকেল-ডালে
দোলা খেত উদাস হাওয়ার তালে তালে ।
কালো অঙ্গে চটুলতা, গ্রীবাভঙ্গি, চাতুরী সতর্ক আঁখিকোণে,
পরস্পর ডাকাডাকি ক্ষণে ক্ষণে—
এ রিক্ত বাগানটিরে দিয়েছিল বিশেষ কী দাম ।
দেখিতাম, আবছায়া ভাবনায় ভালোবাসিতাম ।

শান্তিনিকেতন]
১৪।১০।৩৮

ধ্বনি

জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে বাঁধা মন নিয়া,
চারি দিক হতে শব্দ উঠিত ধ্বনিয়া
নানা কম্পে নানা সুরে
নাড়ীর জটিল জালে ঘুরে ঘুরে।
বালকের মনের অতলে দিত আনি
পাণ্ডুনীল আকাশের বাণী
চিলের সুতীক্ষ্ণ সুরে
নির্জন দুপুরে,
রৌদ্রের প্লাবনে যবে চারি ধার
সময়েরে করে দিত একাকার
নিষ্কর্ম তন্দ্রার তলে।
ওপাড়ায় কুকুরের সুদূর কলহকোলাহলে
মনেরে জাগাত মোর অনির্দিষ্ট ভাবনার পারে
অস্পষ্ট সংসারে।
ফেরিওলাদের ডাক সূক্ষ্ম হয়ে কোথা যেত চলি,
যে-সকল অলিগলি
জানি নি কখনো
তারা যেন কোনো
বোগদাদের বসোরার
পরদেশী পসরার
স্বপ্ন এনে দিত বহি।
রহি রহি
রাস্তা হতে শোনা যেত সহিসের ডাক ঊর্ধ্বস্বরে,
অন্তরে অন্তরে
দিত সে ঘোষণা কোন্ অস্পষ্ট বার্তার,
অসম্পন্ন উধাও যাত্রার।
একঝাঁক পাতিহাঁস
টলোমলো গতি নিয়ে উচ্চকলভাষ
পুকুরে পড়িত ভেসে।
বটগাছ হতে বাঁকা রৌদ্ররশ্মি এসে
তাদের সাঁতার-কাটা জলে
সবুজ ছায়ার তলে
চিকন সাপের মতো পাশে পাশে মিলি
খেলাত আলোর কিলিবিলি।
বেলা হলে
হলদে গামছা কাঁধে হাত দোলাইয়া যেত চলে
কোন্‌খানে কে যে।
ইস্কুলে উঠিত ঘণ্টা বেজে।

সে ঘণ্টার ধ্বনি
নিরর্থ আহ্বানঘাতে কাঁপাইত আমার ধমনী।
রৌদ্রক্লান্ত ছুটির প্রহরে
আলস্যে-শিথিল শান্তি ঘরে ঘরে ;
দক্ষিণে গঙ্গার ঘাট থেকে
গম্ভীরমন্দ্রিত হাঁক হেঁকে
বাষ্পশ্বাসী সমুদ্র-খেয়ার ডিঙা
বাজাইত শিঙা,
রৌদ্রের প্রান্তর বহি
ছুটে যেত দিগন্তে শব্দের অশ্বারোহী।
বাতায়নকোণে
নির্বাসনে
যবে দিন যেত বয়ে
না-চেনা ভুবন হতে ভাষাহীন নানা ধ্বনি লয়ে
প্রহরে প্রহরে দূত ফিরে ফিরে
আমারে ফেলিত ঘিরে।
জনপূর্ণ জীবনের যে আবেগ পৃথ্বীনাট্যশালে
তালে ও বেতালে
করিত চরণপাত,
কভু অকস্মাৎ
কভু মৃদুবেগে ধীরে
ধ্বনিরূপে মোর শিরে
স্পর্শ দিয়ে চেতনারে জাগাইত ধোঁয়ালি চিন্তায়,
নিয়ে যেত সৃষ্টির আদিম ভূমিকায়।
চোখে-দেখা এ বিশ্বের গভীর সুদূরে
রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে
ছন্দের মন্দিরে বসি রেখা-জাদুকর কাল
আকাশে আকাশে নিত্য প্রসারে বস্তুর ইন্দ্রজাল।
যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়,
শুধু যেথা কত কী যে হয়—
কেন হয় কিসে হয় সে প্রশ্নের কোনো
নাহি মেলে উত্তর কখনো।
যেথা আদিপিতামহী পড়ে বিশ্ব-পাঁচালির ছড়া
ইঙ্গিতের অনুপ্রাসে গড়া—
কেবল ধ্বনির ঘাতে বক্ষস্পন্দে দোলন দুলায়ে
মনেরে ভুলায়ে
নিয়ে যায় অস্তিত্বের ইন্দ্রজাল যেই কেন্দ্রস্থলে,
বোধের প্রত্যূষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে।

[শান্তিনিকেতন]
২১।১০।৩৮

বধূ

ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত প'ড়ে—
ভাবখানা মনে আছে— "বউ আসে চতুর্দোলা চ'ড়ে
আম-কাঁঠালের ছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।"

বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনীগানে
ছন্দের লাগাল দোল আধোজাগা কল্পনার শিহরদোলায়,
আঁধার-আলোর দ্বন্দ্বে যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,
সত্য-অসত্যের মাঝে লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।
ছড়া-বাঁধা চতুর্দোলা চলেছিল যে-গলি বাহিয়া
চিহ্নিত করেছে মোর হিয়া
গভীর নাড়ীর পথে অদৃশ্য রেখায় এঁকেবেঁকে।
তারি প্রান্ত থেকে
অশ্রুত সানাই বাজে অনিশ্চিত প্রত্যাশার সুরে
দুর্গম চিন্তার দূরে দূরে।
সেদিন সে কল্পলোকে বেহারাগুলোর পদক্ষেপে
বক্ষ উঠেছিল কেঁপে কেঁপে,
পলে পলে ছন্দে ছন্দে আসে তারা আসে না তবুও,
পথ শেষ হবে না কভুও।

সেকাল মিলাল। তার পরে, বধূ-আগমনগাথা
গেয়েছে মর্মরচ্ছন্দে অশোকের কচি রাঙা পাতা ;
বেজেছে বর্ষণঘন শ্রাবণের বিনিদ্র নিশীথে ;
মধ্যাহ্নে করুণ রাগিণীতে
বিদেশী পান্থের শ্রান্ত সুরে।
অতিদূর মায়াময়ী বধূর নূপুরে
তন্দ্রার প্রত্যন্তদেশে জাগায়েছে ধ্বনি
মৃদু রণরণি।
ঘুম ভেঙে উঠেছিনু জেগে,
পূর্বাকাশে রক্ত মেঘে
দিয়েছিল দেখা
অনাগত চরণের অলক্তের রেখা।
কানে কানে ডেকেছিল মোরে
অপরিচিতার কণ্ঠ স্নিগ্ধ নাম ধ'রে—
সচকিতে
দেখে তবু পাই নি দেখিতে।
অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ
রহস্যের তীব্রতায় দেহে মনে জাগাল হরষ ;

তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্তেই,
"তুমিই কি সেই,
আঁধারের কোন্ ঘাট হতে
এসেছ আলোতে !"
উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ ;
ইঙ্গিতে জানায়েছিল, "আমি তারি দূত,
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে ।
নক্ষত্রলিপির পত্রে তোমার নামের কাছে
যার নাম লেখা রহিয়াছে
অনাদি অজ্ঞাত যুগে সে চড়েছে তার চতুর্দোলা,
ফিরিছে সে চির-পথভোলা
জ্যোতিষ্কের আলোছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে ।"

[শান্তিনিকেতন]
২৫।১০।৩৮

জল

ধরাতলে
চঞ্চলতা সব-আগে নেমেছিল জলে ।
সবার প্রথম ধ্বনি উঠেছিল জেগে
তারি স্রোতোবেগে ।
তরঙ্গিত গতিমত্ত সেই জল
কলোল্লোলে উদ্‌বেল উচ্ছল
শৃঙ্খলিত ছিল স্তব্ধ পুকুরে আমার,
নৃত্যহীন ঔদাসীন্যে অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি তার ।
গান নাই, শব্দের তরণী হোথা ডোবা,
প্রাণ হোথা বোবা ।
জীবনের রঙ্গমঞ্চে ওখানে রয়েছে পর্দা টানা,
ওইখানে কালো বরনের মানা ।
ঘটনার স্রোত নাহি বয়,
নিস্তব্ধ সময় ।
হোথা হতে তাই মনে দিত সাড়া
সময়ের বন্ধ-ছাড়া
ইতিহাসপলাতক কাহিনীর কত
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি নানামতো ।
উপরের তলা থেকে
চেয়ে দেখে
না-দেখা গভীরে ওর মায়াপুরী এঁকেছিনু মনে ।

নাগকন্যা মানিকদর্পণে
সেথায় গাঁথিছে বেণী,
কুঞ্চিত লহরিকার শ্রেণী
ভেসে যায় বেঁকে বেঁকে
যখন বিকেলে হাওয়া জাগিয়া উঠিত থেকে থেকে ।
তীরে যত গাছপালা পশুপাখি
তারা আছে অন্যলোকে, এ শুধু একাকী ।
তাই সব
যত কিছু অসম্ভব
কল্পনার মিটাইত সাধ,
কোথাও ছিল না তার প্রতিবাদ ।

তার পরে মনে হল একদিন,
সাঁতারিতে পেল যারা পৃথিবীতে তারাই স্বাধীন,
বন্দী তারা যারা পায় নাই ।
এ আঘাত প্রাণে নিয়ে চলিলাম তাই
ভূমির নিষেধগণ্ডি হতে পার ।
অনাত্মীয় শত্রুতার
সংশয় কাটিল ধীরে ধীরে,
জলে আর তীরে
আমারে মাঝেতে নিয়ে হল বোঝাপড়া ।
আঁকড়িয়া সাঁতারের ঘড়া
অপরিচয়ের বাধা উত্তীর্ণ হয়েছি দিনে দিনে,
অচেনার প্রান্তসীমা লয়েছিনু চিনে ।
পুলকিত সাবধানে
নামিতাম স্নানে,
গোপন তরল কোন্ অদৃশ্যের স্পর্শ সর্ব গায়ে
ধরিত জড়ায়ে ।
হর্ষ-সাথে মিলি ভয়
দেহময়
রহস্য ফেলিত ব্যাপ্ত করি ।

পূর্বতীরে বৃদ্ধ বট প্রাচীন প্রহরী
গ্রন্থিল শিকড়গুলো কোথায় পাঠাত নিরালোকে
যেন পাতালের নাগলোকে ।
এক দিকে দূর আকাশের সাথে
দিনে রাতে
চলে তার আলোকছায়ার আলাপন,
অন্য দিকে দূর নিঃশব্দের তলে নিমজ্জন
কিসের সন্ধানে
অবিচ্ছিন্ন প্রচ্ছন্নের পানে ।

সেই পুকুরের
ছিনু আমি দোসর দূরের
বাতায়নে বসি নিরালায়,
বন্দী মোরা উভয়েই জগতের ভিন্ন কিনারায় ;
তার পরে দেখিলাম, এ পুকুর এও বাতায়ন—
এক দিকে সীমা বাঁধা, অন্য দিকে মুক্ত সারাক্ষণ ।
করিয়াছি পারাপার
যত শত বার
ততই এ তটে-বাঁধা জলে
গভীরের বক্ষতলে
লভিয়াছি প্রতি ক্ষণে বাধা-ঠেলা স্বাধীনের জয়,
গেছে চলি ভয় ।

শান্তিনিকেতন]
২৬।১০।৩৮

শ্যামা

উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ, গলায় পলার হারখানি ।
চেয়েছি অবাক মানি
তার পানে ।
বড়ো বড়ো কাজল নয়ানে
অসংকোচে ছিল চেয়ে
নবকৈশোরের মেয়ে,
ছিল তারি কাছাকাছি বয়স আমার ।
স্পষ্ট মনে পড়ে ছবি । ঘরের দক্ষিণে খোলা দ্বার,
সকালবেলার রোদে বাদামগাছের মাথা
ফিকে আকাশের নীলে মেলেছে চিকন ঘন পাতা ।
একখানি সাদা শাড়ি কাঁচা কচি গায়ে,
কালো পাড় দেহ ঘিরে ঘুরিয়া পড়েছে তার পায়ে ।
দুখানি সোনার চুড়ি নিটোল দু হাতে,
ছুটির মধ্যাহ্নে পড়া কাহিনীর পাতে
ওই মূর্তিখানি ছিল । ডেকেছে সে মোরে মাঝে মাঝে
বিধির খেয়াল যেথা নানাবিধ সাজে
রচে মরীচিকালোক নাগালের পারে
বালকের স্বপ্নের কিনারে ।
দেহ ধরি মায়া
আমার শরীরে মনে ফেলিল অদৃশ্য ছায়া
সূক্ষ্ম স্পর্শময়ী ।
সাহস হল না কথা কই ।
হৃদয় ব্যথিল মোর অতিমৃদু গুঞ্জরিত সুরে—
ও যে দূরে, ও যে বহুদূরে,

যত দূরে শিরীষের ঊর্ধ্বশাখা যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।

একদিন পুতুলের বিয়ে,
পত্র গেল দিয়ে।
কলরব করেছিল হেসে খেলে
নিমন্ত্রিত দল। আমি মুখচোরা ছেলে
একপাশে সংকোচে পীড়িত। সন্ধ্যা গেল বৃথা,
পরিবেশনের ভাগে পেয়েছিনু মনে নেই কী তা।
দেখেছিনু, দ্রুতগতি দুখানি পা আসে যায় ফিরে,
কালো পাড় নাচে তারে ঘিরে।
কটাক্ষে দেখেছি, তার কাঁকনে নিরেট রোদ
দু হাতে পড়েছে যেন বাঁধা। অনুরোধ উপরোধ
শুনেছিনু তার স্নিগ্ধ স্বরে।
ফিরে এসে ঘরে
মনে বেজেছিল তারি প্রতিধ্বনি
অর্ধেক রজনী।

তার পরে একদিন
জানাশোনা হল বাধাহীন।
একদিন নিয়ে তার ডাকনাম
তারে ডাকিলাম।
একদিন ঘুচে গেল ভয়,
পরিহাসে পরিহাসে হল দোঁহে কথা-বিনিময়।
কখনো-বা গড়ে-তোলা দোষ
ঘটায়েছে ছল-করা রোষ।
কখনো-বা শ্লেষবাক্যে নিষ্ঠুর কৌতুক
হেনেছিল দুখ।
কখনো বা দিয়েছিল অপবাদ
অনবধানের অপরাধ।
কখনো দেখেছি তার অযত্নের সাজ—
রন্ধনে ছিল সে ব্যস্ত, পায় নাই লাজ।
পুরুষসুলভ মোর কত মূঢ়তারে
ধিক্কার দিয়েছে নিজ স্ত্রীবুদ্ধির তীব্র অহংকারে।
একদিন বলেছিল, "জানি হাত দেখা।"
হাতে তুলে নিয়ে হাত নতশিরে গনেছিল রেখা—
বলেছিল, "তোমার স্বভাব
প্রেমের লক্ষণে দীন।" দিই নাই কোনোই জবাব।
পরশের সত্য পুরস্কার
খণ্ডিয়া দিয়েছে দোষ মিথ্যা সে নিন্দার।

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।

পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন
পশ্চিমে দিগন্তে হয় লীন।
চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাবণ্য ঘনাল,
আশ্বিনের আলো
বাজাল সোনার ধানে ছুটির সানাই।
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশে স্বপ্নেতে বোঝাই।

[শান্তিনিকেতন]
৩১।১০।৩৮

পঞ্চমী

ভাবি বসে বসে
গত জীবনের কথা,
কাঁচা মনে ছিল
কী বিষম মূঢ়তা।
শেষে ধিক্‌কারে বলি হাত নেড়ে,
যাক গে সে কথা যাক গে।

তরুণ বেলাতে যে খেলা খেলাতে
ভয় ছিল হারবার,
তারি লাগি, প্রিয়ে, সংশয়ে মোরে
ফিরিয়েছ বার বার।
কৃপণ কৃপার ভাঙা কণা একটুক
মনে দেয় নাই সুখ।
সে যুগের শেষে আজ বলি হেসে,
কম কি সে কৌতুক
যতটুকু ছিল ভাগ্যে,
দুঃখের কথা থাক্ গে।

পঞ্চমী তিথি
বনের আড়াল থেকে
দেখা দিয়েছিল
ছায়া দিয়ে মুখ ঢেকে।
মহা আক্ষেপে বলেছি সেদিন,
এ ছল কিসের জন্য।
পরিতাপে জ্বলি আজ আমি বলি,
সিকি চাঁদিনীর আলো
দেউলে নিশার অমাবস্যার
চেয়ে যে অনেক ভালো।

বলি আরবার, এসো পঞ্চমী, এসো,
চাপা হাসিটুকু হেসো,
আধখানি বেঁকে ছলনায় ঢেকে
না জানিয়ে ভালোবেসো।
দয়া, ফাঁকি নামে গণ্য,
আমারে করুক ধন্য।

আজ খুলিয়াছি
পুরানো স্মৃতির ঝুলি,
দেখি নেড়েচেড়ে
ভুলের দুঃখগুলি।
হায় হায় এ কী, যাহা কিছু দেখি
সকলই যে পরিহাস্য।
ভাগ্যের হাসি কৌতুক করি
সেদিন সে কোন্ ছলে
আপনার ছবি দেখিতে চাহিল
আমার অশ্রুজলে।
এসো ফিরে এসো সেই ঢাকা বাঁকা হাসি,
পালা শেষ করো আসি।
মূঢ় বলিয়া করতালি দিয়া
যাও মোরে সম্ভাষি।
আজ করো তারি ভাষ্য
যা ছিল অবিশ্বাস্য।

বয়স গিয়েছে,
হাসিবার ক্ষমতাটি
বিধাতা দিয়েছে,
কুয়াশা গিয়েছে কাটি।
দুখদুর্দিন কালো বরনের
মুখোশ করেছে ছিন্ন।
দীর্ঘ পথের শেষ গিরিশিরে
উঠে গেছে আজ কবি।
সেথা হতে তার ভূতভবিষ্য
সব দেখে যেন ছবি।
ভয়ের মূর্তি যেন যাত্রার সঙ,
মেখেছে কুশ্রী রঙ।
দিনগুলি যেন পশুদলে চলে,
ঘণ্টা বাজায়ে গলে।
কেবল ভিন্ন ভিন্ন
সাদা কালো যত চিহ্ন।

[শান্তিনিকেতন],
২৯।১১।৩৮

১২।।৬

জানা-অজানা

এই ঘরে আগে পাছে
বোবা কালা বস্তু যত আছে
দলবাঁধা এখানে সেখানে,
কিছু চোখে পড়ে, কিছু পড়ে না মনের অবধানে।
পিতলের ফুলদানিটাকে
বহে নিয়ে টিপাইটা এক কোণে মুখ ঢেকে থাকে।
ক্যাবিনেটে কী যে আছে কত,
না-জানারই মতো।
পর্দায় পড়েছে ঢাকা সাসির দুখানা কাঁচ ভাঙা ;
আজ চেয়ে অকস্মাৎ দেখা গেল পর্দাখানা রাঙা—
চোখে পড়ে পড়েও না ;
জাজিমেতে আঁকে আলপনা
সাতটা বেলার আলো সকালে রোদ্‌দুরে।
সবুজ একটি শাড়ি ডুরে
ঢেকে আছে ডেস্কোখানা ; কবে তারে নিয়েছিনু বেছে,
রঙ চোখে উঠেছিল নেচে,
আজ যেন সে রঙের আগুনেতে পড়ে গেছে ছাই,
আছে তবু ষোলো-আনা নাই।
থাকে থাকে দেরাজের
এলোমেলো ভরা আছে ঢের
কাগজপত্তর নানামতো,
ফেলে দিতে ভুলে যাই কত,
জানি নে কী জানি কোন্ আছে দরকার।
টেবিলে হেলানো ক্যালেন্ডার,
হঠাৎ ঠাহর হল আটই তারিখ। ল্যাভেন্ডার
শিশিভরা রোদ্‌দুরের রঙে। দিনরাত
টিক্‌টিক্ করে ঘড়ি, চেয়ে দেখি কখনো দৈবাৎ।
দেয়ালের কাছে
আলমারিভরা বই আছে ;
ওরা বারো-আনা
পরিচয়-অপেক্ষায় রয়েছে অজানা।
ওই যে দেয়ালে
ছবিগুলো হেথা হোথা, রেখেছিনু কোনো-এক কালে ;
আজ তারা ভুলে-যাওয়া,
যেন ভূতে-পাওয়া।
কার্পেটের ডিজাইন
স্পষ্টভাষা বলেছিল একদিন ;
আজ অন্যরূপ,
প্রায় তারা চুপ।

আগেকার দিন আর আজিকার দিন
পড়ে আছে হেথা হোথা একসাথে সম্বন্ধবিহীন।

এইটুকু ঘর।
কিছু-বা আপন তার, অনেক কিছুই তার পর।
টেবিলের ধারে তাই
চোখ-বোজা অভ্যাসের পথ দিয়ে যাই।
দেখি যাহা অনেকটা স্পষ্ট দেখি নাকো।
জানা-অজানার মাঝে সরু এক চৈতন্যের সাঁকো,
ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনা
তারি 'পরে চলে আনাগোনা।
আয়না-ফ্রেমের তলে ছেলেবেলাকার ফোটোগ্রাফ
কে রেখেছে, ফিকে হয়ে গেছে তার ছাপ।
পাশাপাশি ছায়া আর ছবি।
মনে ভাবি, আমি সেই রবি,
স্পষ্ট আর অস্পষ্টের উপাদানে ঠাসা
ঘরের মতন ; ঝাপ্‌সা পুরানো ছেঁড়া-ভাষা
আসবাবগুলো যেন আছে অন্যমনে।
সামনে রয়েছে কিছু, কিছু লুকিয়েছে কোণে কোণে।
যাহা ফেলিবার
ফেলে দিতে মনে নেই। ক্ষয় হয়ে আসে অর্থ তার
যাহা আছে জমে।
ক্রমে ক্রমে
অতীতের দিনগুলি
মুছে ফেলে অস্তিত্বের অধিকার। ছায়া তারা
নূতনের মাঝে পথহারা ;
যে অক্ষরে লিপি তারা লিখিয়া পাঠায় বর্তমানে
সে কেহ পড়িতে নাহি জানে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১১।৯।৩৮

প্রশ্ন

বাঁশবাগানের গলি দিয়ে মাঠে
চলতেছিলেম হাটে।
তুমি তখন আনতেছিলে জল,
পড়ল আমার ঝুড়ির থেকে
একটি রাঙা ফল।

হঠাৎ তোমার পায়ের কাছে
গড়িয়ে গেল ভুলে,
নিই নি ফিরে তুলে ।
দিনের শেষে দিঘির ঘাটে
তুলতে এলে জল,
অন্ধকারে কুড়িয়ে তখন
নিলে কি সেই ফল ।
এই প্রশ্নই গানে গেঁথে
একলা বসে গাই,
বলার কথা আর কিছু মোর নাই ।

[শান্তিনিকেতন]
৩।১২।৩৮

বঞ্চিত

রাজসভাতে ছিল জ্ঞানী,
ছিল অনেক গুণী ।
কবির মুখে কাব্যকথা শুনি
ভাঙল দ্বিধার বাঁধ,
সমস্বরে জাগল সাধুবাদ ।
উষ্ণীষেতে জড়িয়ে দিল
মণিমালার মান,
স্বয়ং রাজার দান ।
রাজধানীময় যশের বন্যাবেগে
নাম উঠল জেগে ।

দিন ফুরাল । খ্যাতিক্লান্ত মনে
যেতে যেতে পথের ধারে
দেখল বাতায়নে,
তরুণী সে, ললাটে তার
কুঙ্কুমেরি ফোঁটা,
অলকেতে সদ্য অশোক ফোটা ।
সামনে পদ্মপাতা,
মাঝখানে তার চাঁপার মালা গাঁথা,
সন্ধেবেলার বাতাস গন্ধে ভরে ।
নিশ্বাসিয়া বললে কবি,
এই মালাটি নয় তো আমার তরে ।

[শান্তিনিকেতন]
৩।১২।৩৮

আমগাছ

এ তো সহজ কথা,
অঘ্রানে এই স্তব্ধ নীরবতা
জড়িয়ে আছে সামনে আমার
আমের গাছে ;
কিন্তু ওটাই সবার চেয়ে
দুর্গম মোর কাছে।
বিকেলবেলার রোদ্‌দুরে এই চেয়ে থাকি,
যে রহস্য ওই তরুটি রাখল ঢাকি
গুঁড়িতে তার ডালে ডালে
পাতায় পাতায় কাঁপনলাগা তালে
সে কোন্ ভাষা আলোর সোহাগ
শূন্যে বেড়ায় খুঁজি।
মর্ম তাহার স্পষ্ট নাহি বুঝি,
তবু যেন অদৃশ্য তার চঞ্চলতা
রক্তে জাগায় কানে-কানে কথা,
মনের মধ্যে বুলায় যে অঙ্গুলি
আভাস-ছোঁওয়া ভাষা তুলি
সে এনে দেয় অস্পষ্ট ইঙ্গিত
বাক্যের অতীত।

ওই যে বাকলখানি
রয়েছে ওর পর্দা টানি
ওর ভিতরের আড়াল থেকে আকাশ-দূতের সাথে
বলা-কওয়া কী হয় দিনে রাতে,
পরের মনের স্বপ্নকথার সম
পৌঁছবে না কৌতূহলে মম।
দুয়ার-দেওয়া যেন বাসরঘরে
ফুলশয্যার গোপন রাতে কানাকানি করে,
অনুমানেই জানি,
আভাসমাত্র না পাই তাহার বাণী।
ফাগুন আসে বছরশেষের পারে,
দিনে-দিনেই খবর আসে দ্বারে।
একটা যেন চাপা হাসি কিসের ছলে
অবাক শ্যামলতার তলে
শিকড় হতে শাখে শাখে
ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।
অবশেষে খুশির দুয়ার হঠাৎ যাবে খুলে
মুকুলে মুকুলে।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
৫।১২।৩৮

পাখির ভোজ

ভোরে উঠেই পড়ে মনে,
মুড়ি খাবার নিমন্ত্রণে
আসবে শালিখ পাখি।
চাতালকোণে বসে থাকি,
ওদের খুশি দেখতে লাগে ভালো।
স্নিগ্ধ আলো
এ অঘ্রানের শিশির-ছোঁওয়া প্রাতে,
সরল লোভে চপল পাখির চটুল নৃত্য-সাথে
শিশুদিনের প্রথম হাসি মধুর হয়ে মেলে—
চেয়ে দেখি সকল কর্ম ফেলে।

জাড়ের হাওয়ায় ফুলিয়ে ডানা
একটুকু মুখ ঢেকে
অতিথিরা থেকে থেকে
লাল্‌চে-কালো সাদা রঙের পরিচ্ছন্ন বেশে
দেখা দিচ্ছে এসে।

খানিক পরেই একে একে জোটে পায়রাগুলো,
বুক ফুলিয়ে হেলে-দুলে খুঁটে খুঁটে ধুলো
খায় ছড়ানো ধান।
ওদের সঙ্গে শালিখদলের পঙ্‌ক্তি-ব্যবধান
একটুমাত্র নেই।
পরস্পরে একসমানেই
ব্যস্ত পায়ে বেড়ায় প্রাতরাশে।
মাঝে-মাঝে কী অকারণ ত্রাসে
ত্রস্ত পাখা মেলে
এক মুহূর্তে যায় উড়ে ধান ফেলে।
আবার ফিরে আসে
অহেতু আশ্বাসে।

এমন সময় আসে কাকের দল,
খাদ্যকণায় ঠোকর মেরে দেখে কী হয় ফল।
একটুখানি যাচ্ছে সরে আসছে আবার কাছে,
উড়ে গিয়ে বসছে তেঁতুলগাছে।
বাঁকিয়ে গ্রীবা ভাবছে বারংবার,
নিরাপদের সীমা কোথায় তার।
এবার মনে হয়,
এতক্ষণে পরস্পরের ভাঙল সমন্বয়।

কাকের দলের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিৎ মন
সন্দেহ আর সতর্কতায় দুলছে সারাক্ষণ।
প্রথম হল মনে,
তাড়িয়ে দেব ; লজ্জা হল তারি পরক্ষণে—
পড়ল মনে, প্রাণের যজ্ঞে ওদের সবাকার
আমার মতোই সমান অধিকার।
তখন দেখি, লাগছে না আর মন্দ
সকালবেলার ভোজের সভায়
কাকের নাচের ছন্দ।

এই যে বহায় ওরা
প্রাণস্রোতের পাগ্‌লা ঝোরা,
কোথা হতে অহরহ আসছে নাবি
সেই কথাটাই ভাবি।
এই খুশিটার স্বরূপ কী যে, তারি
রহস্যটা বুঝতে নাহি পারি।
চটুলদেহ দলে দলে
দুলিয়ে তোলে যে আনন্দ খাদ্যভোগের ছলে,
এ তো নহে এই নিমেষের সদ্য চঞ্চলতা,
অগণ্য এ কত যুগের অতি প্রাচীন কথা
রন্ধ্রে রন্ধ্রে হাওয়া যেমন সুরে বাজায় বাঁশি,
কালের বাঁশির মৃত্যুরন্ধ্রে সেই মতো উচ্ছ্বাসি
উৎসারিছে প্রাণের ধারা।
সেই প্রাণেরে বাহন করি আনন্দের এই তত্ত্ব অন্তহারা
দিকে দিকে পাচ্ছে পরকাশ।
পদে পদে ছেদ আছে তার, নাই তবু তার নাশ।
আলোক যেন অলক্ষ্য কোন্ সুদূর কেন্দ্র হতে
অবিশ্রান্ত স্রোতে
নানা রূপের বিচিত্র সীমায়
ব্যক্ত হতে থাকে নিত্য নানা ভঙ্গে নানা রঙ্গিমায়
তেমনি যে এই সত্তার উচ্ছ্বাস
চতুর্দিকে ছড়িয়ে ফেলে নিবিড় উল্লাস—
যুগের পরে যুগে তবু হয় না গতিহারা,
হয় না ক্লান্ত অনাদি সেই ধারা।
সেই পুরাতন অনির্বচনীয়
সকালবেলায় রোজ দেখা দেয় কি ও
আমার চোখের কাছে
ভিড় করা ওই শালিখগুলির নাচে।
আদিমকালের সেই আনন্দ ওদের নৃত্যবেগে
রূপ ধ'রে মোর রক্তে ওঠে জেগে।

তবুও দেখি কখন কদাচিৎ
বিরূপ বিপরীত—
প্রাণের সহজ সুষমা যায় ঘুচি,
চঞ্চুতে চঞ্চুতে খোঁচাখুচি ;
পরাভূত হতভাগ্য মোর দুয়ারের কাছে
ক্ষত-অঙ্গে শরণ মাগিয়াছে ।
দেখেছি সেই জীবন-বিরুদ্ধতা,
হিংসার ক্রুদ্ধতা—
যেমন দেখি কুহেলিকার কুশ্রী অপরাধ,
শীতের প্রাতে আলোর প্রতি কালোর অপবাদ—
অহংকৃত ক্ষণিকতার অলীক পরিচয়,
অসীমতার মিথ্যা পরাজয় ।
তাহার পরে আবার করে ছিন্নেরে গ্রন্থন
সহজ চিরন্তন ।
প্রাণোৎসবে অতিথিরা আবার পাশাপাশি
মহাকালের প্রাঙ্গণেতে নৃত্য করে আসি

শ্যামলী । শান্তিনিকেতন
৬।১২।৩৮

বেজি

অনেকদিনের এই ডেস্কো—
আনমনা কলমের কালিপড়া ফ্রেস্কো
দিয়েছে বিস্তর দাগ ভুতুড়ে রেখার ।
যমজ সোদর ওরা যে-সব লেখার—
ছাপার লাইনে পেল ভদ্রবেশে ঠাঁই,
তাদের স্মরণে এরা নাই ।
অক্সফোর্ড ডিক্সনারি, পদকল্পতরু
ইংরেজ মেয়ের লেখা 'সাহারার মরু'
ভ্রমণের বই, ছবি আঁকা,
এগুলোর একপাশে চা রয়েছে ঢাকা
পেয়ালায়, মডার্ন্ রিভিয়ুতে চাপা ।
পড়ে আছে সদ্যছাপা
প্রুফগুলো কুঁড়েমির উপেক্ষায় ।
বেলা যায়,
ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে পাঁচ,
বৈকালী ছায়ার নাচ
মেঝেতে হয়েছে শুরু, বাতাসে পর্দায় লেগে দোলা ।
খাতাখানি আছে খোলা ।—
আধঘণ্টা ভেবে মরি,
প্যান্থীজ্‌ম্ শব্দটাকে বাংলায় কী করি ।

পোষা বেজি হেনকালে দ্রুতগতি এখানে সেখানে
টেবিল-চৌকির নীচে ঘুরে গেল কিসের সন্ধানে—
দুই চক্ষু ঔৎসুক্যের দীপ্তিজ্বলা,
তাড়াতাড়ি দেখে গেল আলমারির তলা
দামি দ্রব্য যদি কিছু থাকে ;
ঘ্রাণ কিছু মিলিল না তীক্ষ্ণ নাকে
ঈপ্সিত বস্তুর। ঘুরে ফিরে অবজ্ঞায় গেল চলে :
এ ঘরে সকলই ব্যর্থ আরসুলার খোঁজ নেই ব'লে।

আমার কঠিন চিন্তা এই,
প্যাট্রীজ্‌ম্‌ শব্দটার বাংলা বুঝি নেই।

[শান্তিনিকেতন]
৪ অক্টোবর ১৯৩৮

যাত্রা

ইস্‌টিমারের ক্যাবিনটাতে কবে নিলেম ঠাঁই,
স্পষ্ট মনে নাই।
উপরতলার সারে
কামরা আমার একটা ধারে।
পাশাপাশি তারি
আরো ক্যাবিন সারি সারি
নম্বরে চিহ্নিত,
একই রকম খোপ সেগুলোর দেয়ালে ভিন্নিত।
সরকারী যা আইনকানুন তাহার যাথাযথ্য
অটুট, তবু যাত্রীজনের পৃথক বিশেষত্ব
রুদ্ধদুয়ার ক্যাবিনগুলোয় ঢাকা ;
এক চলনের মধ্যে চালায় ভিন্ন ভিন্ন চাকা,
ভিন্ন ভিন্ন চাল।
অদৃশ্য তার হাল,
অজানা তার লক্ষ্য হাজার পথেই,
সেথায় কারো আসনে ভাগ হয় না কোনোমতেই।
প্রত্যেকেরই রিজার্ভ-করা কোটর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ;
দরজাটা খোলা হলেই সম্মুখে সমুদ্র
মুক্ত চোখের 'পরে
সমান সবার তরে,
তবুও সে একান্ত অজানা,
তরঙ্গতর্জনী-তোলা অলঙ্ঘ্য তার মানা।

মাঝে মাঝে ঘণ্টা পড়ে। ডিনার-টেবিলে
খাবার গন্ধ, মদের গন্ধ, অঙ্গরাগের সুগন্ধ যায় মিলে—
তারি সঙ্গে নানা রঙের সাজে
ইলেক্‌ট্রিকের আলো -জ্বালা কক্ষমাঝে
একটু জানা অনেকখানি না-জানাতেই মেশা
চক্ষু-কানের স্বাদের ঘ্রাণের সম্মিলিত নেশা
কিছুক্ষণের তরে
মোহাবেশে ঘনিয়ে সবায় ধরে।
চেনাশোনা হাসি-আলাপ মদের ফেনার মতো
বুদ্‌বুদিয়া ওঠে আবার গভীরে হয় গত।
বাইরে রাত্রি তারায় তারাময়,
ফেনিল সুনীল তেপান্তরে মরণ-ঘেরা ভয়।

হঠাৎ কেন খেয়াল গেল মিছে,
জাহাজখানা ঘুরে আসি উপর থেকে নীচে।
খানিক যেতেই পথ হারালুম, গলির আঁকেবাঁকে
কোথায় ওরা কোন্ অফিসার থাকে।
কোথাও দেখি সেলুন-ঘরে ঢুকে,
ক্ষুর বোলাচ্ছে নাপিত সে কার ফেনায়-মগ্ন মুখে।
হোথায় রান্নাঘর ;
রাঁধুনেরা সার বেঁধেছে পৃথুল-কলেবর।
গা ঘেঁষে কে গেল চলে ড্রেসিং-গাউন-পরা,
স্নানের ঘরে জায়গা পাবার ত্বরা।
নীচের তলার ডেকের 'পরে কেউ-বা করে খেলা,
ডেক-চেয়ারে কারো শরীর মেলা,
বুকের উপর বইটা রেখে কেউ বা নিদ্রা যায়,
পায়চারি কেউ করে ত্বরিত পায়।
স্টুয়ার্ড্ হোথায় জুগিয়ে বেড়ায় বরফী শর্বৎ।
আমি তাকে শুধাই আমার ক্যাবিন-ঘরের পথ
নেহাত থতোমতো।
সে শুধাল, নম্বর তার কত।
আমি বললেম যেই,
নম্বরটা মনে আমার নেই—
একটু হেসে নিরুত্তরে গেল আপন কাজে,
ঘেমে উঠি উদ্‌বেগে আর লাজে।
আবার ঘুরে বেড়াই আগে পাছে,
চেয়ে দেখি কোন্ ক্যাবিনের নম্বর কী আছে।
যেটাই দেখি মনেতে হয়, এইটে হতে পারে ;
সাহস হয় না ধাক্কা দিতে দ্বারে।
ভাবছি কেবল, কী যে করি, হল আমার এ কী—
এমন সময় হঠাৎ চমকে দেখি,

নিছক স্বপ্ন এ যে,
এক যাত্রার যাত্রী যারা কোথায় গেল কে যে।

গভীর রাত্রি ; বাতাস লেগে কাঁপে ঘরের সাসি,
রেলের গাড়ি অনেক দূরে বাজিয়ে গেল বাঁশি।

[শান্তিনিকেতন]
২৬।২।৩৯

সময়হারা

খবর এল, সময় আমার গেছে,
আমার-গড়া পুতুল যারা বেচে
বর্তমানে এমনতরো পসারী নেই ;
সাবেক কালের দালানঘরের পিছন কোণেই
ক্রমে ক্রমে
উঠছে জমে জমে
আমার হাতের খেলনাগুলো,
টানছে ধুলো।
হাল আমলের ছাড়পত্রহীন
অকিঞ্চনটা লুকিয়ে কাটায় জোড়াতাড়ার দিন।
ভাঙা দেয়াল ঢেকে একটা ছেঁড়া পর্দা টাঙাই ;
ইচ্ছে করে, পৌষমাসের হাওয়ার তোড়টা ভাঙাই ;
ঘুমোই যখন ফড়্‌ফড়িয়ে বেড়ায় সেটা উড়ে,
নিতান্ত ভুতুড়ে।
আধপেটা খাই শালুক-পোড়া ; একলা কঠিন ভুঁয়ে
চেটাই পেতে শুয়ে
ঘুম হারিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
আউড়ে চলি শুধু আপন-মনে—
"উড়কি ধানের মুড়কি দেব, বিন্নে ধানের খই,
সরু ধানের চিঁড়ে দেব, কাগমারে দই।"
আমার চেয়ে কম-ঘুমন্ত নিশাচরের দল
খোঁজ নিয়ে যায় ঘরে এসে, হায় সে কী নিষ্ফল।
কখনো-বা হিসেব ভুলে আসে মাতাল চোর,
শূন্য ঘরের পানে চেয়ে বলে, "সাঙাত মোর,
আছে ঘরে ভদ্র ভাষায় বলে যাকে দাওয়াই ?"
নেই কিছু তো, দু-এক ছিলিম তামাক সেজে খাওয়াই।
একটু যখন আসে ঘুমের ঘোর
সুড়সুড়ি দেয় আরসুলারা পায়ের তলায় মোর।
দুপুরবেলায় বেকার থাকি অন্যমনা ;
গিরগিটি আর কাঠবিড়ালির আনাগোনা

সেই দালানের বাহির ঝোপে ;
থামের মাথায় খোপে খোপে
পায়রাগুলোর সারাটা দিন বকম্-বকম্ ।
আঙিনাটার ভাঙা পাঁচিল, ফাটলে তার রকম-রকম
লতাগুল্ম পড়ছে ঝুলে,
হলদে সাদা বেগনি ফুলে
আকাশ-পানে দিচ্ছে উঁকি ।
ছাতিমগাছের মরা শাখা পড়ছে ঝুঁকি
শঙ্খমণির খালে,
মাছরাঙারা দুপুরবেলায় তন্দ্রানিঝুম কালে
তাকিয়ে থাকে গভীর জলের রহস্যভেদরত
বিজ্ঞানীদের মতো ।
পানাপুকুর, ভাঙনধরা ঘাট,
অফলা এক চালতাগাছের চলে ছায়ার নাট ।
চক্ষু বুজে ছবি দেখি— কাৎলা ভেসেছে,
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে ।
ঝাউগুঁড়িটার 'পরে
কাঠঠোকরা ঠক্‌ঠকিয়ে কেবল প্রশ্ন করে ।
আগে কানে পৌঁছত না ঝিঁঝিপোকার ডাক,
এখন যখন পোড়ো বাড়ি দাঁড়িয়ে হতবাক্
ঝিল্লিরবের তানপুরা-তান স্তব্ধতা-সংগীতে
লেগেই আছে একঘেয়ে সুর দিতে ।
আঁধার হতে না হতে সব শেয়াল ওঠে ডেকে
কলম্‌দিঘির ডাঙা পাড়ির থেকে ।
পেঁচার ডাকে বাঁশের বাগান হঠাৎ ভয়ে জাগে,
তন্দ্রা ভেঙে বুকে চমক লাগে ।
বাদুড়-ঝোলা তেঁতুলগাছে মনে যে হয় সত্যি,
দাড়িওয়ালা আছে ব্রহ্মদত্যি ।
রাতের বেলায় ডোমপাড়াতে কিসের কাজে
তাক্‌ধুমাধুম বাদ্যি বাজে ।
তখন ভাবি, একলা ব'সে দাওয়ার কোণে
মনে-মনে,
ঝড়েতে কাত জারুলগাছের ডালে ডালে
পির্‌ভু নাচে হাওয়ার তালে ।

শহর জুড়ে নামটা ছিল, যেদিন গেল ভাসি
হলুম বনগাঁবাসী ।
সময় আমার গেছে ব'লেই সময় থাকে পড়ে,
পুতুল গড়ার শূন্য বেলা কাটাই খেয়াল গ'ড়ে ।
সজনেগাছে হঠাৎ দেখি কমলাপুলির টিয়ে—
গোধূলিতে সুয্যিমামার বিয়ে ,

মামি থাকেন, সোনার বরন ঘোমটাতে মুখ ঢাকা,
আলতা পায়ে আঁকা।
এইখানেতে ঘুঘুডাঙার খাঁটি খবর মেলে
কুলতলাতে গেলে।
সময় আমার গেছে বলেই জানার সুযোগ হল
'কলুদ ফুল' যে কাকে বলে, ওই যে থোলো থোলো
আগাছা জঙ্গলে
সবুজ অন্ধকারে যেন রোদের টুক্‌রো জ্বলে।
বেড়া আমার সব গিয়েছে টুটে ;
পরের গোরু যেখান থেকে যখন খুশি ছুটে
হাতার মধ্যে আসে ;
আর কিছু তো পায় না, খিদে মেটায় শুকনো ঘাসে।
আগে ছিল সাট্‌ন্‌ বীজে বিলিতি মৌসুমি,
এখন মরুভূমি।
সাত পাড়াতে সাত কুলেতে নেইকো কোথাও কেউ
মনিব যেটার, সেই কুকুরটা কেবলই ঘেউ-ঘেউ
লাগায় আমার দ্বারে ; আমি বোঝাই তারে কত,
আমার ঘরে তাড়িয়ে দেবার মতো
ঘুম ছাড়া আর মিলবে না তো কিছু—
শুনে সে লেজ নাড়ে, সঙ্গে বেড়ায় পিছু পিছু।
অনাদরের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে পিঠের 'পরে
জানিয়ে দিলে, লক্ষ্মীছাড়ার জীর্ণ ভিটের 'পরে
অধিকারের দলিল তাহার দেহেই বর্তমান।
দুর্ভাগ্যের নতুন হাওয়া-বদল করার স্থান
এমনতরো মিলবে কোথায়। সময় গেছে তারই,
সন্দেহ তার নেইকো একেবারেই।
সময় আমার গিয়েছে, তাই গাঁয়ের ছাগল চরাই ;
রবিশস্যে ভরা ছিল, শূন্য এখন মরাই।
খুদকুঁড়ো যা বাকি ছিল ইঁদুরগুলো ঢুকে
দিল কখন ফুঁকে।

হাওয়ার ঠেলায় শব্দ করে আগলভাঙা দ্বার,
সারাদিনে জনামাত্র নেইকো খরিদ্দার।
কালের অলস চরণপাতে
ঘাস উঠেছে ঘরে আসার বাঁকা গলিটাতে।
ওরই ধারে বটের তলায় নিয়ে চিঁড়ের থালা
চড়ুইপাখির জন্যে আমার খোলা অতিথশালা।

সন্ধে নামে পাতাঝরা শিমুলগাছের আগায়,
আধ-ঘুমে আধ-জাগায়
মন চলে যায় চিহ্নবিহীন পস্‌টারিটির পথে
স্বপ্নমনোরথে ;

কালপুরুষের সিংহদ্বারের ওপার থেকে
শুনি কে কয় আমায় ডেকে—
"ওরে পুতুলওলা
তোর যে ঘরে যুগান্তরের দুয়ার আছে খোলা,
সেথায় আগাম-বায়না-নেওয়া খেলনা যত আছে
লুকিয়ে ছিল গ্রহণ-লাগা ক্ষণিক কালের পাছে ;
আজ চেয়ে দেখ্, দেখতে পাবি,
মোদের দাবি
ছাপ-দেওয়া তার ভালে ।
পুরানো সে নতুন আলোয় জাগল নতুন কালে ।
সময় আছে কিংবা গেছে দেখার দৃষ্টি সেই
সবার চক্ষে নেই—
এই কথাটা মনে রেখে ওরে পুতুলওলা,
আপন সৃষ্টি-মাঝখানেতে থাকিস আপন-ভোলা ।
ওই যে বলিস, বিছানা তোর ভুঁয়ে চেটাই পাতা,
ছেঁড়া মলিন কাঁথা—
ওই যে বলিস, জোটে কেবল সিদ্ধ কচুর পথ্যি—
এটা নেহাত স্বপ্ন কি নয়, এ কি নিছক সত্যি ।
পাস নি খবর, বাহান্ন জন কাহার
পালকি আনে— শব্দ কি পাস তাহার ।
বাঘনাপাড়া পেরিয়ে এল ধেয়ে,
সখীর সঙ্গে আসছে রাজার মেয়ে ।
খেলা যে তার বন্ধ আছে তোমার খেলনা বিনে,
এবার নেবে কিনে ।
কী জানি বা ভাগ্যি তোমার ভালো,
বাসরঘরে নতুন প্রদীপ জ্বালো ;
নবযুগের রাজকন্যা আধেক রাজ্যসুদ্ধ
যদি মেলে, তা নিয়ে কেউ বাধায় যদি যুদ্ধ,
ব্যাপারখানা উচ্চতলায় ইতিহাসের ধাপে
উঠে পড়বে মহাকাব্যের মাপে ।
বয়স নিয়ে পণ্ডিত কেউ তর্ক যদি করে
বলবে তাকে, একটা যুগের পরে
চিরকালের বয়স আসে সকল-পাঁজি-ছাড়া,
যমকে লাগায় তাড়া ।"

এতক্ষণ যা বকা গেল এটা প্রলাপমাত্র—
নবীন বিচারপতি ওগো, আমি ক্ষমার পাত্র ;
পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে-সব সময়হারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা

শ্যামলী । শান্তিনিকেতন
১।১।৩৯

নামকরণ

একদিন মুখে এল নূতন এ নাম—
চৈতালিপূর্ণিমা ব'লে কেন যে তোমারে ডাকিলাম
সে কথা শুধাও যবে মোরে
স্পষ্ট ক'রে
তোমারে বুঝাই
হেন সাধ্য নাই।
রসনায় রসিয়েছে, আর কোনো মানে
কী আছে কে জানে।
জীবনের যে সীমায়
এসেছ গম্ভীর মহিমায়
সেথা অপ্রমত্ত তুমি,
পেরিয়েছ ফাল্গুনের ভাঙাভাঙা উচ্ছিষ্টের ভূমি,
পৌঁছিয়াছ তপঃশুচি নিরাসক্ত বৈশাখের পাশে,
এ কথাই বুঝি মনে আসে
না ভাবিয়া আগুপিছু।
কিংবা এ ধ্বনির মাঝে অজ্ঞাত কুহক আছে কিছু।
হয়তো মুকুল-ঝরা মাসে
পরিণতফলনম্র অপ্রগল্‌ভ যে মর্যাদা আসে
আম্রডালে,
দেখেছি তোমার ভালে
সে পূর্ণতা স্তব্ধতামন্থর—
তার মৌন-মাঝে বাজে অরণ্যের চরম মর্মর।
অবসন্ন বসন্তের অবশিষ্ট অন্তিম চাঁপায়
মৌমাছির ডানারে কাঁপায়
নিকুঞ্জের ম্লান মৃদু ঘ্রাণে,
সেই ঘ্রাণ একদিন পাঠায়েছ প্রাণে,
তাই মোর উৎকণ্ঠিত বাণী
জাগায়ে দিয়েছে নামখানি।
সেই নাম থেকে থেকে ফিরে ফিরে
তোমারে গুঞ্জন করি ঘিরে
চারি দিকে,
ধ্বনিলিপি দিয়ে তার বিদায়স্বাক্ষর দেয় লিখে।
তুমি যেন রজনীর জ্যোতিষ্কের শেষ পরিচয়
শুকতারা, তোমার উদয়
অস্তের খেয়ায় চ'ড়ে আসা,
মিলনের সাথে বহি বিদায়ের ভাষা।
তাই বসে একা
প্রথম দেখার ছন্দে ভরি লই সব-শেষ দেখা।

সেই দেখা মম
পরিস্ফুটতম।
বসন্তের শেষমাসে শেষ শুক্লতিথি
তুমি এলে তাহার অতিথি,
উজাড় করিয়া শেষ দানে
ভাবের দাক্ষিণ্য মোর অন্ত নাহি জানে।
ফাল্গুনের অতিতৃপ্তি ক্লান্ত হয়ে যায়,
চৈত্রে সে বিরলরসে নিবিড়তা পায়,
চৈত্রের সে ঘন দিন তোমার লাবণ্যে মূর্তি ধরে;
মিলে যায় সারঙের বৈরাগ্যরাগের শান্তস্বরে,
প্রৌঢ় যৌবনের পূর্ণ পর্যাপ্ত মহিমা
লাভ করে গৌরবের সীমা।

হয়তো এ-সব ব্যাখ্যা স্বপ্ন-অন্তে চিন্তা ক'রে বলা,
দাম্ভিক বুদ্ধিরে শুধু ছলা—
বুঝি এর কোনো অর্থ নাইকো কিছুই।
জ্যৈষ্ঠ-অবসানদিনে আকস্মিক জুঁই
যেমন চমকি জেগে উঠে
সেইমতো অকারণে উঠেছিল ফুটে,
সেই চিত্রে পড়েছিল তার লেখা
বাক্যের তূলিকা যেথা স্পর্শ করে অব্যক্তের রেখা।
পুরুষ যে রূপকার,
আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেরে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার
অপূর্ব উপকরণ
বিশ্বের রহস্যলোকে করে অন্বেষণ।
সেই রহস্যই নারী—
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড়া মূর্তি রচে তারি;
যাহা পায় তার সাথে যাহা নাহি পায়
তাহারে মিলায়।
উপমা তুলনা যত ভিড় করে আসে
ছন্দের কেন্দ্রের চারি পাশে
কুমোরের ঘুরখাওয়া চাকার সংবেগে
যেমন বিচিত্র রূপ উঠে জেগে জেগে।
বসন্তে নাগকেশরের সুগন্ধে মাতাল
বিশ্বের জাদুর মঞ্চে রচে সে আপন ইন্দ্রজাল।
বনতলে মর্মরিয়া কাঁপে সোনাঝুরি;
চাঁদের আলোর পথে খেলা করে ছায়ার চাতুরী;
গভীর চৈতন্যলোকে
রাঙা নিমন্ত্রণলিপি দেয় লিখি কিংশুকে অশোকে;
হাওয়ায় বুলায় দেহে অনামীর অদৃশ্য উত্তরী,
শিরায় সেতার উঠে গুঞ্জরি গুঞ্জরি।

এই যারে মায়ারথে পুরুষের চিত্ত ডেকে আনে
সে কি নিজে সত্য করে জানে
সত্য মিথ্যা আপনার,
কোথা হতে আসে মন্ত্র এই সাধনার।
রক্তস্রোত-আন্দোলনে জেগে
ধ্বনি উচ্ছ্বসিয়া উঠে অর্থহীন বেগে;
প্রচ্ছন্ন নিকুঞ্জ হতে অকস্মাৎ ঝঞ্ঝায় আহত
ছিন্ন মঞ্জরীর মতো
নাম এল ঘূর্ণিবায়ে ঘুরি ঘুরি,
চাঁপার গন্ধের সাথে অন্তরেতে ছড়াল মাধুরী।

[? শান্তিনিকেতন]
চৈত্রপূর্ণিমা [২১ চৈত্র]। ১৩৪৫

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে

পাকুড়তলির মাঠে
বামুনমারা দিঘির ঘাটে
আদিবিশ্ব-ঠাকুরমায়ের আস্‌মানি এক চেলা
ঠিক দুক্কুর বেলা
বেগ্‌নি-সোনা দিক্‌-আঙিনার কোণে
ব'সে ব'সে ভুঁইজোড়া এক চাটাই বোনে
হলদে রঙের শুকনো ঘাসে।
সেখান থেকে ঝাপসা স্মৃতির কানে আসে
ঘুম-লাগা রোদ্‌দুরে
ঝিম্‌ঝিমিনি সুরে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে।'

সুদূর কালের দারুণ ছড়াটিকে
স্পষ্ট করে দেখি নে আজ, ছবিটা তার ফিকে।
মনের মধ্যে বেঁধে না তার ছুরি,
সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি।
বিয়ের পথে ডাকাত এসে হরণ করলে মেয়ে,
এই বারতা ধুলোয়-পড়া শুকনোপাতার চেয়ে
উত্তাপহীন, ঝেঁটিয়ে-ফেলা আবর্জনার মতো।
দুঃসহ দিন দুঃখেতে বিক্ষত
এই-কটা তার শব্দমাত্র দৈবে রইল বাকি,
আগুন-নেভা ছাইয়ের মতন ফাঁকি।
সেই মরা দিন কোন্‌ খবরের টানে
পড়ল এসে সজীব বর্তমানে।

তপ্ত হাওয়ার বাজপাখি আজ বারে বারে
ছোঁ মেরে যায় ছড়াটারে,
এলোমেলো ভাবনাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে
টুক্‌রো করে ওড়ায় ধ্বনিটাকে।
জাগা মনের কোন্ কুয়াশা স্বপ্নেতে যায় ব্যেপে,
ধোঁয়াটে এক কম্বলেতে ঘুমকে ধরে চেপে,
রক্তে নাচে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্‌ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।

বিকেলবেলার চিকন আলোর আভাস লেগে
ঘোলা রঙের আলস ভেঙে উঠি জেগে।
হঠাৎ দেখি, বুকে বাজে টন্‌টনানি
পাঁজরগুলোর তলায় তলায় ব্যথা হানি।
চটকা ভাঙে যেন খোঁচা খেয়ে—
কই আমাদের পাড়ার কালো মেয়ে—
ঝুড়ি ভ'রে মুড়ি আনত, আনত পাকা জাম,
সামান্য তার দাম,
ঘরের গাছের আম আনত কাঁচামিঠা,
আনির স্থলে দিতেম তাকে চার-আনিটা।
ওই যে অন্ধ কলুবুড়ির কান্না শুনি—
ক'দিন হল জানি নে কোন্ গোঁয়ার খুনি
সমথ তার নাতনিটিকে
কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন্ দিকে।
আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে,
যৌবন তার দ'লে গেছে, জীবন গেছে চুকে।
বুক-ফাটানো এমন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।
শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে—
'উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার' বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্‌ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।

শান্তিনিকেতন
২৮।৩।৩৯

তর্ক

নারীকে দিবেন বিধি পুরুষের অন্তরে মিলায়ে
সেই অভিপ্রায়ে
রচিলেন সূক্ষ্মশিল্পকারুময়ী কায়া—
তারি সঙ্গে মিলালেন অঙ্গের অতীত কোন্ মায়া
যারে নাহি যায় ধরা,
যাহা শুধু জাদুমন্ত্রে ভরা,
যাহারে অন্তরতম হৃদয়ের অদৃশ্য আলোকে
দেখা যায় ধ্যানাবিষ্ট চোখে,
ছন্দোজালে বাঁধে যার ছবি
না-পাওয়া বেদনা দিয়ে কবি।
যার ছায়া সুরে খেলা করে
চঞ্চল দিঘির জলে আলোর মতন থরথরে।
'নিশ্চিত পেয়েছি' ভেবে যারে
অবুঝ আঁকড়ি রাখে আপন ভোগের অধিকারে,
মাটির পাত্রটা নিয়ে বঞ্চিত সে অমৃতের স্বাদে,
ডুবায় সে ক্লান্তি-অবসাদে
সোনার প্রদীপ শিখা-নেভা।
দূর হতে অধরাকে পায় যে বা
চরিতার্থ করে সে'ই কাছের পাওয়ারে,
পূর্ণ করে তারে।

নারীস্তব শুনালেম। ছিল মনে আশা—
উচ্চতত্ত্বে-ভরা এই ভাষা
উৎসাহিত করে দেবে মন ললিতার,
পাব পুরস্কার।
হায় রে, দুর্গ্রহগুণে
কাব্য শুনে
ঝক্‌ঝকে হাসিখানি হেসে
কহিল সে, "তোমার এ কবিত্বের শেষে
বসিয়েছ মহোন্নত যে-কটা লাইন
আগাগোড়া সত্যহীন।
ওরা সব-কটা
বানানো কথার ঘটা,
সদরেতে যত বড়ো অন্দরেতে ততখানি ফাঁকি।
জানি না কি—
দূর হতে নিরামিষ সাত্ত্বিক মৃগয়া,
নাই পুরুষের হাড়ে অমায়িক বিশুদ্ধ এ দয়া।"
আমি শুধালেম, "আর, তোমাদের?"

সে কহিল, "আমাদের চারি দিকে শক্ত আছে ঘের
পরশ-বাঁচানো,
সে তুমি নিশ্চিত জান।"
আমি শুধালেম, "তার মানে ?"
সে কহিল, "আমরা পুষি না মোহ প্রাণে,
কেবল বিশুদ্ধ ভালোবাসি।"
কহিলাম হাসি,
"আমি যাহা বলেছিনু সে-কথাটা মস্ত বড়ো বটে,
কিন্তু তবু লাগে না সে তোমার এ স্পর্ধার নিকটে।
মোহ কি কিছুই নেই রমণীর প্রেমে।"
সে কহিল একটুকু থেমে,
"নেই বলিলেই হয়। এ কথা নিশ্চিত—
জোর করে বলিবই—
আমরা কাঙাল কভু নই।"
আমি কহিলাম, "ভদ্রে, তা হলে তো পুরুষের জিত।"
"কেন শুনি"
মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলিল তরুণী।
আমি কহিলাম, "যদি প্রেম হয় অমৃতকলস,
মোহ তবে রসনার রস।
সে সুধার পূর্ণ স্বাদ থেকে
মোহহীন রমণীরে প্রবঞ্চিত বলো করেছে কে।
আনন্দিত হই দেখে তোমার লাবণ্যভরা কায়া,
তাহার তো বারো-আনা আমারি অন্তরবাসী মায়া।
প্রেম আর মোহে
একেবারে বিরুদ্ধ কি দোঁহে।
আকাশের আলো
বিপরীতে-ভাগ-করা সে কি সাদা কালো।
ওই আলো আপনার পূর্ণতারে চূর্ণ করে
দিকে দিগন্তরে,
বর্ণে বর্ণে
তৃণে শস্যে পুষ্পে পর্ণে,
পাখির পাখায় আর আকাশের নীলে,
চোখ ভোলাবার মোহ মেলে দেয় সর্বত্র নিখিলে।
অভাব যেখানে এই মন-ভোলাবার
সেইখানে সৃষ্টিকর্তা বিধাতার হার।
এমন লজ্জার কথা বলিতেও নাই—
তোমরা ভোল না শুধু ভুলি আমরাই।
এই কথা স্পষ্ট দিনু কয়ে,
সৃষ্টি কভু নাহি ঘটে একেবারে বিশুদ্ধেরে লয়ে।
পূর্ণতা আপন কেন্দ্রে স্তব্ধ হয়ে থাকে,
কারেও কোথাও নাহি ডাকে।

অপূর্ণের সাথে দ্বন্দ্বে চাঞ্চল্যের শক্তি দেয় তারে,
রসে রূপে বিচিত্র আকারে।
এরে নাম দিয়ে মোহ
যে করে বিদ্রোহ
এড়ায়ে নদীর টান সে চাহে নদীরে,
পড়ে থাকে তীরে।
পুরুষ যে ভাবের বিলাসী,
মোহতরী বেয়ে তাই সুধাসাগরের প্রান্তে আসি
আভাসে দেখিতে পায় পরপারে অরূপের মায়া
অসীমের ছায়া।
অমৃতের পাত্র তার ভরে ওঠে কানায় কানায়
স্বল্প জানা ভূরি অজানায়।"

কোনো কথা নাহি ব'লে
সুন্দরী ফিরায়ে মুখ দ্রুত গেল চলে।
পরদিন বটের পাতায়
গুটিকত সদ্যফোটা বেলফুল রেখে গেল পায়।
বলে গেল, "ক্ষমা করো, অবুঝের মতো
মিছেমিছি বকেছিনু কত।"

ঢেলা আমি মেরেছিনু চৈত্রে-ফোটা কাঞ্চনের ডালে,
তারি প্রতিবাদে ফুল ঝরিল এ স্পর্ধিত কপালে।
নিয়ে এই বিবাদের দান
এ বসন্তে চৈত্র মোর হল অবসান।

[এপ্রিল ১৯৩৯]

ময়ূরের দৃষ্টি

দক্ষিণায়নের সূর্যোদয় আড়াল ক'রে
সকালে বসি চাতালে।
অনুকূল অবকাশ ;
তখনো নিরেট হয়ে ওঠে নি কাজের দাবি,
ঝুঁকে পড়ে নি লোকের ভিড়
পায়ে পায়ে সময় দলিত করে দিয়ে।
লিখতে বসি,
কাটা খেজুরের গুঁড়ির মতো
ছুটির সকাল কলমের ডগায় চুঁইয়ে দেয় কিছু রস।

আমাদের ময়ূর এসে পুচ্ছ নামিয়ে বসে
পাশের রেলিংটির উপর।
আমার এই আশ্রয় তার কাছে নিরাপদ,
এখানে আসে না তার বেদরদী শাসনকর্তা বাঁধন হাতে।
বাইরে ডালে ডালে কাঁচা আম পড়েছে ঝুলে,
নেবু ধরেছে নেবুর গাছে,
একটা একলা কুড়চিগাছ
আপনি আশ্চর্য আপন ফুলের বাড়াবাড়িতে।
প্রাণের নিরর্থক চাঞ্চল্যে
ময়ূরটি ঘাড় বাঁকায় এদিকে ওদিকে।
তার উদাসীন দৃষ্টি
কিছুমাত্র খেয়াল করে না আমার খাতা-লেখায় ;
করত, যদি অক্ষরগুলো হত পোকা ;
তা হলে নগণ্য মনে করত না কবিকে।
হাসি পেল ওর ওই গম্ভীর উপেক্ষায়,
ওরই দৃষ্টি দিয়ে দেখলুম আমার এই রচনা।
দেখলুম, ময়ূরের চোখের ঔদাসীন্য
সমস্ত নীল আকাশে,
কাঁচা-আম-ঝোলা গাছের পাতায় পাতায়,
তেঁতুলগাছের গুঞ্জনমুখর মৌচাকে।
ভাবলুম, মাহেন্দজারোতে
এইরকম চৈত্রশেষের অকেজো সকালে
কবি লিখেছিল কবিতা,
বিশ্বপ্রকৃতি তার কোনোই হিসাব রাখে নি।
কিন্তু, ময়ূর আজও আছে প্রাণের দেনাপাওনায়,
কাঁচা আম ঝুলে পড়েছে ডালে।
নীল আকাশ থেকে শুরু করে সবুজ পৃথিবী পর্যন্ত
কোথাও ওদের দাম যাবে না কমে।
আর, মাহেন্দজারোর কবিকে গ্রাহ্যই করলে না
পথের ধারের তৃণ, আঁধার রাত্রের জোনাকি।

নিরবধি কাল আর বিপুলা পৃথিবীতে
মেলে দিলাম চেতনাকে,
টেনে নিলেম প্রকৃতির ধ্যান থেকে বৃহৎ বৈরাগ্য
আপন মনে ;
খাতার অক্ষরগুলোকে দেখলুম
মহাকালের দেয়ালিতে
পোকার ঝাঁকের মতো।
ভাবলুম, আজ যদি ছিঁড়ে ফেলি পাতাগুলো
তা হলে পর্শুদিনের অন্ত্যসৎকার এগিয়ে রাখব মাত্র।

এমন সময় আওয়াজ এল কানে,
"দাদামশায়, কিছু লিখেছ না কি ।"
ওই এসেছে— ময়ূর না,
ঘরে যার নাম সুনয়নী,
আমি যাকে ডাকি শুনায়নী ব'লে ।
ওকে আমার কবিতা শোনাবার দাবি সকলের আগে ।
আমি বললেম, "সুরসিকে, খুশি হবে না,
এ গদ্যকাব্য ।"
কপালে ভ্রূকুঞ্চনের ঢেউ খেলিয়ে
বললে, "আচ্ছা, তাই সই ।"
সঙ্গে একটু স্তুতিবাক্য দিলে মিলিয়ে ;
বললে, "তোমার কণ্ঠস্বরে
গদ্যে রঙ ধরে পদ্যের ।"
ব'লে গলা ধরলে জড়িয়ে ।
আমি বললেম, "কবিত্বের রঙ লাগিয়ে নিচ্ছ
কবিকণ্ঠ থেকে তোমার বাহুতে ?"
সে বললে, "অকবির মতো হল তোমার কথাটা ;
কবিত্বের স্পর্শ লাগিয়ে দিলেম তোমারই কণ্ঠে,
হয়তো জাগিয়ে দিলেম গান ।"

শুনলুম নীরবে, খুশি হলুম নিরুত্তরে ।
মনে-মনে বললুম, প্রকৃতির ঔদাসীন্য অচল রয়েছে
অসংখ্য বর্ষকালের চূড়ায়,
তারই উপরে একবারমাত্র পা ফেলে চলে যাবে
আমার শুনায়নী,
ভোরবেলার শুকতারা ।
সেই ক্ষণিকের কাছে হার মানবে বিরাটকালের বৈরাগ্য ।

মাহেন্দজারোর কবি, তোমার সন্ধ্যাতারা
অস্তাচল পেরিয়ে
আজ উঠেছে আমার জীবনের
উদয়াচলশিখরে ।

[? শান্তিনিকেতন
এপ্রিল ১৯৩৯]

কাঁচা আম

তিনটে কাঁচা আম পড়ে ছিল গাছতলায়
চৈত্রমাসের সকালে মৃদু রোদ্‌দুরে।
যখন দেখলুম অস্থির ব্যগ্রতায়
হাত গেল না কুড়িয়ে নিতে।
তখন চা খেতে খেতে মনে ভাবলুম,
বদল হয়েছে পালের হাওয়া।
পুব দিকের খেয়ার ঘাট ঝাপসা হয়ে এল।
সেদিন গেছে যেদিন দৈবে-পাওয়া দুটি-একটি কাঁচা আম
ছিল আমার সোনার চাবি,
খুলে দিত সমস্ত দিনের খুশির গোপন কুঠুরি ;
আজ সে তালা নেই, চাবিও লাগে না।

গোড়াকার কথাটা বলি।
আমার বয়সে এ বাড়িতে যেদিন প্রথম আসছে বউ
পরের ঘর থেকে,
সেদিন যে-মনটা ছিল নোঙর-ফেলা নৌকো
বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় ক'রে।
জীবনের বাঁধা বরাদ্দ ছাপিয়ে দিয়ে
এল অদৃষ্টের বদান্যতা।
পুরোনো ছেঁড়া আটপৌরে দিনরাত্রিগুলো
খসে পড়ল সমস্ত বাড়িটা থেকে।
কদিন তিনবেলা রোশনচৌকিতে
চার দিকের প্রাত্যহিক ভাষা দিল বদলিয়ে ;
ঘরে ঘরে চলল আলোর গোলমাল
ঝাড়ে লণ্ঠনে।
অত্যন্ত পরিচিতের মাঝখানে
ফুটে উঠল অত্যন্ত আশ্চর্য।
কে এল রঙিন সাজে সজ্জায়,
আলতা-পরা পায়ে পায়ে—
ইঙ্গিত করল যে, সে এই সংসারের পরিমিত দামের মানুষ নয়—
সেদিন সে ছিল একলা অতুলনীয়।
বালকের দৃষ্টিতে এই প্রথম প্রকাশ পেল—
জগতে এমন কিছু যাকে দেখা যায় কিন্তু জানা যায় না।
বাঁশি থামল, বাণী থামল না—
আমাদের বধূ রইল
বিস্ময়ের অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে ঘেরা।

তার ভাব, তার আড়ি, তার খেলাধুলো ননদের সঙ্গে।
অনেক সংকোচে অল্প একটু কাছে যেতে চাই,
তার ডুরে শাড়িটি মনে ঘুরিয়ে দেয় আবর্ত ;

কিন্তু, ভ্রূকুটিতে বুঝতে দেরি হয় না, আমি ছেলেমানুষ,
আমি মেয়ে নই, আমি অন্য জাতের।
তার বয়স আমার চেয়ে দুই-এক মাসের
বড়োই হবে বা ছোটোই হবে।
তা হোক, কিন্তু এ কথা মানি,
আমরা ভিন্ন মসলায় তৈরি।
মন একান্তই চাইত, ওকে কিছু একটা দিয়ে
সাঁকো বানিয়ে নিতে।
একদিন এই হতভাগা কোথা থেকে পেল
কতকগুলো রঙিন পুঁথি ;
ভাবলে, চমক লাগিয়ে দেবে।
হেসে উঠল সে ; বলল,
"এগুলো নিয়ে করব কী।"
ইতিহাসের উপেক্ষিত এই-সব ট্র্যাজেডি
কোথাও দরদ পায় না,
লজ্জার ভারে বালকের সমস্ত দিনরাত্রির
দেয় মাথা হেঁট ক'রে।
কোন্ বিচারক বিচার করবে যে, মূল্য আছে
সেই পুঁথিগুলোর।

তবু এরই মধ্যে দেখা গেল, শস্তা খাজনা চলে
এমন দাবিও আছে ওই উচ্চাসনার—
সেখানে ওর পিঁড়ে পাতা মাটির কাছে।
ও ভালোবাসে কাঁচা আম খেতে
শুল্পো শাক আর লঙ্কা দিয়ে মিশিয়ে।
প্রসাদলাভের একটি ছোট্ট দরজা খোলা আছে
আমার মতো ছেলে আর ছেলেমানুষের জন্যেও।

গাছে চড়তে ছিল কড়া নিষেধ
হাওয়া দিলেই ছুটে যেতুম বাগানে,
দৈবে যদি পাওয়া যেত একটিমাত্র ফল
একটুখানি দুর্লভতার আড়াল থেকে,
দেখতুম, সে কী শ্যামল, কী নিটোল, কী সুন্দর,
প্রকৃতির সে কী আশ্চর্য দান।
যে লোভী চিরে চিরে ওকে খায়।
সে দেখতে পায় নি ওর অপরূপ রূপ।

একদিন শিলবৃষ্টির মধ্যে আম কুড়িয়ে এনেছিলুম ;
ও বলল, "কে বলেছে তোমাকে আনতে।"
আমি বললুম, "কেউ না।"
ঝুড়িসুদ্ধ মাটিতে ফেলে চলে গেলুম।

আর-একদিন মৌমাছিতে আমাকে দিলে কামড়ে ;
সে বললে, "এমন ক'রে ফল আনতে হবে না ।"
চুপ করে রইলুম ।

বয়স বেড়ে গেল ।
একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে ;
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল ।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে—
খুঁজে পাই নি ।
এখনো কাঁচা আম পড়ছে খসে খসে
গাছের তলায়, বছরের পর বছর ।
ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই ।

[? শান্তিনিকেতন]
৮।৪।৩৯

নবজাতক

রবীন্দ্রনাথ

উদয়ন
সেপ্টেম্বর ১৯৩৭

সত্যেন্দ্রনাথ বিশী
-কর্তৃক গৃহীত

সূচনা

আমার কাব্যের ঋতুপরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু-জোগান নতুন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চার দিকের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু তারা এই বিশিষ্টতা টের পায় স্বাদে। কোনো কোনো বনের মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রঙ হয় রাঙা; কোনো পাহাড়ি মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, সে শুভ্র; আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে।

কাব্যে এই-যে হাওয়াবদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাইরে থেকে সমজদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে। সম্প্রতি সেই সমজদারের সাড়া পেয়েছিলুম। আমার একশ্রেণীর কবিতার এই বিশিষ্টতা আমার স্নেহভাজন বন্ধু অমিয়চন্দ্রের দৃষ্টিতে পড়েছিল। ঠিক কী ভাবে তিনি এদের বিশ্লেষণ করে পৃথক করেছিলেন তা আমি বলতে পারি নে। হয়তো দেখেছিলেন, এরা বসন্তের ফুল নয়; এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তা হলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা। কিন্তু এ আলোচনা আমার পক্ষে সংগত নয়। আমি তাই নবজাতক গ্রন্থের কাব্যগ্রন্থনের ভার অমিয়চন্দ্রের উপরেই দিয়েছিলুম। নিশ্চিন্ত ছিলুম, কারণ দেশবিদেশের সাহিত্যে ব্যাপকক্ষেত্রে তাঁর সঞ্চরণ।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
৪ এপ্রিল ১৯৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবজাতক

নবজাতক

নবীন আগন্তুক,
নব যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।
কী বার্তা নিয়ে মর্তে এসেছ তুমি;
জীবনরঙ্গভূমি
তোমার লাগিয়া পাতিয়াছে কী আসন।
নরদেবতার পূজায় এনেছ
কী নব সম্ভাষণ।
অমরলোকের কী গান এসেছ শুনে।
তরুণ বীরের তূণে
কোন্ মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির 'পরে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রাম-তরে।
রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে
বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয়তো রচিবে মিলনতীর্থ
শান্তির বাঁধ বেঁধে।
কে বলিতে পারে তোমার ললাটে লিখা
কোন্ সাধনার অদৃশ্য জয়টিকা।
আজিকে তোমার অলিখিত নাম
আমরা বেড়াই খুঁজি—
আগামী প্রাতের শুকতারা-সম
নেপথ্যে আছে বুঝি।
মানবের শিশু বারে বারে আনে
চির আশ্বাসবাণী—
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝি-বা দিতেছে আনি।

শান্তিনিকেতন
১৯ অগস্ট ১৯৩৮

উদ্‌বোধন

প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে
প্রথম দিনের উষা নেমে এল যবে
প্রকাশপিয়াসি ধরিত্রী বনে বনে
শুধায়ে ফিরিল, সুর খুঁজে পাবে কবে।
এসো এসো সেই নব সৃষ্টির কবি।
নবজাগরণ-যুগপ্রভাতের রবি।
গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে
তরুণী উষার শিশিরস্নানের কালে,
আলো-আঁধারের আনন্দবিপ্লবে।

সে গান আজিও নানা রাগরাগিণীতে
শুনাও তাহারে আগমনীসংগীতে
যে জাগায় চোখে নূতন দেখার দেখা ;
যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে
বননীলিমার পেলব সীমানাটিতে,
বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা।
অবাক আলোর লিপি যে বহিয়া আনে
নিভৃত প্রহরে কবির চকিত প্রাণে,
নব পরিচয়ে বিরহব্যথা যে হানে
বিহ্বল প্রাতে সংগীতসৌরভে,
দূর-আকাশের অরুণিম উৎসবে।

যে জাগায় জাগে পূজার শঙ্খধ্বনি,
বনের ছায়ায় লাগায় পরশমণি,
যে জাগায় মোছে ধরার মনের কালি
মুক্ত করে সে পূর্ণ মাধুরী-ডালি।
জাগে সুন্দর, জাগে নির্মল, জাগে আনন্দময়ী—
জাগে জড়ত্বজয়ী।
জাগো সকলের সাথে
আজি এ সুপ্রভাতে,
বিশ্বজনের প্রাঙ্গণতলে লহো আপনার স্থান—
তোমার জীবনে সার্থক হোক
নিখিলের আহ্বান।

[কালিম্পং]
২৫ বৈশাখ ১৩৪৫

শেষদৃষ্টি

আজি এ আঁখির শেষদৃষ্টির দিনে
ফাগুনবেলার ফুলের খেলার
দানগুলি লব চিনে।
দেখা দিয়েছিল মুখর প্রহরে
দিনের দুয়ার খুলি,
তাদের আভায় আজি মিলে যায়
রাঙা গোধূলির শেষতূলিকায়
ক্ষণিকের রূপ-রচনলীলায়
সন্ধ্যার রঙগুলি।

যে অতিথিদেহে ভোরবেলাকার
রূপ নিল ভৈরবী,
অস্তরবির দেহলিদুয়ারে
বাঁশিতে আজিকে আঁকিল উহারে
মূলতান রাগে সুরের প্রতিমা
গেরুয়া রঙের ছবি।

খনে খনে যত মর্মভেদিনী
বেদনা পেয়েছে মন
নিয়ে সে দুঃখ ধীর আনন্দে
বিষাদকরুণ শিল্পছন্দে
অগোচর কবি করেছে রচনা
মাধুরী চিরন্তন।

একদা জীবনে সুখের শিহর
নিখিল করেছে প্রিয়।
মরণপরশে আজি কুণ্ঠিত,
অন্তরালে সে অবগুণ্ঠিত,
অদেখা আলোকে তাকে দেখা যায়
কী অনির্বচনীয়।

যা গিয়েছে তার অধরারূপের
অলখ পরশখানি
যা রয়েছে তারি তারে বাঁধে সুর,
দিক্‌সীমানার পারের সুদূর
কালের অতীত ভাষার অতীত
শুনায় দৈববাণী।

সেঁজুতি। শান্তিনিকেতন
১২ জানুয়ারি ১৯৪০

প্রায়শ্চিত্ত

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো—
নিম্নে নিবিড় অতিবর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।

দুঃসহ তাপে গর্জি উঠিল
ভূমিকম্পের রোল,
জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে
লাগিল ভীষণ দোল।
বিদীর্ণ হল ধনভাণ্ডারতল,
জাগিয়া উঠিছে গুপ্ত গুহা
কালীনাগিনীর দল।
দুলিছে বিকট ফণা,
বিষনিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা।

নিরর্থ হাহাকারে
দিয়ো না দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে।
পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের পাগলের হাতে
আগে হয়ে যাক ক্ষয়।
বিষম দুঃখে ব্রণের পিণ্ড
বিদীর্ণ হয়ে তার
কলুষপুঞ্জ ক'রে দিক উদ্গার।
ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা,
রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর
একদিন হবে ঢিলা।

প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে দুর্বলের দলিত পিষ্ট-প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুলবীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।

মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন—ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।

ওই দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।
দীনাত্মাদের বিশ্বাস, ওরা
ভীত প্রার্থনারবে
শান্তি আনিবে ভবে।
কৃপণ পূজায় দিবে নাকো কড়িকড়া।
থলিতে ঝুলিতে কষিয়া আঁটিবে
শত শত দড়িদড়া।
শুধু বাণীকৌশলে
জিনিবে ধরণীতলে।
স্তূপাকার লোভ
বক্ষে রাখিয়া জমা
কেবল শাস্ত্রমন্ত্র পড়িয়া
লবে বিধাতার ক্ষমা।

সবে না দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি ভক্তির।
যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণশক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।

বিজয়াদশমী
[১৭ আশ্বিন] ১৩৪৫

বুদ্ধভক্তি

জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধমন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকটদর্শন,
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির—
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

গর্জিয়া প্রার্থনা করে—
আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
আত্মীয়বন্ধন করি দিবে ছিন্ন,
গ্রামপল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন,
হানিবে শূন্য হতে বহ্নি-আঘাত,
বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ—
বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
দয়াময় বুদ্ধের কাছে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

হত-আহতের গনি সংখ্যা
তালে তালে মন্দ্রিত হবে জয়ডঙ্কা।
নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ,
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষবাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস—
মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

শান্তিনিকেতন
৭ জানুয়ারি ১৯৩৮

কেন

জ্যোতিষীরা বলে,
সবিতার আত্মদান-যজ্ঞের হোমাগ্নিবেদীতলে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্রতপে
এ বিশ্বের মন্দিরমণ্ডপে,
অতিতুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের 'পরে।
অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা
পথহারা,
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে অপার তিমির-তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে রশ্মিপ্লাবী নিরন্ত নির্ঝরে
সর্বত্যাগী অপব্যয়,
আপন সৃষ্টির 'পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়।
কিংবা এ কি মহাকাল কল্পকল্পান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান ক'রে ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে।
সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন—
কিন্তু, কেন।

তার পরে চেয়ে দেখি মানুষের চৈতন্যজগতে
ভেসে চলে সুখদুঃখ কল্পনাভাবনা কত পথে।
কোথাও বা জ্ব'লে ওঠে জীবন-উৎসাহ,
কোথাও বা সভ্যতার চিতাবহ্নিদাহ
নিভে আসে নিঃস্বতার ভস্ম-অবশেষে।
নির্ঝর ঝরিছে দেশে দেশে—
লক্ষ্যহীন প্রাণস্রোত মৃত্যুর গহ্বরে ঢালে মহী
বাসনার বেদনার অজস্র বুদ্‌বুদ্‌পুঞ্জ বহি।
কে তার হিসাব রাখে লিখি।
নিত্য নিত্য এমনি কি
অফুরান আত্মহত্যা মানবসৃষ্টির
নিরন্তর প্রলয়বৃষ্টির
অশ্রান্ত প্লাবনে।
নিরর্থক হরণে ভরণে
মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূতখেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—
কিন্তু, কেন।

প্রথম বয়সে কবে ভাবনার কী আঘাত লেগে
এ প্রশ্নই মনে উঠেছিল জেগে—

শুধায়েছি, এ বিশ্বের কোন্ কেন্দ্রস্থলে
মিলিতেছে প্রতি দণ্ডে পলে
অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের উল্লোল গর্জন,
ঝটিকার মন্দ্রস্বন,
দিবসনিশার
বেদনাবীণার তারে চেতনার মিশ্রিত ঝংকার,
পূর্ণ করি ঋতুর উৎসব
জীবনের মরণের নিত্যকলরব,
আলোকের নিঃশব্দ চরণপাত
নিয়ত স্পন্দিত করি দ্যুলোকের অন্তহীন রাত।
কল্পনায় দেখেছিনু, প্রতিধ্বনিমণ্ডল বিরাজে
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরকন্দর-মাঝে।
সেথা বাঁধে বাসা
চতুর্দিক হতে আসি জগতের পাখা-মেলা ভাষা।
সেথা হতে পুরানো স্মৃতিরে দীর্ণ করি
সৃষ্টির আরম্ভবীজ লয় ভরি ভরি
আপনার পক্ষপুটে ফিরে-চলা যত প্রতিধ্বনি।
অনুভব করেছি তখনি,
বহু যুগযুগান্তের কোন্ এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।

প্রশ্ন মনে আসে আরবার,
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার—
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয়পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার
ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন?
কিন্তু, কেন।

শান্তিনিকেতন
১২ অক্টোবর ১৯৩৮

হিন্দুস্থান

মোরে হিন্দুস্থান
বার বার করেছে আহ্বান
কোন্ শিশুকাল হতে পশ্চিমদিগন্ত-পানে,
ভারতের ভাগ্য যেথা নৃত্যলীলা করেছে শ্মশানে,
কালে কালে
তাণ্ডবের তালে তালে।

দিল্লিতে আগ্রাতে
মঞ্জীরঝংকার আর দূর শকুনির ধ্বনি-সাথে ;
কালের মন্থনদণ্ডঘাতে
উচ্ছলি উঠেছে যেথা পাথরের ফেনস্তূপে
অদৃষ্টের অট্টহাস্য অভ্রভেদী প্রাসাদের রূপে ।
লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর দুই বিপরীত পথে
রথে প্রতিরথে
ধূলিতে ধূলিতে যেথা পাকে পাকে করেছে রচনা
জটিল রেখার জালে শুভ-অশুভের আল্‌পনা ।
নব নব ধ্বজা হাতে নব নব সৈনিকবাহিনী
এক কাহিনীর সূত্র ছিন্ন করি আরেক কাহিনী
বারংবার গ্রন্থি দিয়ে করেছে যোজন ।
প্রাঙ্গণপ্রাচীর যার অকস্মাৎ করেছে লঙ্ঘন
দস্যুদল,
অর্ধরাত্রে দ্বার ভেঙে জাগিয়েছে আর্ত কোলাহল,
করেছে আসন-কাড়াকাড়ি,
ক্ষুধিতে অন্নথালি নিয়েছে উজাড়ি ।
রাত্রিরে ভুলিল তারা ঐশ্বর্যের মশাল-আলোয়—
পীড়িত পীড়নকারী দোঁহে মিলি সাদায় কালোয়
যেখানে রচিয়াছিল দ্যূতখেলাঘর,
অবশেষে সেথা আজ একমাত্র বিরাট কবর
প্রান্ত হতে প্রান্তে প্রসারিত ;
সেথা জয়ী আর পরাজিত
একত্রে করেছে অবসান
বহু শতাব্দীর যত মান অসম্মান ।
ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়া সেথা শীর্ণ যমুনায়
প্রেতের আহ্বান বহি চলে যায়,
বলে যায়—
আরো ছায়া ঘনাইছে অস্তদিগন্তের
জীর্ণ যুগান্তের ।

শান্তিনিকেতন
১৯ এপ্রিল ১৯৩৭

রাজপুতানা

এই ছবি রাজপুতানার ;
এ দেখি মৃত্যুর পৃষ্ঠে বেঁচে থাকিবার
দুর্বিষহ বোঝা ।
হতবুদ্ধি অতীতের এই যেন খোঁজা
পথভ্রষ্ট বর্তমানে অর্থ আপনার,
শূন্যেতে হারানো অধিকার ।

ওই তার গিরিদুর্গে অবরুদ্ধ নিরর্থ ভ্রূকুটি,
ওই তার জয়স্তম্ভ তোলে ক্রুদ্ধ মুঠি
বিরুদ্ধ ভাগ্যের পানে।
মৃত্যুতে করেছে গ্রাস তবুও যে মরিতে না জানে,
ভোগ করে অসম্মান অকালের হাতে
দিনে রাতে,
অসাড় অন্তরে
গ্লানি অনুভব নাহি করে,
আপনারি চাটুবাক্যে আপনারে ভুলায় আশ্বাসে—
জানে না সে,
পরিপূর্ণ কত শতাব্দীর পণ্যরথ
উত্তীর্ণ না হতে পথ
ভগ্নচক্র পড়ে আছে মরুর প্রান্তরে,
ম্রিয়মাণ আলোকের প্রহরে প্রহরে
বেড়িয়াছে অন্ধ বিভাবরী
নাগপাশে ; ভাষাভোলা ধূলির করুণা লাভ করি
একমাত্র শান্তি তাহাদের।
লঙ্ঘন যে করে নাই ভোলামনে কালের বাঁধের
অন্তিম নিষেধসীমা—
ভগ্নস্তূপে থাকে তার নামহীন প্রচ্ছন্ন মহিমা ;
জেগে থাকে কল্পনার ভিতে
ইতিবৃত্তহারা তার ইতিহাস উদার ইঙ্গিতে।
কিন্তু এ নির্লজ্জ কারা। কালের উপেক্ষাদৃষ্টি-কাছে
না থেকেও তবু আছে।
একি আত্মবিস্মরণমোহ,
বীর্যহীন ভিত্তি-'পরে কেন রচে শূন্য সমারোহ।
রাজ্যহীন সিংহাসনে অত্যুক্তির রাজা,
বিধাতার সাজা।

হোথা যারা মাটি করে চাষ
রৌদ্রবৃষ্টি শিরে ধরি বারো মাস,
ওরা কভু আধামিথ্যা রূপে
সত্যেরে তো হানে না বিদ্রূপে।
ওরা আছে নিজ স্থান পেয়ে ;
দারিদ্র্যের মূল্য বেশি লুপ্তমূল্য ঐশ্বর্যের চেয়ে।

এ দিকে চাহিয়া দেখো টিটাগড়।
লোষ্ট্রে লৌহে বন্দী হেথা কালবৈশাখীর পণ্যঝড়।
বণিকের দম্ভে নাই বাধা,
আসমুদ্র পৃথ্বীতলে দৃপ্ত তার অক্ষুণ্ণ মর্যাদা।
প্রয়োজন নাহি জানে ওরা।
ভূষণে সাজায়ে হাতিঘোড়া

সম্মানের ভান করিবার,
ভুলাইতে ছদ্মবেশী সমুচ্চ তুচ্ছতা আপনার।
শেষের পঙ্‌ক্তিতে যবে থামিবে ওদের ভাগ্যলিখা,
নামিবে অন্তিম যবনিকা,
উত্তাল রজতপিণ্ড-উদ্ধারের শেষ হবে পালা,
যন্ত্রের কিঙ্করগুলো নিয়ে ভস্মডালা
লুপ্ত হবে নেপথ্যে যখন,
পশ্চাতে যাবে না রেখে প্রেতের প্রগল্‌ভ প্রহসন।

উদাত্ত যুগের রথে বল্গাধরা সে রাজপুতানা
মরুপ্রস্তরের স্তরে একদিন দিল মুষ্টি হানা ;
তুলিল উদ্ভেদ করি কলোল্লোলে মহা-ইতিহাস
প্রাণে উচ্ছ্বসিত, মৃত্যুতে ফেনিল ; তারি তপ্তশ্বাস
স্পর্শ দেয় মনে, রক্ত উঠে আবর্তিয়া বুকে—
সে যুগের সুদূর সম্মুখে
স্তব্ধ হয়ে ভুলি এই কৃপণ কালের দৈন্যপাশে
জর্জরিত, নতশির অদৃষ্টের অট্টহাসে,
গলবদ্ধ পশুশ্রেণীসম চলে দিন পরে দিন
লজ্জাহীন।
জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব-মাঝে
সেদিন যে দুন্দুভি মন্দ্রিয়াছিল তার প্রতিধ্বনি বাজে
প্রাণের কুহরে গুমরিয়া। নির্ভয় দুর্দান্ত খেলা,
মনে হয়, সেই তো সহজ, দূরে নিক্ষেপিয়া ফেলা
আপনারে নিঃসংশয় নিষ্ঠুর সংকটে। তুচ্ছ প্রাণ
নহে তো সহজ ; মৃত্যুর বেদীতে যার কোনো দান
নাই কোনো কালে সেই তো দুর্ভর অতি;
আপনার সঙ্গে নিত্য বাল্যপনা দুঃসহ দুর্গতি।
প্রচণ্ড সত্যেরে ভেঙে গল্পে রচে অলস কল্পনা
নিষ্কর্মার স্বাদু উত্তেজনা,
নাট্যমঞ্চে ব্যঙ্গ করি বীরসাজে
তারস্বর আস্ফালনে উন্মত্ততা করে কোন্ লাজে।
তাই ভাবি হে রাজপুতানা,
কেন তুমি মানিলে না যথাকালে প্রলয়ের মানা,
লভিলে না বিনষ্টির শেষ স্বর্গলোক ;
জনতার চোখ
দীপ্তিহীন
কৌতুকের দৃষ্টিপাতে পলে পলে করে যে মলিন।
শঙ্করের তৃতীয় নয়ন হতে
সম্মান নিলে না কেন যুগান্তের বহ্নির আলোতে।

মংপু
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

ভাগ্যরাজ্য

আমার এ ভাগ্যরাজ্যে পুরানো কালের যে প্রদেশ.
আয়ুহারাদের ভগ্নশেষ
সেথা পড়ে আছে
পূর্বদিগন্তের কাছে ।
নিঃশেষ করেছে মূল্য সংসারের হাটে,
অনাবশ্যকের ভাঙা ঘাটে
জীর্ণ দিন কাটাইছে তারা
অর্থহারা ।
ভগ্নগৃহে লগ্ন ওই অর্ধেক প্রাচীর ;
আশাহীন পূর্ব আসক্তির
কাঙাল শিকড়জাল
বৃথা আঁকড়িয়া ধরে প্রাণপণে বর্তমান কাল ।
আকাশে তাকায় শিলালেখ,
তাহার প্রত্যেক
অস্পষ্ট অক্ষর আজ পাশের অক্ষরে
ক্লান্ত সুরে প্রশ্ন করে,
"আরো কি রয়েছে বাকি কোনো কথা,
শেষ হয়ে যায় নি বারতা ।"

এ আমার ভাগ্যরাজ্যে অন্যত্র হোথায় দিগন্তরে
অসংলগ্ন ভিত্তি-'পরে
করে আছে চুপ
অসমাপ্ত আকাঙক্ষার অসম্পূর্ণ রূপ ।
অকথিত বাণীর ইঙ্গিতে
চারি ভিতে
নীরবতা-উৎকণ্ঠিত মুখ
রয়েছে উৎসুক ।
একদা যে যাত্রীদের সংকল্পে ঘটেছে অপঘাত,
অন্য পথে গেছে অকস্মাৎ,
তাদের চকিত আশা,
স্থকিত চলার স্তব্ধ ভাষা
জানায়, হয় নি চলা সারা—
দুরাশার দূরতীর্থ আজো নিত্য করিছে ইশারা ।
আজিও কালের সভা-মাঝে
তাদের প্রথম সাজে
পড়ে নাই জীর্ণতার দাগ,
লক্ষ্যচ্যুত কামনায় রয়েছে আদিম রক্তরাগ ।
কিছু শেষ করা হয় নাই,
হেরো, তাই

সময় যে পেল না নবীন
কোনোদিন
পুরাতন হতে—
শৈবালে ঢাকে নি তারে বাঁধা-পড়া ঘাটে-লাগা স্রোতে ;
স্মৃতির বেদনা কিছু, কিছু পরিতাপ,
কিছু অপ্রাপ্তির অভিশাপ
তারে নিত্য রেখেছে উজ্জ্বল ;
না দেয় নীরস হতে মজ্জাগত গুপ্ত অশ্রুজল ।
যাত্রাপথ-পাশে
আছ তুমি আধো-ঢাকা ঘাসে—
পাথরে খুদিতেছিনু, হে মূর্তি, তোমারে কোন্ ক্ষণে
কিসের কল্পনে ।
অপূর্ণ তোমার কাছে পাই না উত্তর ।
মনে যে কী ছিল মোর
যেদিন ফুটিত তাহা শিল্পের সম্পূর্ণ সাধনাতে
শেষ-রেখাপাতে,
সেদিন তা জানিতাম আমি ;
তার আগে চেষ্টা গেছে থামি ।
সেই শেষ না-জানার
নিত্য-নিরুত্তরখানি মর্ম-মাঝে রয়েছে আমার
স্বপ্নে তার প্রতিবিম্ব ফেলি
সচকিত আলোকের কটাক্ষে সে করিতেছে কেলি ।

আলমোড়া
১৬ মে ১৯৩৭

ভূমিকম্প

হায় ধরিত্রী, তোমার আঁধার পাতালদেশে
অন্ধ রিপু লুকিয়ে ছিল ছদ্মবেশে—
সোনার পুঞ্জ যেথায় রাখো,
আঁচলতলে যেথায় ঢাকো
কঠিন লৌহ, মৃত্যুদূতের চরণধূলির
পিণ্ড তারা, খেলা জোগায়
যমালয়ের ডাণ্ডাগুলির ।

উপর তলায় হাওয়ার দোলায় নবীন ধানে
ধানশ্রীসুর মূর্ছনা দেয় সবুজ গানে ।
দুঃখে সুখে স্নেহে প্রেমে
স্বর্গ আসে মর্তে নেমে,

ঋতুর ডালি ফুল-ফসলের অর্ঘ্য বিলায়,
ওড়না রাঙে ধূপছায়াতে
প্রাণনটিনীর নৃত্যলীলায়।

অন্তরে তোর গুপ্ত যে পাপ রাখলি চেপে
তার ঢাকা আজ স্তরে স্তরে উঠল কেঁপে।
যে বিশ্বাসের আবাসখানি
ধ্রুব বলেই সবাই জানি
এক নিমেষে মিশিয়ে দিলি ধূলির সাথে,
প্রাণের দারুণ অবমানন
ঘটিয়ে দিলি জড়ের হাতে।

বিপুল প্রতাপ থাক্-না যতই বাহির দিকে
কেবল সেটা স্পর্ধাবলে রয় না টিকে।
দুর্বলতা কুটিল হেসে
ফাটল ধরায় তলায় এসে—
হঠাৎ কখন দিগ্‌ব্যাপিনী কীর্তি যত
দর্পহারীর অট্টহাস্যে
যায় মিলিয়ে স্বপ্নমত।

হে ধরণী, এই ইতিহাস সহস্রবার
যুগে যুগে উদ্‌ঘাটিলে সামনে সবার।
জাগল দম্ভ বিরাট রূপে,
মজ্জায় তার চুপে চুপে
লাগল রিপুর অলক্ষ্য বিষ সর্বনাশা—
রূপক নাট্যে ব্যাখ্যা তারি
দিয়েছ আজ ভীষণ ভাষায়।

যে যথার্থ শক্তি সে তো শান্তিময়ী,
সৌম্য তাহার কল্যাণরূপ বিশ্বজয়ী।
অশক্তি তার আসন পেতে
ছিল তোমার অন্তরেতে—
সেই তো ভীষণ, নিষ্ঠুর তার বীভৎসতা,
নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠাহীন
তাই সে এমন হিংসারতা।

৬ চৈত্র ১৩৪০

পক্ষীমানব

যন্ত্রদানব, মানবে করিলে পাখি ।
স্থল জল যত তার পদানত
আকাশ আছিল বাকি ।

বিধাতার দান পাখিদের ডানাদুটি—
রঙের রেখায় চিত্রলেখায়
আনন্দ উঠে ফুটি ;
তারা যে রঙিন পান্থ মেঘের সাথি ।
নীল গগনের মহাপবনের
যেন তারা একজাতি ।
তাহাদের লীলা বায়ুর ছন্দে বাঁধা ;
তাহাদের প্রাণ, তাহাদের গান
আকাশের সুরে সাধা ;
তাই প্রতিদিন ধরণীর বনে বনে
আলোক জাগিলে একতানে মিলে
তাহাদের জাগরণে ।
মহাকাশতলে যে মহাশান্তি আছে
তাহাতে লহরী কাঁপে থরথরি
তাদের পাখার নাচে ।

যুগে যুগে তারা গগনের পথে পথে
জীবনের বাণী দিয়েছিল আনি
অরণ্যে পর্বতে ;
আজি একি হল, অর্থ কে তার জানে ।
স্পর্ধা-পতাকা মেলিয়াছে পাখা
শক্তির অভিমানে ।
তারে প্রাণদেব করে নি আশীর্বাদ ।
তাহারে আপন করে নি তপন,
মানে নি তাহারে চাঁদ ।
আকাশের সাথে অমিল প্রচার করি
কর্কশ স্বরে গর্জন করে
বাতাসেরে জর্জরি ।
আজি মানুষের কলুষিত ইতিহাসে
উঠি মেঘলোকে স্বর্গ-আলোকে
হানিছে অট্টহাসে ।
যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে—
অশান্তি আজ উদ্যত বাজ
কোথাও না বাধা মানে ;

ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
জাগাইল বিভীষিকা।
দেবতা যেথায় পাতিবে আসনখানি
যদি তার ঠাঁই কোনোখানে নাই
তবে, হে বজ্রপাণি,
এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে।

আর্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন—
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি
সার্থক হোক পুন।

২৫ ফাল্গুন ১৩৩৮

আহ্বান

কানাডার প্রতি

বিশ্ব জুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে
অন্ধবেগে ঝঞ্ঝাবায়ু হুংকারিয়া আসে,
ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া।
ধর্ম আজি সংশয়েতে নত,
যুগ-যুগের তাপসদের সাধনধন যত
দানবপদদলনে হল গুঁড়া।
তোমরা এসো তরুণ জাতি সবে
মুক্তিরণ-ঘোষণাবাণী জাগাও বীররবে।
তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু।
রক্তে-রাঙা ভাঙন-ধরা পথে
দুর্গমেরে পেরোতে হবে বিঘ্নজয়ী রথে,
পরান দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।
ত্রাসের পদাঘাতের তাড়নায়
অসম্মান নিয়ো না শিরে, ভুলো না আপনায়।
মিথ্যা দিয়ে, চাতুরী দিয়ে, রচিয়া গুহাবাস
পৌরুষেরে কোরো না পরিহাস
বাঁচাতে নিজ প্রাণ
বলীর পদে দুর্বলেরে কোরো না বলিদান।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
১ এপ্রিল ১৯৩৯

রাতের গাড়ি

এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি,
দিল পাড়ি—
কামরায় গাড়িভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।
অসীম আঁধারে
কালি-লেপা কিছু-নয় মনে হয় যারে
নিদ্রার পারে রয়েছে সে
পরিচয়হারা দেশে।
ক্ষণ-আলো ইঙ্গিতে উঠে ঝলি,
পার হয়ে যায় চলি
অজানার পরে অজানায়,
অদৃশ্য ঠিকানায়।
অতিদূর-তীর্থের যাত্রী,
ভাষাহীন রাত্রি,
দূরের কোথা যে শেষ
ভাবিয়া না পাই উদ্দেশ।
চালায় যে নাম নাহি কয়;
কেউ বলে, যন্ত্র সে, আর-কিছু নয়।
মনোহীন বলে তারে, তবু অন্ধের হাতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে, সে অনিশ্চিত, তবু জানে অতি
নিশ্চিত তার গতি।
নামহীন যে অচেনা বার বার পার হয়ে যায়
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়,
তারি যেন বহে নিশ্বাস,
সন্দেহ-আড়ালেতে-মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে,
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে।
ঘুমের ভিতরে থাকে অচেতনে
কোন্ দূর প্রভাতের প্রত্যাশা নিদ্রিত মনে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২৮ মার্চ ১৯৪০

মৌলানা জিয়াউদ্দীন

কখনো কখনো কোনো অবসরে
নিকটে দাঁড়াতে এসে ;
'এই যে' বলেই তাকাতেম মুখে,
'বোসো' বলিতাম হেসে ।
দু-চারটে হত সামান্য কথা,
ঘরের প্রশ্ন কিছু,
গভীর হৃদয় নীরবে রহিত
হাসি-তামাশার পিছু ।
কত সে গভীর প্রেম সুনিবিড়,
অকথিত কত বাণী,
চিরকাল-তরে গিয়েছ যখন
আজিকে সে কথা জানি ।
প্রতি দিবসের তুচ্ছ খেয়ালে
সামান্য যাওয়া-আসা,
সেটুকু হারালে কতখানি যায়
খুঁজে নাহি পাই ভাষা ।

তব জীবনের বহু সাধনার
যে পণ্যভার ভরি
মধ্যদিনের বাতাসে ভাসালে
তোমার নবীন তরী,
যেমনই তা হোক মনে জানি তার
এতটা মূল্য নাই
যার বিনিময়ে পাবে তব স্মৃতি
আপন নিত্য ঠাঁই—
সেই কথা স্মরি বার বার আজ
লাগে ধিক্‌কার প্রাণে—
অজানা জনের পরম মূল্য
নাই কি গো কোনোখানে ।
এ অবহেলার বেদনা বোঝাতে
কোথা হতে খুঁজে আনি
ছুরির আঘাত যেমন সহজ
তেমন সহজ বাণী ।
কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব,
কারো অর্থের খ্যাতি—
কেহ-বা প্রজার সুহৃদ সহায়,
কেহ-বা রাজার জ্ঞাতি—
তুমি আপনার বন্ধুজনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া,

ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সৌরভে অঙ্গুল খ্যাতির বাড়া।
ভরা আষাঢ়ের যে মালতীগুলি
আনন্দমহিমায়
আপনার দান নিঃশেষ করি
ধুলায় মিলায়ে যায়—
আকাশে আকাশে বাতাসে তাহারা
আমাদের চারি পাশে
তোমার বিরহ ছড়ায়ে চলেছে
সৌরভনিশ্বাসে।

শান্তিনিকেতন
৮ জুলাই ১৯৩৮

অস্পষ্ট

আজি ফাল্গুনে দোলপূর্ণিমারাত্রি,
উপছায়া-চলা বনে বনে মন
আবছা পথের যাত্রী।
ঘুম-ভাঙানিয়া জোছনা—
কোথা থেকে যেন আকাশে কে বলে,
'একটুকু কাছে বোসো না।'
ফিস্‌ফিস্‌ করে পাতায় পাতায়,
উস্‌খুস্‌ করে হাওয়া।
ছায়ার আড়ালে গন্ধরাজের
তন্দ্রাজড়িত চাওয়া।
চন্দনিদহে থৈ থৈ জল
ঝিক্ ঝিক্ করে আলোতে,
জামরুলগাছে ফুল-কাটা কাজে
বুনুনি সাদায় কালোতে।
প্রহরে প্রহরে রাজার ফটকে
বহু দূরে বাজে ঘণ্টা।
জেগে উঠে বসে ঠিকানা-হারানো
শূন্য-উধাও মনটা।
বুঝিতে পারি নে কত কী শব্দ—
মনে হয় যেন ধারণা,
রাতের বুকের ভিতরে কে করে
অদৃশ্য পদচারণা।
গাছগুলো সব ঘুমে ডুবে আছে,
তন্দ্রা তারায় তারায়,

কাছের পৃথিবী স্বপ্নপ্লাবনে
দূরের প্রান্তে হারায় ।
রাতের পৃথিবী ভেসে উঠিয়াছে
বিধির নিশ্চেতনায়,
আভাস আপন ভাষার পরশ
খোঁজে সেই আনমনায় ।
রক্তের দোলে যে-সব বেদনা
স্পষ্ট বোধের বাহিরে
ভাবনাপ্রবাহে বুদ্‌বুদ্‌ তারা
স্থির পরিচয় নাহি রে ।
প্রভাত-আলোক আকাশে আকাশে
এ চিত্র দিবে মুছিয়া,
পরিহাসে তার অবচেতনার
বঞ্চনা যাবে ঘুচিয়া ।
চেতনার জালে এ মহাগহনে
বস্তু যা-কিছু টিকিবে,
সৃষ্টি তারেই স্বীকার করিয়া
স্বাক্ষর তাহে লিখিবে ।
তবু কিছু মোহ, কিছু কিছু ভুল
জাগ্রত সেই প্রাপণার
প্রাণতন্তুতে রেখায় রেখায়
রঙ রেখে যাবে আপনার ।
এ জীবনে তাই রাত্রির দান
দিনের রচনা জড়ায়ে ।
চিন্তা কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব
রয়েছে ছড়ায়ে ছড়ায়ে ।
বুদ্ধি যাহারে মিছে বলে হাসে
সে যে সত্যের মূলে
আপন গোপন রসসঞ্চারে
ভরিছে ফসলে ফুলে ।
অর্থ পেরিয়ে নিরর্থ এসে
ফেলিছে রঙিন ছায়া—
বাস্তব যত শিকল গড়িছে,
খেলেনা গড়িছে মায়া ।

উদয়ন । শান্তিনিকেতন
২৭ মার্চ ১৯৪০

এপারে-ওপারে

রাস্তার ওপারে
বাড়িগুলো ঘেঁষাঘেঁষি সারে সারে।
ওখানে সবাই আছে
ক্ষীণ যত আড়ালের আড়ে-আড়ে কাছে-কাছে।
যা-খুশি প্রসঙ্গ নিয়ে
ইনিয়ে-বিনিয়ে
নানা কণ্ঠে বকে যায় কলস্বরে।
অকারণে হাত ধরে ;
যে যাহারে চেনে
পিঠেতে চাপড় দিয়ে নিয়ে যায় টেনে
লক্ষ্যহীন অলিতে গলিতে,
কথা-কাটাকাটি চলে, গলাগলি চলিতে চলিতে।
বৃথাই কুশলবার্তা জানিবার ছলে
প্রশ্ন করে বিনা কৌতূহলে।
পরস্পরে দেখা হয়,
বাঁধা ঠাট্টা করে বিনিময়।
কোথা হতে অকস্মাৎ ঘরে ঢুকে
হেসে ওঠে অহেতু কৌতুকে।
'আনন্দবাজার' হতে সংবাদ-উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে ঘেঁটে
ছুটির মধ্যাহ্নবেলা বিষম বিতর্কে যায় কেটে।
সিনেমা-নটীর ছবি নিয়ে দুই দলে
রূপের তুলনা-দ্বন্দ্ব চলে,
উত্তাপ প্রবল হয় শেষে
বন্ধুবিচ্ছেদের কাছে এসে।
পথপ্রান্তে দ্বারের সম্মুখে বসি
ফেরিওয়ালাদের সাথে হুঁকো-হাতে দর-কষাকষি।
একই সুরে দম দিয়ে বার বার
গ্রামোফোনে চেষ্টা চলে থিয়েটরি গান শিখিবার।
কোথাও কুকুরছানা ঘেউ-ঘেউ আদরের ডাকে
চমক লাগায় বাড়িটাকে।
শিশু কাঁদে মেঝে মাথা হানি,
সাথে চলে গৃহিণীর অসহিষ্ণু তীব্র ধমকানি।
তাস-পিটোনির শব্দ, নিয়ে জিত হার
থেকে থেকে বিষম চীৎকার।
যেদিন ট্যাক্সিতে চ'ড়ে জামাই উদয় হয় আসি
মেয়েতে মেয়েতে হাসাহাসি,
টেপাটেপি, কানাকানি,
অঙ্গরাগে লাজুকেরে সাজিয়ে দেবার টানাটানি।

দেউড়িতে ছাতে বারান্দায়
নানাবিধ আনাগোনা ক্ষণে ক্ষণে ছায়া ফেলে যায়।

হেথা দ্বার বন্ধ হয় হোথা দ্বার খোলে,
দড়িতে গামছা ধুতি ফর্‌ফর্‌ শব্দ করি ঝোলে।
অনির্দিষ্ট ধ্বনি চারি পাশে
দিনে রাত্রে কাজের আভাসে।
উঠোনে অনবধানে-খুলে-রাখা কলে
জল বহে যায় কলকলে ;
সিঁড়িতে আসিতে যেতে
রাত্রিদিন পথ স্যাঁৎসেঁতে।
বেলা হলে ওঠে ঝনঝনি
বাসন মাজার ধ্বনি।
বেড়ি হাতা খুন্তি রান্নাঘরে
ঘর-করনার সুরে ঝংকার জাগায় পরস্পরে।
কড়ায় সরষের তেল চিড়্‌বিড়্‌ ফোটে,
তারি মধ্যে কইমাছ অকস্মাৎ ছ্যাঁক্‌ করে ওঠে।
বন্দেমাতরম্‌-পেড়ে শাড়ি নিয়ে তাঁতি বউ ডাকে
বউমাকে।
খেলার ট্রাইসিকেলে
ছড়্‌ছড়্‌ খড়্‌খড়্‌ আঙিনায় ঘোরে কার ছেলে।
যাদের উদয় অস্ত আপিসের দিক্‌চক্রবালে
তাদের গৃহিণীদের সকালে বিকালে
দিন পরে দিন যায়
দুইবার জোয়ার-ভাঁটায়
ছুটি আর কাজে।
হোথা পড়া-মুখস্থের একঘেয়ে অশ্রান্ত আওয়াজে
ধৈর্য হারাইছে পাড়া,
এগ্‌জামিনেশনে দেয় তাড়া।

প্রাণের প্রবাহে ভেসে
বিবিধ ভঙ্গিতে ওরা মেশে।
চেনা ও অচেনা
লঘু আলাপের ফেনা
আবর্তিয়া তোলে
দেখাশোনা আনাগোনা গতির হিল্লোলে।

রাস্তার এপারে আমি নিঃশব্দ দুপুরে
জীবনের তথ্য যত ফেলে রেখে দূরে
জীবনের তত্ত্ব যত খুঁজি
নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গে যুঝি,
সারাদিন চলেছে সন্ধান
দুরূহের ব্যর্থ সমাধান।

মনের ধূসর কূলে
প্রাণের জোয়ার মোরে একদিন দিয়ে গেছে তুলে।
চারি দিকে তীক্ষ্ণ আলো ঝক্‌ঝক্‌ করে
রিক্তরস উদ্দীপ্ত প্রহরে।
ভাবি এই কথা—
ওইখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা,
এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে
নানা শব্দ নানা রূপ জাগিয়ে তুলিছে দিনরাতে।
কিছু তার টেঁকে নাকো দীর্ঘকাল,
মাটিগড়া মৃদঙ্গের তাল
ছন্দটারে তার
বদল করিছে বারংবার।
তারি ধাক্কা পেয়ে মন
ক্ষণেক্ষণ
ব্যগ্র হয়ে ওঠে জাগি
সর্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের লাগি।
আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।

পুরী
২০ বৈশাখ ১৩৪৬

মংপু পাহাড়ে

কুজ্‌ঝটিজাল যেই
সরে গেল মংপু'র।
নীল শৈলের গায়ে
দেখা দিল রঙপুর।
বহুকেলে জাদুকর, খেলা বহুদিন তার,
আর কোনো দায় নেই, লেশ নেই চিন্তার।
দূর বৎসর-পানে ধ্যানে চাই যদ্‌দূর
দেখি লুকোচুরি খেলে মেঘ আর রোদ্‌দুর।
কত রাজা এল গেল, ম'ল এরই মধ্যে,
লড়েছিল বীর, কবি লিখেছিল পদ্যে।
কত মাথা-কাটাকাটি সভ্যে অসভ্যে,
কত মাথা-ফাটাফাটি সনাতনে নব্যে।
ওই গাছ চিরদিন যেন শিশু মস্ত,
সূর্য-উদয় দেখে, দেখে তার অস্ত।
ওই ঢালু গিরিমালা, রুক্ষ ও বন্ধ্যা,
দিন গেলে ওরই 'পরে জপ করে সন্ধ্যা।
নীচে রেখা দেখা যায় ওই নদী তিস্তার,
কঠোরের স্বপ্নে ও মধুরের বিস্তার।

হেনকালে একদিন বৈশাখী গ্রীষ্মে
টানাপাখা-চলা সেই সেকালের বিশ্বে
রবিঠাকুরের দেখা সেইদিন মাত্তর,
আজি তো বয়স তার কেবল আটাত্তর—
সাতের পিঠের কাছে একফোঁটা শূন্য,
শত শত বরষের ওদের তারুণ্য।
ছোটো আয়ু মানুষের, তবু একি কাণ্ড,
এটুকু সীমায় গড়া মনোব্রহ্মাণ্ড—
কত সুখে দুখে গাঁথা, ইষ্টে অনিষ্টে,
সুন্দরে কুৎসিতে, তিক্তে ও মিষ্টে,
কত গৃহ-উৎসবে, কত সভাসজ্জায়,
কত রসে মজ্জিত অস্থি ও মজ্জায়,
ভাষার-নাগাল-ছাড়া কত উপলব্ধি,
ধেয়ানের মন্দিরে আছে তার স্তব্ধি।
অবশেষে একদিন বন্ধন খণ্ডি
অজানা অদৃষ্টের অদৃশ্য গণ্ডি
অন্তিম নিমেষেই হবে উত্তীর্ণ।
তখনি অকস্মাৎ হবে কি বিদীর্ণ
এত রেখা এত রঙে গড়া এই সৃষ্টি,
এত মধু-অঞ্জনে রঞ্জিত দৃষ্টি।
বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য
নিজেরই তবিল-ভাঙা হয় তার কার্য,
নিমেষেই নিঃশেষ করি ভরা পাত্র
বেদনা না যদি তার লাগে কিছুমাত্র,
আমারই কী লোকসান যদি হই শূন্য—
শেষ ক্ষয় হলে কারে কে করিবে ক্ষুণ্ন।
এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য,
মরণে হারানোটা তো নহে তার তুল্য।
রবিঠাকুরের পালা শেষ হবে সদ্য,
তখনো তো হেথা এক অখণ্ড অদ্য
জাগ্রত রবে চির-দিবসের জন্যে
এই গিরিতটে, এই নীলিম অরণ্যে।
তখনো চলিবে খেলা নাই যার যুক্তি—
বার বার ঢাকা দেওয়া, বার বার মুক্তি।
তখনো এ বিধাতার সুন্দর ভ্রান্তি—
উদাসীন এ আকাশে এ মোহন কান্তি।

মংপু
১০ জুন ১৯৩৮

ইস্টেশন

সকাল বিকাল ইস্টেশনে আসি,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাসি।
ব্যস্ত হয়ে ওরা টিকিট কেনে,
ভাঁটির ট্রেনে কেউ-বা চড়ে
কেউ-বা উজান ট্রেনে।
সকাল থেকে কেউ-বা থাকে বসে,
কেউ-বা গাড়ি ফেল্ করে তার
শেষ-মিনিটের দোষে।

দিনরাত গড়্‌গড়্ ঘড়্‌ঘড়্
গাড়িভরা মানুষের ছোটে ঝড়।
ঘন ঘন গতি তার ঘুরবে
কভু পশ্চিমে, কভু পূর্বে।

চলচ্ছবির এই-যে মূর্তিখানি
মনেতে দেয় আনি
নিত্য-মেলার নিত্য-ভোলার ভাষা—
কেবল যাওয়া-আসা।
মঞ্চতলে দণ্ডে পলে
ভিড় জমা হয় কত—
পতাকাটা দেয় দুলিয়ে,
কে কোথা হয় গত।
এর পিছনে সুখদুঃখ-
ক্ষতিলাভের তাড়া
দেয় সবলে নাড়া।

সময়ের ঘড়িধরা অঙ্কেতে
ভোঁ ভোঁ ক'রে বাঁশি বাজে সংকেতে।
দেরি নাহি সয় কারো কিছুতেই—
কেহ যায়, কেহ থাকে পিছুতেই।

ওদের চলা ওদের পড়ে-থাকায়
আর কিছু নেই, ছবির পরে
কেবল ছবি আঁকায়।
খানিকক্ষণ যা চোখে পড়ে
তার পরে যায় মুছে,
আত্ম-অবহেলার খেলা
নিত্যই যায় ঘুচে।
ছেঁড়া পটের টুকরো জমে
পথের প্রান্ত জুড়ে,

তপ্তদিনের ক্লান্ত হাওয়ায়
কোন্‌খানে যায় উড়ে।
'গেল গেল' ব'লে যারা
ফুক্‌রে কেঁদে ওঠে
ক্ষণেক পরে কান্না-সমেত
তারাই পিছে ছোটে।

ঢং ঢং বেজে ওঠে ঘণ্টা,
এসে পড়ে বিদায়ের ক্ষণটা।
মুখ রাখে জানলায় বাড়িয়ে,
নিমেষেই নিয়ে যায় ছাড়িয়ে।

চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি—
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি।
কর্মকারের নয় এ গড়া-পেটা—
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়,
দেখার জিনিস এটা।
কালের পরে যায় চলে কাল,
হয় না কভু হারা
ছবির বাহন চলাফেরার ধারা।
দুবেলা সেই এ সংসারের
চলতি ছবি দেখা,
এই নিয়ে রই যাওয়া-আসার
ইস্টেশনে একা।

এক তুলি ছবিখানা এঁকে দেয়,
আর তুলি কালি তাহে মেখে দেয়।
আসে কারা এক দিক হতে ওই,
ভাসে কারা বিপরীত স্রোতে ওই।

শান্তিনিকেতন
৭ জুলাই ১৯৩৮

জবাবদিহি

কবি হয়ে দোল-উৎসবে
কোন্ লাজে কালো সাজে আসি,
এ নিয়ে রসিকা তোরা সবে
করেছিলি খুব হাসাহাসি।
চৈত্রের দোল-প্রাঙ্গণে
আমার জবাবদিহি চাই
এ দাবি তোদের ছিল মনে,
কাজ ফেলে আসিয়াছি তাই।

দোলের দিনে, সে কী মনের ভুলে,
    পরেছিলাম যখন কালো কাপড়,
দখিন হাওয়া দুয়ারখানা খুলে
    হঠাৎ পিঠে দিল হাসির চাপড়।
সকাল বেলা বেড়াই খুঁজি খুঁজি
    কোথা সে মোর গেল রঙের ডালা,
কালো এসে আজ লাগালো বুঝি
    শেষ প্রহরের রঙহরণের পালা।

ওরে কবি, ভয় কিছু নেই তোর—
    কালো রঙ যে সকল রঙের চোর।
জানি যে ওর বক্ষে রাখে তুলি
    হারিয়ে-যাওয়া পূর্ণিমা ফাল্গুনী—
অস্তরবির রঙের কালো ঝুলি,
    রসের শাস্ত্রে এই কথা কয় শুনি।
অন্ধকারে অজানা-সন্ধানে
    অচিন লোকে সীমাবিহীন রাতে
রঙের তৃষা বহন করি প্রাণে
    চলব যখন তারার ইশারাতে,
হয়তো তখন শেষ-বয়সের কালো
    করবে বাহির আপন গ্রন্থি খুলি
যৌবনদীপ— জাগাবে তার আলো
    ঘুমভাঙা সব রাঙা প্রহরগুলি।
কালো তখন রঙের দীপালিতে
    সুর লাগাবে বিস্মৃত সংগীতে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২৮ মার্চ ১৯৪০

সাড়ে নটা

সাড়ে নটা বেজেছে ঘড়িতে ;
    সকালের মৃদু শীতে
তন্দ্রাবেশে হাওয়া যেন রোদ পোহাইছে
    পাহাড়ের উপত্যকা-নীচে
        বনের মাথায়
    সবুজের আমন্ত্রণ-বিছানো পাতায়
বৈঠকখানার ঘরে রেডিয়োতে
        সমুদ্রপারের দেশ হতে

আকাশে প্লাবন আনে সুরের প্রবাহে,
বিদেশিনী বিদেশের কণ্ঠে গান গাহে
বহু যোজনের অন্তরালে।
সব তার লুপ্ত হয়ে মিলেছে কেবল সুরে তালে।
দেহহীন পরিবেশহীন
গীতস্পর্শ হতেছে বিলীন
সমস্ত চেতনা ছেয়ে।
যে বেলাটি বেয়ে
এল তার সাড়া
সে আমার দেশের সময়-সূত্র-ছাড়া।
একাকিনী, বহি রাগিণীর দীপশিখা
আসিছে অভিসারিকা
সর্বভারহীনা;
অরূপা সে, অলক্ষিত আলোকে আসীনা।
গিরিনদীসমুদ্রের মানে নি নিষেধ,
করিয়াছে ভেদ
পথে পথে বিচিত্র ভাষার কলরব,
পদে পদে জন্ম-মৃত্যু বিলাপ-উৎসব।
রণক্ষেত্রে নিদারুণ হানাহানি,
লক্ষ লক্ষ গৃহকোণে সংসারের তুচ্ছ কানাকানি,
সমস্ত সংসর্গ তার
একান্ত করেছে পরিহার।
বিশ্বহারা
একখানি নিরাসক্ত সংগীতের ধারা।
যক্ষের বিরহগাথা মেঘদূত
সেও জানি এমনি অদ্ভুত।
বাণীমূর্তি সেও একা।
শুধু নামটুকু নিয়ে কবির কোথাও নেই দেখা।
তার পাশে চুপ
সেকালের সংসারের সংখ্যাহীন রূপ।
সেদিনের যে প্রভাতে উজ্জয়িনী ছিল সমুজ্জ্বল
জীবনে উচ্ছল
ওর মাঝে তার কোনো আলো পড়ে নাই।
রাজার প্রতাপ সেও ওর ছন্দে সম্পূর্ণ বৃথাই।
যুগ যুগ হয়ে এল পার
কালের বিপ্লব বেয়ে, কোনো চিহ্ন আনে নাই তার।
বিপুল বিশ্বের মুখরতা
উহার শ্লোকের পথে স্তব্ধ করে দিল সব কথা।

মংপু
৮ জুন ১৯৩৯

প্রবাসী

হে প্রবাসী,
আমি কবি যে বাণীর প্রসাদ-প্রত্যাশী
অন্তরতমের ভাবা
সে করে বহন। ভালোবাসা
তারি পক্ষে ভর করি নাহি জানে দূর।
রক্তের নিঃশব্দ সুর
সদা চলে নাড়ীতন্তু বেয়ে,
সেই সুর যে ভাষার শব্দে আছে ছেয়ে
বাণীর অতীতগামী তাহারি বাণীতে
ভালোবাসা আপনার গূঢ় রূপ পারে যে জানিতে।
হে বিষয়ী, হে সংসারী, তোমরা যাহারা
আত্মহারা,
যারা ভালোবাসিবার বিশ্বপথ
হারায়েছ, হারায়েছ আপন জগৎ,
রয়েছ আত্মবিরহী গৃহকোণে,
বিরহের ব্যথা নেই মনে।
আমি কবি পাঠালেম তোমাদের উদ্‌ভ্রান্ত পরানে
সে ভাষার দৌত্য, যাহা হারানো নিজেরে কাছে আনে,
ভেদ করি মরুকারা
শুষ্ক চিত্তে নিয়ে আসে বেদনার ধারা।
বিস্মৃতি দিয়েছে তাহে ঘের
আজন্মকালের যাহা নিত্যদান চিরসুন্দরের—
তারে আজ লও ফিরে।
লক্ষ্মীর মন্দিরে
আমি আনিয়াছি নিমন্ত্রণ;
জানায়েছি, সেথাকার তোমার আসন
অন্যমনে তুমি আছ ভুলি।
জড় অভ্যাসের ধূলি
আজি নববর্ষে পুণ্যক্ষণে
যাক উড়ে, তোমার নয়নে
দেখা দিক্— এ ভুবনে সর্বত্রই কাছে আসিবার
তোমার আপন অধিকার।

সুদূরের মিতা,
মোর কাছে চেয়েছিলে নূতন কবিতা।
এই লও বুঝে,
নূতনের স্পর্শমন্ত্র এর ছন্দে পাও যদি খুঁজে।

[পুরী]
১ বৈশাখ ১৩৪৬

জন্মদিন

তোমরা রচিলে যারে
নানা অলংকারে
তারে তো চিনি নে আমি,
চেনেন না মোর অন্তর্যামী
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা ।
বিধাতার সৃষ্টিসীমা
তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে ।

কালসমুদ্রের তীরে
বিরলে রচেন মূর্তিখানি
বিচিত্রিত রহস্যের যবনিকা টানি
রূপকার আপন নিভৃতে ।
বাহির হইতে
মিলায়ে আলোক অন্ধকার
কেহ এক দেখে তারে, কেহ দেখে আর ।
খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া,
আর কল্পনার মায়া,
আর মাঝে মাঝে শূন্য, এই নিয়ে পরিচয় গাঁথে
অপরিচয়ের ভূমিকাতে ।
সংসারখেলার কক্ষে তাঁর
যে খেলেনা রচিলেন মূর্তিকার
মোরে লয়ে মাটিতে আলোতে,
সাদায় কালোতে,
কে না জানে সে ক্ষণভঙ্গুর
কালের চাকার নীচে নিঃশেষে ভাঙিয়া হবে চুর ।
সে বহিয়া এনেছে যে দান
সে করে ক্ষণেকতরে অমরের ভান—
সহসা মুহূর্তে দেয় ফাঁকি,
মুঠি-কয় ধূলি রয় বাকি,
আর থাকে কালরাত্রি সব-চিহ্ন-ধুয়ে-মুছে-ফেলা ।
তোমাদের জনতার খেলা
রচিল যে পুতুলিরে
সে কি লুব্ধ বিরাট ধূলিরে
এড়ায়ে আলোতে নিত্য রবে ।
এ কথা কল্পনা কর যবে
তখন আমার
আপন গোপন রূপকার
হাসেন কি আঁখিকোণে,
সে কথাই ভাবি আজ মনে

পুরী
২৫ বৈশাখ ১৩৪৬

প্রশ্ন

চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহু দূরে,
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্রপথে ঘুরে।
কত বেগ, কত তাপ, কত ভার, কত আয়তন,
সূক্ষ্ম অঙ্কে করেছে গণন
পণ্ডিতেরা, লক্ষ কোটি ক্রোশ দূর হতে
দুর্লক্ষ্য আলোতে।

আপনার পানে চাই,
লেশমাত্র পরিচয় নাই।
এ কি কোনো দৃশ্যাতীত জ্যোতি।
কোন্ অজানারে ঘিরি এই অজানার নিত্য গতি।
বহু যুগে বহু দূরে স্মৃতি আর বিস্মৃতি-বিস্তার,
যেন বাষ্পপরিবেশ তার
ইতিহাসে পিণ্ড বাঁধে রূপে-রূপান্তরে।
'আমি' উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র-মাঝে অসংখ্য বৎসরে।
সুখদুঃখ ভালোমন্দ রাগদ্বেষ ভক্তি সখ্য স্নেহ
এই নিয়ে গড়া তার সত্তাদেহ ;
এরা সব উপাদান ধাক্কা পায়, হয় আবর্তিত,
পুঞ্জিত, নর্তিত।
এরা সত্য কী যে
বুঝি নাই নিজে।
বলি তারে মায়া—
যাই বলি শব্দ সেটা, অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া।
তার পরে ভাবি,
এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি' অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নাবি।
অসীম রহস্য নিয়ে মুহূর্তের নিরর্থকতায়
লুপ্ত হবে নানারঙা জলবিম্বপ্রায়,
অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষকথা
আত্মার বারতা।
তখনো সুদূরে ওই নক্ষত্রের দূত
ছুটাবে অসংখ্য তার দীপ্ত পরমাণুর বিদ্যুৎ
অপার আকাশ-মাঝে,
কিছুই জানি না কোন্ কাজে।
বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর,
ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
৭ ডিসেম্বর ১৯৩৮

রোম্যান্টিক

আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক।
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ-পথের পথিক।
মোর উত্তরীয়ে
রঙ লাগায়েছি, প্রিয়ে।
দুয়ার-বাহিরে তব আসি যবে
সুর করে ডাকি আমি ভোরের ভৈরবে।
বসন্তবনের গন্ধ আনি তুলে
রজনীগন্ধার ফুলে
নিভৃত হাওয়ায় তব ঘরে।
কবিতা শুনাই মৃদুস্বরে,
ছন্দ তাহে থাকে,
তার ফাঁকে ফাঁকে
শিল্প রচে বাক্যের গাঁথুনি—
তাই শুনি
নেশা লাগে তোমার হাসিতে।
আমার বাঁশিতে
যখন আলাপ করি মূলতান
মনের রহস্য নিজ রাগিণীর পায় যে সন্ধান।
যে কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধূলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই—
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।
ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে
কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ-রস,
আনি তাঁরি জাদুর পরশ।
জানি, তার অনেকটা মায়া,
অনেকটা ছায়া।
আমারে শুধাও যবে 'এরে কভু বলে বাস্তবিক?'
আমি বলি, 'কখনো না, আমি রোম্যান্টিক।'
যেথা ওই বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি— সে নহে কথায় তাহা জানি—
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম;
সেথায় নির্মম কর্ম;

সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক 'মাভৈ
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে-হাতে।

ক্যান্ডীয় নাচ

সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যান্ডিদলের নাচ ;
শিকড়গুলোর শিকল ছিঁড়ে যেন শালের গাছ
পেরিয়ে এল মুক্তিমাতাল খ্যাপা,
হুংকার তার ছুটল আকাশ-ব্যাপা।
ডালপালা সব দুড়্দাড়িয়ে ঘূর্ণি হাওয়ায় কহে—
নহে, নহে, নহে—
নহে বাধা, নহে বাঁধন, নহে পিছন-ফেরা,
নহে আবেশ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা,
নহে মৃদু লতার দোলা, নহে পাতার কাঁপন—
আগুন হয়ে জ্বলে ওঠা এ যে তপের তাপন।
ওদের ডেকে বলেছিল সমুদ্দরের ঢেউ,
'আমার ছন্দ রক্তে আছে এমন আছে কেউ ?'
ঝঞ্ঝা ওদের বলেছিল, 'মঞ্জীর তোর আছে
ঝংকারে যার লাগাবে লয় আমার প্রলয়নাচে ?'
ওই যে পাগল দেহখানা, শূন্যে ওঠে বাহু,
যেন কোথায় হাঁ করেছে রাহু,
লুব্ধ তাহার ক্ষুধার থেকে চাঁদকে করবে ত্রাণ,
পূর্ণিমাকে ফিরিয়ে দেবে প্রাণ।
মহাদেবের তপোভঙ্গে যেন বিষম বেগে
নন্দী উঠল জেগে ;
শিবের ক্রোধের সঙ্গে
উঠল জ্বলে দুর্দাম তার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে
নাচের বহ্নিশিখা
নির্দয়া নির্ভীকা।
খুঁজতে ছোটে মোহমদের বাহন কোথায় আছে
দাহন করবে এই নিদারুণ আনন্দময় নাচে।
নটরাজ যে পুরুষ তিনি, তাণ্ডবে তাঁর সাধন,
আপন শক্তি মুক্ত ক'রে ছেঁড়েন আপন বাঁধন ;
দুঃখবেগে জাগিয়ে তোলেন সকল ভয়ের ভয় ;
জয়ের নৃত্যে আপনাকে তাঁর জয়।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

অবর্জিত

আমি চলে গেলে ফেলে রেখে যাব পিছু
চিরকাল মনে রাখিবে এমন কিছু,
মূঢ়তা করা তা নিয়ে মিথ্যে ভেবে।
ধুলোর খাজনা শোধ করে নেবে ধুলো,
চুকে গিয়ে তবু বাকি রবে যতগুলো
গরজ যাদের তারাই তা খুঁজে নেবে।
আমি শুধু ভাবি, নিজেরে কেমনে ক্ষমি—
পুঞ্জ পুঞ্জ বকুনি উঠেছে জমি,
কোন্ সংকারে করি তার সদ্‌গতি।
কবির গর্ব নেই মোর হেন নয়—
কবির লজ্জা পাশাপাশি তারি রয়,
ভারতীর আছে এই দয়া মোর প্রতি।
লিখিতে লিখিতে কেবলই গিয়েছি ছেপে,
সময় রাখি নি ওজন দেখিতে মেপে,
কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী,
এ অপরাধের জন্যে যে জন দায়ী
তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে।
বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা,
বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা—
আবর্জনারে বর্জন করি যদি
চারি দিক হতে গর্জন করি উঠে,
'ঐতিহাসিক সূত্র দিবে কি টুটে,
যা ঘটেছে তারা রাখা চাই নিরবধি।'
ইতিহাস বুড়ো, বেড়াজাল তার পাতা,
সঙ্গে রয়েছে হিসাবের মোটা খাতা—
ধরা যাহা পড়ে ফর্দে সকলি আছে।
হয় আর নয়, খোঁজ রাখে শুধু এই,
ভালোমন্দর দরদ কিছুই নেই,
মূল্যের ভেদ তুল্য তাহার কাছে।
বিধাতাপুরুষ ঐতিহাসিক হলে
চেহারা লইয়া ঋতুরা পড়িত গোলে,
অঘ্রান তবে ফাগুন রহিত ব্যেপে।
পুরানো পাতারা ঝরিতে যাইত ভুলে,
কচি পাতাদের আঁকড়ি রহিত ঝুলে,
পুরাণ ধরিত কাব্যের টুঁটি চেপে।
জোড়হাত করে আমি বলি, শোনো কথা,
সৃষ্টির কাজে প্রকাশেরই ব্যগ্রতা,
ইতিহাসটারে গোপন করে সে রাখে।

জীবনলক্ষ্মী মেলিয়া রঙের রেখা
ধরার অঙ্গে আঁকিছে পত্রলেখা,
ভূতত্ত্ব তার কঙ্কালে ঢাকা থাকে।
বিশ্বকবির লেখা যত হয় ছাপা
প্রুফ্‌শিটে তার দশগুণ পড়ে চাপা,
নব এডিশনে নূতন করিয়া তুলে।
দাগি যাহা, যাহে বিকার, যাহাতে ক্ষতি,
মমতামাত্র, নাহি তো তাহার প্রতি—
বাঁধা নাহি থাকে ভুলে আর নির্ভুলে।
সৃষ্টির কাজ লুপ্তির সাথে চলে,
ছাপাযন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বলে
এ বিধান যদি পদে পদে পায় বাধা—
জীর্ণ ছিন্ন মলিনের সাথে গোঁজা
কৃপণপাড়ার রাশীকৃত নিয়ে বোঝা
সাহিত্য হবে শুধু কি ধোবার গাধা।
যাহা-কিছু লেখে সেরা নাহি হয় সবি,
তা নিয়ে লজ্জা না করুক কোনো কবি—
প্রকৃতির কাজে কত হয় ভুলচুক ;
কিন্তু, হেয় যা শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে
তারেও রক্ষা করিবার ভূতে পেলে
কালের সভায় কেমনে দেখাবে মুখ।
ভাবী কালে মোর কী দান শ্রদ্ধা পাবে,
খ্যাতিধারা মোর কত দূর চলে যাবে,
সে লাগি চিন্তা করার অর্থ নাহি।
বর্তমানের ভরি অর্ঘ্যের ডালি
অদেয় যা দিনু মাখায়ে ছাপার কালি
তাহারি লাগিয়া মার্জনা আমি চাহি।

'পদ্মা' বোট। চন্দননগর
৫ জুন ১৯৩৫

শেষ হিসাব

চেনাশোনার সাঁঝবেলাতে
শুনতে আমি চাই—
পথে পথে চলার পালা
লাগল কেমন, ভাই।
দুর্গম পথ ছিল ঘরেই,
বাইরে বিরাট পথ—
তেপান্তরের মাঠ কোথা-বা,
কোথা-বা পর্বত।

কোথা-বা সে চড়াই উঁচু,
কোথা-বা উৎরাই,
কোথা-বা পথ নাই ।
মাঝে মাঝে জুটল অনেক ভালো
অনেক ছিল বিকট মন্দ,
অনেক কুশ্রী কালো ।

ফিরেছিলে আপন মনের
গোপন অলিগলি,
পরের মনের বাহির দ্বারে
পেতেছ অঞ্জলি ।
আশাপথের রেখা বেয়ে
কতই এলে গেলে,
পাওনা ব'লে যা পেয়েছ
অর্থ কি তার পেলে ।
অনেক কেঁদে-কেটে
ভিক্ষার ধন জুটিয়েছিলে
অনেক রাস্তা হেঁটে ।

পথের মধ্যে লুঠেল দস্যু
দিয়েছিল হানা,
উজাড় করে নিয়েছিল
ছিন্ন ঝুলিখানা ।
অতি কঠিন আঘাত তারা
লাগিয়েছিল বুকে—
ভেবেছিলুম, চিহ্ন নিয়ে
সে-সব গেছে চুকে ।
হাটে বাটে মধুর যাহা
পেয়েছিলুম খুঁজি
মনে ছিল, যত্নের ধন
তাই রয়েছে পুঁজি ।
হায় রে ভাগ্য, খোলো তোমার ঝুলি ।
তাকিয়ে দেখো, জমিয়েছিলে ধূলি ।
নিষ্ঠুর যে ব্যর্থকে সে
করে যে বর্জ্জিত,
দৃঢ় কঠোর মুষ্টিতলে
রাখে সে অর্জ্জিত
নিত্যকালের রতন-কণ্ঠহার ;
চিরমূল্য দেয় সে তারে
দারুণ বেদনার ।

আর যা-কিছু জুটেছিল
না চাহিতেই পাওয়া—
আজকে তারা ঝুলিতে নেই,
রাত্রিদিনের হাওয়া
ভরল তারাই, দিল তারা
পথে চলার মানে,
রইল তারাই একতারাতে
তোমার গানে গানে।

শান্তিনিকেতন
৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮
পুনর্লিখন : শ্রীনিকেতন। ৭ জুলাই ১৯৩৯

সন্ধ্যা

দিন সে প্রাচীন অতি প্রবীণ বিষয়ী
তীক্ষ্ণদৃষ্টি, বস্তুরাজ্যজয়ী,
দিকে দিকে প্রসারিয়া গনিছে সম্বল আপনার।
নবীনা শ্যামলা সন্ধ্যা পরেছে জ্যোতির অলংকার
চিরনববধূ,
অন্তরে সলজ্জ মধু
অদৃশ্য ফুলের কুঞ্জে রেখেছে নিভৃতে।
অবগুণ্ঠনের অলক্ষিতে
তার দূর পরিচয়
শেষ নাহি হয়।
দিনশেষে দেখা দেয় সে আমার বিদেশিনী—
তারে চিনি তবু নাহি চিনি।

[২০-২২ মে ১৯৩৭]

জয়ধ্বনি

যাবার সময় হলে জীবনের সব কথা সেরে
শেষবাক্যে জয়ধ্বনি দিয়ে যাব মোর অদৃষ্টেরে।
বলে যাব, পরমক্ষণের আশীর্বাদ
বার বার আনিয়াছে বিস্ময়ের অপূর্ব আস্বাদ।
যাহা রুগ্‌ণ, যাহা ভগ্ন, যাহা মগ্ন পঙ্কস্তরতলে
আত্মপ্রবঞ্চনাচ্ছলে
তাহারে করি না অস্বীকার।
বলি, বার বার
পতন হয়েছে যাত্রাপথে
ভগ্ন মনোরথে ;

বারে বারে পাপ
ললাটে লেপিয়া গেছে কলঙ্কের ছাপ ;
বার বার আত্মপরাভব কত
দিয়ে গেছে মেরুদণ্ড করি নত :
কদর্যের আক্রমণ ফিরে ফিরে
দিগন্ত গ্লানিতে দিল ঘিরে ।
মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,
ছুটি নি করিতে প্রতিকার—
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্‌কার তাহার ।

অপূর্ণ-শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ,
দেখিয়াছি চারি দিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু ।
প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা,
গুহাগহ্বরের যত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
পারে নি বিদ্রূপ করিবারে
যত-কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষবাক্যে আজি তারি দিব জয়ধ্বনি ।

শ্যামলী । শান্তিনিকেতন
২৬ নভেম্বর ১৯৩৯

প্রজাপতি

সকালে উঠেই দেখি
প্রজাপতি একি
আমার লেখার ঘরে,
শেলফের 'পরে
মেলেছে নিঃস্পন্দ দুটি ডানা—
রেশমি সবুজ রঙ, তার 'পরে সাদা রেখা টানা ।
সন্ধ্যাবেলা বাতির আলোয় অকস্মাৎ
ঘরে ঢুকে সারারাত
কী ভেবেছে কে জানে তা
কোনোখানে হেথা
অরণ্যের বর্ণ গন্ধ নাই,
গৃহসজ্জা ওর কাছে সমস্ত বৃথাই ।

বিচিত্র বোধের এ ভুবন,
লক্ষকোটি মন

একই বিশ্ব লক্ষকোটি ক'রে জানে
রূপে রসে নানা অনুমানে।
লক্ষকোটি কেন্দ্র তারা জগতের,
সংখ্যাহীন স্বতন্ত্র পথের
জীবনযাত্রার যাত্রী,
দিনরাত্রি
নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা-কাজে
একান্ত রয়েছে বিশ্ব-মাঝে।

প্রজাপতি বসে আছে যে কাব্যপুঁথির 'পরে
স্পর্শ তারে করে,
চক্ষে দেখে তারে,
তার বেশি সত্য যাহা তাহা
তার কাছে সত্য নয়—
অন্ধকারময়।
ও জানে কাহারে বলে মধু, তবু
মধুর কী সে-রহস্য জানে না ও কভু।
পুষ্পপাত্রে নিয়মিত আছে ওর ভোজ—
প্রতিদিন করে তার খোঁজ
কেবল লোভের টানে,
কিন্তু নাহি জানে
লোভের অতীত যাহা। সুন্দর যা, অনির্বচনীয়,
যাহা প্রিয়,
সেই বোধ সীমাহীন দূরে আছে
তার কাছে।

আমি যেথা আছি
মন যে আপন টানে তাহা হতে সত্য লয় বাছি।
যাহা নিতে নাহি পারে
তাই শূন্যময় হয়ে নিত্য ব্যাপ্ত তার চারি ধারে।
কী আছে বা নাই কী এ,
সে শুধু তাহার জানা নিয়ে।
জানে না যা, যার কাছে স্পষ্ট তাহা, হয়তো-বা কাছে
এখনি সে এখানেই আছে
আমার চৈতন্যসীমা অতিক্রম করি বহুদূরে
রূপের অন্তরদেশে অপরূপপুরে।
সে আলোকে তার ঘর
যে আলো আমার অগোচর।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
১০ মার্চ ১৯৩৯

প্রবীণ

বিশ্বজগৎ যখন করে কাজ
স্পর্ধা ক'রে পরে ছুটির সাজ।
আকাশে তার আলোর ঘোরা চলে,
কৃতিত্বেরে লুকিয়ে রাখে পরিহাসের ছলে।
বনের তলে গাছে গাছে শ্যামল-রূপের মেলা,
ফুলে ফলে নানান্ রঙে নিত্য নতুন খেলা।
বাহির হতে কে জানতে পায়, শান্ত আকাশতলে
প্রাণ বাঁচাবার কঠিন কর্মে নিত্য লড়াই চলে।
চেষ্টা যখন নগ্ন হয়ে শাখায় পড়ে ধরা,
তখন খেলার রূপ চলে যায়, তখন আসে জরা।

বিলাসী নয় মেঘগুলো তো জলের ভারে ভরা,
চেহারা তার বিলাসিতার রঙের ভূষণ পরা।
বাইরে ওরা বুড়োমিকে দেয় না তো প্রশ্রয়
অন্তরে তাই চিরন্তনের বজ্রমন্দ্র রয়।
জল-ঝরানো ছেলেখেলা যেমনি বন্ধ করে
ফ্যাকাশে হয় চেহারা তার, বয়স তাকে ধরে।
দেহের মাঝে হাজার কাজে বহে প্রাণের বায়ু—
পালের তরীর মতন যেন ছুটিয়ে চলে আয়ু,
বুকের মধ্যে জাগায় নাচন, কণ্ঠে লাগায় সুর,
সকল অঙ্গ অকারণে উৎসাহে ভরপুর
রক্তে যখন ফুরোবে ওর খেলার নেশা খোঁজা
তখনি কাজ অচল হবে, বয়স হবে বোঝা।

ওগো তুমি কী করছ ভাই, স্তব্ধ সারাক্ষণ—
বুদ্ধি তোমার আড়ষ্ট যে, ঝিমিয়ে-পড়া মন।
নবীন বয়স যেই পেরোল খেলাঘরের দ্বারে,
মরচে-পড়া লাগল তালা, বন্ধ একেবারে।
ভালোমন্দ বিচারগুলো খোঁটায় যেন পোঁতা।
আপন মনের তলায় তুমি তলিয়ে গেলে কোথা।
চলার পথে আগল দিয়ে বসে আছ স্থির—
বাইরে এসো, বাইরে এসো, পরমগম্ভীর।
কেবলই কি প্রবীণ তুমি, নবীন নও কি তাও।
দিনে দিনে ছি ছি কেবল বুড়ো হয়েই যাও!
আশি বছর বয়স হবে ওই-যে পিপুল গাছ,
এ আশ্বিনের রোদ্দুরে ওর দেখলে বিপুল নাচ?
পাতায় পাতায় আবোল-তাবোল, শাখায় দোলাদুলি,
পান্থ হাওয়ার সঙ্গে ও চায় করতে কোলাকুলি।
ওগো প্রবীণ, চলো এবার সকল কাজের শেষে
নবীন হাসি মুখে নিয়ে চরম খেলার বেশে।

রাত্রি

অভিভূত ধরণীর দীপ-নেভা তোরণদুয়ারে
আসে রাত্রি,
আধা অন্ধ, আধা বোবা,
বিরাট অস্পষ্ট মূর্তি,
যুগারম্ভসৃষ্টিশালে অসমাপ্তি পুঞ্জীভূত যেন
নিদ্রার মায়ায় ।
হয় নি নিশ্চিত ভাগ সত্যের মিথ্যার,
ভালোমন্দ-যাচাইয়ের তুলাদণ্ডে
বাটখারা ভুলের ওজনে ।
কামনার যে পাত্রটি দিনে ছিল আলোয় লুকানো
আঁধার তাহারে টেনে আনে—
ভরে দেয় সুরা দিয়ে
রজনীগন্ধার গন্ধে,
ঝিমিঝিমি ঝিল্লির ঝননে,
আধ-দেখা কটাক্ষে ইঙ্গিতে ।
ছায়া করে আনাগোনা সংশয়ের মুখোশ-পরানো,
মোহ আসে কালো মূর্তি লালরঙে এঁকে,
তপস্বীরে করে যে বিদ্রূপ ।
বেড়াজাল হাতে নিয়ে সঞ্চরে আদিম মায়াবিনী
যবে গুপ্ত গুহা হতে গোধূলির ধূসর প্রান্তরে
দস্যু এসে দিবসের রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে যায় ।

বিশ্বনাট্যে প্রথম অঙ্কের
অনিশ্চিত প্রকাশের যবনিকা
ছিন্ন করে এসেছিল দিন,
নির্বারিত করেছিল বিশ্বের চেতনা
আপনার নিঃসংশয় পরিচয় ।
আবার সে আচ্ছাদন
মাঝে মাঝে নেমে আসে স্বপ্নের সংকেতে ।
আবিল বুদ্ধির স্রোতে ক্ষণিকের মতো
মেতে ওঠে ফেনার নর্তন ।
প্রবৃত্তির হালে ব'সে কর্ণধার করে
উদ্‌ভ্রান্ত চালনা তন্দ্রাবিষ্ট চোখে ।
নিজেরে ধিক্‌কার দিয়ে মন ব'লে ওঠে,
'নহি নহি আমি নহি অপূর্ণ সৃষ্টির
সমুদ্রের পঙ্কলোকে অন্ধ তলচর
অর্ধস্ফুট শক্তি যার বিহ্বলতা-বিলাসী মাতাল
তরলে নিমগ্ন অনুক্ষণ ।

আমি কর্তা, আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীক্ষিত,
কঠিন মাটির 'পরে
প্রতি পদক্ষেপ যার
আপনারে জয় ক'রে চলা ।'

পুনশ্চ । শান্তিনিকেতন
২৬ জুলাই ১৯৩৯

শেষ বেলা

এল বেলা পাতা ঝরাবারে ;
শীর্ণ বলিত কায়া, আজ শুধু ভাঙা ছায়া
মেলে দিতে পারে ।
একদিন ডাল ছিল ফুলে ফুলে ভরা
নানা-রঙ-করা ।
কুঁড়ি-ধরা ফলে
কার যেন কী কৌতূহলে
উঁকি মেরে আসা
খুঁজে নিতে আপনার বাসা ।
ঋতুতে ঋতুতে
আকাশের উৎসবদূতে
এনে দিত পল্লবপল্লীতে তার
কখনো পা-টিপে চলা হালকা হাওয়ার,
কখনো-বা ফাগুনের অস্থির এলোমেলো চাল
জোগাইত নাচনের তাল ।

জীবনের রস আজ মজ্জায় বহে,
বাহিরে প্রকাশ তার নহে ।
অন্তরবিধাতার সৃষ্টিনিদেশে
যে অতীত পরিচিত সে নূতন বেশে
সাজবদলের কাজে ভিতরে লুকালো—
বাহিরে নিবিল দীপ, অন্তরে দেখা যায় আলো ।
গোধূলির ধূসরতা ক্রমে সন্ধ্যার
প্রাঙ্গণে ঘনায় আঁধার ।
মাঝে মাঝে জেগে ওঠে তারা,
আজ চিনে নিতে হবে তাদের ইশারা ।
সমুখে অজানা পথ ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে,
সেথা যাত্রার কালে যাত্রীর পাত্রটি পূরে
সদয় অতীত কিছু সঞ্চয় দান করে তারে
পিপাসার গ্লানি মিটাবারে ।

যত বেড়ে ওঠে রাতি
সত্য যা সেদিনের উজ্জ্বল হয় তার ভাতি।
এই কথা ধ্রুব জেনে নিভৃতে লুকায়ে
সারা জীবনের ঋণ একে একে দিতেছি চুকায়ে।

[শান্তিনিকেতন]
১১ জানুয়ারি ১৯৪০

রূপ-বিরূপ

এই মোর জীবনের মহাদেশে
কত প্রান্তরের শেষে,
কত প্লাবনের স্রোতে
এলেম ভ্রমণ করি শিশুকাল হতে—
কোথাও রহস্যঘন অরণ্যের ছায়াময় ভাষা,
কোথাও পাণ্ডুর শুষ্ক মরুর নৈরাশা,
কোথাও-বা যৌবনের কুসুমপ্রগল্‌ভ বনপথ,
কোথাও-বা ধ্যানমগ্ন প্রাচীন পর্বত
মেঘপুঞ্জে স্তব্ধ যার দুর্বোধ কী বাণী,
কাব্যের ভাণ্ডারে আনি
স্মৃতিলেখা ছন্দে রাখিয়াছি ঢাকি,
আজ দেখি অনেক রয়েছে বাকি।
সুকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয়
যা পরুষ, যা নিষ্ঠুর, উৎকট যা, করে নি সঞ্চয়
আপনার চিত্রশালে;
তার সংগীতের তালে
ছন্দোভঙ্গ হল তাই,
সংকোচে সে কেন বোঝে নাই।

সৃষ্টিরঙ্গভূমিতলে
রূপ-বিরূপের নৃত্য একসঙ্গে নিত্যকাল চলে,
সে দ্বন্দ্বের করতালঘাতে
উদ্দাম চরণপাতে
সুন্দরের ভঙ্গি যত অকুণ্ঠিত শক্তিরূপ ধরে,
বাণীর সম্মোহবন্ধ ছিন্ন করে অবজ্ঞার ভরে।
তাই আজ বেদমন্ত্রে, হে বজ্রী, তোমার করি স্তব—
তব মন্দ্ররব
করুক ঐশ্বর্যদান,
রৌদ্রী রাগিণীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষগান,

আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের ছন্দে
জাগুক হুংকার,
বাণীবিলাসীর কানে ব্যক্ত হোক ভর্ৎসনা তোমার।

উদীচী। শান্তিনিকেতন
২৮ জানুয়ারি ১৯৪০

শেষ কথা

এ ঘরে ফুরালো খেলা,
এল দ্বার রুধিবার বেলা।
বিলয়বিলীন দিনশেষে
ফিরিয়া দাঁড়াও এসে
যে ছিলে গোপনচর
জীবনের অন্তরতর।
ক্ষণিক মুহূর্ততরে চরম আলোকে
দেখে নিই স্বপ্নভাঙা চোখে;
চিনে নিই, এ লীলার শেষ পরিচয়ে
কী তুমি ফেলিয়া গেলে, কী রাখিলে অন্তিম সঞ্চয়ে।
কাছের দেখায় দেখা পূর্ণ হয় নাই,
মনে-মনে ভাবি তাই—
বিচ্ছেদের দূর-দিগন্তের ভূমিকায়
পরিপূর্ণ দেখা দিবে অস্তরবিরশ্মির রেখায়।
জানি না, বুঝিব কিনা প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা আর যাওয়া,
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানি না, এ আজিকার মুছে-ফেলা ছবি
আবার নূতন রঙে আঁকিবে কি তুমি, শিল্পীকবি।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
৪ এপ্রিল ১৯৪০

সানাই

সানাই

দূরের গান

সুদূরের পানে চাওয়া উৎকণ্ঠিত আমি
মন সেই আঘাটায় তীর্থপথগামী,
যেথায় হঠাৎ-নামা প্লাবনের জলে
তটপ্লাবী কোলাহলে
ওপারের আনে আহ্বান,
নিরুদ্দেশ পথিকের গান।
ফেনোচ্ছল সে-নদীর বন্ধহারা জলে
পণ্যতরী নাহি চলে,
কেবল অলস মেঘ ব্যর্থ ছায়া-ভাসানের খেলা
খেলাইছে এবেলা ওবেলা।

দিগন্তের নীলিমার স্পর্শ দিয়ে ঘেরা
গোধূলিলগ্নের যাত্রী মোর স্বপনেরা।
নীল আলো প্রেয়সীর আঁখিপ্রান্ত হতে
নিয়ে যায় চিত্ত মোর অকূলের অবারিত স্রোতে;
চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমারে
অজানার অতিদূর পারে।

মোর জন্মকালে
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে
দীপ-জ্বালা ভেলাখানি নামহারা অদৃশ্যের পানে;
আজিও চলেছি তার টানে।
বাসাহারা মোর মন
তারার আলোতে কোন্ অধরাকে করে অন্বেষণ
পথে পথে
দূরের জগতে।

ওগো দূরবাসী,
কে শুনিতে চাও মোর চিরপ্রবাসের এই বাঁশি—
অকারণ বেদনার ভৈরবীর সুরে
চেনার সীমানা হতে দূরে
যার গান কক্ষ্যচ্যুত তারা
চিররাত্রি আকাশেতে খুঁজিছে কিনারা।

এ বাঁশি দিবে সে মন্ত্র যে মন্ত্রের গুণে
আজি এ ফাল্গুনে
কুসুমিত অরণ্যের গভীর রহস্যখানি
তোমার সর্বাঙ্গে মনে দিবে আনি
সৃষ্টির প্রথম গূঢ়বাণী।
যেই বাণী অনাদির সুচিরবাঞ্ছিত
তারায় তারায় শূন্যে হল রোমাঞ্চিত,
রূপেরে আনিল ডাকি
অরূপের অসীমেতে জ্যোতিঃসীমা আঁকি।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২২ ফাল্গুন ১৩৪৬

কর্ণধার

ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার,
দিকে দিকে ঢেউ জাগালো
লীলার পারাবার।
আলোক-ছায়া চমকিছে
ক্ষণেক আগে ক্ষণেক পিছে,
অমার আঁধার ঘাটে ভাসায়
নৌকা পূর্ণিমার।
ওগো কর্ণধার,
ডাইনে বাঁয়ে দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মিথ্যার।

ওগো আমার লীলার কর্ণধার,
জীবন-তরী মৃত্যুভাঁটায়
কোথায় করো পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী,
গান করে দিন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
তুমি ওগো লীলার কর্ণধার
রক্তে বাজাও রহস্যময়
মন্ত্রের ঝংকার।

তাকায় যখন নিমেষহারা
দিনশেষের প্রথম তারা
ছায়াঘন কুঞ্জবনে
মন্দ মৃদু গুঞ্জরণে

বাতাসেতে জাল বুনে দেয়
মদির তন্দ্রার।
স্বপ্নস্রোতে লীলার কর্ণধার
গোধূলিতে পাল তুলে দাও
ধূসরচ্ছন্দার।

অস্তরবির ছায়ার সাথে
লুকিয়ে আঁধার আসন পাতে।
ঝিল্লিরবে গগন কাঁপে,
দিগঙ্গনা কী জপ জাপে,
হাওয়ায় লাগে মোহপরশ
রজনীগন্ধার।
হৃদয়-মাঝে লীলার কর্ণধার
একতারাতে বেহাগ বাজাও
বিধুর সন্ধ্যার।

রাতের শঙ্খকুহর ব্যেপে
গম্ভীর রব উঠে কেঁপে।
সঙ্গবিহীন চিরন্তনের
বিরহগান বিরাট মনের
শূন্যে করে নিঃশবদের
বিষাদবিস্তার।
তুমি আমার লীলার কর্ণধার
তারার ফেনা ফেনিয়ে তোল
আকাশগঙ্গার।

বক্ষে যবে বাজে মরণভেরি
ঘুচিয়ে ত্বরা ঘুচিয়ে সকল দেরি,
প্রাণের সীমা মৃত্যুসীমায়
সূক্ষ্ম হয়ে মিলায়ে যায়,
উর্ধ্বে তখন পাল তুলে দাও
অন্তিম যাত্রার।
ব্যক্ত কর, হে মোর কর্ণধার,
আঁধারহীন অচিন্ত্য সে
অসীম অন্ধকার।

। শান্তিনিকেতন
২৮ জানুয়ারি ১৯৪০

আসা-যাওয়া

ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিই নি আসন বসিবার।
বিদায় সে নিল যবে, খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে,
ফিরায়ে ডাকিতে গেনু ধেয়ে।
তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন,
নিশীথে বিলীন,
দূরপথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা

[শান্তিনিকেতন]
২৮ মার্চ ১৯৪০

বিপ্লব

ডমরুতে নটরাজ বাজালেন তাণ্ডবে যে তাল
ছিন্ন করে দিল তার ছন্দ তব ঝংকৃত কিঙ্কিণী
হে নর্তিনী!
বেণীর বন্ধনমুক্ত উৎক্ষিপ্ত তোমার কেশজাল
ঝঞ্ঝার বাতাসে
উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম উচ্ছ্বাসে;
বিদীর্ণ বিদ্যুৎঘাতে তোমার বিহ্বল বিভাবরী
হে সুন্দরী।
সীমন্তের সিঁথি তব, প্রবালে খচিত কণ্ঠহার—
অন্ধকারে মগ্ন হল চৌদিকে বিক্ষিপ্ত অলংকার।
আভরণশূন্য রূপ
বোবা হয়ে আছে করি চুপ।
ভীষণ রিক্ততা তার
উৎসুক চক্ষুর 'পরে হানিছে আঘাত অবজ্ঞার।
নিষ্ঠুর নৃত্যের ছন্দে মুগ্ধ হস্তে-গাঁথা পুষ্পমালা
বিস্রস্ত দলিত দলে বিকীর্ণ করিছে রঙ্গশালা।
মোহমদে ফেনায়িত কানায় কানায়
যে পাত্রখানায়
মুক্ত হত রসের প্লাবন
মত্ততার শেষপালা আজি সে করিল উদ্‌যাপন।

যে অভিসারের পথে চেলাঞ্চলখানি
নিতে টানি
কম্পিত প্রদীপশিখা-'পরে
তার চিহ্ন পদপাতে লুপ্ত করি দিলে চিরতরে ;
প্রান্তে তার ব্যর্থ বাঁশিরবে
প্রতীক্ষিত প্রত্যাশার বেদনা যে উপেক্ষিত হবে ।

এ নহে তো ঔদাসীন্য, নহে ক্লান্তি, নহে বিস্মরণ,
ক্রুদ্ধ এ বিতৃষ্ণা তব মাধুর্যের প্রচণ্ড মরণ,
তোমার কটাক্ষ
দেয় তারই হিংস্র সাক্ষ্য
ঝলকে ঝলকে
পলকে পলকে,
বঙ্কিম নির্মম
মর্মভেদী তরবারি-সম ।
তবে তাই হোক,
ফুৎকারে নিবায়ে দাও অতীতের অন্তিম আলোক ।
চাহিব না ক্ষমা তব, করিব না দুর্বল বিনতি,
পরুষ মরুর পথে হোক মোর অন্তহীন গতি,
অবজ্ঞা করিয়া পিপাসারে,
দলিয়া চরণতলে ক্রূর বালুকারে ।

মাঝে মাঝে কটুস্বাদ দুখে
তীব্র রস দিতে ঢালি রজনীর অনিদ্র কৌতুকে
যবে তুমি ছিলে রহঃসখী ।
প্রেমেরই সে দানখানি, সে যেন কেতকী
রক্তরেখা এঁকে গায়ে
রক্তস্রোতে মধুগন্ধ দিয়েছে মিশায়ে ।
আজ তব নিঃশব্দ নীরস হাস্যবাণ
আমার ব্যথার কেন্দ্র করিছে সন্ধান ।
সেই লক্ষ্য তব
কিছুতেই মেনে নাহি লব,
বক্ষ মোর এড়ায়ে সে যাবে শূন্যতলে,
যেখানে উল্কার আলো জ্বলে
ক্ষণিক বর্ষণে
অশুভ দর্শনে ।

বেজে ওঠে ডঙ্কা, শঙ্কা শিহরায় নিশীথগগনে–
হে নির্দয়া, কী সংকেত বিচ্ছুরিল স্খলিত কঙ্কণে !

[শান্তিনিকেতন]
২১ জানুয়ারি ১৯৪০

জ্যোতির্বাষ্প

হে বন্ধু, সবার চেয়ে চিনি তোমাকেই
এ কথায় পূর্ণ সত্য নেই।
চিনি আমি সংসারের শত-সহস্রেরে
কাজের বা অকাজের ঘেরে
নির্দিষ্ট সীমায় যারা স্পষ্ট হয়ে জাগে,
প্রত্যহের ব্যবহারে লাগে,
প্রাপ্য যাহা হাতে দেয় তাই,
দান যাহা তাহা নাহি পাই

অনন্তের সমুদ্রমন্থনে
গভীর রহস্য হতে তুমি এলে আমার জীবনে।
উঠিয়াছ অতলের অস্পষ্টতাখানি
আপনার চারি দিকে টানি।
নীহারিকা রহে যথা কেন্দ্রে তার নক্ষত্রেরে ঘেরি,
জ্যোতির্ময় বাষ্প-মাঝে দূরবিন্দু তারাটিরে হেরি।
তোমা-মাঝে শিল্পী তার রেখে গেছে তর্জনীর মানা,
সব নহে জানা।
সৌন্দর্যের যে-পাহারা জাগিয়া রয়েছে অন্তঃপুরে
সে আমারে নিত্য রাখে দূরে।

[শান্তিনিকেতন]
২৮ মার্চ ১৯৪০

জানালায়

বেলা হয়ে গেল, তোমার জানালা-'পরে
রৌদ্র পড়েছে বেঁকে।
এলোমেলো হাওয়া আমলকী-ডালে-ডালে
দোলা দেয় থেকে থেকে।
মন্থর পায়ে চলেছে মহিষগুলি,
রাঙা পথ হতে রহি রহি ওড়ে ধূলি,
নানা পাখিদের মিশ্রিত কাকলিতে,
আকাশ আবিল ম্লান সোনালির শীতে।
পসারী হোথায় হাঁক দিয়ে যায়
গলি বেয়ে কোন্ দূরে,
ভুলে গেছি যাহা তারি ধ্বনি বাজে
বক্ষে করুণ সুরে।
চোখে পড়ে খনে খনে
তব জানালায় কম্পিত ছায়া
খেলিছে রৌদ্র-সনে।

কেন মনে হয়, যেন দূর ইতিহাসে
কোনো বিদেশের কবি
বিদেশী ভাষার ছন্দে দিয়েছে এঁকে
এ বাতায়নের ছবি।
ঘরের ভিতরে যে-প্রাণের ধারা চলে
সে যেন অতীত কাহিনীর কথা বলে।
ছায়া দিয়ে ঢাকা সুখদুঃখের মাঝে
গুঞ্জনসুরে সুরশৃঙ্গার বাজে।
যারা আসে যায় তাদের ছায়ায়
প্রবাসের ব্যথা কাঁপে,
আমার চক্ষু তন্দ্রা-অলস
মধ্যদিনের তাপে।
ঘাসের উপরে একা বসে থাকি,
দেখি চেয়ে দূর থেকে,
শীতের বেলার রৌদ্র তোমার
জানালায় পড়ে বেঁকে।

[উদীচী। শান্তিনিকেতন]
১৫ জানুয়ারি ১৯৪০

ক্ষণিক

এ চিকন তব লাবণ্য যবে দেখি
মনে মনে ভাবি, একি
ক্ষণিকের 'পরে অসীমের বরদান,
আড়ালে আবার ফিরে নেয় তারে
দিন হলে অবসান।
একদা শিশিররাতে
শতদল তার দল ঝরাইবে
হেমন্তে হিমপাতে,
সেই যাত্রায় তোমারো মাধুরী
প্রলয়ে লভিবে গতি।
এতই সহজে মহাশিল্পীর
আপনার এত ক্ষতি
কেমন করিয়া সয়,
প্রকাশে বিনাশে বাঁধিয়া সূত্র
ক্ষয়ে নাহি মানে ক্ষয়।
যে দান তাহার সবার অধিক দান
মাটির পাত্রে সে পায় আপন স্থান

ক্ষণভঙ্গুর দিনে
নিমেষ-কিনারে বিশ্ব তাহারে
বিস্ময়ে লয় চিনে।
অসীম যাহার মূল্য সে-ছবি
সামান্য পটে আঁকি
মুছে ফেলে দেয় লোলুপেরে দিয়ে ফাঁকি।
দীর্ঘকালের ক্লান্ত আঁখির উপেক্ষা হতে তারে
সরায় অন্ধকারে।
দেখিতে দেখিতে দেখে না যখন প্রাণ
বিস্মৃতি আসি অবগুণ্ঠনে
রাখে তার সম্মান।
হরণ করিয়া লয় তারে সচকিতে,
লুব্ধ হাতের অঙ্গুলি তারে
পারে না চিহ্ন দিতে।

[উদীচী। শান্তিনিকেতন]
১৫ জানুয়ারি ১৯৪০

অনাবৃষ্টি

প্রাণের সাধন কবে নিবেদন
করেছি চরণতলে,
অভিষেক তার হল না তোমার
করুণ নয়নজলে।
রসের বাদল নামিল না কেন
তাপের দিনে।
ঝরে গেল ফুল, মালা পরাই নি
তোমার গলে।

মনে হয়েছিল, দেখেছি করুণা
আঁখির পাতে—
উড়ে গেল কোথা শুকানো যূথীর সাথে।

যদি এ মাটিতে চলিতে চলিতে
পড়িত তোমার দান
এ মাটি লভিত প্রাণ,
একদা গোপনে ফিরে পেতে তারে
অমৃত ফলে।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি ১৯৪০

নতুন রঙ

এ ধূসর জীবনের গোধূলি,
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি,
মুছে-আসা সেই ম্লান ছবিতে
রঙ দেয় গুঞ্জনগীতি।

ফাগুনের চম্পকপরাগে
সেই রঙ জাগে,
ঘুম ভাঙা কোকিলের কূজনে
সেই রঙ লাগে,
সেই রঙ পিয়ালের ছায়াতে
ঢেলে দেয় পূর্ণিমাতিথি।

এই ছবি ভৈরবী-আলাপে
দোলে মোর কম্পিত বক্ষে,
সেই ছবি সেতারের প্রলাপে
মরীচিকা এনে দেয় চক্ষে,
বুকের লালিম-রঙে রাঙানো
সেই ছবি স্বপ্নের অতিথি।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি ১৯৪০

গানের খেয়া

যে গান আমি গাই
জানি নে সে
কার উদ্দেশে।
যবে জাগে মনে
অকারণে
চপল হাওয়া
সুর যায় ভেসে
কার উদ্দেশে।

ওই মুখে চেয়ে দেখি,
জানি নে তুমিই সে কি
অতীত কালের মুরতি এসেছ
নতুন কালের বেশে।
কভু জাগে মনে,
যে আসে নি এ জীবনে
ঘাট খুঁজি খুঁজি
গানের খেয়া সে মাগিতেছে বুঝি
আমার তীরেতে এসে

১৩।১।৪০

অধরা

অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে
এ মোর ছন্দোবন্ধনে।
বলাকাপাঁতির পিছিয়ে-পড়া ও পাখি,
বাসা সুদূরের বনের প্রাঙ্গণে।
গত ফসলের পলাশের রাঙিমারে
ধরে রাখে ওর পাখা,
ঝরা শিরীষের পেলব আভাস
ওর কাকলিতে মাখা।

শুনে যাও বিদেশিনী,
তোমার ভাষায় ওরে
ডাকো দেখি নাম ধ'রে।

ও জানে তোমারি দেশের আকাশ
তোমারি রাতের তারা,
তব যৌবন-উৎসবে ও যে
গানে গানে দেয় সাড়া,
ওর দুটি পাখা চঞ্চলি উঠে
তব হৃৎকম্পনে।
ওর বাসাখানি তব কুঞ্জের
নিভৃত প্রাঙ্গণে।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি ১৯৪০

ব্যথিতা

জাগায়ো না ওরে, জাগায়ো না।
ও আজি মেনেছে হার
ক্রূর বিধাতার কাছে।
সব চাওয়া ও যে দিতে চায় নিঃশেষে
অতলে জলাঞ্জলি।

দুঃসহ দুরাশার
গুরুভার যাক দূরে
কৃপণ প্রাণের ইতর বঞ্চনা।
আসুক নিবিড় নিদ্রা,
তামসী মসীর তূলিকায়
অতীত দিনের বিদ্রূপবাণী
রেখায় রেখায় মুছে মুছে দিক
স্মৃতির পত্র হতে,
থেমে যাক ওর বেদনার গুঞ্জন
সুপ্ত পাখির স্তব্ধ নীড়ের মতো।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি ১৯৪০

বিদায়

বসন্ত সে যায় তো হেসে, যাবার কালে
শেষ কুসুমের পরশ রাখে বনের ভালে।
তেমনি তুমি যাবে জানি,
ঝলক দেবে হাসিখানি,
অলক হতে খসবে অশোক নাচের তালে।

ভাসান-খেলার তরীখানি চলবে বেয়ে,
একলা ঘাটে রইব চেয়ে।

অস্তরবি তোমার পালে
রঙিন রশ্মি যখন ঢালে
কালিমা রয় আমার রাতের
অন্তরালে।

[১৩৪৬]

যাবার আগে

উদাস হাওয়ার পথে পথে
মুকুলগুলি ঝরে,
কুড়িয়ে নিয়ে এনেছি তাই
লহো করুণ করে।
যখন যাব চলে
ফুটবে তোমার কোলে,
মালা গাঁথার আঙুল যেন
আমার স্মরণ করে।

ও হাতখানি হাতে নিয়ে
বসব তোমার পাশে
ফুল-বিছানো ঘাসে,
কানাকানির সাক্ষী রইবে তারা।
বউ-কথা-কও ডাকবে তন্দ্রাহারা।

স্মৃতির ডালায় রইবে আভাসগুলি
কালকে দিনের তরে।
শিরীষ-পাতায় কাঁপবে আলো
নীরব দ্বিপ্রহরে।

[১৩৪৬]

সানাই

সারারাত ধ'রে
গোছা গোছা কলাপাতা আসে গাড়ি ভ'রে ।
আসে সরা খুরি
ভূরি ভূরি ।
এপাড়া ওপাড়া হতে যত
রবাহূত অনাহূত আসে শত শত ;
প্রবেশ পাবার তরে
ভোজনের ঘরে
উর্ধ্বশ্বাসে ঠেলাঠেলি করে ;
ব'সে পড়ে যে পারে যেখানে
নিষেধ না মানে ।
কে কাহারে হাঁক ছাড়ে হৈ হৈ,
এ কই, ও কই ।
রঙিন উষ্ণীষধর
লালরঙা সাজে যত অনুচর
অনর্থক ব্যস্ততায় ফেরে সবে
আপনার দায়িত্বগৌরবে ।
গোরুর গাড়ির সারি হাটের রাস্তায়,
রাশি রাশি ধুলো উড়ে যায়,
রাঙা রাগে
রৌদ্রে গেরুয়া রঙ লাগে ।
ওদিকে ধানের কল দিগন্তে কালিমাধূম্র হাত
উর্ধ্বে তুলি, কলঙ্কিত করিছে প্রভাত ।
ধান-পচানির গন্ধে
বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
মিশাইছে বিষ ।
থেকে থেকে রেলগাড়ি মাঠের ওপারে দেয় শিস
দুই প্রহরের ঘণ্টা বাজে ।

সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি-মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান ।
কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান
কোন্ উদ্‌ভ্রান্তের কাছে,
-বুঝিবার সময় কি আছে ।
অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি ।
সন্ধ্যাতারা-জ্বালা অন্ধকারে
অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তর-মাঝারে,

তেমনি সুদূর স্বচ্ছ সুর
গভীর মধুর
অমর্ত লোকের কোন্ বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি।
নামিতে নামিতে এই আনন্দের ধারা
বেদনার মূর্ছনায় হয় আত্মহারা।
বসন্তের যে দীর্ঘনিশ্বাস
বিকচ বকুলে আনে বিদায়ের বিমর্ষ আভাস,
সংশয়ের আবেগ কাঁপায়
সদ্যঃপাতী শিথিল চাঁপায়,
তারি স্পর্শ লেগে
সাহানার রাগিণীতে বৈরাগিণী ওঠে যেন জেগে,
চলে যায় পথহারা অর্থহারা দিগন্তের পানে।

কতবার মনে ভাবি, কী যে সে কে জানে।
মনে হয়, বিশ্বের যে মূল উৎস হতে
সৃষ্টির নির্ঝর ঝরে শূন্যে শূন্যে কোটি কোটি স্রোতে,
এ রাগিণী সেথা হতে আপন ছন্দের পিছু পিছু
নিয়ে আসে বস্তুর অতীত কিছু
হেন ইন্দ্রজাল
যার সুর যার তাল
রূপে রূপে পূর্ণ হয়ে উঠে
কালের অঞ্জলিপুটে।
প্রথম যুগের সেই ধ্বনি
শিরায় শিরায় উঠে রণরণি;
মনে ভাবি, এই সুর প্রত্যহের অবরোধ-'পরে
যতবার গভীর আঘাত করে
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবী যুগ-আরম্ভের অজানা পর্যায়।
নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই,
মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে
যেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরক-সম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে।

উদীচী। শান্তিনিকেতন
৪।১।৪০

পূর্ণা

তুমি গো পঞ্চদশী
শুক্লা নিশার অভিসারপথে
চরম তিথির শশী।
স্মিত স্বপ্নের আভাস লেগেছে
বিহ্বল তব রাতে।
ক্বচিৎ চকিত বিহগকাকলি
তব যৌবনে উঠিছে আকুলি
নব আষাঢ়ের কেতকী গন্ধ-
শিথিলিত নিদ্রাতে।

যেন অশ্রুত বনমর্মর
তোমার বক্ষে কাঁপে থরথর।
অগোচর চেতনার
অকারণ বেদনার
ছায়া এসে পড়ে মনের দিগন্তে,
গোপন অশান্তি
উছলিয়া তুলে ছলছল জল
কজ্জল-আঁখিপাতে।

[শান্তিনিকেতন]
১০।১।৪০

কৃপণা

এসেছিনু দ্বারে ঘনবর্ষণ রাতে,
প্রদীপ নিবালে কেন অঞ্চলঘাতে।
কালো ছায়াখানি মনে পড়ে গেল আঁকা,
বিমুখ মুখের ছবি অন্তরে ঢাকা,
কলঙ্করেখা যেন
চিরদিন চাঁদ বহি চলে সাথে সাথে

কেন বাধা হল দিতে মাধুরীর কণা
হায় হায়, হে কৃপণা।

তব যৌবন-মাঝে
লাবণ্য বিরাজে,
লিপিখানি তার নিয়ে এসে তবু
কেন যে দিলে না হাতে।

[জানুয়ারি ১৯৪০]

ছায়াছবি

আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি
সজল নীলাকাশে ।
আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার ভাসে ।

বারিঝরা বনের গন্ধ নিয়া
পরশহারা বরণমালা গাঁথে আমার প্রিয়া ।

আমার প্রিয়া ঘনশ্রাবণধারায়
আকাশ ছেয়ে মনের কথা হারায়,
আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে
নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে ।

[১৩৪৫]

স্মৃতির ভূমিকা

আজি এই মেঘমুক্ত সকালের স্নিগ্ধ নিরালায়
অচেনা গাছের যত ছিন্ন ছিন্ন ছায়ার ডালায়
রৌদ্রপুঞ্জ আছে ভরি ।
সারাবেলা ধরি
কোন্ পাখি আপনারি সুরে কুতূহলী
আলস্যের পেয়ালায় ঢেলে দেয় অস্ফুট কাকলি ।
হঠাৎ কী হল মতি,
সোনালি রঙের প্রজাপতি
আমার রুপালি চুলে
বসিয়া রয়েছে পথ ভুলে ।
সাবধানে থাকি, লাগে ভয়,
পাছে ওর জাগাই সংশয়—
ধরা প'ড়ে যায় পাছে, আমি নই গাছের দলের,
আমার বাণী সে নহে ফুলের ফলের ।

চেয়ে দেখি, ঘন হয়ে কোথা নেমে গেছে ঝোপঝাড়
সম্মুখে পাহাড়
আপনার অচলতা ভুলে থাকে বেলা-অবেলায়,
হামাগুড়ি দিয়ে চলে দলে দলে মেঘের খেলায় ।
হোথা শুষ্ক জলধারা
শব্দহীন রচিছে ইশারা

পরিশ্রান্ত নিদ্রিত বর্ষার। নুড়িগুলি
বনের ছায়ার মধ্যে অস্থিসার প্রেতের অঙ্গুলি
নির্দেশ করিছে তারে যাহা নিরর্থক,
নির্ঝরিণী-সর্পিণীর দেহচ্যুত ত্বক্।

এখনি এ আমার দেখাতে
মিলায়েছে শৈলশ্রেণী তরঙ্গিত নীলিম রেখাতে
আপন অদৃশ্য লিপি। বাড়ির সিঁড়ির 'পরে
স্তরে স্তরে
বিদেশী ফুলের টব, সেথা জেরেনিয়মের গন্ধ
খসিয়া নিয়েছে মোর ছন্দ
এ চারি দিকের এই-সব নিয়ে সাথে
বর্ণে গন্ধে বিচিত্রিত একটি দিনের ভূমিকাতে
এটুকু রচনা মোর বাণীর যাত্রায় হোক পার
যে ক'দিন তার ভাগ্যে সময়ের আছে অধিকার।

মংপু
৮ জুন ১৯৩৯

মানসী

মনে নেই, বুঝি হবে অগ্রহান মাস,
তখন তরণীবাস
ছিল মোর পদ্মাবক্ষ-'পরে।
বামে বালুচরে
সর্বশূন্য শুভ্রতার না পাই অবধি।
ধারে ধারে নদী
কলরবধারা দিয়ে নিঃশব্দেরে করিছে মিনতি।
ওপারেতে আকাশের প্রশান্ত প্রণতি
নেমেছে মন্দিরচূড়া-'পরে।
হেথা-হোথা পলিমাটিস্তরে
পাড়ির নীচের তলে
ছোলা-খেত ভরেছে ফসলে।
অরণ্যে নিবিড় গ্রাম নীলিমার নিম্নান্তের পটে;
বাঁধা মোর নৌকাখানি জনশূন্য বালুকার তটে

পূর্ণ যৌবনের বেগে
নিরুদ্দেশ বেদনার জোয়ার উঠেছে মনে জেগে
মানসীর মায়ামূর্তি বহি।
ছন্দের বুনানি গেঁথে অদেখার সাথে কথা কহি।

ম্লানরৌদ্র অপরাহ্ণবেলা
পাণ্ডুর জীবন মোর হেরিলাম প্রকাণ্ড একেলা
অনারব্ধ সৃজনের বিশ্বকর্তা-সম।
সুদূর দুর্গম
কোন্‌ পথে যায় শোনা
অগোচর চরণের স্বপ্নে আনাগোনা।
প্রলাপ বিছায়ে দিনু আগন্তুক অচেনার লাগি,
আহ্বান পাঠানু শূন্যে তারি পদপরশন মাগি

শীতের কৃপণ বেলা যায়।
ক্ষীণ কুয়াশায়
অস্পষ্ট হয়েছে বালি।
সায়াহ্নের মলিন সোনালি
পলে পলে
বদল করিছে রঙ মসৃণ তরঙ্গহীন জলে।

বাহিরেতে বাণী মোর হল শেষ,
অন্তরের তারে তারে ঝংকারে রহিল তার রেশ।
অফলিত প্রতীক্ষার সেই গাথা আজি
কবিরে পশ্চাতে ফেলি শূন্যপথে চলিয়াছে বাজি।
কোথায় রহিল তার সাথে
বক্ষস্পন্দে-কম্পমান সেই স্তব্ধ রাতে
সেই সন্ধ্যাতারা।
জন্মসাথিহারা
কাব্যখানি পাড়ি দিল চিহ্নহীন কালের সাগরে
কিছুদিন তরে ;
শুধু একখানি
সূত্রছিন্ন বাণী
সেদিনের দিনান্তের মগ্নস্মৃতি হতে
ভেসে যায় স্রোতে।

[মংপু]
৯ জুন ১৯৩৯

দেওয়া-নেওয়া

বাদল দিনের প্রথম কদমফুল
আমায় করেছ দান,
আমি তো দিয়েছি ভরা শ্রাবণের
মেঘমল্লার গান।
সজল ছায়ার অন্ধকারে
ঢাকিয়া তারে

এনেছি সুরের শ্যামল খেতের
প্রথম সোনার ধান।

আজ এনে দিলে যাহা
হয়তো দিবে না কাল,
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।

স্মৃতিবন্যার উছল প্লাবনে
আমার এ গান শ্রাবণে শ্রাবণে
ফিরিয়া ফিরিয়া বাহিবে তরণী
ভরি তব সম্মান।

[শান্তিনিকেতন]
১০।১।৪০

সার্থকতা

ফাল্গুনের সূর্য যবে
দিল কর প্রসারিয়া সঙ্গীহীন দক্ষিণ অর্ণবে,
অতল বিরহ তার যুগযুগান্তের
উচ্ছ্বসিয়া ছুটে গেল নিত্য-অশান্তের
সীমানার ধারে।

ব্যথার ব্যথিত কারে
ফিরিল খুঁজিয়া,
বেড়ালো যুঝিয়া
আপন তরঙ্গদল-সাথে।

অবশেষে রজনীপ্রভাতে,
জানে না সে কখন দুলায়ে গেল চলি
বিপুল নিশ্বাসবেগে একটুকু মল্লিকার কলি।
উদ্‌বারিল গন্ধ তার,
সচকিয়া লভিল সে গভীর রহস্য আপনার।
এই বার্তা ঘোষিল অম্বরে—
সমুদ্রের উদ্‌বোধন পূর্ণ আজি পুষ্পের অন্তরে।

[শান্তিনিকেতন]
৭ আশ্বিন ১৩৪৫

মায়া

আজ এ মনের কোন্ সীমানায়
যুগান্তরের প্রিয়া।
দূরে-উড়ে-যাওয়া মেঘের ছিদ্র দিয়া
কখনো আসিছে রৌদ্র কখনো ছায়া,
আমার জীবনে তুমি আজ শুধু মায়া ;
সহজে তোমায় তাই তো মিলাই সুরে,
সহজেই ডাকি সহজেই রাখি দূরে।
স্বপ্নরূপিণী তুমি
আকুলিয়া আছ পথ-খোয়া মোর
প্রাণের স্বর্গভূমি।
নাই কোনো ভার, নাই বেদনার তাপ,
ধূলির ধরায় পড়ে না পায়ের ছাপ।
তাই তো আমার ছন্দে
সহসা তোমার চুলের ফুলের গন্ধে
জাগে নির্জন রাতের দীর্ঘশ্বাস,
জাগে প্রভাতের পেলব তারায়
বিদায়ের স্মিত হাস।
তাই পথে যেতে কাশের বনেতে
মর্মর দেয় আনি
পাশ-দিয়ে-চলা ধানী-রঙ-করা
শাড়ির পরশখানি।
যদি জীবনের বর্তমানের তীরে
আস কভু তুমি ফিরে
স্পষ্ট আলোয়, তবে
জানি না তোমার মায়ার সঙ্গে
কায়ার কি মিল হবে।
বিরহস্বর্গলোকে
সে-জাগরণের রূঢ় আলোয়
চিনিব কি চোখে-চোখে।
সন্ধ্যাবেলায় যে-দ্বারে দিয়েছ
বিরহকরুণ নাড়া,
মিলনের ঘায়ে সে-দ্বার খুলিলে
কাহারো কি পাবে সাড়া।

কালিম্পঙ
২২ জুন ১৯৩৮

অদেয়

তোমায় যখন সাজিয়ে দিলেম দেহ,
করেছ সন্দেহ
সত্য আমার দিই নি তাহার সাথে।
তাই কেবলই বাজে আমার দিনে রাতে
সেই সুতীব্র ব্যথা—
এমন দৈন্য, এমন কৃপণতা,
যৌবন-ঐশ্বর্যে আমার এমন অসম্মান।
সে লাঞ্ছনা নিয়ে আমি পাই নে কোথাও স্থান
এই বসন্তে ফুলের নিমন্ত্রণে।
ধেয়ান-মগ্ন ক্ষণে
নৃত্যহারা শান্ত নদী সুপ্ত তটের অরণ্যচ্ছায়ায়
অবসন্ন পল্লীচেতনায়
মেশায় যখন স্বপ্নে-বলা মৃদু ভাষার ধারা—
প্রথম রাতের তারা
অবাক চেয়ে থাকে,
অন্ধকারের পারে যেন কানাকানির মানুষ পেল কাকে,
হৃদয় তখন বিশ্বলোকের অনন্ত নিভৃতে
দোসর নিয়ে চায় যে প্রবেশিতে—
কে দেয় দুয়ার রুধে,
একলা ঘরের স্তব্ধ কোণে থাকি নয়ন মুদে।
কী সংশয়ে কেন তুমি এলে কাঙাল বেশে।
সময় হলে রাজার মতো এসে
জানিয়ে কেন দাও নি আমায় প্রবল তোমার দাবি।
ভেঙে যদি ফেলতে ঘরের চাবি
ধুলার 'পরে মাথা আমার দিতেম লুটায়ে,
গর্ব আমার অর্ঘ্য হত পায়ে।
দুঃখের সংঘাতে আজি সুধার পাত্র উঠেছে এই ভ'রে,
তোমার পানে উদ্দেশেতে ঊর্ধ্বে আছি ধ'রে
চরম আত্মদান।
তোমার অভিমান
আঁধার ক'রে আছে আমার সমস্ত জগৎ,
পাই নে খুঁজে সার্থকতার পথ।

কালিম্পঙ
১৮ জুন ১৯৩৮

রূপকথায়

কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা
মনে মনে।
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা
মনে মনে।

তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপকথার,
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপকথার,
পারুলবনের চম্পারে মোর হয় জানা
মনে মনে।

সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি
মেঘে মেঘে আকাশকুসুম তুলি।
সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
যাই ভেসে দূর দিশে,
পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার দিই হানা
মনে মনে।

[শান্তিনিকেতন]
১০।১।৪০

আহ্বান

জ্বেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্রদীপ
বিজন ঘরের কোণে।
নামিল শ্রাবণ, কালো ছায়া তার
ঘনাইল বনে বনে।

বিস্ময় আনো ব্যগ্র হিয়ার পরশ-প্রতীক্ষায়
সজল পবনে নীল বসনের চঞ্চল কিনারায়,
দুয়ার-বাহির হতে আজি ক্ষণে ক্ষণে
তব কবরীর করবীমালার বারতা আসুক মনে।

বাতায়ন হতে উৎসুক দুই আঁখি
তব মঞ্জীরধ্বনি পথ বেয়ে
তোমারে কি যায় ডাকি।

কম্পিত এই মোর বক্ষের ব্যথা
অলকে তোমার আনে কি চঞ্চলতা
বকুলবনের মুখরিত সমীরণে।

[শান্তিনিকেতন]
১০।১।৪০

অধীরা

চির-অধীরার বিরহ-আবেগ
দূরদিগন্তপথে
ঝঞ্ঝার ধ্বজা উড়ায়ে ছুটিল
মত্ত মেঘের রথে।
দ্বার-ভাঙিবার অভিযান তার,
বার বার কর হানে,
বার বার হাঁকে 'চাই আমি চাই',
ছোটে অলক্ষ্য-পানে।

হুহু হুংকার ঝর্ঝর বর্ষণ,
সঘন শূন্যে বিদ্যুৎঘাতে
তীব্র কী হর্ষণ।
দুর্দাম প্রেম কি এ—
প্রস্তর ভেঙে খোঁজে উত্তর
গর্জিত ভাষা দিয়ে।
মানে না শাস্ত্র, জানে না শঙ্কা,
নাই দুর্বল মোহ—
প্রভুশাপ-'পরে হানে অভিশাপ
দুর্বার বিদ্রোহ।

করুণ ধৈর্যে গনে না দিবস,
সহে না পলেক গৌণ,
তাপসের তপ করে না মান্য,
ভাঙে সে মুনির মৌন।
মৃত্যুরে দেয় টিটকারি তার হাস্যে;
মঞ্জীরে বাজে যে-ছন্দ তার লাস্যে
নহে মন্দাক্রান্তা—
প্রদীপ লুকায়ে শঙ্কিত পায়ে
চলে না কোমলকান্তা।

নিষ্ঠুর তার চরণতাড়নে
বিঘ্ন পড়িছে খসে,
বিধাতারে হানে ভর্ৎসনাবাণী
বজ্রের নির্ঘোষে।
নিলাজ ক্ষুধায় অগ্নি বরষে
নিঃসংকোচ আঁখি,
ঝড়ের বাতাসে অবগুণ্ঠন
উড্ডীন থাকি থাকি।

মুক্ত বেণীতে, স্রস্ত আঁচলে,
উচ্ছৃঙ্খল সাজে
দেখা যায় ওর মাঝে
অনাদি কালের বেদনার উদ্‌বোধন–
সৃষ্টিযুগের প্রথম রাতের রোদন—
যে-নবসৃষ্টি অসীম কালের
সিংহদুয়ারে থামি
হেঁকেছিল তার প্রথম মন্ত্রে
'এই আসিয়াছি আমি'।

মংপু
৮ জুন ১৯৩৮

বাসাবদল

যেতেই হবে।
দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের মতো
ব্যান্ডেজেতে বাঁধা।
একটু চলা, একটু থেমে-থাকা,
টেবিলটাতে হেলান দিয়ে বসা
সিঁড়ির দিকে চেয়ে।
আকাশেতে পায়রাগুলো ওড়ে
ঘুরে ঘুরে চক্র বেঁধে।
চেয়ে দেখি দেয়ালে সেই লেখনখানি
গেল বছরের,
লাল রঙা পেন্‌সিলে লেখা—
'এসেছিলুম ; পাই নি দেখা ; যাই তা হলে।
দোসরা ডিসেম্বর।'
এ লেখাটি ধুলো ঝেড়ে রেখেছিলেম তাজা,
যাবার সময় মুছে দিয়ে যাব।
পুরোনো এক ব্লটিং কাগজ
চায়ের ভোজে অলস ক্ষণের হিজিবিজি-কাটা,
ভাঁজ করে তাই নিলেম জামার নীচে।
প্যাক করতে গা লাগে না,
মেজের 'পরে বসে আছি পা ছড়িয়ে।
হাতপাখাটা ক্লান্ত হাতে
অন্যমনে দোলাই ধীরে ধীরে।
ডেস্কে ছিল মেডেন্‌-হেয়ার পাতায় বাঁধা
শুকনো-গোলাপ,

কোলে নিয়ে ভাবছি বসে—
কী ভাবছি কে জানে।

অবিনাশের ফরিদপুরে বাড়ি,
আনুকূল্য তার
বিশেষ কাজে লাগে
আমার এই দশাতেই।
কোথা থেকে আপনি এসে জোটে
চাইতে না চাইতেই,
কাজ পেলে সে ভাগ্য ব'লেই মানে—
খাটে মুটের মতো।
জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা,
লাগল ক'ষে আস্তিন গুটিয়ে।
ওডিকলোন মুড়ে নিল পুরোনো এক আনন্দবাজারে।
ময়লা মোজায় জড়িয়ে নিল এমোনিয়া।
ড্রেসিং কেসে রাখল খোপে-খোপে
হাত-আয়না, রুপোয় বাঁধা বুরুশ,
নখ চাঁচবার উখো,
সাবানদানি, ক্রিমের কৌটো, ম্যাকাসারের তেল।
ছেড়ে-ফেলা শাড়িগুলো
নানা দিনের নিমন্ত্রণের
ফিকে গন্ধ ছড়িয়ে দিল ঘরে।
সেগুলো সব বিছিয়ে দিয়ে চেপে চেপে
পাট করতে অবিনাশের যে-সময়টা গেল
নেহাত সেটা বেশি।
বারে বারে ঘুরিয়ে আমার চটিজোড়া
কোঁচা দিয়ে যত্নে দিল মুছে,
ফুঁ দিয়ে সে উড়িয়ে দিল ধুলোটা কাল্পনিক
মুখের কাছে ধ'রে।
দেয়াল থেকে খসিয়ে নিল ছবিগুলো,
একটা বিশেষ ফোটো
মুছল আপন আস্তিনেতে অকারণে।
একটা চিঠির খাম
হঠাৎ দেখি লুকিয়ে নিল
বুকের পকেটেতে।
দেখে যেমন হাসি পেল, পড়ল দীর্ঘশ্বাস।
কার্পেটটা গুটিয়ে দিল দেয়াল ঘেঁষে—
জন্মদিনের পাওয়া,
হল বছর-সাতেক।

অবসাদের ভারে অলস মন,
চুল বাঁধতে গা লাগে নাই সারা সকালবেলা,

আলগা আঁচল অন্যমনে বাঁধি নি ব্রোচ দিয়ে।
কুটিকুটি ছিঁড়তেছিলেম একে-একে
পুরোনো সব চিঠি—
ছড়িয়ে রইল মেঝের 'পরে, ঝাঁট দেবে না কেউ
বোশেখমাসের শুকনো হাওয়া ছাড়া।
ডাক আনল পাড়ার পিয়ন বুড়ো,
দিলেম সেটা কাঁপা হাতে রিডাইরেক্টেড ক'রে।
রাস্তা দিয়ে চলে গেল তপসি-মাছের হাঁক,
চমকে উঠে হঠাৎ পড়ল মনে—
নাই কোনো দরকার।
মোটর-গাড়ির চেনা শব্দ কখন দূরে মিলিয়ে গেছে
সাড়ে-দশটা বেলায়
পেরিয়ে গিয়ে হাজরা রোডের মোড়।

উজাড় হল ঘর,
দেওয়ালগুলো অবুঝ-পারা তাকিয়ে থাকে ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে
যেখানে কেউ নেই।
সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছে দিল অবিনাশ
ট্যাক্সিগাড়ি-'পরে।
এই দরোজায় শেষ বিদায়ের বাণী
শোনা গেল ওই ভক্তের মুখে—
বললে, 'আমায় চিঠি লিখো।'
রাগ হল তাই শুনে
কেন জানি বিনা কারণেই।

[শান্তিনিকেতন
অগস্ট ১৯৩৮]

শেষ কথা

রাগ কর নাই কর, শেষ কথা এসেছি বলিতে
তোমার প্রদীপ আছে, নাইকো সলিতে।
শিল্প তার মূল্যবান, দেয় না সে আলো,
চোখেতে জড়ায় লোভ, মনেতে ঘনায় ছায়া কালো
অবসাদে। তবু তারে প্রাণপণে রাখি যতনেই,
ছেড়ে যাব তার পথ নেই।
অন্ধকারে অন্ধদৃষ্টি নানাবিধ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরে
আচ্ছন্ন করিয়া বাস্তবেরে।

অস্পষ্ট তোমারে যবে
ব্যগ্রকণ্ঠে ডাক দিই অত্যুক্তির স্তবে
তোমারে লঙ্ঘন করি সে-ডাক বাজিতে থাকে সুরে
তাহারি উদ্দেশে আজো যে রয়েছে দূরে।
হয়তো সে আসিবে না কভু,
তিমিরে আচ্ছন্ন তুমি তারেই নির্দেশ কর তবু।
তোমার এ দূত অন্ধকার
গোপনে আমার
ইচ্ছারে করিয়া পঙ্গু গতি তার করেছে হরণ,
জীবনের উৎসজলে মিশায়েছে মাদক মরণ।
রক্তে মোর যে-দুর্বল আছে
শঙ্কিত বক্ষের কাছে
তারেই সে করেছে সহায়,
পশুবাহনের মতো মোহভার তাহারে বহায়।
সে যে একান্তই দীন,
মূল্যহীন,
নিগড়ে বাঁধিয়া তারে
আপনারে
বিড়ম্বিত করিতেছ পূর্ণ দান হতে,
এ প্রমাদ কখনো কি দেখিবে আলোতে।
প্রেম নাহি দিয়ে যারে টানিয়াছ উচ্ছিষ্টের লোভে
সে-দীন কি পার্শ্বে তব শোভে।
কভু কি জানিতে পাবে অসম্মানে নত এই প্রাণ
বহন করিছে নিত্য তোমারি আপন অসম্মান।
আমারে যা পারিলে না দিতে
সে-কার্পণ্য তোমারেই চিরদিন রহিল বঞ্চিতে।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
২২ মার্চ ১৯৩৯

মুক্তপথে

বাঁকাও ভুরু দ্বারে আগল দিয়া,
চক্ষু করো রাঙা,
ওই আসে মোর জাত-খোয়ানো প্রিয়া
ভদ্র-নিয়ম-ভাঙা।
আসন পাবার কাঙাল ও নয় তো
আচার-মানা ঘরে—
আমি ওকে বসাব হয়তো
ময়লা কাঁথার 'পরে।

সাবধানে রয় বাজার-দরের খোঁজে
সাধু গাঁয়ের লোক,
ধুলার বরন ধূসর বেশে ও যে
এড়ায় তাদের চোখ ।
বেশের আদর করতে গিয়ে ওরা
রূপের আদর ভোলে—

আমার পাশে ও মোর মনোচোরা,
একলা এসো চলে ।
হঠাৎ কখন এসেছ ঘর ফেলে
তুমি পথিক-বধূ,
মাটির ভাঁড়ে কোথায় থেকে পেলে
পদ্মবনের মধু ।
ভালোবাসি ভাবের সহজ খেলা
এসেছ তাই শুনে—
মাটির পাত্রে নাইকো আমার হেলা
হাতের পরশগুণে ।
পায়ে নূপুর নাই রহিল বাঁধা,
নাচেতে কাজ নাই,
যে-চলনটি রক্তে তোমার সাধা
মন ভোলাবে তাই ।
লজ্জা পেতে লাগে তোমার লাজ
ভূষণ নেইকো ব'লে,
নষ্ট হবে নেই তো এমন সাজ
ধুলোর 'পরে চ'লে ।
গাঁয়ের কুকুর ফেরে তোমার পাশে,
রাখালরা হয় জড়ো,
বেদের মেয়ের মতন অনায়াসে
টাট্টু ঘোড়ায় চড়ো ।
ভিজে শাড়ি হাঁটুর 'পরে তুলে
পার হয়ে যাও নদী,
বামুনপাড়ার রাস্তা যে যাই ভুলে
তোমায় দেখি যদি ।
হাটের দিনে শাক তুলে নাও ক্ষেতে
চুপড়ি নিয়ে কাঁখে,
মটর কলাই খাওয়াও আঁচল পেতে
পথের গাধাটাকে ।
মানো নাকো বাদল দিনের মানা,
কাদায়-মাখা পায়ে
মাথায় তুলে কচুর পাতাখানা
যাও চলে দূর গাঁয়ে ।

পাই তোমারে যেমন খুশি তাই
যেথায় খুশি সেথা ।
আয়োজনের বালাই কিছু নাই
জানবে বলো কে তা ।
সতর্কতার দায় ঘুচায়ে দিয়ে
পাড়ার অনাদরে
এসো ও মোর জাত-খোয়ানো প্রিয়ে,
মুক্ত পথের 'পরে ।

[শ্রীনিকেতন]
৬ নভেম্বর ১৯৩৬

দ্বিধা

এসেছিলে তবু আস নাই, তাই
জানায়ে গেলে
সমুখের পথে পলাতকা পদ-পতন ফেলে ।
তোমার সে উদাসীনতা
উপহাসভরে জানালো কি মোর দীনতা ।
সে কি ছল-করা অবহেলা, জানি না সে—
চপল চরণ সত্য কি ঘাসে ঘাসে
গেল উপেক্ষা মেলে ।

পাতায় পাতায় ফোঁটা ফোঁটা ঝরে জল,
ছলছল করে শ্যাম বনান্ততল ।

তুমি কোথা দূরে কুঞ্জছায়াতে
মিলে গেলে কলমুখর মায়াতে,
পিছে পিছে তব ছায়ারৌদ্রের
খেলা গেলে তুমি খেলে ।

[জানুয়ারি ১৯৪০]

আধোজাগা

রাত্রে কখন মনে হল যেন
ঘা দিলে আমার দ্বারে,
জানি নাই আমি জানি নাই, তুমি
স্বপ্নের পরপারে।
অচেতন মন-মাঝে
নিবিড় গহনে ঝিমিঝিমি ধ্বনি বাজে,
কাঁপিছে তখন বেণুবনবায়ু
ঝিল্লির ঝংকারে।

জাগি নাই আমি জাগি নাই গো,
আধোজাগরণ বহিছে তখন
মৃদুমন্থরধারে।

গভীর মন্দ্রস্বরে
কে করেছে পাঠ পথের মন্ত্র
মোর নির্জন ঘরে।
জাগি নাই আমি জাগি নাই, যবে
বনের গন্ধ রচিল ছন্দ
তন্দ্রার চারি ধারে।

[জানুয়ারি ১৯৪০]

যক্ষ

যক্ষের বিরহ চলে অবিশ্রাম অলকার পথে
পবনের ধৈর্যহীন রথে
বর্ষাবাষ্প-ব্যাকুলিত দিগন্তে ইঙ্গিত-আমন্ত্রণে
গিরি হতে গিরিশীর্ষে, বন হতে বনে।
সমুৎসুক বলাকার ডানার আনন্দ-চঞ্চলতা
তারি সাথে উড়ে চলে বিরহীর আগ্রহ-বারতা
চিরদূর স্বর্গপুরে,
ছায়াচ্ছন্ন বাদলের বক্ষোদীর্ণ নিশ্বাসের সুরে
নিবিড় ব্যথার সাথে পদে পদে পরমসুন্দর
পথে পথে মেলে নিরন্তর।

পথিক কালের মর্মে জেগে থাকে বিপুল বিচ্ছেদ ;
পূর্ণতার সাথে ভেদ
মিটাতে সে নিত্য চলে ভবিষ্যের তোরণে তোরণে
নব নব জীবনে মরণে।

এ বিশ্ব তো তারি কাব্য, মন্দাক্রান্তে তারি রচে টীকা
বিরাট দুঃখের পটে আনন্দের সুদূর ভূমিকা।
ধন্য যক্ষ সেই
সৃষ্টির আগুন-জ্বালা এই বিরহেই।

হোথা বিরহিণী ও যে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়,
দণ্ড পল গনি গনি মন্থর দিবস তার যায়।
সম্মুখে চলার পথ নাই,
রুদ্ধ কক্ষে তাই
আগন্তুক পান্থ-লাগি ক্লান্তিভারে ধূলিশায়ী আশা।
কবি তারে দেয় নাই বিরহের তীর্থগামী ভাষা।
তার তরে বাণীহীন যক্ষপুরী ঐশ্বর্যের কারা
অর্থহারা—
নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
অস্তিত্বের এত বড়ো শোক
নাই মর্তভূমে
জাগরণ নাহি যার স্বপ্নমুগ্ধ ঘুমে।
প্রভুবরে যক্ষের বিরহ
আঘাত করিছে ওর দ্বারে অহরহ।
স্তব্ধগতি চরমের স্বর্গ হতে
ছায়ায়-বিচিত্র এই নানাবর্ণ মর্তের আলোতে
উহারে আনিতে চাহে
তরঙ্গিত প্রাণের প্রবাহে।

কালিম্পঙ
২০ জুন ১৯৩৮

পরিচয়

বয়স ছিল কাঁচা,
বিদ্যালয়ের মধ্যপথের থেকে
বার হয়েছি আই. এ.-র পালা সেরে।
মুক্ত বেণী পড়ল বাঁধা খোঁপার পাকে,
নতুন রঙের শাড়ি দিয়ে
দেহ ঘিরে যৌবনকে নতুন নতুন ক'রে
পেয়েছিলুম বিচিত্র বিস্ময়ে।

অচিন জগৎ বুকের মধ্যে পাঠিয়ে দিত ডাক
কখন থেকে থেকে,
দুপুরবেলায় অকাল ধারায় ভিজে মাটির আতপ্ত নিশ্বাসে,
চৈত্ররাতের মদির ঘন নিবিড় শূন্যতায়,

ভোরবেলাকার তন্দ্রাবিবশ দেহে
ঝাপসা আলোয় শিশির-ছোঁয়া আলস-জড়িমাতে ।
যে-বিশ্ব মোর স্পষ্ট জানার শেষের সীমায় থাকে
তারি মধ্যে, গুণী, তুমি অচিন সবার চেয়ে
তোমার আপন রচন-অন্তরালে ।
কখনো-বা মাসিকপত্রে চমক দিত প্রাণে
অপূর্ব-এক বাণীর ইন্দ্রজাল,
কখনো-বা আলগা-মলাট বইয়ের দাগি পাতায়
হাজারোবার-পড়া লেখায় পুরনো কোন্ লাইন
হানত বেদন বিদ্যুতেরই মতো,
কখনো-বা বিকেলবেলায় ট্রামে চ'ড়ে
হঠাৎ মনে উঠত গুনগুনিয়ে
অকারণে একটি তোমার শ্লোক ।

অচিন কবি, তোমার কথার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা যেত একটি ছায়াছবি—
স্বপ্নঘোড়ায়-চড়া তুমি খুঁজতে বেরিয়েছ
তোমার মানসীকে
সীমাবিহীন তেপান্তরে,
রাজপুত্র তুমি যে রূপকথার ।

আয়নাখানার সামনে সেদিন চুল বাঁধবার বেলায়
মনে যদি ক'রে থাকি সে রাজকন্যা আমিই,
হেসো না তাই ব'লে ।
তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে-ভাগেই
ছুঁইয়েছিলে রুপোর কাঠি,
জাগিয়েছিলে ঘুমন্ত এই প্রাণ ।
সেই বয়সে আমার মতো অনেক মেয়ে
ওই কথাটাই ভেবেছিল মনে ;
তোমায় তারা বারে বারে পত্র লিখেছিল,
কেবল তোমায় দেয় নি ঠিকানাটা ।

হায় রে খেয়াল ! খেয়াল এ কোন্ পাগলা বসন্তের ;
ওই খেয়ালের কুয়াশাতে আবছা হয়ে যেত
কত দুপুরবেলায়
কত ক্লাসের পড়া,
উছল হয়ে উঠত হঠাৎ
যৌবনেরই খাপছাড়া এক ঢেউ ।

রোমান্স বলে একেই—
নবীন প্রাণের শিল্পকলা আপনা ভোলাবার ।

আর-কিছুদিন পরেই
কখন ভাবের নীহারিকায় রশ্মি হত ফিকে—
বয়স যখন পেরিয়ে যেত বিশ-পঁচিশের কোঠা,
হাল-আমলের নভেল প'ড়ে
মনের যখন আব্রু যেত ভেঙে,
তখন হাসি পেত
আজকে দিনের কচিমেয়েপনায়।

সেই যে তরুণীরা
ক্লাসের পড়ার উপলক্ষে
পড়ত বসে 'ওড্‌স্‌ টু নাইটিঙ্গেল',
না-দেখা কোন্‌ বিদেশবাসী বিহঙ্গমের
না-শোনা সংগীতে
বক্ষে তাদের মোচড় দিত
ঝরোখা সব খুলে যেত হৃদয়-বাতায়নে
ফেনায়িত সুনীল শূন্যতায়
উজাড় পরীস্থানে।

বরষ-কয়েক যেতেই
চোখে তাদের জুড়িয়ে গেল দৃষ্টিদহন
মরীচিকায়-পাগল হরিণীর।
ছেঁড়া মোজা শেলাই করার এল যুগান্তর,
বাজারদরের ঠকা নিয়ে চাকরগুলোর সঙ্গে বকাবকির,
চা-পান-সভায় হাঁটুজলের সখ্যসাধনার।
কিন্তু আমার স্বভাব-বশে
ঘোর ভাঙে নি যখন ভোলামনে
এলুম তোমার কাছাকাছি।

চেনাশোনার প্রথম পালাতেই
পড়ল ধরা, একেবারে দুর্লভ নও তুমি—
আমার লক্ষ্য-সন্ধানেরই আগেই
তোমার দেখি আপনি বাঁধন-মানা।
হায় গো রাজার পুত্র,
একটু পরশ দেবামাত্র পড়ল মুকুট খ'সে
আমার পায়ের কাছে,
কটাক্ষেতে চেয়ে তোমার মুখে
হেসেছিলুম আবিল চোখের বিহ্বলতায়।
তাহার পরে হঠাৎ কবে মনে হল—
দিগন্ত মোর পাংশু হয়ে গেল,
মুখে আমার নামল ধূসর ছায়া;
পাখির কণ্ঠে মিইয়ে গেল গান,
পাখায় লাগল উড়ুক্ষু পাগলামি।

পাখির পায়ে এঁটে দিলেম ফাঁস
অভিমানের ব্যঙ্গস্বরে,
বিচ্ছেদেরই ক্ষণিক বঞ্চনায়,
কটুরসের তীব্র মাধুরীতে।

এমন সময় বেড়াজালের ফাঁকে
পড়ল এসে আরেক মায়াবিনী ;
রণিতা তার নাম।
এ কথাটা হয়তো জান—
মেয়েতে মেয়েতে আছে বাজি-রাখার পণ
ভিতরে ভিতরে।
কটাক্ষে সে চাইল আমায়, তারে চাইলুম আমি,
পাশা ফেলল নিপুণ হাতের ঘুরুনিতে,
এক দানেতেই হল তারি জিত।
জিত ? কে জানে তাও সত্য কি না।
কে জানে তা নয় কি তারি
দারুণ হারের পালা।

সেদিন আমি মনের ক্ষোভে
বলেছিলুম কপালে কর হানি,
চিনব ব'লে এলেম কাছে,
হল বটে নিংড়ে নিয়ে চেনা
চরম বিকৃতিতে।
কিন্তু তবু ধিক্ আমারে, যতই দুঃখ পাই
পাপ যে মিথ্যে কথা।
আপনাকে তো ভুলিয়েছিলুম যেই তোমারে এলেম ভোলাবারে ;
ঘুলিয়ে-দেওয়া ঘূর্ণিপাকে সেই কি চেনার পথ।
আমার মায়ার জালটা ছিঁড়ে অবশেষে আমায় বাঁচালে যে ;
আবার সেই তো দেখতে পেলেম
আজো তোমার স্বপ্নঘোড়ায়-চড়া
নিত্যকালের সন্ধান সেই মানসসুন্দরীকে
সীমাবিহীন তেপান্তরের মাঠে।

দেখতে পেলেম ছবি,
এই বিশ্বের হৃদয়মাঝে
বসে আছেন অনির্বচনীয়া,
তুমি তাঁরি পায়ের কাছে বাজাও তোমার বাঁশি।
এ-সব কথা শোনাচ্ছে কি সাজিয়ে-বলার মতো।
না বন্ধু, এ হঠাৎ মুখে আসে,
ঢেউয়ের মুখে মোতির ঝিনুক যেন

এ-সব কথা প্রতিদিনের নয় ;
যে-তুমি নও প্রতিদিনের সেই তোমারে দিলাম যে-অঞ্জলি
তোমার দেবীর প্রসাদ রবে তাহে।
আমি কি নই সেই দেবীরই সহচরী,
ছিলাম না কি অচিন রহস্যে
যখন কাছে প্রথম এসেছিলে।

তোমায় বেড়া দিতে গিয়ে আমায় দিলেম সীমা।
তবু মনে রেখো,
আমার মধ্যে আজো আছে চেনার অতীত কিছু

[মংপু]
১৩ জুন ১৯৩৯

নারী

স্বাতন্ত্র্যস্পর্ধায় মত্ত পুরুষেরে করিবারে বশ
যে-আনন্দরস
রূপ ধরেছিল রমণীতে,
ধরণীর ধমনীতে
তুলেছিল চাঞ্চল্যের দোল
রক্তিম হিল্লোল,
সেই আদি ধ্যানমূর্তিটিরে
সন্ধান করিছে ফিরে ফিরে
রূপকার মনে-মনে
বিধাতার তপস্যার সংগোপনে।
পলাতকা লাবণ্য তাহার
বাঁধিবারে চেয়েছে সে আপন সৃষ্টিতে
প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে।
দুর্বাধ্য প্রস্তরপিণ্ডে দুঃসাধ্য সাধনা
সিংহাসন করেছে রচনা
অধরাকে করিতে আপন
চিরন্তন।
সংসারের ব্যবহারে যত লজ্জা ভয়
সংকোচ সংশয়,
শাস্ত্রবচনের ঘের,
ব্যবধান বিধিবিধানের
সকলই ফেলিয়া দূরে
ভোগের অতীত মূল সুরে
নগ্নতা করেছে শুচি,
দিয়ে তারে ভুবনমোহিনী শুভ্ররুচি।

পুরুষের অনন্ত বেদন
মর্তের মদিরা-মাঝে স্বর্গের সুধারে অন্বেষণ।
তারি চিহ্ন যেখানে-সেখানে
কাব্যে গানে,
ছবিতে মূর্তিতে,
দেবালয়ে দেবীর স্তুতিতে।
কালে কালে দেশে দেশে শিল্পস্বপ্নে দেখে রূপখানি,
নাহি তাহে প্রত্যহের গ্লানি।
দুর্বলতা নাহি তাহে, নাহি ক্লান্তি—
টানি লয়ে বিশ্বের সকল কান্তি
আদিস্বর্গলোক হতে নির্বাসিত পুরুষের মন
রূপ আর অরূপের ঘটায় মিলন।
উদ্‌ভাসিত ছিলে তুমি, অয়ি নারী, অপূর্ব আলোকে
সেই পূর্ণ লোকে—
সেই ছবি আনিতেছ ধ্যান ভরি
বিচ্ছেদের মহিমায় বিরহীর নিত্যসহচরী।

আলমোড়া
১৮ মে ১৯৩৭

গানের স্মৃতি

কেন মনে হয়—
তোমার এ গানখানি এখনি যে শোনালে তা নয়।
বিশেষ লগ্নের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই এর সুরে ;
শুধু এই মনে পড়ে, এই গানে দিগন্তের দূরে
আলোর কাঁপনখানি লেগেছিল সন্ধ্যাতারকার
সুগভীর স্তব্ধতায়, সে-স্পন্দন শিরায় আমার
রাগিণীর চমকেতে রহি রহি বিচ্ছুরিছে আলো
আজি দেয়ালির দিনে। আজো এই অন্ধকারে জ্বালো
সেই সায়াহ্নের স্মৃতি, যে নিভৃতে নক্ষত্রসভায়
নীহারিকা ভাষা তার প্রসারিল নিঃশব্দ প্রভায়—
যে ক্ষণে তোমার স্বর জ্যোতির্লোকে দিতেছিল আনি
অনন্তের-পথ-চাওয়া ধরিত্রীর সকরুণ বাণী।
সেই স্মৃতি পার হয়ে মনে মোর এই প্রশ্ন লাগে,
কালের-অতীত প্রান্তে তোমারে কি চিনিতাম আগে।
দেখা হয়েছিল না কি কোনো-এক সংগীতের পথে
অরূপের মন্দিরেতে অপরূপ ছন্দের জগতে।

শান্তিনিকেতন
দেয়ালি [৫ কার্তিক] ১৩৪৫

অবশেষে

যৌবনের অনাহূত রবাহূত ভিড়-করা ভোজে
কে ছিল কাহার খোঁজে,
ভালো করে মনে ছিল না তা
ক্ষণে ক্ষণে হয়েছে আসন পাতা,
ক্ষণে ক্ষণে নিয়েছে সরায়ে।
মালা কেহ গিয়েছে পরায়ে
জেনেছিনু, তবু কে যে জানি নাই তারে।
মাঝখানে বারে বারে
কত কী যে এলোমেলো
কভু গেল, কভু এল।
সার্থকতা ছিল যেইখানে
ক্ষণিক পরশি তারে চলে গেছি জনতার টানে।

সে যৌবনমধ্যাহ্নের অজস্রের পালা
শেষ হয়ে গেছে আজি, সন্ধ্যার প্রদীপ হল জ্বালা।
অনেকের মাঝে যারে কাছে দেখে হয় নাই দেখা
একেলার ঘরে তারে একা
চেয়ে দেখি, কথা কই চুপে চুপে,
পাই তারে না-পাওয়ার রূপে।

শান্তিনিকেতন
৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮

সম্পূর্ণ

প্রথম তোমাকে দেখেছি তোমার
বোনের বিয়ের বাসরে
নিমন্ত্রণের আসরে।
সেদিন তখনো দেখেও তোমাকে দেখি নি,
তুমি যেন ছিলে সূক্ষ্মরেখিণী
ছবির মতো—
পেন্সিলে-আঁকা ঝাপসা ধোঁয়াটে লাইনে
চেহারার ঠিক ভিতর দিকের
সন্ধানটুকু পাই নে।
নিজের মনের রঙ মেলাবার বাটিতে
চাঁপাগি খড়ির মাটিতে
গোলাপি খড়ির রঙ হয় নি যে গোলা,
সোনালি রঙের মোড়ক হয় নি খোলা।

দিনে দিনে শেষে সময় এসেছে আগিয়ে,
তোমার ছবিতে আমারি মনের
রঙ যে দিয়েছি লাগিয়ে।
বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করতে এসে
আনমনা হয়ে শেষে
কেবল তোমার ছায়া
রচে দিয়ে, ভুলে ফেলে গিয়েছেন—
শুরু করেন নি কায়া।
যদি শেষ করে দিতেন, হয়তো
হত সে তিলোত্তমা,
একেবারে নিরুপমা।
যত রাজ্যের যত কবি তাকে
ছন্দের ঘের দিয়ে
আপন বুলিটি শিখিয়ে করত
কাব্যের পোষা টিয়ে।
আমার মনের স্বপ্নে তোমাকে
যেমনি দিয়েছি দেহ
অমনি তখন নাগাল পায় না
সাহিত্যিকেরা কেহ।
আমার দৃষ্টি তোমার সৃষ্টি
হয়ে গেল একাকার।
মাঝখান থেকে বিশ্বপতির ঘুচে গেল অধিকার।
তুমি যে কেমন আমিই কেবল জানি,
কোনো সাধারণ বাণী
লাগে না কোনোই কাজে।
কেবল তোমার নাম ধ'রে মাঝে-মাঝে
অসময়ে দিই ডাক,
কোনো প্রয়োজন থাক্ বা নাই-বা থাক্।
অমনি তখনি কাঠিতে-জড়ানো উলে
হাত কেঁপে গিয়ে গুনতিতে যাও ভুলে।
কোনো কথা আর নাই কোনো অভিধানে
যার এত বড়ো মানে।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

উদ্‌বৃত্ত

তব দক্ষিণ হাতের পরশ
কর নি সমর্পণ।
লেখে আর মোছে তব আলো ছায়া
ভাবনার প্রাঙ্গণে
খনে খনে আলিপন।

বৈশাখে কৃশ নদী
পূর্ণ স্রোতের প্রসাদ না দিল যদি
শুধু কুণ্ঠিত বিশীর্ণ ধারা।
তীরের প্রান্তে
জাগালো পিয়াসি মন।

যতটুকু পাই ভীরু বাসনার
অঞ্জলিতে
নাই বা উচ্ছলিল,
সারা দিবসের দৈন্যের শেষে
সঞ্চয় সে যে
সারা জীবনের স্বপ্নের আয়োজন।

[মংপু]
৩০।৭।৩৯

ভাঙন

কোন্ ভাঙনের পথে এলে
আমার সুপ্ত রাতে।
ভাঙল যা তাই ধন্য হল
নিঠুর চরণ-পাতে।
রাখব গেঁথে তারে
কমলমণির হারে,
দুলবে বুকে গোপন বেদনাতে।

সেতারখানি নিয়েছিলে
অনেক যতনভরে—
তার যবে তার ছিন্ন হল
ফেললে ভূমি-'পরে।
নীরব তাহার গান
রইল তোমার দান—
ফাগুন-হাওয়ার মর্মে বাজে
গোপন মত্ততাতে।

শ্রীনিকেতন
১২।৭।৩৯

মন যে দরিদ্র, তার
তর্কের নৈপুণ্য আছে, ধনৈশ্বর্য নাইকো ভাষার।
কল্পনাভাণ্ডার হতে তাই করে ধার
বাক্য-অলংকার।
কখন হৃদয় হয় সহসা উতলা—
তখন সাজিয়ে বলা
আসে অগত্যাই ;
শুনে তাই
কেন তুমি হেসে ওঠ, আধুনিকা প্রিয়ে,
অত্যুক্তির অপবাদ দিয়ে।
তোমার সম্মানে ভাষা আপনারে করে সুসজ্জিত,
তারে তুমি বারে বারে পরিহাসে কোরো না লজ্জিত।
তোমার আরতি-অর্ঘ্যে অত্যুক্তিবঞ্চিত ভাষা হেয়,
অসত্যের মতো অশ্রদ্ধেয়।
নাই তার আলো,
তার চেয়ে মৌন ঢের ভালো।
তব অঙ্গে অত্যুক্তি কি কর না বহন
সন্ধ্যায় যখন
দেখা দিতে আস।
তখন যে হাসি হাস
সে তো নহে মিতব্যয়ী প্রত্যহের মতো—
অতিরিক্তি মধু কিছু তার মধ্যে থাকে তো সংহত।
সে হাসির অতিভাষা
মোর বাক্যে ধরা দেবে নাই সে প্রত্যাশা।
অলংকার যত পায় বাক্যগুলো তত হার মানে,
তাই তার অস্থিরতা বাড়াবাড়ি ঠেকে তব কানে।
কিন্তু, ওই আশমানি শাড়িখানি
ও কি নহে অত্যুক্তির বাণী।
তোমার দেহের সঙ্গে নীল গগনের
ব্যঞ্জনা মিলায়ে দেয়, সে যে কোন্ অসীম মনের
আপন ইঙ্গিত,
সে যে অঙ্গের সংগীত।
আমি তারে মনে জানি সত্যেরও অধিক।
সোহাগবাণীরে মোর হেসে কেন বল কাল্পনিক।

পুরী
৭ মে ১৯৩৯

হঠাৎ মিলন

মনে পড়ে কবে ছিলাম একা বিজন চরে ;
তোমার নৌকা ভরা পালের ভরে
সুদূর পারের হতে
কোন্ অবেলায় এল উজান স্রোতে।
দ্বিধায় ছোঁওয়া তোমার মৌনীমুখে
কাঁপতেছিল সলজ্জ কৌতুকে
আঁচল-আড়ে দীপের মতো একটুখানি হাসি,
নিবিড় সুখের বেদন দেহে উঠছিল নিশ্বাসি

দুঃসহ বিস্ময়ে
ছিলাম স্তব্ধ হয়ে,
বলার মতো বলা পাই নি খুঁজে ;
মনের সঙ্গে যুঝে
মুখের কথার হল পরাজয়।
তোমার তখন লাগল বুঝি ভয়,
বাঁধন-ছেঁড়া অধীরতার এমন দুঃসাহসে
গোপনে মন পাছে তোমায় দোষে।
মিনতি উপেক্ষা করি ত্বরায় গেলে চলে
"তবে আসি" এইটি শুধু ব'লে।
তখন আমি আপন মনে যে-গান সারাদিন
গেয়েছিলেম, তাহারি সুর রইল অন্তহীন।
পাথর-ঠেকা নির্ঝর সে, তারি কলস্বর
দূরের থেকে পূর্ণ করে বিজন অবসর।

আলমোড়া
২৭ মে ১৯৩৭

গানের জাল

দৈবে তুমি
কখন নেশায় পেয়ে
আপন-মনে
যাও চলে গান গেয়ে।
যে আকাশে সুরের লেখা লেখ
বুঝি না তা, কেবল রহি চেয়ে।
হৃদয় আমার অদৃশ্যে যায় চলে,
প্রতিদিনের ঠিকঠিকানা ভোলে—
মৌমাছিরা আপনা হারায় যেন
গন্ধের পথ বেয়ে।

গানের টানা জালে
নিমেষ-ঘেরা বাঁধন হতে
টানে অসীম কালে।
মাটির আড়াল করি ভেদন
স্বর্গলোকের আনে বেদন,
পরান ফেলে ছেয়ে।

[১৯৩৯]

মরিয়া

মেঘ কেটে গেল
আজি এ সকাল বেলায়।
হাসিমুখে এসো
অলস দিনেরি খেলায়।
আশানিরাশার সঞ্চয় যত
সুখদুঃখেরে ঘেরে
ভ'রে ছিল যাহা সার্থক আর
নিষ্ফল প্রণয়েরে,
অকূলের পানে দিব তা ভাসায়ে
ভাঁটার গাঙের ভেলায়।

যত বাঁধনের
গ্রন্থন দিব খুলে,
ক্ষণিকের তরে
রহিব সকল ভুলে।
যে গান হয় নি গাওয়া,
যে দান হয় নি পাওয়া
পুবেন হাওয়ায় পরিতাপ তার
উড়াইব অবহেলায়।

[১৯৩৯]

দূরবর্তিনী

সেদিন তুমি দূরের ছিলে মম,
তাই ছিলে সেই আসন-'পরে যা অন্তরতম।
অগোচরে সেদিন তোমার লীলা
বইত অন্তঃশীলা।
থমকে যেতে যখন কাছে আসি,
তখন তোমার ত্রস্ত চোখে বাজত দূরের বাঁশি।
ছায়া তোমার মনের কুঞ্জে ফিরত চুপে চুপে,
কায়া নিত অপরূপের রূপে।
আশার অতীত বিরল অবকাশে
আসতে তখন পাশে ;
একটি ফুলের দানে
চিরফাগুন-দিনের হাওয়া আনতে আমার প্রাণে।
অবশেষে যখন তোমার অভিসারের রথ
পেল আপন সহজ সুগম পথ,
ইচ্ছা তোমার আর নাহি পায় নতুন-জানার বাধা,
সাধনা নাই, শেষ হয়েছে সাধা।
তোমার পালে লাগে না আর হঠাৎ দখিন-হাওয়া ;
শিথিল হল সকল চাওয়া পাওয়া।
মাঘের রাতে আমের বোলের গন্ধ বহে যায়,
নিশ্বাস তার মেলে না আর তোমার বেদনায়।
উদ্‌বেগ নাই, প্রত্যাশা নাই, ব্যথা নাইকো কিছু,
পোষ-মানা সব দিন চলে যায় দিনের পিছু পিছু।
অলস ভালোবাসা
হারিয়েছে তার ভাষাপারের ভাষা।
ঘরের কোণের ভরা পাত্র দুই বেলা তা পাই,
ঝরনাতলার উছল পাত্র নাই।

[১৯৩৯]

গান

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
এতদিন তারে বুঝিতে পারি নি,
দিন চলে গেছে খুঁজিতে।
শুভখনে কাছে ডাকিলে,
লজ্জা আমার ঢাকিলে,
তোমারে পেরেছি বুঝিতে।

কে মোরে ফিরাবে অনাদরে,
কে মোরে ডাকিবে কাছে,
কাহার প্রেমের বেদনার মাঝে
আমার মূল্য আছে,
এ নিরন্তর সংশয়ে আর
পারি না কেবলই যুঝিতে—
তোমারেই শুধু সত্য পেরেছি বুঝিতে।

[শ্যামলী। শান্তিনিকেতন]
৮।১২।৩৮

বাণীহারা

ওগো মোর নাহি যে বাণী,
আকাশে হৃদয় শুধু বিছাতে জানি।
আমি অমাবিভাবরী আলোকহারা
মেলিয়া তারা
চাহি নিঃশেষ পথপানে
নিষ্ফল আশা নিয়ে প্রাণে।
বহুদূরে বাজে তব বাঁশি,
সকরুণ সুর আসে ভাসি
বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি
দিই যে ফিরায়ে—
সে কি তব স্বপ্নের তীরে
ভাঁটার স্রোতের মতো
লাগে ধীরে, অতি ধীরে ধীরে।

[১৩৪৬]

অনসূয়া

কাঁঠালের ভূতি-পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ,
রান্নাঘরের পাঁশ,
মরা বিড়ালের দেহ, পেঁকো নর্দমায়
বীভৎস মাছির দল ঐকতান-বাদন জমায়।
শেষরাত্রে মাতাল বাসায়
স্ত্রীকে মারে, গালি দেয় গদ্‌গদ ভাষায়,

ঘুমভাঙা পাশের বাড়িতে
পাড়াপ্রতিবেশী থাকে হুংকার ছাড়িতে।
ভদ্রতার বোধ যায় চলে,
মনে হয় নরহত্যা পাপ নয় ব'লে।
কুকুরটা, সর্ব অঙ্গে ক্ষত,
বিছানায় শোয় এসে, আমি নিদ্রাগত।
নিজেরে জানান দেয় তীব্রকণ্ঠে আত্মশ্লাঘী সতী
রণচণ্ডা চণ্ডী মূর্তিমতী।
মোটা সিঁদুরের রেখা আঁকা,
হাতে মোটা শাঁখা,
শাড়ি লাল-পেড়ে,
খাটো খোঁপা-পিণ্ডটুকু ছেড়ে
ঘোমটার প্রান্ত ওঠে টাকের সীমায়—
অস্থির সমস্ত পাড়া এ মেয়ের সতী-মহিমায়।

এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোমান্টিক—
আমি সেই পথের পথিক
যে-পথ দেখায়ে চলে দক্ষিনে বাতাসে,
পাখির ইশারা যায় যে-পথের অলক্ষ্য আকাশে।
মৌমাছি যে-পথ জানে
মাধবীর অদৃশ্য আহ্বানে।
এটা সত্য কিংবা সত্য ওটা
মোর কাছে মিথ্যা সে তর্কটা।
আকাশকুসুম-কুঞ্জবনে,
দিগঙ্গনে
ভিত্তিহীন যে-বাসা আমার
সেখানেই পলাতকা আসা-যাওয়া করে বার-বার।
আজি এই চৈত্রের খেয়ালে
মনেরে জড়ালো ইন্দ্রজালে।
দেশকাল
ভুলে গেল তার বাঁধা তাল।
নায়িকা আসিল নেমে আকাশপ্রদীপে আলো পেয়ে।

সেই মেয়ে
নহে বিংশ-শতকিয়া
ছন্দোহারা কবিদের ব্যঙ্গহাসি-বিহসিত প্রিয়া।
সে নয় ইকনমিক্‌স্‌-পরীক্ষাবাহিনী
আতপ্ত বসন্তে আজি নিশ্বসিত যাহার কাহিনী।
অনসূয়া নাম তার, প্রাকৃতভাষায়
কারে সে বিস্মৃত যুগে কাঁদায় হাসায়,

অশ্রুত হাসির ধ্বনি মিলায় সে কলকোলাহলে
শিপ্রাতটতলে।
পিনদ্ধ বল্কলবন্ধে যৌবনের বন্দী দূত দোঁহে
জাগে অঙ্গে উদ্ধত বিদ্রোহে।
অযতনে এলায়িত রুক্ষ কেশপাশ
বনপথে মেলে চলে মৃদুমন্দ গন্ধের আভাস।
প্রিয়কে সে বলে 'পিয়',
বাণী লোভনীয়—
এনে দেয় রোমাঞ্চ-হরষ
কোমল সে ধ্বনির পরশ।
সোহাগের নাম দেয় মাধবীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে,
এ মাধুরী যে দেখে গোপনে
ঈর্ষার বেদনা পায় মনে।

যখন নৃপতি ছিল উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্তের মতো
দয়াহীন ছলনায় রত
আমি কবি অনাবিল সরল মাধুরী
করিতেছিলাম চুরি
এলা-বনচ্ছায়ে এক কোণে,
মধকুর যেমন গোপনে
ফুলমধু লয় হরি
নিভৃত ভাণ্ডার ভরি ভরি
মালতীর স্মিত সম্মতিতে।
ছিল সে গাঁথিতে
নতশিরে পুষ্পহার
সদ্য-তোলা কুঁড়ি মল্লিকার।
বলেছিনু, আমি দেব ছন্দের গাঁথুনি
কথা চুনি চুনি।

অয়ি মালবিকা
অভিসার-যাত্রাপথে কখনো বহ নি দীপশিখা।
অর্ধাবগুণ্ঠিত ছিলে কাব্যে শুধু ইঙ্গিত-আড়ালে,
নিঃশবদে চরণ বাড়ালে
হৃদয়প্রাঙ্গণে আজি স্পষ্ট আলোকে—
বিস্মিত চাহনিখানি বিস্ফারিত কালো দুটি চোখে,
বহু মৌনী শতাব্দীর মাঝে দেখিলাম—
প্রিয় নাম
প্রথম শুনিলে বুঝি কবিকণ্ঠস্বরে
দূর যুগান্তরে।

বোধ হল, তুলে ধ'রে ডালা
মোর হাতে দিলে তব আধফোটা মল্লিকার মালা।
সুকুমার অঙ্গুলির ভঙ্গিটুকু মনে ধ্যান ক'রে
ছবি আঁকিলাম বসে চৈত্রের প্রহরে।
স্বপ্নের বাঁশিটি আজ ফেলে তব কোলে
আর-বার যেতে হবে চ'লে
সেথা, যেথা বাস্তবের মিথ্যা বঞ্চনায়
দিন চলে যায়।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২০ মার্চ ১৯৪০

শেষ অভিসার

আকাশে ঈশানকোণে মসীপুঞ্জ মেঘ।
আসন্ন ঝড়ের বেগ
স্তব্ধ রহে অরণ্যের ডালে ডালে
যেন সে বাদুড় পালে পালে।
নিষ্কম্প পল্লবঘন মৌনরাশি
শিকার-প্রত্যাশী
বাঘের মতন আছে থাবা পেতে,
রন্ধ্রহীন আঁধারেতে।
ঝাঁকে ঝাঁক
উড়িয়া চলেছে কাক
আতঙ্ক বহন করি উদ্‌বিগ্ন ডানার 'পরে।
যেন কোন্ ভেঙে-পড়া লোকান্তরে।
ছিন্ন ছিন্ন রাত্রিখণ্ড চলিয়াছে উড়ে
উচ্ছৃঙ্খল ব্যর্থতার শূন্যতল জুড়ে।

দুর্যোগের ভূমিকায় তুমি আজ কোথা হতে এলে
এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলে।
জন্মের আরম্ভপ্রান্তে আর-একদিন
এসেছিলে অম্লান নবীন
বসন্তের প্রথম দূতিকা,
এনেছিলে আষাঢ়ের প্রথম যূথিকা
অনির্বচনীয় তুমি।
মর্মতলে উঠিলে কুসুমি
অসীম বিস্ময়-মাঝে, নাহি জানি এলে কোথা হতে
অদৃশ্য আলোক হতে দৃষ্টির আলোতে।
তেমনি রহস্যপথে, হে অভিসারিকা,
আজ আসিয়াছ তুমি; ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুতের শিখা

কী ইঙ্গিত মেলিতেছে মুখে তব,
কী তাহার ভাষা অভিনব।

আসিছ যে-পথ বেয়ে সেদিনের চেনা পথ এ কি।
এ যে দেখি
কোথাও বা ক্ষীণ তার রেখা,
কোথাও চিহ্নের সূত্র লেশমাত্র নাহি যায় দেখা।
ডালিতে এনেছ ফুল স্মৃত বিস্মৃত,
কিছু বা অপরিচিত।
হে দূতী, এনেছ আজ গন্ধে তব যে-ঋতুর বাণী
নাম তার নাহি জানি।
মৃত্যু অন্ধকারময়
পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আসন্ন তাহার পরিচয়।
তারি বরমাল্যখানি পরাইয়া দাও মোর গলে
স্তিমিতনক্ষত্র এই নীরবের সভাঙ্গনতলে।
এই তব শেষ অভিসারে
ধরণীর পারে
মিলন ঘটায়ে যাও অজানার সাথে
অন্তহীন রাতে।

মংপু
২৩।৪।৪০

নামকরণ

বাদলবেলায় গৃহকোণে
রেশমে পশমে জামা বোনে,
নীরবে আমার লেখা শোনে,
তাই সে আমার শোনামণি।
প্রচলিত ডাক নয় এ যে
দরদীর মুখে ওঠে বেজে,
পণ্ডিতে দেয় নাই মেজে—
প্রাণের ভাষাই এর খনি।
সেও জানে আর জানি আমি
এ মোর নেহাত পাগলামি—
ডাক শুনে কাজ যায় থামি,
কঙ্কণ ওঠে কনকনি।

সে হাসে, আমিও তাই হাসি—
জবাবে ঘটে না কোনো বাধা।
অভিধান-বর্জিত ব'লে
মানে আমাদের কাছে সাদা।

কেহ নাহি জানে কোন্ খনে
পশমের শিল্পের সাথে
সুকুমার হাতের নাচনে
নূতন নামের ধ্বনি গাঁথে
শোনামণি, ওগো সুনয়নী ।

গৌরীপুর ভবন । কালিম্পং
২৪ মে ১৯৪০

বিমুখতা

মন যে তাহার হঠাৎপ্লাবনী
নদীর প্রায়
অভাবিত পথে সহসা কী টানে
বাঁকিয়া যায়—
সে তার সহজ গতি,
সেই বিমুখতা ভরা ফসলের
যতই করুক ক্ষতি ।
বাঁধা পথে তারে বাঁধিয়া রাখিবে যদি
বর্ষা নামিলে খরপ্রবাহিণী নদী
ফিরে ফিরে তার ভাঙিয়া ফেলিবে কূল,
ভাঙিবে তোমার ভুল ।
নয় সে খেলার পুতুল, নয় সে
আদরের পোষা প্রাণী,
মনে রেখো তাহা জানি ।
মত্তপ্রবাহবেগে
দুর্দাম তার ফেনিল হাস্য
কখন উঠিবে জেগে ।
তোমার প্রাণের পণ্য আহরি
ভাসাইয়া দিলে ভঙ্গুর তরী,
হঠাৎ কখন পাষাণে আছাড়ি
করিবে সে পরিহাস,
হেলায় খেলায় ঘটাবে সর্বনাশ ।
এ খেলারে যদি খেলা বলি মান,
হাসিতে হাস্য মিলাইতে জান,
তা হলে রবে না খেদ ।
ঝরনার পথে উজানের খেয়া,
সে যে মরণের জেদ ।
স্বাধীন বলো যে ওরে
নিতান্ত ভুল ক'রে ।

দিক্‌সীমানার বাঁধন টুটিয়া
ঘুমের ঘোরেতে চমকি উঠিয়া
যে-উল্কা পড়ে খ'সে
কোন্ ভাগ্যের দোষে
সেই কি স্বাধীন, তেমনি স্বাধীন এও—
এরে ক্ষমা করে যেয়ো।
বন্যারে নিয়ে খেলা যদি সাধ
লাভের হিসাব দিয়ো তবে বাদ,
গিরিনদী-সাথে বাঁধা পড়িয়ো না
পণ্যের ব্যবহারে
মূল্য যাহার আছে একটুও
সাবধান করি ঘরে তারে থুয়ো,
খাটাতে যেয়ো না মাতাল চলার
চলতি এ কারবারে।
কাটিয়ো সাঁতার যদি জানা থাকে,
তলিয়ে যেয়ো না আওড়ের পাকে,
নিজেরে ভাসায়ে রাখিতে না জান
ভরসা ডাঙার পারে—
যতই নীরস হোক-না সে তবু
নিরাপদ জেনো তারে।
'সে আমারি' ব'লে বৃথা অহমিকা
ভালে আঁকি দেয় ব্যঙ্গের টিকা।
আল্‌গা লীলায় নাই দেওয়া পাওয়া,
দূর থেকে শুধু আসা আর যাওয়া—
মানবমনের রহস্য কিছু শিখা।

[কালিম্পং
জুন ১৯৪০]

আত্মছলনা

দোষী করিব না তোমারে,
ব্যথিত মনের বিকারে,
নিজেরেই আমি নিজে নিজে করি ছলনা।
মনেরে বুঝাই বুঝি ভালোবাস,
আড়ালে আড়ালে তাই তুমি হাস ;
স্থির জান, এ যে অবুঝের খেলা,
এ শুধু মোহের রচনা।

সন্ধ্যামেঘের রাগে
অকারণে যত ভেসে-চলে-যাওয়া
অপরূপ ছবি জাগে।
সেইমতো ভাসে মায়ার আভাসে
রঙিন বাষ্প মনের আকাশে,
উড়াইয়া দেয় ছিন্ন লিপিতে
বিরহমিলন-ভাবনা।

[কালিম্পং]
২৯।৫।৪০

অসময়

বেকালবেলা ফসল-ফুরানো
শূন্য খেতে
বৈশাখে যবে কৃপণ ধরণী
রয়েছে তেতে,
ছেড়ে তার বন জানি নে কখন
কী ভুল ভুলি
শুষ্ক ধূলির ধূসর দৈন্যে
এসেছিল বুল্‌বুলি।

সকালবেলার স্মৃতিখানি মনে
বহিয়া বুঝি
তরুণ দিনের ভরা আতিথ্য
বেড়ালো খুঁজি।
অরুণে শ্যামলে উজ্জ্বল সেই
পূর্ণতারে
মিথ্যা ভাবিয়া ফিরে যাবে সে কি
রাতের অন্ধকারে।

তবুও তো গান করে গেল দান
কিছু না পেয়ে।
সংশয়-মাঝে কী শুনায়ে গেল
কাহারে চেয়ে।
যাহা গেছে সরে কোনো রূপ ধ'রে
রয়েছে বাকি,
এই সংবাদ বুঝি মনে মনে
জানিতে পেয়েছে পাখি।

প্রভাতবেলার যে ঐশ্বর্য
রাখে নি কণা,
এসেছিল সে যে, হারায় না কভু
সে সান্ত্বনা।
সত্য যা পাই ক্ষণেকের তরে
ক্ষণিক নহে।
সকালের পাখি বিকালের গানে
এ আনন্দই বহে।

১৯৪০

অপঘাত

সূর্যাস্তের পথ হতে বিকালের রৌদ্র এল নেমে।
বাতাস ঝিমিয়ে গেছে থেমে।
বিচালি-বোঝাই গাড়ি চলে দূর নদিয়ার হাটে
জনশূন্য মাঠে।
পিছে পিছে
দড়ি-বাঁধা বাছুর চলিছে।
রাজবংশীপাড়ার কিনারে
পুকুরের ধারে
বনমালী পণ্ডিতের বড়ো ছেলে
সারাক্ষণ বসে আছে ছিপ ফেলে।
মাথার উপর দিয়ে গেল ডেকে
শুকনো নদীর চর থেকে
কাজলা বিলের পানে
বুনোহাঁস গুগ্‌লি-সন্ধানে।

কেটে-নেওয়া ইক্ষুখেত, তারি ধারে ধারে
দুই বন্ধু চলে ধীরে শান্ত পদচারে
বৃষ্টিধোওয়া বনের নিশ্বাসে,
ভিজে ঘাসে ঘাসে।
এসেছে ছুটিতে—
হঠাৎ গাঁয়েতে এসে সাক্ষাৎ দুটিতে,
নববিবাহিত একজনা,
শেষ হতে নাহি চায় ভরা আনন্দের আলোচনা।
আশে-পাশে ভাঁটিফুল ফুটিয়া রয়েছে দলে দলে
বাঁকাচোরা গলির জঙ্গলে,
মৃদুগন্ধে দেয় আনি
চৈত্রের ছড়ানো নেশাখানি।

জারুলের শাখায় অদূরে
কোকিল ভাঙিছে গলা একঘেয়ে প্রলাপের সুরে।

টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিনল্যান্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।

[কালিম্পং]
১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

মানসী

আজি আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে
মনখানা উড়ো পক্ষী
বাদলা হাওয়ায় দিকে দিকে ধায়
অজানার পানে লক্ষ্যি'।
যাহা-খুশি বলি স্বগত কাকলি,
লিখিবারে চাহি পত্র,
গোপন মনের শিল্পসূত্রে
বুনানো দু-চারি ছত্র।
সঙ্গীবিহীন নিরালায় করি
জানা-অজানার সন্ধি,
গর্‌ঠিকানিয়া বন্ধু কে আছ
করিব বাণীর বন্দী।
না জানি তোমার নামধাম আমি,
না জানি তোমার তথ্য।
কিবা আসে যায় যে হও সে হও
মিথ্যা অথবা সত্য।
নিভৃতে তোমারি সাথে আনাগোনা
হে মোর অচিন মিত্র,
প্রলাপী মনেতে আঁকা পড়ে তব
কত অদ্ভুত চিত্র।
যে নেয় নি মেনে মর্ত শরীরে
বাঁধন পাঞ্চভৌত্যে
তার সাথে মন করেছি বদল
স্বপ্নমায়ার দৌত্যে।
ঘুমের ঘোরেতে পেয়েছি তাহার
রুক্ষ চুলের গন্ধ।
আধেক রাত্রে শুনি যেন তার—
দ্বার-খোলা, দ্বার-বন্ধ।
নীপবন হতে সৌরভে আনে
ভাষাবিহীনার ভাষ্য।

জোনাকি আঁধারে ছড়াছড়ি করে
　　মণিহার-ছেঁড়া-হাস্য।
সঘন নিশীথে গর্জিছে দেয়া,
　　রিমিঝিমি বারি বর্ষে—
মনে-মনে ভাবি, কোন্ পালঙ্কে
　　কে নিদ্রা দেয় হর্ষে।
গিরির শিখরে ডাকিছে ময়ূর
　　কবিকাব্যের রঙ্গে—
স্বপ্নপুলকে কে জাগে চমকি
　　বিগলিতচীর-অঙ্গে।
বাস্তব মোরে বঞ্চনা করে
　　পালায় চকিত নৃত্যে—
তারি ছায়া যবে রূপ ধরি আসে
　　ধাঁধা পড়ি যায় চিত্তে।
তারার আলোকে ভরে সেই সাকী
　　মদিরোচ্ছল পাত্র,
নিবিড় রাতের মুগ্ধ মিলনে
　　নাই বিচ্ছেদ মাত্র।
ওগো মায়াময়ী, আজি বরষায়
　　জাগালে আমার ছন্দ—
যাহা-খুশি সুরে বাজিছে সেতার,
　　নাহি মানে কোনো বন্ধ।

[কালিম্পং]
২২ মে ১৯৪০

অসম্ভব ছবি

আলোকের আভা তার অলকের চুলে,
　　বুকের কাছেতে হাঁটু তুলে
বসে আছে ঠেস দিয়ে পিপুল-গুঁড়িতে,
　　পাশেই পাহাড়ে নদী নুড়িতে নুড়িতে
　　　　ফুলে উঠে চলে যায় বেগে।
　　দেবদারু-ছায়াতলে উঠে জেগে
　　　　কলস্বর,
কান পেতে শোনে তাই প্রাচীন পাথর—
　　　　অরণ্যের কোল
　　　যেন মুখরিয়া তোলে শিশুর কল্লোল।
ইংরেজ কবির লেখা একমনে পড়িছে তরুণী,
　গুন্‌গুন্ রব তার পিছনে দাঁড়ায়ে আমি শুনি;

মৃদু বেদনায় ভাবি, যে-কবির বাণী
পড়িছে বিরাম নাহি মানি,
আমি কেন সে কবি না হই ।
এতদিন নানাভাবে কাব্যে যাহা কই
আজি এ গিরির মতো কেন সে নির্বাক ।
অদূরে মাদার-শাখে ঘুঘু দেয় ডাক ।
আমার মর্মের ছন্দ পাখির ভাষায়
অফুরান নৈরাশায়
উছলিতে থাকে একতানে
আন-মননীর কানে কানে ।
আতপ্ত হতেছে দিন, শিশির শুকায়ে গেছে ঘাসে,
অজানা ফুলের গুচ্ছ উচ্চ শাখে দুলিছে বাতাসে ।
ঢালু তটে তরুচ্ছায়াতলে
ঝিলিমিলি শিহরন ঝরনার জলে ।
চূর্ণ কেশে নিত্য চঞ্চলতা,
দুর্বাধ্য পড়িছে চোখে, অধ্যয়নরতা
সরায়ে দিতেছে বারংবার
বাহুক্ষেপে । ধৈর্য মোর রহিল না আর ;
চকিতে সম্মুখে আসি শুধালাম,
"তুমি কি শোন নি মোর নাম ।"
মুখে তার সে কি অসন্তোষ,
সে কি লজ্জা, সে কি রোষ,
সে কি সমুদ্ধত অহংকার ।
উত্তর শোনার
অপেক্ষা না করি আমি দ্রুত গেনু চলি ।
ঘুঘুর কাকলি
ঘন পল্লবের মাঝে আশ্বিনের রৌদ্র ও ছায়ারে
ব্যথিত করিছে চির নিরুত্তর ব্যর্থতার ভারে ।

মিথ্যা, মিথ্যা এ স্বপন, ঘরে ফিরে বসিয়া নির্জনে
শৈল-অরণ্যের সেই ছবিখানি আনি মনে-মনে
অসম্ভব রচনায়
পূরণ করিনু তারে ঘটে নি যা সেই কল্পনায় ।

যদি সত্য হত, যদি বলিতাম কিছু,
শুনিত সে মাথা করি নিচু,
কিংবা যদি সুতীব্র চাহনি
বিদ্যুৎবাহনী
কটাক্ষে হানিত মুখে
রক্ত মোর আলোড়িয়া বুকে,
কিংবা যদি চলে যেত অঞ্চল সংবরি
শুষ্কপত্রপবিকীর্ণ বনপথ সচকিত করি,

আমি রহিতাম চেয়ে
হেসে উঠিতাম গেয়ে—
"চলে গেলে হে রূপসী, মুখখানি ঢেকে,
বঞ্চিত কর নি মোরে, পিছনে গিয়েছ কিছু রেখে।"

হায় রে, হয় নি কিছু বলা,
হয় নি ছায়ার পথে ছায়াসম চলা,
হয়তো সে শিলাতল-'পরে
এখনো পড়িছে কাব্য গুন্‌গুন্ স্বরে।

শান্তিনিকেতন
১৬ জুলাই ১৯৪০

অসম্ভব

পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ, যবে ভাবিনু মনে,
একা একা কোথা চলিতেছিলাম নিষ্কারণে।
শ্রাবণের মেঘ কালো হয়ে নামে বনের শিরে,
খর বিদ্যুৎ রাতের বক্ষ দিতেছে চিরে,
দূর হতে শুনি বারুণী নদীর তরল রব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

এমনি রাত্রে কতবার, মোর বাহুতে মাথা,
শুনেছিল সে যে কবির ছন্দে কাজরি-গাথা।
রিমিঝিমি ঘন বর্ষণে বন রোমাঞ্চিত,
দেহে আর মনে এক হয়ে গেছে যে-বাঞ্ছিত
এল সেই রাতি বহি শ্রাবণের সে-বৈভব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

দূরে চলে যাই নিবিড় রাতের অন্ধকারে,
আকাশের সুর বাজিছে শিরায় বৃষ্টিধারে।
যূথীবন হতে বাতাসেতে আসে সুধার স্বাদ,
বেণীবাঁধনের মালায় পেতেম যে-সংবাদ
এই তো জেগেছে নবমালতীর সে-সৌরভ—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

ভাবনার ভুলে কোথা চলে যাই অন্যমনে
পথসংকেত কত জানায়েছে যে-বাতায়নে।
শুনিতে পেলেম সেতারে বাজিছে সুরের দান
অশ্রুজলের আভাসে জড়িত আমারি গান।
কবিরে ত্যজিয়া রেখেছ কবির এ গৌরব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

শান্তিনিকেতন
১৬ জুলাই ১৯৪০

গানের মন্ত্র

মাঝে মাঝে আসি যে তোমারে
গান শিখাবারে—
মনে তব কৌতুক লাগে,
অধরের আগে
দেখা দেয় একটুকু হাসির কাঁপন।
যে-কথাটি আমার আপন
এই ছলে হয় সে তোমারি।
তারে তারে সুর বাঁধা হয়ে যায় তারি
অন্তরে অন্তরে
কখন তোমার অগোচরে।
চাবি করা চুরি,
প্রাণের গোপন দ্বারে প্রবেশের সহজ চাতুরী,
সুর দিয়ে পথ বাঁধা
যে-দুর্গমে কথা পেত পদে পদে পাষাণের বাধা—
গানের মন্ত্রেতে দীক্ষা যার
এই তো তাহার অধিকার।
সেই জানে দেবতার অলক্ষিত পথ
শূন্যে শূন্যে যেথা চলে মহেন্দ্রের শব্দভেদী রথ।
ঘনবর্ষণের পিছে যেমন সে বিদ্যুতের খেলা
বিমুখ নিশীথবেলা,
অমোঘ বিজয়মন্ত্র হানে
দূর দিগন্তের পানে,
আঁধারের সংকোচ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে
মেঘমল্লারের ঝড়ে।

শান্তিনিকেতন
১৮ জুলাই ১৯৪০

স্বল্প

জানি আমি, ছোটো আমার ঠাঁই—
তাহার বেশি কিছুই চাহি নাই।
দিয়ো আমায় সবার চেয়ে অল্প তোমার দান,
নিজের হাতে দাও তুলে তো
রইবে অফুরান।

আমি তো নই কাঙাল পরদেশী,
পথে পথে খোঁজ করে যে
যা পায় তারো বেশি।

সকলটুকুই চায় সে পেতে হাতে,
পুরিয়ে নিতে পারে না সে
আপন দানের সাথে।

তুমি শুনে বললে আমায় হেসে,
বললে ভালোবেসে,
"আশ মিটিবে এইটুকুতেই তবে ?"
আমি বলি, "তার বেশি কী হবে।
যে-দানে ভার থাকে
বস্তু দিয়ে পথ সে কেবল
আটক করে রাখে।

যে-দান কেবল বাহুর পরশ তব
তারে আমি বীণার মতো বক্ষে তুলে লব।
সুরে সুরে উঠবে বেজে,
যেটুকু সে তাহার চেয়ে
অনেক বেশি সে যে।
লোভীর মতো তোমার দ্বারে
যাহার আসা-যাওয়া
তাহার চাওয়া-পাওয়া
তোমায় নিত্য খর্ব করে আনে
আপন ক্ষুধার পানে।
ভালোবাসার বর্বরতা,
মলিন করে তোমারি সম্মান
পৃথুল তার বিপুল পরিমাণ।
তাই তো বলি, প্রিয়ে,
হাসিমুখে বিদায় কোরো স্বল্প কিছু দিয়ে ;
সন্ধ্যা যেমন সন্ধ্যাতারাটিরে
আনিয়া দেয় ধীরে
সূর্য-ডোবার শেষ সোপানের ভিতে
সলজ্জ তার গোপন থালিটিতে।"

শান্তিনিকেতন
১৭ জুলাই ১৯৪০

অবসান

জানি দিন অবসান হবে,
জানি তবু কিছু বাকি রবে ।
রজনীতে ঘুমহারা পাখি
এক সুরে গাহিবে একাকী—
যে শুনিবে, যে রহিবে জাগি
সে জানিবে, তারি নীড়হারা
স্বপন খুঁজিছে সেই তারা
যেথা প্রাণ হয়েছে বিবাগি ।
কিছু পরে করে যাবে চুপ
ছায়াঘন স্বপনের রূপ ।
ঝরে যাবে আকাশকুসুম,
তখন কূজনহীন ঘুম
এক হবে রাত্রির সাথে ।
যে-গান স্বপনে নিল বাসা
তার ক্ষীণ গুঞ্জন-ভাষা
শেষ হবে সব-শেষ রাতে ।

শান্তিনিকেতন
১৯ জুলাই ১৯৪০

নাটক ও প্রহসন

চণ্ডালিকা

ভূমিকা

রাজেন্দ্রলাল মিত্র -কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দূলকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গৃহীত।

গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথপিণ্ডদের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন, এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলেন, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হল। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে। মা তার জাদুবিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে সেখানে আগুন জ্বালল এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অর্ক ফুল সেই আগুনে ফেললে। আনন্দ এই জাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হল। পরিত্রাণের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণবিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।

চণ্ডালিকা

প্রথম দৃশ্য

মা। প্রকৃতি, ও প্রকৃতি ! গেল কোথায় ! কী জানি কী হল মেয়েটার। ঘরে দেখতেই পাই নে।

প্রকৃতি। এই-যে, মা, এখানেই আছি।

মা। কোথায় !

প্রকৃতি। এই-যে কুয়োতলায়।

মা। আশ্চর্য করলি তুই। বেলা গেল দুপুর পেরিয়ে, কাঠফাটা রোদ, মাটি উঠেছে তেতে, পা ফেলা যায় না। ঘরের জল কোন্ সকালে তোলা হয়ে গেছে। পাড়ার মেয়েরা সবাই জল নিয়ে গেল ঘরে। ঐ দেখ্, ঠোঁট মেলে গরমে কাক ধুঁকছে আমলকীগাছের ডালে। তুই এই বৈশেখের রোদ পোয়াচ্ছিস বিনি কাজে। পুরাণকথা শুনেছি, উমা তপ করেছিলেন ঘর ছেড়ে বাইরে, রোদে পুড়ে ; তোর কি তাই হল ?

প্রকৃতি। হাঁ, মা, তপ করছি তো বটে।

মা। অবাক করলে ! কার জন্যে।

প্রকৃতি। যে আমাকে ডাক দিয়েছে।

গান

যে আমারে দিয়েছে ডাক, দিয়েছে ডাক,
বচনহারা আমাকে যে দিয়েছে বাক্।
যে আমারি নাম জেনেছে ওগো তারি
নামখানি মোর হৃদয়ে থাক্ ॥

মা। কিসের ডাক ?

প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 'জল দাও'।

মা। পোড়া কপাল ! তোকে বলেছে 'জল দাও' ! কে শুনি। তোর আপন জাতের কেউ ?

প্রকৃতি। তাই তো বললেন, তিনি আমার আপন জাতেরই।

মা। জাত লুকোস নি ? বলেছিলি যে তুই চণ্ডালিনী ?

প্রকৃতি। বলেছিলেম। তিনি বললেন, মিথ্যে কথা। তিনি বললেন, শ্রাবণের কালো মেঘকে চণ্ডাল নাম দিলেই বা কী, তাতে তার জাত বদলায় না, তার জলের ঘোচে না গুণ। তিনি বললেন, নিন্দে কোরো না নিজেকে। আত্মনিন্দা পাপ, আত্মহত্যার চেয়ে বেশি।

মা। তোর মুখে এ-সব কী শুনছি। তোর কি মনে পড়েছে পূর্বজন্মের কোনো কাহিনী।

প্রকৃতি। এ কাহিনী আমার নতুন জন্মের।

মা। হাসালি তুই। নতুন জন্ম ! ঘটল কবে।

প্রকৃতি। সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা-দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীত বসন তাঁর। বললেন, জল দাও। প্রাণটা উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে। ভোর বেলাকার

আলো দিয়ে তৈরি তাঁর রূপ। বললেম, আমি চণ্ডালের মেয়ে, কুয়োর জল অশুদ্ধ। তিনি বললেন, যে-মানুষ আমি তুমিও সেই মানুষ ; সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে। প্রথম শুনলুম এমন কথা, প্রথম দিলুম এক গণ্ডূষ জল, যাঁর পায়ের ধুলোর এক কণা নিতে কেঁপে উঠত বুক।

মা। ওরে অবোধ মেয়ে, হঠাৎ এত বড়ো হল তোর বুকের পাটা ! এ পাগলামির প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। জানিস নে কোন্ কুলে তোর জন্ম ?

প্রকৃতি। কেবল একটি গণ্ডূষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হল সেই জল। সাত সমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।

মা। তোর মুখের কথা সুদ্ধ বদলে গেছে যে ! জাদু করেছে তোর কথাকে। কী বলিস নিজে বুঝতে পারিস কিছু ?

প্রকৃতি। সমস্ত শ্রাবস্তীনগরে আর কি কোথাও জল ছিল না, মা। এলেন কেন এই কুয়োরই ধারে। একেই তো বলি নতুন জন্মের পালা। আমাকে দান করতে এলেন মানুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিরোপা। এই মহাপুণ্যই খুঁজছিলেন। যে-জলে ব্রত হল পূর্ণ সে-জল তো আর কোথাও পেতেন না, কোনো তীর্থেই না। তিনি বললেন, বনবাসের গোড়াতেই জানকী এই জলেই স্নান করেছিলেন, সে-জল তুলে এনেছিল গুহক চণ্ডাল। সেই অবধি নেচে উঠছে আমার মন, গভীর কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি দিনরাত-- দাও জল, দাও জল।

গান

বলে দাও জল, দাও জল !
দেব আমি, কে দিয়েছে হেন সম্বল।
কালো মেঘ-পানে চেয়ে
এল ধেয়ে
চাতক বিহ্বল—
দাও জল, দাও জল।
ভূমিতলে হারা
উৎসের ধারা
অন্ধকারে
কারাগারে।
কার সুগভীর বাণী
দিল হানি
কালো শিলাতল—
দাও জল, দাও জল ॥

মা। কী জানি, বাছা, ভালো ঠেকছে না। ওদের মন্তরের খেলা আমি বুঝি নে। আজ তোর কথা চিনছি নে, কাল তোর মুখ চিনতেই পারব না। ওদের এ যে প্রাণবদলানো মন্তর।

প্রকৃতি। চিনতে পার নি এতদিন। যিনি চিনেছেন তিনি চেনাবেন। তাই আছি তাকিয়ে। রাজদুয়ারে দুপুরের ঘণ্টা বাজে, মেয়েরা জল নিয়ে যায় ঘরে, শঙ্খচিল একলা ওড়ে দূর আকাশে, আমার ঘট নিয়ে এসে বসি কুয়োতলায় পথের ধারে।

মা। কার জন্যে।

প্রকৃতি। পথিকের জন্যে।

মা। তোর কাছে কোন্ পথিক আসবে, পাগলি !

প্রকৃতি। সেই এক পথিক, মা, সেই এক পথিক। তাঁর মধ্যে আছে বিশ্বের সকল পথের সব

পথিক। দিনের পর দিন চলে যায়, এলেন না তো। কোনো কথা না ব'লে তবু কথা দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু রাখলেন না কেন কথা। আমার মন যে হল মরুভূমির মতো; ধূ ধূ করে সমস্তদিন, হু হু করে তপ্ত হাওয়া, সে যে পারছে না জল দিতে। কেউ এসে চাইলে না।

গান

চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো
তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন,
সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে।
ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায়,
মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়,
অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে।
যে-ফুল কানন করত আলো
কালো হয়ে সে শুকাল।
ঝরনারে কে দিল বাধা—
তাপের প্রতাপে বাঁধা
দুঃখের শিখরচূড়ে॥

মা। তোর আজকেকার কথা কিছু বুঝতে পারছি নে, তোকে কী নেশা লেগেছে কী জানি। কী চাস, আমাকে সাদা ক'রে বল্।

প্রকৃতি। আমি চাই তাঁকে। তিনি আচমকা এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন, আমার সেবাও চলবে বিধাতার সংসারে, এত বড়ো আশ্চর্য কথা! সেবিকা আমি, এই কথাটি নিন তুলে ধুলোর থেকে তাঁর বুকের কাছে, এই ধুতরো ফুলটাকে।

মা। মনে রাখিস, প্রকৃতি, ওদের কথা কানেই শোনবার, কাজে খাটাবার নয়। অদৃষ্টদোষে যে-কুলে জন্মেছিস তার কাদার বেড়া ভাঙতে পারে এমন লোহার খোন্তাও নেই কোনোখানে। অশুচি তুই, তোর অশুচি হাওয়া ছড়িয়ে বেড়াস নে বাইরে, যেখানে আছিস সেইখানটুকুতেই থাক্ সাবধানে। এই জায়গাটুকুর বাইরে সর্বত্রই তোর অপরাধ।

প্রকৃতি।

গান

ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির 'পরে,
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে।
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
দয়া করে দাও ভুলিতে,
নাই ধূলি মোর অন্তরে।
নয়ন তোমার নত করো,
দলগুলি কাঁপে থরো থরো।
চরণ-পরশ দিয়ো দিয়ো,
ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়,
ধরার প্রণাম আমি
তোমার তরে॥

মা। বাছা, কিছু কিছু বুঝতে পারি তোর কথা। তুই মেয়েমানুষ, সেবাতেই তোর পুজো, সেবাতেই তোর রাজত্ব। এক নিমিষে জাত ডিঙিয়ে যেতে পারে মেয়েরাই; ধরা পড়ে, সবাই তারা রাজরানীর অংশ, যদি হঠাৎ স'রে পড়ে ভাগ্যের পর্দাটা। সুযোগ তোর তো ঘটেছিল। মৃগয়ায় বেরিয়ে রাজার

ছেলে এসেছিল তোরই এই কুয়োতলায়। মনে পড়ে তো ?

প্রকৃতি। হাঁ, মনে পড়ে।

মা। কেন গেলি নে রাজার ঘরে। রূপ দেখে সে তো ভুলেছিল।

প্রকৃতি। ভুলেছিল না তো কী। ভুলেই ছিল যে, আমি মানুষ। পশু মারতে বেরিয়েছিল ; চোখে ঠেকে পশুকেই, তাকেই চায় বাঁধতে সোনার শিকলে।

মা। তবু তো শিকার বলেও ঐ মুখ লক্ষ্য করেছিল সে। আর, ভিক্ষু, সে কি নারী বলে চিনেছে তোমাকে।

প্রকৃতি। বুঝবে না তুমি বুঝবে না। আমি বুঝেছি, এতদিন পরে সে'ই আমাকে প্রথম চিনেছে। সে বড়ো আশ্চর্য।

গান

ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্যদৃষ্টি
আমার সত্যরূপ প্রথম করেছ সৃষ্টি।
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার।
আমি তরুণ অরুণলেখা,
আমি বিমল জ্যোতির রেখা,
আমি নবীন শ্যামল মেঘে
প্রথম প্রসাদবৃষ্টি।
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার ॥

তাঁকে চাই, মা। নিতান্তই চাই। তাঁর সামনে সাজিয়ে ধরতে চাই আমার এ জন্মের পূজার ডালি। অশুচি হবে না তাতে তাঁর চরণ। দেখুক সবাই আমার স্পর্ধা। গৌরব ক'রে বলতে চাই, আমি তোমার সেবিকা, নইলে সংসারে সবারই পায়ের কাছে চিরদিন বাঁধা পড়ে থাকতে হবে দাসী হয়ে।

মা। মিছে রাগ করিস কেন, বাছা। দাসীজন্মই যে তোর। বিধাতার লিখন খণ্ডাবে কে।

প্রকৃতি। ছি ছি, মা, আবার তোকে বলছি, ভুলিস নে, মিথ্যে নিন্দে রটাস নে নিজের— পাপ সে পাপ ! রাজার বংশে কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘরে, আমি দাসী নই। ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল জন্মায় দেশে দেশে, আমি নই চণ্ডাল।

মা। তোর সঙ্গে কথা কইতে পারি এমন কথা আমি জানি নে। তা ভালো, আমি নিজে যাব তাঁর কাছে। পায়ে ধ'রে বলব, তুমি অন্ন নিয়ে থাক সব ঘর থেকেই, আমার ঘরে কেবল এক গণ্ডূষ জল নিতে এসো।

প্রকৃতি। গান

না না, ডাকব না, ডাকব না অমন করে বাইরে থেকে।
পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব, আনব ডেকে।
দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে,
নেবার মানুষ জানি নে তো কোথায় চলে,
এই দেওয়া-নেওয়ার মিলন আমার ঘটাবে কে।
মিলবে না কি মোর বেদনা তার বেদনাতে
গঙ্গাধারা মিশবে না কি কালো যমুনাতে।
আপনি কী সুর উঠল বেজে
আপনা হতে এসেছে যে,
গেল যখন আশার বচন গেছে রেখে ॥

পৃথিবী যখন অনাবৃষ্টিতে ফেটে চৌচির, কী হবে, মা, এক-ঘটি জল সংগ্রহ করে। আপনি আসবে না মেঘ আপন টানে, আকাশ ভরে দিয়ে ?

মা। এ-সব কথা বলে লাভ কী। মেঘ আপনি আসে তো আসে, না আসে তো আসেই না। খেত-খন্দ যদি শুকিয়ে যায় তাতে কার কিসের গরজ। আমরা আকাশে তাকিয়ে থাকি, আর কী করতে পারি।

প্রকৃতি। সে হবে না। তাকিয়ে বসে থাকব না, মন্তর জানিস তুই, সেই মন্তর হোক আমার বাহুবন্ধন, আনুক তাঁকে টেনে।

মা। ওরে সর্বনাশী, বলিস কী ! সাহস কেবলই বাড়ছে দেখি ! আগুন নিয়ে খেলা ! এরা কি সাধারণ মানুষ ! মন্তর খাটাব এদের 'পরে ? শুনে বুক কেঁপে ওঠে।

প্রকৃতি। রাজার ছেলের বেলায় মন্তর পড়তে চেয়েছিলি কোন্ সাহসে।

মা। ভয় করি নে রাজাকে, সে শূলে চড়াতে পারে। কিন্তু, এরা যে কিছুই করে না।

প্রকৃতি। আমি আর কোনো ভয় করি নে ; ভয় করি, আবার যাব নেমে, আবার আপনাকে ভুলব, আবার ঢুকব আঁধার কোঠায়। সে যে মরণের বাড়া। আনতেই হবে তাঁকে, এত বড়ো কথা এত জোর করে বলছি, এ কি আশ্চর্য নয়— এই আশ্চর্যই তো ঘটিয়েছে সে। আরো আশ্চর্য কি ঘটবে না, আসবে না কি আমার পাশে। আমারই আধো আঁচলে বসবে না ?

মা। তাঁকে আনতে পারি হয়তো, তুই তার মূল্য দিতে পারবি ? তোর কিচ্ছুই থাকবে না বাকি !

প্রকৃতি। না, কিছুই থাকবে না। আমার জন্মজন্মান্তরের সেই দায়, কিচ্ছুই থাকবে না, একেবারে সমস্তই মিটিয়ে দিতে পারলেই বেঁচে যাব। তাই তো চাই তাঁকে। কিচ্ছু থাকবে না আমার। আমার যুগযুগের অপেক্ষা করে থাকা এই জন্মেই সার্থক হবে, মন কেবলই তাই বলছে। সার্থক হবে। সেইজন্যেই তো শুনলুম এমন আশ্চর্য কথা— জল দাও। আজ জেনেছি, আমিও পারি দিতে। এই কথা সবাই আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। দেব, দেব, আজ আমার সব-কিছু দেব বলেই বসে আছি তাঁর পথ চেয়ে।

মা। তুই ধর্ম মানিস নে ?

প্রকৃতি। কী করে বলব ! তাঁকেই মানি যিনি আমাকে মানেন। যে-ধর্ম অপমান করে সে-ধর্ম মিথ্যে। অন্ধ ক'রে, মুখ বন্ধ ক'রে সবাই মিলে সেই ধর্ম আমাকে মানিয়েছে। কিন্তু, সেদিন থেকে এই ধর্ম মানা আমার বারণ। কোনো ভয় আর নেই আমার— পড়্ তোর মন্তর, ভিক্ষুকে নিয়ে আয় চণ্ডালের মেয়ের পাশে। আমিই দেব তাঁকে সম্মান। এত বড়ো সম্মান আর কেউ দিতে পারবে না।

গান

আমি তারেই জানি তারেই জানি
আমায় যে জন আপন জানে—
তারি দানে দাবি আমার
যার অধিকার আমার দানে।
যে আমারে চিনতে পারে
সেই চেনাতেই চিনি তারে,
একই আলো চেনার পথে
তার প্রাণে আর আমার প্রাণে।
আপন মনের অন্ধকারে ঢাকল যারা
আমি তাদের মধ্যে আপনহারা।
ছুঁইয়ে দিল সোনার কাঠি,
ঘুমের ঢাকা গেল ফাটি,

নয়ন আমার ছুটেছে তার
আলো-করা মুখের পানে ।।

মা। শাপ লাগার ভয় করিস নে তুই ?

প্রকৃতি। শাপ তো লেগেই আছে জন্মকাল থেকে। এক শাপের বিষে আর-এক শাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায়। কোনো কথাই শুনব না, মা, শুনব না, শুনব না। শুরু করে দে মন্ত্র। পারব না দেরি সইতে।

মা। আচ্ছা, তা হলে কী নাম তাঁর বল্।

প্রকৃতি। তাঁর নাম আনন্দ।

মা। আনন্দ ? ভগবান বুদ্ধের শিষ্য ?

প্রকৃতি। হাঁ, সেই ভিক্ষু।

মা। তুই আমার বুক-চেরা ধন, আমার চোখের মণি— তোর কথাতেই এত বড়ো পাপে হাত দিচ্ছি।

প্রকৃতি। কিসের পাপ ! যিনি সবাইকে কাছে আনেন তাঁকে কাছে আনব, তাতে দোষ হয়েছে কী।

মা। ওঁরা পুণ্যের জোরে টেনে আনেন মানুষকে। আমরা মন্তর পড়ে টানি, পশুকে টানে যে-ফাঁসে। আমরা মথন করে তুলি পাঁক।

প্রকৃতি। ভালোই সে ভালোই, নইলে পঙ্কোদ্ধার হয় না।

মা। ওগো, তুমি মহাপুরুষ, অপরাধ করবার শক্তি আমার যত, ক্ষমা করবার শক্তি তোমার তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রভু, অসম্মান করতে বসেছি, তবু প্রণাম গ্রহণ করো।

প্রকৃতি। কিসের ভয় তোমার, মা ! মন্ত্র আমিই পড়ছি মায়ের মুখ দিয়ে। আমার বেদনা যদি আনে তাঁকে টেনে, আর তাই যদি হয় অপরাধ, তবে করবই অপরাধ, করবই। যে-বিধানে কেবল শাস্তিই আছে, সান্ত্বনা নেই, মানব না সে বিধানকে।

গান

দোষী করো, দোষী করো।
ধুলায়-পড়া ম্লান কুসুম
পায়ের তলায় ধরো।
অপরাধে-ভরা ডালি
নিজ হাতে করো খালি,
তার পরে সেই শূন্য ডালায়
তোমার করুণা ভরো।
তুমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ—
ধরব তোমায় ফাঁদে
আমার অপরাধে।
আমার দোষকে তোমার পুণ্য
করবে তো কলঙ্কশূন্য,
ক্ষমায় গেঁথে সকল ত্রুটি
গলায় তোমার পরো ।।

মা। আচ্ছা সাহস তোর প্রকৃতি।

প্রকৃতি। আমার সাহস ! ভেবে দেখ্, তাঁর সাহসের জোর ! কেউ যে-কথা আমার কাছে বলতে

পারে নি তিনি সহজেই বললেন, জল দাও। ঐটুকু বাণী, তার তেজ কত— আলো ক'রে দিলে আমার সমস্ত জন্ম ; বুকের উপরে কালো পাথরটা চিরকাল চাপা ছিল, দিলে সেটাকে ঠেলে, উছলে উঠল রসের ধারা। মিথ্যে তোর ভয়, তুই যে তাঁকে দেখিস নি। সমস্ত সকাল বেলা ভিক্ষা শেষ করলেন শ্রাবস্তীনগরে ; এলেন মাঠ পেরিয়ে শ্মশান পেরিয়ে, নদীর তীর বেয়ে, প্রখর রৌদ্র মাথায় করে। কিসের জন্যে। আমার মতো মেয়েকেও কেবল ঐ একটি কথা বলবার জন্যে— জল দাও ! মরে যাই, মরে যাই। কোথা থেকে নামল এত দয়া, এত প্রেম ! নামল সেই ভীরুর কাছে যে সবার চেয়ে অযোগ্য। আর কিসের ভয় আমার ! জল দাও ! সেই জল-যে আমার জন্ম ভরে উপচে উঠেছে, না দিতে পারলে তো বাঁচব না। জল দাও ! এক নিমেষে জেনেছি, জল আছে আমার, অফুরান জল, সে আমি জানাব কাকে। তাই তো ডাকছি দিনরাত। শুনতে যদি না পান, ভয় নেই, দে তোর মন্তর পড়ে। সইবে তাঁর সইবে।

মা। মাঠপারের রাস্তা দিয়ে ঐ-যে কারা চলেছে, প্রকৃতি, পীতবসন-পরা।

প্রকৃতি। তাই তো, ও যে দেখছি সংঘের সব শ্রমণ। শুনছ না, পড়ছেন মন্ত্র !

পথে শ্রমণেরা। বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহান্নবো
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর-ঞানলোচনো।
লোকস্‌স পাপূপকিলেসঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধম্‌ অহমাদরেণ তম্‌।

প্রকৃতি। মা, ঐ-যে তিনি চলেছেন সবার আগে আগে। এই কুয়োতলার দিকে ফিরে তাকালেন না। আর-একবার তো বলে যেতে পারতেন, জল দাও। মনে হয়েছিল, আমাকে উনি ফেলে যেতে পারবেন না, আমি যে ওঁর নিজের হাতের নতুন সৃষ্টি। (বসে প'ড়ে বার বার মাটিতে মাথা ঠুকে) এই মাটি, এই মাটি, এই মাটিই তোর আপন— হতভাগিনী, কে তোকে আলোতে ফুটিয়ে তুলেছিল এক মুহূর্তের জন্যে। তাকে কি দয়া বলে। শেষে পড়তে হল এই মাটিতেই— চিরদিন মিশিয়ে থাকতে হবে এই মাটিতেই, যত লোক চলে রাস্তায় তাদের পায়ের তলায়।

মা। বাছা, ভুলে যা, ভুলে যা এ সমস্ত-কিছু। তোর এক নিমেষের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে ওরা যাচ্ছে চলে, যাক যাক। যা টেকবার নয় তা যত শীঘ্র যায় ততই ভালো।

প্রকৃতি। এই প্রতিদিনের চাই চাই চাই, এই প্রতি মুহূর্তের অপমান, বুকের ভিতরে এই খাঁচার পাখির পাখা-আছড়ে-মরা, একেই বলে স্বপ্ন ? যা বুকের সব শিরা কামড়ে ধ'রে থাকে, ছাড়তে চায় না, তাই স্বপ্ন ? আর ঐ ওরা, নেই কোনো বাঁধন, নেই কোনো সুখদুঃখ, নেই কোনো সংসারের বোঝা— ভেসে চলে যায় শরৎকালের মেঘের মতো— ওরাই আছে জেগে, ওরাই স্বপ্ন নয় ?

মা। তোর কষ্ট দেখতে পারি নে, প্রকৃতি। ওঠ্‌ তুই। আনবই তাঁকে মন্ত্র পড়ে। নিয়ে আসব ধুলোর পথ দিয়েই। 'কিছু চাই না' বলার অহংকার ভাঙব তাঁর— 'চাই চাই' বলেই আসতে হবে তাঁকে ছুটে।

প্রকৃতি। মা, তোমার মন্ত্র জীবসৃষ্টির আদিকালের। এদের মন্ত্র কাঁচা, এই সেদিনকার। ওরা পারবে না তোমার সঙ্গে। তোমার মন্ত্রের টানে খুলবে ওদের মন্ত্রের গাঁঠ। ওঁকে হারতেই হবে, হারতেই হবে।

মা। কোথায় যাচ্ছে ওরা।

প্রকৃতি। ওরা যায় এইমাত্র জানি, ওরা কোনোখানেই যায় না। বর্ষা আসবে কিছুদিন পরে, তখন বসবে চাতুর্মাস্যে। আবার যাবে, কী জানি কোথায়। একেই ওরা বলে জেগে থাকা !

মা। পাগলি, তবে কী বলছিস মন্তরের কথা। চলে যাচ্ছে কত দূরে— কোথা থেকে আনব ফিরিয়ে।

প্রকৃতি। যেখানেই যাক ফেরাতেই হবে, দূর নেই তোর মন্তরের কাছে।

গান

যায় যদি যাক সাগরতীরে।
আবার আসুক, আবার আসুক, আসুক ফিরে
রেখে দেব আসন পেতে
হৃদয়েতে,
পথের ধুলো ভিজিয়ে দেব অশ্রুনীরে।
যায় যদি যাক শৈলশিরে।
আসুক ফিরে, আসুক ফিরে।
লুকিয়ে রব গিরিগুহায়,
ডাকব উহায়—
আমার স্বপন ওর জাগরণ রইবে ঘিরে ॥

আমাকে করলে না দয়া, আমি ওকে দয়া করব না। তোর সব চেয়ে যে নিষ্ঠুর মন্ত্র পড়িস তাই— পাকে পাকে দাগ দিয়ে দিয়ে জড়াক ওর মনকে। যাবে কোথায় আমাকে এড়িয়ে, পারবে কেন।

মা। ভাবনা করিস নে। অসাধ্য হবে না। তোকে দেব মায়াদর্পণ। সেইটি হাতে নিয়ে নাচবি। তার ছায়া পড়বে তাতে। সেই আয়নাতেই দেখতে পাবি কী হল তার, কতদূর সে এল।

প্রকৃতি। ঐ দেখ্, পশ্চিমে জমল মেঘ, ঝড়ের মেঘ। মন্ত্র খাটবে, মা, খাটবে। উড়ে যাবে শুষ্ক সাধন, শুকনো পাতার মতো। নিববে বাতি। পথ দেখা যাবে না। ঘুরে ঘুরে এসে পড়বে এই দরজায়, নিশীথরাতে ঝড়ে বাসাভাঙা পাখি যেমন করে এসে পড়ে অন্ধকার আঙিনায়। বুক দুর্‌দুর্ করছে, মনের মধ্যে ঝিলিক দিচ্ছে বিজুলি, ফেনিয়ে ফেনিয়ে ঢেউ উঠছে যে-সমুদ্রে তার পার দেখি নে।

মা। এখনো ভেবে দেখ্। মাঝখানে তো আঁৎকে উঠবি নে ভয়ে? ধৈর্য থাকবে তোর? মন্ত্রের বেগ চ'ড়ে যাবে যখন, হঠাৎ ঠেকাতে গেলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। জ্বলবার জিনিস সমস্ত যাবে ছাই হয়ে, তবে নিববে আগুন, এই কথাটা মনে রাখিস।

প্রকৃতি। তুই ডরছিস কার জন্যে। সে কি তেমনি মানুষ। কিছুতে কিছু হবে না তার— শেষ পর্যন্তই আসুক সে চলে, আগুনের পথ মাড়িয়ে মাড়িয়ে। আমি মনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, সামনে প্রলয়ের রাত্রি, মিলনের ঝড়, ভাঙনের আনন্দ।

গান

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু,
ঘন মেঘের ভুরু, কুটিল কুঞ্চিত,
হল রোমাঞ্চিত বন বনান্তর;
দুলিল চঞ্চল বক্ষোহিন্দোলে
মিলনস্বপ্নে সে কোন্ অতিথি রে।
সঘন-বর্ষণ-শব্দ-মুখরিত
বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী,
মালতীবল্লরী কাঁপায় পল্লব
করুণ কল্লোলে,
কানন শঙ্কিত ঝিল্লিঝংকৃত ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রকৃতি। বুক ফেটে যাবে। আমি দেখব না আয়না, দেখতে পারব না। কী ভয়ংকর দুঃখের ঘূর্ণিঝড়। বনস্পতি শেষকালে কি মড়্‌মড়্‌ করে লুটোবে ধুলোয়, অভ্রভেদী গৌরব তার পড়বে ভেঙে ?

মা। দেখ্, বাছা, এখনো যদি বলিস, ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি আমার মন্ত্রকে। তাতে আমার নাড়ী ছিঁড়ে যায় যদি, যায় নিজের প্রাণ, সেও ভালো, কিন্তু ঐ মহাপ্রাণ রক্ষে পাক।

প্রকৃতি। সেই ভালো, মা, থাক্ তোমার মন্ত্র। আর কাজ নেই।— না না না না— পথ আর কতখানিই বা ! শেষ পর্যন্ত আসতে দে তাকে, আসতে দে, আমার এই বুকের কাছ পর্যন্ত। তার পরে সব দুঃখ দেব মিটিয়ে, আমার বিশ্বসংসার উজাড় করে দিয়ে। গভীর রাত্রে এসে পৌঁছবে পথিক, সমস্ত বুকের জ্বালা দিয়ে জ্বালিয়ে দেব প্রদীপ, আছে সুধার ঝরনা গভীর অন্তরে, তারি জলে অভিষেক হবে তার— যে শ্রান্ত, যে তপ্ত, যে ক্ষতবিক্ষত। আর-একবার সে চাইবে, জল দাও— আমার হৃদয়সমুদ্রের জল ! আসবে সেইদিন। তোর মন্ত্র চলুক, চলুক।

গান

দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার,
স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার।
মোর সংসার দিব যে জ্বালি,
শোধন হবে এ মোহের কালি,
মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার ॥

মা। এত দেরি হবে জানতুম না, বাছা। আমার মন্ত্র শেষ হল বুঝি। আমার প্রাণ যে কণ্ঠে এসেছে।

প্রকৃতি। ভয় নেই, মা, আর-একটু সয়ে থাক্। একটুখানি। বেশি দেরি নেই।

মা। আষাঢ় তো পড়েছে, ওঁদের চাতুর্মাস্য তো আরম্ভ হল।

প্রকৃতি। ওঁরা গেছেন বৈশালীতে গোশিরসংঘে।

মা। কী নিষ্ঠুর তুই ! সে যে অনেক দূর।

প্রকৃতি। বহুদূর নয়। সাত দিনের পথ। পনেরো দিন তো কেটে গেল। এতদিনে মনে হচ্ছে, টলেছে আসন, আসছে আসছে, যা বহুদূর, যা লক্ষযোজন দূর, যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে, আমার দু হাতের নাগাল থেকে যা অসীম দূরে তাই আসছে কাছে। আসছে, কাঁপছে আমার বুক ভূমিকম্পে।

মা। মন্ত্রের সব অঙ্গ পূর্ণ করেছি, এতে বজ্রপাণি ইন্দ্রকে আনতে পারত টেনে। তবু দেরি হচ্ছে। কী মরণান্তিক যুদ্ধই চলছে। কী দেখেছিলি তুই আয়নাতে।

প্রকৃতি। প্রথম দেখেছি, আকাশজোড়া কুয়াশা, দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত দেবতার ফ্যাকাশে মুখের মতো। কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে বেরোচ্ছে আগুন। তার পরে কুয়াশাটা স্তবকে স্তবকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল— ফুলে-ওঠা ফেটে-পড়া প্রকাণ্ড বিষফোড়ার মতো— লাল হয়ে উঠল রঙ। সেদিন গেল। পরের দিন দেখি, পিছনে ঘন কালো মেঘ, বিদ্যুৎ খেলছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, জ্বলছে আগুন সর্বাঙ্গ ঘিরে। আমার রক্ত এল হিম হয়ে। ছুটে তোকে বলতে গেলুম, এখনি দে তোর মন্ত্র বন্ধ করে। গিয়ে দেখি তুই শিবনেত্র, কাঠের মতো বসে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, জ্ঞান নেই। মনে হল, তোর মধ্যেও কোনোখানে দাউ-দাউ জ্বলছে আগুন। যে পাবক দিয়ে তিনি ঢেকেছেন আপনাকে তোর অগ্নিনাগিনী ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে তাকে ছোবল মারছে, চলছে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। ফিরে এসে আয়না তুলে দেখি, আলো গেছে— শুধু দুঃখ দুঃখ দুঃখ, অসীম দুঃখের মূর্তি।

মা। মরে পড়ে গেলি নে তাই দেখে! তারই তো ঝলক লেগেছিল আমার প্রাণের মধ্যে ; মনে হল, আর সইবে না।

প্রকৃতি। যে দুঃখের রূপ দেখেছি সে তো তাঁর একলার নয়, সে আমারও ; আমাদের দু-জনের। ভীষণ আগুনে গ'লে মিশেছে সোনার সঙ্গে তাঁবা।

মা। ভয় হল না তোর মনে?

প্রকৃতি। ভয়ের চেয়ে অনেক বেশি— মনে হল দেখলুম, সৃষ্টির দেবতা প্রলয়ের দেবতার চেয়ে ভয়ংকর— আগুনকে চাবকাচ্ছেন তাঁর কাজে, আর আগুন কেবলই গোমরাচ্ছে গর্জাচ্ছে। সপ্তধাতুর কৌটোতে কী আছে তাঁর পায়ের সামনে— প্রাণ না মৃত্যু? আমার মনে ফুলতে লাগল একটা আনন্দ। তাকে কী বলব? নতুন সৃষ্টির বিরাট বৈরাগ্য। ভাবনা নেই, ভয় নেই, দয়া নেই, দুঃখ নেই— ভাঙছে, জ্বলে উঠছে, গলে যাচ্ছে, ছিটকে পড়ছে স্ফুলিঙ্গ। থাকতে পারলুম না, আমার সমস্ত শরীর-মন নেচে নেচে উঠল অগ্নিশিখার মতো।

গান

হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র, হে ভয়ংকর,
ওহে শংকর, হে প্রলয়ংকর।
হোক জটানিঃসৃত অগ্নিভুজঙ্গম-
দংশনে জর্জর স্থাবর জঙ্গম,
ঘন ঘন ঝন-ঝন, ঝন-নন ঝন-নন
পিণাক টংকরো॥

মা। কী রকম দেখলি তোর ভিক্ষুকে।

প্রকৃতি। দেখলুম, তাঁর অনিমেষ দৃষ্টি বহুদূরে তাকিয়ে, গোধূলি-আকাশের তারার মতো। ইচ্ছে হল, আপনার কাছ থেকে চলে যাই অনন্তযোজন দূরে।

মা। তুই আয়নার সামনে তখন নাচছিলি— তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন?

প্রকৃতি। ধিক্ ধিক্, কী লজ্জা! মনে হচ্ছিল, থেকে থেকে চোখ লাল হয়ে উঠছে, অভিশাপ দিতে যাচ্ছেন। আবার তখনি পা দিয়ে মাড়িয়ে দলে ফেলছেন রাগের অঙ্গারগুলো। শেষকালে দেখলেম, তাঁর রাগ ফিরল কাঁপতে কাঁপতে শেলের মতো নিজের দিকে, বিঁধল গিয়ে মর্মের মধ্যে।

মা। সমস্ত সহ্য করলি তুই?

প্রকৃতি। আশ্চর্য হয়ে গেলুম। আমি, এই আমি, এই তোমার মেয়ে, কোথাকার কে তার ঠিকানা নেই— তাঁর দুঃখ আর এর দুঃখ আজ এক। কোন্ সৃষ্টির যজ্ঞে এমন ঘটে— এত বড়ো কথা কেউ কোনোদিন ভাবতে পারত!

মা। এই উৎপাত শান্ত হবে কতদিনে।

প্রকৃতি। যতদিন-না আমার দুঃখ শান্ত হবে। ততদিন দুঃখ তাঁকে দেবই। আমি মুক্তি যদি না পাই তিনি মুক্তি পাবেন কী করে।

মা। তোর আয়না শেষ দেখেছিস কবে।

প্রকৃতি। কাল সন্ধেবেলায়। বৈশালীর সিংহদরজা পেরিয়েছেন কিছুদিন আগে, গভীর রাত্রে। বোধ হয় গোপনে, শ্রমণদের না জানিয়ে। তার পরে কখনো দেখেছি, নদী পেরলেন খেয়া নৌকোয় ; দেখেছি দুর্গম পাহাড়ে ; দেখেছি সন্ধে হয়ে এসেছে, মাঠে তিনি একা ; দেখেছি অন্ধকারে, গভীর রাত্রে, বনের পথে। যত যাচ্ছে দিন, স্বপ্নের ঘোর আসছে ঘন হয়ে, চলেছেন কোনো বিচার না করে, নিজের সঙ্গে সমস্ত দ্বন্দ্ব শেষ করে দিয়ে। মুখে একটা বিহ্বলতা, দেহে একটা শৈথিল্য— দুই চোখের

সামনে যেন বস্তু নেই ; নেই সত্যমিথ্যা, নেই ভালোমন্দ ; আছে চিন্তাহীন অন্ধ লক্ষ্য, নেই তার কোনো অর্থ।

মা। আজ কোথায় এসেছেন আন্দাজ করতে পারিস ?

প্রকৃতি। কাল সন্ধ্যার সময় দেখেছি উপলী নদীর ধারে পাটল গ্রামে। নববর্ষায় জলের ধারা উন্মত্ত, ঘাটের কাছে পুরোনো পিপুল গাছ, জোনাকি জ্বলছে ডালে ডালে, তলায় শেওলা-ধরা বেদী— সেইখানে এসেই হঠাৎ চমকে দাঁড়ালেন। অনেকদিনের চেনা জায়গা ; শুনেছি, ঐখানে বসে ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজা সুপ্রভাসকে উপদেশ দিয়েছিলেন। দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন, স্বপ্ন বুঝি ভাঙল হঠাৎ। তখনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেম আয়না, ভয় হল কী জানি কী দেখব। তার পরে গেছে সমস্তদিন, কিছু জানতে চাই নি, আশা করছি, আশা ছাড়ছি— এমনি করে আছি বসে। এখন রাত আসছে অন্ধকার হয়ে। প্রহরী হাঁক দিয়ে চলেছে রাস্তায়, এক প্রহর গেল বুঝি কেটে ! আর সময় নেই, সময় নেই, মা, এ রাত ব্যর্থ করিস নে। তোর সব জোরটা দে ঐ মন্ত্রে।

মা। আর পারছি নে, বাছা। মন্ত্র দুর্বল হয়ে এল, আমার প্রাণ ও শরীর এসেছে অবশ হয়ে।

প্রকৃতি। দুর্বল হলে চলবে না। দিস নে হাল ছেড়ে। ফেরবার দিকে মুখ ফিরিয়েছেন বা, বাঁধনে শেষ টান পড়েছে— হয়তো টিকবে না। হয়তো বেরিয়ে যাবেন আমার এ জন্মের সংসার থেকে, আর পাব না নাগাল কিছুতেই। তখন আমারই স্বপ্নের পালা, আবার চণ্ডালিনীর মায়ামূর্তি। পারব না সইতে সেই মিথ্যে। পায়ে পড়ি, মা, দে একবার তোর সমস্ত শক্তি। এবার শুরু কর্ তোর বসুন্ধরামন্ত্র, টলতে থাক্ পুণ্যবানদের তুষিত স্বর্গলোক।

গান

আমি তোমারি মাটির কন্যা,
জননী বসুন্ধরা।
তবে আমার মানবজন্ম
কেন বঞ্চিত করা।
পবিত্র জানি যে তুমি
পবিত্র জন্মভূমি—
মানবকন্যা আমি যে ধন্যা
প্রাণের পুণ্যে ভরা।
কোন্ স্বর্গের তরে
ওরা তোমায় তুচ্ছ করে,
রহি তোমার বক্ষ-'পরে।
আমি যে তোমারি আছি
নিতান্ত কাছাকাছি—
তোমার মোহিনীশক্তি দাও আমারে
হৃদয়প্রাণ-হরা॥

মা। যেমন বলেছিলেম তেমনি প্রস্তুত হয়েছ তো ?

প্রকৃতি। হয়েছি ! কাল ছিল শুক্লাদ্বিতীয়ার রাত, করেছি গম্ভীরায় অবগাহন স্নান। এই তো চাল দিয়ে, দাড়িমের ফুল দিয়ে, সিঁদুর দিয়ে, সাতটি রত্ন দিয়ে, চক্র এঁকেছি আঙিনায়। পুঁতেছি হলদে কাপড়ের ধ্বজাগুলি, থালায় রেখেছি মালাচন্দন, জ্বালিয়েছি বাতি। স্নানের পর কাপড় পরেছি ধানের অঙ্কুরের রঙ, চাঁপার রঙের ওড়না। পুব দিকে আসন করে সমস্ত রাত ধ্যান করেছি তাঁর মূর্তি। ষোলোটি সোনালি সুতোয় ষোলোটি গ্রন্থি দিয়ে রাখী পরেছি বাঁ হাতে।

মা। আচ্ছা, তবে নাচো তোমার সেই আহ্বানের নাচ— প্রদক্ষিণ করো। আমি বেদীর কাছে মন্ত্র পড়ছি।

প্রকৃতি।

গান

মম রুদ্ধ মুকুলদলে এসো
সৌরভ-অমৃতে।
মম অখ্যাত তিমিরতলে এসো
গৌরবনিশীথে।
এই মূল্যহারা মম শুক্তি,
এসো মুক্তাকণায় তুমি মুক্তি।
মম মৌনী বীণার তারে তারে
এসো সংগীতে।
নব-অরুণের এসো আহ্বান—
চিররজনীর হোক অবসান, এসো।
এসো শুভস্মিত শুকতারায়,
এসো শিশির-অশ্রুধারায়,
সিন্দূর পরাও উষারে
তব রশ্মিতে।।

মা। প্রকৃতি, এইবার তোমার আয়নাটা নিয়ে দেখো। দেখছ— কালো ছায়া পড়েছে বেদীটার উপরে? আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, পারছি নে। দেখো আয়নাটা— আর কত দেরি।

প্রকৃতি। না, দেখব না, দেখব না, আমি শুনব মনের মধ্যে— ধ্যানের মধ্যে। হঠাৎ সামনে দেখব যদি দেখা দেন। আর-একটু সয়ে থাকো, মা— দেবেন দেখা, নিশ্চয় দেবেন। ঐ দেখো, হঠাৎ এল ঝড়, আগমনীর ঝড়, পদভরে পৃথিবী কাঁপছে থর্‌থরিয়ে, বুক উঠছে গুর্‌গুর্ করে।

মা। আনছে তোর অভিশাপ হতভাগিনী। আমাকে তো মেরে ফেললে! ছিঁড়ল বুঝি শিরাগুলো।

প্রকৃতি। অভিশাপ নয়, অভিশাপ নয়, আনছে আমার জন্মান্তর, মরণের সিংহদ্বার খুলছে, বজ্রের হাতুড়ি মেরে। ভাঙল দরজা, ভাঙল প্রাচীর, ভাঙল আমার এ জন্মের সমস্ত মিথ্যে। ভয়ে কাঁপছে আমার মন, আনন্দে দুলছে আমার প্রাণ। ও আমার সর্বনাশ, ও আমার সর্বস্ব, তুমি এসেছ— আমার সমস্ত অপমানের চূড়ায় তোমাকে বসাব, গাঁথব তোমার সিংহাসন। আমার লজ্জা দিয়ে, ভয় দিয়ে, আনন্দ দিয়ে।

মা। সময় হয়ে আসছে আমার। আর পারছি নে। শিগ্‌গির দেখ্ তোর আয়নাটা।

প্রকৃতি। মা, ভয় হচ্ছে। তাঁর পথ আসছে শেষ হয়ে— তার পরে? তার পরে কী। শুধু এই আমি! আর কিছু না! এতদিনের নিষ্ঠুর দুঃখ এতেই ভরবে? শুধু আমি? কিসের জন্যে এত দীর্ঘ, এত দুর্গম পথ! শেষ কোথায় এর! শুধু এই আমাতে!

গান

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়,
কী আছে শেষে,
এত কামনা এত সাধনা কোথায় মেশে।

সম্মুখে ঘন আঁধার—
পার আছে কোন্ দেশে

আজ ভাবি মনে মনে,
মরীচিকা-অন্বেষণে
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই—
মনে ভয় লাগে সেই,
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা
চলেছে নিরুদ্দেশে ।।

মা । ও নিষ্ঠুর মেয়ে, দয়া কর্ আমাকে । আমার আর সহ্য হয় না । শিগ্‌গির আয়নাটা দেখ্ ।

প্রকৃতি । (আয়নাটা দেখেই ফেলে দিল) মা, ওমা, ওমা রাখ্ রাখ্ রাখ্ রাখ্, ফিরিয়ে নে ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র ! এখনি, এখনি । ওরে ও রাক্ষুসী, কী করলি, কী করলি, তুই মরলি নে কেন ! কী দেখলেম ! ওগো, কোথায় আমার সেই দীপ্ত উজ্জ্বল, সেই শুভ্র নির্মল, সেই সুদূর স্বর্গের আলো ! কী ম্লান, কী ক্লান্ত, আত্মপরাজয়ের কী প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে এল আমার দ্বারে ! মাথা হেঁট করে এল ! যাক, যাক, এ-সব যাক (পা দিয়ে মন্ত্রের উপকরণ ভেঙে ছড়িয়ে ফেললে)— ওরে, তুই চণ্ডালিনী না হোস যদি, অপমান করিস নে বীরের । জয় হোক তাঁর জয় হোক ।

আনন্দের প্রবেশ

প্রভু, এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে— তাই এত দুঃখই পেলে— ক্ষমা করো, ক্ষমা করো । অসীম গ্লানি পদাঘাতে দূর করে দাও । টেনে এনেছি তোমাকে মাটিতে, নইলে কেমন করে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে তোমার পুণ্যলোকে ! ওগো নির্মল, পায়ে তোমার ধুলো লেগেছে, সার্থক হবে সেই ধুলো-লাগা । আমার মায়া-আবরণ পড়বে খসে তোমার পায়ে, ধুলো সব নেবে মুছে । জয় হোক, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক ।

মা । জয় হোক, প্রভু । আমার পাপ আর আমার প্রাণ দুই পড়ল তোমার পায়ে, আমার দিন ফুরল ঐখানেই— তোমার ক্ষমার তীরে এসে ।

[মৃত্যু

আনন্দ ।

বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর-ঞানলোচনো ।
লোকস্‌স পাপূপকিলেসঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধম্ অহমাদরেণ তম্ ।।

VISVA-BHARATI LIBRARY
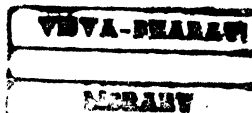
তাসের দেশ

উৎসর্গ

কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র,

স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ ক'রে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।

শান্তিনিকেতন
মাঘ ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খর বায়ু বয় বেগে,
চারি দিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কষে ধরো হাল,
আমি তুলে বাঁধি পাল—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥
শৃঙ্খলে বার বার
ঝন্‌ঝন্ ঝংকার,
নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার—
বন্ধন দুর্বার
সহ্য না হয় আর,
টলোমলো করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।
গনি গনি দিন খন
চঞ্চল করি মন
বোলো না, যাই কি নাই যাই রে।
সংশয়পারাবার
অন্তরে হবে পার,
উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল,
উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হোয়ো নাকো কুণ্ঠিত,
তালে তার দিয়ো তাল,
জয়-জয় জয়গান গাইয়ো।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক তাসের দেশের অভিনয়

তাসের দেশ

প্রথম দৃশ্য

রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র

রাজপুত্র। আর তো চলছে না, বন্ধু।

সদাগর। কিসের চাঞ্চল্য তোমার, রাজকুমার।

রাজপুত্র। কেমন ক'রে বলব। কিসের চাঞ্চল্য বলো দেখি ঐ হাঁসের দলের, বসন্তে যারা ঝাঁকে ঝাঁকে চলেছে হিমালয়ের দিকে।

সদাগর। সেখানে যে ওদের বাসা।

রাজপুত্র। বাসা যদি, তবে ছেড়ে আসে কেন। না না, ওড়বার আনন্দ, অকারণ আনন্দ।

সদাগর। তুমি উড়তে চাও ?

রাজপুত্র। চাই বৈকি।

সদাগর। বুঝতেই পারি নে তোমার কথা। আমি তো বলি অকারণ ওড়ার চেয়ে সকারণ খাঁচায় বন্ধ থাকাও ভালো।

রাজপুত্র। সকারণ বলছ কেন।

সদাগর। আমরা-যে সোনার খাঁচায় থাকি শিকলে বাঁধা দানাপানির লোভে।

রাজপুত্র। তুমি বুঝতে পারবে না, বুঝতে পারবে না।

সদাগর। আমার ও দোষটা আছে, যা বোঝা যায় না তা আমি বুঝতেই পারি নে। একটু স্পষ্ট করেই বলো-না, কী তোমার অসহ্য হল।

রাজপুত্র। রাজবাড়ির এই একঘেয়ে দিনগুলো।

সদাগর। একঘেয়ে বল তাকে ? কতরকম আয়োজন, কত উপকরণ।

রাজপুত্র। নিজেকে মনে হয় যেন সোনার মন্দিরে পাথরের দেবতা। কানের কাছে কেবল একই আওয়াজে বাজছে শঙ্খ কাঁসর ঘণ্টা। নৈবেদ্যের বাঁধা বরাদ্দ, কিন্তু ভোগে রুচি নেই। এ কি সহ্য হয়।

সদাগর। আমাদের মতো লোকের তো খুবই সহ্য হয়। ভাগ্যিস বাঁধা বরাদ্দ। বাঁধন ছিঁড়লেই তো মাথায় হাত দিয়ে পড়তে হয়। যা পাই তাতেই আমাদের ক্ষুধা মেটে। আর, যা পাও না তাই দিয়েই তোমরা মনে মনে ক্ষুধা মেটাতে চাও।

রাজপুত্র। আর, রোজ রোজ ঐ-যে চারণদের স্তব শুনতে হয় একই বাঁধা ছন্দে— সেই শার্দূলবিক্রীড়িত।

সদাগর। আমার তো মনে হয়, স্তব জিনিসটা বার বার যতই শোনা যায় ততই লাগে ভালো। কিছুতেই পুরনো হয় না।

রাজপুত্র। ঘুম ভাঙতেই সেই এক বৈতালিকের দল। আর, রোজ সকালে সেই এক পুরুতঠাকুরের ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ। আর আসতে যেতে দেখি, সেই বুড়ো কঞ্চুকীটা কাঠের পুতুলের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। কোথাও যাবার জন্যে একটু পা বাড়িয়েছি কি অমনি কোথা থেকে প্রতিহারী এসে হাজির, বলে— ইত ইতো, ইত ইতো, ইত ইতো। সব্বাই মিলে মনটাকে যেন বুলি-চাপা দিয়ে রেখেছে।

সদাগর। কেন, মাঝে মাঝে যখন শিকারে যাও তখন বুনোজন্তু ছাড়া আর-কোনো উৎপাত তো থাকে না।

রাজপুত্র। বুনোজন্তু বলো কাকে। আমার তো সন্দেহ হয়, রাজশিকারী বাঘগুলোকে আফিম খাইয়ে রাখে। ওরা যেন অহিংস্রনীতির দীক্ষা নিয়েছে। এ পর্যন্ত একটাকেও তো ভদ্ররকম লাফ মারতে দেখলুম না।

সদাগর। যাই বল, বাঘের এই আচরণকে আমি তো অসৌজন্য ব'লে মনে করি নে। শিকারে যাবার ধুমধামটা সম্পূর্ণই থাকে, কেবল বুক দুর্‌দুর্‌ করে না।

রাজপুত্র। সেদিন ভালুকটাকে বহুদূর থেকে তীর বিঁধেছিলুম, তা নিয়ে চার দিক থেকে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল ; বললে, রাজপুত্রের লক্ষ্যভেদের কী নৈপুণ্য ! তার পরে কানাকানিতে শুনলুম, একটা মরা ভালুকের চামড়ার মধ্যে খড়বিচিলি ভরে দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল। এত বড়ো পরিহাস সহ্য করতে পারি নি। শিকারীকে কারাদণ্ডের আদেশ করে দিয়েছি।

সদাগর। তার উপকার করেছ। তার সে কারাগারটা রানীমার অন্দরমহলের সংলগ্ন, সে দিব্যি সুখে আছে। এই তো সেদিন, তার জন্য তিন মণ ঘি আর তেত্রিশটা পাঁঠা পাঠিয়ে দিয়েছি আমাদের গদি থেকে।

রাজপুত্র। এর অর্থ কী।

সদাগর। সে ভালুকটার সৃষ্টি যে রানীমারই আদেশে।

রাজপুত্র। ঐ তো। আমরা পড়েছি অসত্যের বেড়াজালে। নিরাপদের খাঁচায় থেকে থেকে আমাদের ডানা আড়ষ্ট হয়ে গেল। আগাগোড়া সবই অভিনয়। আমাকে যুবরাজী সঙ বানিয়েছে। আমার এই রাজসাজ ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। ঐ-যে ফসলখেতে ওদের চাষ করতে দেখি, আর ভাবি, পূর্বপুরুষের পুণ্যে ওরা জন্মেছে চাষী হয়ে।

সদাগর। আর, ওরা তোমার কথা কী ভাবে সে ওদের জিজ্ঞাসা করে দেখো দেখি। রাজপুত্র, তুমি কী সব বাজে কথা বলছ— মনের আসল কথাটা লুকিয়েছ। ওগো পত্রলেখা, আমাদের রাজপুত্রের গোপন কথাটি হয়তো তুমিই আন্দাজ করতে পারবে, একবার সুধিয়ে দেখো-না।

পত্রলেখার প্রবেশ

গান

পত্রলেখা। গোপন কথাটি রবে না গোপনে,
উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে—
রাজপুত্র। না না না, রবে না গোপনে।
পত্রলেখা। বিভল হাসিতে
বাজিল বাঁশিতে,
স্ফুরিল অধরে নিভৃত স্বপনে—
রাজপুত্র। না না না, রবে না গোপনে।
পত্রলেখা। মধুপ গুঞ্জরিল,
মধুর বেদনায় আলোক-পিয়াসি
অশোক মুঞ্জরিল।
হৃদয়শতদল
করিছে টলমল
অরুণ প্রভাতে করুণ তপনে—
রাজপুত্র। না না না, রবে না গোপনে।।

রাজপুত্র। আছে আমার গোপন কথা, সে কথাটা গোপন রয়েছে দূরের আকাশে। সমুদ্রের ধারে বসে থাকি পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে। সেইখানে আমার অদৃষ্ট যা যক্ষের ধনের মতো গোপন ক'রে রেখেছে যাব তারই সন্ধানে।

গান

যাবই আমি যাবই, ওগো
বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীরে হারাবই যদি
অলক্ষ্মীরে পাবই।

সদাগর। ও কী কথা। বাণিজ্য? ও যে তুমি সদাগরের মন্ত্র আওড়াচ্ছ।

রাজপুত্র।

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি
বসিয়ে হাজার দাঁড়ি
কোন্ পুরীতে যাব দিয়ে
কোন্ সাগরে পাড়ি।
কোন্ তারকা লক্ষ্য করি
কূল-কিনারা পরিহরি
কোন্ দিকে যে বাইব তরী
বিরাট কালো নীরে—
মরব না আর ব্যর্থ আশায়
সোনার বালুর তীরে।

সদাগর। অকূলের নাবিকগিরি ক'রে নিরুদ্দেশ হওয়া, এ তো বাণিজ্যের রাস্তা নয়। খবর কিছু পেয়েছ কি।

রাজপুত্র। পেয়েছি বৈকি। পেয়েছি আভাসে, পেয়েছি স্বপ্নে।

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা।
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগরবিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো হাওয়া কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নগনদী।
সাত রাজার ধন মানিক পাবই
সেথায় নামি যদি॥

সদাগর। তোমার গানের সুরে বোঝা যাচ্ছে, এ মানিকটি তো সদাগরি মানিক নয়, এ মানিকের নাম বলো তো।

রাজপুত্র। নবীনা! নবীনা!

সদাগর। নবীনা! এতক্ষণে একটা স্পষ্ট কথা পাওয়া গেল।

রাজপুত্র। স্পষ্ট হয়ে রূপ নিতে এখনো দেরি আছে।

গান

হে নবীনা, হে নবীনা।
প্রতিদিনের পথের ধুলায় যায় না চিনা।
শুনি বাণী ভাসে
বসন্তবাতাসে,
প্রথম জাগরণে দেখি সোনার মেঘে লীনা।

সদাগর। তোমার এ স্বপ্নের ধন কিন্তু সংগ্রহ করা শক্ত হবে।

রাজপুত্র। স্বপনে দাও ধরা
কী কৌতুকে ভরা।
কোন্ অলকার ফুলে
মালা গাঁথ চুলে,
কোন্ অজানা সুরে
বিজনে বাজাও বীণা॥

রাজমাতার প্রবেশ

সদাগর। রানীমা, উনি মরীচিকাকে জাল ফেলে ধরবেন, উনি রূপকথার দেশের সন্ধান পেতে চান।

মা। সে কী কথা। আবার ছেলেমানুষ হতে চাস নাকি।

রাজপুত্র। হাঁ, মা, বুড়োমানুষির সুবুদ্ধি-ঘেরা জগতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে।

মা। বুঝেছি, বাছা, আসলে তোমার অভাবটা অভাবেরই অভাব। পাওয়া জিনিসে তোমার বিতৃষ্ণা জন্মেছে। তুমি চাইতে চাও, আজ পর্যন্ত সে সুযোগ তোমার ঘটে নি।

রাজপুত্র। গান

আমার মন বলে, 'চাই চাই গো
যারে নাহি পাই গো।'
সকল পাওয়ার মাঝে
আমার মনে বেদন বাজে,
'নাই নাই নাই গো।'
হারিয়ে যেতে হবে,
ফিরিয়ে পাব তবে,
সন্ধ্যাতারা যায় যে চলে
ভোরের তারায় জাগবে ব'লে,
বলে সে, 'যাই যাই যাই গো।'

মা। বাছা, তোমাকে ধরে রাখতে গেলেই হারাব। তুমি বইতে পারবে না আরামের বোঝা, সইতে পারবে না সেবার বন্ধন। আমি ভয় ক'রে অকল্যাণ করব না। ললাটে দেব শ্বেতচন্দনের তিলক, শ্বেত উষ্ণীষে পরাব শ্বেতকরবীর গুচ্ছ। যাই কুলদেবতার পুজো সাজাতে। সন্ধ্যার সময় আরতির কাজল পরাব চোখে। পথে দৃষ্টির বাধা যাবে কেটে।

[রাজমাতার প্রস্থান

রাজপুত্র। গান

হেরো, সাগর উঠে তরঙ্গিয়া
বাতাস বহে বেগে।
সূর্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক মারে মেঘে।

দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই,
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
        তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশমনে
        রইব না আর কভু।
অকূল-মাঝে ভাসিয়ে তরী
        যাচ্ছি অজানায়।
আমি শুধু একলা নেয়ে
        আমার শূন্য নায়।
নব নব পবন-ভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ ক'রে
        অপূর্ব ধন যত—
ভিখারি মন ফিরবে যখন
        ফিরবে রাজার মতো ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র

রাজপুত্র। এক ডাঙা থেকে দিলেম পাড়ি, তরী ডুবল মাঝ সমুদ্রে, ভেসে উঠলেম আর-এক ডাঙায়। এতদিন পরে মনে হচ্ছে, জীবনে নতুন পর্ব শুরু হল।

সদাগর। রাজপুত্র, তুমি তো কেবলই নতুন নতুন করে অস্থির হলে। আমি ভয় করি ঐ নতুনকেই। যাই বল, বন্ধু, পুরোনোটা আরামের।

রাজপুত্র। ব্যাঙের আরাম এঁদো কুয়োর মধ্যে। এটা বুঝলে না, উঠে এসেছি মরণের তলা থেকে। যম আমাদের ললাটে নতুন জীবনের তিলক পরিয়ে দিলেন।

সদাগর। রাজতিলক তোমার ললাটে তো নিয়েই এসেছ জন্মমুহূর্তে।

রাজপুত্র। সে তো অদৃষ্টের ভিক্ষেদানের ছাপ। যমরাজ মহাসমুদ্রের জলে সেটা কপাল থেকে মুছে দিয়ে হুকুম করেছেন, নতুন রাজ্য নতুন শক্তিতে জয় করে নিতে হবে, নতুন দেশে।—

গান

এলেম নতুন দেশে
তলায় গেল ভগ্ন তরী, কূলে এলেম ভেসে।
অচিন মনের ভাষা
শোনাবে   অপূর্ব কোন্ আশা,
বোনাবে   রঙিন সুতোয় দুঃখসুখের জাল,
বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল,
নতুন বেদনায়   ফিরব কেঁদে হেসে।

নাম-না-জানা প্রিয়া
নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া
হিয়ায় দেবে হিয়া।
যৌবনেরি নবোচ্ছ্বাসে
ফাগুনমাসে
বাজবে নূপুর ঘাসে ঘাসে,
মাতবে দখিনবায়
মঞ্জরিত লবঙ্গলতায়
চঞ্চলিত এলোকেশে।।

সদাগর। রাজপুত্র, তোমার গানের সুরে কথাটা শোনাচ্ছে ভালো। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, এ দেশে যৌবনের নবীন রূপ দেখলে কোথায়। চারি দিকটা তো একবার ঘুরে এসেছি। দেখে মনে হল, যেন ছুতোরের তৈরি কাঠের কুঞ্জবন। দেখলুম, ওরা চৌকো চৌকো কেঠো চালে চলেছে, বুকে পিঠে চ্যাপটা, পা ফেলছে খিট্‌খুট্ খিটখুট্ শব্দে, বোধ করি চৌকুনি নূপুর পরেছে পায়ে, তৈরি সেটা তেঁতুল কাঠে। এই মরা দেশকে কি বলে নতুন দেশ।

রাজপুত্র। এর থেকেই বুঝবে, জিনিসটা সত্যি নয়, এটা বানানো, এটা উপর থেকে চাপানো, এদের দেশের পণ্ডিতদের হাতে গড়া খোলস। আমরা এসেছি কী করতে— খসিয়ে দেব। ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা রূপ যখন বেরিয়ে পড়বে, আশ্চর্য করে দেবে।

সদাগর। আমরা সদাগর মানুষ, যা পষ্ট দেখি তার থেকেই দর যাচাই করি। আর, যা দেখতে পাও না তারই উপর তোমাদের বিশ্বাস। আচ্ছা, দেখা যাক, ছাইয়ের মধ্যে থেকে আগুন বেরোয় কি না। আমার তো মনে হয়, ফুঁ দিতে দিতে দম ফুরিয়ে যাবে। ঐ দেখো-না, এই দিকেই আসছে— এ যেন মরা দেহে ভূতের নৃত্য।

রাজপুত্র। একটু সরে দাঁড়ানো যাক। দেখি-না কাণ্ডটা কী।

তাসের দলের প্রবেশ

তাসের কাওয়াজ

গান

তোলন নামন,
পিছন সামন,
বাঁয়ে ডাইনে
চাই নে চাই নে,
বোসন ওঠন,
ছড়ান গুটন,
উলটো-পালটা
ঘূর্ণি চালটা—
বাস্ বাস্ বাস্।

সদাগর। দেখছ ব্যাপারটা! লাল উর্দি, কালো উর্দি, উঠছে পড়ছে, শুচ্ছে বসছে, একেবারে অকারণে— ভারি অদ্ভুত। হা হা হা হা।

ছক্কা। এ কী ব্যাপার! হাসি!

পঞ্জা। লজ্জা নেই তোমাদের! হাসি!

ছক্কা। নিয়ম মান না তোমরা! হাসি!

রাজপুত্র। হাসির তো একটা অর্থ আছে। কিন্তু, তোমরা যা করছিলে তার অর্থ নেই যে।

ছক্কা। অর্থ ? অর্থের কী দরকার। চাই নিয়ম। এটা বুঝতে পার না ? পাগল নাকি তোমরা !

রাজপুত্র। খাঁটি পাগল তো চেনা সহজ নয়। চিনলে কী করে।

পঞ্জা। চালচলন দেখে।

রাজপুত্র। কীরকম দেখলে।

ছক্কা। দেখলেম, কেবল চলনটাই আছে তোমাদের, চালটা নেই।

সদাগর। আর, তোমাদের বুঝি চালটাই আছে, চলনটা নেই ?

পঞ্জা। জান না, চালটা অতি প্রাচীন, চলনটাই আধুনিক, অপোগণ্ড, অর্বাচীন, অজাতশ্মশ্রু।

ছক্কা। গুরুমশায়ের হাতে মানুষ হও নি। কেউ বুঝিয়ে দেয় নি, রাস্তায় ঘাটে খানা আছে, ডোবা আছে, কাঁটা আছে, খোঁচা আছে— চলন জিনিসটার আপদ বিস্তর।

রাজপুত্র। এ দেশটা তো গুরুমশায়েরই দেশ। শরণ নেব তাঁদের।

ছক্কা। এবার তোমাদের পরিচয়টা ?

রাজপুত্র। আমরা বিদেশী।

পঞ্জা। বাস্। আর, বলতে হবে না। তার মানে, তোমাদের জাত নেই, কুল নেই, গোত্র নেই, গাঁই নেই, জ্ঞাত নেই, গুষ্টি নেই, শ্রেণী নেই, পঙ্‌ক্তি নেই।

রাজপুত্র। কিছু নেই, কিছু নেই— সব বাদ দিয়ে এই যা আছে, দেখছই তো। এখন তোমাদের পরিচয়টা ?

ছক্কা। আমরা ভুবনবিখ্যাত তাসবংশীয়। আমি ছক্কা শর্মণ।

পঞ্জা। আমি পঞ্জা বর্মণ।

রাজপুত্র। ঐ যারা সংকোচে দূরে দাঁড়িয়ে ?

ছক্কা। কালো-হানো, ঐ তিরি ঘোষ।

পঞ্জা। আর, রাঙা-মতো এই দুরি দাস।

সদাগর। তোমাদের উৎপত্তি কোথা থেকে।

ছক্কা। ব্রহ্মা হয়রান হয়ে পড়লেন সৃষ্টির কাজে। তখন বিকেল বেলাটায় প্রথম যে হাই তুললেন, পবিত্র সেই হাই থেকে আমাদের উদ্‌ভব।

পঞ্জা। এই কারণে কোনো কোনো ম্লেচ্ছভাষায় আমাদের তাসবংশীয় না বলে হাইবংশীয় বলে।

সদাগর। আশ্চর্য।

ছক্কা। শুভ গোধূলিলগ্নে পিতামহ চার মুখে একসঙ্গে তুললেন চার হাই।

সদাগর। বাস্ রে। ফল হল কী।

ছক্কা। বেরিয়ে পড়ল ফস্ ফস্ ক'রে ইস্কাবন, রুইতন, হরতন, চিড়েতন। এঁরা সকলেই প্রণম্য। (প্রণাম)

রাজপুত্র। সকলেই কুলীন ?

ছক্কা। কুলীন বৈকি। মুখ্য কুলীন। মুখ থেকে উৎপত্তি।

পঞ্জা। তাসবংশের আদিকবি ভগবান তাসরঙ্গনিধি দিনের চার প্রহর ঘুমিয়ে স্বপ্নের ঘোরে প্রথম যে ছন্দ বানালেন সেই ছন্দের মাত্রা গুনে গুনে আমাদের সাড়ে-সাঁইত্রিশ রকমের পদ্ধতির উদ্‌ভব।

রাজপুত্র। অন্তত তার একটাও তো জানা চাই।

পঞ্জা। আচ্ছা, তা হলে মুখ ফেরাও।

রাজপুত্র। কেন।

পঞ্জা। নিয়ম। ভাই ছক্কা, ঠং মন্ত্র প'ড়ে ওদের কানে একটা ফুঁ দিয়ে দাও।

রাজপুত্র। কেন।

পঞ্জা। নিয়ম।

তাসের দলের গান

হা-আ-আ-আই।
হাতে কাজ নাই।
দিন যায় দিন যায়।
আয় আয় আয় আয়।
হাতে কাজ নাই॥

রাজপুত্র। আর সহ্য করতে পারছি নে, মুখ ফেরাতে হল।
পঞ্জা। এঃ! ভেঙে দিলে মন্ত্রটা! অশুচি করে দিলে!
রাজপুত্র। অশুচি?
পঞ্জা। অশুচি নয় তো কী। মন্ত্রের মাঝখানটায় বিদেশীর দৃষ্টি পড়ল।
রাজপুত্র। এখন উপায়?
ছক্কা। বাদুড়ে-খাওয়া গাবের আঁটি পুড়িয়ে তিন দিন চোখে কাজল পরতে হবে, তবেই স্বর্গে পিতামহদের উপোষ ভাঙবে।
রাজপুত্র। বিপদ ঘটিয়েছি তো। তোমাদের দেশে খুব সাবধানে চলতে হবে।
ছক্কা। একেবারে না চললেই ভালো হয়, শুচি থাকতে পারবে।
রাজপুত্র। শুচি থাকলে কী হয়।
পঞ্জা। কী আর হবে, শুচি থাকলে শুচি হয়। বুঝতে পারছ না?
রাজপুত্র। আমাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঐ পাড়ির উপরে কী করছিলে দল বেঁধে।
ছক্কা। যুদ্ধ।
রাজপুত্র। তাকে বল যুদ্ধ?
পঞ্জা। নিশ্চয়! অতি বিশুদ্ধ নিয়মে তাসবংশোচিত আচার-অনুসারে।

গান

আমরা চিত্র, অতি বিচিত্র,
অতি বিশুদ্ধ, অতি পবিত্র।

সদাগর। তা হোক। যুদ্ধে একটু রাগারাগি না হলে রস থাকে না।
ছক্কা। আমাদের রাগ রঙে।

আমাদের যুদ্ধ—
নহে কেহ ক্রুদ্ধ,
ওই দেখো গোলাম
অতিশয় মোলাম।

সদাগর। তা হোক-না, তবু কামান-বন্দুকটা যুদ্ধক্ষেত্রে মানায় ভালো।
পঞ্জা।
নাহি কোনো অস্ত্র,
খাকি-রাঙা বস্ত্র।
নাহি লোভ,
নাহি ক্ষোভ,
নাহি লাফ,
নাহি ঝাঁপ।

রাজপুত্র। নাই রইল, তবু একটা নালিশ থাকা চাই তো। তাই নিয়েই তো দুই পক্ষের লড়াই।

ছক্কা। যথারীতি জানি,
সেইমতে মানি,
কে তোমার শত্রু, কে তোমার মিত্র,
কে তোমার টক্কা, কে তোমার ফক্কা।

পঞ্জা। ওহে বিদেশী, শাস্ত্রমতে তোমাদেরও তো একটা উৎপত্তি ঘটেছিল?

সদাগর। নিশ্চিত। পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টির গোড়াতেই সূর্যকে যেই শানে চড়িয়েছেন অমনি তাঁর নাকের মধ্যে ঢুকে পড়ল একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ। তিনি কামানের মতো আওয়াজ ক'রে হেঁচে ফেললেন— সেই বিশ্ব-কাঁপানি হাঁচি থেকেই আমাদের উৎপত্তি।

ছক্কা। এখন বোঝা গেল! তাই এত চঞ্চল!

রাজপুত্র। স্থির থাকতে পারি নে, ছিটকে ছিটকে পড়ি।

পঞ্জা। সেটা তো ভালো নয়।

সদাগর। কে বলছে ভালো। আদিযুগের সেই হাঁচির তাড়া আজও সামলাতে পারছি নে।

ছক্কা। একটা ভালো ফল দেখতে পাচ্ছি— এই হাঁচির তাড়ায় তোমরা সকাল-সকাল এই দ্বীপ থেকে ছিটকে পড়বে, টিকতে পারবে না।

সদাগর। টেঁকা শক্ত।

পঞ্জা। তোমাদের যুদ্ধটা কী ধরনের।

সদাগর। সেটা দুই-দুই পক্ষের চার-চার জোড়া হাঁচির মাপে।

ছক্কা। হাঁচির মাপে? বাস্ রে, তা হলে মাথা ঠোকাঠুকি হবে তো!

সদাগর। হাঁ, একেবারে দমাদ্দম।

ছক্কা। তোমাদেরও আদিকবির মন্ত্র আছে তো?

সদাগর। আছে বৈকি।

গান

হাঁচ্ছোঃ,
ভয় কী দেখাচ্ছ।
ধরি টিপে টুঁটি
মুখে মারি মুঠি,
বলো দেখি কী আরাম পাচ্ছ॥

ছক্কা। ওহে ভাই পঞ্জা, একেবারে অসবর্ণ। কী জাতি তোমরা।

সদাগর। আমরা নাশক, নাসা থেকে উৎপন্ন।

পঞ্জা। কোনো উচ্চবংশীয় জাতির অমনতরো নাম তো শুনি নি।

সদাগর। হাইয়ের বাষ্পে তোমরা উড়ে গেছ উচ্চে, পরলোকের পারে; হাঁচির চোটে আমরা পড়েছি নীচে, এই ইহলোকের ধারে।

ছক্কা। পিতামহের নাসিকার অসংযম-বশতই তোমরা এমন অদ্ভুত।

রাজপুত্র। এতক্ষণে ঠিক কথাটাই বেরিয়েছে তোমার মুখ থেকে, আমরা অদ্ভুত।

গান

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত,
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।

আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি,
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই,
আমরা বিদ্যুৎ।
আমরা করি ভুল।
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে
যুঝিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে
জীবন-মরণ-ঝড়ে
আমরা প্রস্তুত ॥

ছক্কা-পঞ্জা। (পরস্পর মুখ চেয়ে) এ চলবে না, এ চলবে না।

রাজপুত্র। যা চলবে না তাকেই আমরা চালাই।

ছক্কা। কিন্তু, নিয়ম!

রাজপুত্র। বেড়ার নিয়ম ভাঙলেই পথের নিয়ম আপনিই বেরিয়ে পড়ে, নইলে এগোব কী করে।

পঞ্জা। ওরে ভাই, কী বলে এরা। এগোবে! অম্লানমুখে ব'লে বসল, এগোব।

রাজপুত্র। নইলে চলা কিসের জন্যে।

ছক্কা। চলা! চলবে কেন তুমি! চলবে নিয়ম।

গান

চলো নিয়ম-মতে।
দূরে তাকিয়ো নাকো,
ঘাড় বাঁকিয়ো নাকো,
চলো সমান পথে।

রাজপুত্র। হেরো অরণ্য ওই,
হোথা শৃঙ্খলা কই,
পাগল ঝরনাগুলো
দক্ষিণ পর্বতে।

তাসের দল। ওদিক চেয়ো না চেয়ো না,
যেয়ো না যেয়ো না—
চলো সমান পথে ॥

পঞ্জা। আর নয়, ঐ আসছেন রাজাসাহেব, আসছেন রানীবিবি। এইখানে আজ সভা। এই নাও ভুঁইকুমড়োর ডাল একটা ক'রে।

রাজপুত্র। ভুঁইকুমড়োর ডাল! হা হা হা হা— কেন।

পঞ্জা। চুপ। হেসো না, নিয়ম। বোসো ঈশান কোণে মুখ ক'রে, খবরদার বায়ুকোণে মুখ ফিরিয়ো না।

রাজপুত্র। কেন।

ছক্কা। নিয়ম।

রাজা রানী টেক্কা গোলাম প্রভৃতির যথারীতি যথাভঙ্গিতে প্রবেশ

রাজপুত্র। ওহে ভাই, স্তবগান করে রাজাকে খুশি করে দিই। তুমি ভুঁইকুমড়োর ডালটা দোলাও।

গান

জয় জয় তাসবংশ-অবতংস,
তন্দ্রাতীর নিবাসী,
সব-অবকাশ ধ্বংস।

তাসের দল। ভ্যাস্তা ভ্যাস্তা ভ্যাস্তা! অকালে সভা দিলে ভেঙে, বর্বর!

রাজা। শান্ত হও, এরা কারা।

ছক্কা। বিদেশী।

রাজা। বিদেশী! তা হলে নিয়ম খাটবে না। একবার সকলে ঠাঁই বদল করে নাও তা হলেই দোষ যাবে কেটে। সর্বাগ্রে তাসমহাসভার জাতীয় সংগীত।

সকলে। গান

চিঁড়েতন, হর্তন, ইস্কাবন—
অতি সনাতন ছন্দে
করতেছে নর্তন
চিঁড়েতন হর্তন।
কেঁউ-বা ওঠে কেউ পড়ে,
কেউ-বা একটু নাহি নড়ে,
কেউ শুয়ে শুয়ে ভুঁয়ে
করে কালকর্তন।
নাহি কহে কথা কিছু,
একটু না হাসে,
সামনে যে আসে
চলে তারি পিছু পিছু।
বাঁধা তার পুরাতন চালটা,
নাই কোনো উলটা-পালটা,
নাই পরিবর্তন॥

রাজা। ওহে বিদেশী।

রাজপুত্র। কী রাজাসাহেব।

রাজা। কে তুমি।

রাজপুত্র। আমি সমুদ্রপারের দূত।

গোলাম। ভেট এনেছ কী।

রাজপুত্র। এ দেশে সব চেয়ে যা দুর্লভ, তাই এনেছি।

গোলাম। সেটা কী শুনি।

রাজপুত্র। উৎপাত।

ছক্কা। শুনলে তো রাজাসাহেব, কথাটা তো শুনলে? লোকটা এগোতে চায়, বললে বিশ্বাস করবে না, লোকটা হাসে। দুদিনে এখানকার হাওয়া দেবে হালকা করে।

গোলাম। এখানকার হাওয়া যেমন স্থির, যেমন ভারী, এমন কোনো গ্রহে নেই। ইন্দ্রের বিদ্যুৎ পর্যন্ত একে নাড়া দিতে পারে না, অন্যে পরে কা কথা।

সকলে। (একবাক্যে) অন্যে পরে কা কথা।

গোলাম। লঘুচিত্ত বিদেশী এই হাওয়াকে যদি হালকা করে তা হলে কী হবে।

রাজা। সেটা চিন্তার বিষয়।

সকলে। সেটা চিন্তার বিষয়।

গোলাম। হালকা হাওয়াতেই ঝড় আসে। ঝড় এলেই নিয়ম যায় উড়ে। তখন আমাদের পুরুত-ঠাকুর নহলা গোস্বামী পর্যন্ত বলতে শুরু করবেন, আমরা এগোব।

পঞ্জা। এমন-কি, ভগবান না করুন, হয়তো এখানে হাসিটা সংক্রামক হয়ে উঠবে।

রাজা। ওহে ইস্কাবনের গোলাম।

গোলাম। কী রাজাসাহেব।

রাজা। তুমি তো সম্পাদক।

গোলাম। আমি তাসদ্বীপপ্রদীপের সম্পাদক। আমি তাসদ্বীপের কৃষ্টির রক্ষক।

রাজা। কৃষ্টি! এটা কী জিনিস। মিষ্টি শোনাচ্ছে না তো।

গোলাম। না মহারাজ, এ মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন, নবতম অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন।

সকলে। কৃষ্টি, কৃষ্টি, কৃষ্টি।

রাজা। তোমার পত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভ আছে তো?

গোলাম। দুটো বড়ো বড়ো স্তম্ভ।

রাজা। সেই স্তম্ভের গর্জনে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিতে হবে। এখানকার বায়ুকে লঘু করা সইব না।

গোলাম। বাধ্যতামূলক আইন চাই।

রাজা। ওটা আবার কী বললে! বাধ্যতামূলক আইন!

গোলাম। কানমলা আইনের নব্য ভাষা। এও নবতম অবদান।

রাজা। আচ্ছা, পরে হবে। বিদেশী, তোমার কোনো আবেদন আছে?

রাজপুত্র। আছে, কিন্তু তোমার কাছে নয়।

রাজা। কার কাছে।

রাজপুত্র। এই রাজকুমারীদের কাছে।

রাজা। আচ্ছা, বলো।

রাজপুত্র।

গান

ওগো, শান্ত পাষাণমুরতি সুন্দরী,
চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লও বরি।
কুঞ্জবনে এসো একা,
নয়নে অশ্রু দিক দেখা,
অরুণরাগে হোক রঞ্জিত
বিকশিত বেদনার মঞ্জরী॥

রানী। এ কী অনিয়ম, এ কী অবিচার।

পঞ্জা। রাজাসাহেব, নির্বাসন, ওকে নির্বাসন!

রাজা। নির্বাসন! রানীবিবি, তোমার কী মত। চুপ ক'রে রইলে যে। শুনছ আমার কথা? একটা উত্তর দাও। কী বলো নির্বাসন তো?

রানী। না, নির্বাসন নয়।

টেক্কাকুমারীরা। (একে একে) না, নির্বাসন নয়।

রাজা। রানীবিবি, তোমাকে যেন কেমন-কেমন মনে হচ্ছে।

রানী। আমার নিজেরই মনে হচ্ছে কেমন-কেমন।

গোলাম। টেক্কাকুমারী, বিবিসুন্দরী, মনে রেখো, আমার হাতে সম্পাদকীয় স্তম্ভ।

সকলে। কৃষ্টি, কৃষ্টি, তাসদ্বীপের কৃষ্টি। বাঁচাও সেই কৃষ্টি।

গোলাম। জারি করো বাধ্যতামূলক আইন।

রাজা। অর্থাৎ?

গোলাম। কানমলা মোচড়ের আইন।

রাজা। বুঝেছি। রানীবিবি, তোমার কী মত। বাধ্যতামূলক আইন এবার তবে চালাই?

রানী। বাধ্যতামূলক আইন অন্দরমহলে আমরাও চালিয়ে থাকি— দেখব, কে দেয় কাকে নির্বাসন।

টেক্কাকুমারীরা। (সকলে) আমরা চালাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন।

গোলাম। এ কী হল। হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি।

রাজা। সভা ভেঙে দিলুম। এখনি সবাই চলে এসো। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

[তাসের দলের প্রস্থান

সদাগর। ভাই সাঙাত, এখানে তো আর সহ্য হচ্ছে না। এরা যে বিধাতার ব্যঙ্গ। এদের মধ্যে প'ড়ে আমরা সুদ্ধ মাটি হয়ে যাব।

রাজপুত্র। ভিতরে ভিতরে কী ঘটছে, সেটা কি তোমার চোখে পড়ে না। পুতুলের মধ্যে প্রথম প্রাণের সঞ্চার কি অনুভব করছ না। আমি তো শেষ পর্যন্ত না দেখে যাচ্ছি নে।

সদাগর। কিন্তু, এ যে জীবন্মৃতের খাঁচা, নিয়মের জারকরসে জীর্ণ এদের মন।

রাজপুত্র। ঐ দিকে চোখ মেলে দেখো দেকি।

সদাগর। তাই তো, বন্ধু, লেগেছে সমুদ্রপারের মন্ত্র। ইস্কাবনের নহলা গাছের তলায় পা ছড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে, দেখছি এখানকার নিয়ম গেল উড়ে।

রাজপুত্র। চিঁড়েতনীর পায়ের শব্দ শুনছে আকাশ থেকে। এ সময়ে বোধ হয় আমাদের সঙ্গটা ওর পছন্দ হবে না। চলো, আমরা সরে যাই। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

প্রসাধনে রত ইস্কাবনী। টেক্কানীর প্রবেশ

টেক্কানী।

গান

বলো, সখী, বলো তারি নাম
আমার কানে কানে
যে-নাম বাজে তোমার বীণার তানে তানে।
বসন্তবাতাসে বনবীথিকায়
সে-নাম মিলে যাবে,
বিরহী বিহঙ্গ-কলগীতিকায়
সে-নাম মদির হবে-যে বকুলঘ্রাণে।
নাহয় সখীদের মুখে মুখে
সে-নাম দোলা খাবে সকৌতুকে।
পূর্ণিমারাতে একা যবে
অকারণে মন উতলা হবে
সে-নাম শুনাইব গানে গানে॥

ইস্কাবনী। ভাই, এ কী হল বলো তো এই তাসের দেশে। ঐ বিদেশীরা কী খ্যাপামির হাওয়া নিয়ে এল। মনটা কেবলই টলমল করছে।

টেক্কানী। হাঁ, ভাই ইস্কাবনী, আর দুদিন আগে কে জানত তাসেরা আপন জাত খুইয়ে ঠিক যেন মানুষের মতো চালচলন ধরবে। ছি ছি, কী লজ্জা।

ইস্কাবনী। বলো তো, ভাই, মানুষপনা, এ-যে অনাচার। এ কিন্তু শুরু করেছে তোমাদের ঐ হরতনী। দেখিস নি ? আজকাল ওর চলন ঠিক থাকে না, একেবারে হুবহু মানুষের ভঙ্গি। কার পাশে কখন দাঁড়াতে হবে তারও সমস্ত ভুল হয়ে যায়, পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেছে। তাসের দেশের নাম ডোবালে।

চিঁড়েতনীর প্রবেশ

চিঁড়েতনী। কী গো টেক্কাঠাকরুন, শুনেছি, আমাদের নিন্দে রটিয়ে বেড়াচ্ছ। বলছ, আমরা আচার খুইয়ে, ওঠবার বেলায় বসি, বসবার বেলায় উঠি।

টেক্কানী। তা, সত্যি কথা বলেছি, দোষ হয়েছে কী। ঐ-যে তোমার গাল দুটি টুকটুক করছে, রঙ্গিনী, সে কোন্ রঙে। আর, ঐ-যে তোমার ভুরুর ভঙ্গিমা, ধার করেছ কোন্ বিদেশী অমাবস্যার কাজললতা থেকে। এটা তো সাতজন্মে তাসের দেশের শাস্তরে লেখে না। তুমি কি ভাব', এ কারও চোখে পড়ে না।

চিঁড়েতনী। মরে যাই ! আর, তুমি যে তোমার ঐ সখীটিকে নিয়ে বকুলতলায় বসে দিনরাত কানে কানে ফিস্-ফিস্ করছ, এটাই কি তাসের দেশের শাস্ত্রে লেখে না কি। ওদিকে-যে গোলাম বেচারা তার জুড়ি পায় না, মরে হায়-হায় ক'রে।

ইস্কাবনী। আহা, গুরুঠাকরুন, উপদেশ দিতে হবে না। চুলে যে রাঙা ফিতেটা জড়িয়েছ ঐ ফিতে দিয়ে তাসের দেশের আচার বিচার গলায় দড়ি দিয়ে মরবে। এতবড়ো বেহায়াগিরি তাসরমণী হয়ে !

চিঁড়েতনী। তা, হয়েছে কী। আমি ভয় করি নে কাউকে, তোমাদের মতো লুকোচুরি আমার স্বভাব নয়। ঐ-যে তোমাদের দহলানী সেদিন আমাকে মানবী ব'লে টিটকারি দিতে এসেছিল, আমি তাকে পষ্ট জবাব দিয়েছি, তোমাদের তাসিনী হয়ে মরে থাকার চেয়ে মানবী হতে পারলে বেঁচে যেতুম।

ইস্কাবনী। অত গুমোর কোরো না গো কোরো না— জান ? তোমাকে জাতে ঠেলবে ব'লে কথা উঠেছে।

চিঁড়েতনী। তাসের জাত তো, আমি তা নিজের হাতে জলাঞ্জলি দিয়েছি, আমাকে ভয় দেখাবে কিসে।

ইস্কাবনী। সর্বনাশ ! এমন ধাষ্টমির কথা তো সাত জন্মে শুনি নি। উনি ঢাক পিটিয়ে মানবী হতে চলেছেন। চল্ ভাই, টেক্কারানী, কে কোথা থেকে দেখবে, ওর সঙ্গে কথা কচ্ছি, আমাদের সুদ্ধ মজাবে। [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

শ্রীমতী হরতনী টেক্কার প্রবেশ

হরতনী।

গান

আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে,
জানি নে কী ছিল মনে।
এ তো ফুল তোলা নয়, এ তো ফুল তোলা নয়,
বুঝি নে কী মনে হয়,
জল ভরে যায় দু নয়নে॥

রুইতনের সাহেবের প্রবেশ

রুইতন। এ কী, হরতনী তুমি এখানে? খুঁজতে খুঁজতে বেলা হয়ে গেল যে।

হরতনী। কেন, কী হয়েছে, কী চাই।

রুইতন। তোমাকে ডাক পড়েছে রাজসভার গরাবুমগুলে।

হরতনী। বলো গে, আমি হারিয়ে গেছি।

রুইতন। হারিয়ে গেছ?

হরতনী। হাঁ, হারিয়ে গেছি, যাকে খুঁজছ তাকে আর খুঁজে পাবে না, কোনোদিনই।

রুইতন। এ কী কাণ্ড। এ কী দুঃসাহস। এই বনে এসেছ তুমি? জান না— নিয়ম নেই?

হরতনী। নিয়ম তো নেই, কিন্তু কার নিয়মে বর্ষাবিহীন তাসের দেশে আজ এমন ঘনঘটা। হঠাৎ সকালে উঠেই দেখি, নীল মেঘ আকাশ জুড়ে। এতদিন তোমাদের দেশের ময়ূর গুনে গুনে পা ফেলত, নাচত সাবধানে, আজ কেন এমন অনিয়মের নাচ নাচল, সমস্ত পেখম ছড়িয়ে দিয়ে।

রুইতন। কিন্তু, ঘর হতে যার আঙিনা বিদেশ; সেও আজ ফুল তুলতে বেরিয়েছে— এতবড়ো অদ্ভুত কাজ তোমার মাথায় এল কী করে।

হরতনী। হঠাৎ মনে হল, আমি মালিনী, আর-জন্মে ফুল তুলতেম। আজ পুবে হাওয়ায় সেই জন্মের ফুলবাগানের গন্ধ এল। সেই জন্মের মাধবীবন থেকে ভ্রমর এসেছে মনের মধ্যে।

গান

ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।
কেমনে রহি ঘরে, মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।
কী মায়া দেয় বুলায়ে, দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে॥

রুইতন। আচ্ছা, গরাবুমগুলের জন্যে বিবিসুন্দরীদের খুঁজে বেড়াচ্ছি, তারাও কি তবে—

হরতনী। হাঁ, তারাও এইখানেই, নদীর ধারে ধারে, গাছের তলায় তলায়।

রুইতন। কী করছে।

হরতনী। সাজ বদল করছে, আমারই মতো। কেমন দেখাচ্ছে। পছন্দ হয়?

রুইতন। মনে হচ্ছে, পর্দা খুলে গেছে, চাঁদের থেকে মেঘ গেছে সরে, একেবারে নতুন মানুষ।

হরতনী। তোমাদের ছক্কা পঞ্জা আমাদের শাসাবার জন্যে এসেছিলেন, তাঁদের কী দশা হয়েছে দেখো গে যাও।

রুইতন। কেন। কী হল।

হরতনী। খ্যাপার মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, এমন-কি, গুন-গুন্ করে গানও করছে।

রুইতন। গান! ছক্কা-পঞ্জার গান!

হরতনী। সুরে না হোক, বেসুরে। আমি তখন চুল বাঁধছিলুম। থাকতে পারলুম না, চলে আসতে হল।

রুইতন। আশ্চর্য করলে। চুল বাঁধা! এ বিদ্যে কে শেখালে।

হরতনী। কেউ না। ঐ দেখো-না, এবার হঠাৎ শুকনো ঝরনায় নামল বর্ষা। জলের ধারায় ধারায় শুরু হল বেণীবন্ধন। এ বিদ্যা কে শেখাল তাকে। চলো আমার সঙ্গে, ছক্কা-পঞ্জার গান শুনিয়ে দিই তোমাকে। [প্রস্থান

বিবিদের প্রবেশ

বিবিরা। নাচ ও গান

অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে,
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে।
বিস্মৃত জন্মের ছায়ালোকে
হারিয়ে-যাওয়া বীণার শোকে
কেঁদে ফিরে পথহারা রাগিণী।
কোন্ বসন্তের মিলনরাতে তারার পানে
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে॥

[প্রস্থান

রুইতন-হরতনীর পুনঃপ্রবেশ

রুইতন। দোষ দেব কাকে। আমারই গাইতে ইচ্ছা করছে।

হরতনী। দেখো, সম্পাদক যেন শুনতে না পায়, স্তম্ভে চড়াবে। সে দেখলুম ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বনের খবর নিতে।

রুইতন। দেখো, হরতনী, ভয় কিন্তু আমার গেছে ঘুচে, কেন কী জানি। একটা কিছু হুকুম করো, তোমার জন্যে দুঃসাধ্য কিছু একটা করতে চাই।

হরতনী। আর যাই কর গান গেয়ো না, বনে জবা ফুটেছে, তুলে এনে দাও। ফুলের রস দিয়ে রাঙাব পায়ের তলা।

রুইতন। দেখো, সুন্দরী, আজ সকালে উঠেই বুঝেছি, আমাদের এই তাসজন্মটা স্বপ্ন। সেটা হঠাৎ ভাঙল। আমাদের আর-এক জন্ম বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তারই বাণী আসছে মুখে, তারই গান শুনছি কানে। ঐ শোনো, ঐ শোনো, আমার সেই যুগের রচিত গান আকাশ থেকে ঐ কে বয়ে আনছে।

গান

তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে,
আমার মনের বনের ফুলের রাঙা রাগে।
যেন আমার গানের তানে
তোমায় ভূষণ পরাই কানে,
যেন রক্তমণির হার গেঁথে দিই প্রাণের অনুরাগে॥

হরতনী। এ গান কোনোদিন তুমিই বেঁধেছিলে, আর আমারই জন্যে? কেমন ক'রে বাঁধলে।

রুইতন। যেমন করে তুমি বাঁধলে বেণী।

হরতনী। আচ্ছা, মনে কি আসছে, তোমার গানে আমি নেচেছিলুম কোনো একটা যুগে।

রুইতন। মনে আসছে, আসছে। এতদিন ভুলে ছিলুম কী করে তাই ভাবি।

গান

উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে।
দোলা লাগে, দোলা লাগে
তোমার চঞ্চল ওই নাচের লহরীতে

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণ -কর্তৃক তাসের দেশের অভিনয়

যদি কাটে রসি,
যদি হাল পড়ে খসি,
যদি ঢেউ উঠে উচ্ছ্বসি,
সম্মুখেতে মরণ যদি জাগে,
করি নে ভয়, নেবই তারে নেবই তারে জিতে।

রুইতন। দেখো হরতনী, মন ছট্‌ফটিয়ে উঠেছে যমরাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ছবি, তুমি পরিয়ে দিলে আমার কপালে জয়তিলক, আমি বেরলুম বন্দিনীকে উদ্ধার করতে, বন্ধ দুর্গের দ্বারে বাজালুম আমার ভেরী। কানে আসছে বিদায়কালে যে গান তুমি গেয়েছিলে।

গান

বিজয়মালা এনো আমার লাগি।
দীর্ঘ রাত্রি রইব আমি জাগি।
চরণ যখন পড়বে তোমার মরণকূলে
বুকের মধ্যে উঠবে আমার পরান দুলে,
সব যদি যায় হব তোমার সর্বনাশের ভাগী॥

হরতনী। চলো চলো, বীর, মরণ পণ করে বেরিয়ে পড়ি দুজনে মিলে। দেখতে পাচ্ছি যে, সামনে কী যেন কালো পাথরের ভ্রূকুটি, ভেঙে চুরমার করতে হবে। ভেঙে মাথায় যদি পড়ে পড়ুক। পথ কাটতে হবে পাহাড়ের বুক ফাটিয়ে দিয়ে। কী করতে এসেছি এখানে। ছি ছি, কেন আছি এখানে। একি অর্থহীন দিন, কী প্রাণহীন রাত্রি। কী ব্যর্থতার আবর্তন মুহূর্তে মুহূর্তে।

রুইতন। সাহস আছে তোমার, সুন্দরী?

হরতনী। আছে, আছে।

রুইতন। অজানাকে ভয় করবে না?

হরতনী। না, করব না।

রুইতন। পা যাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে, পথ ফুরোতে চাইবে না।

হরতনী। কোন্ যুগে আমরা চলেছিলুম সেই দুর্গমে। রাত্রে ধরেছি মশাল তোমার সামনে, দিনে বয়েছি জয়ধ্বজা তোমার আগে আগে। আজ আর-একবার উঠে দাঁড়াও, ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গণ্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এই-সব নিরর্থকের আবর্জনা।

রুইতন। ছিঁড়ে ফেলো আবরণ, টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলো। মুক্ত হও, শুদ্ধ হও, পূর্ণ হও।

[প্রস্থান

ছক্কা-পঞ্জার প্রবেশ

ছক্কা। ওহে পঞ্জা, কী হল বলো দেখি।

পঞ্জা। ভারি লজ্জা হচ্ছে নিজের দিকে তাকিয়ে। মূঢ়, মূঢ়! কী করছিলি এতদিন।

ছক্কা। এতদিন পরে কেন মনে প্রশ্ন জাগছে, এ-সমস্তর অর্থ কী।

পঞ্জা। ঐ-যে দহলা পণ্ডিত আসছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করি।

দহলার প্রবেশ

ছক্কা। এতকাল যে-সব ওঠাপড়া-শোওয়াবসার কোট্‌কেনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলুম তার অর্থ কী।

দহলা। চুপ।

ছক্কা-পঞ্জা। (উভয়ে) করব না চুপ।

দহলা। ভয় নেই?

ছক্কা-পঞ্জা। (উভয়ে) নেই ভয়, বলতে হবে অর্থ কী।

দহলা। অর্থ নেই— নিয়ম।
ছক্কা। নিয়ম যদি নাই মানি?
দহলা। অধঃপাতে যাবে।
ছক্কা। যাব সেই অধঃপাতেই।
দহলা। কী করতে।
পঞ্জা। সেখানে যদি অগৌরব থাকে তার সঙ্গে লড়াই করতে।
দহলা। এ কেমন গোঁয়ারের কথা শান্তিপ্রিয় দেশে!
পঞ্জা। শান্তিভঙ্গ করব পণ করেছি।

হরতনীর প্রবেশ

দহলা। শুনছ, শ্রীমতী হরতনী? এরা শান্তি ভাঙতে চায় আমাদের এই অতলস্পর্শ প্রশান্তমহাসাগরের ধারে।

হরতনী। আমাদের শান্তিটা বুড়ো গাছের মতো। পোকা লেগেছে ভিতরে ভিতরে, সেটা নির্জীব, তাকে কেটে ফেলা চাই।

দহলা। ছি ছি ছি ছি, এমন কথা তোমার মুখে বেরোল! তুমি নারী, রক্ষা করবে শান্তি; আমরা পুরুষ, রক্ষা করব কৃষ্টি।

হরতনী। অনেকদিন তোমরা আমাদের ভুলিয়েছ, পণ্ডিত। আর নয়, তোমাদের শান্তিরসে হিম হয়ে জমে গেছে আমাদের রক্ত, আর ভুলিয়ো না।

দহলা। সর্বনাশ! কার কাছ থেকে পেলে এ-সব কথা।
হরতনী। মনে মনে তাকেই তো ডাকছি। আকাশে শুনতে পাচ্ছি তারই গান।
দহলা। সর্বনাশ। আকাশে গান! এবার মজল তাসের দেশ। আর এখানে নয়।

[প্রস্থান

ছক্কা। সুন্দরী, তুমিই আমাদের পথ দেখাও।
পঞ্জা। অশান্তিমন্ত্র পেয়েছ তুমি, সেই মন্ত্র দাও আমাদের।
হরতনী। বিধাতার ধিক্কারের মধ্যে আছি আমরা, মূঢ়তার অপমানে। চলো, বেরিয়ে পড়ি।
ছক্কা। একটু নড়লেই যে ওরা দোষ ধরে, বলে 'অশুচি'।
হরতনী। দোষ হয় হোক, কিন্তু মরে থাকার মতো অশুচিতা নেই।

[প্রস্থান

ইস্কাবনী ও টেক্কানী ফুল তুলছে

টেক্কানী। ঐ-রে, দহলানী এসেছে। আর রক্ষে নেই।

দহলানীর প্রবেশ

দহলানী। লুকোচ্ছ কোথায়। কে গো, চেনা যায় না যে! এ-যে আমাদের টেক্কানী। আর, উনি কে, উনি যে আমাদের ইস্কাবনী। মরে যাই। কী ছিরি করেছ! মানুষ সেজেছ বুঝি? লজ্জা নেই?

টেক্কানী। সাজি নি, দৈবাৎ সাজ খসে পড়েছে।

দহলানী। তাসের দেশের বন্ধন আঁট বন্ধন— হাজার বছরের হাজার গিরে দেওয়া, খসে পড়ল? কাণ্ডটা ঘটল কী ক'রে।

ইস্কাবনী। একটা হাওয়া দিয়েছিল।

দহলানী। ওমা, কী বলো গো। তাসের দেশের হাওয়ায় বাঁধন ছেঁড়ে! আমাদের পবনদেবের নামে

এত বড়ো বদনাম। বলি, এ কি মেলেচ্ছ দেশ পেয়েছ, যেখানে একটু হাওয়া দিলেই গাছের শুকনো পাতা খসে উড়ে যায়।

ইস্কাবনী। স্বচক্ষেই দেখো-না, দিদি, কী বদল ঘটিয়েছেন আমাদের পবনদেব!

দহলানী। দেখো, ছোটো মুখে বড়ো কথা ভালো নয়। আমাদের সনাতন পবনদেব! তবে কিনা পুঁথিতে লিখছে তাঁর এক মহাবীর পুত্র আছেন, তিনি নাকি লম্বা লম্বা লম্ফ দিয়ে বেড়ান। হয়তো বা তিনিই ভর করেছেন তোমাদের 'পরে।

টেক্কানী। কেবল আমাদের খোঁটা দিচ্ছ কেন। এখনো চোখে বুঝি পড়ে নি? তিনি যে লম্ফ লাগিয়েছেন তাসের দেশময়। তাসিনীদের বুকে আগুন লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ইস্কাবনী। সাগরপারের মানুষরা বলছে, তিনিই নাকি ওদের পূর্বপুরুষ।

দহলানী। হতে পারে— ওরা লাফ-মারা-বংশেরই সন্তান।

টেক্কানী। আচ্ছা, সত্যি কথা বলো দিদি— ভিতরে ভিতরে তোমারও মন চঞ্চল হয়েছে? না, চুপ ক'রে থাকলে চলবে না।

দহলানী। কাউকে ব'লে দিবি নে তো?

টেক্কানী। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, কাউকে বলব না।

দহলানী। কাল ভোর রাত্তিরের ঘুমে স্বপ্ন দেখলুম, হঠাৎ মানুষ হয়ে গেছি, নড়েচড়ে বেড়াচ্ছি ঠিক ওদেরই মতো। জেগে উঠে লজ্জায় মরি আর-কি। কিন্তু—

টেক্কানি। কিন্তু কী!

দহলানী। সে কথা থাক্‌ গে।

ইস্কাবনী। বুঝেছি, বুঝেছি, দিনের বেলাকার বাঁধা পাখি খোলা পেয়েছিল স্বপ্নে।

দহলানী। চুপ চুপ চুপ, নহলাপণ্ডিত শুনলে স্বপ্নেরও প্রায়শ্চিত্ত লাগিয়ে দেবে। ওটা পাপ যে। কিন্তু, স্বপ্নে কী ফুর্তি!

টেক্কানী। যা বলিস, ভাই, তাসের দেশে সাগরপারের হাওয়া দিয়েছে খুব জোরে। কিছু যেন ধরে রাখতে পারছি নে, সব দিচ্ছে উড়িয়ে।

দহলানী। তা হোক, এখনো কিন্তু কিছু উড়ল, কিছু রইল বাকি। মাথার ঘোমটা যদি-বা খসল, পায়ের বাঁক-মল তো সোজা করতে পারল না।

ইস্কাবনী। সত্যি বলেছিস, মনটা সমুদ্রের এপারে ওপারে দোলাদুলি করছে। ঐ দেখ্‌-না, চিঁড়েতনীর মানুষ হবার অসহ্য শখ, পারে না, তাই মানুষের মুখোশ পরেছে— সেটা তাসমহলেরই কারখানাঘরে তৈরি। কী অদ্ভুত দেখতে হয়েছে।

দহলানী। আমাদের কাকে কিরকম দেখতে হয়েছে নিজেরা বুঝতেই পারি নে। গাছের আড়াল থেকে কাল শুনলুম, সদাগরের পুত্তুর বলছিল, এরা যে মানুষের সঙ সাজছে।

টেক্কানী। ওমা, কী লজ্জা। রাজপুত্তুর কী বললেন।

দহলানী। তিনি রেগে উঠে বললেন, সে তো ভালোই— সাজের ভিতর দিয়ে রুচি দেখা দিল। তিনি বললেন, এ দেখে হেসো না, হাসতে চাও তো যাও তাদের কাছে মানুষের মধ্যে যারা তাসের সঙ সেজে বেড়ায়।

ইস্কাবনী। ওমা, তাও কি ঘটে নাকি। মানুষ হয়ে তাসের নকল! আচ্ছা, কী করে তারা।

দহলানী। রাজপুত্তুর বলছিলেন, তারা রঙের কাঠি বুলোয় ঠোঁটে, কালো বাতি দিয়ে আঁকে ভুরু, আরো কত কী, আমাদের রঙ-করা তাসেদেরই মতো। সব চেয়ে মজার কথা, ওরা খুরওয়ালা চামড়া লাগায় পায়ের তলায়।

টেক্কানী। কেন।

দহলানী। পদোন্নতি ঘটে, মাটিতে পা পড়ে না। এ সমস্তই তাসের ঢঙ। এঁকে দেওয়া, সাজিয়ে দেওয়া কায়দা।

ইস্কাবনী। এ তো দেখি পবনদেবের উলটোপালটা খেলা— তাসীরা হতে চায় রঙ খসিয়ে মানুষ, মানুষ চায় রঙ মেখে তাসী হতে। আমি কিন্তু, ভাই, ঠিক করেছি, মানুষের মন্তর নেব রাজপুত্তুরের কাছে।

টেক্কানী। আমিও।

দহলানী। আমারও ইচ্ছে করে, কিন্তু ভয়ও করে। শুনেছি মানুষের দুঃখ ঢের, তাসের কোনো বালাই নেই।

ইস্কাবনী। দুঃখের কথা বলছিস, ভাই ? দুঃখ যে এখনি শুরু করেছে তার নৃত্য বুকের মধ্যে।

টেক্কানী। কিন্তু, সেই দুঃখের নেশা ছাড়তে চাই নে। থেকে থেকে চোখ জলে ভেসে যায়, কেন যে ভেবেই পাই নে।

গান

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়,
মন কেন এমন করে—
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে।
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে চলে গিয়েছে অনাদরে—
বাজে তারি অযতন প্রাণের 'পরে।
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে॥

ইস্কাবনী। পালাও পালাও, সম্পাদক আসছে। কাগজে যদি রটে যায় তা হলে মুখ দেখাতে পারব না।

দহলানী। ঐ-যে দলবল সবাই আসছে। বুড়োনিমতলায় আজ সভা বসবে। এখানে আর নয়।

[প্রস্থান

রাজাসাহেব প্রভৃতির প্রবেশ

রাজা। এ জায়গাটা কেমন ঠেকছে। ওটা কিসের গন্ধ।

পঞ্জা। কদম্বের।

রাজা। কদম্ব ! অদ্ভুত নাম। ওটা কী পাখি ডাকছে।

পঞ্জা। শুনেছি, ওকে বলে ঘুঘু।

রাজা। ঘুঘু ! তাসের ভাষায় ওকে একটা ভদ্র নাম দাও, বলো বিনতি।— আজ তো কাজ করা দায় হয়েছে। আজ আকাশে কথা শোনা যাচ্ছে, বাতাসে সুর উঠেছে। অনেক কষ্টে মনকে শান্ত রেখেছি। রানীবিবিকে তো ঘরে রাখা শক্ত হল, নেচে বেড়াচ্ছে ভূতে-পাওয়ার মতো। সভ্যগণ, তোমাদের আজ চেনা যায় না— সভার সাজ নেই, অত্যন্ত অসভ্যের মতো।

সকলে। দোষ নেই। ঢিলে হয়ে গেল আমাদের সাজ, আপনি পড়ল খসে— সেগুলো রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে আছে।

রাজা। সম্পাদক, তোমারও যেন গাম্ভীর্যহানি হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে।

গোলাম। সকাল থেকে আছি বনে, পলাতকাদের নাম সংগ্রহ করার জন্যে। এখানকার হাওয়া লেগেছে। সম্পাদকীয় স্তম্ভ ভরাতে গিয়ে দেখি, লেখনী দিয়ে ছন্দ ঝরছে। শুনেছি, আধুনিক ডাক্তার এইরকম নিঃসারণকেই বলে ইনফ্লুয়েঞ্জা।

রাজা। কিরকম, একটা নমুনা দেখি।

গোলাম। যে দেশে বায়ু না মানে
বাধ্যতামূলক বিধি,
সে দেশে দহলা তত্ত্বনিধি
কেমনে করিবে রক্ষা কৃষ্টি—
সে দেশে নিশ্চিত অনাসৃষ্টি ।।

রাজা। থাক্ আর প্রয়োজন নেই। এটা চতুর্থবর্গের পাঠ্য পুস্তকে চালিয়ে দিয়ো। তাসবংশীয় শিশুরা কণ্ঠস্থ করুক।

ছক্কা। রাজাসাহেব, তোমার চতুর্থবর্গের শিশুবিভাগের ছাত্র নই আমরা। আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে, আমাদের বয়স হয়েছে। ও ছন্দ মনে লাগছে না।

পঞ্জা। ওগো বিদেশী, সমুদ্রের ওপারের ছন্দ আমাদের কানে দিতে পার ?

রাজপুত্র। পারি, তবে শোনো।

গান

গগনে গগনে যায় হাঁকি
বিদ্যুৎবাণী বজ্রবাহিনী বৈশাখী,
স্পর্ধাবেগের ছন্দ জাগায়
বনস্পতির শাখাতে।
শূন্যমদের নেশায় মাতাল ধায় পাখি,
অচিন পথের ছন্দ উড়ায়
মুক্ত বেগের পাখাতে।
অন্তরতল মন্থন করে ছন্দে
সাদ্যর কালোর দ্বন্দ্বে,
নানা ভালো নানা মন্দে,
নানা সোজা নানা বাঁকাতে।
ছন্দ নাচিল হোমবহ্নির তরঙ্গে,
মুক্তিরণের যোদ্ধবীরের ভ্রূভঙ্গে,
ছন্দ ছুটিল প্রলয়পথের
রুদ্ররথের চাকাতে ।।

রাজা। কিছু বুঝলে তোমরা ?

তাসের দল। কিছুই না।

রাজা। তবে ?

তাসের দল। মন মেতে উঠল।

রাজা। সেটা তো ভালো নয়। আমাদের সনাতন শাস্ত্রের ছন্দ একটা শোনো—

শান্ত যেই জন
যম তারে ঠেলে ঠেলে
নেড়েচেড়ে যায় ফেলে ;
বলে, "মোর নাহি প্রয়োজন।"

শোনো বিদেশী।

রাজপুত্র। আদেশ করো।

রাজা। তোমরা যে তাসদ্বীপময় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছ— জলে দিচ্ছ ডুব, চড়ছ পাহাড়ের মাথায়, কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ— এ-সব কেন।

রাজপুত্র। রাজাসাহেব, তোমরা যে কেবলই উঠছ বসছ, পাশ ফিরছ, পিঠ ফেরাচ্ছ, গড়াচ্ছ মাটিতে, সেই-বা কেন।

রাজা। সে আমাদের নিয়ম।

রাজপুত্র। এ আমাদের ইচ্ছে।

রাজা। ইচ্ছে ? কী সর্বনাশ ! এই তাসের দেশে ইচ্ছে ! বন্ধুগণ, তোমরা সবাই কী বল।

ছক্কা-পঞ্জা। আমরা ওর কাছে 'ইচ্ছেমন্ত্র' নিয়েছি।

রাজা। কী মন্ত্র।

ছক্কা-পঞ্জা। গান

ইচ্ছে।
সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,
সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে।
সেই তো আঘাত করছে তালায়,
সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়
বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে ॥

রাজা। যাও, যাও, এখান থেকে চলে যাও, শীঘ্র চলে যাও। হরতনী, কানে পৌঁছল না কথাটা ? চিঁড়েতনী, দেখছ ওর ব্যবহারটা ? হঠাৎ এমন হল কেন।

হরতনী। ইচ্ছে।

অন্য টেক্কারা। ইচ্ছে।

রাজা। ও কী রানীবিবি, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে যে।

রানী। আর বসে থাকতে পারছি নে।

রাজা। রানীবিবি, সন্দেহ হচ্ছে, তোমার মন বিচলিত হয়েছে।

রানী। সন্দেহ নেই, বিচলিত হয়েছে।

রাজা। জান ? চাঞ্চল্য তাসের দেশে সব চেয়ে বড়ো অপরাধ।

রানী। জানি, আর এও জানি, এই অপরাধটাই সব চেয়ে বড়ো সম্ভোগের জিনিস।

রাজা। শাস্তির জিনিসকে তুমি বললে ভোগের জিনিস, তাসের দেশের ভাষাও ভুলে গেছ ?

রানী। আমাদের তাসের দেশের ভাষায় শিকলকে বলে অলংকার, এ ভাষা ভোলবার সময় এসেছে।

রুইতন। হাঁ বিবিরানী, এদের ভাষায় জেলখানাকে বলে শ্বশুরবাড়ি।

রাজা। চুপ।

হরতনী। এরা হেঁয়ালিকে বলে শাস্তর।

রাজা। চুপ।

হরতনী। বোবাকে বলে সাধু।

রাজা। চুপ।

হরতনী। বোকাকে বলে পণ্ডিত।

রাজা। চুপ।

পঞ্জা। এরা মরাকে বলে বাঁচা।

রাজা। চুপ।

রানী। আর, স্বর্গকে বলে অপরাধ। বলো তোমরা, জয় ইচ্ছের জয়।

সকলে। জয় ইচ্ছের জয়।

রাজা। রানীবিবি, তোমার বনবাস !

রানী। বাঁচি তাহলে।
রাজা। নির্বাসন!— ও কী, চললে যে! কোথায় চললে।
রানী। নির্বাসনে।
রাজা। আমাকে ফেলে রেখে যাবে?
রানী। ফেলে রেখে যাব কেন।
রাজা। তবে?
রানী। সঙ্গে নিয়ে যাব তোমাকে।
রাজা। কোথায়।
রানী। নির্বাসনে।
রাজা। আর এরা, আমার প্রজারা?
সকলে। যাব নির্বাসনে।
রাজা। দহলাপণ্ডিত কী মনে করছ।
দহলা। নির্বাসনটা ভালোই মনে করছি।
রাজা। আর, তোমার পুঁথিগুলো?
দহলা। ভাসিয়ে দেব জলে।
রাজা। বাধ্যতামূলক আইন?
দহলা। আর চলবে না।
সকলে। চলবে না, চলবে না।
রানী। কোথায় গেল সেই মানুষরা।
রাজপুত্র। এই-যে আছি আমরা।
রানী। মানুষ হতে পারব আমরা?
রাজপুত্র। পারবে, নিশ্চয় পারবে।
রাজা। ওগো বিদেশী, আমিও কি পারব।
রাজপুত্র। সন্দেহ করি। কিন্তু, রানী আছেন তোমার সহায়। জয় রানীর।

সকলের গান

বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,
বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার-উদ্দাম কৌতুক;
ভাঙনের জয়গান গাও।
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক,
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক।
আমরা শুনেছি ওই
'মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ'
কোন্ নূতনেরই ডাক।
ভয় করি না অজানারে,
রুদ্ধ তাহারি দ্বারে
দুর্দাড় বেগে ধাও ॥

শান্তিনিকেতন
১৪।১।৩৯

বাঁশরি

বাঁশরি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীমতী বাঁশরি সরকার বিলিতি য়ুনিভার্সিটিতে পাস করা মেয়ে। রূপসী না হলেও তার চলে। তার প্রকৃতিটা বৈদ্যুতশক্তিতে সমুজ্জ্বল, তার আকৃতিটাতে শান-দেওয়া ইস্পাতের চাকচিক্য। ক্ষিতীশ সাহিত্যিক। চেহারায় খুঁত আছে, কিন্তু গল্প লেখায় খ্যাতনামা। পার্টি জমেছে সুষমা সেনদের বাগানে।

বাঁশরি। ক্ষিতীশ, সাহিত্যে তুমি নূতন ফ্যাশনের ধূমকেতু বললেই হয়। জ্বলন্ত লেজের ঝাপটায় পুরোনো কায়দাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছ আকাশ থেকে। যেখানে তোমাকে এনেছি এটা বিলিতি-বাঙালি মহল, ফ্যাশনেবল পাড়া। পথঘাট তোমার জানা নেই। দেউড়িতে কার্ড তলব করলেই ঘেমে উঠতে। তাই সকাল-সকাল আনলুম। আপাতত একটু আড়ালে বোসো। সকলে এলে প্রকাশ কোরো আপন মহিমা। এখন চললুম, হয়তো না আসতেও পারি।

ক্ষিতীশ। রোসো, একটু সমঝিয়ে দাও। অজায়গায় আমাকে আনা কেন।

বাঁশরি। কথাটা খোলসা করে বলি তবে। বাজারে নাম করেছ বই লিখে। আরো উন্নতি আশা করেছিলুম। ভেবেছিলুম, নামটাকে বাজার থেকে উদ্ধার করে এত ঊর্ধ্বে তুলবে যে, ইতরসাধারণ গাল পাড়তে থাকবে।

ক্ষিতীশ। আমার নামটা বাজারে-চলতি ঘষা পয়সা নয়, সে কথা কি স্বীকার কর না।

বাঁশরি। সাহিত্যের সদর বাজারের কথা হচ্ছে না, তোমরা যে নতুন বাজারের চলতি দরে ব্যাবসা চালাচ্ছ সেও একটা বাজার। তার বাইরে যেতে তোমার সাহস নেই পাছে মালের গুমোর কমে। এবারে তারই প্রমাণ পেলুম তোমার এই হালের বইটাতে যার নাম দিয়েছ 'বেমানান'। সস্তায় পাঠক ভোলাবার লোভ তোমার পুরো পরিমাণেই আছে। মাঝারি লেখকেরা মরে ঐ লোভে। তোমার এই বইটাকে বলি আধুনিকতার বটতলায় ছাপা, খেলো আধুনিকতা।

ক্ষিতীশ। কিঞ্চিৎ রাগ হয়েছে দেখছি ; ছুরিটা বিঁধেছে তোমাদের ফ্যাশনেবল শার্ট-ফ্রন্ট ফুঁড়ে।

বাঁশরি। রামো ! ছুরি বল ওকে ! যাত্রার দলের কাঠের ছুরি, রাংতা-মাখানো। ওতে যারা ভোলে তারা অজবুগ।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, মেনে নিলেম। কিন্তু আমাকে এখানে কেন।

বাঁশরি। তুমি টেবিল বাজিয়ে বাজনা অভ্যেস কর, যেখানে সত্যিকার বাজনা মেলে সেইখানে শিক্ষা দিতে নিয়ে এলুম। এদের কাছ থেকে দূরে থাক, ঈর্ষা কর, বানিয়ে দাও গাল। তোমার বইয়ে নলিনাক্ষের নামে যে দলকে সৃষ্টি করে লোক হাসিয়েছ সে দলের মানুষকে কি সত্যি করে জান।

ক্ষিতীশ। আদালতের সাক্ষীর মতো জানি নে, বানিয়ে বলবার মতো জানি।

বাঁশরি। বানিয়ে বলতে গেলে আদালতের সাক্ষীর চেয়ে অনেক বেশি জানা দরকার হয়, মশায়। তখন কলেজে পড়া মুখস্থ করতে যখন শিখেছিলে রসাত্মক বাক্যই কাব্য ; এখন সাবালক হয়েছ তবু ঐ কথাটা পুরিয়ে নিতে পারলে না যে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিত্য।

ক্ষিতীশ। ছেলেমানুষি রুচিকে রস জোগাবার ব্যাবসা আমার নয়। আমি এসেছি জীর্ণকে চূর্ণ করে সাফ করতে।

বাঁশরি। বাস্‌ রে। আচ্ছা বেশ, কলমটাকে যদি ঝাঁটাই বানাতে চাও তা হলে আঁস্তাকুড়টা সত্যি হওয়া চাই, ঝাঁটাগাছটাও, আর সেইসঙ্গে ঝাড়ু-ব্যবসায়ীর হাতটাও। এই আমরাই তোমাদের নলিনাক্ষের দল, আমাদের অপরাধ আছে ঢের, তোমাদেরও আছে বিস্তর। কসুর মাপ করতে বলি নে, ভালো করে জানতে বলি, সত্যি করে জানাতে বলি, এতে ভালোই লাগুক মন্দই লাগুক কিছুই যায় আসে না।

ক্ষিতীশ। অন্তত তোমাকে তো জেনেছি, বাঁশি। কেমন লাগছে তারও আভাস আড়চোখে কিছু কিছু পাও বোধ করি।

বাঁশরি। দেখো সাহিত্যিক, আমাদের দলেও মানান-বেমানানের একটা নিক্তি আছে। চিটেগুড় মাখিয়ে কথাগুলোকে চট্‌চটে করে তোলা এখানে চলতি নেই। ওটাতে ঘেন্না করে। শোনো ক্ষিতীশ, আর-একবার তোমাকে স্পষ্ট করে বলি।

ক্ষিতীশ। এত অধিক স্পষ্ট তোমার কথা যে, যত বুঝি তার চেয়ে বাজে বেশি।

বাঁশরি। তা হোক, শোনো। অশ্বত্থামার ছেলেবেলাকার গল্প পড়েছ। ধনীর ছেলেকে দুধ খেতে দেখে যখন সে কান্না ধরল, তাকে পিটুলি গুলে খেতে দেওয়া হল, দু হাত তুলে নাচতে লাগল দুধ খেয়েছি বলে।

ক্ষিতীশ। বুঝেছি, আর বলতে হবে না। অর্থাৎ, আমার লেখায় পিটুলি-গোলা জল খাইয়ে পাঠকশিশুদের নাচাচ্ছি।

বাঁশরি। বানিয়ে-তোলা লেখা তোমার, বই প'ড়ে লেখা। জীবনে যার সত্যের পরিচয় আছে তার অমন লেখা বিস্বাদ লাগে।

ক্ষিতীশ। সত্যের পরিচয় আছে তোমার?

বাঁশরি। হাঁ আছে, দুঃখ এই, লেখবার শক্তি নেই। তার চেয়ে দুঃখের কথা— লেখবার শক্তি আছে তোমার, কিন্তু নেই সত্যের পরিচয়। আমি চাই, তুমি স্পষ্ট জানতে শেখ যেমন প্রত্যক্ষ করে আমি জেনেছি, সাঁচ্চা করে লিখতে শেখ। যাতে মনে হবে, আমারই মন প্রাণ যেন তোমার কলমের মুখে ফুটে পড়ছে।

ক্ষিতীশ। জানার কথা তো বললে, জানবার পদ্ধতিটা কী।

বাঁশরি। পদ্ধতিটা শুরু হোক আজকের এই পার্টিতে। এখানকার এই জগৎটার কাছ থেকে সেই পরিমাণে তুমি দূরে আছ, যাতে এর সমস্তটাকে নির্লিপ্ত হয়ে দেখা সম্ভব।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, তা হলে এই পার্টিটার একটা সরল ব্যাখ্যা দাও, একটা সিনপ্‌সিস।

বাঁশরি। তবে শোনো। এক পক্ষে এই বাড়ির মেয়ে, নাম সুষমা সেন। পুরুষমাত্রেরই মত এই যে, ওর যোগ্যপাত্র জগতে নেই নিজে ছাড়া। উদ্ধত যুবকদের মধ্যে মাঝে মাঝে এমনতরো আস্তিন-গোটানো ভঙ্গি দেখি যাতে বোঝা যায়, আইন-আদালত না থাকলে ওকে নিয়ে লোকক্ষয়কর কাণ্ড ঘটত। অপর পক্ষে শম্ভুগড়ের রাজা সোমশংকর। মেয়েরা তার সম্বন্ধে কী কানাকানি করে বলব না, কারণ আমিও স্ত্রী জাতিরই অন্তর্গত। আজকের পার্টি এঁদের দোঁহাকার এনগেজ্‌মেন্ট নিয়ে।

ক্ষিতীশ। দুজন মানুষের ঠিকানা পাওয়া গেল। দুই সংখ্যাটা গড়ায় এসে সুশীতল গার্হস্থ্যে। তিন সংখ্যাটা নারদ, পাকিয়ে তোলে জটা, ঘটিয়ে তোলে তাপজনক নাট্য। এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি কোথাও আছে নিশ্চয়, নইলে সাহিত্যিকের প্রলোভন কোথায়।

বাঁশরি। আছে তৃতীয় ব্যক্তি, সেই হয়তো প্রধান ব্যক্তি। লোকে তাকে ডাকে পুরন্দরসন্ন্যাসী। পিতৃদত্ত নামটার সন্ধান মেলে না। কেউ দেখেছে তাকে কুম্ভমেলায়, কেউ দেখেছে গারো পাহাড়ে ভালুক-শিকারে। কেউ বলে, ও য়ুরোপে অনেককাল ছিল। সুষমাকে কলেজের পড়া পড়িয়েছে আপন ইচ্ছায়। অবশেষে ঘটিয়েছে এই সম্বন্ধ। সুষমার মা বললেন— অনুষ্ঠানটা হোক ব্রাহ্মসমাজের

কাউকে দিয়ে, সুষমা জেদ ধরলে একমাত্র পুরন্দর ছাড়া আর-কাউকে দিয়ে চলবে না। চতুর্দিকের আবহাওয়াটার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, বলব, কোনো-একটা জায়গায় ডিপ্রেশন ঘটেছে। গতিকটা ঝোড়ো রকমের ; বাদলা কোনো-না-কোনো পাড়ায় নেমেছে, বৃষ্টিপাত হয়তো স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। বাস্, আর নয়।

ক্ষিতীশ। ঐ যাঃ, এই দেখো আমার এণ্ডির চাদরটাতে মস্ত একটা কালির দাগ।

বাঁশরি। ব্যস্ত হও কেন। ঐ কালির দাগেই তোমার অসাধারণতা। তুমি রিয়ালিস্ট, নির্মলতা তোমাকে মানায় না। তুমি মসীধ্বজ। ঐ আসছে অনসূয়া প্রিয়ম্বদা।

ক্ষিতীশ। তার মানে ?

বাঁশরি। দুই সখী। ছাড়াছাড়ি হবার জো নেই। বন্ধুত্বের উপাধি-পরীক্ষায় ঐ নাম পেয়েছে, আসল নামটা ভুলেছে সবাই।

[উভয়ের প্রস্থান

দুই সখীর প্রবেশ

১। আজ সুষমার এন্‌গেজ্‌মেন্ট, মনে করতে কেমন লাগে।

২। সব মেয়েরই এন্‌গেজ্‌মেন্টে মন খারাপ হয়ে যায়।

১। কেন।

২। মনে হয়, দড়ির উপরে চলছে, থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে সুখদুঃখের মাঝখানে। মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন ভয় করে।

১। তা সত্যি। আজ মনে হচ্ছে যেন নাটকের প্রথম অঙ্কের ড্রপ্‌সীন উঠল। নায়কনায়িকাও তেমনি, নাট্যকার নিজের হাতে সাজিয়ে চালান করেছেন রঙ্গভূমিতে। রাজা সোমশংকরকে দেখলে মনে হয়, টডের রাজস্থান থেকে বেরিয়ে এল দুশো-তিনশো বছর পেরিয়ে।

২। দেখিস নি, প্রথম যখন এলেন রাজাবাহাদুর ! খাঁটি মধ্যযুগের ; ঝাঁকড়া চুল, কানে বীরবৌলি, হাতে মোটা কঙ্কণ, কপালে চন্দনের তিলক, বাংলা কথা খুব বাঁকা। পড়লেন বাঁশরির হাতে, হল ওঁর মডারন্ সংস্করণ। দেখতে দেখতে যে-রকম রূপান্তর ঘটল কারো সন্দেহ ছিল না ওঁর গোত্রান্তর ঘটবে বাঁশরির গুষ্টিতেই। বাপ প্রভুশংকর খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি আধুনিকের কবল থেকে নিয়ে গেলেন সরিয়ে।

১। বাঁশরির চেয়ে বড়ো ওস্তাদ ঐ পুরন্দর সন্ন্যাসী, সব-ক'টা বেড়া ডিঙিয়ে রাজার ছেলেকে টেনে নিয়ে এলেন এই ব্রাহ্মসমাজের আংটি-বদলের সভায়। সব চেয়ে কঠিন বেড়া স্বয়ং বাঁশরির।

সুষমার বিধবা মা বিভাসিনীর প্রবেশ

স্বল্পজলা বৈশাখী নদীর স্রোতঃপথে মাঝে মাঝে চর প'ড়ে যে-রকম দৃশ্য হয় তেমনি চেহারা। শিথিলবিস্তারিত দেহ, কিছু মাংসবহুল, তবু চাপা পড়ে নি যৌবনের ধারাবশেষ।

বিভাসিনী। বসে বসে কী ফিস্ ফিস্ করছিস তোরা।

১। মাসি, লোকজন আসবার সময় হল, সুষমার দেখা নেই কেন।

বিভাসিনী। কী জানি, হয়তো সাজগোজ চলছে। তোরা চল্ বাছা, চায়ের টেবিলের কাছে, অতিথিদের খাওয়াতে হবে।

১। যাচ্ছি মাসি, ওখানে এখনো রোদ্দুর।

বিভাসিনী। যাই, দেখি গে সুষমা কী করছে। তাকে এখানে তোরা কেউ দেখিস নি ?

২। না, মাসি।

বিভাসিনী। কে যে বললে ঐ পুকুরটার ধারে এসেছিল ?

১। না, এতক্ষণ আমরাই ওখানে বেড়াচ্ছিলুম।

[বিভাসিনীর প্রস্থান

২। চেয়ে দেখ্, ভাই, তোদের সুধাংশু কী খাটুনিই খাটছে। নিজের খরচে ফুল কিনে এনে টেবিল সাজিয়েছে নিজের হাতে। কাল এক কাণ্ড বাধিয়েছিল। নেপু বিশ্বাস মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল, সুষমা টাকার লোভে এক বুনো রাজাকে বিয়ে করছে।

১। নেপু বিশ্বেস ! ওর মুখ বাঁকবে না ? বুকের মধ্যে যে ধনুষ্টংকার ! আজকাল সুষমাকে নিয়ে ছেলেদের দলে বুক-জ্বলুনির লঙ্কাকাণ্ড। ঐ সুধাংশুর বুকখানা যেন মানোয়ারি জাহাজের বয়লারঘরের মতো হয়ে উঠেছে।

২। সুধাংশুর তেজ আছে, যেমন শোনা নেপুর কথা অমনি তাকে পেড়ে ফেললে মাটিতে, বুকের উপর চেপে বসে বললে, মাপ চেয়ে চিঠি লিখতে হবে।

১। দারুণ গোঁয়ার, ওর ভয়ে পেট ভ'রে কেউ নিন্দে করতেও পারে না। বাঙালির ছেলেদের বিষম কষ্ট।

২। জানিস নে, আমাদের পাড়ায় বসেছে হতাশের সমিতি ? লোকে যাদের বলে সুষমাভক্ত সম্প্রদায়, সৌষমিক যাদের উপাধি, তারা নাম নিয়েছে লক্ষ্মীছাড়ার দল। নিশেন বানিয়েছে, তাতে ভাঙাকুলোর চিহ্ন। সন্ধ্যাবেলায় কী চেঁচামেচি। পাড়ার গেরস্তরা বলছে কাউন্সিলে প্রস্তাব তুলবে, আইন করে ধরে ধরে অবিলম্বে সব-ক'টার জীবন্ত সমাধি, অর্থাৎ বিয়ে দেওয়া চাই। নইলে রাত্তিরে ভদ্রলোকদের ঘুম বন্ধ। পাবলিক-ন্যুসেন্স্ যাকে বলে।

১। এই লোকহিতকর কার্যে তুই সাহায্য করতে পারবি, প্রিয়।

২। দয়াময়ী, লোকহিতৈষিতা তোমারও কোনো মেয়ের চেয়ে কম নয়, ভাই। লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে লক্ষ্মী স্থাপন করবার শখ আছে তোমার। আন্দাজে তা বুঝতে পারি। অনু, ঐ লোকটাকে চিনিস ?

১। কখনো তো দেখি নি।

২। ক্ষিতীশবাবু। গল্প লেখে, খুব নাম। বাঁশরি দামি জিনিসের বাজারদর বোঝে। ঠাট্টা করলে বলে— ঘোলের সাধ দুধে মেটাচ্ছি, মুক্তার বদলে শুক্তি।

১। চল্ ভাই, সবাই এসে পড়ল। আমাদের একত্র দেখলে ঠাট্টা করবে।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাগানের কোণে তিনটে ঝাউগাছ চক্র করে দাঁড়িয়ে। তলায় কাঠের আসন। সেই নিভৃতে ক্ষিতীশ। অন্যত্র নিমন্ত্রিতের দল কেউ-বা আলাপ করছে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে, কেউ-বা খেলছে টেনিস, কেউ-বা টেবিলে সাজানো আহার্য ভোগ করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

শচীন। আই সে, তারক, লোকটা আমাদের এলাকায় পিলপেগাড়ি করেছে, এর পরে পার্মনেন্ট টেন্যুরের দাবি করবে। উচ্ছেদ করতে ফৌজদারি।

তারক। কার কথা বলছ।

শচীন। ঐ-যে নববার্তা কাগজের গল্প-লিখিয়ে ক্ষিতীশ।

তারক। ওর লেখা একটাও পড়ি নি, সেইজন্যে অসীম শ্রদ্ধা করি।

শচীন। পড় নি ওর নূতন বই 'বেমানান' ? বিলিতিমার্কা, নব্যবাঙালিকে মুচড়ে মুচড়ে নিংড়েছে।

অরুণ। দূরে বসে কলম চালিয়েছে, ভয় ছিল না মনে। কাছে এসেছে এইবারে বুঝবে, নিংড়ে ধব্‌ধবে সাদা করতে পারি আমরাও। তার পরে চড়াতে পারি গাধার পিঠে।

অর্চনা। ওর ছোঁওয়া বাঁচাতে চাও তোমরা, ওরই ভয় তোমাদের ছোঁওয়াকে দেখছ না— দূরে বসে আইডিয়ার ডিমগুলোতে তা দিচ্ছে ?

সতীশ। ও হল সাহিত্যরথী, আমরা পায়ে-হাঁটা পেয়াদা, মিলন ঘটবে কী উপায়ে।

শচীন। ঘটকী আছেন স্বয়ং তোমার বোন বাঁশরি। হাইব্রো দার্জিলিং আর ফিলিস্টাইন সিলিগুড়ি, এর মধ্যে উনি রেল-লাইন পাতছেন। এখানে ক্ষিতীশের নেমন্তন্ন তাঁরই চক্রান্তে।

সতীশ। তাই নাকি। তা হলে ভগবানের কাছে হতভাগার আত্মার জন্যে শান্তি কামনা করি। আমার বোনকে এখনো চেনেন না।

শৈলবালা। তোমরা যাই বল, আমার কিন্তু ওর উপরে মায়া হয়।

সতীশ। কোন্ গুণে।

শৈল। চেহারাতে। শুনেছি, ছেলেবেলায় মায়ের বঁটির উপর পড়ে গিয়ে কপালে চোট লেগেছিল, তাই ঐ মস্ত কাটা দাগ। শরীরের খুঁত নিয়ে ওকে যখন ঠাট্টা কর, আমার ভালো লাগে না।

শচীন। মিস্ শৈল, বিধাতা তোমাকে নিখুঁত করেছেন তাই এত করুণা। কলির কোপ আছে যার চেহারায়, সে বিধাতার অকৃপার শোধ তুলতে চায় বিশ্বের উপর। তার হাতে কলম যদি সরু করে কাটা থাকে তা হলে শতহস্ত দূরে থাকা শ্রেয়। ইংরেজ কবি পোপের কথা মনে রেখো।

শৈল। আহা, তোমরা বাড়াবাড়ি করছ।

সতীশ। শৈল, তোমার দরদ দেখে নিজেরই কপালে বঁটি মারতে ইচ্ছে করছে। শাস্ত্রে আছে মেয়েদের দয়া আর ভালোবাসা থাকে এক মহলে, ঠাঁইবদল করতে দেরি হয় না।

শচীন। তোমার ভয় নেই সতীশ, মেয়েরা অযোগ্যকেই দয়া করে।

শৈল। আমাকে তাড়াতে চাও এখান থেকে?

শচীন। সতীশ সেই অপেক্ষাই করছে। ও যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

শৈল। রাগিয়ো না বলছি, তা হলে তোমার কথাও ফাঁস করে দেব।

শচীন। জেনে নাও বন্ধুগণ, আমারও ফাঁস করবার যোগ্য খবর আছে।

সতীশ। মিস্ বাণী, দেখছ লোকটার স্পর্ধা? গুজবটাকে ঠেলে আনছে তোমার দিকে। পাশ কাটাতে না পারলে অ্যাক্সিডেন্ট অনিবার্য।

লীলা। মিস্ বাণীকে সাবধান করতে হবে না। ও জানে তাড়া লাগালেই বিপদকে খেদিয়ে আনা হয়। তাই চুপচাপ আছে, কপালে যা থাকে। ঐ-যে কী গানটা, 'বলেছিল ধরা দেব না'।

গান

বলেছিল ধরা দেব না, শুনেছিল সেই বড়াই।
বীরপুরুষের সয় নি গুমোর, বাধিয়ে দিয়েছে লড়াই।
তার পরে শেষে কী-যে হল কার,
কোন্ দশা হল জয়পতাকার—
কেউ বলে জিত, কেউ বলে হার, আমরা গুজব ছড়াই।

অর্চনা। আঃ, কেন তোরা বাণীকে নিয়ে পড়েছিস। ও এখনই কেঁদে ফেলবে। সুষীমা, যা তো ক্ষিতীশবাবুকে ডেকে আন্ চা খেতে।

লীলা। হায় রে কপাল! মিথ্যে ডাকবে, চোখ নেই, দেখতে পাও না!

সতীশ। কেন, দেখবার কী আছে।

লীলা। ঐ-যে, এণ্ডি চাদরের কোণে মস্ত একটা কালির দাগ। ভেবেছেন চাপা দিয়েছেন কিন্তু ঝুলে পড়েছে।

সতীশ। আচ্ছা চোখ যা হোক তোমার!

লীলা। বোমা তদন্তে পুলিস না এলে ওঁকে নড়ায় কার সাধ্যি।

সতীশ। আমার কিন্তু ভয় হয়, কোন্‌দিন বাঁশরি ঐ জখমী মানুষকে বিয়ে করে পরিবারের মধ্যে আতুরাশ্রম খুলে বসে।

লীলা। কী বল তার ঠিক নেই। বাঁশরির জন্যে ভয়! ওর একটা গল্প বলি, ভয় ভাঙবে শুনে। আমি উপস্থিত ছিলুম।

শচীন। কী মিছে তাস খেলছ তোমরা! এসো এখানে, গল্প-লিখিয়ের উপর গল্প! শুরু করো।

লীলা। সোমশংকর হাতছাড়া হবার পরে বাঁশরির শখ গেল নখী-দন্তী-গোছের একটা লেখক পোষবার। হঠাৎ দেখি জোটালো কোথা থেকে আস্ত একজন কাঁচা সাহিত্যিক। সেদিন উৎসাহ পেয়ে লোকটা শোনাতে এসেছে একটা নূতন লেখা। জয়দেব-পদ্মাবতীকে নিয়ে তাজা গল্প। জয়দেব দূর থেকে ভালোবাসে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে। রাজবধূর যেমন রূপ তেমনি সাজসজ্জা, তেমনি বিদ্যেসাধ্যি। অর্থাৎ এ কালে জন্মালে সে হত ঠিক তোমারই মতো শৈল। এ দিকে জয়দেবের স্ত্রী ষোলোআনা গ্রাম্য, ভাষায় পানাপুকুরের গন্ধ, ব্যবহারটা প্রকাশ্যে বর্ণনা করবার মতো নয়, যে-সব তার বীভৎস প্রবৃত্তি— ড্যাশ দিয়ে ফুটকি দিয়েও তার উল্লেখ চলে না। লেখক শেষকালটায় খুব কালো কালিতে দেগে প্রমাণ করেছে, যে জয়দেব স্নব, পদ্মাবতী মেকি, একমাত্র খাঁটি সোনা মন্দাকিনী। বাঁশরি চৌকি ছেড়ে দাঁড়িয়ে তারস্বরে বলে উঠল, 'মাস্‌টরপীস!' ধন্যি মেয়ে! একেবারে সাব্লাইম ন্যাকামি।

শচীন। মানুষটা চুপসে চ্যাপটা হয়ে গেল বোধ হয়।

লীলা। উলটো। বুক উঠল ফুলে। বললে, 'শ্রীমতী বাঁশরি, মাটি খোঁড়বার কোদালকে আমি খনিত্র নাম দিয়ে শুদ্ধ করে নিই নে, তাকে কোদালই বলি।' বাঁশরি বলে উঠল, 'তোমার খেতাব হওয়া উচিত— নব্যসাহিত্যের পূর্ণচন্দ্র, কলঙ্কগর্বিত।' ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় যেন আতসবাজির মতো।

শচীন। এটাও লোকটার গলা দিয়ে গলল? বাধল না?

লীলা। একটুও না। চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে ভাবল, আশ্চর্য করেছি, এবার মুগ্ধ করে দেব। বললে, 'শ্রীমতী বাঁশরি, আমার একটা থিয়োরি আছে। দেখে নেবেন একদিন ল্যাবরেটারিতে তার প্রমাণ হবে। মেয়েদের জৈবকণায় যে এনার্জি থাকে সেটা ব্যাপ্ত সমস্ত পৃথিবীর মাটিতে। নইলে পৃথিবী হত বন্ধ্যা।' আমাদের সর্দার-নেকি শুনেই এতখানি চোখ করে বললে, 'মাটিতে! বলেন কী ক্ষিতীশবাবু! মেয়েদের মাটি করবেন না। মাটি তো পুরুষ। পঞ্চভূতের কোঠায় মেয়ে যদি কোথাও থাকে সে জলে। নারীর সঙ্গে মেলে বারি। স্থূল মাটিতে সূক্ষ্ম হয়ে সে প্রবেশ করে, কখনো আকাশ থেকে নামে বৃষ্টিতে, কখনো মাটির তলা থেকে ওঠে ফোয়ারায়, কখনো কঠিন হয় বরফে, কখনো ঝরে পড়ে ঝরনায়।' যা বলিস ভাই শৈল, বাঁশি কোথা থেকে কথা আনে জুটিয়ে, ভগীরথের গঙ্গার মতো, হাঁপ ধরিয়ে দিতে পারে ঐরাবত হাতিটাকে পর্যন্ত।

শচীন। ক্ষিতীশ সেদিন ভিজে কাদা হয়ে গিয়েছিল বলো!

লীলা। সম্পূর্ণ। বাঁশি আমার দিকে ফিরে বললে, 'তুই তো এম· এস্‌সি·-তে বায়োকেমিস্ট্রি নিয়েছিস, শুনলি তো? বিশ্বে রমণীর রমণীয়তা যে অংশে সেইটিকে কেটে ছিঁড়ে পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে হাইড্রলিক প্রেস দিয়ে দলিয়ে সল্‌ফ্যুরিক অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে তোকে রিসর্চে লাগতে হবে।' দেখো একবার দুষ্টুমি, আমি কোনোকালে বায়োকেমিস্ট্রি নিই নি। ওর পোষা জীবকে নাচাবার জন্যে চাতুরী। তাই বলছি, ভয় নেই, মেয়েরা যাকে গাল দেয় তাকেও বিয়ে করতে পারে কিন্তু যাকে বিদ্রূপ করে তাকে নৈব নৈব চ। সব-শেষে বোকাটা বললে, 'আজ স্পষ্ট বুঝলুম, পুরুষ তেমনি করেই নারীকে চায় যেমন করে মরুভূমি চায় জলকে মাটির তলার বোবা ভাষাকে উদ্ভিদ করে তোলবার জন্যে।' এত হেসেছি!

তারক। তুমি তো ঐ বললে। আমি একদিন ক্ষিতীশের তালি-দেওয়া মুখ নিয়ে একটু ঠাট্টার আভাস দিয়েছিলেম। বাঁশরি বলে উঠলেন, 'দেখো লাহিড়ি, ওর মুখ দেখতে আমার পজিটিভ্‌লি ভালো লাগে।' আমি আশ্চর্য হয়ে বললেম, 'তা হলে মুখখানা বিশুদ্ধ মডার্‌ন্‌ আর্ট। বুঝতে ধাঁধা লাগে।' ওর সঙ্গে কথায় কে পারবে— ও বললে, 'বিধাতার তুলিতে অসীম সাহস। যাকে ভালো দেখতে করতে চান তাকে সুন্দর দেখতে করা দরকার বোধ করেন না। তাঁর মিষ্টান্ন ছড়ান ইতর

লোকদেরই পাতে।' বাই জোভ্, সূক্ষ্ম বটে!

শৈল। আর কি কোনো কথা নেই তোমাদের। ক্ষিতীশবাবু শুনতে পাবেন যে।

সতীশ। ভয় নেই, ওখানে ফোয়ারা ছুটছে, বাতাস উলটো দিকে, শোনা যাবে না।

অর্চনা। আচ্ছা, তোমরা সব তাস খেলো, টেনিস খেলতে যাও, ঐ মানুষটার সঙ্গে হিসেব চুকিয়ে আসি গে।

অর্চনা প্লেটে খাবার সাজিয়ে নিয়ে গেল ক্ষিতীশের কাছে। দোহারা গড়নের দেহ, সাজে-সজ্জায় কিছু অযত্ন আছে, হাসিখুশি ঢল্‌ঢলে মুখ, আয়ু পশ্চিমের দিকে এক ডিগ্রি হেলেছে।

অর্চনা। ক্ষিতীশবাবু, পালিয়ে বসে আছেন আমাদের কাছ থেকে তার মানে বুঝতে পারি, কিন্তু খাবার টেবিলটাকে অস্পৃশ্য করলেন কোন্ দোষে। নিরাকার আইডিয়ায় আপনারা অভ্যস্ত, নিরাহার ভোজও কি তাই। আমরা বঙ্গনারী বঙ্গসাহিত্যের সেবার ভার পেয়েছি যে দিকটাতে সে দিকে আপনাদের পাকযন্ত্র।

ক্ষিতীশ। দেবী, আমরা জোগাই রসাত্মক বাক্য, তা নিয়ে তর্ক ওঠে; আপনারা দেন রসাত্মক বস্তু, ওটা অন্তরে গ্রহণ করতে মতান্তর ঘটে না।

অর্চনা। কী চমৎকার। আমি যখন থালায় কেক সন্দেশ গোছাচ্ছিলুম আপনি ততক্ষণ কথাটা বানিয়ে নিচ্ছিলেন। সাত জন্ম উপোস করে থাকলেও আমার মুখ দিয়ে এমন ঝক্‌ঝকে কথাটা বেরত না। তা যাক গে; পরিচয় নেই, তবু এলুম কাছে, কিছু মনে করবেন না। পরিচয় দেবার মতো নেই বিশেষ কিছু। বালিগঞ্জ থেকে টালিগঞ্জে যাবার ভ্রমণবৃত্তান্তও কোনো মাসিকপত্রে আজ পর্যন্ত ছাপাই নি। আমার নাম অর্চনা সেন। ঐ-যে অপরিচিত ছোটো মেয়েটি বেণী দুলিয়ে বেড়াচ্ছে, আমি তারই অখ্যাত কাকী।

ক্ষিতীশ। এবার তা হলে আমার পরিচয়টা—

অর্চনা। বলেন কী। পাড়াগেঁয়ে ঠাওরালেন আমাকে? শেয়ালদ-স্টেশনে কি গাইড রাখতে হয় চেঁচিয়ে জানাতে যে কলকাতা শহরটা রাজধানী। এই পরশুদিন পড়েছি আপনার 'বেমানান' গল্পটা। পড়ে হেসে মরি আর-কি। ও কী! প্রশংসা শুনতে আজও আপনার লজ্জা বোধ হয়! খাওয়া বন্ধ করলেন যে? আচ্ছা, সত্যি বলুন, নিশ্চয় ঘরের লোক কাউকে লক্ষ্য করে লিখেছেন। রক্তের যোগ না থাকলে অমন অদ্ভুত সৃষ্টি বানানো যায় না। ঐ-যে, যে জায়গাটাতে মিস্টার কিষেণ গাপ্টা বি· এ· ক্যান্টাব, মিস্ লোটিকার পিঠের দিকের জামার ফাঁক দিয়ে আঙটি ফেলে দিয়ে খানাতল্লাশির দাবি করে হো-হো বাধিয়ে দিলে। আমার বন্ধুরা সবাই পড়ে বললে, ম্যাচ্‌লেস— বঙ্গসাহিত্যে এ জায়গাটার দেশলাই মেলে না, একটু পোড়াকাঠিও না। আপনার লেখা ভয়ানক রিয়লিস্টিক ক্ষিতীশবাবু। ভয় হয় আপনার সামনে দাঁড়াতে।

ক্ষিতীশ। আমাদের দুজনের মধ্যে কে বেশি ভয়ংকর, বিচার করবেন বিধাতাপুরুষ।

অর্চনা। না, ঠাট্টা করবেন না। সিঙাড়াটা শেষ করে ফেলুন। আপনি ওস্তাদ, ঠাট্টায় আপনার সঙ্গে পারব না। মোস্ট ইন্টারেস্টিং আপনার বইখানা। এমন-সব মানুষ কোথাও দেখা যায় না। ঐ-যে মেয়েটা কী তার নাম— কথায় কথায় হাঁপিয়ে উঠে বলে, মাই আইজ্, ও গড লাজুক ছেলে স্যান্ডেলের সংকোচ ভাঙবার জন্যে নিজে মোটর হাঁকিয়ে ইচ্ছে করে গাড়িটা ফেললে খাদে, মতলব ছিল স্যান্ডেলকে দুই হাতে তুলে পতিতোদ্ধার করবে। হবি তো হ স্যান্ডেলের হাতে হল কম্পউন্ড ফ্র্যাক্‌চার। কী ড্রামাটিক, রিয়ালিজ্‌মের চূড়ান্ত! ভালোবাসার এতবড়ো আধুনিক পদ্ধতি বেদব্যাসের জানা ছিল না। ভেবে দেখুন, সুভদ্রার কত বড়ো চান্স্ মারা গেল, আর অর্জুনেরও কব্জি গেল বেঁচে!

ক্ষিতীশ। কম মডারন্ নন আপনি। আমার মতো নির্লজ্জকেও লজ্জা দিতে পারেন।

অর্চনা। দোহাই ক্ষিতীশবাবু, বিনয় করবেন না। আপনি নির্লজ্জ! লজ্জায় গলা দিয়ে সন্দেশ গলছে না। কলমটার কথা স্বতন্ত্র।

লীলা। (কিছু দূর থেকে) অর্চনা মাসি, সময় হয়ে এল ডাক পড়েছে।
অর্চনা। (জনান্তিকে) লীলা, আধমরা করেছি, বাকিটুকু তোর হাতে।

[অর্চনার প্রস্থান

লীলা সাহিত্যে ফার্স্ট ক্লাস এম· এ· ডিগ্রি নিয়ে আবার সায়েন্স ধরেছে। রোগা শরীর, ঠাট্টা-তামাশায় তীক্ষ্ণ, সাজগোজে নিপুণ, কটাক্ষে দেখবার অভ্যাস।

লীলা। ক্ষিতীশবাবু, নমস্কার! আপনি 'সর্বত্র পূজ্যতে'র দলে। লুকোবেন কোথায়, পূজারী আপনাকে খুঁজে বের করে নিজের গরজে। এনেছি অটোগ্রাফের খাতা। সুযোগ কি কম। কী লিখলেন দেখি।

'অন্য-সকলের মতো নয় যে-মানুষ তার মার অন্য-সকলের হাতে।' চমৎকার, কিন্তু প্যাথেটিক। মারে ঈর্ষা ক'রে। মনে রাখবেন, ছোটো যারা তাদের ভক্তিরই একটা ইডিয়ম ঈর্ষা, মারটা তাদের পূজা।

ক্ষিতীশ। বাগ্‌বাদিনীর জাতই বটে, কথায় আশ্চর্য করে দিলেন।

লীলা। বাচস্পতির জাত যে আপনারা। যেটা বললেম ওটা কোটেশন। পুরুষের লেখা থেকেই। আপনাদের প্রতিভা বাক্যরচনায়, আমাদের নৈপুণ্য বাক্যপ্রয়োগে। ওরিজিন্যালিটি আপনার বইয়ের পাতায় পাতায়। সেদিন আপনারই লেখা গল্পের বই পড়লেম। ব্রীলিয়েন্ট্। ঐ-যে যাতে একজন মেয়ের কথা আছে, সে যখন দেখলে স্বামীর মন আর-এক জনের উপরে, বানিয়ে চিঠি লিখলে; স্বামীর কাছে প্রমাণ করে দিলে যে সে ভালোবাসে তাদের প্রতিবেশী বামনদাসকে। আশ্চর্য সাইকলজির ধাঁধা। বোঝা শক্ত, স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগাবার এই ফন্দী, না তাকে নিষ্কৃতি দেবার ঔদার্য।

ক্ষিতীশ। না না, আপনি ওটা—

লীলা। বিনয় করবেন না। এমন ওরিজিন্যাল আইডিয়া, এমন ঝক্‌ঝকে ভাষা, এমন চরিত্রচিত্র আপনার আর-কোনো লেখায় দেখি নি। আপনার নিজের রচনাকেও বহু দূরে ছাড়িয়ে গেছেন। ওতে আপনার মুদ্রাদোষগুলো নেই, অথচ—

ক্ষিতীশ। ভুল করছেন আপনি। 'রক্তজবা'— ও-বইটা যতীন ঘটকের।

লীলা। বলেন কী! ছি, ছি, এমন ভুলও হয়! যতীন ঘটককে যে আপনি রোজ দু-বেলা গাল দিয়ে থাকেন। আমার এ কী বুদ্ধি! মাপ করবেন আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ। আপনার জন্যে আর-এক পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিচ্ছি— রাগ করে ফিরিয়ে দেবেন না।

[লীলার প্রস্থান

রাজাবাহাদুর সোমশংকরের প্রবেশ

রাঘুবংশিক চেহারা 'শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ' রৌদ্রে পুড়ে ঈষৎ ম্লান গৌরবর্ণ, ভারী মুখ, দাড়িগোঁফ-কামানো, চুড়িদার সাদা পায়জামা, চুড়িদার সাদা আচকান, সাদা মসলিনের পাঞ্জাবী কায়দার পাগড়ি, শুঁড়তোলা সাদা নাগরাজুতো, দেহটা যে ওজনের কণ্ঠস্বরটাও তেমনি।

সোমশংকর। ক্ষিতীশবাবু, বসতে পারি কি।

ক্ষিতীশ। নিশ্চয়।

সোমশংকর। আমার নাম সোমশংকর সিং। আপনার নাম শুনেছি মিস্ বাঁশরির কাছ থেকে। তিনি আপনার ভক্ত।

ক্ষিতীশ। বোঝা কঠিন। অন্তত ভক্তিটা অবিমিশ্র নয়। তার থেকে ফুলের অংশ ঝরে পড়ে, কাঁটাগুলো দিনরাত থাকে বিঁধে।

সোমশংকর। আমার দুর্ভাগ্য আপনার বই পড়বার অবকাশ পাই নি। তবু আমাদের এই বিশেষ

দিনে আপনি এখানে এসেছেন, বড়ো কৃতজ্ঞ হলুম। কোনো এক সময়ে আমাদের শম্ভুগড়ে আসবেন, এই আশা রইল। জায়গাটা আপনার মতো সাহিত্যিকের দেখবার যোগ্য।

বাঁশরি। (পিছন থেকে এসে) ভুল বলছ শংকর, যা চোখে দেখা যায় তা উনি দেখেন না। ভূতের পায়ের মতো ওঁর চোখ উলটো দিকে। সে কথা যাক। শংকর, ব্যস্ত হোয়ো না। এখানে আজ আমার নেমন্তন্ন ছিল না। ধরে নিচ্ছি, সেটা আমার গ্রহের ভুল নয়, গৃহকর্তাদেরই ভুল। সংশোধন করতে এলুম। আজ সুষমার সঙ্গে তোমার এন্‌গেজ্‌মেন্টের দিন, অথচ এ সভায় আমি থাকব না এ হতেই পারে না। খুশি হও নি অনাহূত এসেছি বলে?

সোমশংকর। খুব খুশি হয়েছি, সে কি বলতে হবে।

বাঁশরি। সেই কথাটা ভালো করে বলবার জন্যে একটু বোসো এখানে। ক্ষিতীশ, ঐ চাঁপাগাছটার তলায় কিছুক্ষণ অদ্বিতীয় হয়ে থাকো গে। আড়ালে তোমার নিন্দে করব না।

[ক্ষিতীশের প্রস্থান

শংকর, সময় বেশি নেই, কাজের কথাটা সেরে এখনই ছুটি দেব। তোমার নূতন এন্‌গেজ্‌মেন্টের রাস্তায় পুরোনো জঞ্জাল কিছু জমে আছে। সাফ করে ফেললে সুগম হবে পথ। এই নাও।

বাঁশরি রেশমের থলি থেকে একটা পান্নার কণ্ঠী, হীরের ব্রেস্‌লেট, মুক্তোবসানো ব্রোচ বের করে দেখিয়ে আবার থলিতে পুরে সোমশংকরের কোলে ফেলে দিলে।

সোমশংকর। বাঁশি, তুমি জান, আমার মুখে কথা জোগায় না। যা বলতে পারলেম না তার মানে নিজে বুঝে নিয়ো।

বাঁশরি। সব কথাই আমার জানা, মানে আমি বুঝি। এখন যাও, তোমাদের সময় হল।

সোমশংকর। যেয়ো না, বাঁশি। ভুল বুঝো না আমাকে। আমার শেষ কথাটা শুনে যাও। আমি জঙ্গলের মানুষ। শহরে এসে কলেজে পড়ার আরম্ভের মুখে প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা। সে দৈবের খেলা। তুমিই আমাকে মানুষ করে দিয়েছিলে, তার দাম কিছুতেই শোধ হবে না। তুচ্ছ এই গয়নাগুলো।

বাঁশরি। আমার শেষ কথাটা শোনো, শংকর। আমার তখন প্রথম বয়েস, তুমি এসে পড়লে সেই নতুন-জাগা অরুণরঙের দিগন্তে। ডাক দিয়ে আলোয় আনলে যাকে তাকে লও বা না লও নিজে তো তাকে পেলুম। আত্মপরিচয় ঘটল। বাস্‌, দুই পক্ষে হয়ে গেল শোধবোধ। এখন দুজনেই অঋণী হয়ে আপন আপন পথে চললুম। আর কী চাই।

সোমশংকর। বাঁশি, যদি কিছু বলতে যাই নির্বোধের মতো বলব। বুঝলুম, আমার আসল কথাটা বলা হবে না কোনোদিনই। আচ্ছা, তবে থাক্‌। অমন চুপ করে আমার দিকে চেয়ে আছ কেন। মনে হচ্ছে, দুইচোখ দিয়ে আমাকে লুপ্ত করে দেবে।

বাঁশরি। আমি তাকিয়ে দেখছি একশো বছর পরেকার যুগান্তে। সে দিকে আমি নেই, তুমি নেই, আজকের দিনের অন্য কেউ নেই। ভুল বোঝার কথা বলছ! সেই ভুল বোঝার উপর দিয়ে চলে যাবে কালের রথ। ধুলো হয়ে যাবে, সেই ধুলোর উপরে বসে খেলা করবে তোমার নাতি-নাতনিরা। সেই নির্বিকার ধুলোর হোক জয়।

সোমশংকর। এ গয়নাগুলোর কোথাও স্থান রইল না; যাক তবে।

[ফেলে দিলে ফোয়ারার জলাশয়ে

সুষমার বোন সুষীমার প্রবেশ

ফ্রক পরা, চশমা চোখে, বেণী দোলানো, দ্রুতপদে চলা এগারো বছরের মেয়ে।

সুষীমা। সন্ন্যাসীবাবা আসছেন, শংকরদা। তোমাকে ডেকে পাঠালেন সবাই। তুমি আসবে না, বাঁশিদিদি?

বাঁশরি। আসব বৈকি, আসার সময় হোক আগে।

[সোমশংকর ও সুষীমার প্রস্থান

ক্ষিতীশ, শুনে যাও। চোখ আছে। দেখতে পাচ্ছ কিছু কিছু ?

ক্ষিতীশ। রঙ্গভূমির বাইরে আমি। আওয়াজ পাচ্ছি, রাস্তা পাচ্ছি নে।

বাঁশরি। বাংলা উপন্যাসে নিয়ুমার্কেটের রাস্তা খুলেছ নিজের জোরে আলকাতরা ঢেলে। এখানে পুতুলনাচের রাস্তাটা বের করতে তোমারও অফীসিয়াল গাইড চাই! লোকে হাসবে যে!

ক্ষিতীশ। হাসুক-না। রাস্তা না পাই, অমন গাইডকে তো পাওয়া গেল।

বাঁশরি। রসিকতা! সস্তা মিষ্টান্নের ব্যাবসা! এজন্যে ডাকি নি তোমাকে। সত্যি করে দেখতে শেখো, সত্যি করে লিখতে শিখবে। চারি দিকে অনেক মানুষ আছে, অনেক অমানুষও আছে, ঠাহর করলেই চোখে পড়বে। দেখো দেখো, ভালো করে দেখো।

ক্ষিতীশ। নাই বা দেখলেম, তোমার তাতে কী।

বাঁশরি। নিজে লিখতে পারি নে যে, ক্ষিতীশ। চোখে দেখি, মনে বুঝি, স্বর বন্ধ, ব্যর্থ হয় যে-সব। ইতিহাসে বলে, একদিন বাঙালি কারিগরদের বুড়ো আঙুল দিয়েছিল কেটে। আমিও কারিগর, বিধাতা বুড়ো আঙুল কেটে দিয়েছেন। আমদানি-করা মালে কাজ চালাই, পরখ করে দেখতে হয় সেটা সাঁচ্চা কি না। তোমরা লেখক, আমাদের মতো কলমহারাদের জন্যেই কলমের কাজ তোমাদের।

সুষমার প্রবেশ

দেখবামাত্র বিস্ময় লাগে। চেহারা সতেজ সবল সমুন্নত। রঙ যাকে বলে কনকগৌর, ফিকে চাঁপার মতো, কপাল নাক চিবুক যেন কুঁদে তোলা।

সুষমা। (ক্ষিতীশকে নমস্কার ক'রে) বাঁশি, কোণে লুকিয়ে কেন।

বাঁশরি। কুনো সাহিত্যিককে বাইরে আনবার জন্য। খনির সোনাকে শানে চড়িয়ে তার চেকনাই বের করতে পারি, আগে থাকতেই হাতযশ আছে। জহরতকে দামি করে তোলে জহরী, পরের ভোগেরই জন্য, কী বল। সুষী, ইনিই ক্ষিতীশবাবু, জান বোধ হয়।

সুষমা। জানি বৈকি। এই সেদিন পড়ছিলুম ওঁর 'বোকার বুদ্ধি' গল্পটা। কাগজে কেন এত গাল দিয়েছে বুঝতে পারলুম না।

ক্ষিতীশ। অর্থাৎ বইখানা গাল দেবার যোগ্য, এতই কী ভালো!

সুষমা। ওরকম ধারালো কথা বলবার ভার বাঁশরি আর ঐ আমার পিসতুতো বোন লীলার উপরে। আপনাদের মতো লেখকের বই সমালোচনা করতে ভয় করি, কেননা তাতে সমালোচনা করা হয় নিজেরই বিদ্যে-বুদ্ধির। অনেক কথা বুঝতেই পারি নে। বাঁশরির কল্যাণে আপনাকে কাছে পেয়েছি, দরকার হলে বুঝিয়ে নেব।

বাঁশরি। ক্ষিতীশবাবু ন্যাচারল্ হিস্ট্রী লেখেন গল্পের ছাঁচে। যেখানটা জানা নেই, দগদগে রঙ লেপে দেন মোটা তুলি দিয়ে। রঙের আমদানি সমুদ্রের ওপার থেকে। দেখে দয়া হল। বললুম, জীবজন্তুর সাইকলজির খোঁজে গুহাগহ্বরে যেতে যদি খরচে না কুলোয়, অন্তত জুয়োলজিক্যালের খাঁচার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে দোষ কী।

সুষমা। তাই বুঝি এনেছ এখানে ?

বাঁশরি। পাপমুখে বলব কী করে। তাই তো বটে। ক্ষিতীশবাবুর হাত পাকা, মালমসলাও পাকা হওয়া চাই। যথাসাধ্য জোগাড় দেবার মজুরগিরি করছি।

সুষমা। ক্ষিতীশবাবু, একটু অবকাশ করে নিয়ে আমাদের ও দিকে যাবেন। মেয়েরা সদ্য আপনার বই কিনে আনিয়েছে সই নেবে বলে। সাহস করছে না কাছে আসতে। বাঁশি, ওঁকে একলা ঘিরে রেখে কেন অভিশাপ কুড়োচ্ছ।

বাঁশরি। (উচ্চহাস্যে) সেই অভিশাপই তো মেয়েদের বর। সে তুমি জান। জয়যাত্রায় মেয়েদের লুটের মাল প্রতিবেশিনীর ঈর্ষা।

সুষমা। ক্ষিতীশবাবু, শেষ দরবার জানিয়ে গেলুম। গণ্ডি পেরোবার স্বাধীনতা যদি থাকে একবার যাবেন ও দিকে।

[সুষমার প্রস্থান

ক্ষিতীশ। কী আশ্চর্য ওঁকে দেখতে। বাঙালি ঘরের মেয়ে বলে মনেই হয় না। যেন এথীনা, যেন মিনর্ভা, যেন ব্রুন্‌হিল্‌ড!

বাঁশরি। (তীব্রহাস্যে) হায় রে হায়, যত বড়ো দিগ্‌গজ পুরুষই হোক-না কেন সবার মধ্যেই আছে আদিম যুগের বর্বর। হাড়-পাকা রিয়লিস্ট বলে দেমাক কর, ভান কর মন্তর মান না। লাগল মন্তর চোখের কটাক্ষে, একদম উড়িয়ে নিয়ে গেল মাইথলজির যুগে। আজও কচি মনটা রূপকথা আঁকড়িয়ে আছে। তাকে হিঁচড়িয়ে উজোন পথে টানাটানি ক'রে মনের উপরের চামড়াটাকে করে তুলেছ কড়া। দুর্বল বলেই বলের এত বড়াই।

ক্ষিতীশ। সে কথা মাথা হেঁট করেই মানব। পুরুষজাত দুর্বল জাত।

বাঁশরি। তোমরা আবার রিয়লিস্‌ট্‌! রিয়লিস্‌ট্‌ মেয়েরা। যত বড়ো স্থূল পদার্থ হও না, যা তোমরা তাই বলেই জানি তোমাদের। পাঁকে-ডোবা জলহস্তীকে নিয়ে ঘর যদি করতেই হয় তাকে ঐরাবত বলে রোমান্স্‌ বানাই নে। রঙ মাখাই নে তোমাদের মুখে। মাখি নিজে। রূপকথার খোকা সব! ভালো কাজ হয়েছে মেয়েদের! তোমাদের ভোলানো। পোড়া কপাল আমাদের! এথীনা! মিনর্ভা! মরে যাই! ওগো রিয়লিস্‌ট্‌, রাস্তায় চলতে যাদের দেখেছ পানওয়ালীর দোকানে, গড়েছ কালো মাটির তাল দিয়ে যাদের মূর্তি, তারাই সেজে বেড়াচ্ছে এথীনা, মিনর্ভা।

ক্ষিতীশ। বাঁশি, বৈদিককালে ঋষিদের কাজ ছিল মন্তর পড়ে দেবতা ভোলানো—যাঁদের ভোলাতেন তাঁদের ভক্তিও করতেন। তোমাদের যে সেই দশা। বোকা পুরুষদের ভোলাও তোমরা, আবার পাদোদক নিতেও ছাড় না। এমনি করেই মাটি করলে এই জাতটাকে।

বাঁশরি। সত্যি সত্যি, খুব সত্যি। ঐ বোকাদের আমরাই বসাই টঙের উপরে, চোখের জলে কাদামাখা পা ধুইয়ে দিই, নিজেদের অপমানের শেষ করি, যত ভোলাই তার চেয়ে ভুলি হাজার গুণে।

ক্ষিতীশ। এর উপায়?

বাঁশরি। লেখো, লেখো সত্যি করে, লেখো শক্ত করে। মন্তর নয়, মাইথলজি নয়, মিনর্ভার মুখোশটা ফেলে দাও টান মেরে। ঠোঁট লাল ক'রে তোমাদের পানওয়ালী যে মন্তর ছড়ায় ঐ আশ্চর্য মেয়েও ভাষা বদলিয়ে সেই মন্তরই ছড়াচ্ছে। সামনে পড়ল পথ-চলতি এক রাজা, শুরু করলে জাদু। কিসের জন্যে। টাকার জন্যে। শুনে রাখো, টাকা জিনিসটা মাইথলজির নয়, ওটা ব্যাঙ্কের, ওটা তোমাদের রিয়লিজ্‌মের কোঠায়।

ক্ষিতীশ। টাকার প্রতি দৃষ্টি আছে সেটা তো বুদ্ধির লক্ষণ, সেইসঙ্গে হৃদয়টাও থাকতে পারে।

বাঁশরি। আছে গো, হৃদয় আছে। ঠিক জায়গায় খুঁজলে দেখতে পাবে, পানওয়ালীরও হৃদয় আছে। কিন্তু মুনফা এক দিকে, হৃদয়টা আর-এক দিকে। এইটে যখন আবিষ্কার করবে তখনই জমবে গল্পটা। পাঠিকারা ঘোর আপত্তি করবে; বলবে, মেয়েদের খেলো করা হল, অর্থাৎ তাদের মন্ত্রশক্তিতে বোকাদের মনে খটকা লাগানো হচ্ছে। উঁচুদরের পুরুষ পাঠকও গাল পাড়বে। বল কী, তাদের মাইথলজির রঙ চটিয়ে দেওয়া! সর্বনাশ! কিন্তু ভয় কোরো না ক্ষিতীশ, রঙ যখন যাবে জ্বলে, মন্ত্র পড়বে চাপা, তখনো সত্য থাকবে টিকে, শেলের মতো, শূলের মতো।

ক্ষিতীশ। শ্রীমতী সুষমার হৃদয়ের বর্তমান ঠিকানাটা জানতে পারি কি।

বাঁশরি। ঠিকানা বলতে হবে না, নিজের চোখেই দেখতে পাবে যদি চোখ থাকে। এখন চলো ঐ দিকে। ওরা টেনিস-খেলা সেরে এসেছে। এখন আইস্‌ক্রিম পরিবেশনের পালা। বঞ্চিত হবে কেন।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বাগানের এক দিক। খাবার-টেবিল ঘিরে বসে আছে তারক, শচীন, সুধাংশু, সতীশ ইত্যাদি।

তারক। বাড়াবাড়ি হচ্ছে সন্ন্যাসীকে নিয়ে। নাম পুরন্দর নয়, সবাই জানে। আসল নাম ধরা পড়লেই বোকার ভিড় পাতলা হয়ে যেত। দেশী কি বিদেশী তা নিয়েও মতভেদ। ধর্ম কী জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলে, ধর্মটা এখনো মরে নি তাই তাকে নামের কোঠায় ঠেসে দেওয়া চলে না। সেদিন দেখি, আমাদের হিমুকে গল্‌ফ শেখাচ্ছে। হিমুর জীবাত্মাটা কোনোমতে গল্‌ফের গুলির পিছনেই ছুটতে পারে, তার বেশি ওর দৌড় নেই, তাই সে ভক্তিতে গদ্‌গদ। মিস্টিরিয়স সাজের নানা মালমসলা জুটিয়েছে। আজ ওকে আমি একস্‌পোজ করব সবার সামনে, দেখে নিয়ো।

সুধাংশু। প্রমাণ করবে, তোমার চেয়ে যে বড়ো সে তোমার চেয়ে ছোটো!

সতীশ। আঃ সুধাংশু, মজাটা মাটি করিস কেন। পকেট বাজিয়ে ও বলছে ডক্যুমেন্ট্‌ আছে। বের করুক-না, দেখি কিরকম চীজ সেটা। ঐ যে সন্ন্যাসী, সঙ্গে আসছেন এঁরা সবাই।

পুরন্দরের প্রবেশ

ললাট উন্নত, জ্বলছে দুই চোখ, ঠোঁটে রয়েছে অনুচ্চারিত অনুশাসন, মুখের স্বচ্ছ রঙ পাণ্ডুর শ্যাম— অন্তর থেকে বিচ্ছুরিত দীপ্তিতে ধৌত। দাড়ি-গোঁফ কামানো, সুডৌল মাথায় ছোটো করে ছাঁটা চুল, পায়ে নেই জুতো, তসরের ধুতি পরা, গায়ে খয়েরি রঙের ঢিলে জামা। সঙ্গে সুষমা, সোমশংকর, বিভাসিনী।

শচীন। সন্ন্যাসীঠাকুর, বলতে ভয় করি, কিন্তু চা খেতে দোষ কী।

পুরন্দর। কিছুমাত্র না। যদি ভালো চা হয়। আজ থাক্‌, এইমাত্র নেমন্তন্ন খেয়ে আসছি।

শচীন। নেমন্তন্ন আপনাকেও ? লাঞ্চে নাকি। গ্রেট্‌ইস্টার্‌নে বোষ্টমের মোচ্ছব!

পুরন্দর। গ্রেট্‌ইস্টার্‌নেই যেতে হয়েছিল। ডাক্তার উইল্‌কক্সের ওখানে।

শচীন। ডাক্তার উইল্‌কক্স! কী উপলক্ষে।

পুরন্দর। যোগবাশিষ্ঠ পড়ছেন।

শচীন। বাস্‌ রে। ওহে তারক, এগিয়ে এসো-না।—কী-যে বলছিলে।

তারক। এই ফোটোগ্রাফটা তো আপনার ?

পুরন্দর। সন্দেহমাত্র নেই।

তারক। মোগলাই সাজ, সামনে গুড়্‌গুড়ি, পাশে দাড়িওয়ালাটা কে। সুস্পষ্ট যাবনিক।

পুরন্দর। রোশেনাবাদের নবাব। ইরানী বংশীয়। তোমার চেয়ে এঁর আর্যরক্ত বিশুদ্ধ।

তারক। আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে যে!

পুরন্দর। দেখাচ্ছে তুর্কির বাদশার মতো। নবাবসাহেব ভালোবাসেন আমাকে, আদর করে ডাকেন মুক্তিয়ার মিঞা, খাওয়ান এক থালায়। মেয়ের বিয়ে ছিল, আমাকে সাজিয়েছিলেন আপন বেশে।

তারক। মেয়ের বিয়েতে ভাগবতপাঠ ছিল বুঝি ?

পুরন্দর। ছিল পোলোখেলার টুর্নামেন্ট্‌। আমি ছিলুম নবাবসাহেবের আপন দলে।

তারক। কেমন সন্ন্যাসী আপনি।

পুরন্দর। ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। কোনো উপাধিই নেই, তাই সব উপাধিই সমান খাটে। জন্মেছি দিগম্বর বেশে, মরব বিশ্বাম্বর হয়ে। তোমার বাবা ছিলেন কাশীতে হরিহর তত্ত্বরত্ন, তিনি আমাকে যে নামে জানতেন সে নাম গেছে ঘুচে। তোমার দাদা রামসেবক বেদান্তভূষণ কিছুদিন পড়েছেন আমার কাছে বৈশেষিক। তুমি তারক লাহিড়ি, তোমার নাম ছিল বুকু, আজ শ্বশুরের সুপারিশে কক্‌স্‌হিল সাহেবের অ্যাটর্নি-অফিসে শিক্ষানবিশ। সাজ বদলেছে তোমার, তারক নামের

আদ্যক্ষরটা তবর্গ থেকে টবর্গে চড়েছে। শুনেছি যাবে বিলেতে। বিশ্বনাথের বাহনের প্রতি দয়া রেখো।

তারক। ডাক্তার উইল্‌কক্সের কাছ থেকে কি ইন্ট্রোডাক্‌শন চিঠি পাওয়া যেতে পারবে।

পুরন্দর। পাওয়া অসম্ভব নয়।

তারক। মাপ করবেন।

পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম

বাঁশরি। সুষমার মাস্টারিতে আজ ইস্তফা দিতে এসেছেন?

পুরন্দর। কেন দেব। আরো-একটি ছাত্র বাড়ল।

বাঁশরি। শুরু করাবেন মুগ্ধবোধের পাঠ? মুগ্ধতার তলায় ডুবছে যে মানুষটা হঠাৎ তার বোধোদয় হলে নাড়ি ছাড়বে।

পুরন্দর। (কিছুক্ষণ বাঁশরির মুখের দিকে তাকিয়ে) বৎসে, একেই বলে ধৃষ্টতা।

বাঁশরি মুখ ফিরিয়ে সরে গেল

বিভাসিনী। সময় হয়েছে। ঘরের মধ্যে সভা প্রস্তুত, চলুন সকলে।

সকলের ঘরে প্রবেশ

দরজা পর্যন্ত গিয়ে বাঁশরি থমকে দাঁড়াল

ক্ষিতীশ। তুমি যাবে না ঘরে?

বাঁশরি। সন্তাদরের সদুপদেশ শোনবার শখ আমার নেই।

ক্ষিতীশ। সদুপদেশ!

বাঁশরি। এই তো সুযোগ। পালাবার রাস্তা বন্ধ। জালিয়ানওয়ালাবাগের মার।

ক্ষিতীশ। আমি একবার দেখে আসিগে।

বাঁশরি। না। শোনো, প্রশ্ন আছে। সাহিত্যসম্রাট, গল্পটার মর্ম যেখানে সেখানে পৌঁচেছে তোমার দৃষ্টি?

ক্ষিতীশ। আমার হয়েছে অন্ধ-গোলাঙ্গুল ন্যায়। লেজটা ধরেছি চেপে, বাকিটা টান মেরেচে আমাকে কিন্তু চেহারা রয়েছে অস্পষ্ট। মোট কথাটা এই বুঝেছি যে, সুষমা বিয়ে করবে রাজাবাহাদুরকে, পাবে রাজৈশ্বর্য, তার বদলে হাতটা দিতে প্রস্তুত, হৃদয়টা নয়।

বাঁশরি। তবে শোনো বলি। সোমশংকর নয় প্রধান নায়ক, এ কথা মনে রেখো।

ক্ষিতীশ। তাই নাকি। তা হলে অন্তত গল্পটার ঘাট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। তার পরে সাঁতরিয়ে হোক, খেয়া ধরে হোক, পারে পৌঁছব।

বাঁশরি। হয়তো জান পুরন্দর তরুণসমাজে বিনা মাইনেয় মাস্টারি করেন। পরীক্ষায় উৎরিয়ে দিতে অদ্বিতীয়। কড়া বাছাই করে নেন ছাত্র। ছাত্রী পেতে পারতেন অসংখ্য, কিন্তু বাছাইরীতি এত অসম্ভব কঠিন যে, এতদিনে একটিমাত্র পেয়েছেন, তার নাম শ্রীমতী সুষমা সেন।

ক্ষিতীশ। ছাত্রী যাদের ত্যাগ করেছেন তাদের কী দশা।

বাঁশরি। আত্মহত্যার সংখ্যা কত, খবর পাই নি। এটা জানি, তাদের অনেকেই চঞ্চু মেলে চেয়ে আছে ঊর্ধ্বে।

ক্ষিতীশ। সেই চকোরীর দলে নাম লেখাও নি?

বাঁশরি। তোমার কী মনে হয়।

ক্ষিতীশ। আমার মনে হয় চকোরীর জাত তোমার নয়, তুমি মিসেস্ রাহুর পদের উমেদার। যাকে নেবে তাকে দেবে লোপ করে, শুধু চঞ্চু মেলে তাকিয়ে থাকা নয়।

বাঁশরি। ধন্য! নরনারীর ধাত বুঝতে পয়লা নম্বর, গোল্ড্ মেডালিস্ট্। লোকে বলে নারীস্বভাবের

রহস্যভেদ করতে হার মানেন স্বয়ং নারীর সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত, কিন্তু তুমি নারীচরিত্রচারণচক্রবর্তী, নমস্কার তোমাকে।

ক্ষিতীশ। (করজোড়ে) বন্দনা সারা হল, এবার বর্ণনার পালা শুরু হোক।

বাঁশরি। এটা আন্দাজ করতে পার নি যে, সুষমা ঐ সন্ন্যাসীর ভালোবাসায় একেবারে শেষ-পর্যন্ত তলিয়ে গেছে?

ক্ষিতীশ। ভালোবাসা না ভক্তি?

বাঁশরি। চরিত্রবিশারদ, লিখে রাখো, মেয়েদের যে ভালোবাসা পৌঁছয় ভক্তিতে সেটা তাদের মহাপ্রয়াণ— সেখান থেকে ফেরবার রাস্তা নেই। অভিভূত যে পুরুষ ওদের সমান প্ল্যাটফর্‌মে নামে সেই গরিবের জন্য থার্ডক্লাস, বড়ো জোর ইন্টার-মীডিয়েট। সেলুনগাড়ি তো নয়ই। যে উদাসীন মেয়েদের মোহে হার মানল না, ওদের ভুজপাশের দিগ্‌বলয় এড়িয়ে যে উঠল মধ্যগগনে, দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে মেয়েরা তারই উদ্দেশে দিল শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য। দেখ নি তুমি, সন্ন্যাসী যেখানে মেয়েদের সেখানে কী ঠেলাঠেলি ভিড়।

ক্ষিতীশ। তা হবে। কিন্তু তার উলটোটাও দেখেছি। মেয়েদের বিষম টান একেবারে তাজা বর্বরের প্রতি। পুলকিত হয়ে ওঠে তাদের অপমানের কঠোরতায়, পিছন পিছন রসাতল পর্যন্ত যেতে রাজি।

বাঁশরি। তার কারণ মেয়েরা অভিসারিকার জাত। এগিয়ে গিয়ে যাকে চাইতে হয় তার দিকেই ওদের পুরো ভালোবাসা। ওদের উপেক্ষা তারই 'পরে দুর্বৃত্ত হবার মতো জোর নেই যার কিংবা দুর্লভ হবার মতো তপস্যা।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, বোঝা গেল সন্ন্যাসীকে ভালোবাসে ঐ সুষমা। তার পরে?

বাঁশরি। সে কী ভালোবাসা। মরণের বাড়া! সংকোচ ছিল না, কেননা একে সে ভক্তি বলেই জানত। পুরন্দর দূরে যেত আপন কাজে, সুষমা তখন যেত শুকিয়ে, মুখ হয়ে যেত ফ্যাকাশে। চোখে প্রকাশ পেত জ্বালা, মন শূন্যে শূন্যে খুঁজে বেড়াত কার দর্শন। বিষম ভাবনা হল মায়ের মনে। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাঁশি, কী করি।' আমার বুদ্ধির উপর তখন তাঁর ভরসা ছিল। আমি বললেম, 'দাও-না পুরন্দরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে।' তিনি তো আঁৎকে উঠলেন; বললেন, 'এমন কথা ভাবতেও পার?' তখন নিজেই গেলুম পুরন্দরের কাছে। সোজা বললুম, 'নিশ্চয়ই জানেন, সুষমা আপনাকে ভালোবাসে। ওকে বিয়ে করে উদ্ধার করুন বিপদ থেকে।' এমন করে মানুষটা তাকাল আমার মুখের দিকে, রক্ত জল হয়ে গেল। গম্ভীর সুরে বললে, 'সুষমা আমার ছাত্রী, তার ভার আমার 'পরে আর আমার ভার তোমার 'পরে নয়।' পুরুষের কাছ থেকে এতবড়ো ধাক্কা জীবনে এই প্রথম। ধারণা ছিল, সব পুরুষের 'পরেই সব মেয়ের আবদার চলে, যদি নিঃসংকোচ সাহস থাকে। দেখলুম দুর্ভেদ্য দুর্গও আছে। মেয়েদের সাংঘাতিক বিপদ সেই বন্ধ কপাটের সামনে, ডাকও আসে সেইখান থেকে, কপালও ভাঙে সেইখানটায়।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা বাঁশি, সত্যি করে বলো, সন্ন্যাসী তোমারও মনকে টেনেছিল কিনা।

বাঁশরি। দেখো, সাইকলজির অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বের মহলে কুলুপ দেওয়া ঘর। নিষিদ্ধ দরজা না খোলাই ভালো; সদরমহলেই যথেষ্ট গোলমাল, সামলাতে পারলে বাঁচি। আজ যে-পর্যন্ত শুনলে তার পরের অধ্যায়ের বিবরণ পাওয়া যাবে একখানা চিঠি থেকে। পরে দেখাব।

ক্ষিতীশ। ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখো, বাঁশি। পুরন্দর আংটি বদল করাচ্ছে। জানলার থেকে সুষমার মুখের উপর পড়েছে রোদের রেখা। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, শান্ত মুখ, জল ঝরে পড়ছে দুই চোখ দিয়ে। বরফের পাহাড়ে যেন সূর্যাস্ত, গলে পড়ছে ঝরনা।

বাঁশরি। সোমশংকরের মুখের দিকে দেখো— সুখ না দুঃখ, বাঁধন পরছে না ছিঁড়ছে? আর পুরন্দর, সে যেন ঐ সূর্যেরই আলো। তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে লক্ষ যোজন দূরে, মেয়েটার মনে যে অগ্নিকাণ্ড চলছে তার সঙ্গে কোনো যোগই নেই। অথচ তাকে ঘিরে একটা জ্বলন্ত ছবি বানিয়ে দিলে।

ক্ষিতীশ। সুষমার 'পরে সন্ন্যাসীর মন এতই যদি নির্লিপ্ত তবে ওকেই বেছে নিলে কেন।

বাঁশরি। ও যে আইডিয়ালিস্ট্! বাস্ রে! এতবড়ো ভয়ংকর জীব জগতে নেই। আফ্রিকার অসভ্য মারে মানুষকে নিজে খাবে বলে। এরা মারে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায়। খায় না খিদে পেলেও। বলি দেয় সারে সারে, জেঙ্গিসখাঁর চেয়ে সর্বনেশে।

ক্ষিতীশ। সন্ন্যাসীর 'পরে তোমার মনে মনে ভক্তি আছে বলেই তোমার ভাষা এত তীব্র।

বাঁশরি। যাকে-তাকে ভক্তি করতে না পেলে বাঁচে না যে-সব হ্যাংলা মেয়ে আমি তাদের দলে নই গো। রাজরানী যদি হতুম মেয়েদের চুলে দড়ি পাকিয়ে ওকে দিতুম ফাঁসি। কামিনীকাঞ্চন ছোঁয় না যে তা নয়, কিন্তু তাকে দেয় ফেলে ওর কোন্-এক জগন্নাথের রথের তলায়, বুকের পাঁজর যায় গুঁড়িয়ে।

ক্ষিতীশ। ওর আইডিয়াটা কী জানা চাই তো।

বাঁশরি। সে আছে বাওয়ান্ন বাঁও জলের নীচে। তোমার এলাকার বাইরে, সেখানে তোমার মন্দাকিনী-পদ্মাবতীর ডুবসাঁতার চলে না। আভাস পেয়েছি কোন্ ডাকঘর-বিবর্জিত দেশে ও এক সংঘ বানিয়েছে, তরুণতাপসসংঘ, সেখানে নানা পরীক্ষায় মানুষ তৈরি হচ্ছে।

ক্ষিতীশ। কিন্তু, তরুণী?

বাঁশরি। ওর মতে গৃহেই নারী, কিন্তু পথে নয়।

ক্ষিতীশ। তা হলে সুষমাকে কিসের প্রয়োজন।

বাঁশরি। অন্ন চাই-যে। মেয়েরা প্রহরণধারিণী না হোক বেড়িহাতা-ধারিণী তো বটে। রাজভাণ্ডারের চাবিটা থাকবে ওরই হাতে। ঐ-যে ওরা বেরিয়ে আসছে, অনুষ্ঠান শেষ হল বুঝি।

পুরন্দর ও অন্য সকলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে

পুরন্দর। (সোমশংকর ও সুষমাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে) তোমাদের মিলনের শেষ কথাটা ঘরের দেয়ালের মধ্যে নয়, বাইরে, বড়ো রাস্তার সামনে। সুষমা বৎসে, যে সম্বন্ধ মুক্তির দিকে নিয়ে চলে তাকেই শ্রদ্ধা করি। যা বেঁধে রাখে পশুর মতো প্রকৃতির-গড়া প্রবৃত্তির বন্ধনে বা মানুষের-গড়া দাসত্বের শৃঙ্খলে ধিক্ তাকে। পুরুষ কর্ম করে, স্ত্রী শক্তি দেয়। মুক্তির রথ কর্ম, মুক্তির বাহন শক্তি। সুষমা, ধনে তোমার লোভ নেই, তাই ধনে তোমার অধিকার। তুমি সন্ন্যাসীর শিষ্যা, তাই রাজার গৃহিণীপদে তোমার পূর্ণতা। (ডান হাতে সোমশংকরের ডান হাত ধরে)

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

ওঠো তুমি যশোলাভ করো। শত্রুদের জয় করো— যে রাজ্য অসীম সমৃদ্ধিবান তাকে ভোগ করো। বৎস, আমার সঙ্গে আবৃত্তি করো প্রণামের মন্ত্র।

নমঃ পুরস্তাদ্ অথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥

তোমাকে নমস্কার সম্মুখ থেকে, তোমাকে নমস্কার পশ্চাৎ থেকে, হে সর্ব, তোমাকে নমস্কার সর্ব দিক থেকে। অনন্তবীর্য তুমি, অমিতবিক্রম তুমি, তোমাতেই সর্ব, তুমিই সর্ব!

ক্ষণকালের জন্য যবনিকা পড়ে তখনই উঠে গেল। তখন রাত্রি, আকাশে তারা দেখা যায়। সুষমা ও তার বন্ধু নন্দা।

সুষমা। এইবার সেই গানটা গা দেখি ভাই।

গান

নন্দা

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়,
তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে-ধন হারায়েছি আমি
পেয়েছি আঁধার রাতে।
না দেখিবে তারে পরশিবে না গো,
তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো,
তারায় তারায় রবে তারি বাণী,
কুসুমে ফুটিবে প্রাতে ॥
তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল
বীণাবাদিনীর শতদলদলে
করিছে সে টলমল।
মোর গানে গানে পলকে পলকে
ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে,
শান্ত হাসির করুণ আলোক
ভাতিছে নয়নপাতে ॥

পুরন্দরের প্রবেশ

সুষমা। (ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে) প্রভু, দুর্বল আমি। মনের গোপনে যদি পাপ থাকে ধুয়ে দাও, মুছে দাও। আসক্তি দূর হোক, জয়যুক্ত হোক তোমার বাণী।

পুরন্দর। বৎসে, নিজেকে নিন্দা কোরো না, অবিশ্বাস কোরো না, নাত্মানমবসাদয়েৎ। ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। আজ তোমার মধ্যে সত্যের আবির্ভাব হয়েছে মাধুর্যে, কাল সেই সত্য অনাবৃত করবে আপন জগজ্জয়িনী বীরশক্তি।

সুষমা। আজ সন্ধ্যায় এইখানে তোমার প্রসন্নদৃষ্টির সামনে আমার নূতন জীবন আরম্ভ হল। তোমারই পথ হোক আমার পথ।

পুরন্দর। তোমাদের কাছ থেকে দূরে যাবার সময় আসন্ন হয়েছে।

সুষমা। দয়া করো প্রভু, ত্যাগ কোরো না আমাকে! নিজের ভার আমি নিজে বহন করতে পারব না। তুমি চলে গেলে আমার সমস্ত শক্তি যাবে তোমারই সঙ্গে।

পুরন্দর। আমি দূরে গেলেই তোমার শক্তি তোমার মধ্যে ধ্রুবপ্রতিষ্ঠিত হবে। আমি তোমার হৃদয়দ্বার খুলে দিয়েছি নিজে স্থান নেব বলে নয়। যিনি আমার ব্রতপতি তিনি সেখানে স্থান গ্রহণ করুন। আমার দেবতা হোন তোমারই দেবতা, দুঃখকে ভয় নেই, আনন্দিত হও আত্মজয়ী আপনারই মধ্যে।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সোমশংকরের মহত্ত্ব তুমি আপন অন্তরের থেকে চিনতে পেরেছ?

সুষমা। পেরেছি।

পুরন্দর। সেই দুর্লভ মহত্ত্বকে তোমার দুর্লভ সেবার দ্বারা মূল্যদান করে গৌরবান্বিত করবে, তার বীর্যকে সর্বোচ্চ সার্থকতার দিকে আনন্দে উন্মুখ রাখবে, এই নারীর কাজ; মনে রেখো, তোমার দিকে তাকিয়ে সে যেন নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারে— এই কথাটি ভুলো না।

সুষমা। কখনো ভুলব না।

পুরন্দর। প্রাণকে নারী পূর্ণতা দেয়, এইজন্যেই নারী মৃত্যুকেও মহীয়ান করতে পারে, তোমার কাছে এই আমার শেষ কথা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চৌরঙ্গি-অঞ্চলের বাঁশরিদের বাড়ি। ক্ষিতীশ ও বাঁশরি

ক্ষিতীশ। তোমার হিন্দুস্থানী শোফারটা ভোরবেলা মুহুর্মুহু বাজাতে লাগল গাড়ির ভেঁপু। চেনা আওয়াজ, ধড়ফড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লুম।

বাঁশরি। ভোরবেলায় ? অর্থাৎ ?

ক্ষিতীশ। অর্থাৎ আটটার কম হবে না।

বাঁশরি। অকালবোধন !

ক্ষিতীশ। দুঃখ নেই, তবু জানতে চাই কারণটা। কোনো কারণ না থাকলেও নালিশ করব না।

বাঁশরি। বুঝিয়ে বলছি। লেখবার বেলায় নলিনাক্ষের দল বলে যাদের দাগা দিয়েছ তাদের সামনে এলেই দেখি তোমার মন যায় এতটুকু হয়ে। মনে মনে চেঁচিয়ে নিজেকে বোঝাতে থাক— ওরা তো ডেকোরেটেড ফুল্‌স্‌। কিন্তু, সেই স্বগতোক্তিতে সংকোচ চাপা পড়ে না। সাহিত্যিক আভিজাত্যবোধকে অন্তরের মধ্যে ফাঁপিয়ে তোল তবু নিজেকে ওদের সমান বহরে দাঁড় করাতে পার না। সেই চিত্তবিক্ষেপ থেকে বাঁচাবার জন্য নলিনাক্ষ-দলের দিন আরম্ভ হবার পূর্বেই তোমাকে ডাকিয়েছি। সকালবেলায় অন্তত নটা পর্যন্ত আমাদের এখানে রাতের উত্তরাকাণ্ড। আপাতত এ বাড়িটা সাহারা মরুভূমির মতো নির্জন।

ক্ষিতীশ। ওয়েসিস দেখতে পাচ্ছি এই ঘরটার সীমানায়।

বাঁশরি। ওগো পথিক, ওয়েসিস নয়, ভালো করে যখন চিনবে তখন বুঝবে মরীচিকা।

ক্ষিতীশ। আমার মাথায় আরো উপমা আসছে বাঁশি, আজ তোমার সকালবেলাকার অসজ্জিত রূপ দেখাচ্ছে যেন সকালবেলাকার অলস চাঁদের মতো।

বাঁশরি। দোহাই তোমার, গদ্‌গদ ভাবটা রেখে দিয়ো একলা-ঘরের বিজনবিরহের জন্য। মুগ্ধ দৃষ্টি তোমাকে মানায় না। কাজের জন্য ডেকেছি, বাজে কথা স্ট্রিক্টলি প্রোহিবিটেড।

ক্ষিতিশ। এর থেকে ভাষার রেলেটিভিটি প্রমাণ হয়। আমার পক্ষে যা মর্মান্তিক জরুরি তোমার পক্ষে তা ঝেঁটিয়ে-ফেলা বাজে।

বাঁশরি। আজ সকালে এই আমার শেষ অনুরোধ, গাঁজিয়ে-ওঠা রসের ফেনা দিয়ে তাড়িখানা বানিয়ো না নিজের ব্যবহারটাকে। আর্টিস্টের দায়িত্ব তোমার।

ক্ষিতিশ। আচ্ছা, তবে মেনে নিলুম দায়িত্ব।

বাঁশরি। সাহিত্যিক, হতাশ হয়ে পড়েছি তোমার অসাড়তা দেখে। নিজের চক্ষে দেখলে একটা আসন্ন ট্র্যাজেডির সংকেত— আগুনের সাপ ফণা ধরেছে— এখনো চেতিয়ে উঠল না তোমার কলম, আমার তো কাল সারারাত্রি ঘুম হল না। এমন লেখা লেখবার শক্তি কেন আমাকে দিলেন না বিধাতা, যার অক্ষরে অক্ষরে ফেটে পড়ত রক্তবর্ণ আগুনের ফোয়ারা। দেখতে পাচ্ছি আর্টিস্টের চোখে, বলতে পারছি না আর্টিস্টের কণ্ঠে। ব্রহ্মা যদি বোবা হতেন তা হলে অসৃষ্ট বিশ্বের ব্যথায় মহাকাশের বুক যেত ফেটে।

ক্ষিতিশ। কে বলে তুমি প্রকাশ করতে পার না বাঁশি, তুমি নও আর্টিস্ট্‌ ! তুমি যেন হীরেমুক্তোর হরির লুঠ দিচ্ছ। কথায় কথায় তোমার শক্তির প্রমাণ ছড়াছড়ি যায়, দেখে ঈর্ষা হয় মনে।

বাঁশরি। আমি যে মেয়ে, আমার প্রকাশ ব্যক্তিগত। বলবার লোককে প্রত্যক্ষ পেলে তবেই বলতে পারি। কেউ নেই তবু বলা— সেই বলা তো চিরকালের। আমাদের বলা নগদ বিদায়, হাতে হাতে, দিনে দিনে। ঘরে ঘরে মুহূর্তে মুহূর্তে সেগুলো ওঠে আর মেলায়।

ক্ষিতিশ। পুরুষ আর্টিস্ট্‌কে এবার মেরেছ ঠেলা আচ্ছা বেশ, কাজ আরম্ভ হোক। সেদিন বলেছিলে একটা চিঠির কথা।

বাঁশরি। এই সেই চিঠি। সন্ন্যাসী বলছেন— প্রেমে মানুষের মুক্তি সর্বত্র। কবিরা যাকে বলে ভালোবাসা সেইটাই বন্ধন। তাতে একজন মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে নিবিড় স্বাতন্ত্র্যে অতিকৃত করে ; প্রকৃতি রঙিন মদ ঢেলে দেয় দেহের পাত্রে, তাতে যে মাতলামি তীব্র হয়ে ওঠে তাকে অপ্রমত্ত সত্যবোধের চেয়ে বেশি সত্য বলে ভুল হয়। খাঁচাকেও পাখি ভালোবাসে যদি তাকে আফিমের নেশার বশ করা যায়। সংসারের যত দুঃখ, যত বিরোধ, যত বিকৃতি সেই মায়া নিয়ে যাতে শিকলকে করে লোভনীয়। কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যে চিনতে যদি চাও তবে বিচার করে দেখো কোন্‌টাতে ছাড়া দেয় আর কোন্‌টা রাখে বেঁধে। প্রেমে মুক্তি, ভালোবাসায় বন্ধন।

ক্ষিতিশ। শুনলেম চিঠি, তার পরে ?

বাঁশরি। তার পরে তোমার মাথা ! অর্থাৎ তোমার কল্পনা। মনে মনে শুনতে পাচ্ছ না ? শিষ্যকে বলছেন, ভালোবাসা আমাকে নয়, অন্য কাউকেও নয়। নির্বিশেষ প্রেম, নির্বিকার আনন্দ, নিরাসক্ত আত্মনিবেদন, এই হল দীক্ষামন্ত্র।

ক্ষিতিশ। তা হলে এর মধ্যে সোমশংকর আসে কোথা থেকে।

বাঁশরি। প্রেমের সরকারী রাস্তায়, যে প্রেমে সকলেরই সমান অধিকার খোলা হাওয়ার মতো। তুমি লেখকপ্রবর, তোমার সামনে সমস্যাটা এই যে, খোলা হাওয়ায় সোমশংকরের পেট ভরবে কি।

ক্ষিতিশ। কী জানি। সূচনায় তো দেখতে পাচ্ছি শূন্যপুরাণের পালা।

বাঁশরি। কিন্তু, শূন্যে এসে কি ঠেকতে পারে কিছু। শেষ মোকামে তো পৌঁছল গাড়ি, এ-পর্যন্ত রথ চালিয়ে এলেন সন্ন্যাসীসারথি ! আড্ডা-বদলের সময় যখন একদিন আসবে তখন লাগাম পড়বে কার হাতে। সেই কথাটা বলো না রিয়লিস্‌ট্‌ ?

ক্ষিতিশ। যাকে ওঁরা নাক সিটকে প্রকৃতি বলেন, সেই মায়াবিনীর হাতে। পাখা নেই অথচ আকাশে উড়তে চায় যে স্থূল জীবটা তাকে যিনি ধপ্‌ করে মাটিতে ফেলে চট্‌কা দেন ভাঙিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে লাগিয়ে দেন ধুলো।

বাঁশরি। প্রকৃতির সেই বিদ্রূপটাকেই বর্ণনা করতে হবে তোমাকে। ভবিতব্যের চেহারাটা জোর কলমে দেখিয়ে দাও। বড়ো নিষ্ঠুর। সীতা ভাবলেন, দেবচরিত্র রামচন্দ্র উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে ; শেষকালে মানবপ্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে আগুনে পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজ্‌ম্‌, নোঙরামিকে নয়। লেখো লেখো, দেরি কোরো না, লেখো এমন ভাষায় যা হৃৎপিণ্ডের শিরাছেঁড়া ভাষা। পাঠকেরা চমকে উঠে দেখুক, এতদিন পরে বাংলার দুর্বল সাহিত্যে এমন একটা লেখা ফেটে বেরোল যা ঝোড়ো মেঘের বুকভাঙা সূর্যাস্তের রাগী আলোর মতো।

ক্ষিতিশ। ইস্‌, তোমার মনটা নেমেছে ভল্‌ক্যানোর জঠরাগ্নির মধ্যে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ওদের অবস্থায় পড়লে কী করতে তুমি।

বাঁশরি। সন্ন্যাসীর উপদেশ সোনার জলে বাঁধানো খাতায় লিখে রাখতুম। তার পরে প্রবৃত্তির জোর কলমে তার প্রত্যেক অক্ষরের উপর দিতুম কালির আঁচড় কেটে। প্রকৃতি জাদু লাগায় আপন মন্ত্রে, সন্ন্যাসীও জাদু করতেই চায় উলটো মন্ত্রে। ওর মধ্যে একটা মন্ত্র নিতুম মাথায়, আর-একটা মন্ত্রে প্রতিদিন প্রতিবাদ করতুম হৃদয়ে।

ক্ষিতিশ। এখন কাজের কথা পাড়া যাক। ইতিহাসের গোড়ার দিকটায় ফাঁক রয়েছে। ওদের বিবাহসম্বন্ধ সন্ন্যাসী ঘটাল কী উপায়ে।

বাঁশরি। প্রথমত সেনবংশ যে ক্ষত্রিয়, সেনানী শব্দ থেকে তার পদবীর উদ্ভব, ওরা যে কোনো-কএ খ্রীস্ট-শতাব্দীতে এসেছিল কোনো-এক দক্ষিণপ্রদেশ থেকে দিগ্‌বিজয়ীবাহিনীর পতাকা নিয়ে বাংলার কোনো-এক বিশেষ বিভাগে, সেইটে প্রমাণ করে লিখল এক সংস্কৃত পুঁথি। কাশীর দ্রাবিড়ী পণ্ডিত করলে তার সমর্থন। সন্ন্যাসী স্বয়ং গেল সোমশংকরদের রাজ্যে। প্রজারা হাঁ করে রইল ওর চেহারা দেখে ; কানাকানি করতে লাগল, কোনো-একটা দেব-অংশের ঝালাই দিয়ে এর্‌ দেহখানা তৈরি। সভাপণ্ডিত মুগ্ধ হল শৈবদর্শনব্যাখ্যায়। রাজাবাহাদুরের মনটা সাদা, দেহটা জোরালো, তাতে লাগল

কিছু সন্ন্যাসীর মন্ত্র, কিছু লাগল প্রকৃতির মোহ। তার পরে এই যা দেখছ।

ক্ষিতিশ। হায় রে, সন্ন্যাসী কি আমাদের মতো অভাজনদের হয়ে স্থূল প্রকৃতির তরফে ঘটকালি করেন না।

বাঁশরি। রাখো তোমার ছিবলেমি। ভুল করেছি তোমাকে নিয়ে। যে মানুষ খাঁটি লিখিয়ে তার সামনে যখন দেখা দিয়েছে সৃষ্টিকল্পনার এমন একটা জীবন্ত আদর্শ দব্ দব্ করছে যার নাড়ি, তার মুখ দিয়ে কি বেরোয় খেলো কথা। কেমন করে জাগাব তোমাকে। আমি যে প্রত্যক্ষ দেখছি একটা মহারচনার পূর্বরাগ, শুনছি তার অন্তহীন নীরস কান্না। দেখতে পাচ্ছ না অদৃষ্টের একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ ? থাক্ গে, শেষ হল আমার কথা। তোমার খাবার পাঠিয়ে দিতে চললুম।

প্রস্থানোদ্যম

ক্ষিতিশ। (ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরে) চাই নে খাবার। যেয়ো না তুমি।

বাঁশরি। (হাত ছিনিয়ে নিয়ে উচ্চহাস্যে) তোমার 'বেমানান' গল্পের নায়িকা পেয়েছ আমাকে ! আমি ভয়ংকর সত্যি।

ড্রেসিং-গাউন-পরা সতীশের প্রবেশ

সতীশ। উচ্চহাসির আওয়াজ শুনলুম যে।

বাঁশরি। উনি এতক্ষণ স্টেজের মুনুবাবুর নকল করছিলেন।

সতীশ। ক্ষিতীশবাবুর নকল আসে নাকি।

বাঁশরি। আসে বৈকি, ওঁর লেখা পড়লেই টের পাওয়া যায়। তুমি এঁর কাছে একটু বোসো, আমি ওঁর জন্য খাবার পাঠিয়ে দিইগে।

ক্ষিতীশ। দরকার নেই, কাজ আছে, দেরি করতে পারব না।

[প্রস্থান

বাঁশরি। মনে থাকে যেন আজ বিকালে সিনেমা—তোমারই 'পদ্মাবতী'।

ক্ষিতীশ। (নেপথ্য হতে) সময় হবে না।

বাঁশরি। হবেই সময়, অন্য দিনের চেয়ে দু-ঘণ্টা আগে।

সতীশ। আচ্ছা বাঁশি, ঐ ক্ষিতীশের মধ্যে কি দেখতে পাও বলো তো।

বাঁশরি। বিধাতা ওকে যে পরীক্ষার কাগজটা দিয়েছিলেন, দেখতে পাই তার উত্তরটা। আর দেখি তারই মাঝখানে পরীক্ষকের একটা মস্ত কাটা দাগ।

সতীশ। এমন ফেল-করা জিনিস নিয়ে করবে কি।

বাঁশরি। ডান হাত ধরে ওকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে দেব।

সতীশ। তার পরে বাঁ হাত দিয়ে প্রাইজ দেবার প্ল্যান আছে নাকি।

বাঁশরি। দিলে পরের ছেলের প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হবে।

সতীশ। ঘরের ছেলের প্রতিও। এ দিকে ও মহলের হাল খবরটা শুনেছ ?

বাঁশরি। ও মহলের খবর এ মহলে এসে পৌঁছয় না। হাওয়া বইছে উলটো দিকে।

সতীশ। কথা ছিল সুষমার বিয়ে হবে মাস খানেক বাদে, সম্প্রতি স্থির হয়েছে আসছে হপ্তায়।

বাঁশরি। হঠাৎ দম এত দ্রুতবেগে চড়িয়ে দিলে যে ?

সতীশ। ওদের হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠেছে দ্রুতবেগে, হঠাৎ দেখেছে তোমাকে রণরঙ্গিনী বেশে। তোমার তীর ছোটার আগেই ছুটে বেরিয়ে পড়তে চায়— এইরকম আন্দাজ।

বাঁশরি। আমার তীর ! আধমরা প্রাণীকে আমি ছুঁই নে। বনমালী, মোটর ডাকো।

[বাঁশরির প্রস্থান

শৈলর প্রবেশ

বয়স বাইশ কিন্তু দেখে মনে হয়, ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে। তনু দেহ শ্যামবর্ণ, চোখের ভাব স্নিগ্ধ, মুখের ভাব মমতায় ভরা।

সতীশ। কী আশ্চর্য। ভোরের স্বপ্নে আজ তোমাকেই দেখেছি, শৈল। তুমিও আমাকে দেখেছ নিশ্চয়।

শৈল। না, দেখি নি তো।

সতীশ। আঃ, বানিয়ে বলো-না কেন। বড়ো নিষ্ঠুর তুমি। আমার দিনটা মধুর হয়ে উঠত তা হলে।

শৈল। তোমাদের ফরমাশে নিজেকে স্বপ্ন করে বানাতে হবে! আমরা যা, শুধু তাই নিয়ে তোমাদের মন খুশি হয় না কেন।

সতীশ। খুব হয়, এই-যে সাক্ষাৎ এসেছ এর চেয়ে আর কিসের দরকার।

শৈল। আমি এসেছি বাঁশরির কাছে।

সতীশ। ঐ দেখো, আবার একটা সত্য কথা। সদ্য বিছানা থেকে উঠেই দু-দুটো খাঁটি সত্য কথা সহ্য করি এত মনের জোর নেই। ধর্মরাজ মাপ করতেন তোমাকে যদি বলতে আমারই জন্য এসেছ।

শৈল। ব্যারিস্টার মানুষ, তুমি বড্ড লিটরল। বাঁশরির কাছে আসতে চেয়েছি বলে তোমার কাছে আসবার কথা মনে ছিল না এটা ধরে নিলে কেন।

সতীশ। খোঁটা দেবার জন্যে। বাঁশির সঙ্গে কথা আছে কিছু? আমাদের লগ্ন স্থির করবার পরামর্শ?

শৈল। না, কোনো কথা নেই। ওর জন্য বড়ো মন খারাপ হয়ে থাকে। মনের মধ্যে মরণবাণ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অথচ কবুল করবার মেয়ে নয়। ওর ব্যথায় হাত বুলোতে গেলে ফোঁস করে ওঠে, সেটা যেন সাপের মাথার মণি। তাই সময় পেলে কাছে এসে বসি, যা তা বকে যাই। পরশুদিন সকালে এসেছিলুম ওর ঘরে। পায়ের শব্দ পায় নি। ওর সামনে এক বাণ্ডিল চিঠি। ডেস্কে ঝুঁকে পড়ছিল বসে, বেশ বুঝতে পারলুম চোখ দিয়ে জল পড়ছে। যদি জানত আমি দেখতে পেয়েছি তা হলে একটা কাণ্ড বাধত, বোধ হয় আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত। আস্তে আস্তে চলে গেলুম। কিন্তু, সেই ছবি আমি ভুলতে পারি নে। বাঁশি গেল কোথায়।

খানসামা চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল

সতীশ। বাঁশি এইমাত্র বেরিয়ে গেছে, ভাগ্যিস গেছে।

শৈল। ভারি স্বার্থপর তুমি।

সতীশ। অত্যন্ত। ও কী, উঠছ কেন। চা তৈরি শুরু করো।

শৈল। খেয়ে এসেছি।

সতীশ। তা হোক-না, আমি তো খাই নি। বসে খাওয়াও আমাকে। কবিরাজী মতে একলা চা খাওয়া নিষেধ, ওতে বায়ু প্রকুপিত হয়ে ওঠে।

শৈল। মিথ্যে আবদার কর কেন।

সতীশ। সুযোগ পেলেই করি, তোমার মতো খাঁটি সত্য আমার ধাতে নেই। ঢালো চা, ও কী করলে, চায়ে আমি চিনি দিই নে তুমি জান।

শৈল। ভুলে গিয়েছিলুম।

সতীশ। আমি হলে কখনো ভুলতুম না।

শৈল। আমাকে স্বপ্ন দেখে অবধি তোমার মেজাজের তো কোনো উন্নতি হয় নি। ঝগড়া করছ কেন।

সতীশ। কারণ মিষ্টি কথা পাড়লে তুমিই ঝগড়া বাধাতে। সীরিয়স হয়ে উঠতে।

শৈল। আচ্ছা থামো, তোমার চা খাওয়া হল?

সতীশ। হলেই যদি ওঠ তা হলে হয় নি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। হরিশবাবু দলিলপত্র নিয়ে এসেছেন।

সতীশ। বলো ফুর্‌সত নেই। [ভৃত্যের প্রস্থান

শৈল। ও কী ও, কাজ কামাই করবে!

সতীশ। করব, আমার খুশি।

শৈল। আমি যে দায়ী হব।

সতীশ। তাতে সন্দেহ নেই, বিনা কারণে কেউ কাজ কামাই করে না।

নেপথ্য থেকে। সতীশদা!

সতীশ। ঐ রে! এল ওরা! বাড়িতে নেই বলবার সময় দিলে না।

সুধাংশুর সঙ্গে একদল লোকের প্রবেশ

অলক্ষুণের দল, সকালবেলায় মুখ দেখলুম, উননের উপর হাঁড়ির তলা যাবে ফেটে।

সুধাংশু। মিস্ শৈল, ভীরু তোমার আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু আজ ছাড়ছি নে।

সতীশ। ভয় দেখাও কেন। চাও কী।

শচীন। চাই লক্ষ্মীছাড়া ক্লাবের চাঁদা। প্রথম দিন থেকেই বাকি।

সতীশ। কী। আমি তোমাদের দলে! ভিগরস্ প্রোটেস্ট জানাচ্ছি, বলবান অস্বীকৃতি।

নরেন্দ্র। দলিল দেখাও।

সতীশ। আমার দলিল এই সামনে সশরীরে।

সুধাংশু। শৈলদেবী, এই বুঝি! বে-আইনি প্রশ্রয় দেন পলাতকাকে।

শৈল। কিছু প্রশ্রয় দিই নে, নিন-না আপনাদের দাবি আদায় করে।

সতীশ। শৈল, যত তোমার সত্য আমার বেলায়। আর, এদের সামনে সত্যের অপলাপ— প্রশ্রয় দেও না বলতে চাও!

শৈল। কী প্রশ্রয় দিয়েছি।

সতীশ। এইমাত্র মাথার দিব্যি দিয়ে আমাকে চা খাওয়াতে বস নি? শ্রীহস্তে অজীর্ণ রোগের পত্তন আরম্ভ, তবু আমাকে বলে লক্ষ্মীছাড়া!

শচীন। লোকটা লোভ দেখিয়ে কথা বলছে। শৈলদেবী, যদি শক্ত হয়ে থাকতে পার তা হলে ওকে আমাদের লাইফ-মেম্বর করে নিই।

সতীশ। আচ্ছা, তবে বলি শোনো। চাঁদা পাবা মাত্র যদি পাড়া ছেড়ে দৌড় মার তা হলে এখনই বাকি-বকেয়া সব শোধ করে দিই।

শচীন। শুধু চাঁদা নয়। আমাদের ঘরে নেই চা ঢেলে দেবার লোক, যাদের ঘরে আছে সেখানে পালা করে চা খেতে বেরোই—তার পরে কিছু ভিক্ষে নিয়ে যাই— আজ এসেছি বাঁশরিদেবীর করকমল লক্ষ্য করে।

সতীশ। সৌভাগ্যক্রমে সেই দেবী তার করকমলসুদ্ধ অনুপস্থিত। অতএব ঘড়ি ধরে ঠিক পাঁচ মিনিটের নোটিশ দিচ্ছি, বেরোও তোমরা— ভাগো।

শৈল। আহা, ও কী কথা। না খেয়ে যাবেন কেন। আমি বুঝি পারি নে খাওয়াতে? একটু বসুন, সব ঠিক করে দিচ্ছি। [শৈলের প্রস্থান

সতীশ। কিন্তু, ঐ যে ভিক্ষার কথাটা বললে, ভালো ঠেকল না। উদ্দেশ্যও বুঝতে পারছি নে।

সুধাংশু। কিংখাবের দোকানে আমাদের সমবেত দেনা আছে, আজ সমবেত চেষ্টায় শোধ করতে হবে।

সতীশ। কিংখাব! ভাবী লক্ষ্মীর আসন-রচনা?
শচীন। ঠিক তাই।
সতীশ। আশ্চর্য দূরদর্শিতা—
শচীন। না হে, অদূরদর্শিতা প্রমাণ করে দেব অবিলম্বে।

শৈলের প্রবেশ

শৈল। সব প্রস্তুত, আসুন আপনারা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বারান্দায় সোমশংকর। গহনার বাক্স খুলে জহুরি গহনা দেখাচ্ছে। কাপড়ের গাঁঠরি নিয়ে অপেক্ষা করছে কাশ্মীরী দোকানদার।

বাঁশরি। কিছু বলবার আছে।

সোমশংকর জহুরি ও কাশ্মীরীকে ইঙ্গিতে বিদায় করলে।

সোমশংকর। ভেবেছিলুম আজই যাব তোমার কাছে।

বাঁশরি। ও-সব কথা থাক্। ভয় নেই, কান্নাকাটি করতে আসি নি। তবু আর কিছু না হোক তোমার ভাবনা ভাববার অধিকার একদিন দিয়েছ আমাকে। তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— জান সুষমা তোমাকে ভালোবাসে না?

সোমশংকর। জানি।

বাঁশরি। তাতে তোমার কিছুই যায় আসে না।

সোমশংকর। কিছুই না।

বাঁশরি। তা হলে সংসারযাত্রাটা কিরকম হবে।

সোমশংকর। সংসারযাত্রার কথা ভাবছিই নে।

বাঁশরি। তবে কিসের কথা ভাবছ।

সোমশংকর। একমাত্র সুষমার কথা।

বাঁশরি। অর্থাৎ ভাবছ, তোমাকে ভালো না বেসেও কী করে সুখী হবে ঐ মেয়ে।

সোমশংকর। না, তা নয়। সুখী হবার কথা সুষমা ভাবে না— ভালোবাসারও দরকার নেই তার।

বাঁশরি। কিসের দরকার আছে তার, টাকার?

সোমশংকর। তোমার যোগ্য কথা হল না, বাঁশি।

বাঁশরি। আচ্ছা, ভুল করেছি। কিন্তু, প্রশ্নটার উত্তর বাকি। কিসের দরকার আছে সুষমার।

সোমশংকর। ওর একটি ব্রত আছে। ওর জীবনে সমস্ত দরকার তাই নিয়ে, তাকে সাধ্যমত সার্থক করা আমারও ব্রত।

বাঁশরি। ওর ব্রত আগে, তারই পশ্চাতে তোমার— পুরুষের মতো শোনাচ্ছে না, এ কথা ক্ষত্রিয়ের মতো নয়ই। এতবড়ো পুরুষকে মন্ত্র পড়িয়েছে ঐ সন্ন্যাসী। বুদ্ধিকে দিয়েছে ঘোলা করে, দৃষ্টিকে দিয়েছে চাপা। শুনলুম সব, ভালো হল। গেল আমার শ্রদ্ধা ভেঙে, গেল আমার বন্ধন ছিঁড়ে। বয়স্ক শিশুকে মানুষ করবার কাজ আমার নয়, সে-কাজের ভার সম্পূর্ণ দিলেম ছেড়ে ঐ মেয়ের হাতে।

পুরন্দরের প্রবেশ

সোমশংকর প্রণাম করলে, অগ্নিশিখার মতো বাঁশরি উঠে দাঁড়াল তার সামনে।

বাঁশরি। আজ রাগ করবেন না; ধৈর্য ধরবেন, কিছু প্রশ্ন করব।

[পুরন্দরের ইঙ্গিতে সোমশংকরের প্রস্থান

পুরন্দর। আচ্ছা, বলো তুমি।

বাঁশরি। জিজ্ঞাসা করি, সোমশংকরকে শ্রদ্ধা করেন আপনি ? ওকে খেলার পুতুল বলে মনে করেন না ?

পুরন্দর। বিশেষ শ্রদ্ধা করি।

বাঁশরি। তবে কেন এমন মেয়ের ভার দিচ্ছেন ওর হাতে যে ওকে ভালোবাসে না।

পুরন্দর। জান না এ অতি মহৎ ভার, একই কালে ক্ষত্রিয়ের পুরস্কার এবং পরীক্ষা। সোমশংকরই এই ভার গ্রহণ করবার যোগ্য।

বাঁশরি। যোগ্য বলেই ওর চিরজীবনের সুখ নষ্ট করতে চান আপনি ?

পুরন্দর। সুখকে উপেক্ষা করতে পারে ঐ বীর মনের আনন্দে।

বাঁশরি। আপনি মানবপ্রকৃতিকে মানেন না ?

পুরন্দর। মানবপ্রকৃতিকেই মানি, তার চেয়ে নীচের প্রকৃতিকে নয়।

বাঁশরি। এতই যদি হল, ওরা বিয়ে নাই করত ?

পুরন্দর। ব্রতকে নিষ্কামভাবে পোষণ করবে মেয়ে, ব্রতকে নিষ্কামভাবে প্রয়োগ করবে পুরুষ, এই কথা মনে করে দুটি মেয়ে-পুরুষ অনেকদিন খুঁজেছি। দৈবাৎ পেয়েছি।

বাঁশরি। পুরুষ বলেই বুঝতে পারছ না যে, ভালোবাসা নইলে দুজন মানুষকে মেলানো যায় না।

পুরন্দর। মেয়ে বলেই বুঝতে ইচ্ছা করছ না, ভালোবাসার মিলনে মোহ আছে, প্রেমের মিলনে মোহ নেই।

বাঁশরি। মোহ চাই, চাই ; সন্ন্যাসী, মোহ নইলে সৃষ্টি কিসের। তোমার মোহ তোমার ব্রত নিয়ে— সেই ব্রতের টানে তুমি মানুষের মনগুলো নিয়ে কেটে ছিঁড়ে জোড়াতাড়া দিতে বসেছ— বুঝতেই পারছ না তারা সজীব পদার্থ, তোমার প্ল্যানের মধ্যে খাপ-খাওয়াবার জন্য তৈরি হয় নি। আমাদের মোহ সুন্দর, আর ভয়ংকর তোমাদের মোহ।

পুরন্দর। মোহ নইলে সৃষ্টি হয় না, মোহ ভাঙলে প্রলয়, এ কথা মানতে রাজি আছি। কিন্তু, তুমিও এ কথা মনে রেখো, আমার সৃষ্টি তোমার সৃষ্টির চেয়ে অনেক উপরে। তাই আমি নির্মম হয়ে তোমার সুখ দেব ছারখার করে। আমিও চাইব না সুখ ; যারা আসবে আমার কাছে সুখের দিক থেকে, মুখ দেব ফিরিয়ে। আমার ব্রতই আমার সৃষ্টি, তার যা প্রাপ্য তা তাকে দিতেই হবে। যতই কঠিন হোক।

বাঁশরি। সেইজন্যেই সজীব নয় তোমার আইডিয়া, সন্ন্যাসী। তুমি জান মন্ত্র, জান না মানুষকে। মানুষের মর্মগ্রন্থি টেনে ছিঁড়ে সেইখানে তোমার কেঠো আইডিয়ার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে অসহ্য ব্যথার 'পরে মস্ত মস্ত বিশেষণ চাপা দিতে চাও। তাকে বল শান্তি ? টিকবে না ব্যাণ্ডেজ, ব্যথা যাবে থেকে। তোমরা সব অমানুষ, মানুষের বসতিতে এলে কী করতে। যাও-না তোমাদের গুহাগহ্বরে বদরিকাশ্রমে। সেখানে মনের সাধে নিজেদের শুকিয়ে পাথর করে ফেলো। আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের তৃষ্ণার জল মুখের থেকে কেড়ে নিয়ে মরুভূমিতে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে সাধনা বলে প্রচার করতে চাও কোন্ করুণায়। ব্যর্থজীবনের অভিশাপ লাগবে না তোমাকে ? যা নিজে ভোগ করতে জান না তা ভোগ করতে দেবে না ক্ষুধিতকে ?

সুষমার প্রবেশ

এই যে সুষমা, শোন্ বলি। মরিয়া হয়ে মেয়েরা চিতার আগুনে মরেছে অনেক, ভেবেছে তাতেই পরমার্থ। তেমনি করেই নিজের হাতে নিজের ভাগ্যে আগুন লাগিয়ে দিনে দিনে মরতে চাস জ্বলে জ্বলে ? চাস নে তুই ভালোবাসা, কিন্তু যে-মেয়ে চায়, পাষাণ সে করে নি আপন নারীর প্রাণ, কেন কেড়ে নিতে এলি তার চিরজীবনের আনন্দ। এই আমি আজ বলে দিলুম তোকে, ঘোড়ায় চড়িস, শিকার করিস, সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিস, তবু তুই পুরুষ নোস। আইডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তোর দিন কাটবে না গো, তোর রাত বিছিয়ে দেবে কাঁটার শয়ন।

সোমশংকরের প্রবেশ

সোমশংকর। বাঁশি, শান্ত হও, চলো এখান থেকে।

বাঁশরি। যাব না তো কী। মনে কোরো না মরব বুক ফেটে। জীবন হবে চিরচিতানলের শ্মশান। কখনো এমন বিচলিত দশা হয় নি আমার। আজ কেন এল বন্যার মতো এই পাগলামি। লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! তোমাদের তিনজনের সামনে এই অপমান! থামো সোমশংকর, আমাকে দয়া করতে এসো না। মুছে ফেলব এই অপমান, কোনো চিহ্ন থাকবে না এর কাল। এই আমি বলে গেলুম।

[বাঁশরি ও সুষমার প্রস্থান

পুরন্দর। সোমশংকর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

সোমশংকর। বলুন।

পুরন্দর। যে-ব্রত তুমি স্বীকার করেছ তা সম্পূর্ণই তোমার আপন হয়েছে কি। তার ক্রিয়া চলেছে তোমার প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে ?

সোমশংকর। কেন সন্দেহ বোধ করছেন।

পুরন্দর। আমার প্রতি ভক্তিতেই যদি এই সংকল্প গ্রহণ করে থাক তবে এখনই ফেলে দাও এই বোঝা।

সোমশংকর। এমন কথা কেন বলছেন আজ। আমার মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ কিছু দেখছেন কি ?

পুরন্দর। মোহিনী শক্তি আছে আমার, এমন কথা কেউ কেউ বলে— শুনে লজ্জা পাই ; জাদুকর নই আমি।

সোমশংকর। আত্মার ক্রিয়াকে যারা বিশ্বাস করে না তারা তাকে বলে জাদুর ক্রিয়া।

পুরন্দর। ব্রতের মাহাত্ম্য তার স্বাধীনতায়। যদি ভুলিয়ে থাকি তোমাকে, সে-ভুল ভাঙতে হবে। গুরুবাক্য বিষ— সে-বাক্য যদি তোমার নিজের বাক্য না হয়।

সোমশংকর। সন্ন্যাসী, যে-ব্রত নিয়েছি সে আজ আমার রক্তে বইছে তেজরূপে, জ্বলছে বুকের মধ্যে হোমাগ্নির মতো। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, আজ আমার দ্বিধা কোথায়।

পুরন্দর। এই কথাই শুনতে চেয়েছিলুম তোমার মুখ থেকে। আর-একটি কথা বাকি আছে। কেউ কেউ প্রশ্ন করে, কেন সুষমার বিবাহ দিলুম তোমার সঙ্গে। তোমারই কাছ থেকে আমি তার উত্তর চাই।

সোমশংকর। এতদিনের তপস্যায় এই নারীর চিত্তকে তুমি যজ্ঞের অগ্নিশিখার মতো ঊর্ধ্বে জ্বালিয়ে তুলেছ, আমারই 'পরে ভার দিলে এই অনির্বাণ অগ্নিকে চিরদিন রক্ষা করতে।

পুরন্দর। বৎস, যতদিন রক্ষা করবে তার দ্বারা তুমি আপনাকেই রক্ষা করতে পারবে। ঐ তোমার মূর্তিমান ধর্ম, রইল তোমার সঙ্গে— ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতম্। আমার বন্ধন থেকে তুমি মুক্ত, সেইসঙ্গে শিষ্যের বন্ধন থেকে আমিও মুক্তি পেলুম। তোমাদের বিবাহের পর আমাকে যেতে হবে দূরে— হয়তো কোনোদিন আমার আর দেখা পাবে না। আমার এই আশীর্বাদ রইল, জানথ আত্মানম্— আপনাকে পূর্ণ করে জানো।

[পুরন্দরের প্রস্থান। সোমশংকর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল

সোমশংকর। ওরে ভোলা, সেই নতুন গানটা—

গান

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো।
দুন্দুভিতে হল রে কার আঘাত শুরু,
বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু,
পালায় ছুটে সুপ্তিরাতের স্বপ্নে-দেখা মন্দ ভালো।

নিরুদ্দেশের পথিক, আমায় ডাক দিলে কি—
দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই-বা দেখি।
ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া,
ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া,
বজ্রশিখায় এক পলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালো ॥

নেপথ্য থেকে। যেতে পারি কি?

সোমশংকর। এসো এসো।

তারকের প্রবেশ

তারক। রাজাবাহাদুর, আজকাল তোমার কাছে আসতে কিরকম ভয়-ভয় করে।

সোমশংকর। কোনো কারণ তো দেখি নে।

তারক। কারণ নেই বলেই তো ভয় বেশি। আজ বাদে কাল বিয়ে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন দ্বীপান্তরে চলেছ। ভয়ানক গাম্ভীর্য।

সোমশংকর। বিয়েটা তো এক লোক থেকে অন্য লোকে যাত্রাই বটে।

তারক। সব বিয়ে তা নয় রাজন্! নিজের কথা বলতে পারি। আমার বরযাত্রা হয়েছিল পটলডাঙা থেকে চোরবাগানে। মনের ভিতরটাও তার বেশি এগোয় নি। আমার স্ত্রীর নাম পুষ্প। রসিকবন্ধু তার কবিতায় আমাকে খেতাব দিলে পুষ্পচোর। কবিতাটার হেডিং ছিল চৌর-পঞ্চাশিকা। কবিকে প্রশ্ন করলেম, চৌর-পঞ্চাশিকার একটা কবিতাই তো দেখছি, বাকি উনপঞ্চাশটা গেল কোথায়। উত্তর পেলেম, তারা উনপঞ্চাশ পবনরূপে বরের হৃদয়গহ্বরে বেড়াচ্ছে ঘুরপাক দিয়ে।

সোমশংকর। এর থেকে প্রমাণ হয় আমার রসিকবন্ধু নেই, তাই গাম্ভীর্য রয়েছে ঘনিয়ে।

তারক। আমাদের পাড়ার লক্ষ্মীছাড়ার দল অশোক গুপ্তদের বাগানে দর্মা-ঘেরা একটা পোড়ো ফর্নরিতে ক্লাব করেছে। আপিস থেকে ফিরে এসে সেইখানে সন্ধেবেলায় বিষম হল্লা করতে থাকে। সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমরা লক্ষ্মীমন্তরা ওদের নিমন্ত্রণ করছি। তোমাকে প্রিজাইড করতে হবে।

সোমশংকর। শুনেছি বৈকুণ্ঠলুণ্ঠন পাঁচালি লিখে ওরা আমাকে লক্ষ্মীহারী দৈত্য বানিয়েছে।

তারক। সে কথা সত্যি। ওদের টেম্পেরেচর কমানো দরকার হয়েছে।

সোমশংকর। বৈধ উপায়ে ওদের ঠাণ্ডা করতে রাজি আছি।

তারক। আমাদের কমলবিলাস সেনগুপ্তকে দিয়ে একটা নিমন্ত্রণপত্র রচিয়ে নিয়ে এলুম।

সোমশংকর। পড়ে শোনাও।

তারক।

প্রজাপতি যাঁদের সাথে পাতিয়ে আছেন সখ্য,
আর যাঁরা সব প্রজাপতির ভবিষ্যতের লক্ষ্য,
উদরসেবার উদার ক্ষেত্রে মিলুন উভয় পক্ষ,
রসনাতে রসিয়ে উঠুক নানা রসের ভক্ষ্য।
সত্যযুগে দেবদেবীদের ডেকেছিলেন দক্ষ,
অনাহূত পড়ল এসে মেলাই যক্ষ রক্ষ,
আমরা সে-ভুল করব না তো, মোদের অন্নকক্ষ
দুই পক্ষেই অপক্ষপাত দেবে ক্ষুধার মোক্ষ।
আজও যাঁরা বাঁধন-ছাড়া ফুলিয়ে বেড়ান বক্ষ
বিদায়কালে দেব তাঁদের আশিস্ লক্ষ লক্ষ,
তাঁদের ভাগ্যে অবিলম্বে জুটুন কারাধ্যক্ষ,
এর পরে আর মিল মেলে না— য র ল ব হ ক্ষ।

ঐ আসছে ওদের দল।

সুধাংশু শচীন প্রভৃতির প্রবেশ

সোমশংকর। কী উদ্দেশ্যে আগমন।

সুধাংশু। গান শোনাব।

সোমশংকর। তার পরে?

সুধাংশু। তার পরে নোব্‌ল্‌ রিভেঞ্জ, সুমহতী প্রতিহিংসা।

সোমশংকর। ঐ মানুষটার কাঁধে ওটা কী। বোমা নয়?

সুধাংশু। ক্রমশ প্রকাশ্য। এখন গান।

সোমশংকর। কার রচনা।

শচীন। কপিরাইটের তর্ক আছে। বিষয় অনুসারে কপিরাইট-স্বত্ব আমাদেরই, বাক্যগুলি যার তাকে আমরা গণ্য করি নে।

গান

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল
ভবের পদ্মপত্রে জল
সদাই করছি টলোমল,
মোদের আসা-যাওয়া শূন্য হাওয়া,
নাইকো ফলাফল।
নাহি জানি করণ কারণ, নাহি জানি ধরন ধারণ
নাহি মানি শাসন বারণ গো—
আমরা আপন রোখে মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল
লক্ষ্মী তোমার বাহনগুলি ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি,
লুঠুন তোমার চরণধূলি গো—
আমরা স্কন্ধে লয়ে কাঁথা ঝুলি ফিরব ধরাতল।
তোমার বন্দরেতে বাঁধাঘাটে বোঝাই-করা সোনার পাটে
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো,
আমরা নোঙরছেঁড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল।
আমরা এবার খুঁজে দেখি অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভবসাগরে—
যদি সুখ না জোটে দেখব ডুবে কোথায় রসাতল।
আমরা জুটে সারাবেলা করব হতভাগার মেলা,
গাব গান করব খেলা গো,
কণ্ঠে যদি সুর না আসে করব কোলাহল॥

সোমশংকর। এবার কিঞ্চিৎ ফলাহারের আয়োজন করি।

সুধাংশু। আগে দেবী আসুন ঘরে, তার পরে ফল কামনা করব।

সোমশংকর। তৎপূর্বে—

সুধাংশু। তৎপূর্বে সুমহতী প্রতিহিংসা। (গাঁঠরি থেকে কিংখাবের আসন বেরল) লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর ভক্তদের যোগ থাকবে এই আসনটিতে। তোমাদের ঘরের মাটি রইল তোমাদের, তার উপরে আসনটা রইল আমাদেরই। আর তাঁর কমলাসন, সে আছে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে।

সোমশংকর। কী তোমাদের বলব। বলবার কথা আমি জানি নে।

তৃতীয় অঙ্ক

শেষ দৃশ্য

বাঁশরিদের বাড়ি। সতীশ ডেস্কে বসে লিখছে
সুষমার ছোটো বোন সুষীমার প্রবেশ

সতীশ। আমার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতে এসেছিস? বরের মুখ-দেখা বুঝি আজ?

সুষীমা। যাও!

সতীশ। যাও কী। বেশিদিনের কথা নয়, তোর বয়স যখন পাঁচ, মাকে জিজ্ঞাসা করিস, আমাকে বিয়ে করতে তোর কী জেদ ছিল। আমি তোকে সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছিলুম, সেটা ভেঙে ব্রোচ তৈরি হয়েছে।

সুষীমা। সতীশদা, কী বকছ তুমি।

সতীশ। আচ্ছা থাক্ তবে, কী জন্যে এসেছিস।

সুষীমা। দিদির বিয়েতে প্রেজেন্ট্ দেব।

সতীশ। সে তো ভালো কথা। কী দিতে চাস।

সুষীমা। এই চামড়ার থলিটা।

সতীশ। ভালো জিনিস, আমারই লোভ হচ্ছে।

সুষীমা। আমি এসেছি বাঁশিদিদির কাছে।

সতীশ। ওখান থেকে কেউ তোকে পাঠিয়ে দিয়েছে?

সুষীমা। না, লুকিয়ে এসেছি, কেউ জানে না। আমার এই থলির উপরে বাঁশিদিদিকে দিয়ে আঁকিয়ে নেব।

সতীশ। বাঁশিদিদি আঁকতে পারে কে বললে তোকে।

সুষীমা। শংকরদাদা। তাঁর কাছে একটা সিগারেট-কেস আছে সেটা বাঁশিদিদির দেওয়া। তার উপরে একজোড়া পায়রা এঁকেছেন নিজের হাতে চমৎকার!

সতীশ। আচ্ছা, তোর বাঁশিদিদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

বাঁশরির প্রবেশ

বাঁশরি। কী সুষী।

সুষীমা। তোমাকে সতীশদাদা সব বলেছেন?

বাঁশরি। হাঁ বলেছেন। ছবি এঁকে দেব তোর থলির উপর? কী ছবি আঁকব।

সুষীমা। একজোড়া পায়রা, ঠিক যেমন এঁকেছ শংকরদাদার সিগারেট-কেসের উপরে।

বাঁশরি। ঠিক তেমনি করেই দেব। কিন্তু কাউকে বলিস নে যে আমি এঁকে দিয়েছি।

সুষীমা। কাউকে না।

বাঁশরি। তোকেও একটা কাজ করতে হবে, নইলে আমি আঁকব না।

সুষীমা। বলো কী করতে হবে।

বাঁশরি। সেই সিগারেট-কেসটা আমাকে এনে দিতে হবে।

সুষীমা। তাঁর বুকের পকেটে থাকে। কক্‌খনো আমাকে দেবেন না।

বাঁশরি। আমার নাম করে বলিস দিতেই হবে।

সুষীমা। তুমি তাঁকে দিয়েছ আবার ফিরিয়ে নেবে কী করে।

বাঁশরি। তোমার শংকরদাদাও দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নেন।

সুষীমা। কক্‌খনো না।

বাঁশরি। আচ্ছা, তাঁকে জিজ্ঞাসা করিস আমার নাম ক'রে।

সুষীমা। আচ্ছা করব। আমি যাই, কিন্তু ভুলো না আমার কথা।

বাঁশরি। তুইও ভুলিস না আমার কথা, আর নিয়ে যা এক বাক্স চকোলেট, কাউকে বলিস নে আমি দিয়েছি।

সুষীমা। কেন।

বাঁশরি। মা জানতে পারলে রাগ করবেন।

সুষীমা। কেন।

বাঁশরি। যদি তোর অসুখ করে।

সুষীমা। বলব না, কিন্তু খেতে দেব শংকরদাদাকেও।

[সুষীমার প্রস্থান

একখানা খাতা হাতে নিয়ে বাঁশরি সোফায় হেলান দিয়ে বসল

লীলার প্রবেশ

বাঁশরি। দেখ্ লীলা, মুখ গম্ভীর করে আসিস নে ভাই, তা হলে ঝগড়া হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে সান্ত্বনা দেবার কুমতলব আছে, বাদল নামল বলে। দুঃখ আমার সয়, সান্ত্বনা আমার সয় না, সে তোদের জানা। বসেছিলেম গ্রামোফোনে কমিক গান বাজাতে কিন্তু তার চেয়ে কমিক জিনিস নিয়ে পড়েছি।

লীলা। কী বলো তো বাঁশি।

বাঁশরি। ক্ষিতীশের এই গল্পখানা।

লীলা। (খাতাটা তুলে নিয়ে) 'ভালোবাসার নিলাম'— নামটা চলবে বাজারে।

বাঁশরি। বস্তুটাও। এ জিনিসের কাটতি আছে। পড়তে চাস?

লীলা। না ভাই, সময় নেই, বিয়েবাড়ি সাজাবার জন্যে ডাক পড়েছে।

বাঁশরি। আমি কি সাজাতে পারতুম না!

লীলা। আমার চেয়ে অনেক ভালো পারতিস।

বাঁশরি। ডাকতে সাহস হল না! ভীরু ওরা।

লীলা। তা নয়, লজ্জা হল, কী বলে তোকে ডাকবে।

বাঁশরি। না ডেকেই লজ্জা দিলে আমাকে। ভাবছে আমি অন্নজল ছেড়ে ঘরে দরজা দিয়ে কেঁদে মরছি। ওদের সঙ্গে যখন তোর দেখা হবে কথাপ্রসঙ্গে বলিস, 'বাঁশি বিছানায় শুয়ে কমিক গল্প পড়ছিল, পেট ফেটে যাচ্ছিল হেসে হেসে।' নিশ্চয় বলিস।

লীলা। নিশ্চয় বলব, গল্পের বিষয়টা কী বল্ দেখি।

বাঁশরি। হিরোর নাম স্যার চন্দ্রশেখর। নায়িকা পঙ্কজা, ধনকুবেরের মন ভোলাতে লেগেছেন উঠে পড়ে। ওঠার চেয়ে পড়ার অংশটাই বেশি। সেন্ট-অ্যান্টনির টেমটেশন ছবি দেখেছিস তো? দিনের পর দিন নূতন বেহায়াগিরি— তোর খুব-যে শুচিবাই তা নয়, তবু ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ঘাটে দৌড় মারতে চাইতিস। দ্বিতীয় নম্বরের নায়িকা গলা ভেঙে মরছে পঙ্ককুণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে। অবশেষে একদিন পৌষ মাসের অর্ধরাতে খিড়কির ঘাটে— তুই ভাবছিস হতভাগিনী আত্মহত্যা করে বাঁচল— ক্ষিতীশের কল্পনাকে অবিচার করিস নে— নায়িকা জলের মধ্যে এক পৈঁঠে পর্যন্ত নেবেছিল। ঠাণ্ডা জলে ছ্যাঁক করে উঠল গা-টা। ছুটল গরম বিছানা লক্ষ্য করে। এইখানটাতে সাইকলজির তর্ক এই, শীত করল বলেই মরা মুলতুবি কিংবা শীত করাতে আগুনের কথাটা মাথায় এল, অমনি ভাবল ওদের জ্বালিয়ে মারবে বেঁচে থেকে।

লীলা। কিছুতে বুঝতে পারি নে, এত লোক থাকতে ক্ষিতীশের উপর এত ভরসা রেখেছিস কী করে।

বাঁশরি। অবিচার করিস নে। ওর লেখবার শক্তি আছে। ও আমাদের ময়মনসিংহের বাগানের আম, জাত ভালো, কিন্তু যত্তই চেষ্টা করা গেল ভিতরে পোকা হতেই আছে। ঐ পোকা বাদ দিয়ে কাজে লাগানো হয়তো চলবে। ঐ বুঝি আসছে।

লীলা। আমি তবে চললুম।

বাঁশরি। একেবারে যাস নে। সন্ধেবেলাটা কোনোমতে কাটাতে হবে। কমিক গল্পটা তো শেষ হল।

লীলা। কমিক গল্পের এক্‌টিনি করতে হবে বুঝি আমাকেই? আচ্ছা, রইলুম পাশের ঘরে।

ক্ষিতীশের প্রবেশ

ক্ষিতীশ। কেমন লাগল। মেলোড্রামার খাদ মেশাই নি সিকি তোলাও। সেন্টিমেন্টালিটির তরল রস চায় যে-সব খুকিরা, তাদের পক্ষে নির্জলা একাদশী। একেবারে নিষ্ঠুর সত্য।

বাঁশরি। কেমন লাগল বুঝিয়ে দিচ্ছি (পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলল)।

ক্ষিতীশ। করলে কী। সর্বনাশ। এটা আমার সব লেখার সেরা, নষ্ট করে ফেললে?

বাঁশরি। দলিলটা নষ্ট করে ফেললেই সেরা জিনিসের বালাই থাকে না। কৃতজ্ঞ হোয়ো আমার 'পরে।

ক্ষিতীশ। সাহিত্যে নিজে কিছু দেবার শক্তি নেই, অথচ সংকোচ নেই তাকে বঞ্চিত করতে। এর দাম দিতে হবে, কিছুতে ছাড়ব না।

বাঁশরি। কী দাম চাই।

ক্ষিতীশ। তোমাকে।

বাঁশরি। ক্ষতিপূরণ এত সস্তায়, সাহস আছে নিতে?

ক্ষিতীশ। আছে।

বাঁশরি। সেন্টিমেন্ট্ এক ফোঁটাও মিলবে না।

ক্ষিতীশ। আশাও করি নে।

বাঁশরি। নির্জলা একাদশী, নিষ্ঠুর সত্য।

ক্ষিতীশ। রাজি আছি।

বাঁশরি। আছ রাজি? বুঝেসুঝে বলছ? এ কমিক নভেল নয়, ভুল করলে প্রুফ-দেখা চলবে না, এডিশনও ফুরবে না মরার দিন পর্যন্ত।

ক্ষিতীশ। শিশু নই, এ কথা বুঝি।

বাঁশরি। না মশায়, কিচ্ছু বোঝ না, বুঝতে হবে দিনে দিনে পলে পলে, বুঝতে হবে হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায়।

ক্ষিতীশ। সেই হবে আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো অভিজ্ঞতা।

বাঁশরি। তবে বলি শোনো। অবোধের 'পরে মেয়েদের স্বাভাবিক স্নেহ। তোমার উপর কৃপা আছে আমার। তাই অবুঝের মতো নিজের সর্বনাশের যে-প্রস্তাবটা করলে তাতে সম্মতি দিতে দয়া হচ্ছে।

ক্ষিতীশ। সম্মতি না দিলে সাংঘাতিক নির্দয়তা হবে। সামলে উঠতে পারব না।

বাঁশরি। মেলোড্রামা?

ক্ষিতীশ। না, মেলোড্রামা নয়।

বাঁশরি। ক্রমে মেলোড্রামা হয়ে উঠবে না?

ক্ষিতীশ। যদি হয় তবে সেই দিনগুলোকে ঐ খাতার পাতার মতো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলো।

বাঁশরি। (উঠে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা সম্মতি দিলাম। (ক্ষিতীশ ছুটে এল বাঁশরির দিকে) ঐ রে, শুরু হল! ভালো করে ভেবে দেখো, এখনো পিছোবার সময় আছে।

ক্ষিতীশ। (করজোড়ে) মাপ করো, ভয় হচ্ছে পাছে মত বদলায়।

বাঁশরি। যখন বদলাবে তখন ভয় কোরো। অমন মুখের দিকে তাকিয়ে থেকো না। দেখতে খারাপ লাগে। যাও রেজেস্ট্রি আফিসে। তিন-চার দিনের মধ্যে বিয়ে হওয়া চাই।

ক্ষিতীশ। নোটিশের মেয়াদ কমাতে আইনে যদি বাধে?

বাঁশরি। তা হলে বিয়েতেও বাধবে। দেরি করতে সাহস নেই।

ক্ষিতীশ। অনুষ্ঠান?

বাঁশরি। হবে না অনুষ্ঠান, তোমার দেখছি কমিকের দিকে ঝোঁক আছে। এখনো বুঝলে না জিনিসটা সীরিয়াস।

ক্ষিতীশ। কাউকে নিমন্ত্রণ?

বাঁশরি। কাউকে না।

ক্ষিতীশ। কাউকেই না?

বাঁশরি। আচ্ছা, সোমশংকরকে।

ক্ষিতীশ। কিরকম চিঠিটা লিখতে হবে তার একটা খসড়া—

বাঁশরি। খসড়া কেন, লিখে দিচ্ছি।

ক্ষিতীশ। স্বহস্তে?

বাঁশরি। হাঁ, স্বহস্তে।

ক্ষিতীশ। আজই?

বাঁশরি। হাঁ, এখনই। (চিঠি লিখে) এই নাও, পড়ো।

ক্ষিতীশের পাঠ। এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, শ্রীমতী বাঁশরি সরকারের সহিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিকের অবিলম্বে বিবাহ স্থির হইয়াছে। তারিখ জানানো অনাবশ্যক— আপনার অভিনন্দন প্রার্থনীয়। পত্রদ্বারা বিজ্ঞাপন হইল, ত্রুটি মার্জনা করিবেন। ইতি—

বাঁশরি। এ চিঠি এখনই রাজার দারোয়ানের হাতে দিয়ে আসবে। দেরি কোরো না।

[ক্ষিতীশের প্রস্থান

লীলা, শুনে যা খবরটা।

লীলার প্রবেশ

লীলা। কী খবর।

বাঁশরি। বাঁশরি সরকারের সঙ্গে ক্ষিতীশ ভৌমিকের বিবাহ পাকা হয়ে গেল।

লীলা। আঃ, কী বলিস তার ঠিকানা নেই।

বাঁশরি। এতদিন পরে একটা ঠিকানা হল।

লীলা। এটা যে আত্মহত্যা!

বাঁশরি। তার পরে পুনর্জন্মের প্রথম অধ্যায়।

লীলা। সব চেয়ে দুঃখ এই যে, যেটা ট্র্যাজেডি সেটাকে দেখাবে প্রহসন।

বাঁশরি। ট্র্যাজেডির লজ্জা ঘুচবে ঠাট্টার হাসিতে। অশ্রুপাতের চেয়ে অগৌরব নেই।

লীলা। আমাদের রাশিচক্র থেকে খসে পড়ল সব চেয়ে উজ্জ্বল তারাটি। যদি তার জ্বালা নিভত শোক করতুম না। জ্বালা সে সঙ্গে করে নিয়েই চলল অন্ধকারের তলায়।

বাঁশরি। তা হোক, ডার্ক হীট, কালো আগুন, কারও চোখে পড়বে না। আমার জন্য শোক করিস নে, যে আমার সাথি হতে চলল শোচনীয় সে-ই। এ কী। শংকর আসছে। তুই যা ভাই একটু আড়ালে।

[লীলার প্রস্থান

সোমশংকরের প্রবেশ

সোমশংকর। বাঁশি!

বাঁশরি। তুমি যে!

সোমশংকর। নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। জানি অন্যপক্ষ থেকে ডাকে নি তোমাকে। আমার পক্ষ থেকে কোনো সংকোচ নেই।

বাঁশরি। কেন সংকোচ নেই। ঔদাসীন্য ?

সোমশংকর। তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি আর আমি যা দিয়েছি তোমাকে, এ বিবাহে তাকে স্পর্শমাত্র করতে পারবে না, এ তুমি নিশ্চয় জান।

বাঁশরি। তবে বিবাহ করতে যাচ্ছ কেন ?

সোমশংকর। সে কথা বুঝতে যদি নাও পার, তবু দয়া কোরো আমাকে।

বাঁশরি। তবু বলো। বুঝতে চেষ্টা করি।

সোমশংকর। কঠিন ব্রত নিয়েছি, একদিন প্রকাশ হবে, আজ থাক্, দুঃসাধ্য আমার সংকল্প, ক্ষত্রিয়ের যোগ্য। কোনো-এক সংকটের দিনে বুঝবে সে ব্রত ভালোবাসার চেয়েও বড়ো। তাকে সম্পন্ন করতেই হবে প্রাণ দিয়েও।

বাঁশরি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে সম্পন্ন করতে পারতে না ?

সোমশংকর। নিজেকে কখনো তুমি ভুল বোঝাও না বাঁশি। তুমি নিশ্চিত জান তোমার কাছে আমি দুর্বল। হয়তো একদিন তোমার ভালোবাসা আমাকে টলিয়ে দিত আমার ব্রত থেকে। যে-দুর্গমপথে সুষমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আমাকে যাত্রায় প্রবৃত্ত করেছেন সেখানে ভালোবাসার গতিবিধি বন্ধ।

বাঁশরি। সন্ন্যাসী হয়তো ঠিকই বুঝেছেন। তোমার চেয়েও তোমার ব্রতকে আমি বড়ো করে দেখতে পারতুম না। হয়তো সেইখানেই বাধত সংঘাত। আজ পর্যন্ত তোমার ব্রতের সঙ্গেই আমার শত্রুতা। তবে এই শত্রুর দুর্গে কোন্ সাহসে তুমি এলে। একদিন যে-শক্তি আমার মধ্যে দেখেছিলে আজ কিছু কি তার অবশিষ্ট নেই। ভয় করবে না ?

সোমশংকর। শক্তি একটুও কমে নি, তবু ভয় করব না।

বাঁশরি। যদি তেমন করে পিছু ডাকি এড়িয়ে যেতে পারবে ?

সোমশংকর। কী জানি, না পারতেও পারি।

বাঁশরি। তবে ?

সোমশংকর। তোমাকে বিশ্বাস করি। আমার সত্য কখনোই ভাঙা পড়বে না তোমার হাতে। সংকটের মুখে যাবার পথে আমাকে হেয় করতে পারবে না তুমি। নিশ্চিত জান, সত্যভঙ্গ হলে আমি প্রাণ রাখব না। মরব তুষানলে পুড়ে।

বাঁশরি। শংকর, তুমি ক্ষত্রিয়ের মতোই ভালোবাসতে পার। শুধু ভাব দিয়ে নয় বীর্য দিয়ে। সত্যি করে বলো, আজও কি আমাকে সেদিনের মতোই ততখানি ভালোবাস।

সোমশংকর। ততখানিই।

বাঁশরি। আর কিছুই চাই নে আমি। সুষমাকে নিয়ে পূর্ণ হোক তোমার ব্রত, তাকে ঈর্ষা করব না।

সোমশংকর। একটা কথা বাকি আছে।

বাঁশরি। কী, বলো।

সোমশংকর। আমার ভালোবাসার কিছু চিহ্ন রেখে যাচ্ছি তোমার কাছে, ফিরিয়ে দিতে পারবে না। (অলংকারের সেই থলি বের করলে)

বাঁশরি। ও কী, ও-সব যে তলিয়ে ছিল জলে।

সোমশংকর। ডুব দিয়ে আবার তুলে এনেছি।

বাঁশরি। মনে করেছিলুম আমার সব হারিয়েছে। ফিরে পেয়ে অনেকখানি বেশি করে পেলুম। নিজের হাতে পরিয়ে দাও আমাকে। (সোমশংকর গয়না পরিয়ে দিলে) শক্ত আমার প্রাণ। তোমার কাছেও কোনোদিন কেঁদেছি বলে মনে পড়ে না, আজ যদি কাঁদি কিছু মনে কোরো না। (হাতে মাথা রেখে কান্না)

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। রাজাবাহাদুরের চিঠি।

বাঁশরি। (দাঁড়িয়ে উঠে) শংকর, ও চিঠি আমাকে দাও।

সোমশংকর। না পড়েই?

বাঁশরি। হাঁ, না পড়েই।

সোমশংকর। তবে নাও। (বাঁশরি চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল) এখনো একটা কাজ বাকি আছে। এই সিগারেট-কেস চেয়ে পাঠিয়েছিলে। কেন, বুঝতে পারি নি।

বাঁশরি। আর-একবার তোমার ঐ পকেটে রাখব বলে, এ আমার দ্বিতীয়বারকার দান।

সোমশংকর। সন্ন্যাসীবাবা আমাদের বাড়িতে আসবেন এখনই— বিদায় দাও, যাই তাঁর কাছে।

বাঁশরি। যাও, জয় হোক সন্ন্যাসীর।

[সোমশংকরের প্রস্থান

লীলার প্রবেশ

লীলা। কী ভাই—

বাঁশরি। একটু বোসো। আর-একখানা চিঠি লেখা বাকি আছে, সেটা তাকে দিতে হবে তোরই হাত দিয়ে। (চিঠি লিখে লীলাকে দিলে) পড়ে দেখ্।

চিঠি

শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক কল্যাণবরেষু—
তোমার ভাগ্য ভালো, ফাঁড়া কেটে গেল, আমারও বিবাহের আসন্ন আশঙ্কাটা সম্পূর্ণ লোপ করে দিলুম। 'ভালোবাসার নিলামে' সর্বোচ্চ দরই পেয়েছি, তোমার ডাক সে-পর্যন্ত পৌঁছত না। অন্যত্র অন্য-কোনো সান্ত্বনার সুযোগ উপস্থিতমত যদি না জোটে তবে বই লেখো। আশা করি এবার সত্যের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে। তোমার এই লেখায় বাঁশরির প্রতি দয়া করবার দরকার হবে না। আত্মহত্যায় এক পৈঠে পা বাড়িয়েই সে ফিরে এসেছে।

লীলা। (বাঁশরিকে জড়িয়ে ধরে) আঃ, বাঁচালি ভাই আমাদের সবাইকে। সুষমার উপর এখন আর তোর রাগ নেই?

বাঁশরি। কেন থাকবে। সে কি আমার চেয়ে জিতেছে। লীলা, দে ভাই সব দরজা খুলে সব আলোগুলো জ্বালিয়ে— বাগান থেকে যতগুলো ফুল পাস নিয়ে আয় সংগ্রহ করে।

[লীলার প্রস্থান

পুরন্দরের প্রবেশ

বাঁশরি। এ কী সন্ন্যাসী, তুমি যে আমার ঘরে?

পুরন্দর। চলে যাচ্ছি দূরে, হয়তো আর দেখা হবে না।

বাঁশরি। যাবার বেলায় আমার কথা মনে পড়ল?

পুরন্দর। তোমার কথা কখনোই ভুলি নি। ভোলবার মতো মেয়ে নও তুমি। নিত্যই এ কথা মনে রেখেছি, তোমাকে চাই আমাদের কাজে— দুর্লভ দুঃসাধ্য তুমি, তাই দুঃখ দিয়েছি।

বাঁশরি। পার নি দুঃখ দিতে। মরা কঠিন নয়, পেয়েছি তার প্রথম শিক্ষা। কিন্তু তোমাকে একটা শেষ কথা বলব সন্ন্যাসী, শোনো। সুষমাকে তুমি ভালোবাস, সুষমা জানে সেই কথা। তোমার ভালোবাসার সূত্রে গেঁথে ব্রতের হার পরেছে সে গলায়, তার আর ভাবনা কিসের। সত্য কি না বলো

পুরন্দর। সত্য কি মিথ্যা সে-কথা বলে কোনো ফল নেই, দুইই সমান।

বাঁশরি। সুষমার ভাগ্য ভালো কিন্তু সোমশংকরকে কী তুমি দিলে।

পুরন্দর। সে পুরুষ, সে ক্ষত্রিয়, সে তপস্বী

বাঁশরি। হোক পুরুষ, হোক ক্ষত্রিয়, তার তপস্যা অপূর্ণ থাকবে আমি না থাকলে, আবশ্যক আছে আমাকে।

পুরন্দর। বঞ্চিত হবার দুঃখই তাকে দেবে শক্তি।

বাঁশরি। কখনোই না, তাতেই পঙ্গু করবে তার ব্রত। যে পারে ঐ ক্ষত্রিয়কে শক্তি দিতে এমন কেবল একটি মেয়ে আছে এ-সংসারে।

পুরন্দর। জানি।

বাঁশরি। সে সুষমা নয়।

পুরন্দর। তাও জানি। কিন্তু ঐ বীরের শক্তি হরণ করতে পারে, এমনও একটি মাত্র মেয়ে আছে এ-সংসারে।

বাঁশরি। আজ অভয় দিচ্ছে সে। আপন অন্তরের মধ্যে সে আপনি পেয়েছে দীক্ষা। তার বন্ধন ঘুচেছে, সে আর বাঁধবে না।

পুরন্দর। তবে আজ যাবার দিনে নিঃসংকোচে তারই হাতে রেখে গেলেম সোমশংকরের দুর্গম পথের পাথেয়।

বাঁশরি। এতদিন আমার যত প্রণাম বাকি ছিল সব একত্র করে আজ এই দিলেম তোমার পায়ে।

পুরন্দর। আর আমি দিয়ে গেলেম তোমাকে একটি গান, তোমার কণ্ঠে সেটিকে গ্রহণ করো।

গান

পিনাকেতে লাগে টংকার—
বসুন্ধরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার।
আকাশেতে ঘোরে ঘূর্ণী
সৃষ্টির বাঁধ চূর্ণি,
বজ্রভীষণ গর্জনরব প্রলয়ের জয়ডঙ্কার।
স্বর্গ উঠিছে ক্রন্দি,
সুরপরিষদ বন্দী,
তিমিরগহন দুঃসহ রাতে উঠে শৃঙ্খলঝংকার।
দানবদম্ভ তর্জি
রুদ্র উঠিল গর্জি,
লণ্ডভণ্ড লুটিল ধুলায় অভ্রভেদী অহংকার॥

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

হালদারগোষ্ঠী

এই পরিবারটির মধ্যে কোনোরকমের গোল বাধিবার কোনো সংগত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মানুষগুলিও কেহই মন্দ নহে, কিন্তু তবুও গোল বাধিল।

কেননা, সংগত কারণেই যদি মানুষের সব-কিছু ঘটিত তবে তো লোকালয়টা একটা অঙ্কের খাতার মতো হইত, একটু সাবধানে চলিলেই হিসাবে কোথাও কোনো ভুল ঘটিত না ; যদি-বা ঘটিত সেটাকে রবার দিয়া মুছিয়া সংশোধন করিলেই চলিয়া যাইত।

কিন্তু, মানুষের ভাগ্যদেবতার রসবোধ আছে ; গণিতশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য আছে কি না জানি না, কিন্তু অনুরাগ নাই ; মানবজীবনের যোগবিয়োগের বিশুদ্ধ অঙ্কফলটি উদ্ধার করিতে তিনি মনোযোগ করেন না। এইজন্য তাঁহার ব্যবস্থার মধ্যে একটা পদার্থ তিনি সংযোগ করিয়াছেন, সেটা অসংগতি। যাহা হইতে পারিত সেটাকে সে হঠাৎ আসিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। ইহাতেই নাট্যলীলা জমিয়া উঠে, সংসারের দুই কূল ছাপাইয়া হাসিকান্নার তুফান চলিতে থাকে।

এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল— যেখানে পদ্মবন সেখানে মত্তহস্তী আসিয়া উপস্থিত। পঙ্কের সঙ্গে পঙ্কজের একটা বিপরীত রকমের মাখামাখি হইয়া গেল ; তা না হইলে এ গল্পটির সৃষ্টি হইতে পারিত না।

যে পরিবারের কথা উপস্থিত করিয়াছি তাহার মধ্যে সব চেয়ে যোগ্য মানুষ যে বনোয়ারিলাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে নিজেও তাহা বিলক্ষণ জানে এবং সেইটেতেই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। যোগ্যতা এঞ্জিনের স্টীমের মতো তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে ; সামনে যদি সে রাস্তা পায় তো ভালোই, যদি না পায় তবে যাহা পায় তাহাকে ধাক্কা মারে।

তাহার বাপ মনোহরলালের ছিল সাবেককেলে বড়োমানুষি চাল। যে-সমাজ তাঁহার সেই সমাজের মাথাটিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি তাহার শিরোভূষণ হইয়া থাকিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। সুতরাং সমাজের হাত-পায়ের সঙ্গে তিনি কোনো সংস্রব রাখেন না। সাধারণ লোকে কাজকর্ম করে, চলে ফেরে ; তিনি কাজ না-করিবার ও না-চলিবার বিপুল আয়োজনটির কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া বিরাজ করেন।

প্রায় দেখা যায়, এই প্রকার লোকেরা বিনাচেষ্টায় আপনার কাছে অন্তত দুটি-একটি শক্ত এবং খাঁটি লোককে যেন চুম্বকের মতো টানিয়া আনেন। তাহার কারণ আর কিছু নয়, পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায় সেবা করাই তাহাদের ধর্ম। তাহারা আপন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্যই এমন অক্ষম মানুষকে চায় যে-লোক নিজের ভার ষোলোআনাই তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে। এই সহজ সেবকেরা নিজের কাজে কোনো সুখ পায় না, কিন্তু আর-একজনকে নিশ্চিন্ত করা, তাহাকে সম্পূর্ণ আরামে রাখা, তাহাকে সকল প্রকার সংকট হইতে বাঁচাইয়া চলা, লোকসমাজে তাহার সম্মানবৃদ্ধি করা, ইহাতেই তাহাদের পরম উৎসাহ। ইহারা যেন এক প্রকারের পুরুষ-মা ; তাহাও নিজের ছেলের নহে, পরের ছেলের।

মনোহরলালের যে চাকরটি আছে, রামচরণ, তাহার শরীররক্ষা ও শরীরপাতের একমাত্র লক্ষ্য বাবুর দেহ রক্ষা করা। যদি সে নিশ্বাস লইলে বাবুর নিশ্বাস লইবার প্রয়োজনটুকু বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে সে

অহোরাত্র কামারের হাপরের মতো হাঁপাইতে রাজি আছে। বাহিরে লোকে অনেক সময় ভাবে, মনোহরলাল বুঝি তাঁহার সেবককে অনাবশ্যক খাটাইয়া অন্যায় পীড়ন করিতেছেন। কেননা, হাত হইতে গুড়গুড়ির নলটা হয়তো মাটিতে পড়িয়াছে, সেটাকে তোলা কঠিন কাজ নহে, অথচ সেজন্য ডাক দিয়া অন্য ঘর হইতে রামচরণকে দৌড় করানো নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয় ; কিন্তু এই-সকল ভূরি ভূরি অনাবশ্যক ব্যাপারে নিজেকে অত্যাবশ্যক করিয়া তোলাতেই রামচরণের প্রভূত আনন্দ।

যেমন তাঁহার রামচরণ, তেমনি তাঁহার আর-একটি অনুচর নীলকণ্ঠ। বিষয়রক্ষার ভার এই নীলকণ্ঠের উপর। বাবুর প্রসাদপরিপুষ্ট রামচরণটি দিব্য সুচিক্কণ, কিন্তু নীলকণ্ঠের দেহে তাহার অস্থিকঙ্কালের উপর কোনো প্রকার আব্রু নাই বলিলেই হয়। বাবুর ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দ্বারে সে মূর্তিমান দুর্ভিক্ষের মতো পাহারা দেয়। বিষয়টা মনোহরলালের কিন্তু তাহার মমতাটা সম্পূর্ণ নীলকণ্ঠের।

নীলকণ্ঠের সঙ্গে বনোয়ারিলালের খিটিমিটি অনেকদিন হইতে বাধিয়াছে। মনে করো, বাপের কাছে দরবার করিয়া বনোয়ারি বড়োবউয়ের জন্য একটা নূতন গহনা গড়াইবার হুকুম আদায় করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, টাকাটা বাহির করিয়া লইয়া নিজের মনোমত করিয়া জিনিসটা ফরমাশ করে। কিন্তু, সে হইবার জো নাই। খরচপত্রের সমস্ত কাজই নীলকণ্ঠের হাত দিয়াই হওয়া চাই। তাহার ফল হইল এই, গহনা হইল বটে, কিন্তু কাহারও মনের মতো হইল না। বনোয়ারির নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, স্যাকরার সঙ্গে নীলকণ্ঠের ভাগবাটোয়ারা চলে। কড়া লোকের শত্রুর অভাব নাই। ঢের লোকের কাছে বনোয়ারি ঐ কথাই শুনিয়া আসিয়াছে যে, নীলকণ্ঠ অন্যকে যে পরিমাণে বঞ্চিত করিতেছে নিজের ঘরে তাহার ততোধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

অথচ দুই পক্ষে এই-যে সব বিরোধ জমা হইয়া উঠিয়াছে তাহা সামান্য পাঁচ-দশ টাকা লইয়া। নীলকণ্ঠের বিষয়বুদ্ধির অভাব নাই— এ কথা তাহার পক্ষে বুঝা কঠিন নহে যে, বনোয়ারির সঙ্গে বনাইয়া চলিতে না পারিলে কোনো-না-কোনো দিন তাহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু, মনিবের ধন সম্বন্ধে নীলকণ্ঠের একটা কৃপণতার বায়ু আছে। সে যেটাকে অন্যায্য মনে করে মনিবের হুকুম পাইলেও কিছুতেই তাহা সে খরচ করিতে পারে না।

এ দিকে বনোয়ারির প্রায়ই অন্যায্য খরচের প্রয়োজন ঘটিতেছে। পুরুষের অনেক অন্যায্য ব্যাপারের মূলে যে কারণ থাকে সেই কারণটি এখানেও খুব প্রবলভাবে বর্তমান। বনোয়ারির স্ত্রী কিরণলেখার সৌন্দর্য সম্বন্ধে নানা মত থাকিতে পারে, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার মধ্যে যে মতটি বনোয়ারির, বর্তমান প্রসঙ্গে একমাত্র সেইটেই কাজের। বস্তুত স্ত্রীর প্রতি বনোয়ারির মনের যে পরিমাণ টান সেটাকে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে করে। অর্থাৎ, তাহারা নিজের স্বামীর কাছ হইতে যতটা আদর চায় অথচ পায় না, ইহা ততটা।

কিরণলেখার বয়স যতই হউক চেহারা দেখিলে মনে হয় ছেলেমানুষটি। বাড়ির বড়োবউয়ের যেমনতর গিন্নিবান্নি ধরনের আকৃতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত সে তাহার একেবারেই নহে। সবসুদ্ধ জড়াইয়া সে যেন বড়ো স্বল্প।

বনোয়ারি তাহাকে আদর করিয়া অণু বলিয়া ডাকিত। যখন তাহাতেও কুলাইত না তখন বলিত পরমাণু। রসায়নশাস্ত্রে যাঁহাদের বিচক্ষণতা আছে তাঁহারা জানেন, বিশ্বঘটনায় অণুপরমাণুগুলির শক্তি বড়ো কম নয়।

কিরণ কোনোদিন স্বামীর কাছে কিছুর জন্য আবদার করে নাই। তাহার এমন একটি উদাসীন ভাব, যেন তাহার বিশেষ কিছুতে প্রয়োজন নাই। বাড়িতে তাহার অনেক ঠাকুরঝি, অনেক ননদ ; তাহাদিগকে লইয়া সর্বদাই তাহার সমস্ত মন ব্যাপৃত ; নবযৌবনের নবজাগ্রত প্রেমের মধ্যে যে একটা নির্জন তপস্যা আছে তাহাতে তাহার তেমন প্রয়োজন-বোধ নাই। এইজন্য বনোয়ারির সঙ্গে ব্যবহারে তাহার বিশেষ একটা আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায় না। যাহা সে বনোয়ারির কাছ হইতে পায় তাহা সে শান্তভাবে গ্রহণ করে, অগ্রসর হইয়া কিছু চায় না। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, স্ত্রীটি কেমন করিয়া

খুশি হইবে সেই কথা বনোয়ারিকে নিজে ভাবিয়া বাহির করিতে হয়। স্ত্রী যেখানে নিজের মুখে ফরমাশ করে সেখানে সেটাকে তর্ক করিয়া কিছু-না-কিছু খর্ব করা সম্ভব হয়, কিন্তু নিজের সঙ্গে তো দর-কষাকষি চলে না। এমন স্থলে অযাচিত দানে যাচিত দানের চেয়ে খরচ বেশি পড়িয়া যায়।

তাহার পরে স্বামীর সোহাগের উপহার পাইয়া কিরণ যে কতখানি খুশি হইল তাহা ভালো করিয়া বুঝিবার জো নাই। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে বলে— বেশ। ভালো। কিন্তু, বনোয়ারির মনের খটকা কিছুতেই মেটে না ; ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হয়, হয়তো পছন্দ হয় নাই। কিরণ স্বামীকে ঈষৎ ভর্ৎসনা করিয়া বলে, "তোমার ঐ স্বভাব! কেন এমন খুঁতখুঁত করছ। কেন, এ তো বেশ হয়েছে।"

বনোয়ারি পাঠ্যপুস্তকে পড়িয়াছে— সন্তোষগুণটি মানুষের মহৎ গুণ। কিন্তু, স্ত্রীর স্বভাবে এই মহৎ গুণটি তাহাকে পীড়া দেয়। তাহার স্ত্রী তো তাহাকে কেবলমাত্র সন্তুষ্ট করে নাই, অভিভূত করিয়াছে, সেও স্ত্রীকে অভিভূত করিতে চায়। তাহার স্ত্রীকে তো বিশেষ কোনো চেষ্টা করিতে হয় না— যৌবনের লাবণ্য আপনি উছলিয়া পড়ে, সেবার নৈপুণ্য আপনি প্রকাশ হইতে থাকে ; কিন্তু পুরুষের তো এমন সহজ সুযোগ নয় ; পৌরুষের পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে কিছু একটা করিয়া তুলিতে হয়। তাহার যে বিশেষ একটা শক্তি আছে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে পুরুষের ভালোবাসা ম্লান হইয়া থাকে। আর-কিছু না-ও যদি থাকে, ধন যে একটা শক্তির নিদর্শন, ময়ূরের পুচ্ছের মতো স্ত্রীর কাছে সেই ধনের সমস্ত বর্ণচ্ছটা বিস্তার করিতে পারিলে তাহাতে মন সান্ত্বনা পায়। নীলকণ্ঠ বনোয়ারির প্রেমনাট্যলীলার এই আয়োজনটাতে বারংবার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বনোয়ারি বাড়ির বড়োবাবু, তবু কিছুতে তাহার কর্তৃত্ব নাই, কর্তার প্রশ্রয় পাইয়া ভৃত্য হইয়া নীলকণ্ঠ তাহার উপরে আধিপত্য করে, ইহাতে বনোয়ারির যে অসুবিধা ও অপমান সেটা আর-কিছুর জন্য তত নহে যতটা পঞ্চশরের তূণে মনের মতো শর জোগাইবার অক্ষমতাবশত।

একদিন এই ধনসম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার তো জন্মিবে। কিন্তু, যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? বসন্তের রঙিন পেয়ালায় তখন এ সুধারস এমন করিয়া আপনা-আপনি ভরিয়া ভরিয়া উঠিবে না ; টাকা তখন বিষয়ীর টাকা হইয়া খুব শক্ত হইয়া জমিবে, গিরিশিখরের তুষারসংঘাতের মতো ; তাহাতে কথায় কথায় অসাবধানের অপব্যয়ের ঢেউ খেলিতে থাকিবে না। টাকার দরকার তো এখনই, যখন আনন্দে তাহা নয়-ছয় করিবার শক্তি নষ্ট হয় নাই।

বনোয়ারির প্রধান শখ তিনটি— কুস্তি, শিকার এবং সংস্কৃতচর্চা। তাহার খাতার মধ্যে সংস্কৃত উদ্ভটকবিতা একেবারে বোঝাই করা। বাদলার দিনে, জ্যোৎস্নারাত্রে, দক্ষিনা হাওয়ায় সেগুলি বড়ো কাজে লাগে। সুবিধা এই, নীলকণ্ঠ এই কবিতাগুলির অলংকারবাহুল্যকে খর্ব করিতে পারে না। অতিশয়োক্তি যতই অতিশয় হউক, কোনো খাতাঞ্চি-সেরেস্তায় তাহার জন্য জবাবদিহি নাই। কিরণের কানের সোনায় কার্পণ্য ঘটে কিন্তু তাহার কানের কাছে যে মন্দাক্রান্তা গুঞ্জরিত হয় তাহার ছন্দে একটি মাত্রাও কম পড়ে না এবং তাহার ভাবে কোনো মাত্রা থাকে না বলিলেই হয়।

লম্বাচওড়া পালোয়ানের চেহারা বনোয়ারির। যখন সে রাগ করে তখন তাহার ভয়ে লোকে অস্থির। কিন্তু, এই জোয়ান লোকটির মনের ভিতরটা ভারি কোমল। তাহার ছোটো ভাই বংশীলাল যখন ছোটো ছিল তখন সে তাহাকে মাতৃস্নেহে লালন করিয়াছে। তাহার হৃদয়ে যেন একটি লালন করিবার ক্ষুধা আছে।

তাহার স্ত্রীকে সে যে ভালোবাসে তাহার সঙ্গে এই জিনিসটিও জড়িত, এই লালন করিবার ইচ্ছা। কিরণলেখা তরুচ্ছায়ার মধ্যে পথহারা রশ্মিরেখাটুকুর মতোই ছোটো, ছোটো বলিয়াই সে তাহার স্বামীর মনে ভারি একটা দরদ জাগাইয়া রাখিয়াছে ; এই স্ত্রীকে বসনে ভূষণে নানারকম করিয়া সাজাইয়া দেখিতে তাহার বড়ো আগ্রহ। তাহা ভোগ করিবার আনন্দ নহে, তাহা রচনা করিবার আনন্দ ; তাহা একেকে বহু করিবার আনন্দ, কিরণলেখাকে নানা বর্ণে নানা আবরণে নানারকম করিয়া দেখিবার আনন্দ।

কিন্তু, কেবলমাত্র সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বনোয়ারির এই শখ কোনোমতেই মিটিতেছে না।

তাহার নিজের মধ্যে একটি পুরুষোচিত প্রভুশক্তি আছে তাহাও প্রকাশ করিতে পারিল না, আর প্রেমের সামগ্রীকে নানা উপকরণে ঐশ্বর্যবান করিয়া তুলিবার যে ইচ্ছা তাহাও তার পূর্ণ হইতেছে না।

এমনি করিয়াই এই ধনীর সন্তান তাহার মানমর্যাদা, তাহার সুন্দরী স্ত্রী, তাহার ভরা যৌবন— সাধারণত লোকে যাহা কামনা করে তাহার সমস্ত লইয়াও সংসারে একদিন একটা উৎপাতের মতো হইয়া উঠিল।

সুখদা মধুকৈবর্তের স্ত্রী, মনোহরলালের প্রজা। সে একদিন অন্তঃপুরে আসিয়া কিরণলেখার পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ব্যাপারটা এই— বছর কয়েক পূর্বে নদীতে বেড়জাল ফেলিবার আয়োজন-উপলক্ষে অন্যান্য বারের মতো জেলেরা মিলিয়া এক যোগে খৎ লিখিয়া মনোহরলালের কাছারিতে হাজার টাকা ধার লইয়াছিল। ভালোমত মাছ পড়িলে সুদে আসলে টাকা শোধ করিয়া দিবার কোনো অসুবিধা ঘটে না ; এইজন্য উচ্চ সুদের হারে টাকা লইতে ইহারা চিন্তামাত্র করে না। সে বৎসর তেমন মাছ পড়িল না এবং ঘটনাক্রমে উপরি উপরি তিন বৎসর নদীর বাঁকে মাছ এত কম আসিল যে, জেলেদের খরচ পোষাইল না, অধিকন্তু তাহারা ঋণের জালে বিপরীত রকম জড়াইয়া পড়িল। যে-সকল জেলে ভিন্ন এলেকার, তাহাদের আর দেখা পাওয়া যায় না ; কিন্তু, মধুকৈবর্ত ভিটাবাড়ির প্রজা, তাহার পলাইবার জো নাই বলিয়া সমস্ত দেনার দায় তাহার উপরেই চাপিয়াছে। সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার অনুরোধ লইয়া সে কিরণের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিরণের শাশুড়ির কাছে গিয়া কোনো ফল নাই তাহা সকলেই জানে ; কেননা নীলকণ্ঠের ব্যবস্থায় কেহ যে আঁচড়টুকু কাটিতে পারে, এ কথা তিনি কল্পনা করিতেও পারেন না। নীলকণ্ঠের প্রতি বনোয়ারির খুব একটা আক্রোশ আছে জানিয়াই মধুকৈবর্ত তাহার স্ত্রীকে কিরণের কাছে পাঠাইয়াছে।

বনোয়ারি যতই রাগ এবং যতই আস্ফালন করুক, কিরণ নিশ্চয় জানে যে, নীলকণ্ঠের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার তাহার নাই। এইজন্য কিরণ সুখদাকে বার বার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বাছা, কী করব বলো। জানই তো এতে আমাদের কোনো হাত নাই। কর্তা আছেন, মধুকে বলো, তাঁকে গিয়ে ধরুক।"

সে চেষ্টা তো পূর্বেই হইয়াছে। মনোহরলালের কাছে কোনো বিষয়ে নালিশ উঠিলেই তিনি তাহার বিচারের ভার নীলকণ্ঠের 'পরেই অর্পণ করেন, কখনোই তাহার অন্যথা হয় না। ইহাতে বিচারপ্রার্থীর বিপদ আরো বাড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাঁহার কাছে আপিল করিতে চায় তাহা হইলে কর্তা রাগিয়া আগুন হইয়া উঠেন— বিষয়কর্মের বিরক্তিই যদি তাঁহাকে পোহাইতে হইল তবে বিষয় ভোগ করিয়া তাঁহার সুখ কী।

সুখদা যখন কিরণের কাছে কান্নাকাটি করিতেছে তখন পাশের ঘরে বসিয়া বনোয়ারি তাহার বন্দুকের চোঙে তেল মাখাইতেছিল। বনোয়ারি সব কথাই শুনিল। কিরণ করুণকণ্ঠে যে বার বার করিয়া বলিতেছিল যে, তাহারা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে অক্ষম, সেটা বনোয়ারির বুকে শেলের মতো বিঁধিল।

সেদিন মাঘীপূর্ণিমা ফাল্গুনের আরম্ভে আসিয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলাকার গুমট ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়া মাতিয়া উঠিল। কোকিল তো ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থির ; বার বার এক সুরের আঘাতে সে কোথাকার কোন্ ঔদাসীন্যকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর, আকাশে ফুলগন্ধের মেলা বসিয়াছে, যেন ঠেলাঠেলি ভিড় ; জানলার ঠিক পাশেই অন্তঃপুরের বাগান হইতে মুচুকুন্দফুলের গন্ধ বসন্তের আকাশে নিবিড় নেশা ধরাইয়া দিল। কিরণ সেদিন লট্‌কানের রঙ-করা একখানি শাড়ি এবং খোঁপায় বেলফুলের মালা পরিয়াছে। এই দম্পতির চিরনিয়ম অনুসারে সেদিন বনোয়ারির জন্যও ফাল্গুন-ঋতুযাপনের উপযোগী একখানি লট্‌কানে-রঙিন চাদর ও বেলফুলের গড়েমালা প্রস্তুত। রাত্রির প্রথম প্রহর কাটিয়া গেল তবু বনোয়ারির দেখা নাই। যৌবনের ভরা পেয়ালাটি আজ তাহার কাছে কিছুতেই রুচিল না। প্রেমের বৈকুণ্ঠলোকে এতবড়ো কুণ্ঠা লইয়া সে

প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া। মধুকৈবর্তের দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সে ক্ষমতা আছে নীলকণ্ঠের! এমন কাপুরুষের কণ্ঠে পরাইবার জন্য মালা কে গাঁথিয়াছে।

প্রথমেই সে তাহার বাহিরের ঘরে নীলকণ্ঠকে ডাকাইয়া আনিল এবং দেনার দায়ে মধুকৈবর্তকে নষ্ট করিতে নিষেধ করিল। নীলকণ্ঠ কহিল, মধুকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহা হইলে এই তামাদির মুখে বিস্তর টাকা বাকি পড়িবে; সকলেই ওজর করিতে আরম্ভ করিবে। বনোয়ারি তর্কে যখন পারিল না তখন যাহা মুখে আসিল গাল দিতে লাগিল। বলিল, ছোটোলোক। নীলকণ্ঠ কহিল, "ছোটোলোক না হইলে বড়োলোকের শরণাপন্ন হইব কেন।" বলিল, চোর। নীলকণ্ঠ বলিল, "সে তো বটেই, ভগবান যাহাকে নিজের কিছুই দেন নাই, পরের ধনেই তো সে প্রাণ বাঁচায়।" সকল গালিই সে মাথায় করিয়া লইল; শেষকালে বলিল, "উকিলবাবু বসিয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গে কাজের কথাটা সারিয়া লই। যদি দরকার বোধ করেন তো আবার আসিব।"

বনোয়ারি ছোটো ভাই বংশীকে নিজের দলে টানিয়া তখনই বাপের কাছে যাওয়া স্থির করিল। সে জানিত, একলা গেলে কোনো ফল হইবে না, কেননা, এই নীলকণ্ঠকে লইয়াই তাহার বাপের সঙ্গে পূর্বেই তাহার খিটিমিটি হইয়াছে। বাপ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াই আছেন। একদিন ছিল যখন সকলেই মনে করিত মনোহরলাল তাঁহার বড়ো ছেলেকেই সব চেয়ে ভালোবাসেন। কিন্তু, এখন মনে হয়, বংশীর উপরেই তাঁহার পক্ষপাত। এইজন্যই বনোয়ারি বংশীকেও তাহার নালিশের পক্ষভুক্ত করিতে চাহিল।

বংশী, যাহাকে বলে, অত্যন্ত ভালো ছেলে। এই পরিবারের মধ্যে সে-ই কেবল দুটো একজামিন পাস করিয়াছে। এবার সে আইনের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দিনরাত জাগিয়া পড়া করিয়া করিয়া তাহার অন্তরের দিকে কিছু জমা হইতেছে কি না অন্তর্যামী জানেন কিন্তু শরীরের দিকে খরচ ছাড়া আর কিছুই নাই।

এই ফাল্গুনের সন্ধ্যায় তাহার ঘরে জানলা বন্ধ। ঋতুপরিবর্তনের সময়টাকে তাহার ভারি ভয়। হাওয়ার প্রতি তাহার শ্রদ্ধামাত্র নাই। টেবিলের উপর একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছে। কতক বই মেজের উপরে চৌকির পাশে রাশীকৃত, কতক টেবিলের উপরে; দেয়ালে কুলুঙ্গিতে কতগুলি ঔষধের শিশি।

বনোয়ারির প্রস্তাবে সে কোনোমতেই সম্মত হইল না। বনোয়ারি রাগ করিয়া গর্জিয়া উঠিল, "তুই নীলকণ্ঠকে ভয় করিস!" বংশী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। বস্তুতই নীলকণ্ঠকে অনুকূল রাখিবার জন্য তাহার সর্বদাই চেষ্টা। সে প্রায় সমস্ত বৎসর কলিকাতার বাসাতেই কাটায়; সেখানে বরাদ্দ টাকার চেয়ে তাহার বেশি দরকার হইয়াই পড়ে। এই সূত্রে নীলকণ্ঠকে প্রসন্ন রাখাটা তাহার অভ্যস্ত।

বংশীকে ভীরু, কাপুরুষ, নীলকণ্ঠের চরণ-চারণ-চক্রবর্তী বলিয়া খুব একচোট গালি দিয়া বনোয়ারি একলাই বাপের কাছে গিয়া উপস্থিত। মনোহরলাল তাঁহাদের বাগানে দিঘির ঘাটে তাঁহার নধর শরীরটি উদ্‌ঘাটন করিয়া আরামে হাওয়া খাইতেছেন। পারিষদগণ কাছে বসিয়া কলিকাতার বারিস্টারের জেরায় জেলাকোর্টে অপর পল্লীর জমিদার অখিল মজুমদার যে কিরূপ নাকাল হইয়াছিল তাহারই কাহিনী কর্তাবাবুর শ্রুতিমধুর করিয়া রচনা করিতেছিল। সেদিন বসন্তসন্ধ্যার সুগন্ধ বায়ুসহযোগে সেই বৃত্তান্তটি তাঁহার কাছে অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ বনোয়ারি তাহার মাঝখানে পড়িয়া রসভঙ্গ করিয়া দিল। ভূমিকা করিয়া নিজের বক্তব্য কথাটা ধীরে ধীরে পাড়িবার মতো অবস্থা তাহার ছিল না। সে একেবারে গলা চড়াইয়া শুরু করিয়া দিল, নীলকণ্ঠের দ্বারা তাহাদের ক্ষতি হইতেছে। সে চোর, সে মনিবের টাকা ভাঙিয়া নিজের পেট ভরিতেছে। কথাটার কোনো প্রমাণ নাই এবং তাহা সত্যও নহে। নীলকণ্ঠের দ্বারা বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, এবং সে চুরিও করে না। বনোয়ারি মনে করিয়াছিল, নীলকণ্ঠের সৎস্বভাবের প্রতি অটল বিশ্বাস আছে বলিয়াই কর্তা সকল বিষয়েই তাহার 'পরে এমন চোখ বুজিয়া নির্ভর করেন। এটা তাহার

ভ্রম। মনোহরলালের মনে নিশ্চয় ধারণা যে নীলকণ্ঠ সুযোগ পাইলে চুরি করিয়া থাকে। কিন্তু, সেজন্য তাহার প্রতি তাঁহার কোনো অশ্রদ্ধা নাই। কারণ, আবহমানকাল এমনি ভাবেই সংসার চলিয়া আসিতেছে। অনুচরগণের চুরির উচ্ছিষ্টেই তো চিরকাল বড়োঘর পালিত। চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই, মনিবের বিষয়রক্ষা করিবার বুদ্ধিই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়া তো জমিদারির কাজ চলে না। মনোহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, নীলকণ্ঠ কী করে না-করে সে কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।" সেইসঙ্গে ইহাও বলিলেন, "দেখো দেখি, বংশীর তো কোনো বালাই নাই। সে কেমন পড়াশুনা করিতেছে। ঐ ছেলেটা তবু একটু মানুষের মতো।"

ইহার পরে অখিল মজুমদারের দুর্গতিকাহিনীতে আর রস জমিল না। সুতরাং, মনোহরলালের পক্ষে সেদিন বসন্তের বাতাস বৃথা বহিল এবং দিঘির কালো জলের উপর চাঁদের আলোর ঝক্ঝক্ করিয়া উঠিবার কোনো উপযোগিতা রহিল না। সেদিন সন্ধ্যাটা কেবল বৃথা হয় নাই বংশী এবং নীলকণ্ঠের কাছে। জানলা বন্ধ করিয়া বংশী অনেক রাত পর্যন্ত পড়িল এবং উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নীলকণ্ঠ অর্ধেক রাত কাটাইয়া দিল।

কিরণ ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া জানলার কাছে বসিয়া। কাজকর্ম আজ সে সকাল-সকাল সারিয়া লইয়াছে। রাত্রের আহার বাকি, কিন্তু এখনো বনোয়ারি খায় নাই, তাই সে অপেক্ষা করিতেছে। মধুকৈবর্তের কথা তাহার মনেও নাই। বনোয়ারি যে মধুর দুঃখের কোনো প্রতিকার করিতে পারে না, এ সম্বন্ধে কিরণের মনে ক্ষোভের লেশমাত্র ছিল না। তাহার স্বামীর কাছ হইতে কোনোদিন সে কোনো বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাইবার জন্য উৎসুক নহে। পরিবারের গৌরবেই তাহার স্বামীর গৌরব। তাহার স্বামী তাহার শ্বশুরের বড়োছেলে, ইহার চেয়ে তাহাকে যে আরো বড়ো হইতে হইবে, এমন কথা কোনোদিন তাহার মনেও হয় নাই। ইহারা যে গোঁসাইগঞ্জের সুবিখ্যাত হালদার-বংশ!

বনোয়ারি অনেক রাত্রি পর্যন্ত বাহিরের বারান্ডায় পায়চারি সমাধা করিয়া ঘরে আসিল। সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহার খাওয়া হয় নাই। কিরণ যে তাহার অপেক্ষায় না-খাইয়া বসিয়া আছে এই ঘটনাটা সেদিন যেন তাহাকে বিশেষ করিয়া আঘাত করিল। কিরণের এই কষ্টস্বীকারের সঙ্গে তাহার নিজের অকর্মণ্যতা যেন খাপ খাইল না। অন্নের গ্রাস তাহার গলায় বাধিয়া যাইবার জো হইল। বনোয়ারি অত্যন্ত উত্তেজনার সহিত স্ত্রীকে বলিল, "যেমন করিয়া পারি মধুকৈবর্তকে আমি রক্ষা করিব।" কিরণ তাহার এই অনাবশ্যক উগ্রতায় বিস্মিত হইয়া কহিল, "শোনো একবার! তুমি তাহাকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া।"

মধুর দেনা বনোয়ারি নিজে শোধ করিয়া দিবে এই তাহার পণ, কিন্তু বনোয়ারির হাতে কোনোদিন তো টাকা জমে না। স্থির করিল, তাহার তিনটে ভালো বন্দুকের মধ্যে একটা বন্দুক এবং একটা দামি হীরার আংটি বিক্রয় করিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিবে। কিন্তু, গ্রামে এ-সব জিনিসের উপযুক্ত মূল্য জুটিবে না এবং বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে চারি দিকে লোকে কানাকানি করিবে। এইজন্য কোনো একটা ছুতা করিয়া বনোয়ারি কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় মধুকে ডাকিয়া আশ্বাস দিয়া গেল, তাহার কোনো ভয় নাই।

এ দিকে বনোয়ারির শরণাপন্ন হইয়াছে বুঝিয়া, নীলকণ্ঠ মধুর উপরে রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। পেয়াদার উৎপীড়নে কৈবর্তপাড়ার আর মানসম্ভ্রম থাকে না।

কলিকাতা হইতে বনোয়ারি যেদিন ফিরিয়া আসিল সেই দিনই মধুর ছেলে স্বরূপ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে বনোয়ারির পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউহাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। "কী রে কী, ব্যাপারখানা কী?" স্বরূপ বলিল তাহার বাপকে নীলকণ্ঠ কাল রাত্রি হইতে কাছারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বনোয়ারির সর্বশরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। কহিল, "এখনি গিয়া থানায় খবর দিয়া আয় গে।"

কী সর্বনাশ! থানায় খবর! নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে! তাহার পা উঠিতে চায় না। শেষকালে বনোয়ারির তাড়নায় থানায় গিয়া সে খবর দিল। পুলিস হঠাৎ কাছারিতে আসিয়া বন্ধনদশা হইতে মধুকে খালাস করিল এবং নীলকণ্ঠ ও কাছারির কয়েকজন পেয়াদাকে আসামী করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চালান করিয়া দিল।

মনোহর বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মকদ্দমার মন্ত্রীরা ঘুষের উপলক্ষ করিয়া পুলিসের সঙ্গে ভাগ করিয়া টাকা লুটিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে এক বারিস্টার আসিল, সে একেবারে কাঁচা, নূতন পাস-করা। সুবিধা এই, যত ফি তাহার নামে খাতায় খরচ পড়ে তত ফি তাহার পকেটে উঠে না। ওদিকে মধুকৈবর্তের পক্ষে জেলা-আদালতের একজন মাতব্বর উকিল নিযুক্ত হইল। কে যে তাহার খরচ জোগাইতেছে বোঝা গেল না। নীলকণ্ঠের ছয় মাস মেয়াদ হইল। হাইকোর্টের আপিলেও তাহাই বহাল রহিল।

ঘড়ি এবং বন্দুকটা যে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে তাহা ব্যর্থ হইল না— আপাতত মধু বাঁচিয়া গেল এবং নীলকণ্ঠের জেল হইল। কিন্তু, এই ঘটনার পরে মধু তাহার ভিটায় টিকিবে কী করিয়া? বনোয়ারি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "তুই থাক্‌, তোর কোনো ভয় নাই।" কিসের জোরে যে আশ্বাস দিল তাহা সেই জানে— বোধ করি, নিছক নিজের পৌরুষের স্পর্ধায়।

বনোয়ারি যে এই ব্যাপারের মূলে আছে তাহা সে লুকাইয়া রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কথাটা প্রকাশ হইল; এমন-কি, কর্তার কানেও গেল। তিনি চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "বনোয়ারি যেন কদাচ আমার সম্মুখে না আসে।" বনোয়ারি পিতার আদেশ অমান্য করিল না।

কিরণ তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া অবাক। এ কী কাণ্ড। বাড়ির বড়োবাবু— বাপের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ! তার উপরে নিজেদের আমলাকে জেলে পাঠাইয়া বিশ্বের লোকের কাছে নিজের পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দেওয়া! তাও এই এক সামান্য মধুকৈবর্তকে লইয়া।

অদ্ভুত বটে! এ বংশে কতকাল ধরিয়া কত বড়োবাবু জন্মিয়াছে এবং কোনোদিন নীলকণ্ঠেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠেরা বিষয়ব্যবস্থার সমস্ত দায় নিজেরা লইয়াছে আর বড়োবাবুরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বংশগৌরব রক্ষা করিয়াছে। এমন বিপরীত ব্যাপার তো কোনোদিন ঘটে নাই।

আজ এই পরিবারের বড়োবাবুর পদের অবনতি ঘটাতে বড়োবউয়ের সম্মানে আঘাত লাগিল। ইহাতে এতদিন পরে আজ স্বামীর প্রতি কিরণের যথার্থ অশ্রদ্ধার কারণ ঘটিল। এতদিন পরে তাহার বসন্তকালের লট্‌কানে রঙের শাড়ি এবং খোঁপার বেলফুলের মালা লজ্জায় ম্লান হইয়া গেল।

কিরণের বয়স হইয়াছে অথচ সন্তান হয় নাই। এই নীলকণ্ঠই একদিন কর্তার মত করাইয়া পাত্রী দেখিয়া বনোয়ারির আর-একটি বিবাহ প্রায় পাকাপাকি স্থির করিয়াছিল। বনোয়ারি হালদারবংশের বড়ো ছেলে, সকল কথার আগে এ কথা তো মনে রাখিতে হইবে। সে অপুত্রক থাকিবে, ইহা তো হইতেই পারে না। এই ব্যাপারে কিরণের বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, ইহা সে মনে মনে না স্বীকার করিয়া থাকিতে পারে নাই যে, কথাটা সংগত। তখনো সে নীলকণ্ঠের উপরে কিছুমাত্র রাগ করে নাই, সে নিজের ভাগ্যকেই দোষ দিয়াছে। তাহার স্বামী যদি নীলকণ্ঠকে রাগিয়া মারিতে না যাইত এবং বিবাহসম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া পিতামাতার সঙ্গে রাগারাগি না করিত তবে কিরণ সেটাকে অন্যায় মনে করিত না। এমন-কি, বনোয়ারি যে তাহার বংশের কথা ভাবিল না, ইহাতে অতি গোপনে কিরণের মনে বনোয়ারির পৌরুষের প্রতি একটু অশ্রদ্ধাই হইয়াছিল। বড়ো ঘরের দাবি কি সামান্য দাবি! তাহার যে নিষ্ঠুর হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তরুণী স্ত্রীর কিংবা কোনো দুঃখী কৈবর্তের সুখদুঃখের কতটুকুই বা মূল্য।

সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে এক-একবার তাহা না ঘটিলে কেহই তাহা ক্ষমা করিতে পারে না, এ কথা বনোয়ারি কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। সম্পূর্ণরূপে এ বাড়ির বড়োবাবু হওয়াই তাহার উচিত ছিল; অন্য কোনো প্রকারের উচিত-অনুচিত চিন্তা করিয়া এখানকার ধারাবাহিকতা নষ্ট করা যে তাহার অকর্তব্য, তাহা সে ছাড়া সকলেরই কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

এ লইয়া কিরণ তাহার দেবরের কাছে কত দুঃখই করিয়াছে। বংশী বুদ্ধিমান ; তাহার খাওয়া হজম হয় না এবং একটু হাওয়া লাগিলেই সে হাঁচিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া উঠে, কিন্তু সে স্থির ধীর বিচক্ষণ। সে তাহার আইনের বইয়ের যে অধ্যায়টি পড়িতেছিল সেইটেকে টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় উপুড় করিয়া রাখিয়া কিরণকে বলিল, "এ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নহে।" কিরণ অত্যন্ত উদ্‌বেগের সহিত মাথা নাড়িয়া কহিল, "জান তো, ঠাকুরপো ? তোমার দাদা যখন ভালো আছেন তখন বেশ আছেন, কিন্তু একবার যদি খ্যাপেন তবে তাঁহাকে কেহ সামলাইতে পারে না। আমি কী করি বলো তো।"

পরিবারের সকল প্রকৃতিস্থ লোকের সঙ্গেই যখন কিরণের মতের সম্পূর্ণ মিল হইল, তখন সেইটেই বনোয়ারির বুকে সকলের চেয়ে বাজিল। এই একটুখানি স্ত্রীলোক, অনতিস্ফুট চাঁপাফুলটির মতো পেলব, ইহার হৃদয়টিকে আপন বেদনার কাছে টানিয়া আনিতে পুরুষের সমস্ত শক্তি পরাস্ত হইল। আজকের দিনে কিরণ যদি বনোয়ারির সহিত সম্পূর্ণ মিলিতে পারিত তবে তাহার হৃদয়ক্ষত দেখিতে দেখিতে এমন করিয়া বাড়িয়া উঠিত না।

মধুকে রক্ষা করিতে হইবে এই অতি সহজ কর্তব্যের কথাটা, চারি দিক হইতে তাড়নার চোটে, বনোয়ারির পক্ষে সত্য-সত্যই একটা খ্যাপামির ব্যাপার হইয়া উঠিল। ইহার তুলনায় অন্য সমস্ত কথাই তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল। এ দিকে জেল হইতে নীলকণ্ঠ এমন সুস্থভাবে ফিরিয়া আসিল যেন সে জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। আবার সে যথারীতি অম্লানবদনে আপনার কাজে লাগিয়া গেল।

মধুকে ভিটাছাড়া করিতে না পারিলে প্রজাদের কাছে নীলকণ্ঠের মান রক্ষা হয় না। মানের জন্য সে বেশি কিছু ভাবে না, কিন্তু প্রজারা তাহাকে না মানিলে তাহার কাজ চলিবে না, এইজন্যই তাহাকে সাবধান হইতে হয়। তাই মধুকে তৃণের মতো উৎপাটিত করিবার জন্য তাহার নিড়ানিতে শান দেওয়া শুরু হইল।

এবার বনোয়ারি আর গোপনে রহিল না। এবার সে নীলকণ্ঠকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল যে, যেমন করিয়া হউক মধুকে উচ্ছেদ হইতে সে দিবে না। প্রথমত, মধুর দেনা সে নিজে হইতে সমস্ত শোধ করিয়া দিল ; তাহার পরে আর-কোনো উপায় না দেখিয়া সে নিজে গিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইয়া আসিল যে, নীলকণ্ঠ অন্যায় করিয়া মধুকে বিপদে ফেলিবার উদ্‌যোগ করিতেছে।

হিতৈষীরা বনোয়ারিকে সকলেই বুঝাইল, যেরূপ কাণ্ড ঘটিতেছে তাহাতে কোন্‌দিন মনোহর তাহাকে ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিতে গেলে যে-সব উৎপাত পোহাইতে হয় তাহা যদি না থাকিত তবে এতদিনে মনোহর তাহাকে বিদায় করিয়া দিত। কিন্তু, বনোয়ারির মা আছেন এবং আত্মীয়স্বজনের নানা লোকের নানা প্রকার মত, এই লইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিতে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক বলিয়াই এখনো মনোহর চুপ করিয়া আছেন।

এমনি হইতে হইতে একদিন সকালে হঠাৎ দেখা গেল, মধুর ঘরে তালা বন্ধ। রাতারাতি সে যে কোথায় গিয়াছে তাহার খবর নাই। ব্যাপারটা নিতান্ত অশোভন হইতেছে দেখিয়া নীলকণ্ঠ জমিদার-সরকার হইতে টাকা দিয়া তাহাকে সপরিবারে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছে। পুলিস তাহা জানে, এজন্য কোনো গোলমাল হইল না অথচ নীলকণ্ঠ কৌশলে গুজব রটাইয়া দিল যে, মধুকে তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-সমেত অমাবস্যারাত্রে কালীর কাছে বলি দিয়া মৃতদেহগুলি ছালায় পুরিয়া মাঝগঙ্গায় ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভয়ে সকলের শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং নীলকণ্ঠের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা পূর্বের চেয়ে অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল।

বনোয়ারি যাহা লইয়া মাতিয়া ছিল উপস্থিতমত তাহার শান্তি হইল। কিন্তু, সংসারটি তাহার কাছে আর পূর্বের মতো রহিল না।

বংশীকে একদিন বনোয়ারি অত্যন্ত ভালোবাসিত ; আজ দেখিল, বংশী তাহার কেহ নহে, সে হালদারগোষ্ঠীর। আর, তাহার কিরণ, যাহার ধ্যানরূপটি যৌবনারম্ভের পূর্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয়ের লতাবিতানটিকে জড়াইয়া জড়াইয়া আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সেও সম্পূর্ণ তাহার নহে, সেও

হালদারগোষ্ঠীর। একদিন ছিল, যখন নীলকণ্ঠের ফরমাশে-গড়া গহনা তাহার এই হৃদয়বিহারিণী কিরণের গায়ে ঠিকমত মানাইত না বলিয়া বনোয়ারি খুঁতখুঁত করিত। আজ দেখিল, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অমরু ও চৌর কবির যে-সমস্ত কবিতার সোহাগে সে প্রেয়সীকে মণ্ডিত করিয়া আসিয়াছে আজ তাহা এই হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউকে কিছুতেই মানাইতেছে না।

হায় রে, বসন্তের হাওয়া তবু বহে, রাত্রে শ্রাবণের বর্ষণ তবু মুখরিত হইয়া উঠে এবং অতৃপ্ত প্রেমের বেদনা শূন্য হৃদয়ের পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।

প্রেমের নিবিড়তায় সকলের তো প্রয়োজন নাই ; সংসারের ছোটো কুন্‌কের মাপের বাঁধা বরাদ্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত ব্যবস্থায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু, এক-একজনের ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষীশাবকের মতো কেবলমাত্র ডিমের ভিতরকার সংকীর্ণ খাদ্যরসটুকু লইয়া বাঁচে না, তাহারা ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে খাদ্য আহরণের বৃহৎ ক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারি সেই ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছে, নিজের প্রেমকে নিজের পৌরুষের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য তাহার চিত্ত উৎসুক, কিন্তু যেদিকেই সে ছুটিতে চায় সেইদিকেই হালদারগোষ্ঠীর পাকা ভিত ; নড়িতে গেলেই তাহার মাথা ঠুকিয়া যায়।

দিন আবার পূর্বের মতো কাটিতে লাগিল। আগের চেয়ে বনোয়ারি শিকারে বেশি মন দিয়াছে, ইহা ছাড়া বাহিরের দিক হইতে তাহার জীবনে আর বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা গেল না। অন্তঃপুরে সে আহার করিতে যায়, আহারের পর স্ত্রীর সঙ্গে যথাপরিমাণে বাক্যালাপও হয়। মধুকৈবর্তকে কিরণ আজও ক্ষমা করে নাই, কেননা, এই পরিবারে তাহার স্বামী যে আপন প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছে তাহার মূল কারণ মধু। এইজন্য ক্ষণে ক্ষণে কেমন করিয়া সেই মধুর কথা অত্যন্ত তীব্র হইয়া কিরণের মুখে আসিয়া পড়ে। মধুর যে হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, সে যে শয়তানের অগ্রগণ্য, এবং মধুকে দয়া করাটা যে নিতান্তই একটা ঠকা, এ কথা বার বার বিস্তারিত করিয়াও কিছুতে তাহার শান্তি হয় না। বনোয়ারি প্রথম দুই-একদিন প্রতিবাদের চেষ্টা করিয়া কিরণের উত্তেজনা প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করে না। এমনি করিয়া বনোয়ারি তাহার নিয়মিত গৃহধর্ম রক্ষা করিতেছে ; কিরণ ইহাতে কোনো অভাব-অসম্পূর্ণতা অনুভব করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বনোয়ারির জীবনটা বিবর্ণ, বিরস এবং চির-অভুক্ত।

এমন সময় জানা গেল বাড়ির ছোটোবউ, বংশীর স্ত্রী গর্ভিণী। সমস্ত পরিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিরণের দ্বারা এই মহদ্‌বংশের প্রতি যে কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছিল, এতদিন পরে তাহা পূরণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে ; এখন ষষ্ঠীর কৃপায় কন্যা না হইয়া পুত্র হইলে রক্ষা।

পুত্রই জন্মিল। ছোটোবাবু কলেজের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ, বংশের পরীক্ষাতেও প্রথম মার্ক পাইল। তাহার আদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল, এখন তাহার আদরের সীমা রহিল না।

সকলে মিলিয়া এই ছেলেটিকে লইয়া পড়িল। কিরণ তো তাহাকে এক মুহূর্ত কোল হইতে নামাইতে চায় না। তাহার এমন অবস্থা যে, মধুকৈবর্তের স্বভাবের কুটিলতার কথাও সে প্রায় বিস্মৃত হইবার জো হইল।

বনোয়ারির ছেলে-ভালোবাসা অত্যন্ত প্রবল। যাহা কিছু ছোটো, অক্ষম, সুকুমার, তাহার প্রতি তাহার গভীর স্নেহ এবং করুণা। সকল মানুষেরই প্রকৃতির মধ্যে বিধাতা এমন একটা-কিছু দেন যাহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ; নহিলে বনোয়ারি যে কেমন করিয়া পাখি শিকার করিতে পারে বোঝা যায় না।

কিরণের কোলে একটি শিশুর উদয় দেখিবে, এই ইচ্ছা বনোয়ারির মনে বহুকাল হইতে অতৃপ্ত হইয়া আছে। এইজন্য বংশীর ছেলে হইলে প্রথমটা তাহার মনে একটু ঈর্ষার বেদনা জন্মিয়াছিল, কিন্তু সেটাকে দূর করিয়া দিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই শিশুটিকে বনোয়ারি খুবই ভালোবাসিতে পারিত, কিন্তু ব্যাঘাতের কারণ হইল এই যে, যত দিন যাইতে লাগিল কিরণ তাহাকে লইয়া অত্যন্ত বেশি ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর সঙ্গে বনোয়ারির মিলনে বিস্তর ফাঁক পড়িতে লাগিল। বনোয়ারি স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, এতদিন পরে কিরণ এমন একটা কিছু পাইয়াছে যাহা তাহার হৃদয়কে সত্যসত্যই

পূর্ণ করিতে পারে। বনোয়ারি যেন তাহার স্ত্রীর হৃদয়হর্ম্যের একজন ভাড়াটে, যতদিন বাড়ির কর্তা অনুপস্থিত ছিল ততদিন সমস্ত বাড়িটা সে ভোগ করিত, কেহ বাধা দিত না, এখন গৃহস্বামী আসিয়াছে তাই ভাড়াটে সব ছাড়িয়া তাহার কোণের ঘরটি মাত্র দখল করিতে অধিকারী। কিরণ স্নেহে যে কতদূর তন্ময় হইতে পারে, তাহার আত্মবিসর্জনের শক্তি যে কত প্রবল, তাহা বনোয়ারি যখন দেখিল তখন তাহার মন মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এই হৃদয়কে আমি তো জাগাইতে পারি নাই, অথচ আমার যাহা সাধ্য তাহা তো করিয়াছি।'

শুধু তাই নয়, এই ছেলেটির সূত্রে বংশীর ঘরই যেন কিরণের কাছে বেশি আপন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত মন্ত্রণা আলোচনা বংশীর সঙ্গেই ভালো করিয়া জমে। সেই সূক্ষ্মবুদ্ধি সূক্ষ্মশরীর রসরক্তহীন ক্ষীণজীবী ভীরু মানুষটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল। সংসারের সকল লোকে তাহাকেই বনোয়ারির চেয়ে সকল বিষয়ে যোগ্য বলিয়া মনে করে তাহা বনোয়ারির সহিয়াছে, কিন্তু আজ সে যখন বার বার দেখিল মানুষ হিসাবে তাহার স্ত্রীর কাছে বংশীর মূল্য বেশি, তখন নিজের ভাগ্য এবং বিশ্বসংসারের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন হইল না।

এমন সময়ে পরীক্ষার কাছাকাছি কলিকাতার বাসা হইতে খবর আসিল, বংশী জ্বরে পড়িয়াছে এবং ডাক্তার আরোগ্য অসাধ্য বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে। বনোয়ারি কলিকাতায় গিয়া দিনরাত জাগিয়া বংশীর সেবা করিল, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না।

মৃত্যু বনোয়ারির স্মৃতি হইতে সমস্ত কাঁটা উৎপাটিত করিয়া লইল। বংশী যে তাহার ছোটো ভাই এবং শিশুবয়সে দাদার কোলে যে তাহার স্নেহের আশ্রয় ছিল, এই কথাই তাহার মনে অশ্রুধৌত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত প্রাণের যত্ন দিয়া শিশুটিকে মানুষ করিতে সে কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু, এই শিশু সম্বন্ধে কিরণ তাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছে। ইহার প্রতি তাহার স্বামীর বিরাগ সে প্রথম হইতেই লক্ষ করিয়াছে। স্বামীর সম্বন্ধে কিরণের মনে কেমন একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, অপর সাধারণের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহার স্বামীর পক্ষে ঠিক তাহার উলটা। তাহাদের বংশের এই তো একমাত্র কুলপ্রদীপ, ইহার মূল্য যে কী তাহা আর-সকলেই বোঝে, নিশ্চয় সেইজন্যই তাহার স্বামী তাহা বোঝে না। কিরণের মনে সর্বদাই ভয়, পাছে বনোয়ারির বিদ্বেষদৃষ্টি ছেলেটির অমঙ্গল ঘটায়। তাহার দেবর বাঁচিয়া নাই, কিরণের সন্তানসম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহই আশা করে না, অতএব এই শিশুটিকে কোনোমতে সকল প্রকার অকল্যাণ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবে রক্ষা। এইরূপে বংশীর ছেলেটিকে যত্ন করিবার পথ বনোয়ারির পক্ষে বেশ স্বাভাবিক হইল না।

বাড়ির সকলের আদরে ক্রমে ছেলেটি বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নাম হইল হরিদাস। এত বেশি আদরের আওতায় সে যেন কেমন ক্ষীণ এবং ক্ষণভঙ্গুর আকার ধারণ করিল। তাগা-তাবিজ-মাদুলিতে তাহার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন, রক্ষকের দল সর্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া।

ইহার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বনোয়ারির সঙ্গে তাহার দেখা হয়। জ্যাঠামশায়ের ঘোড়ায় চড়িবার চাবুক লইয়া আস্ফালন করিতে সে বড়ো ভালোবাসে। দেখা হইলেই বলে 'চাবু'। বনোয়ারি ঘর হইতে চাবুক বাহির করিয়া আনিয়া বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ করিতে থাকে, তাহার ভারি আনন্দ হয়। বনোয়ারি এক-একদিন তাহাকে আপনার ঘোড়ার উপর বসাইয়া দেয়, তাহাতে বাড়িসুদ্ধ লোক একেবারে হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে। বনোয়ারি কখনো কখনো আপনার বন্দুক লইয়া তাহার সঙ্গে খেলা করে, দেখিতে পাইলে কিরণ ছুটিয়া আসিয়া বালককে সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু, এই-সকল নিষিদ্ধ আমোদেই হরিদাসের সকলের চেয়ে অনুরাগ। এইজন্য সকল প্রকার বিঘ্ন-সত্ত্বে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তাহার খুব ভাব হইল।

বহুকাল অব্যাহতির পর এক সময়ে হঠাৎ এই পরিবারে মৃত্যুর আনাগোনা ঘটিল। প্রথমে মনোহরের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তাহার পরে নীলকণ্ঠ যখন কর্তার জন্য বিবাহের পরামর্শ ও পাত্রীর সন্ধান করিতেছে এমন সময় বিবাহের লগ্নের পূর্বেই মনোহরের মৃত্যু হইল। তখন হরিদাসের বয়স আট।

মৃত্যুর পূর্বে মনোহর বিশেষ করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র এই বংশধরকে কিরণ এবং নীলকণ্ঠের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন ; বনোয়ারিকে কোনো কথাই বলিলেন না।

বাক্স হইতে উইল যখন বাহির হইল তখন দেখা গেল, মনোহর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরিদাসকে দিয়া গিয়াছেন। বনোয়ারি যাবজ্জীবন দুই শত টাকা করিয়া মাসহারা পাইবেন। নীলকণ্ঠ উইলের এক্‌জিক্যুটর, তাহার উপরে ভার রহিল, সে যতদিন বাঁচে হালদার-পরিবারের বিষয় এবং সংসারের ব্যবস্থা সেই করিবে।

বনোয়ারি বুঝিলেন, এ পরিবারে কেহ তাঁহাকে ছেলে দিয়াও ভরসা পায় না, বিষয় দিয়াও না। তিনি কিছুই পারেন না, সমস্তই নষ্ট করিয়া দেন, এ সম্বন্ধে এ বাড়িতে কাহারও দুই মত নাই। অতএব, তিনি বরাদ্দমত আহার করিয়া কোণের ঘরে নিদ্রা দিবেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ বিধান।

তিনি কিরণকে বলিলেন, "আমি নীলকণ্ঠের পেন্‌সন্ খাইয়া বাঁচিব না। এ বাড়ি ছাড়িয়া চলো আমার সঙ্গে কলিকাতায়।"

"ওমা ! সে কী কথা ! এ তো তোমারই বাপের বিষয়, আর হরিদাস তো তোমারই আপন ছেলের তুল্য। ওকে বিষয় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তুমি রাগ কর কেন !"

হায় হায়, তাহার স্বামীর হৃদয় কী কঠিন। এই কচি ছেলের উপরেও ঈর্ষা করিতে তাহার মন ওঠে ? তাহার শ্বশুর যে উইলটি লিখিয়াছে কিরণ মনে মনে তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস, বনোয়ারির হাতে যদি বিষয় পড়িত তবে রাজ্যের যত ছোটোলোক, যত যদু মধু, যত কৈবর্ত এবং মুসলমান জোলার দল তাহাকে ঠকাইয়া কিছু আর বাকি রাখিত না এবং হালদার-বংশের এই ভাবী আশা একদিন অকূলে ভাসিত। শ্বশুরের কুলে বাতি জ্বালিবার দীপটি তো ঘরে আসিয়াছে, এখন তাহার তৈলসঞ্চয় যাহাতে নষ্ট না হয় নীলকণ্ঠই তো তাহার উপযুক্ত প্রহরী।

বনোয়ারি দেখিল, নীলকণ্ঠ অন্তঃপুরে আসিয়া ঘরে ঘরে সমস্ত জিনিসপত্রের লিস্ট করিতেছে এবং যেখানে যত সিন্দুক-বাক্স আছে তাহাতে তালাচাবি লাগাইতেছে। অবশেষে কিরণের শোবার ঘরে আসিয়া সে বনোয়ারির নিত্যব্যবহার্য সমস্ত দ্রব্য ফর্দভুক্ত করিতে লাগিল। নীলকণ্ঠের অন্তঃপুরে গতিবিধি আছে, সুতরাং কিরণ তাহাকে লজ্জা করে না। কিরণ শ্বশুরের শোকে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু মুছিবার অবকাশে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিশেষ করিয়া সমস্ত জিনিস বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

বনোয়ারি সিংহগর্জনে গর্জিয়া উঠিয়া নীলকণ্ঠকে বলিল, "তুমি এখনি আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাও।"

নীলকণ্ঠ নম্র হইয়া কহিল, "বড়োবাবু, আমার তো কোনো দোষ নাই। কর্তার উইল-অনুসারে আমাকে তো সমস্ত বুঝিয়া লইতে হইবে। আসবাবপত্র সমস্তই তো হরিদাসের।"

কিরণ মনে মনে কহিল, 'দেখো একবার, ব্যাপারখানা দেখো। হরিদাস কি আমাদের পর। নিজের ছেলের সামগ্রী ভোগ করিতে আবার লজ্জা কিসের। আর, জিনিসপত্র মানুষের সঙ্গে যাইবে না কি। আজ না হয় কাল ছেলেপুলেরাই তো ভোগ করিবে।'

এ বাড়ির মেঝে বনোয়ারির পায়ের তলায় কাঁটার মতো বিঁধিতে লাগিল, এ বাড়ির দেয়াল তাহার দুই চক্ষুকে যেন দগ্ধ করিল। তাহার বেদনা যে কিসের তাহা বলিবার লোকও এই বৃহৎ পরিবারে কেহ নাই।

এই মুহূর্তেই বাড়িঘর সমস্ত ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য বনোয়ারির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু, তাহার রাগের জ্বালা যে থামিতে চায় না। সে চলিয়া যাইবে আর নীলকণ্ঠ আরামে একাধিপত্য করিবে, এ কল্পনা সে সহ্য করিতে পারিল না। এখনি কোনো একটা গুরুতর অনিষ্ট করিতে না পারিলে তাহার মন শান্ত হইতে পারিতেছে না। সে বলিল, 'নীলকণ্ঠ কেমন বিষয় রক্ষা করিতে পারে আমি তাহা দেখিব।'

বাহিরে তাহার পিতার ঘরে গিয়া দেখিল, সে ঘরে কেহই নাই। সকলেই অন্তঃপুরের তৈজসপত্র ও গহনা প্রভৃতির খবরদারি করিতে গিয়াছে। অত্যন্ত সাবধান লোকেরও সাবধানতায় ত্রুটি থাকিয়া

যায়। নীলকণ্ঠের হুঁশ ছিল না যে, কর্তার বাক্স খুলিয়া উইল বাহির করিবার পরে বাক্সয় চাবি লাগানো হয় নাই। সেই বাক্সয় তাড়াবাঁধা মূল্যবান সমস্ত দলিল ছিল। সেই দলিলগুলির উপরেই এই হালদার-বংশের সম্পত্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বনোয়ারি এই দলিলগুলির বিবরণ কিছুই জানে না, কিন্তু এগুলি যে অত্যন্ত কাজের এবং ইহাদের অভাবে মামলা-মকদ্দমায় পদে পদে ঠকিতে হইবে তাহা সে বোঝে। কাগজগুলি লইয়া সে নিজের একটা রুমালে জড়াইয়া তাহাদের বাহিরের বাগানে চাঁপাতলার বাঁধানো চাতালে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নীলকণ্ঠ বনোয়ারির কাছে উপস্থিত হইল। নীলকণ্ঠের দেহের ভঙ্গি অত্যন্ত বিনম্র, কিন্তু তাহার মুখের মধ্যে এমন একটা-কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, নম্রতার দ্বারা নীলকণ্ঠ তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

নীলকণ্ঠ বলিল, "কর্তার শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে—"

বনোয়ারি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "আমি তাহার কী জানি।"

নীলকণ্ঠ কহিল, "সে কী কথা। আপনিই তো শ্রাদ্ধাধিকারী।"

'মস্ত অধিকার! শ্রাদ্ধের অধিকার! সংসারে কেবল ঐটুকুতে আমার প্রয়োজন আছে— আমি আর কোনো কাজেরই না।' বনোয়ারি গর্জিয়া উঠিল, "যাও, যাও, আমাকে বিরক্ত করিয়ো না।"

নীলকণ্ঠ গেল কিন্তু তাহার পিছন হইতে বনোয়ারির মনে হইল, সে হাসিতে হাসিতে গেল। বনোয়ারির মনে হইল, বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর এই অশ্রদ্ধিত, এই পরিত্যক্তকে লইয়া আপনাদের মধ্যে হাসিতামাশা করিতেছে। যে মানুষ বাড়ির অথচ বাড়ির নহে, তাহার মতো ভাগ্যকর্তৃক পরিহসিত আর কে আছে। পথের ভিক্ষুকও নহে।

বনোয়ারি সেই দলিলের তাড়া লইয়া বাহির হইল। হালদার-পরিবারের প্রতিবেশী ও প্রতিযোগী জমিদার ছিল প্রতাপপুরের বাঁড়ুজ্যে জমিদারেরা। বনোয়ারি স্থির করিল, 'এই দলিল-দস্তাবেজ তাহাদের হাতে দিব, বিষয়সম্পত্তি সমস্ত ছারখার হইয়া যাক।'

বাহির হইবার সময় হরিদাস উপরের তলা হইতে তাহার সুমধুর বালককণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল, "জ্যাঠামশায়, তুমি বাহিরে যাইতেছ, আমিও তোমার সঙ্গে বাহিরে যাইব।"

বনোয়ারির মনে হইল, বালকের অশুভগ্রহ এই কথা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লইল। 'আমি তো পথে বাহির হইয়াছি, উহাকেও আমার সঙ্গে বাহির করিব। যাবে যাবে, সব ছারখার হইবে।'

বাহিরের বাগান পর্যন্ত যাইতেই বনোয়ারি একটা বিষম গোলমাল শুনিতে পাইল। অদূরে হাটের সংলগ্ন একটি বিধবার কুটিরে আগুন লাগিয়াছে। বনোয়ারির চিরাভ্যাসক্রমে এ দৃশ্য দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দলিলের তাড়া সে চাঁপাতলায় রাখিয়া আগুনের কাছে ছুটিল।

যখন ফিরিয়া আসিল, দেখিল, তাহার সেই কাগজের তাড়া নাই। মুহূর্তের মধ্যে হৃদয়ে শেল বিঁধাইয়া এই কথাটা মনে হইল, 'নীলকণ্ঠের কাছে আবার আমার হার হইল। বিধবার ঘর জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেলে তাহাতে ক্ষতি কী ছিল।' তাহার মনে হইল, চতুর নীলকণ্ঠই ওটা পুনর্বার সংগ্রহ করিয়াছে।

একেবারে ঝড়ের মতো সে কাছারিঘরে আসিয়া উপস্থিত। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বনোয়ারিকে প্রণাম করিল। বনোয়ারির মনে হইল, ঐ বাক্সের মধ্যেই সে কাগজ লুকাইল। কোনো-কিছু না বলিয়া একেবারে সেই বাক্সটা খুলিয়া তাহার মধ্যে কাগজ ঘাঁটিতে লাগিল। তাহার মধ্যে হিসাবের খাতা এবং তাহারই জোগাড়ের সমস্ত নথি। বাক্স উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া কিছুই মিলিল না।

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বনোয়ারি কহিল, "তুমি চাঁপাতলায় গিয়াছিলে?"

নীলকণ্ঠ বলিল, "আজ্ঞা, হাঁ, গিয়াছিলাম বৈকি। দেখিলাম, আপনি ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছেন, কী

হইল তাহাই জানিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম।"

বনোয়ারি। আমার রুমালে-বাঁধা কাগজগুলা তুমিই লইয়াছ।

নীলকণ্ঠ নিতান্ত ভালোমানুষের মতো কহিল, "আজ্ঞা, না।"

বনোয়ারি। মিথ্যা কথা বলিতেছ। তোমার ভালো হইবে না, এখনি ফিরাইয়া দাও।

বনোয়ারি মিথ্যা তর্জন গর্জন করিল। কী জিনিস তাহার হারাইয়াছে তাহাও সে বলিতে পারিল না এবং সেই চোরাই মাল সম্বন্ধে তাহার কোনো জোর নাই জানিয়া সে মনে মনে অসাবধান মূঢ় আপনাকেই যেন ছিন্ন ছিন্ন করিতে লাগিল।

কাছারিতে এইরূপ পাগলামি করিয়া সে চাঁপাতলায় আবার খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিল। মনে মনে মাতৃদিব্য করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল, 'যে করিয়া হউক এ কাগজগুলা পুনরায় উদ্ধার করিব তবে আমি ছাড়িব।' কেমন করিয়া উদ্ধার করিবে তাহা চিন্তা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, কেবল ক্রুদ্ধ বালকের মতো বার বার মাটিতে পদাঘাত করিতে করিতে বলিল, 'উদ্ধার করিবই, করিবই, করিবই।'

শ্রান্তদেহে সে গাছতলায় বসিল। কেহ নাই, তাহার কেহ নাই এবং তাহার কিছুই নাই। এখন হইতে নিঃসম্বলে আপন ভাগ্যের সঙ্গে এবং সংসারের সঙ্গে তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। তাহার পক্ষে মানসম্ভ্রম নাই, ভদ্রতা নাই, প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছুই নাই। আছে কেবল মরিবার এবং মারিবার অধ্যবসায়।

এইরূপ মনে মনে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে নিরতিশয় ক্লান্তিতে চাতালের উপর পড়িয়া কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যখন জাগিয়া উঠিল তখন হঠাৎ বুঝিতে পারিল না, কোথায় সে আছে। ভালো করিয়া সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিয়া দেখে তাহার শিয়রের কাছে হরিদাস বসিয়া। বনোয়ারিকে জাগিতে দেখিয়া হরিদাস বলিয়া উঠিল, "জ্যাঠামশায়, তোমার কী হারাইয়াছে বলো দেখি।"

বনোয়ারি স্তব্ধ হইয়া গেল— হরিদাসের এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না।

হরিদাস কহিল, "আমি যদি দিতে পারি আমাকে কী দিবে।"

বনোয়ারির মনে হইল, হয়তো আর-কিছু। সে বলিল, "আমার যাহা আছে সব তোকে দিব।"

এ কথা সে পরিহাস করিয়াই বলিল; সে জানে, তাহার কিছুই নাই।

তখন হরিদাস আপন কাপড়ের ভিতর হইতে বনোয়ারির রুমালে-মোড়া সেই কাগজের তাড়া বাহির করিল। এই রঙিন রুমালটাতে বাঘের ছবি আঁকা ছিল; সেই ছবি তাহার জ্যাঠা তাহাকে অনেকবার দেখাইয়াছে। এই রুমালটার প্রতি হরিদাসের বিশেষ লোভ। সেইজন্যই অগ্নিদাহের গোলমালে ভৃত্যেরা যখন বাহিরে ছুটিয়াছিল সেই অবকাশে বাগানে আসিয়া হরিদাস চাঁপাতলায় দূর হইতে এই রুমালটা দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল।

হরিদাসকে বনোয়ারি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; কিছুক্ষণ পরে তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, অনেকদিন পূর্বে সে তাহার এক নূতন-কেনা কুকুরকে শায়েস্তা করিবার জন্য তাহাকে বারংবার চাবুক মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। একবার তাহার চাবুক হারাইয়া গিয়াছিল, কোথাও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যখন চাবুকের আশা পরিত্যাগ করিয়া সে বসিয়া আছে এমন সময় দেখিল, সেই কুকুরটা কোথা হইতে চাবুকটা মুখে করিয়া মনিবের সম্মুখে আনিয়া পরমানন্দে লেজ নাড়িতেছে। আর-কোনোদিন কুকুরকে সে চাবুক মারিতে পারে নাই।

বনোয়ারি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "হরিদাস, তুই কী চাস আমাকে বল্।"

হরিদাস কহিল, "আমি তোমার ঐ রুমালটা চাই, জ্যাঠামশায়।"

বনোয়ারি কহিল, "আয় হরিদাস, তোকে কাঁধে চড়াই।"

হরিদাসকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া বনোয়ারি তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। শয়নঘরে গিয়া দেখিল, কিরণ সারাদিন-রৌদ্রে-দেওয়া কম্বলখানি বারান্দা হইতে তুলিয়া আনিয়া ঘরের মেজের উপর পাতিতেছে। বনোয়ারির কাঁধের উপর হরিদাসকে দেখিয়া সে উদ্‌বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, "নামাইয়া

দাও, নামাইয়া দাও— উহাকে তুমি ফেলিয়া দিবে।"

বনোয়ারি কিরণের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "আমাকে আর ভয় করিয়ো না, আমি ফেলিয়া দিব না।"

এই বলিয়া সে কাঁধ হইতে নামাইয়া হরিদাসকে কিরণের কোলের কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। তাহার পরে সেই কাগজগুলি লইয়া কিরণের হাতে দিয়া কহিল, "এগুলি হরিদাসের বিষয়সম্পত্তির দলিল। যত্ন করিয়া রাখিয়ো।"

কিরণ আশ্চর্য হইয়া কহিল, "তুমি কোথা হইতে পাইলে।"

বনোয়ারি কহিল, "আমি চুরি করিয়াছিলাম।"

তাহার পর হরিদাসকে বুকে টানিয়া কহিল, "এই নে বাবা, তোর জ্যাঠামশায়ের যে মূল্যবান সম্পত্তিটির প্রতি তোর লোভ পড়িয়াছে, এই নে।" বলিয়া রুমালটি তাহার হাতে দিল।

তাহার পর আর-একবার ভালো করিয়া কিরণের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিল, সেই তন্বী এখন তো তন্বী নাই, কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমরুশতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারির অন্য সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়াই ভালো।

সেই রাত্রেই বনোয়ারির আর দেখা নাই। কেবল সে একছত্র চিঠি লিখিয়া গেছে যে, সে চাকরি খুঁজিতে বাহির হইল।

বাপের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিল না! দেশসুদ্ধ লোক তাই লইয়া তাহাকে ধিক্ ধিক্ করিতে লাগিল।

বৈশাখ ১৩২১

হৈমন্তী

কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেইজন্যই তাড়া।

আমি ছিলাম বর। সুতরাং, বিবাহসম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল। আমার কাজ আমি করিয়াছি, এফ. এ. পাস করিয়া বৃত্তি পাইয়াছি। তাই প্রজাপতির দুই পক্ষ, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল।

আমাদের দেশে যে-মানুষ একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো উদ্‌বেগ থাকে না। নরমাংসের স্বাদ পাইলে মানুষের সম্বন্ধে বাঘের যে দশা হয়, স্ত্রীর সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেইরূপ হইয়া উঠে। অবস্থা যেমনি ও বয়স যতই হউক, স্ত্রীর অভাব ঘটিবামাত্র তাহা পূরণ করিয়া লইতে তাহার কোনো দ্বিধা থাকে না। যত দ্বিধা ও দুশ্চিন্তা সে দেখি আমাদের নবীন ছাত্রদের। বিবাহের পৌনঃপুনিক প্রস্তাবে তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা চুল কলপের আশীর্বাদে পুনঃপুন কাঁচা হইয়া উঠে, আর প্রথম ঘটকালির আঁচেই ইহাদের কাঁচা চুল ভাবনায় একরাত্রে পাকিবার উপক্রম হয়।

সত্য বলিতেছি, আমার মনে এমন বিষম উদ্‌বেগ জন্মে নাই। বরঞ্চ বিবাহের কথায় আমার মনের মধ্যে যেন দক্ষিনে হাওয়া দিতে লাগিল। কৌতূহলী কল্পনার কিশলয়গুলির মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িয়া গেল। যাহাকে বার্কের ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশনের নোট পাঁচ-সাত খাতা মুখস্থ করিতে হইবে, তাহার পক্ষে এ ভাবটা দোষের। আমার এ লেখা যদি টেক্‌স্‌ট্‌বুক-কমিটির অনুমোদিত হইবার কোনো আশঙ্কা থাকিত তবে সাবধান হইতাম।

কিন্তু, এ কী করিতেছি। এ কি একটা গল্প যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম। এমন সুরে আমার লেখা শুরু হইবে এ আমি কি জানিতাম। মনে ছিল, কয় বৎসরের বেদনার যে মেঘ কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বৈশাখসন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মতো প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব। কিন্তু, না পারিলাম বাংলায় শিশুপাঠ্য বই লিখিতে, কারণ সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই ; আর, না পারিলাম কাব্য রচনা করিতে, কারণ মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন পুষ্পিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেইজন্যই দেখিতেছি, আমার ভিতরকার শ্মশানচারী সন্ন্যাসীটা অট্টহাস্যে আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিয়াছে। না করিয়া করিবে কী। তাহার-যে অশ্রু শুকাইয়া গেছে। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রই তো জ্যৈষ্ঠেরই অশ্রুশূন্য রোদন।

আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছিল তাহার সত্য নামটা দিব না। কারণ, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার নামটি লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবাদের কোনো আশঙ্কা নাই। যে তাম্রশাসনে তাহার নাম খোদাই করা আছে সেটা আমার হৃদয়পট। কোনোকালে সে পট এবং সে নাম বিলুপ্ত হইবে, এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। কিন্তু, যে অমৃতলোকে তাহা অক্ষয় হইয়া রহিল সেখানে ঐতিহাসিকের আনাগোনা নাই।

আমার এ লেখায় তাহার যেমন হউক একটা নাম চাই। আচ্ছা, তাহার নাম দিলাম শিশির। কেননা, শিশিরে কান্নাহাসি একেবারে এক হইয়া আছে, আর শিশিরে ভোরবেলাটুকুর কথা সকালবেলায় আসিয়া ফুরাইয়া যায়।

শিশির আমার চেয়ে কেবল দুই বছরের ছোটো ছিল। অথচ, আমার পিতা যে গৌরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে। তাঁহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী ; দেশের প্রচলিত ধর্মকর্ম কিছুতে তাঁহার আস্থা ছিল না ; তিনি কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। আমার পিতা উগ্রভাবে সমাজের অনুগামী ; মানিতে তাঁহার বাধে এমন জিনিস আমাদের সমাজে, সদরে বা অন্দরে, দেউড়ি বা খিড়কির পথে খুঁজিয়া পাওয়া দায়, কারণ ইনিও কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভয়েরই মতামত বিদ্রোহের দুই বিভিন্ন মূর্তি। কোনোটাই সহল স্বাভাবিক নহে। তবুও বড়ো বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ, মেয়ের বয়স বড়ো বলিয়াই পণের অঙ্কটাও বড়ো। শিশির আমার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল, কন্যার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ পূরণ করিয়া তুলিতেছে।

আমার শ্বশুরের বিশেষ কোনো একটা মতের বালাই ছিল না। তিনি পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো রাজার অধীনে বড়ো কাজ করিতেন। শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়। মেয়ে বৎসর-অন্তে এক-এক বছর করিয়া বড়ো হইতেছে, তাহা আমার শ্বশুরের চোখেই পড়ে নাই। সেখানে তাঁহার সমাজের লোক এমন কেহই ছিল না যে তাঁহাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে।

শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইল ; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো, সমাজের ষোলো নহে। কেহ তাহাকে আপন বয়সের জন্য সতর্ক হইতে পরামর্শ দেয় নাই, সেও আপন বয়সটার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

কলেজে তৃতীয় বৎসরে পা দিয়াছি, আমার বয়স উনিশ, এমন সময় আমার বিবাহ হইল। বয়সটা সমাজের মতে বা সমাজসংস্কারকের মতে উপযুক্ত কি না তাহা লইয়া তাহারা দুই পক্ষ লড়াই করিয়া রক্তারক্তি করিয়া মরুক, কিন্তু আমি বলিতেছি, সে বয়সটা পরীক্ষা পাস করিবার পক্ষে যত ভালো হউক, বিবাহের সম্বন্ধ আসিবার পক্ষে কিছুমাত্র কম ভালো নয়।

বিবাহের অরুণোদয় হইল একখানি ফোটোগ্রাফের আভাসে। পড়া মুখস্থ করিতেছিলাম। একজন ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়া আমার টেবিলের উপরে শিশিরের ছবিখানি রাখিয়া বলিলেন, "এইবার সত্যিকার পড়া পড়ো— একেবারে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া।"

কোনো একজন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি। মা ছিল না, সুতরাং কেহ তাহার চুল টানিয়া বাঁধিয়া খোপায় জরি জড়াইয়া, সাহা বা মল্লিক কোম্পানির জবড়জঙ জ্যাকেট পরাইয়া বরপক্ষের চোখ

ভুলাইবার জন্য জালিয়াতির চেষ্টা করে নাই। ভারি একখানি সাদাসিধা মুখ, সাদাসিধা দুটি চোখ, এবং সাদাসিধা একটি শাড়ি। কিন্তু, সমস্তটি লইয়া কী যে মহিমা সে আমি বলিতে পারি না। যেমন তেমন একখানি চৌকিতে বসিয়া, পিছনে একখানা ডোরা-দাগ-কাটা শতরঞ্চ ঝোলানো, পাশে একটা টিপাইয়ের উপরে ফুলদানিতে ফুলের তোড়া। আর, গালিচার উপরে শাড়ির বাঁকা পাড়টির নীচে দুখানি খালি পা।

পটের ছবিটির উপর আমার মনের সোনার কাঠি লাগিতেই সে আমার জীবনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সেই কালো দুটি চোখ আমার সমস্ত ভাবনার মাঝখানে কেমন করিয়া চাহিয়া রহিল। আর, সেই বাঁকা পাড়ের নীচেকার দুখানি খালি পা আমার হৃদয়কে আপন পদ্মাসন করিয়া লইল।

পঞ্জিকার পাতা উলটাইতে থাকিল ; দুটা-তিনটা বিবাহের লগ্ন পিছাইয়া যায়, শ্বশুরের ছুটি আর মেলে না। ও দিকে সামনে একটা অকাল চার-পাঁচটা মাস জুড়িয়া আমার আইবড় বয়সের সীমানাটাকে উনিশ বছর হইতে অনর্থক বিশ বছরের দিকে ঠেলিয়া দিবার চক্রান্ত করিতেছে। শ্বশুরের এবং তাঁহার মনিবের উপর রাগ হইতে লাগিল।

যা হউক, অকালের ঠিক পূর্বলগ্নটাতে আসিয়া বিবাহের দিন ঠেকিল। সেদিনকার সানাইয়ের প্রত্যেক তানটি যে আমার মনে পড়িতেছে। সেদিনকার প্রত্যেক মুহূর্তটিকে আমি আমার সমস্ত চৈতন্য দিয়া স্পর্শ করিয়াছি। আমার সেই উনিশ বছরের বয়সটি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাক্।

বিবাহসভায় চারি দিকে হট্টগোল ; তাহারই মাঝখানে কন্যার কোমল হাতখানি আমার হাতের উপর পড়িল। এমন আশ্চর্য আর কী আছে। আমার মন বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম।' কাহাকে পাইলাম। এ যে দুর্লভ, এ যে মানবী, ইহার রহস্যের কি অন্ত আছে।

আমার শ্বশুরের নাম গৌরীশংকর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাঁহার গাম্ভীর্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়া ছিল। আর, তাঁহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে একটি প্রস্রবণ ছিল তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

কর্মক্ষেত্রে ফিরিবার পূর্বে আমার শ্বশুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার মেয়েটিকে আমি সতেরো বছর ধরিয়া জানি, আর তোমাকে এই ক'টি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। যে ধন দিলাম তাহার মূল্য যেন বুঝিতে পার, ইহার বেশি আশীর্বাদ আর নাই।"

তাঁহার বেহাই বেহান সকলেই তাঁহাকে বার বার করিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বেহাই, মনে কোনো চিন্তা রাখিয়ো না। তোমার মেয়েটি যেমন বাপকে ছাড়িয়া আসিয়াছে, এখানে তেমনি বাপ মা উভয়কেই পাইল।"

তাহার পরে শ্বশুরমশায় মেয়ের কাছে বিদায় লইবার বেলা হাসিলেন ; বলিলেন, "বুড়ি চলিলাম। তোর একখানি মাত্র এই বাপ, আজ হইতে ইহার যদি কিছু খোওয়া যায় বা চুরি যায় বা নষ্ট হয় আমি তাহার জন্য দায়ী নই।"

মেয়ে বলিল, "তাই বৈকি। কোথাও একটু যদি লোকসান হয় তোমাকে তার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।"

অবশেষে নিত্য তাঁহার যে-সব বিষয়ে বিভ্রাট ঘটে বাপকে সে-সম্বন্ধে সে বার বার সতর্ক করিয়া দিল। আহারসম্বন্ধে আমার শ্বশুরের যথেষ্ট সংযম ছিল না ; গুটিকয়েক অপথ্য ছিল, তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি— বাপকে সেই-সমস্ত প্রলোভন হইতে যথাসম্ভব ঠেকাইয়া রাখা মেয়ের এক কাজ ছিল। তাই আজ সে বাপের হাত ধরিয়া উদ্‌বেগের সহিত বলিল, "বাবা, তুমি আমার কথা রেখো— রাখবে ?"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "মানুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য। অতএব কথা না-দেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।"

তাহার পরে বাপ চলিয়া আসিলে ঘরে কপাট পড়িল। তাহার পরে কী হইল কেহ জানে না।

বাপ ও মেয়ের অশ্রুহীন বিদায়ব্যাপার পাশের ঘর হইতে কৌতূহলী অন্তঃপুরিকার দল দেখিল ও শুনিল। অবাক কাণ্ড! খোট্টার দেশে থাকিয়া খোট্টা হইয়া গেছে! মায়ামমতা একেবারে নাই!

আমার শ্বশুরের বন্ধু বনমালীবাবুই আমাদের বিবাহের ঘটকালি করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারেরও পরিচিত। তিনি আমার শ্বশুরকে বলিয়াছিলেন, "সংসারে তোমার তো ঐ একটি মেয়ে। এখন ইহাদেরই পাশে বাড়ি লইয়া এইখানেই জীবনটা কাটাও।"

তিনি বলিলেন, "যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইবার মতো এমন বিড়ম্বনা আর নাই।"

সব শেষে আমাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া অপরাধীর মতো সসংকোচে বলিলেন, "আমার মেয়েটির বই পড়িবার শখ, এবং লোকজনকে খাওয়াইতে ও বড়ো ভালোবাসে। এজন্য বেহাইকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে টাকা পাঠাইব। তোমার বাবা জানিতে পারিলে কি রাগ করিবেন।"

প্রশ্ন শুনিয়া কিছু আশ্চর্য হইলাম। সংসারে কোনো একটা দিক হইতে অর্থসমাগম হইলে বাবা রাগ করিবেন, তাঁহার মেজাজ এত খারাপ তো দেখি নাই।

যেন ঘুষ দিতেছেন এমনিভাবে আমার হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়াই আমার শ্বশুর দ্রুত প্রস্থান করিলেন; আমার প্রণাম লইবার জন্য সবুর করিলেন না। পিছন হইতে দেখিতে পাইলাম, এইবার পকেট হইতে রুমাল বাহির হইল।

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। মনে বুঝিলাম, ইহারা অন্য জাতের মানুষ।

বন্ধুদের অনেককেই তো বিবাহ করিতে দেখিলাম। মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীটিকে একেবারে এক গ্রাসে গলাধঃকরণ করা হয়। পাকযন্ত্রে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বাদে এই পদার্থটির নানা গুণাগুণ প্রকাশ হইতে পারে এবং ক্ষণে ক্ষণে আভ্যন্তরিক উদ্‌বেগ উপস্থিত হইয়াও থাকে, কিন্তু রাস্তাটুকুতে কোথাও কিছুমাত্র বাধে না। আমি কিন্তু বিবাহসভাতেই বুঝিয়াছিলাম, দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে সংসার চলে, কিন্তু পনেরো-আনা বাকি থাকিয়া যায়। আমার সন্দেহ হয়, অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহমাত্র করে, পায় না এবং জানেও না যে পায় নাই; তাহাদের স্ত্রীর কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না। কিন্তু, সে যে আমার সাধনার ধন ছিল; সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।

শিশির— না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না। একে তো এটা তাহার নাম নয়, তাহাতে এটা তাহার পরিচয়ও নহে। সে সূর্যের মতো ধ্রুব; সে ক্ষণজীবিনী উষার বিদায়ের অশ্রুবিন্দুটি নয়। কী হইবে গোপনে রাখিয়া— তাহার আসল নাম হৈমন্তী।

দেখিলাম, এই সতেরো বছরের মেয়েটির উপরে যৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কী অকলঙ্ক শুভ্র সে, কী নিবিড় পবিত্র।

আমার মনে একটা ভাবনা ছিল যে, লেখাপড়া-জানা বড়ো মেয়ে, কী জানি কেমন করিয়া তাহার মন পাইতে হইবে। কিন্তু, অতি অল্পদিনেই দেখিলাম, মনের রাস্তার সঙ্গে বইয়ের দোকানের রাস্তার কোনো জায়গায় কোনো কাটাকাটি নাই। কবে যে তাহার সাদা মনটির উপরে একটু রঙ ধরিল, চোখে একটু ঘোর লাগিল, কবে যে তাহার সমস্ত শরীর মন যেন উৎসুক হইয়া উঠিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

এ তো গেল এক দিকের কথা। আবার অন্য দিকও আছে, সেটা বিস্তারিত বলিবার সময় আসিয়াছে।

রাজসংসারে আমার শ্বশুরের চাকরি। ব্যাঙ্কে যে তাঁহার কত টাকা জমিল সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি

নানাপ্রকার অঙ্কপাত করিয়াছে, কিন্তু কোনো অঙ্কটাই লাখের নীচে নামে নাই। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, তাহার পিতার দর যেমন-যেমন বাড়িল, হৈমর আদরও তেমনি বাড়িতে থাকিল। আমাদের ঘরের কাজকর্ম রীতিপদ্ধতি শিখিয়া লইবার জন্য সে ব্যগ্র, কিন্তু মা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহে কিছুতেই হাত দিতে দিলেন না। এমন-কি, হৈমর সঙ্গে পাহাড় হইতে যে দাসী আসিয়াছিল যদিও তাহাকে নিজেদের ঘরে ঢুকিতে দিতেন না, তবু তাহার জাত সম্বন্ধে প্রশ্নমাত্র করিলেন না, পাছে বিশ্রী একটা উত্তর শুনিতে হয়।

এমনিভাবেই দিন চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবার মুখ ঘোর অন্ধকার দেখা গেল। ব্যাপারখানা এই— আমার বিবাহে আমার শ্বশুর পনেরো হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়াছিলেন। বাবা তাঁহার এক দালাল বন্ধুর কাছে খবর পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে পনেরো হাজার টাকাই ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে ; তাহার সুদও নিতান্ত সামান্য নহে। লাখ টাকার গুজব তো একেবারেই ফাঁকি।

যদিও আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে আমার বাবার সঙ্গে তাঁহার কোনোদিন কোনো আলোচনাই হয় নাই, তবু বাবা জানি না কোন্ যুক্তিতে ঠিক করিলেন, তাঁহার বেহাই তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবঞ্চনা করিয়াছেন।

তার পরে, বাবার একটা ধারণা ছিল, আমার শ্বশুর রাজার প্রধানমন্ত্রী গোছের একটা-কিছু। খবর লইয়া জানিলেন, তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। বাবা বলিলেন, অর্থাৎ ইস্কুলের হেডমাস্টার— সংসারে ভদ্র পদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে ওঁচা। বাবার বড়ো আশা ছিল, শ্বশুর আজ বাদে কাল যখন কাজে অবসর লইবেন তখন আমিই রাজমন্ত্রী হইব।

এমন সময়ে রাস-উপলক্ষে দেশের কুটুম্বরা আমাদের কলিকাতার বাড়িতে আসিয়া জমা হইলেন। কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। কানাকানি ক্রমে অস্ফুট হইতে স্ফুট হইয়া উঠিল। দূর সম্পর্কের কোনো এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "পোড়া কপাল আমার! নাতবউ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল।"

আর-এক দিদিমাশ্রেণীয়া বলিলেন, "আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপু বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন।"

আমার মা খুব জোরের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, সে কি কথা। বউমার বয়স সবে এগারো বৈ তো নয়, এই আসছে ফাল্গুনে বারোয় পা দিবে। খোট্টার দেশে ডালরুটি খাইয়া মানুষ, তাই অমন বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

দিদিমারা বলিলেন, "বাছ, এখনো চোখে এত কম তো দেখি না। কন্যাপক্ষ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে বয়স ভাঁড়াইয়াছে।"

মা বলিলেন, "আমরা যে কুষ্ঠি দেখিলাম।"

কথাটা সত্য। কিন্তু কোষ্ঠীতেই প্রমাণ আছে, মেয়ের বয়স সতেরো।

প্রবীণারা বলিলেন, "কুষ্ঠিতে কি আর ফাঁকি চলে না।"

এই লইয়া ঘোর তর্ক, এমন-কি, বিবাদ হইয়া গেল।

এমন সময়ে সেখানে হৈম আসিয়া উপস্থিত। কোনো-এক দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।"

মা তাহাকে চোখ টিপিয়া ইশারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না ; বলিল, "সতেরো।"

মা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জান না।"

হৈম কহিল, "আমি জানি, আমার বয়স সতেরো।"

দিদিমারা পরস্পর গা-টেপাটেপি করিলেন।

বধূর নির্বুদ্ধিতায় রাগিয়া উঠিয়া মা বলিলেন, "তুমি তো সব জান! তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগারো।"

হৈম চমকিয়া কহিল, "বাবা বলিয়াছেন ? কখনো না।"

মা কহিলেন, "অবাক করিল। বেহাই আমার সামনে নিজের মুখে বলিলেন, আর মেয়ে বলে 'কখনো না' !" এই বলিয়া আর-একবার চোখ টিপিলেন।

এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল। স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল, "বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না।"

মা গলা চড়াইয়া বলিলেন, "তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস ?"

হৈম বলিল, "আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।"

ইহার পরে মা যতই গালি দিতে লাগিলেন কথাটার কালি ততই গড়াইয়া ছড়াইয়া চারি দিকে লেপিয়া গেল।

মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন, "আইবড় মেয়ের বয়স সতেরো, এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে ? আমাদের এখানে এ-সব চলিবে না, বলিয়া রাখিতেছি।"

হায় রে, তাঁহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধুমাখা পঞ্চম স্বর আজ একেবারে এমন বাজখাঁই খাদে নাবিল কেমন করিয়া।

হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কী বলিব।"

বাবা বলিলেন, "মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো 'আমি জানি না, আমার শাশুড়ি জানেন'।"

কেমন করিয়া মিথ্যা বলিতে না হয় সেই উপদেশ শুনিয়া হৈম এমন ভাবে চুপ করিয়া রহিল যে বাবা বুঝিলেন, তাঁহার সদুপদেশটা একেবারে বাজে খরচ হইল।

হৈমর দুর্গতিতে দুঃখ করিব কী, তাহার কাছে আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। সেদিন দেখিলাম, শরৎপ্রভাতের আকাশের মতো তাহার চোখের সেই সরল উদার দৃষ্টি একটা কী সংশয়ে ম্লান হইয়া গেছে। ভীত হরিণীর মতো সে আমার মুখের দিকে চাহিল। ভাবিল, 'আমি ইহাদিগকে চিনি না।'

সেদিন একখানা শৌখিন-বাঁধাই-করা ইংরাজি কবিতার বই তাহার জন্য কিনিয়া আনিয়াছিলাম। বইখানি সে হাতে করিয়া লইল এবং আস্তে আস্তে কোলের উপর রাখিয়া দিল, একবার খুলিয়া দেখিল না।

আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, "হৈম, আমার উপর রাগ করিয়ো না। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না, আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা।"

হৈম কিছু না বলিয়া একটুখানি হাসিল। সে হাসি বিধাতা যাহাকে দিয়াছেন তাহার কোনো কথা বলিবার দরকার নাই।

পিতার আর্থিক উন্নতির পর হইতে দেবতার অনুগ্রহকে স্থায়ী করিবার জন্য নূতন উৎসাহে আমাদের বাড়িতে পূজার্চনা চলিতেছে। এ পর্যন্ত সে-সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বাড়ির বধূকে ডাক পড়ে নাই। নূতন বধূর প্রতি একদিন পূজা সাজাইবার আদেশ হইল ; সে বলিল, "মা, বলিয়া দাও কী করিতে হইবে।"

ইহাতে কাহারও মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার কথা নয়, কারণ সকলেরই জানা ছিল, মাতৃহীন প্রবাসে কন্যা মানুষ। কিন্তু কেবলমাত্র হৈমকে লজ্জিত করাই এই আদেশের হেতু। সকলেই গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, এ কী কাণ্ড। এ কোন্ নাস্তিকের ঘরের মেয়ে। এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরি নাই।"

এই উপলক্ষে হৈমর বাপের উদ্দেশে যাহা-না-বলিবার তাহা বলা হইল। যখন হইতে কটুকথার হাওয়া দিয়াছে, হৈম একেবারে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছে। একদিনের জন্য কাহারও সামনে সে চোখের জলও ফেলে নাই। আজ তাহার বড়ো বড়ো দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনারা জানেন— সে দেশে আমার বাবাকে সকলে ঋষি বলে ?"

ঋষি বলে ! ভারি একটা হাসি পড়িয়া গেল। ইহার পরে তাহার পিতার উল্লেখ করিতে হইলে প্রায়ই বলা হইত, তোমার ঋষিবাবা ! এই মেয়েটির সকলের চেয়ে দরদের জায়গাটি যে কোথায় তাহা আমাদের সংসার বুঝিয়া লইয়াছিল।

বস্তুত, আমার শ্বশুর ব্রাহ্মও নন, খৃষ্টানও নন, হয়তো বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই। মেয়েকে তিনি অনেক পড়াইয়াছেন-শুনাইয়াছেন, কিন্তু কোনোদিনের জন্য দেবতা সম্বন্ধে তিনি তাহাকে কোনো উপদেশ দেন নাই। বনমালীবাবু এ লইয়া তাঁহাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা বুঝি না তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে।"

অন্তঃপুরে হৈমর একটি প্রকৃত ভক্ত ছিল, সে আমার ছোটো বোন নারানী। বউদিদিকে ভালোবাসে বলিয়া তাহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল। সংসারযাত্রায় হৈমর সমস্ত অপমানের পালা আমি তাহার কাছেই শুনিতে পাইতাম। একদিনের জন্যও আমি হৈমর কাছে শুনি নাই। এ-সব কথা সংকোচে সে মুখে আনিতে পারতি না। সে সংকোচ নিজের জন্য নহে।

হৈম তাহার বাপের কাছ হইতে যত চিঠি পাইত সমস্ত আমাকে পড়িতে দিত। চিঠিগুলি ছোটো কিন্তু রসে ভরা। সেও বাপকে যত চিঠি লিখিত সমস্ত আমাকে দেখাইত। বাপের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটিকে আমার সঙ্গে ভাগ করিয়া না লইলে তাহার দাম্পত্য যে পূর্ণ হইতে পারিত না। তাহার চিঠিতে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে কোনো নালিশের ইশারাটুকুও ছিল না। থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারিত। নারানীর কাছে শুনিয়াছি, শ্বশুরবাড়ির কথা কী লেখে জানিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার চিঠি খোলা হইত।

চিঠির মধ্যে অপরাধের কোনো প্রমাণ না পাইয়া উপরওয়ালাদের মন যে শান্ত হইয়াছিল তাহা নহে। বোধ করি তাহাতে তাঁহারা আশাভঙ্গের দুঃখই পাইয়াছিলেন। বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "এত ঘন ঘন চিঠিই বা কিসের জন্য ? বাপই যেন সব, আমরা কি কেহ নই ?" এই লইয়া অনেক অপ্রিয় কথা চলিতে লাগিল। আমি ক্ষুব্ধ হইয়া হৈমকে বলিলাম, "তোমার বাবার চিঠি আর-কাহাকেও না দিয়া আমাকেই দিয়ো। কলেজে যাইবার সময় আমি পোস্ট করিয়া দিব।"

হৈম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

আমি লজ্জায় তাহার উত্তর দিলাম না।

বাড়িতে এখন সকলে বলিতে আরম্ভ করিল, "এইবার অপুর মাথা খাওয়া হইল। বি. এ. ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কী।"

সে তো বটেই। দোষ সমস্তই হৈমর। তাহার দোষ যে তাহার বয়স সতেরো ; তাহার দোষ যে আমি তাহাকে ভালোবাসি ; তাহার দোষ যে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমস্ত আকাশ আজ বাঁশি বাজাইতেছে।

বি. এ. ডিগ্রি অকাতরচিত্তে আমি চুলায় দিতে পারিতাম কিন্তু হৈমর কল্যাণে পণ করিলাম, পাস করিবই এবং ভালো করিয়াই পাস করিব। এ পণ রক্ষা করা আমার সে-অবস্থায় যে সম্ভবপর বোধ হইয়াছিল তাহার দুইটি কারণ ছিল— এক তো হৈমর ভালোবাসার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিস্তার ছিল যে, সংকীর্ণ আসক্তির মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালোবাসার চারি দিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত। দ্বিতীয়, পরীক্ষার জন্য যে বইগুলি পড়ার প্রয়োজন তাহা হৈমর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

পরীক্ষা পাসের উদ্‌যোগে কোমর বাঁধিয়া লাগিলাম। একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে বাহিরের ঘরে বসিয়া মার্টিনোর চরিত্রতত্ত্ব বইখানার বিশেষ বিশেষ লাইনের মধ্যপথগুলা ফাড়িয়া ফেলিয়া নীল পেন্‌সিলের লাঙল চালাইতেছিলাম, এমন সময় বাহিরের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়িল।

আমার ঘরের সমুখে আঙিনার উত্তর দিকে অন্তঃপুরে উঠিবার একটা সিঁড়ি। তাহারই গায়ে গায়ে

মাঝে মাঝে গরাদে-দেওয়া এক-একটা জানলা। দেখি তাহারই একটি জানলায় হৈম চুপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া। সে দিকে মল্লিকদের বাগানে কাঞ্চনগাছ গোলাপি ফুলে আচ্ছন্ন।

আমার বুকে ধক্ করিয়া একটা ধাক্কা দিল; মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপটি আমি এতদিন এমন স্পষ্ট করিয়া দেখি নাই!

কিছু না, আমি কেবল তাহার বসিবার ভঙ্গিটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম। কোলের উপরে একটি হাতের উপর আর-একটি হাত স্থির পড়িয়া আছে, মাথাটি দেয়ালের উপরে হেলানো, খোলা চুল বাম কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার বুকের ভিতরটা হুহু করিয়া উঠিল।

আমার নিজের জীবনটা এমনি কানায় কানায় ভরিয়াছে যে, আমি কোথাও কোনো শূন্যতা লক্ষ করিতে পারি নাই। আজ হঠাৎ আমার অত্যন্ত নিকটে অতি বৃহৎ একটা নৈরাশ্যের গহ্বর দেখিতে পাইলাম। কেমন করিয়া কী দিয়া আমি তাহা পূরণ করি।

আমাকে তো কিছুই ছাড়িতে হয় নাই। না আত্মীয়, না অভ্যাস, না কিছু। হৈম-যে সমস্ত ফেলিয়া আমার কাছে আসিয়াছে। সেটা কতখানি তাহা আমি ভালো করিয়া ভাবি নাই। আমাদের সংসারে অপমানে কণ্টকশয়নে সে বসিয়া; সে শয়ন আমিও তাহার সঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছি। সেই দুঃখে হৈমর সঙ্গে আমার যোগ ছিল, তাহাতে আমাদিগকে পৃথক করে নাই। কিন্তু, এই গিরিনন্দিনী সতেরো বৎসর-কাল অন্তরে বাহিরে কত বড়ো একটা মুক্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে। কী নির্মল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঋজু শুভ্র ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম যে কিরূপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুররূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি নাই, কেননা সেখানে তাহার সঙ্গে আমার সমান আসন ছিল না।

হৈম যে অন্তরে অন্তরে মুহূর্তে মুহূর্তে মরিতেছিল। তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না— তাহা আমার নিজের মধ্যে কোথায়? সেইজন্যই কলিকাতার গলিতে ঐ গরাদের ফাঁক দিয়া নির্বাক্ আকাশের সঙ্গে তাহার নির্বাক্ মনের কথা হয়; এবং এক-একদিন রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখি, সে বিছানায় নাই; হাতের উপর মাথা রাখিয়া আকাশ-ভরা তারার দিকে মুখ তুলিয়া ছাতে শুইয়া আছে।

মার্টিনো পড়িয়া রহিল। ভাবিতে লাগিলাম, কী করি। শিশুকাল হইতে বাবার কাছে আমার সংকোচের অন্ত ছিল না— কখনো মুখামুখি তাঁহার কাছে দরবার করিবার সাহস বা অভ্যাস আমার ছিল না। সেদিন থাকিতে পারিলাম না। লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে বলিয়া বসিলাম, "বউয়ের শরীর ভালো নয়, তাহাকে একবার বাপের কাছে পাঠাইলে হয়।"

বাবা তো একেবারে হতবুদ্ধি। মনে লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, হৈমই এরূপ অভূতপূর্ব স্পর্ধায় আমাকে প্রবর্তিত করিয়াছে। তখনই তিনি উঠিয়া অন্তঃপুরে গিয়া হৈমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি, বউমা, তোমার অসুখটা কিসের।"

হৈম বলিল, "অসুখ তো নাই।"

বাবা ভাবিলেন, এ উত্তরটা তেজ দেখাইবার জন্য।

কিন্তু, হৈমর শরীরও যে দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতেছিল তাহা আমরা প্রতিদিনের অভ্যাসবশতই বুঝি নাই। একদিন বনমালীবাবু তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ, এ কী! হৈমী, এ কেমন চেহারা তোর! অসুখ করে নাই তো?"

হৈম কহিল, "না।"

এই ঘটনার দিনদশেক পরেই, বলা নাই, কহা নাই, হঠাৎ আমার শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত। হৈমর শরীরের কথাটা নিশ্চয় বনমালীবাবু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন।

বিবাহের পর বাপের কাছে বিদায় লইবার সময় মেয়ে আপনার অশ্রু চাপিয়া নিয়াছিল। এবার মিলনের দিন বাপ যেমনি তাহার চিবুক ধরিয়া মুখটি তুলিয়া ধরিলেন অমনি হৈমর চোখের জল আর মানা মানিল না। বাপ একটি কথা বলিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করিলেন না, 'কেমন

আছিস'। আমার শ্বশুর তাঁহার মেয়ের মুখে এমন একটা-কিছু দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল।

হৈম বাবার হাত ধরিয়া তাঁহাকে শোবার ঘরে লইয়া গেল। অনেক কথা যে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাহার বাবারও যে শরীর ভালো দেখাইতেছে না।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুড়ি, আমার সঙ্গে যাবি ?"

হৈম কাঙালের মতো বলিয়া উঠিল, "যাব।"

বাপ বলিলেন, "আচ্ছা, সব ঠিক করিতেছি।"

শ্বশুর যদি অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া না থাকিতেন তাহা হইলে এ-বাড়িতে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিতেন, এখানে তাঁহার আর সেদিন নাই। হঠাৎ তাঁহার আবির্ভাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবা তো ভালো করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশুরের মনে ছিল তাঁহার বেহাই একদা তাঁহাকে বার বার করিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহার খুশি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

বাবা তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "বেহাই, আমি তো কিছু বলিতে পারি না, একবার তা হলে বাড়ির মধ্যে—"

বাড়ির-মধ্যের উপর বরাত দেওয়ার অর্থ কী আমার জানা ছিল। বুঝিলাম, কিছু হইবে না। কিছু হইলও না।

বউমার শরীর ভালো নাই! এত বড়ো অন্যায় অপবাদ!

শ্বশুরমশায় স্বয়ং একজন ভালো ডাক্তার আনিয়া পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্তার বলিলেন, "বায়ু-পরিবর্তন আবশ্যক, নহিলে হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো হইতে পারে।"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো তো সকলেরই হইতে পারে। এটা কি আবার একটা কথা।"

আমার শ্বশুর কহিলেন, "জানেন তো, উনি একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, উহার কথাটা কি—"

বাবা কহিলেন, "অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল পণ্ডিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়!"

এই কথাটা শুনিয়া আমার শ্বশুর একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। হৈম বুঝিল, তাহার বাবার প্রস্তাব অপমানের সহিত অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাহার মন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

আমি আর সহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে গিয়া বলিলাম, "হৈমকে আমি লইয়া যাইব।"

বাবা গর্জিয়া উঠিলেন, "বটে রে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বন্ধুরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন। স্ত্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া গেলেই তো হইত। গেলাম না কেন? কেন! যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে। জান তোমরা? যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর, আমিই তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীপরিত্যাগের গুণবর্ণনা করিয়া মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতাবিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত।

পিতায় কন্যায় আর-একবার বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হইল। এইবারেও দুইজনেরই মুখে হাসি। কন্যা হাসিতে হাসিতেই ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "বাবা, আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।"

বাপ হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, "ফের যদি আসি তবে সিঁধকাটি সঙ্গে করিয়াই আসিব।"
ইহার পরে হৈমর মুখে তাহার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর একদিনের জন্যও দেখি নাই।
তাহারও পরে কী হইল সে কথা আর বলিতে পারিব না।
শুনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয়তো একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না, ইহাও সম্ভব হইতে পারে। কারণ— থাক্ আর কাজ কী!

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

বোষ্টমী

আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম নয়, এইজন্য লোকেও আমাকে সদাসর্বদা যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালির ভাগই বেশি। আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে হয়; কপালক্রমে সেগুলি হিতকথা নয়, মনোহারী তো নহেই।

শরীরে যেখানটায় ঘা পড়িতে থাকে সে জায়গাটা যত তুচ্ছই হোক সমস্ত দেহটাকে বেদনার জোরে সেই ছাড়াইয়া যায়। যে লোক গালি খাইয়া মানুষ হয়, সে আপনার স্বভাবকে যেন ঠেলিয়া একঝোঁকা হইয়া পড়ে। আপনার চারি দিককে ছাড়াইয়া আপনাকেই কেবল তাহার মনে পড়ে— সেটা আরামও নয়, কল্যাণও নয়। আপনাকে ভোলাটাই তো স্বস্তি।

আমাকে তাই ক্ষণে ক্ষণে নির্জনের খোঁজ করিতে হয়। মানুষের ঠেলা খাইতে খাইতে মনের চারি দিকে যে টোল খাইয়া যায়, বিশ্বপ্রকৃতির সেবানিপুণ হাতখানির গুণে তাহা ভরিয়া উঠে।

কলিকাতা হইতে দূরে নিভৃতে আমার একটি অজ্ঞাতবাসের আয়োজন আছে; আমার নিজ-চর্চার দৌরাত্ম্য হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি। সেখানকার লোকেরা এখনো আমার সম্বন্ধে কোনো একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছে নাই। তাহারা দেখিয়াছে— আমি ভোগী নই, পল্লীর রজনীকে কলিকাতার কলুষে আবিল করি না; আবার যোগীও নই, কারণ দূর হইতে আমার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ধনের লক্ষণ আছে; আমি পথিক নহি, পল্লীর রাস্তায় ঘুরি বটে কিন্তু কোথাও পৌঁছিবার দিকে আমার কোনো লক্ষ্যই নাই; আমি যে গৃহী এমন কথা বলাও শক্ত, কারণ ঘরের লোকের প্রমাণাভাব। এইজন্য পরিচিত জীবশ্রেণীর মধ্যে আমাকে কোনো একটা প্রচলিত কোঠায় না ফেলিতে পারিয়া গ্রামের লোক আমার সম্বন্ধে চিন্তা করা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছে, আমিও নিশ্চিন্ত আছি।

অল্পদিন হইল খবর পাইয়াছি, এই গ্রামে একজন মানুষ আছে যে আমার সম্বন্ধে কিছু-একটা মনে ভাবিয়াছে, অন্তত বোকা ভাবে নাই।

তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা হইল, তখন আষাঢ়মাসের বিকালবেলা। কান্না শেষ হইয়া গেলেও চোখের পল্লব ভিজা থাকিলে যেমন ভাবটা হয়, সকালবেলাকার বৃষ্টি-অবসানে সমস্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাসের মধ্যে সেই ভাবটা ছিল। আমাদের পুকুরের উঁচু পাড়িটার উপর দাঁড়াইয়া আমি একটি নধর-শ্যামল গাভীর ঘাস খাওয়া দেখিতেছিলাম। তাহার চিক্কণ দেহটির উপর রৌদ্র পড়িয়াছিল দেখিয়া ভাবিতেছিলাম, আকাশের আলো হইতে সভ্যতা আপনার দেহটাকে পৃথক করিয়া রাখিবার জন্য যে এত দর্জির দোকান বানাইয়াছে, ইহার মতো এমন অপব্যয় আর নাই।

এমন সময় হঠাৎ দেখি, একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার আঁচলে কতকগুলি ঠোঙার মধ্যে করবী, গন্ধরাজ এবং আরো দুই-চার রকমের ফুল ছিল। তাহারই মধ্যে একটি আমার হাতে দিয়া ভক্তির সঙ্গে জোড়হাত করিয়া সে বলিল, "আমার ঠাকুরকে দিলাম।"— বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি এমনি আশ্চর্য হইয়া গেলাম যে, তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেই পাইলাম না।

ব্যাপারটা নিতান্তই সাদা অথচ আমার কাছে তাহা এমন করিয়া প্রকাশ হইল যে, সেই যে গাভীটি বিকালবেলাকার ধূসর রৌদ্রে লেজ দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে, নববর্ষার রসকোমল ঘাসগুলি বড়ো বড়ো নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শান্ত আনন্দে খাইয়া বেড়াইতেছে, তাহার জীবলীলাটি আমার কাছে বড়ো অপরূপ হইয়া দেখা দিল। এ কথা বলিলে লোকে হাসিবে, কিন্তু আমার মন ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আমি সহজ-আনন্দময় জীবনেশ্বরকে প্রণাম করিলাম। বাগানের আমগাছ হইতে পাতা-সমেত একটি কচি আমের ডাল লইয়া সেই গাভীকে খাওয়াইলাম। আমার মনে হইল, আমি দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলাম।

ইহার পরবৎসর যখন সেখানে গিয়াছি তখন মাঘের শেষ। সেবার তখনো শীত ছিল ; সকালের রৌদ্রটি পুবের জানলা দিয়া আমার পিঠে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে নিষেধ করি নাই। দোতলার ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলাম, বেহারা আসিয়া খবর দিল, আনন্দী বোষ্টমী আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। লোকটা কে জানি না ; অন্যমনস্ক হইয়া বলিলাম, "আচ্ছা, এইখানে নিয়ে আয়।"

বোষ্টমী পায়ের ধুলা লইয়া আমাকে প্রণাম করিল। দেখিলাম, সেই আমার পূর্বপরিচিত স্ত্রীলোকটি। সে সুন্দরী কি না সেটা লক্ষ্যগোচর হইবার বয়স তাহার পার হইয়া গেছে। দোহারা, সাধারণ স্ত্রীলোকের চেয়ে লম্বা ; একটি নিয়ত-ভক্তিতে তাহার শরীরটি নম্র, অথচ বলিষ্ঠ নিঃসংকোচ তাহার ভাব। সব চেয়ে চোখে পড়ে তাহার দুই চোখ। ভিতরকার কী-একটা শক্তিতে তাহার সেই বড়ো বড়ো চোখদুটি যেন কোন্ দূরের জিনিসকে কাছে করিয়া দেখিতেছে।

তাহার সেই দুই চোখ দিয়া আমাকে যেন ঠেলা দিয়া সে বলিল, "এ আবার কী কাণ্ড। আমাকে তোমার এই রাজসিংহাসনের তলায় আনিয়া হাজির করা কেন। তোমাকে গাছের তলায় দেখিতাম, সে যে বেশ ছিল।"

বুঝিলাম, গাছতলায় এ আমাকে অনেকদিন লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু আমি ইহাকে দেখি নাই। সর্দির উপক্রম হওয়াতে কয়েকদিন পথে ও বাগানে বেড়ানো বন্ধ করিয়া ছাদের উপরেই সন্ধ্যাকাশের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া থাকি ; তাই কিছুদিন সে আমাকে দেখিতে পায় নাই।

একটুক্ষণ থামিয়া সে বলিল, "গৌর, আমাকে কিছু-একটা উপদেশ দাও।"

আমি মুশকিলে পড়িলাম। বলিলাম, "উপদেশ দিতে পারি না, নিতেও পারি না। চোখ মেলিয়া চুপ করিয়া যাহা পাই তাহা লইয়াই আমার কারবার। এই যে তোমাকে দেখিতেছি, আমার দেখাও হইতেছে শোনাও হইতেছে।"

বোষ্টমী ভারি খুশি হইয়া 'গৌর গৌর' বলিয়া উঠিল। কহিল, "ভগবানের তো শুধু রসনা নয়, তিনি যে সর্বাঙ্গ দিয়া কথা কন।"

আমি বলিলাম, "চুপ করিলেই সর্বাঙ্গ দিয়া তাঁর সেই সর্বাঙ্গের কথা শোনা যায়। তাই শুনিতেই শহর ছাড়িয়া এখানে আসি।"

বোষ্টমী কহিল, "সেটা আমি বুঝিয়াছি, তাই তো তোমার কাছে আসিয়া বসিলাম।"

যাইবার সময় সে আমার পায়ের ধুলা লইতে গিয়া, দেখিলাম, আমার মোজাতে হাত ঠেকিয়া তাহার বড়ো বাধা বোধ হইল।

পরের দিন ভোরে সূর্য উঠিবার পূর্বে আমি ছাদে আসিয়া বসিয়াছি। দক্ষিণে বাগানের ঝাউগাছগুলার মাথার উপর দিয়া একেবারে দিক্‌সীমা পর্যন্ত মাঠ ধূধূ করিতেছে। পূর্ব দিকে বাঁশবনে-ঘেরা গ্রামের পাশে আখের খেতের প্রান্ত দিয়া প্রতিদিন আমার সামনে সূর্য উঠে। গ্রামের রাস্তাটা গাছের ঘন ছায়ার ভিতর হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া খোলা মাঠের মাঝখান দিয়া বাঁকিয়া বহুদূরের গ্রামগুলির কাজ সারিতে চলিয়াছে।

সূর্য উঠিয়াছে কি না জানি না। একখানি শুভ্র কুয়াশার চাদর বিধবার ঘোমটার মতো গ্রামের

গাছগুলির উপর টানা রহিয়াছে। দেখিতে পাইলাম, বোষ্টমী সেই ভোরের ঝাপসা আলোর ভিতর দিয়া একটি সচল কুয়াশার মূর্তির মতো করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে সেই পুব দিকের গ্রামের সমুখ দিয়া চলিয়াছে।

তন্দ্রাভাঙা চোখের পাতার মতো এক সময়ে কুয়াশাটা উঠিয়া গেল এবং ঐ-সমস্ত মাঠের ও ঘরের নানা কাজকর্মের মাঝখানে শীতের রৌদ্রটি গ্রামের ঠাকুরদাদার মতো আসিয়া বেশ করিয়া জমিয়া বসিল।

আমি তখন সম্পাদকের পেয়াদা বিদায় করিবার জন্য লিখিবার টেবিলে আসিয়া বসিয়াছি। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দের সঙ্গে একটা গানের সুর শোনা গেল। বোষ্টমী গুন্‌গুন্ করিতে করিতে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া কিছু দূরে মাটিতে বসিল। আমি লেখা হইতে মুখ তুলিলাম।

সে বলিল, "কাল আমি তোমার প্রসাদ পাইয়াছি।"

আমি বলিলাম, "সে কী কথা।"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যার সময় কখন তোমার খাওয়া হয় আমি সেই আশায় দরজার বাহিরে বসিয়া ছিলাম। খাওয়া হইলে চাকর যখন পাত্র লইয়া বাহিরে আসিল তাহাতে কী ছিল জানি না কিন্তু আমি খাইয়াছি।"

আমি আশ্চর্য হইলাম। আমার বিলাত যাওয়ার কথা সকলেই জানে। সেখানে কী খাইয়াছি না-খাইয়াছি তাহা অনুমান করা কঠিন নহে, কিন্তু গোবর খাই নাই। দীর্ঘকাল মাছমাংসে আমার রুচি নাই বটে কিন্তু আমার পাচকটির জাতিকুলের কথাটা প্রকাশ্য সভায় আলোচনা না করাই সংগত। আমার মুখে বিস্ময়ের লক্ষণ দেখিয়া বোষ্টমী বলিল, "যদি তোমার প্রসাদ খাইতেই না পারিব, তবে তোমার কাছে আসিবার তো কোনো দরকার ছিল না।"

আমি বলিলাম, "লোকে জানিলে তোমার উপর তো তাদের ভক্তি থাকিবে না।"

সে বলিল, "আমি তো সকলকেই বলিয়া বেড়াইয়াছি। শুনিয়া উহারা ভাবিল, আমার এইরকমই দশা।"

বোষ্টমী যে সংসারে ছিল উহার কাছে তাহার খবর বিশেষ কিছু পাইলাম না। কেবল এইটুকু শুনিয়াছি, তাহার মায়ের অবস্থা বেশ ভালো এবং এখনো তিনি বাঁচিয়া আছেন। মেয়েকে যে বহু লোক ভক্তি করিয়া থাকে সে খবর তিনি জানেন। তাঁহার ইচ্ছা, মেয়ে তাঁর কাছে গিয়া থাকে, কিন্তু আনন্দীর মন তাহাতে সায় দেয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার চলে কী করিয়া।"

উত্তরে শুনিলাম, তাহার ভক্তদের একজন তাহাকে সামান্য কিছু জমি দিয়াছে। তাহারই ফসলে সেও খায়, পাঁচজনে খায়, কিছুতে সে আর শেষ হয় না। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "আমার তো সবই ছিল— সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছি, আবার পরের কাছে মাগিয়া সংগ্রহ করিতেছি, ইহার কী দরকার ছিল বলো তো?"

শহরে থাকিতে এ প্রশ্ন উঠিলে সহজে ছাড়িতাম না। ভিক্ষাজীবিতায় সমাজের কত অনিষ্ট তাহা বুঝাইতাম। কিন্তু, এ জায়গায় আসিলে আমার পুঁথিপড়া বিদ্যার সমস্ত ঝাঁজ একেবারে মরিয়া যায়। বোষ্টমীর কাছে কোনো তর্কই আমার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না; আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে আপনিই বলিয়া উঠিল, "না, না, এই আমার ভালো। আমার মাগিয়া-খাওয়া অন্নই অমৃত।"

তাহার কথার ভাবখানা আমি বুঝিলাম। প্রতিদিনই যিনি নিজে অন্ন জোগাইয়া দেন ভিক্ষার অন্নে তাঁহাকেই মনে পড়ে। আর, ঘরে মনে হয়, আমারই অন্ন আমি নিজের শক্তিতে ভোগ করিতেছি।

ইচ্ছা ছিল তাহার স্বামীর ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু সে নিজে বলিল না, আমিও প্রশ্ন করিলাম না।

এখানকার যে-পাড়ায় উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকে থাকে সে-পাড়ার প্রতি বোষ্টমীর শ্রদ্ধা নাই। বলে,

ঠাকুরকে উহারা কিছুই দেয় না, অথচ ঠাকুরের ভোগে উহারাই সব চেয়ে বেশি করিয়া ভাগ বসায়। গরিবরা ভক্তি করে আর উপবাস করিয়া মরে।

এ পাড়ার দুষ্কৃতির কথা অনেক শুনিয়াছি, তাই বলিলাম, "এই-সকল দুর্মতিদের মাঝখানে থাকিয়া ইহাদের মতিগতি ভালো করো, তাহা হইলেই তো ভগবানের সেবা হইবে।"

এই রকমের সব উঁচুদরের উপদেশ অনেক শুনিয়াছি এবং অন্যকে শুনাইতেও ভালোবাসি। কিন্তু, বোষ্টমীর ইহাতে তাক্ লাগিল না। আমার মুখের দিকে তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটি রাখিয়া সে বলিল, "তুমি বলিতেছ, ভগবান পাপীর মধ্যেও আছেন, তাই উহাদের সঙ্গ করিলেও তাঁহারই পূজা করা হয়। এই তো?"

আমি কহিলাম, "হাঁ।"

সে বলিল, "উহারা যখন বাঁচিয়া আছে তখন তিনিও উহাদের সঙ্গে আছেন বৈকি। কিন্তু, আমার তাহাতে কী। আমার তো পূজা ওখানে চলিবে না; আমার ভগবান যে উহাদের মধ্যে নাই। তিনি যেখানে আমি সেখানেই তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াই।"

বলিয়া সে আমাকে প্রণাম করিল। তাহার কথাটা এই যে, শুধু মত লইয়া কী হইবে— সত্য যে চাই। ভগবান সর্বব্যাপী এটা একটা কথা, কিন্তু যেখানে আমি তাঁহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য।

এত বড়ো বাহুল্য কথাটাও কোনো কোনো লোকের কাছে বলা আবশ্যক যে, আমাকে উপলক্ষ করিয়া বোষ্টমী যে ভক্তি করে আমি তাহা গ্রহণও করি না, ফিরাইয়াও দিই না।

এখনকার কালের ছোঁয়াচ আমাকে লাগিয়াছে। আমি গীতা পড়িয়া থাকি এবং বিদ্বান লোকদের দ্বারস্থ হইয়া তাহাদের কাছে ধর্মতত্ত্বের অনেক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। কেবল শুনিয়া শুনিয়াই বয়স বহিয়া যাইবার জো হইল, কোথাও তো কিছু প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দৃষ্টির অহংকার ত্যাগ করিয়া এই শাস্ত্রহীনা স্ত্রীলোকের দুই চক্ষুর ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার এ কী আশ্চর্য প্রণালী।

পরদিন সকালে বোষ্টমী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দেখিল, তখনো আমি লিখিতে প্রবৃত্ত। বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমাকে আমার ঠাকুর এত মিথ্যা খাটাইতেছেন কেন। যখনি আসি দেখিতে পাই, লেখা লইয়াই আছ।"

আমি বলিলাম, "যে লোকটা কোনো কর্মেরই নয় ঠাকুর তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেন না, পাছে সে মাটি হইয়া যায়। যত রকমের বাজে কাজ করিবার ভার তাহারই উপরে।"

আমি যে কত আবরণে আবৃত তাহাই দেখিয়া সে অধৈর্য হইয়া উঠে। আমার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে অনুমতি লইয়া দোতলায় চড়িতে হয়, প্রণাম করিতে আসিয়া হাতে ঠেকে মোজাজোড়া, সহজ দুটো কথা বলা এবং শোনার প্রয়োজন কিন্তু আমার মনটা আছে কোন্ লেখার মধ্যে তলাইয়া।

হাত জোড় করিয়া সে বলিল, "গৌর, আজ ভোরে বিছানায় যেমনি উঠিয়া বসিয়াছি অমনি তোমার চরণ পাইলাম। আহা, সেই তোমার দুখানি পা, কোনো ঢাকা নাই— সে কী ঠাণ্ডা। কী কোমল। কতক্ষণ মাথায় ধরিয়া রাখিলাম। সে তো খুব হইল। তবে আর আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কী। প্রভু, এ আমার মোহ নয় তো? ঠিক করিয়া বলো।"

লিখিবার টেবিলের উপর ফুলদানিতে পূর্বদিনের ফুল ছিল। মালী আসিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া নূতন ফুল সাজাইবার উদ্‌যোগ করিল।

বোষ্টমী যেন ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাস্? এ ফুলগুলি হইয়া গেল? তোমার আর দরকার নাই? তবে দাও দাও, আমাকে দাও।"

এই বলিয়া ফুলগুলি অঞ্জলিতে লইয়া, কতক্ষণ মাথা নত করিয়া, একান্ত স্নেহে এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "তুমি চাহিয়া দেখো না বলিয়াই এ ফুল তোমার কাছে মলিন হইয়া যায়। যখন দেখিবে তখন তোমার লেখাপড়া সব ঘুচিয়া যাইবে।"

এই বলিয়া সে বহু যত্নে ফুলগুলি আপন আঁচলের প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "আমার ঠাকুরকে আমি লইয়া যাই।"

কেবল ফুলদানিতে রাখিলেই যে ফুলের আদর হয় না, তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। আমার মনে হইল, ফুলগুলিকে যেন ইস্কুলের পড়া-না-পারা ছেলেদের মতো প্রতিদিন আমি বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া রাখি।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যখন ছাদে বসিয়াছি, বোষ্টমী আমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। কহিল, "আজ সকালে নাম শুনাইবার সময় তোমার প্রসাদী ফুলগুলি ঘরে ঘরে দিয়া আসিয়াছি। আমার ভক্তি দেখিয়া বেণী চক্রবর্তী হাসিয়া বলিল, 'পাগলি, কাকে ভক্তি করিস তুই? বিশ্বের লোকে যে তাকে মন্দ বলে।' হাঁগো, সকলে নাকি তোমাকে গালি দেয়?"

কেবল এক মুহূর্তের জন্য মনটা সংকুচিত হইয়া গেল। কালির ছিটা এত দূরেও ছড়ায়!

বোষ্টমী বলিল, "বেণী ভাবিয়াছিল, আমার ভক্তিটাকে এক ফুঁয়ে নিবাইয়া দিবে। কিন্তু, এ তো তেলের বাতি নয়, এ যে আগুন! আমার গৌর, ওরা তোমাকে গালি দেয় কেন গো।"

আমি বলিলাম, "আমার পাওনা আছে বলিয়া। আমি হয়তো একদিন লুকাইয়া উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়াছিলাম।"

বোষ্টমী কহিল, "মানুষের মনে বিষ যে কত সে তো দেখিলে। লোভ আর টিকিবে না।"

আমি বলিলাম, "মনে লোভ থাকিলেই মারের মুখে থাকিতে হয়। তখন নিজেকে মারিবার বিষ নিজের মনই জোগায়। তাই আমার ওঝা আমারই মনটাকে নির্বিষ করিবার জন্য এত কড়া করিয়া ঝাড়া দিতেছেন।"

বোষ্টমী কহিল, "দয়াল ঠাকুর মারিতে মারিতে তবে মারকে খেদান। শেষ পর্যন্ত যে সহিতে পারে সেই বাঁচিয়া যায়।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ছাদের উপর সন্ধ্যাতারা উঠিয়া আবার অস্ত গেল; বোষ্টমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল।—

আমার স্বামী বড়ো সাদা মানুষ। কোনো কোনো লোকে মনে করিত তাঁহার বুঝিবার শক্তি কম। কিন্তু, আমি জানি, যাহারা সাদা করিয়া বুঝিতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে। ইহাও দেখিয়াছি, তাঁহার চাষবাস জমিজমার কাজে তিনি যে ঠকিতেন তাহা নহে। বিষয়কাজ এবং ঘরের কাজ দুইই তাঁহার গোছালো ছিল। ধান-চাল-পাটের সামান্য যে একটু ব্যাবসা করিতেন, কখনো তাহাতে লোকসান করেন নাই। কেননা, তাঁহার লোভ অল্প। যেটুকু তাঁহার দরকার সেটুকু তিনি হিসাব করিয়া চলিতেন; তার চেয়ে বেশি যা তাহা তিনি বুঝিতেনও না, তাহাতে হাতও দিতেন না।

আমার বিবাহের পূর্বেই আমার শ্বশুর মারা গিয়াছিলেন এবং আমার বিবাহের অল্পদিন পরেই শাশুড়ির মৃত্যু হয়। সংসারে আমাদের মাথার উপরে কেহই ছিল না।

আমার স্বামী মাথার উপরে একজন উপরওয়ালাকে না বসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন-কি, বলিতে লজ্জা হয়, আমাকে যেন তিনি ভক্তি করিতেন। তবু আমার বিশ্বাস, তিনি আমার চেয়ে বুঝিতেন বেশি, আমি তাঁহার চেয়ে বলিতাম বেশি।

তিনি সকলের চেয়ে ভক্তি করিতেন তাঁহার গুরুঠাকুরকে। শুধু ভক্তি নয়, সে ভালোবাসা— এমন ভালোবাসা দেখা যায় না।

গুরুঠাকুর তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু কম। কী সুন্দর রূপ তাঁর।

বলিতে বলিতে বোষ্টমী ক্ষণকাল থামিয়া তাহার সেই দূরবিহারী চক্ষু দুটিকে বহু দূরে পাঠাইয়া দিল এবং গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিল—

অরুণকিরণখানি তরুণ অমৃতে ছানি
কোন্ বিধি নিরমিল দেহা।

এই গুরুঠাকুরের সঙ্গে বালককাল হইতে তিনি খেলা করিয়াছেন ; তখন হইতেই তাঁহাকে আপন মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

তখন আমার স্বামীকে ঠাকুর বোকা বলিয়া জানিতেন। সেইজন্য তাঁহার উপর বিস্তর উপদ্রব করিয়াছেন। অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়া পরিহাস করিয়া তাঁহাকে যে কত নাকাল করিয়াছেন তাহার সীমা নাই।

বিবাহ করিয়া এ সংসারে যখন আসিয়াছি তখন গুরুঠাকুরকে দেখি নাই। তিনি তখন কাশীতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। আমার স্বামীই তাঁহাকে সেখানকার খরচ জোগাইতেন।

গুরুঠাকুর যখন দেশে ফিরিলেন তখন আমার বয়স বোধ করি আঠারো হইবে।

পনেরো বছর বয়সে আমার একটি ছেলে হইয়াছিল। বয়স কাঁচা ছিল বলিয়াই আমার সেই ছেলেটিকে আমি যত্ন করিতে শিখি নাই, পাড়ার সই-সাঙাতিদের সঙ্গে মিলিবার জন্যই তখন আমার মন ছুটিত। ছেলের জন্য ঘরে বাঁধা থাকিতে হয় বলিয়া এক-একসময় তাহার উপরে আমার রাগ হইত।

হায় রে, ছেলে যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছে, মা তখনো পিছাইয়া পড়িয়া আছে, এমন বিপদ আর কী হইতে পারে। আমার গোপাল আসিয়া দেখিল, তখনো তাহার জন্য ননী তৈরি নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে— আমি আজও মাঠে ঘাটে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।

ছেলেটি ছিল বাপের নয়নের মণি। আমি তাহাকে যত্ন করিতে শিখি নাই বলিয়া তাহার বাপ কষ্ট পাইতেন। কিন্তু, তাঁহার হৃদয় যে ছিল বোবা, আজ পর্যন্ত তাঁহার দুঃখের কথা কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই।

মেয়েমানুষের মতো তিনি ছেলের যত্ন করিতেন। রাত্রে ছেলে কাঁদিলে আমার অল্পবয়সের গভীর ঘুম তিনি ভাঙাইতে চাহিতেন না। নিজে রাত্রে উঠিয়া দুধ গরম করিয়া খাওয়াইয়া কতদিন খোকাকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। তাঁহার সকল কাজই এমনি নিঃশব্দে। পূজাপার্বণে জমিদারদের বাড়িতে যখন যাত্রা বা কথা হইত তিনি বলিতেন, "আমি রাত জাগিতে পারি না, তুমি যাও, আমি এখানেই থাকি।" তিনি ছেলেটিকে লইয়া না থাকিলে আমার যাওয়া হইবে না, এইজন্য তাঁহার ছুতা।

আশ্চর্য এই, তবু ছেলে আমাকেই সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসিত। সে যেন বুঝিত, সুযোগ পাইলেই আমি তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইব, তাই সে যখন আমার কাছে থাকিত তখনো ভয়ে ভয়ে থাকিত। সে আমাকে অল্প পাইয়াছিল বলিয়াই আমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কিছুতেই মিটিতে চাহিত না।

আমি যখন নাহিবার জন্য ঘাটে যাইতাম তাহাকে সঙ্গে লইবার জন্য সে আমাকে রোজ বিরক্ত করিত। ঘাটে সঙ্গিনীদের সঙ্গে আমার মিলনের জায়গা, সেখানে ছেলেকে লইয়া তাহার খবরদারি করিতে আমার ভালো লাগিত না। সেইজন্য পারতপক্ষে তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিতাম না।

সেদিন শ্রাবণ মাস। থাকে থাকে ঘন কালো মেঘে দুই-প্রহর বেলাটাকে একেবারে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া রাখিয়াছে। স্নানে যাইবার সময় খোকা কান্না জুড়িয়া দিল। নিস্তারিণী আমাদের হেঁসেলের কাজ করিত, তাহাকে বলিয়া গেলাম, "বাছা, ছেলেকে দেখিয়ো, আমি ঘাটে একটা ডুব দিয়া আসি গে।"

ঘাটে ঠিক সেই সময়টিতে আর কেহ ছিল না। সঙ্গিনীদের আসিবার অপেক্ষায় আমি সাঁতার দিতে লাগিলাম। দিঘিটা প্রাচীনকালের ; কোন্ রানী কবে খনন করাইয়াছিলেন তাই ইহার নাম রানীসাগর। সাঁতার দিয়া এই দিঘি এপার-ওপার করা মেয়েদের মধ্যে কেবল আমিই পারিতাম। বর্ষায় তখন কূলে কূলে জল। দিঘি যখন প্রায় অর্ধেকটা পার হইয়া গেছি এমন সময় পিছন হইতে ডাক শুনিতে পাইলাম, "মা!" ফিরিয়া দেখি, খোকা ঘাটের সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আমাকে ডাকিতেছে। চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আর আসিস নে, আমি যাচ্ছি।" নিষেধ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সে আরো নামিতে লাগিল। ভয়ে আমার হাতে পায়ে যেন খিল ধরিয়া আসিল, পার হইতে আর পারিই না। চোখ

বুজিলাম। পাছে কী দেখিতে হয়। এমন সময় পিছল ঘাটে সেই দিঘির জলে খোকার হাসি চিরদিনের মতো থামিয়া গেল। পার হইয়া আসিয়া সেই মায়ের কোলের-কাঙাল ছেলেকে জলের তলা হইতে তুলিয়া কোলে লইলাম, কিন্তু আর সে 'মা' বলিয়া ডাকিল না।

আমার গোপালকে আমি এতদিন কাঁদাইয়াছি, সেই সমস্ত অনাদর আজ আমার উপর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে মারিতে লাগিল। বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে বরাবর যে ফেলিয়া চলিয়া গেছি, আজ তাই সে দিনরাত আমার মনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল।

আমার স্বামীর বুকে যে কতটা বাজিল সে কেবল তাঁর অন্তর্যামীই জানেন। আমাকে যদি গালি দিতেন তো ভালো হইত ; কিন্তু তিনি তো কেবল সহিতেই জানেন, কহিতে জানেন না।

এমনি করিয়া আমি যখন একরকম পাগল হইয়া আছি, এমন সময় গুরুঠাকুর দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যখন ছেলেবয়সে আমার স্বামী তাঁহার সঙ্গে একত্রে খেলাধুলা করিয়াছেন তখন সে এক ভাব ছিল। এখন আবার দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর যখন তাঁর ছেলেবয়সের বন্ধু বিদ্যালাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার 'পরে আমার স্বামীর ভক্তি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কে বলিবে খেলার সাথি, ইহার সামনে তিনি যেন একেবারে কথা কহিতে পারিতেন না।

আমার স্বামী আমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহার গুরুকে অনুরোধ করিলেন। গুরু আমাকে শাস্ত্র শুনাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রের কথায় আমার বিশেষ ফল হইয়াছিল বলিয়া মনে তো হয় না। আমার কাছে সে-সব কথার যা-কিছু মূল্য সে তাঁহারই মুখের কথা বলিয়া। মানুষের কণ্ঠ দিয়াই ভগবান তাঁহার অমৃত মানুষকে পান করাইয়া থাকেন ; অমন সুধাপাত্র তো তাঁর হাতে আর নাই। আবার, ঐ মানুষের কণ্ঠ দিয়াই তো সুধা তিনিও পান করেন।

গুরুর প্রতি আমার স্বামীর অজস্র ভক্তি আমাদের সংসারকে সর্বত্র মৌচাকের ভিতরকার মধুর মতো ভরিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের আহারবিহার ধনজন সমস্তই এই ভক্তিতে ঠাসা ছিল, কোথাও ফাঁক ছিল না। আমি সেই রসে আমার সমস্ত মন লইয়া ডুবিয়া তবে সান্ত্বনা পাইয়াছি। তাই দেবতাকে আমার গুরুর রূপেই দেখিতে পাইলাম।

তিনি আসিয়া আহার করিবেন এবং তার পর তাঁর প্রসাদ পাইব, প্রতিদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই এই কথাটি মনে পড়িত, আর সেই আয়োজনে লাগিয়া যাইতাম। তাঁহার জন্য তরকারি কুটিতাম, আমার আঙুলের মধ্যে আনন্দধ্বনি বাজিত। ব্রাহ্মণ নই, তাঁহাকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইতে পারিতাম না, তাই আমার হৃদয়ের সব ক্ষুধাটা মিটিত না।

তিনি যে জ্ঞানের সমুদ্র, সে দিকে তো তাঁর কোনো অভাব নাই। আমি সামান্য রমণী, আমি তাঁহাকে কেবল একটু খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া খুশি করিতে পারি, তাহাতেও এত দিকে এত ফাঁক ছিল।

আমার গুরুসেবা দেখিয়া আমার স্বামীর মন খুশি হইতে থাকিত এবং আমার উপরে তাঁহার ভক্তি আরো বাড়িয়া যাইত। তিনি যখন দেখিতেন, আমার কাছে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার জন্য গুরুর বিশেষ উৎসাহ, তখন তিনি ভাবিতেন, গুরুর কাছে বুদ্ধিহীনতার জন্য তিনি বরাবর অশ্রদ্ধা পাইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী এবার বুদ্ধির জোরে গুরুকে খুশি করিতে পারিল এই তাঁহার সৌভাগ্য।

এমন করিয়া চার-পাঁচ বছর কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা চোখে দেখিতে পাইলাম না।

সমস্ত জীবনই এমনি করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু, গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্যামীর কাছে ধরা পড়িল। তার পর একদিনে একটি মুহূর্তে সমস্ত উলটপালট হইয়া গেল।

সেদিন ফাল্গুনের সকালবেলায় ঘাটে যাইবার ছায়াপথে স্নান সারিয়া ভিজা-কাপড়ে ঘরে ফিরিতেছিলাম। পথের একটি বাঁকে আমতলায় গুরুঠাকুরের সঙ্গে দেখা। তিনি কাঁধে একখানি গামছা লইয়া কোন্-একটা সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে স্নানে যাইতেছেন।

ভিজা-কাপড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে লজ্জায় একটু পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি জড়োসড়ো হইয়া মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের 'পরে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "তোমার দেহখানি সুন্দর।"

ডালে ডালে রাজ্যের পাখি ডাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে ঝোপে-ঝোপে ভাঁটি ফুল ফুটিয়াছে, আমের ডালে বোল ধরিতেছে। মনে হইল, সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল হইয়া আলুথালু হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বাড়ি গেলাম কিছু জ্ঞান নাই। একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুরঘরে ঢুকিলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না— সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুম্‌কিগুলি আমার চোখের উপর কেবলই নাচিতে লাগিল।

সেদিন গুরু আহার করিতে আসিলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আন্দী নাই কেন।"

আমার স্বামী আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

ওগো, আমার সে পৃথিবী আর নাই, আমি সে সূর্যের আলো আর খুঁজিয়া পাইলাম না। ঠাকুরঘরে আমার ঠাকুরকে ডাকি, সে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে।

দিন কোথায় কেমন করিয়া কাটিল ঠিক জানি না। রাত্রে স্বামীর সঙ্গে দেখা হইবে। তখন যে সমস্ত নীরব এবং অন্ধকার। তখনি আমার স্বামীর মন যেন তারার মতো ফুটিয়া উঠে। সেই আঁধারে এক-একদিন তাঁহার মুখে একটা-আধটা কথা শুনিয়া হঠাৎ বুঝিতে পারি, এই সাদা মানুষটি যাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে বুঝিতে পারেন।

সংসারের কাজ সারিয়া আসিতে আমার দেরি হয়। তিনি আমার জন্য বিছানার বাহিরে অপেক্ষা করেন। প্রায়ই তখন আমাদের গুরুর কথা কিছু-না-কিছু হয়।

অনেক রাত করিলাম। তখন তিন প্রহর হইবে, ঘরে আসিয়া দেখি, আমার স্বামী তখনো খাটে শোন নাই, নীচে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আমি অতি সাবধানে শব্দ না করিয়া তাঁহার পায়ের তলায় শুইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে একবার তিনি পা ছুঁড়িলেন, আমার বুকের উপর আসিয়া লাগিল। সেইটেই আমি তাঁহার শেষদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

পরদিন ভোরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙিল আমি তখন উঠিয়া বসিয়া আছি। জানলার বাহিরে কাঁঠালগাছটার মাথার উপর দিয়া আঁধারের একধারে অল্প একটু রঙ ধরিয়াছে ; তখনো কাক ডাকে নাই।

আমি স্বামীর পায়ের কাছে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন এবং আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "আর আমি সংসার করিব না।"

স্বামী বোধ করি ভাবিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন— কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না।

আমি বলিলাম, "আমার মাথার দিব্য, তুমি অন্য স্ত্রী বিবাহ করো। আমি বিদায় লইলাম।"

স্বামী কহিলেন, "তুমি এ কী বলিতেছ। তোমাকে সংসার ছাড়িতে কে বলিল।"

আমি বলিলাম, "গুরুঠাকুর।"

স্বামী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, "গুরুঠাকুর ! এমন কথা তিনি কখন বলিলেন।"

আমি বলিলাম, "আজ সকালে যখন স্নান করিয়া ফিরিতেছিলাম তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তখনি বলিলেন।"

স্বামীর কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন আদেশ কেন করিলেন।"

আমি বলিলাম, "জানি না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো, পারেন তো তিনিই বুঝাইয়া দিবেন।"

স্বামী বলিলেন, "সংসারে থাকিয়াও তো সংসার ত্যাগ করা যায়, আমি সেই কথা গুরুকে বুঝাইয়া বলিব।"

আমি বলিলাম, "হয়তো গুরু বুঝিতে পারেন, কিন্তু আমার মন বুঝিবে না। আমার সংসার করা আজ হইতে ঘুচিল।"

স্বামী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আকাশ যখন ফরসা হইল তিনি বলিলেন, "চলো-না, দুজনে একবার তাঁর কাছেই যাই।"

আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, "তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না।"

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি মুখ নামাইলাম। তিনি আর কোনো কথা বলিলেন না।

আমি জানি, আমার মনটা তিনি একরকম করিয়া দেখিয়া লইলেন।

পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সব চেয়ে ভালোবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।

এই বলিয়া সে গড় করিয়া প্রণাম করিল।

আষাঢ় ১৩২১

স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণকমলেষু

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখি নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি— মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি ; চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায় নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে-সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই ; সে তোমার দেহমনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে ; তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল ; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জানত না, সেই শিশুবয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠলুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বলতে লাগল, "মৃণাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত ?" চুরিবিদ্যাতে যম পাকা, দামি জিনিসের 'পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি।

যেদিন তোমাদের দূরসম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে কনে দেখতে এলেন, তখন আমার বয়স বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলা শেয়াল ডাকে। স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ স্যাক্‌রা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পালকি করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছনো যায়। সেদিন তোমাদের কী হয়রানি। তার উপরে আমাদের বাঙাল দেশের রান্না— সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেন নি।

তোমাদের বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজোবউকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট করে আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন ? বাংলা দেশে পিলে

যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না— তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বুক দুর্‌দুর্‌ করতে লাগল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মেয়ের রূপের উপর ভরসা ; কিন্তু, সেই রূপের গুমর তো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে-দামই দেবে সেই তার দাম। তাই তো হাজার রূপে গুণেও মেয়েমানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন-কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল— আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল— তোমাদের বাড়িতে এসে উঠলুম। আমার খুঁতগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন, মোটের উপর আমি সুন্দরী বটে। সে কথা শুনে আমার বড়ো জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু, আমার রূপের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। রূপ-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন, তা হলে ওর আদর থাকত ; কিন্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে, সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে, সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু কী করব বলো। তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা ; অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি ; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজোবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি ; আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমার মনে জাগছে সে তোমাদের গোয়ালঘর। অন্দরমহলের সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক পাশে ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সামনের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাব্‌না দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ ; উপবাসী গোরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব্‌লা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে— তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বউ ছিলুম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম ; যখন বড়ো হলুম তখন গোরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত তা হলে সেই আমার জীবনে যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সত্য সমস্ত এনে দিত ; তখন মেজোবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বসতুম। মা যে এক-সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্ব-সংসারের। মা

হবার দুঃখটুকু পেলুম কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।

মনে আছে, ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটু বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা আসবাবের অভাব নেই। আর, অন্দরটা যেন পশমের কাজের উলটো পিঠ ; সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সেদিকে আলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলে ; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে ; উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না ; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু, ডাক্তার একটা ভুল করেছিল ; সে ভেবেছিল, এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উলটো— অনাদর জিনিসটা ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেইজন্যে তার বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে, এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়, তা হলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো ; আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে, এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসে নি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়াল, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কীই-বা যে মরণকে ভয় করতে হবে ? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তা হলে আলগা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সুদ্ধ আমি তেমনি করে উঠে আসতুম। বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু, এমন মরায় বাহাদুরিটা কী। মরতে লজ্জা হয় ; আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি তো সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত কেটে যেত ; আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথগাছের অঙ্কুর বের করে ; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল ; তার পর থেকে ফাটল শুরু হল।

বিধমা মার মৃত্যুর পরে আমার বড়ো জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে, তোমরা সেদিন ভাবলে, এ আবার কোথাকার আপদ। আমার পোড়া স্বভাব, কী করব বলো— দেখলুম, তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ, সেইজন্যেই এই নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একেবারে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া— সে কত বড়ো অপমান। দায়ে প'ড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল, তাকে কি এক পাশে ঠেলে রাখা যায়।

তার পরে দেখলুম আমার বড়ো জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে প'ড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু, যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা, তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, যেন একে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন, সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সংকট দেখে আমার মন আরো ব্যথিত হয়ে উঠল। দেখলুম, বড়ো জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়াপরার এমনি মোটারকমের ব্যবস্থা করলেন এবং বাড়ির সর্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার, কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর, অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।

আমাদের বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না— রূপও না, টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জান।

তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে যতদূর সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু, তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মুশকিল হয়েছে। আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারি নে। আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয়— তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দিদি বললেন, "মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেন।" আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম, এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে যে-স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হালকা হল। আমার বড়ো জা বিন্দুর বয়স থেকে দু-চারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু, তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না, এ কথা লুকিয়ে বললে অন্যায় হত না। তুমি তো জান, সে দেখতে এতই মন্দ ছিল যে পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজেটার জন্যেই লোকে উদ্‌বিগ্ন হত। কাজেই পিতা-মাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাঁকে বিয়ে করবার মতো মনের জোরই বা কজন লোকের ছিল।

বিন্দু বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগলে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো শর্ত ছিল না; তাই সে কেবলই পাশ কাটিয়ে, চোখ এড়িয়ে চলত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়তুতো ভাইরা তাকে এমন একটু কোণও ছেড়ে দিতে চায় নি যে-কোণে একটা অনাবশ্যক জিনিস পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশে-পাশে অনায়াসে স্থান পায়, কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়, কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত, সেইজন্যে আঁস্তাকুড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়তুতো ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জো নেই। কিন্তু, তারা বেশ আছে।

তাই, বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আনলুম, তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। তার ভয় দেখে আমার বড়ো দুঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে, সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম।

কিন্তু, আমার ঘর শুধু তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হল না। দু-চারদিন আমার কাছে থাকতেই তার গায়ে লাল-লাল কী উঠল, হয়তো সে ঘামাচি, নয় তো আর-কিছু হবে। তোমরা বললে বসন্ত। কেননা, ও যে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বললে, আর দুই-একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই দুই-একদিনের সবুর সইবে কে। বিন্দু তো তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জো হল। আমি বললুম, বসন্ত হয় তো হোক, আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর-কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্তি ধরেছ, এমন-কি, বিন্দুর দিদিও যখন অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাঁসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরো ব্যস্ত হয়ে উঠলে। বললে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে কেননা, ও যে বিন্দু।

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না— মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল, কিছুই হল না। কিন্তু, এটা বেশ বোঝা গেল, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন। আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর-এক গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালোবাসতে শুরু করলে যে, আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালোবাসার এরকম মূর্তি সংসারে তো

কোনোদিন দেখি নি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে-পুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটে নি— এতদিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বলত, "দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নি।" যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম, সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়তে-চাড়তে তার ভারি ভালো লাগত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের তো দরকার ছিল না। কিন্তু, বিন্দু আমাকে অস্থির করে রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তর দিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোনোগতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠেছে, সেইদিন জানতুম, ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি বুঝলুম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে— সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দুর ভালোবাসার দুঃসহ বেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। এক একবার তার উপর রাগ হত, সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।

এদিকে, বিন্দুর মতো মেয়েকে আমি যে এতটা আদরযত্ন করছি, এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খুঁতখুঁত-খিট্‌খিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল, সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিল, এ কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী হাঙ্গামায় লোকের বাড়িতল্লাসি হতে লাগল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বসলে যে, বিন্দু পুলিসের পোষা মেয়েচর। তার আর কোনো প্রমাণ ছিল না কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি করত— তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাশ করলে, ও-মেয়েও একেবারে সংকোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। এই-সকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখলুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগে নি। বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে, আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর, মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল, তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুশি হও নি। আমাকে খুশি না করলেও চলে আর তোমাদের খুশি না করলেই নয়, এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এদিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য হই, তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাও নি। আমি বেশ বুঝি, তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় কর। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় করতে না পেরে তোমরা প্রজাপতি দেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড়ো জা বললেন, "বাঁচলুম, মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা করলেন।"

বর কেমন তা জানি নে ; তোমাদের কাছে শুনলুম, সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল ; বললে, "দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন।"

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, "বিন্দু, তুই ভয় করিস নে— শুনেছি, তোর বর ভালো।"

বিন্দু বললে, "বর যদি ভালো হয়, আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে।"

বরপক্ষেরা বিন্দুকে তো দেখতে আসবার নামও করলে না। বড়দিদি তাতে বড়ো নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু, দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থামতে চায় না। সে তার কী কষ্ট, সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি কিন্তু, ওর বিবাহ বন্ধ হোক, এ কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বলব। আমি যদি মারা যাই তো ওর কী দশা হবে।

একে তো মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে— কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বললে, "দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি।"

আমি তাকে খুব ধমকে দিলুম, কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তা হলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বললে, "দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।"

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু, শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে। তিনি বললেন, "জানিস তো, বিন্দি, পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।"

আসল কথা হচ্ছে, কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই— বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হোক।

আমি চেয়েছিলুম, বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু, তোমরা বলে বসলে, বরের বাড়িতেই হওয়া চাই— সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বুঝলুম, বিন্দুর বিবাহের জন্য যদি তোমাদের খরচ করতে হয়, তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে যেতে হল। কিন্তু, একটি কথা তোমরা কেউ জান না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তা হলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন— আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্মের, সেজন্য তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "দিদি, আমাকে তোমরা তা হলে নিতান্তই ত্যাগ করলে?"

আমি বললুম, "না বিন্দি, তোর যেমন দশাই হোক-না কেন, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না।"

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল, তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা-রাখবার ঘরের এক পাশে বাস করতে দিয়েছিলুম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আসতুম; তোমার চাকরদের প্রতি দু-একদিন নির্ভর করে দেখেছি, তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি, বিন্দু এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

বিন্দুর স্বামী পাগল।

"সত্যি বলছিস, বিন্দি?"

"এত বড়ো মিথ্যা কথা তোমার কাছে বলতে পারি, দিদি? তিনি পাগল। শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না— কিন্তু তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।"

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়লুম। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না। বলে,

'ও তো মেয়েমানুষ বৈ তো নয়। ছেলে হোক-না পাগল, সে তো পুরুষ বটে।'

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে, তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিন্দু দুপুরবেলায় পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রানী রাসমণি ; বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রানীকে তার নিজের থালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু তো ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বললে, বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরো ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুকতে হল। স্বামী সে রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু, ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বললুম, "এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু, তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক্, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।"

তোমরা বললে, "বিন্দু মিথ্যা কথা বলছে।"

আমি বললুম, "ও কখনো মিথ্যা বলে নি।"

তোমরা বললে, "কেমন করে জানলে।"

আমি বললুম, "আমি নিশ্চয় জানি।"

তোমরা ভয় দেখালে, "বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস-কেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে।"

আমি বললুম, "ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ কথা কি আদালত শুনবে না।"

তোমরা বললে, "তবে কি এই নিয়ে আদালত করতে হবে নাকি। কেন, আমাদের দায় কিসের।"

আমি বললুম, "আমি নিজের গয়না বেচে যা করতে পারি করব।"

তোমরা বললে, "উকিলবাড়ি ছুটবে নাকি।"

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কী করব।

ওদিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বলছে, সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কী জোর আছে জানি নে— কিন্তু কসাইয়ের হাত থেকে যে গোরু প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কসাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে, এ কথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্ধা করে বললুম, "তা দিক্ থানায় খবর!"

এই বলে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি, বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদপ্রতিবাদ যখন চলছিল তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েছে। বুঝেছে, এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেলবে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরো বাড়ালে। তার শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে তো ওকে খেয়ে ফেলছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয়, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড়ো জা বললেন, "ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করব। তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে।"

কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে সতীসাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল ; জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচবোধ হয় নি, সেইজন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর

ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেঁট হয় নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেল কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন। তোমাদের এই-সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না।

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আসবে না, কিন্তু আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে, তাকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোটো ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল ; তোমরা জানই তো যত রকমের ভলন্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দুবার সে এফ· এ· পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায় নি। তাকে আমি ডেকে বললুম, "বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না, লিখলেও আমি পাব না।"

এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম, বিন্দুকে ডাকাতি করে আনতে কিংবা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তা হলে সে বেশি খুশি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করছি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বললে, "আবার কী হাঙ্গামা বাধিয়েছ।"

আমি বললুম, "সেই যা-সব গোড়ায় বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম— কিন্তু সে তো তোমাদেরই কীর্তি।"

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, "বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ ?"

আমি বললুম, "বিন্দু যদি আসত তা হলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আসবে না, তোমাদের ভয় নেই।"

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরো বেড়ে উঠল। আমি জানতুম, শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে, এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল, ওর 'পরে পুলিসের দৃষ্টি আছে— কোন্ দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মামলায় পড়বে, তখন তোমাদেব সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শুনলুম, বিন্দু আবার পালিয়েছে, তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসুর খোঁজ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধল। হতভাগিনীর যে কী অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই।

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বললে, "বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনই আবার তাকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। এর জন্যে তাদের খেসারত এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে, তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরে নি।

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বললুম, "আমিও যাব।"

আমার হঠাৎ এমন ধর্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুশি হয়ে উঠলে যে, কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্ দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

বুধবারে আমাদের যাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। আমি শরৎকে ডেকে বললুম, "যেমন করে হোক, বিন্দুকে বুধবারে পুরী যাবার গাড়িতে তোকে তুলে দিতে হবে।"

শরতের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল ; সে বললে, "ভয় নেই, দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্যন্ত চলে যাব— ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা হয়ে যাবে।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার বুক দমে গেল। আমি বললুম, "কী শরৎ ? সুবিধা হল না বুঝি ?"

সে বললে, "না।"

আমি বললুম, "রাজি করতে পারলি নে ?"

সে বললে, "আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলুম, তার কাছে খবর পেলুম, তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল, কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।"

যাক, শান্তি হল।

দেশসুদ্ধ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, "মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশান হয়েছে।"

তোমরা বললে, "এ সমস্ত নাটক করা।" তা হবে। কিন্তু নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দিটার এমনি পোড়া কপাল বটে! যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পায় নি— মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনে মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুশি হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না। মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। যাই হোক-না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে, মরেছে বৈ তো না! বেঁচে থাকলে কী না হতে পারত।

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি-বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হত তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধ্বী বড়ো জায়ের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে— আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়।

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তার পরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক্-না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়ো। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্— সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, জগতের মধ্যে যা-কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চারি-দিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্‌বুদটা এমন ভয়ংকর বাধা কেন। তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে করে যেমন করেই ডাক দিক-না, এক মুহূর্তের জন্যে কেন আমি এই অন্দরমহলটার এইটুকু মাত্র চৌকাঠ পেরতে পারি নে। তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার— কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশ-বন্ধনেরই হবে জিত— আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল— কোথায় রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া ; কোন্ দুঃখে কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে ! ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে ! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর ! তোর মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না।

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।

তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি— ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল— তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু— তাতে তার যা হবার তা হোক।' এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন—
মৃণাল।

শ্রাবণ ১৩২১

ভাইফোঁটা

শ্রাবণ মাসটা আজ যেন এক রাত্রে একেবারে দেউলে হইয়া গেছে। সমস্ত আকাশে কোথাও একটা ছেঁড়া মেঘের টুকরাও নাই।

আশ্চর্য এই যে, আমার সকালটা আজ এমন করিয়া কাটিতেছে। আমার বাগানের মেহেদি-বেড়ার প্রান্তে শিরীষগাছের পাতাগুলা ঝল্মল্ করিয়া উঠিতেছে, আমি তাহা তাকাইয়া দেখিতেছি। সর্বনাশের যে মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি এটা যখন দূরে ছিল তখন ইহার কথা কল্পনা করিয়া কত শীতের রাত্রে সর্বাঙ্গে ঘাম দিয়াছে, কত গ্রীষ্মের দিনে হাত-পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেছে। কিন্তু আজ সমস্ত ভয়ভাবনা হইতে এমনি ছুটি পাইয়াছি যে, ঐ যে আতাগাছের ডালে একটা গিরগিটি স্থির হইয়া শিকার লক্ষ্য করিতেছে, সেটার দিকেও আমার চোখ রহিয়াছে।

সর্বস্ব খোয়াইয়া পথে দাঁড়াইব, এটা তত কঠিন না—কিন্তু আমাদের বংশে যে সততার খ্যাতি আজ তিন-পুরুষ চলিয়া আসিয়াছে সেটা আমারই জীবনের উপর আছাড় খাইয়া চুরমার হইতে চলিল, সেই লজ্জাতেই আমার দিনরাত্রি স্বস্তি ছিল না ; এমন-কি, আত্মহত্যার কথাও অনেকবার ভাবিয়াছি। কিন্তু, আজ যখন আর পর্দা রহিল না, খাতাপত্রের গুহাগহ্বর হইতে অখ্যাতিগুলো কালো ক্রিমির মতো কিল্‌বিল্ করিয়া বাহির হইয়া আদালত হইতে খবরের কাগজময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন আমার একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। পিতৃপুরুষের সুনামটাকে টানিয়া বেড়াইবার দায় হইতে রক্ষা পাইলাম। সবাই জানিল, আমি জুয়াচোর। বাঁচা গেল।

উকিলে উকিলে ছেঁড়াছিঁড়ি করিয়া সকল কথাই বাহির করিবে, কেবল সকলের চেয়ে বড়ো কলঙ্কের কথাটা আদালতে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই—কারণ, স্বয়ং ধর্ম ছাড়া তার আর-কোনো ফরিয়াদি অবশিষ্ট নাই। এইজন্য সেইটে প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়াই আজ কলম ধরিলাম।

আমার পিতামহ উদ্ধব দত্ত তাঁর প্রভুবংশকে বিপদের দিনে নিজের সম্পত্তি দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। সেই হইতে আমাদের দারিদ্র্যই অন্য লোকের ধনের চেয়ে মাথা উঁচু করিয়াছে। আমার পিতা সনাতন দত্ত ডিরোজিয়োর ছাত্র। মদের সম্বন্ধে তাঁর যেমন অদ্ভুদ নেশা ছিল সত্যের সম্বন্ধে ততোধিক। মা আমাদের একদিন নাপিত ভায়ার গল্প বলিয়াছিলেন শুনিয়া পরদিন হইতে সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ির ভিতরে যাওয়া তিনি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরে পড়িবার ঘরে শুইতাম। সেখানে দেয়াল জুড়িয়া ম্যাপগুলা সত্য কথা বলিত, তেপান্তর মাঠের খবর দিত না, এবং সাত সমুদ্র তেরো নদীর গল্পটাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলাইয়া রাখিত। সততা সম্বন্ধেও তাঁর শুচিবায়ু প্রবল ছিল। আমাদের জবাবদিহির অন্ত ছিল না। একদিন একজন 'হকার' দাদাকে কিছু জিনিস বেচিয়াছিল। তারই কোনো একটা মোড়কের একখানা দড়ি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। বাবার হুকুমে সেই দড়ি হকারকে ফিরাইয়া দিবার জন্য রাস্তায় আমাকে ছুটিতে হইয়াছিল।

আমরা সাধুতার জেলখানায় সততার লোহার বেড়ি পরিয়া মানুষ। মানুষ বলিলে একটু বেশি বলা হয়— আমরা ছাড়া আর সকলেই মানুষ, কেবল আমরা মানুষের দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের খেলা ছিল কঠিন, ঠাট্টা বন্ধ, গল্প নীরস, বাক্য স্বল্প, হাসি সংযত, ব্যবহার নিখুঁত। ইহাতে বাল্যলীলার মস্ত যে একটা ফাঁক পড়িয়াছিল লোকের প্রশংসায় সেটা ভর্তি হইত। আমাদের মাস্টার হইতে মুদি পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করিত, দত্তবাড়ির ছেলেরা সত্যযুগ হইতে হঠাৎ পথ ভুলিয়া আসিয়াছে।

পাথর দিয়া নিরেট করিয়া বাঁধানো রাস্তাতেও একটু ফাঁক পাইলেই প্রকৃতি তার মধ্য হইতে আপনার প্রাণশক্তির সবুজ জয়পতাকা তুলিয়া বসে। আমার নবীন জীবনে সকল তিথিই একাদশী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উহারই মধ্যে উপবাসের একটা কোন্ ফাঁকে আমি একটুখানি সুধার স্বাদ পাইয়াছিলাম।

যে কয়জনের ঘরে আমাদের যাওয়া-আসার বাধা ছিল না তার মধ্যে একজন ছিলেন অখিলবাবু। তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক ; বাবা তাঁকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁর মেয়ে ছিল অনসূয়া, আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোটো। আমি তার শাসনকর্তার পদ লইয়াছিলাম।

তার শিশুমুখের সেই ঘন কালো চোখের পল্লব আমার মনে পড়ে। সেই পল্লবের ছায়াতে এই পৃথিবীর আলোর সমস্ত প্রখরতা তার চোখে যেন কোমল হইয়া আসিয়াছিল। কী স্নিগ্ধ করিয়াই সে মুখের দিকে চাহিত। পিঠের উপরে দুলিতেছে তার সেই বেণীটি, সেও আমার মনে পড়ে ; আর মনে পড়ে সেই দুইখানি হাত— কেন জানি না, তার মধ্যে বড়ো একটি করুণা ছিল। সে যেন পথে চলিতে আর-কারও হাত ধরিতে চায় ; তাই সেই কচি আঙুলগুলি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কার মুঠার মধ্যে ধরা দিবার জন্য পথ চাহিয়া আছে।

ঠিক সেদিন এমন করিয়া তাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, এ কথা বলিলে বেশি বলা হইবে। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ বুঝিবার আগেও অনেকটা বুঝি। অগোচরে মনের মধ্যে অনেক ছবি আঁকা হইয়া যায়— হঠাৎ একদিন কোনো-এক দিক হইতে আলো পড়িলে সেগুলা চোখে পড়ে।

অনুর মনের দরজায় কড়া পাহারা ছিল না। সে যা-তা বিশ্বাস করিত। একে তো সে তার বুড়ি দাসীর কাছ হইতে বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সমস্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তা আমার সেই ম্যাপ-টাঙানো পড়িবার ঘরের জ্ঞানভাণ্ডারের আবর্জনার মধ্যেও ঠাঁই পাইবার যোগ্য নয় ; তার পরে সে আবার নিজের কল্পনার যোগেও কত কী যে সৃষ্টি করিত তার ঠিকানা নাই। এইখানে কেবলই তাকে আমার শাসন করিতে হইত। কেবলই বলিতে হইত, "অনু, এ-সমস্ত মিথ্যা কথা, তা জান! ইহাতে পাপ হয়!" শুনিয়া অনুর দুই চোখে কালো পল্লবের ছায়ার উপরে আবার একটা ভয়ের ছায়া পড়িত। অনু

যখন তার ছোটো বোনের কান্না থামাইবার জন্য কত কী বাজে কথা বলিত— তাকে ভুলাইয়া দুধ খাওয়াইবার সময় যেখানে পাখি নাই সেখানেও পাখি আছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উড়ো খবর দিবার চেষ্টা করিত, আমি তাকে ভয়ংকর গম্ভীর হইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছি ; বলিয়াছি, "উহাকে যে মিথ্যা বলিতেছ, পরমেশ্বর সমস্ত শুনিতেছেন, এখনই তাঁর কাছে তোমার মাপ চাওয়া উচিত।"

এমনি করিয়া আমি তাকে যত শাসন করিয়াছি, সে আমার শাসন মানিয়াছে। সে নিজেকে যতই অপরাধী মনে করিত আমি ততই খুশি হইতাম। কড়া শাসনে মানুষের ভালো করিবার সুযোগ পাইলে, নিজে যে অনেক শাসনে ভালো হইয়াছি সেটার একটা দাম ফিরিয়া পাওয়া যায়। অনুও আমাকে নিজের এবং পৃথিবীর অধিকাংশের তুলনায় অদ্ভুত ভালো বলিয়া জানিত।

ক্রমে বয়স বাড়িয়াছে, ইস্কুল হইতে কলেজে গিয়াছি। অখিলবাবুর স্ত্রীর মনে মনে ইচ্ছা ছিল, আমার মতো ভালো ছেলের সঙ্গে অনুর বিবাহ দেন। আমারও মনে এটা ছিল, কোনো কন্যার পিতার চোখ এড়াইবার মতো ছেলে আমি নই। কিন্তু একদিন শুনিলাম, বি. এল. পাস করা একটি টাটকা মুন্‌সেফের সঙ্গে অনুর সম্বন্ধ পাকা হইয়াছে। আমরা গরিব— আমি তো জানিতাম, সেটাতেই আমাদের দাম বাড়িয়াছে। কিন্তু কন্যার পিতার হিসাবের প্রণালী স্বতন্ত্র।

বিসর্জনের প্রতিমা ডুবিল। একেবারে জীবনের কোন্ আড়ালে সে পড়িয়া গেল। শিশুকাল হইতে যে আমার সকলের চেয়ে পরিচিত, সে একদিনের মধ্যেই এই হাজার লক্ষ অপরিচিত মানুষের সমুদ্রের মধ্যে তলাইয়া গেল। সেদিন মনে যে কী বাজিল তাহা মনই জানে। কিন্তু বিসর্জনের পরেও কি চিনিয়াছিলাম, সে আমার দেবীর প্রতিমা ? তা নয়। অভিমান সেদিন ঘা খাইয়া আরো ঢেউ খেলাইয়া উঠিয়াছিল। অনুকে তো চিরকাল ছোটো করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি ; সেদিন আমার যোগ্যতার তুলনায় তাকে আরো ছোটো করিয়া দেখিলাম। আমার শ্রেষ্ঠতার যে পূজা হইল না, সেদিন এইটেই সংসারের সকলের চেয়ে বড়ো অকল্যাণ বলিয়া জানিয়াছি।

যাক, এটা বোঝা গেল সংসারে শুধু সৎ হইয়া কোনো লাভ নাই। পণ করিলাম, এমন টাকা করিব যে একদিন অখিলবাবুকে বলিতে হইবে, 'বড়ো ঠকান ঠকিয়াছি।' খুব কষিয়া কাজের লোক হইবার জোগাড় করিলাম।

কাজের লোক হইবার সব চেয়ে বড়ো সরঞ্জাম নিজের 'পরে অগাধ বিশ্বাস, সে পক্ষে আমার কোনোদিন কোনো কমতি ছিল না। এ জিনিসটা ছোঁয়াচে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে, অধিকাংশ লোকেই তাকে বিশ্বাস করে। কেজো বুদ্ধিটা যে আমার স্বাভাবিক এবং অসাধারণ সেটা সকলেই মানিয়া লইতে লাগিল।

কেজো সাহিত্যের বই এবং কাগজে আমার শেল্‌ফ্ এবং টেবিল ভরিয়া উঠিল। বাড়ি-মেরামত, ইলেকট্রিক আলো ও পাখার কৌশল, কোন্ জিনিসের কত দর, বাজারদর ওঠাপড়ার গূঢ়তত্ত্ব, এক্‌স্‌চেঞ্জের রহস্য, প্ল্যান, এস্টিমেট্ প্রভৃতি বিদ্যায় আসর জমাইবার মতো ওস্তাদি আমি একরকম মারিয়া লইয়াছিলাম।

কিন্তু অহরহ কাজের কথা বলি অথচ কিছুতে কোনো কাজেই নামি না, এমনভাবে অনেকদিন কাটিল। আমার ভক্তরা যখনই আমাকে কোনো-একটা স্বদেশী কোম্পানিতে যোগ দিবার প্রস্তাব করিত আমি বুঝাইয়া দিতাম, যতগুলা কারবার চলিতেছে, কোনোটার কাজের ধারা বিশুদ্ধ নহে, সকলেরই মধ্যে গলদ বিস্তর— তা ছাড়া, সততা বাঁচাইয়া চলিতে হইলে ওদের কাছে ঘেঁষিবার জো নাই। সততার লাগামে একটু-আধটু ঢিল না দিলে ব্যবসা চলে না, এমন কথা আমার কোনো বন্ধু বলাতে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে।

মৃত্যুকাল পর্যন্ত সর্বাঙ্গসুন্দর প্ল্যান এস্টিমেট্ এবং প্রস্পেক্টস্ লিখিয়া আমার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতাম। কিন্তু বিধির বিপাকে প্ল্যান করা ছাড়িয়া কাজ করায় লাগিলাম। এক তো পিতার মৃত্যু হওয়াতে আমার ঘাড়েই সংসারের দায় চাপিল ; তার পরে আর-এক উপসর্গ আসিয়া জুটিল, সে কথাও বলিতেছি।

প্রসন্ন বলিয়া একটি ছেলে আমার সঙ্গে পড়িত। সে যেমন মুখর তেমনি নিন্দুক। আমাদের পৈতৃক সততার খ্যাতিটাকে লইয়া খোঁচা দিবার সে ভারি সুযোগ পাইয়াছিল। বাবা আমার নাম দিয়াছিলেন সত্যধন। প্রসন্ন আমাদের দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়া বলিত, "বাবা দিবার বেলা দিলেন মিথ্যাধন, আর নামের বেলা দিলেন সত্যধন, তার চেয়ে ধনটাকে সত্য দিয়া নামটাকে মিথ্যা দিলে লোকসান হইত না।" প্রসন্নর মুখটাকে বড়ো ভয় করিতাম।

অনেকদিন তার দেখাই ছিল না। ইতিমধ্যে সে বর্মায় লুধিয়ানায় শ্রীরঙ্গপত্তনে নানা রকম-বেরকমের কাজ করিয়া আসিয়াছে। সে হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া আমাকে পাইয়া বসিল। যার ঠাট্টাকে চিরদিন ভয় করিয়া আসিয়াছি, তার শ্রদ্ধা পাওয়া কি কম আরাম!

প্রসন্ন কহিল, "ভাই, আমার এই কথা রইল, দেখে নিয়ো, একদিন তুমি যদি দ্বিতীয় মতি শীল বা দুর্গাচরণ লা' না হও তবে আমি বউবাজারের মোড় হইতে বাগবাজারের মোড় পর্যন্ত বরাবর সমানে নাকে খত দিতে রাজি আছি।"

প্রসন্নর মুখে এত বড়ো কথাটা যে কতই বড়ো, তাহা প্রসন্নর সঙ্গে যারা এক ক্লাসে না পড়িয়াছে তারা বুঝিতেই পারিবে না। তার উপরে প্রসন্ন পৃথিবীটাকে খুব করিয়া চিনিয়া আসিয়াছে; উহার কথার দাম আছে।

সে বলিল, "কাজ বোঝে এমন লোক আমি ঢের দেখিয়াছি, দাদা— কিন্তু তারাই সব চেয়ে পড়ে বিপদে। তারা বুদ্ধির জোরেই কিস্তি মাত করিতে চায়, ভুলিয়া যায় যে মাথার উপরে ধর্ম আছেন। কিন্তু তোমাতে যে মণিকাঞ্চনযোগ। ধর্মকেও শক্ত করিয়া ধরিয়াছ, আবার কর্মের বুদ্ধিতেও তুমি পাকা।"

তখন ব্যাবসা-খ্যাপা কালটাও পড়িয়াছিল। সকলেই স্থির করিয়াছিল, বাণিজ্য ছাড়া দেশের মুক্তি নাই; এবং ইহাও নিশ্চিত বুঝিয়াছিল যে, কেবলমাত্র মূলধনটার জোগাড় হইলেই উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র এবং ছাত্রদের বাপ-দাদা সকলেই এক দিনেই সকল প্রকার ব্যাবসা পুরাদমে চালাইতে পারে।

আমি প্রসন্নকে বলিলাম, "আমার সম্বল নাই যে।"

সে বলিল "বিলক্ষণ! তোমার পৈতৃক সম্পত্তির অভাব কী।"

তখন হঠাৎ মনে হইল, প্রসন্ন তবে বুঝি এতদিন ধরিয়া আমার সঙ্গে একটা লম্বা ঠাট্টা করিয়া আসিতেছে।

প্রসন্ন কহিল, "ঠাট্টা নয়, দাদা। সততাই তো লক্ষ্মীর সোনার পদ্ম। লোকের বিশ্বাসের উপরই কারবার চলে, টাকায় নয়।"

পিতার আমল হইতেই আমাদের বাড়িতে পাড়ার কোনো কোনো বিধবা মেয়ে টাকা গচ্ছিত রাখিত। তারা সুদের আশা করিত না, কেবল এই বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিল যে, মেয়েমানুষের সর্বত্রই ঠকিবার আশঙ্কা আছে, কেবল আমাদের ঘরেই নাই।

সেই গচ্ছিত টাকা লইয়া স্বদেশী এজেন্সি খুলিলাম। কাপড়, কাগজ, কালি, বোতাম, সাবান, যতই আনাই, বিক্রি হইয়া যায়— একেবারে পঙ্গপালের মতো খরিদ্দার আসিতে লাগিল।

একটা কথা আছে— বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা যায় যে, কিছুই জানি না। টাকারও সেই দশা। টাকা যতই বাড়ে ততই মনে হয়, টাকা নাই বলিলেই হয়। আমার মনের সেই রকম অবস্থায় প্রসন্ন বলিল— ঠিক যে বলিল তাহা নয়, আমাকে দিয়া বলাইয়া লইল যে, খুচরা-দোকানদারির কাজে জীবন দেওয়াটা জীবনের বাজে খরচ। পৃথিবী জুড়িয়া যে-সব ব্যাবসা সেই তো ব্যাবসা। দেশের ভিতরেই যে টাকা খাটে সে টাকা ঘানির বলদের মতো অগ্রসর হয় না, কেবল ঘুরিয়া মরে।

প্রসন্ন এমনি ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া উঠিল যেন এমন নূতন অথচ গভীর জ্ঞানের কথা সে জীবনে আর কখনো শোনে নাই। তার পরে আমি তাকে ভারতবর্ষের তিসির ব্যাবসার সাত বছরের হিসাব দেখাইলাম। কোথায় তিসি কত পরিমাণে যায়; কোথায় কত দর; দর সব চেয়ে উঠেই বা কত,

নামেই বা কত ; মাঠে ইহার দাম কত ; জাহাজের ঘাটে ইহার দাম কত ; চাষাদের ঘর হইতে কিনিয়া একদম সমুদ্রপারে চালান করিতে পারিলে এক লপ্ফে কত লাভ হওয়া উচিত— কোথাও-বা তাহা রেখা কাটিয়া, কোথাও-বা তাহা শতকরা হিসাবের অঙ্কে ছকিয়া, কোথাও বা অনুলোম-প্রণালীতে, কোথাও-বা প্রতিলোম-প্রণালীতে, লাল এবং কালো কালিতে, অতি পরিষ্কার অক্ষরে লম্বা কাগজের পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা ভর্তি করিয়া যখন প্রসন্নর হাতে দিলাম তখন সে আমার পায়ের ধুলা লইতে যায় আর-কি।

সে বলিল, "মনে বিশ্বাস ছিল, আমি এ-সব কিছু কিছু বুঝি, কিন্তু আজ হইতে, দাদা, তোমার সাক্‌রেদ হইলাম।"

আবার একটু প্রতিবাদও করিল। বলিল, "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য—মনে আছে তো ? কী জানি, হিসাবে ভুল থাকিতেও পারে।"

আমার রোখ চড়িয়া গেল। ভুল যে নাই, কাগজে কাগজে তাহার অকাট্য প্রমাণ বাড়িয়া চলিল। লোকসান যত প্রকারের হইতে পারে সমস্তকে সার বাঁধিয়া খাড়া করিয়াও, মুনফাকে কোনোমতেই শতকরা বিশ-পঁচিশের নীচে নামাইতে পারা গেল না।

এমনি করিয়া দোকানদারির সরু খাল বাহিয়া কারবারের সমুদ্রে গিয়া যখন পড়া গেল তখন যেন সেটা নিতান্ত আমারই জেদবশত ঘটিল, এমনি একটা ভাব দেখা দিল। দায়িত্ব আমারই।

একে দত্তবংশের সততা, তার উপরে সুদের লোভ ; গচ্ছিত টাকা ফাঁপিয়া উঠিল। মেয়েরা গহনা বেচিয়া টাকা দিতে লাগিল।

কাজে প্রবেশ করিয়া আর দিশা পাই না। প্ল্যানে যেগুলো দিব্য লাল এবং কালো কালির রেখায় ভাগ করা, কাজের মধ্যে সে বিভাগ খুঁজিয়া পাওয়া দায়। আমার প্ল্যানের রসভঙ্গ হয়, তাই কাজে সুখ পাই না। অন্তরাত্মা স্পষ্ট বুঝিতে লাগিল, কাজ করিবার ক্ষমতা আমার নাই, অথচ সেটা কবুল করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। কাজটা স্বভাবত প্রসন্নর হাতেই পড়িল, অথচ আমিই যে কারবারের হর্তাকর্তা বিধাতা, এ ছাড়া প্রসন্নর মুখে আর কথাই নাই। তার মতলব এবং আমার স্বাক্ষর, তার দক্ষতা এবং আমার পৈতৃক খ্যাতি, এই দুইয়ে মিলিয়া ব্যাবসাটা চার পা তুলিয়া যে কোন পথে ছুটিতেছে ঠাহর করিতেই পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে এমন জায়গায় আসিয়া পড়িলাম সেখানে তলও পাই না, কূলও দেখি না। তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি সত্য খবরটা ফাঁস করি তবে সততা রক্ষা হয়, কিন্তু সততার খ্যাতি রক্ষা হয় না। গচ্ছিত টাকার সুদ জোগাইতে লাগিলাম, কিন্তু সেটা মুনফা হইতে নয়। কাজেই সুদের হার বাড়াইয়া গচ্ছিতের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলাম।

আমার বিবাহ অনেকদিন হইয়াছে। আমি জানিতাম, ঘরকন্না ছাড়া আমার স্ত্রীর আর কোনো-কিছুতেই খেয়াল নাই। হঠাৎ দেখি, অগস্ত্যের মতো এক গণ্ডূষে টাকার সমুদ্র শুষিয়া লইবার লোভ তারও আছে। আমি জানি না কখন আমারই মনের মধ্য হইতে এই হাওয়াটা আমাদের সমস্ত পরিবারে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের চাকর দাসী দরোয়ান পর্যন্ত আমাদের টাকা ফেলিতেছে। আমার স্ত্রীও আমাকে ধরিয়া পড়িল, সে কিছু কিছু গহনা বেচিয়া আমার কারবারে টাকা খাটাইবে। আমি ভর্ৎসনা করিলাম, উপদেশ দিলাম। বলিলাম, লোভের মতো রিপু নাই।— স্ত্রীর টাকা লই নাই।

আরো একজনের টাকা আমি লইতে পারি নাই।

অনু একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। যেমন কৃপণ তেমনি ধনী বলিয়া তার স্বামীর খ্যাতি ছিল। কেহ বলিত, দেড় লক্ষ টাকা তার জমা আছে ; কেহ বলিত আরো অনেক বেশি। লোকে বলিত, কৃপণতায় অনু তার স্বামীর সহধর্মিণী। আমি ভাবিতাম, তা হবেই তো। অনু তো তেমন শিক্ষা এবং সঙ্গ পায় নাই।

এই টাকা কিছু খাটাইয়া দিবার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিল। লোভ হইল,

দরকারও খুব ছিল, কিন্তু ভয়ে তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করিতে গেলাম না।

একবার যখন একটা বড়ো হুন্ডির মেয়াদ আসন্ন এমন সময়ে প্রসন্ন আসিয়া বলিল, "অখিলবাবুর মেয়ের টাকাটা এবার না লইলে নয়।"

আমি বলিলাম, "যেরকম দশা সিঁধ-কাটাও আমার দ্বারা সম্ভব, কিন্তু এ টাকাটা লইতে পারিব না।"

প্রসন্ন কহিল, "যখন হইতে তোমার ভরসা গেছে তখন হইতেই কারবারে লোকসান চলিতেছে! কপাল ঠুকিয়া লাগিলেই কপালের জোরও বাড়ে।"

কিছুতেই রাজি হইলাম না।

পরদিন প্রসন্ন আসিয়া কহিল, "দক্ষিণ হইতে এক বিখ্যাত মারাঠি গণৎকার আসিয়াছে, তাহার কাছে কুষ্ঠি লইয়া চলো।"

সনাতন দত্তর বংশে কুষ্ঠি মিলাইয়া ভাগ্যপরীক্ষা! দুর্বলতার দিনে মানবপ্রকৃতির ভিতরকার সাবেককেলে বর্বরটা বল পাইয়া উঠে। যাহা দৃষ্ট তাহা যখন ভয়ংকর তখন যাহা অদৃষ্ট তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিয়া কোনো আরাম পাইতেছিলাম না, তাই নির্বুদ্ধিতার শরণ লইলাম; জন্মক্ষণ ও সন-তারিখ লইয়া গনাইতে গেলাম।

শুনিলাম, আমি সর্বনাশের শেষ কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু এইবার বৃহস্পতি অনুকূল— এখন তিনি আমাকে কোনো-একটি স্ত্রীলোকের ধনের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া অতুল ঐশ্বর্য মিলাইয়া দিবেন।

ইহার মধ্যে প্রসন্নর হাত আছে, এমন সন্দেহ করিতে পারিতাম। কিন্তু সন্দেহ করিতে কোনোমতেই ইচ্ছা হইল না। বাড়ি ফিরিয়া আসিলে প্রসন্ন আমার হাতে একখানা বই দিয়া বলিল, "খোলো দেখি।" খুলিতেই যে পাতা বাহির হইল তাহাতে ইংরাজিতে লেখা, বাণিজ্যে আশ্চর্য সফলতা।

সেইদিনই অনুকে দেখিতে গেলাম।

স্বামীর সঙ্গে মফঃস্বলে ফিরিবার সময় বার বার ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়িয়া অনুর এখন এমন দশা যে ডাক্তাররা ভয় করিতেছে তাকে ক্ষয়রোগে ধরিয়াছে। কোনো ভালো জায়গায় যাইতে বলিলে সে বলে, "আমি তো আজ বাদে কাল মরিবই, কিন্তু আমার সুবোধের টাকা আমি নষ্ট করিব কেন।"— এমনি করিয়া সে সুবোধকে ও সুবোধের টাকাটিকে নিজের প্রাণ দিয়া পালন করিতেছে।

আমি গিয়া দেখিলাম, অনুর রোগটি তাকে এই পৃথিবী হইতে তফাত করিয়া দিয়াছে। আমি যেন তাকে অনেক দূর হইতে দেখিতেছি। তার দেহখানি একেবারে স্বচ্ছ হইয়া ভিতর হইতে একটি আভা বাহির হইতেছে। যা-কিছু স্থূল সমস্ত ক্ষয় করিয়া তার প্রাণটি মৃত্যুর বাহির দরজায় স্বর্গের আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর, সেই তার করুণ দুটি চোখের ঘন পল্লব। চোখের নীচে কালি পড়িয়া মনে হইতেছে, যেন তার দৃষ্টির উপরে জীবনান্তকালের সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। আমার সমস্ত মন স্তব্ধ হইয়া গেল, আজ তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হইল।

আমাকে দেখিয়া অনুর মুখের উপর একটি শান্ত প্রসন্নতা ছড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, "কাল রাত্রে আমার অসুখ যখন বাড়িয়াছিল তখন হইতে তোমার কথাই ভাবিতেছি। আমি জানি, আমার আর বেশি দিন নাই। পরশু ভাইফোঁটার দিন, সেদিন আমি তোমাকে শেষ ভাইফোঁটা দিয়া যাইব।"

টাকার কথা কিছুই বলিলাম না। সুবোধকে ডাকাইয়া আনিলাম। তার বয়স সাত। চোখদুটি মায়েরই মতো। সমস্তটা জড়াইয়া তার কেমন-একটি ক্ষণিকতার ভাব, পৃথিবী যেন তাকে পুরা পরিমাণ স্তন্য দিতে ভুলিয়া গেছে। কোলে টানিয়া তার কপাল চুম্বন করিলাম। সে চুপ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল, "কী হইল।"

আমি বলিলাম, "আজ আর সময় হইল না।"

সে কহিল, "মেয়াদের আর নয় দিন মাত্র বাকি।"

অনুর সেই মুখখানি, সেই মৃত্যুসরোবরের পদ্মটি, দেখিয়া অবধি সর্বনাশকে আমার তেমন ভয়ংকর

বলিয়া মনে হইতেছিল না।

কিছুকাল হইতে হিসাবপত্র দেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কূল দেখা যাইত না বলিয়া ভয়ে চোখ বুজিয়া থাকিতাম। মরীয়া হইয়া সই করিয়া যাইতাম, বুঝিবার চেষ্টা করিতাম না।

ভাইফোঁটার সকালবেলা একখানা হিসাবের চুম্বক ফর্দ লইয়া জোর করিয়া প্রসন্ন আমাকে কারবারের বর্তমান অবস্থাটা বুঝাইয়া দিল। দেখিলাম, মূলধনের সমস্ত তলা একেবারে ক্ষইয়া গেছে। এখন কেবলই ধারের টাকায় জল সেঁচিয়া না চলিলে নৌকাডুবি হইবে।

কৌশলে টাকার কথাটা পাড়িবার উপায় ভাবিতে ভাবিতে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণে চলিলাম। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। এখন হতবুদ্ধির তাড়ায় বৃহস্পতিবারকেও ভয় না করিয়া পারি না। যে মানুষ হতভাগা, নিজের বুদ্ধি ছাড়া আর-কিছুকেই না মানিতে তার ভরসা হয় না। যাবার বেলায় মনটা বড়ো খারাপ হইল।

অনুর জ্বর বাড়িয়াছে। দেখিলাম, সে বিছানায় শুইয়া। নীচে মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়া সুবোধ ইংরাজি ছবির কাগজ হইতে ছবি কাটিয়া আটা দিয়া একটা খাতায় আঁটিতেছিল।

বারবেলা বাঁচাইবার জন্য সময়ের অনেক আগে আসিয়াছিলাম। কথা ছিল, আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে আনিব। কিন্তু অনুর সম্বন্ধে আমার স্ত্রীর মনের কোণে বোধ করি একটুখানি ঈর্ষা ছিল, তাই সে আসিবার সময় ছুতা করিল— আমিও পীড়াপীড়ি করিলাম না।

অনু জিজ্ঞাসা করিল, "বউদিদি এলেন না?"

আমি বলিলাম, "শরীর ভালো নাই।"

অনু একটু নিশ্বাস ফেলিল, আর কিছু বলিল না।

আমার মধ্যে একদিন যেটুকু মাধুর্য দেখা দিয়াছিল সেইটিকে আপনার সোনার আলোয় গলাইয়া শরতের আকাশ সেই রোগীর বিছানার উপর বিছাইয়াছিল। কত কথা আজ উঠিয়া পড়িল। সেই-সব অনেক দিনের অতি ছোটো কথা আমার আসন্ন সর্বনাশকে ছাড়াইয়া আজ কত বড়ো হইয়া উঠিল। কারবারের হিসাব ভুলিয়া গেলাম।

ভাইফোঁটার খাওয়া খাইলাম। আমার কপালে সেই মরণের যাত্রী দীর্ঘায়ুকামনার ফোঁটা পরাইয়া আমার পায়ের ধুলা লইল। আমি গোপনে চোখ মুছিলাম।

ঘরে আসিয়া বসিলে সে একটি টিনের বাক্স আমার কাছে আনিয়া রাখিল। বলিল, "সুবোধের জন্য এই যা-কিছু এতদিন আগলাইয়া রাখিয়াছি তোমাকে দিলাম, আর সেইসঙ্গে সুবোধকেও তোমার হাতে দিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।"

আমি বলিলাম, "অনু, দোহাই তোমার, টাকা আমি লইব না। সুবোধের দেখাশুনার কোনো ত্রুটি হইবে না, কিন্তু টাকা আর-কারও কাছে রাখিয়ো।"

অনু কহিল, "এই টাকা লইবার জন্য কত লোক হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। তুমি কি তাদের হাতেই দিতে বল?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। অনু বলিল, "একদিন আড়াল হইতে শুনিয়াছি, ডাক্তার বলিয়াছে, সুবোধের যেরকম শরীরের লক্ষণ ওর বেশিদিন বাঁচার আশা নাই। শুনিয়া অবধি ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে আমার মরিতে দেরি হয়। আজ অন্তত আশা লইয়া মরিব যে, ডাক্তারের কথা ভুল হইতেও পারে। সাতচল্লিশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজে জমিয়াছে— আরো কিছু এদিকে ওদিকে আছে। ঐ টাকা হইতে সুবোধের পথ্য ও চিকিৎসা ভালো করিয়াই চলিতে পারিবে। আর যদি ভগবান অল্প বয়সেই উহাকে টানিয়া লন, তবে এই টাকা উহার নামে একটা কোনো ভালো কাজে লাগাইয়ো।"

আমি কহিলাম, "অনু, আমাকে তুমি যত বিশ্বাস কর আমি নিজেকে তত বিশ্বাস করি না।"

শুনিয়া অনু একটুমাত্র হাসিল। আমার মুখে এমন কথা মিথ্যা বিনয়ের মতো শোনায়।

বিদায়কালে অনু বাক্স খুলিয়া কোম্পানির কাগজ ও কয়েক কেতা নোট বুঝাইয়া দিল। তার উইলে দেখিলাম লেখা আছে, অপুত্রক ও নাবালক অবস্থায় সুবোধের মৃত্যু হইলে আমিই সম্পত্তির

উত্তরাধিকারী।

আমি বলিলাম, "আমার স্বার্থের সঙ্গে তোমার সম্পত্তি কেন এমন করিয়া জড়াইলে।"

অনু কহিল, "আমি যে জানি, আমার ছেলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ কোনোদিন বাধিবে না।"

আমি কহিলাম, "কোনো মানুষকেই এতটা বিশ্বাস করা কাজের দস্তুর নয়।"

অনু কহিল, "আমি তোমাকে জানি, ধর্মকে জানি, কাজের দস্তুর বুঝিবার আমার শক্তি নাই।"

বাক্সের মধ্যে গহনা ছিল, সেগুলি দেখাইয়া সে বলিল, "সুবোধ যদি বাঁচে ও বিবাহ করে, তবে বউমাকে এই গহনা ও আমার আশীর্বাদ দিয়ো। আর এই পান্নার কণ্ঠীটি বউদিদিকে দিয়া বলিয়ো, আমার মাথার দিব্য, তিনি যেন গ্রহণ করেন।"

এই বলিয়া অনু যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। এই আমি তার শেষ প্রণাম পাইয়াছি। ইহার দুই দিন পরেই সন্ধ্যার সময় হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া তার মৃত্যু হইল— আমাকে খবর দিবার সময় পাইল না।

ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ সারিয়া, টিনের বাক্স হাতে, গাড়ি হইতে বাড়ির দরজায় যেমনি নামিলাম দেখি, প্রসন্ন অপেক্ষা করিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, খবর ভালো তো ?"

আমি বলিলাম, "এ টাকায় কেহ হাত দিতে পারিবে না।"

প্রসন্ন কহিল, "কিন্তু—"

অমি বলিলাম, "সে জানি না— যা হয় তা হোক, এ টাকা আমার ব্যবসায়ে লাগিবে না।"

প্রসন্ন বলিল, "তবে তোমার অন্ত্যেষ্টিসৎকারে লাগিবে।"

অনুর মৃত্যুর পর সুবোধ আমার বাড়িতে আসিয়া আমার ছেলে নিত্যধনকে সঙ্গী পাইল।

যারা গল্পের বই পড়ে মন করে, মানুষের মনের বড়ো বড়ো পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটে। ঠিক উলটা। টিকার আগুন ধরিতে সময় লাগে কিন্তু বড়ো বড়ো আগুন হুহু করিয়া ধরে। আমি এ কথা যদি বলি যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুবোধের উপর আমার মনের একটা বিদ্বেষ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল, তবে সবাই তার বিস্তারিত কৈফিয়ত চাহিবে। সুবোধ অনাথ, সে বড়ো ক্ষীণপ্রাণ, সে দেখিতেও সুন্দর, সকলের উপরে সুবোধের মা স্বয়ং অনু— কিন্তু তার কথাবার্তা, চলাফেরা, খেলাধুলা, সমস্তই যেন আমাকে দিনরাত খোঁচা দিতে লাগিল।

আসল, সময়টা বড়ো খারাপ পড়িয়াছিল। সুবোধের টাকা কিছুতেই লইব না পণ ছিল, অথচ ও টাকাটা না লইলে নয় এমনি অবস্থা। শেষকালে একদিন মহা বিপদে পড়িয়া কিছু লইলাম। ইহাতে আমার মনের কল এমনি বিগড়াইয়া গেল যে, সুবোধের কাছে মুখ-দেখানো আমার দায় হইল। প্রথমটা উহাকে এড়াইতে থাকিলাম, তার পর উহার উপরে বিষম রাগিতে আরম্ভ করিলাম।

রাগিবার প্রথম উপলক্ষ হইল উহার স্বভাব। আমি নিজে ব্যস্তবাগীশ, সব কাজ তড়িঘড়ি করা আমার অভ্যাস। কিন্তু সুবোধের কী একরকমের ভাব, উহাকে প্রশ্ন করিলে হঠাৎ যেন উত্তর করিতেই পারে না— যেখানে সে আছে সেখানে যেন সে নাই, যেন সে আর কোথাও। রাস্তার ধারের জানলার গরাদে ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয় ; কী দেখে, কী ভাবে, তা সেই জানে। আমার এটা অসহ্য বোধ হয়। সুবোধ বহুকাল হইতে রুগ্‌ণ মায়ের কাছে মানুষ, সমবয়সী খেলার সঙ্গী কেউ ছিল না— তাই সে বরাবর আপনার মনকে লইয়াই আপনি খেলা করিয়াছে। এই-সব ছেলের মুশকিল এই যে, ইহারা যখন শোক পায় তখন ভালো করিয়া কাঁদিতেও জানে না, শোক ভুলিতেও জানে না। এইজন্যই সুবোধকে ডাকিলে হঠাৎ সাড়া পাওয়া যাইত না, এবং কাজ করিতে বলিলে সে ভুলিয়া যাইত। তার জিনিসপত্র সে কেবলই হারাইত, তাহা লইয়া বকিলে চুপ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত— যেন সেই চাহিয়া থাকাই তার কান্না। আমি বলিতে লাগিলাম, এর দৃষ্টান্ত যে আমার ছেলের পক্ষে বড়ো খারাপ। আবার মুশকিল এই যে, ইহাকে দেখিয়া অবধি নিত্যর ইহাকে ভারি ভালো লাগিয়াছে ; তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরকম বলিয়াই ইহার প্রতি টানও যেন তার বেশি হইল।

পরের স্বভাব সংশোধন আমার কৌলিক কাজ ; ইহাতে আমার পটুতাও যেমন উৎসাহও তেমনি। সুবোধের স্বভাবটা কর্মপটু নয় বলিয়াই আমি তাকে খুব কষিয়া কাজ করাইতে লাগিলাম। যতবারই সে ভুল করিত ততবারই নিজেকে দিয়া তার সে ভুল শোধরাইয়া লইতাম। আবার তার আর-এক অভ্যাস, সেটা তার মায়েরও ছিল— সে আপনাকে এবং আপনার চারি দিককে নানা রকম করিয়া কল্পনা করিত।

জানলার সামনেই যে জামরুল গাছ ছিল সেটাকে সে কী একটা অদ্ভুত নাম দিয়াছিল ; স্ত্রীর কাছে শুনিয়াছি একলা দাঁড়াইয়া সেই গাছটার সঙ্গে সে কথা কহিত। বিছানাটাকে মাঠ, আর বালিশগুলাকে গোরুর পাল মনে করিয়া শোবার ঘরে বসিয়া রাখালি করাটা যে কত মিথ্যা, ইহা তার নিজের মুখে কবুল করাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি— সে জবাবই করে না। আমি যতই তাকে শাসন করি আমার কাছে তার ত্রুটি ততই বাড়িয়া চলে। আমাকে দেখিলেই সে থতমত খাইয়া যায় ; আমার মুখের সাদা কথাটাও সে বুঝিতে পারে না।

আর কিছু নয়, হৃদয় যদি রাগ করিতে শুরু করে এবং নিজেকে সামলাইবার মতো বাহির হইতে কোনো ধাক্কা যদি না সে পায় তবে রাগটা আপনাকে আপনিই বাড়াইয়া চলে, নূতন কারণের অপেক্ষা রাখে না। যদি এমন মানুষকে দু-চারবার মূর্খ বলি যার জবাব দিবার সাধ্য নাই তবে সেই দু-চারবার বলাটাই পঞ্চমবারকার বলাটাকে সৃষ্টি করে, কোনো উপকরণের দরকার হয় না। সুবোধের উপর কেবলই বিরক্ত হইয়া ওঠা আমার মনের এমনি অভ্যাস হইয়াছিল যে, সেটা ত্যাগ করা আমার সাধ্যই ছিল না।

এমনি করিয়া পাঁচ বছর কাটিল। সুবোধের বয়স যখন বারো তখন তার কোম্পানির কাগজ এবং গহনাপত্র গলিয়া গিয়া আমার হিসাবের খাতার গোটাকতক কালির অঙ্কে পরিণত হইল।

মনকে বুঝাইলাম, অনু তো উইলে আমাকেই টাকা দিয়াছে। মাঝখানে সুবোধ আছে বটে, কিন্তু ও তো ছায়া, নাই বলিলেই হয়। যে টাকাটা নিশ্চয়ই পাইব সেটাকে আগেভাগে খরচ করিলে অধর্ম হয় না।

অল্প বয়স হইতেই আমার বাতের ব্যামো ছিল। কিছুদিন হইতে সেইটে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। যারা কাজের লোক তাদের স্থির করিয়া রাখিলে তারা চারি দিকের সমস্ত লোককে অস্থির করিয়া তোলে। সে কয়দিন আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, সুবোধ, বাড়ির চাকর-বাকর কারও শান্তি ছিল না।

এদিকে আমার পরিচিত যে কয়জন বিধবা আমার কাছে টাকা রাখিয়াছিল কয়েক মাস তাদের সুদ বন্ধ। পূর্বে এমন কখনো ঘটিতে দিই নাই। এইজন্য তারা উদ্‌বিগ্ন হইয়া আমাকে তাগিদ করিতেছে। আমি প্রসন্নকে তাগিদ করি, সে কেবলই দিন ফিরায়। অবশেষে যেদিন নিশ্চিত দিবার কথা সেদিন সকাল হইতে পাওনাদাররা বসিয়া আছে, প্রসন্নর দেখা নাই।

নিত্যকে বলিলাম, "সুবোধকে ডাকিয়া দাও।"

সে বলিল, "সুবোধ শুইয়া আছে।"

আমি মহা রাগিয়া বলিলাম, "শুইয়া আছে ? এখন বেলা এগারোটা, এখন সে শুইয়া আছে !"

সুবোধ ভয়ে ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, "প্রসন্নকে যেখানে পাও ডাকিয়া আনো।"

সর্বদা আমার ফাইফরমাশ খাটিয়া সুবোধ এ-সকল কাজে পাকা হইয়াছিল। কাকে কোথায় সন্ধান করিতে হইবে, সমস্তই তার জানা।

বেলা একটা হইল, দুটা হইল, তিনটা হইল, সুবোধ আর ফেরে না। এদিকে যারা ধন্না দিয়া বসিয়া আছে তাদের ভাষার তাপ এবং বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোনোমতেই সুবোধটার গড়িমসি চাল ঘুচাইতে পারিলাম না। যত দিন যাইতেছে ততই তার ঢিলামি আরো যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আজকাল সে বসিতে পারিলে উঠিতে চায় না, নড়িতে-চড়িতে তার সাত দিন লাগে। এক-একদিন দেখি, বিকালে পাঁচটার সময়েও সে বিছানায় গড়াইতেছে— সকালে তাকে বিছানা হইতে জোর করিয়া

উঠাইয়া দিতে হয়— চলিবার সময় যেন পায়ে পায়ে জড়াইয়া চলে। আমি সুবোধকে বলিতাম, জন্মকুঁড়ে, কুঁড়েমির মহামহোপাধ্যায়। সে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিত। একদিন তাকে বলিয়াছিলাম, "বল্ দেখি প্রশান্ত মহাসাগরের পরে কোন্ মহাসাগর।" যখন সে জবাব দিতে পারিল না আমি বলিলাম, "সে হচ্ছ তুমি, আলস্যমহাসাগর।" পারতপক্ষে সুবোধ কোনোদিন আমার কাছে কাঁদে না, কিন্তু সেদিন তার চোখ দিয়া ঝর্ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মার গালি সব সহিতে পারিত, কিন্তু বিদ্রূপ তার মর্মে গিয়া বাজিত।

বেলা গেল। রাত হইল। ঘরে কেহ বাতি দিল না। আমি ডাকাডাকি করিলাম, কেহ সাড়া দিল না। বাড়িসুদ্ধ সকলের উপর আমার রাগ হইল। তার পরে হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল, হয়তো প্রসন্ন সুদের টাকা সুবোধের হাতে দিয়াছে, সুবোধ তাই লইয়া পালাইয়াছে। আমার ঘরে সুবোধের যে আরাম ছিল না সে আমি জানিতাম। ছেলেবেলা হইতে আরাম জিনিসটাকে অন্যায় বলিয়াই জানি, বিশেষত ছোটো ছেলের পক্ষে। তাই এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পরিতাপ ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া সুবোধ যে টাকা লইয়া পালাইয়া যাইতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমি তাকে কপট অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে মনে গালি দিতে লাগিলাম। এই বয়সেই চুরি আরম্ভ করিল, ইহার গতি কী হইবে। আমার কাছে থাকিয়া, আমাদের বাড়িতে বাস করিয়াও ইহার এমন শিক্ষা হইল কী করিয়া। সুবোধ যে টাকা চুরি করিয়া পালাইয়াছে এ-সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। ইচ্ছা হইল, পশ্চাতে ছুটিয়া তাকে যেখানে পাই ধরিয়া আনি, এবং আপাদমস্তক একবার কষিয়া প্রহার করি।

এমন সময়ে আমার অন্ধকার ঘরে সুবোধ আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন আমার এমন রাগ হইয়াছে যে চেষ্টা করিয়াও আমার কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না।

সুবোধ বলিল, "টাকা পাই নাই।"

আমি তো সুবোধকে টাকা আনিতে বলি নাই, তবে সে কেন বলিল 'টাকা পাই নাই'। নিশ্চয় টাকা পাইয়া চুরি করিয়াছে— কোথাও লুকাইয়াছে। এই-সমস্ত ভালোমানুষ ছেলেরাই মিট্‌মিটে শয়তান।

আমি বহু কষ্টে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলাম, "টাকা বাহির করিয়া দে।"

সেও উদ্ধত হইয়া বলিল, "না, দিব না, তুমি কী করিতে পার করো।"

আমি আর কিছুতেই আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না। হাতের কাছে লাঠি ছিল, সজোরে তার মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। সে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তখন আমার ভয় হইল। নাম ধরিয়া ডাকিলাম, সে সাড়া দিল না। কাছে গিয়া যে দেখিব আমার সে শক্তি রহিল না। কোনো মতেই উঠিতে পারিলাম না। হাতড়াইতে গিয়া দেখি, জাজিম ভিজিয়া গেছে। এ যে রক্ত! ক্রমে রক্ত ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে আমি যেখানে ছিলাম তার চারি দিক রক্তে ভিজিয়া উঠিল। আমার খোলা জানলার বাহির হইতে সন্ধ্যাতারা দেখা যাইতেছিল; আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলাম— আমার হঠাৎ কেমন মনে হইল, সন্ধ্যাতারাটি ভাইফোঁটার সেই চন্দনের ফোঁটা। সুবোধের উপর আমার এতদিনকার যে অন্যায় বিদ্বেষ ছিল সে কোথায় এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া গেল। সে যে অনুর হৃদয়ের ধন; মায়ের কোল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সে যে আমার হৃদয়ে পথ খুঁজিতে আসিয়াছিল। আমি এ কী করিলাম! এ কী করিলাম! ভগবান আমাকে এ কী বুদ্ধি দিলে! আমার টাকার কী দরকার ছিল। আমার সমস্ত কারবার ভাসাইয়া দিয়া সংসারে কেবল এই রুগ্‌ণ বালকটির কাছে যদি ধর্ম রাখিতাম তাহা হইলে যে আমি রক্ষা পাইতাম।

ক্রমে ভয় হইতে লাগিল পাছে কেহ আসিয়া পড়ে, পাছে ধরা পড়ি। প্রাণপণে ইচ্ছা করিতে লাগিলাম কেহ যেন না আসে, আলো যেন না আনে—এই অন্ধকার যেন মুহূর্তের জন্য না ঘোচে, যেন কাল সূর্য না ওঠে, যেন বিশ্বসংসার একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া এমনিতরো নিবিড় কালো হইয়া আমাকে আর এই ছেলেটিকে চিরদিন ঢাকিয়া রাখে।

পায়ের শব্দ শুনিলাম। মনে হইল, কেমন করিয়া পুলিস খবর পাইয়াছে। কী মিথ্যা কৈফিয়ত দিব তাড়াতাড়ি সেইটে ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মন একেবারেই ভাবিতে পারিল না।

ধড়াস্ করিয়া দরজাটা পড়িল, ঘরে কে প্রবেশ করিল।

আমি আপাদমস্তক চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, তখনো রৌদ্র আছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; সুবোধ ঘরে ঢুকিতেই আমার ঘুম ভাঙিয়াছে।

সুবোধ হাটখোলা বড়োবাজার বেলেঘাটা প্রভৃতি যেখানে যেখানে প্রসন্নর দেখা পাইবার সম্ভাবনা ছিল সমস্ত দিন ধরিয়া সব জায়গায় খুঁজিয়াছে। যে করিয়াই হউক তাহাকে যে আনিতে পারে নাই, এই অপরাধের ভয়ে তার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। এতদিন পরে দেখিলাম, কী সুন্দর তার মুখখানি, কী করুণায় ভরা তার দুইটি চোখ!

আমি বলিলাম, "আয় বাবা সুবোধ, আয় আমার কোলে আয়!"

সে আমার কথা বুঝিতেই পারিল না; ভাবিল, আমি বিদ্রূপ করিতেছি। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল এবং খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়াই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মুহূর্তে আমার বাতের পঙ্গুতা কোথায় চলিয়া গেল। আমি ছুটিয়া গিয়া কোলে করিয়া তাহাকে বিছানায় আনিয়া ফেলিলাম। কুঁজায় জল ছিল, তার মুখে মাথায় ছিটা দিয়া কিছুতেই তার চৈতন্য হইল না। ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম।

ডাক্তার আসিয়া তার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "এ যে একেবারে ক্লান্তির চরম সীমায় আসিয়াছে। কী করিয়া এমন হওয়া সম্ভব হইল।"

আমি বলিলাম, "আজ কোনো কারণে সমস্ত দিন উহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।"

তিনি বলিলেন, "এ তো একদিনের কাজ নয়। বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার ক্ষয় চলিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই।"

উত্তেজক ঔষধ ও পথ্য দিয়া ডাক্তার তার চৈতন্যসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন, "বহু যত্নে যদি দৈবাৎ বাঁচিয়া যায় তো বাঁচিবে, কিন্তু ইহার শরীরে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া গেছে। বোধ করি শেষ-কয়েকদিন এ ছেলে কেবলমাত্র মনের জোরে চলাফেরা করিয়াছে।"

আমি আমার রোগ ভুলিয়া গেলাম। সুবোধকে আমার বিছানায় শোয়াইয়া দিনরাত তার সেবা করিতে লাগিলাম। ডাক্তারের যে ফি দিব এমন টাকা আমার ঘরে নাই। স্ত্রীর গহনার বাক্স খুলিলাম। সেই পান্নার কণ্ঠীটি তুলিয়া লইয়া স্ত্রীকে দিয়া বলিলাম, "এইটি তুমি রাখো।" বাকি সবগুলি লইয়া বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া আসিলাম।

কিন্তু টাকায় তো মানুষ বাঁচে না। উহার প্রাণ যে আমি এতদিন ধরিয়া দলিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি। যে স্নেহের অন্ন হইতে উহাকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি আজ যখন তাহা হৃদয় ভরিয়া তাহাকে আনিয়া দিলাম তখন সে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। শূন্য হাতে তার মার কাছে সে ফিরিয়া গেল।

ভাদ্র ১৩২১

শেষের রাত্রি

"মাসি!"

"ঘুমোও, যতীন, রাত হল যে।"

"হোক-না রাত, আমার দিন তো বেশি নেই। আমি বলছিলুম, মণিকে তার বাপের বাড়ি— ভুলে যাচ্ছি, ওর বাপ এখন কোথায়—"

সীতারামপুরে।"

"হাঁ সীতারামপুরে। সেইখানে মণিকে পাঠিয়ে দাও, আরো কতদিন ও রোগীর সেবা করবে। ওর

শরীর তো তেমন শক্ত নয়।"

"শোনো একবার! এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে বউ বাপের বাড়ি যেতে চাইবেই বা কেন।"

"ডাক্তারেরা কী বলেছে সে কথা কি সে—"

"তা সে নাই জানল— চোখে তো দেখতে পাচ্ছে। সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেমন একটু ইশারায় বলা অমনি বউ কেঁদে অস্থির।"

মাসির এই কথাটার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল, সে কথা বলা আবশ্যক। মণির সঙ্গে সেদিন তাঁর এই প্রসঙ্গে যে আলাপ হইয়াছিল সেটা নিম্নলিখিত-মতো।

"বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু খবর এসেছে বুঝি? তোমার জাঠতুতো ভাই অনাথকে দেখলুম যেন।

"হাঁ, মা ব'লে পাঠিয়েছেন, আসছে শুক্রবারে আমার ছোটো বোনের অন্নপ্রাশন। তাই ভাবছি—"

"বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খুশি হবেন।"

"ভাবছি, আমি যাব। আমার ছোটো বোনকে তো দেখি নি, দেখতে ইচ্ছে করে।"

"সে কী কথা, যতীনকে একলা ফেলে যাবে? ডাক্তার কী বলেছে শুনেছ তো?"

"ডাক্তার তো বলছিল, এখনো তেমন বিশেষ—"

"তা যাই বলুক, ওর এই দশা দেখে যাবে কী ক'রে।"

"আমার তিন ভাইয়ের পরে এই একটি বোন, বড়ো আদরের মেয়ে— শুনেছি, ধুম করে অন্নপ্রাশন হবে— আমি না গেলে মা ভারি—"

"তোমার মায়ের ভাব, বাছা, আমি বুঝতে পারি নে। কিন্তু যতীনের এই সময়ে তুমি যদি যাও, তোমার বাবা রাগ করবেন, সে আমি ব'লে রাখছি।"

"তা জানি। তোমাকে একলাইন লিখে দিতে হবে মাসি, যে, কোনো ভাবনার কথা নেই— আমি গেলে বিশেষ কোনো—"

"তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই সে কি জানি নে। কিন্তু তোমার বাপকে যদি লিখতেই হয়, আমার মনে যা আছে সব খুলেই লিখব।"

"আচ্ছা, বেশ— তুমি লিখো না। আমি ওঁকে গিয়ে বললেই উনি—"

"দেখো, বউ, অনেক সয়েছি— কিন্তু এই নিয়ে যদি তুমি যতীনের কাছে যাও, কিছুতেই সইব না। তোমার বাবা তোমাকে ভালো রকমই চেনেন, তাঁকে ভোলাতে পারবে না।"

এই বলিয়া মাসি চলিয়া আসিলেন। মণি খানিকক্ষণের জন্য রাগ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

পাশের বাড়ি হইতে সই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি সই, গোসা কেন।"

"দেখো দেখি ভাই, আমার একমাত্র বোনের অন্নপ্রাশন— এরা আমাকে যেতে দিতে চায় না।"

"ওমা, সে কী কথা, যাবে কোথায়। স্বামী যে রোগে শুযছে।"

"আমি তো কিছুই করি নে, করতে পারিও নে; বাড়িতে সবই চুপচাপ, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এমন ক'রে আমি থাকতে পারি নে, তা বলছি!"

"তুমি ধন্যি মেয়েমানুষ যা হোক।"

"তা আমি, ভাই, তোমাদের মতো লোক-দেখানে ভান করতে পারি নে। পাছে কেউ কিছু মনে করে ব'লে মুখ গুঁজড়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা আমার কর্ম নয়।"

"তা, কী করবে শুনি।"

"আমি যাবই, আমাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না।"

"ইস্‌, তেজ দেখে আর বাঁচি নে। চললুম, আমার কাজ আছে।"

বাপের বাড়ি যাইবার প্রসঙ্গে মণি কাঁদিয়াছে— এই খবরে যতীন বিচলিত হইয়া বালিশটাকে পিঠের কাছে টানিয়া তুলিল এবং একটু উঠিয়া হেলান দিয়া বসিল। বলিল, "মাসি, এই জানলাটা আর-একটু খুলে দাও, আর এই আলোটা এ ঘরে দরকার নেই।"

জানলা খুলিতেই স্তব্ধ রাত্রি অনন্ত তীর্থপথের পথিকের মতো রোগীর দরজার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কত যুগের কত মৃত্যুকালের সাক্ষী ঐ তারাগুলি যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন এই বৃহৎ অন্ধকারের পটের উপর তাহার মণির মুখখানি দেখিতে পাইল। সেই মুখের ডাগর দুটি চক্ষু মোটা মোটা জলের ফোঁটায় ভরা— সে জল যেন আর শেষ হইল না, চিরকালের জন্য ভরিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ সে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া মাসি নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন, যতীনের ঘুম আসিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "মাসি, তোমরা কিন্তু বরাবর মনে করে এসেছ, মণির মন চঞ্চল, আমাদের ঘরে ওর মন বসে নি। কিন্তু দেখো—"

"না, বাবা, ভুল বুঝেছিলুম— সময় হলেই মানুষকে চেনা যায়!"

"মাসি!"

"যতীন, ঘুমোও, বাবা।"

"আমাকে একটু ভাবতে দাও, একটু কথা কইতে দাও! বিরক্ত হোয়ো না মাসি।"

"আচ্ছা, বলো, বাবা।"

"আমি বলছিলুম, মানুষের নিজের মন নিজে বুঝতেই কত সময় লাগে! একদিন যখন মনে করতুম, আমরা কেউ মণির মন পেলুম না, তখন চুপ করে সহ্য করেছি। তোমরা তখন—"

"না, বাবা, অমন কথা বোলো না— আমিও সহ্য করেছি।"

"মন তো মাটির ঢেলা নয়, কুড়িয়ে নিলেই তো নেওয়া যায় না। আমি জানতুম, মণি নিজের মন এখনো বোঝে নি; কোনো একটা আঘাতে যেদিন বুঝবে সেদিন আর—"

"ঠিক কথা, যতীন।"

"সেইজন্যই ওর ছেলেমানুষিতে কোনোদিন কিছু মনে করি নি।"

মাসি এ কথার কোনো উত্তর করিলেন না; কেবল মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কতদিন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, যতীন বারান্দায় আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, বৃষ্টির ছাঁট আসিয়াছে তবু ঘরে যায় নাই। কতদিন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া; একান্ত ইচ্ছা, মণি আসিয়া মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেয়। মণি তখন সখীদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার আয়োজন করিতেছে। তিনি যতীনকে পাখা করিতে আসিয়াছেন, সে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই বিরক্তির মধ্যে কত বেদনা তাহা তিনি জানিতেন। কতবার তিনি যতীনকে বলিতে চাহিয়াছেন 'বাবা, তুমি ঐ মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিয়ো না— ও একটু চাহিতে শিখুক— মানুষকে একটু কাঁদানো চাই।' কিন্তু এ-সব কথা বলিবার নহে, বলিলেও কেহ বোঝে না। যতীনের মনে নারীদেবতার একটি পীঠস্থান ছিল, সেইখানে সে মণিকে বসাইয়াছে। সেই তীর্থক্ষেত্রে নারীর অমৃতপাত্র চিরদিন তাহার ভাগ্যে শূন্য থাকিতে পারে, এ কথা মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই পূজা চলিতেছিল, অর্ঘ্য ভরিয়া উঠিতেছিল, বরলাভের আশা পরাভব মানিতেছিল না।

মাসি যখন আবার ভাবিতেছিলেন যতীন ঘুমাইয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "আমি জানি, তুমি মনে করেছিলে, মণিকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারি নি। তাই তার উপর রাগ করতে। কিন্তু, মাসি, সুখ জিনিসটা ঐ তারাগুলির মতো, সমস্ত অন্ধকার লেপে রাখে না, মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যায়। জীবনে কত ভুল করি, কত ভুল বুঝি, তবু তার ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলে নি।

কোথা থেকে আমার মনের ভিতরটি আজ এমন আনন্দে ভরে উঠেছে।"

মাসি আস্তে আস্তে যতীনের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া যে জল পড়িতেছিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

"আমি ভাবছি, মাসি, ওর অল্প বয়স, ও কী নিয়ে থাকবে?"

"অল্প বয়স কিসের, যতীন? এ তো ওর ঠিক বয়স। আমরাও তো, বাছা, অল্প বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে অন্তরের মধ্যে বসিয়েছি— তাতে ক্ষতি হয়েছে কী। তাও বলি, সুখেরই বা বেশি দরকার কিসের!"

"মাসি, মণির মনটি যেই জাগবার সময় হল অমনি আমি—"

"ভাব কেন, যতীন? মন যদি জাগে তবে সেই কি কম ভাগ্য!"

হঠাৎ অনেক দিনের শোনা একটা বাউলের গান যতীনের মনে পড়িয়া গেল—

ওরে মন, যখন জাগলি না রে
তখন মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম,
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে॥

"মাসি, ঘড়িতে ক'টা বেজেছে।"

"ন'টা বাজবে।"

"সবে ন'টা? আমি ভাবছিলুম, বুঝি দুটো, তিনটে, কি ক'টা হবে। সন্ধ্যার পর থেকেই আমার দুপুর রাত আরম্ভ হয়। তবে তুমি আমার ঘুমের জন্যে অত ব্যস্ত হয়েছিলে কেন।"

"কালও সন্ধ্যার পর এই রকম কথা কইতে কইতে কত রাত পর্যন্ত তোমার আর ঘুম এল না, তাই আজ তোমাকে সকাল-সকাল ঘুমোতে বলছি।"

"মণি কি ঘুমিয়েছে।"

"না, সে তোমার জন্যে মসুরির ডালের সুপ তৈরি ক'রে তবে ঘুমোতে যায়।"

"বলো কী, মাসি, মণি কি তবে—"

"সেই তো তোমার জন্যে সব পথ্যি তৈরি করে দেয়। তার কি বিশ্রাম আছে।"

"আমি ভাবতুম, মণি বুঝি—"

"মেয়েমানুষের কি আর এ-সব শিখতে হয়। দায়ে পড়লেই আপনি করে নেয়।"

"আজ দুপুরবেলা মৌরলা মাছের যে ঝোল হয়েছিল তাতে বড়ো সুন্দর একটি তার ছিল। আমি ভাবছিলুম, তোমারই হাতের তৈরি।"

"কপাল আমার! মণি কি আমাকে কিছু করতে দেয়। তোমার গামছা তোয়ালে নিজের হাতে কেচে শুকিয়ে রাখে। জানে যে, কোথাও কিছু নোংরা তুমি দেখতে পার না। তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার দেখ তবে দেখতে পাবে, মণি দুবেলা সমস্ত ঝেড়ে মুছে কেমন তক্‌তকে ক'রে রেখে দিয়েছে; আমি যদি তোমার এ ঘরে ওকে সর্বদা আসতে দিতুম তা হলে কি আর রক্ষা থাকত! ও তো তাই চায়।"

"মণির শরীরটা বুঝি—"

"ডাক্তাররা বলে, রোগীর ঘরে ওকে সর্বদা আনাগোনা করতে দেওয়া কিছু নয়। ওর মন বড়ো নরম কি না, তোমার কষ্ট দেখলে দুদিনে যে শরীর ভেঙে পড়বে।"

"মাসি, ওকে তুমি ঠেকিয়ে রাখ কী ক'রে।"

"আমাকে ও বড্ডো মানে বলেই পারি। তবু বার বার গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হয়— ঐ আমার আর-এক কাজ হয়েছে।

আকাশের তারাগুলি যেন করুণা-বিগলিত জলের মতো জ্বলজ্বল্ করিতে লাগিল। যে জীবন আজ বিদায় লইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যতীন তাহাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতার প্রণাম করিল— এবং সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া অন্ধকারের ভিতর হইতে যে দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া দিয়াছে যতীন স্নিগ্ধ বিশ্বাসের সহিত তাহার উপরে আপনার রোগক্লান্ত হাতটি রাখিল।

একবার নিশ্বাস ফেলিয়া, একটুখানি উস্‌খুস্ করিয়া যতীন বলিল, "মাসি, মণি যদি জেগেই থাকে তা হলে একবার যদি তাকে—"

"এখনি ডেকে দিচ্ছি, বাবা।"

"আমি বেশিক্ষণ তাকে এ ঘরে রাখতে চাই নে— কেবল পাঁচ মিনিট— দুটো-একটা কথা যা বলবার আছে—"

মাসি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মণিকে ডাকিতে আসিলেন। এদিকে যতীনের নাড়ী দ্রুত চলিতে লাগিল। যতীন জানে, আজ পর্যন্ত সে মণির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা জমাইতে পারে নাই। দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা, একসঙ্গে আলাপ চলা বড়ো কঠিন। মণি তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে অনর্গল বকিতেছে, হাসিতেছে, দূর হইতে তাহাই শুনিয়া যতীনের মন কতবার ঈর্ষায় পীড়িত হইয়াছে। যতীন নিজেকেই দোষ দিয়াছে— সে কেন অমন সামান্য যাহা-তাহা লইয়া কথা কহিতে পারে না। পারে না যে তাহাও তো নহে, নিজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যতীন সামান্য বিষয় লইয়াই কি আলাপ করে না। কিন্তু পুরুষের যাহা-তাহা তো মেয়েদের যাহা-তাহার সঙ্গে ঠিক মেলে না। বড়ো কথা একলাই একটানা বলিয়া যাওয়া চলে, অন্য পক্ষ মন দিল কি না খেয়াল না করিলেই হয়, কিন্তু তুচ্ছ কথায় নিয়ত দুই পক্ষের যোগ থাকা চাই ; বাঁশি একাই বাজিতে পারে, কিন্তু দুইয়ের মিল না থাকিলে করতালের খচমচ জমে না। এইজন্য কত সন্ধ্যাবেলায় যতীন মণির সঙ্গে যখন খোলা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে, দুটো-চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া ফাঁক হইয়া গেছে ; তাহার পরে সন্ধ্যার নীরবতা যেন লজ্জায় মরিতে চাহিয়াছে। যতীন বুঝিতে পারিয়াছে, মণি পালাইতে পারিলে বাঁচে ; মনে মনে কামনা করিয়াছে, এখনই কোনো-একজন তৃতীয় ব্যক্তি যেন আসিয়া পড়ে। কেননা, দুই জনে কথা কহা কঠিন, তিন জনে সহজ।

মণি আসিলে আজ কেমন করিয়া কথা আরম্ভ করিবে, যতীন তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে গেলে কথাগুলো কেমন অস্বাভাবিক রকম বড়ো হইয়া পড়ে— সে-সব কথা চলিবে না। যতীনের আশঙ্কা হইতে লাগিল, আজকের রাত্রে পাঁচ মিনিটও ব্যর্থ হইবে। অথচ, তাহার জীবনে এমনতরো নিরালা পাঁচ মিনিট আর ক'টাই বা বাকি আছে।

৩

"একি, বউ, কোথাও যাচ্ছ না কি।"

"সীতারামপুরে যাব।"

"সে কী কথা। কার সঙ্গে যাবে।"

"অনাথ নিয়ে যাচ্ছে।"

"লক্ষ্মী মা আমার, তুমি যেয়ো, আমি তোমাকে বারণ করব না, কিন্তু আজ নয়।"

"টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ করা হয়ে গেছে।"

"তা হোক, ও লোকসান গায়ে সইবে— তুমি কাল সকালেই চলে যেয়ো— আজ যেয়ো না।"

"মাসি, আমি তোমাদের তিথি বার মানি নে, আজ গেলে দোষ কী।"

"যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সঙ্গে তার একটু কথা আছে।"

"বেশ তো, এখনো একটু সময় আছে, আমি তাঁকে ব'লে আসছি।"

"না, তুমি বলতে পারবে না যে যাচ্ছ।"

"তা বেশ, কিছু বলব না, কিন্তু আমি দেরি করতে পারব না। কালই অন্নপ্রাশন— আজ যদি না যাই তো চলবে না।"

"আমি জোড়হাত করছি, বউ, আমার কথা আজ একদিনের মতো রাখো। আজ মন একটু শান্ত করে যতীনের কাছে এসে বসো— তাড়াতাড়ি কোরো না।"

"তা, কী করব বলো, গাড়ি তো আমার জন্যে বসে থাকবে না। অনাথ চলে গেছে— দশ মিনিট পরেই সে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। এই বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসি গে।"

"না, তবে থাক্— তুমি যাও। এমন করে তার কাছে যেতে দেব না। ওরে অভাগিনী, তুই যাকে এত দুঃখ দিলি সে তো সব বিসর্জন দিয়ে আজ বাদে কাল চলে যাবে— কিন্তু,যত দিন বেঁচে থাকবি এ দিনের কথা তোকে চিরদিন মনে রাখতে হবে— ভগবান আছেন, ভগবান আছেন, সে কথা একদিন বুঝবি।"

"মাসি, তুমি অমন ক'রে শাপ দিয়ো না বলছি!"

"ওরে বাপ রে, আর কেন বেঁচে আছিস রে বাপ। পাপের যে শেষ নেই— আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না।"

মাসি একটু দেরি করিয়া রোগীর ঘরে গেলেন। আশা করিলেন, যতীন ঘুমাইয়া পড়িবে। কিন্তু ঘরে ঢুকিতেই দেখিলেন, বিছানার উপর যতীন নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। মাসি বলিলেন, "এই এক কাণ্ড ক'রে বসেছে।"

"কী হয়েছে। মণি এল না? এত দেরি করলে কেন, মাসি।"

"গিয়ে দেখি, সে তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে ব'লে কান্না। আমি বলি, 'হয়েছে কী, আরো তো দুধ আছে।' কিন্তু, অসাবধান হয়ে তোমার খাবার দুধ পুড়িয়ে ফেলেছে, বউয়ের এ লজ্জা আর কিছুতেই যায় না। আমি তাকে অনেক ক'রে ঠাণ্ডা ক'রে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। আজ আর তাকে আনলুম না। সে একটু ঘুমোক।"

মণি আসল না বলিয়া যতীনের বুকের মধ্যে যেমন বাজিল, তেমনি সে আরামও পাইল। তাহার মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে মণি সশরীরে আসিয়া মণির ধ্যান-মাধুরীটুকুর প্রতি জুলুম করিয়া যায়। কেননা, তাহার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। দুধ পুড়াইয়া ফেলিয়া মণির কোমল হৃদয় অনুতাপে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই রসটুকুতে তাহার হৃদয় ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

"মাসি!"

"কী, বাবা।"

"আমি বেশ জানছি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু, আমার মনে কোনো খেদ নেই। তুমি আমার জন্যে শোক কোরো না।"

"না, বাবা, আমি শোক করব না। জীবনেই যে মঙ্গল আর মরণে যে নয়, এ কথা আমি মনে করি নে।"

"মাসি, তোমাকে সত্য বলছি, মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্ছে।"

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া যতীন দেখিতেছিল, তাহার মণিই আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে আজ অক্ষয় যৌবনে পূর্ণ— সে গৃহিণী, সে জননী; সে রূপসী, সে কল্যাণী। তাহারই এলোচুলের উপরে ঐ আকাশের তারাগুলি লক্ষ্মীর স্বহস্তের আশীর্বাদের মালা। তাহাদের দুজনের মাথার উপরে এই অন্ধকারের মঙ্গলবস্ত্রখানি মেলিয়া ধরিয়া আবার যেন নূতন করিয়া শুভদৃষ্টি হইল। রাত্রির এই বিপুল অন্ধকার ভরিয়া গেল মণির অনিমেষ প্রেমের দৃষ্টিপাতে। এই ঘরের বধূ মণি, এই একটুখানি মণি, আজ বিশ্বরূপ ধরিল; জীবনমরণের সংগমতীর্থে ঐ নক্ষত্রবেদীর উপরে সে বসিল; নিস্তব্ধ রাত্রি মঙ্গলঘটের মতো পুণ্যধারায় ভরিয়া উঠিল। যতীন জোড়হাত করিয়া মনে

মনে কহিল, 'এতদিনের পর ঘোমটা খুলিল, এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আবরণ ঘুচিল— অনেক কাঁদাইয়াছ— সুন্দর, হে সুন্দর, তুমি আর ফাঁকি দিতে পারিবে না।'

৪

"কষ্ট হচ্ছে, মাসি, কিন্তু যত কষ্ট মনে করছ তার কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আমার কষ্টের ক্রমশই যেন বিচ্ছেদ হয়ে আসছে। বোঝাই নৌকার মতো এতদিন সে আমার জীবন-জাহাজের সঙ্গে বাঁধা ছিল ; আজ যেন বাঁধন কাটা পড়েছে, সে আমার সব বোঝা নিয়ে দূরে ভেসে চলল। এখনো তাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাকে যেন আর আমার ব'লে মনে হচ্ছে না— এ'দুদিন মণিকে একবারও দেখি নি, মাসি।"

"পিঠের কাছে আর-একটা বালিশ দেব কি, যতীন।"

"আমার মনে হচ্ছে, মাসি, মণিও যেন চলে গেছে। আমার বাঁধন-ছেড়া দুঃখের নৌকাটির মতো।"

"বাবা, একটু বেদানার রস খাও, তোমার গলা শুকিয়ে আসছে।"

"আমার উইলটা কাল লেখা হয়ে গেছে— সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েছি— ঠিক মনে পড়ছে না।"

"আমার দেখবার দরকার নেই, যতীন।"

"মা যখন মারা যান আমার তো কিছুই ছিল না। তোমার খেয়ে তোমার হাতে আমি মানুষ। তাই বলছিলুম—"

"সে আবার কী কথা। আমার তো কেবল এই একখানা বাড়ি আর সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল। বাকি সবই তো তোমার নিজের রোজগার।"

"কিন্তু এই বাড়িটা—"

"কিসের বাড়ি আমার ! কত দালান তুমি বাড়িয়েছ, আমার সেটুকু কোথায় আছে খুঁজেই পাওয়া যায় না।"

"মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খুব—"

"সে কি জানি নে, যতীন। তুই এখন ঘুমো।"

"আমি মণিকে সব লিখে দিলুম বটে, কিন্তু তোমারই সব রইল, মাসি। ও তো তোমাকে কখনো অমান্য করবে না।"

"সেজন্যে অত ভাবছ কেন, বাছা।"

"তোমার আশীর্বাদেই আমার সব, তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনোদিন মনে কোরো না—"

"ও কী কথা যতীন। তোমার জিনিস তুমি মণিকে দিয়েছ ব'লে আমি মনে করব ? আমার এমনি পোড়া মন ? তোমার জিনিস ওর নামে লিখে দিয়ে যেতে পারছ বলে তোমার যে-সুখ সেই তো আমার সকল সুখের বেশি, বাপ।"

"কিন্তু, তোমাকেও আমি—"

"দেখ্, যতীন, এইবার আমি রাগ করব। তুই চলে যাবি, আর তুই আমাকে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে যাবি ?"

"মাসি, টাকার চেয়ে আরো বড়ো যদি কিছু তোমাকে—"

"দিয়েছিস, যতীন, ঢের দিয়েছিস। আমার শূন্য ঘর ভ'রে ছিলি, এ আমার অনেক জন্মের ভাগ্য। এতদিন তো বুক ভ'রে পেয়েছি, আজ আমার পাওনা যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তো নালিশ করব না। দাও, সব লিখে দাও, লিখে দাও— বাড়িঘর, জিনিসপত্র, ঘোড়াগাড়ি, তালুকমুলুক— যা আছে সব মণির নামে লিখে দাও— এ-সব বোঝা আমার সইবে না।"

"তোমার ভোগে রুচি নেই— কিন্তু মণির বয়স অল্প, তাই—"

"ও কথা বলিস নে, ও কথা বলিস নে। ধনসম্পদ দিতে চাস দে, কিন্তু ভোগ করা—"

"কেন ভোগ করবে না, মাসি।"

"না গো না, পারবে না, পারবে না! আমি বলছি, ওর মুখে রুচবে না! গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে, কিছুতে কোনো রস পাবে না।"

যতীন চুপ করিয়া রহিল। তাহার অভাবে সংসারটা মণির কাছে একেবারে বিস্বাদ হইয়া যাইবে, এ কথা সত্য কি মিথ্যা, সুখের কি দুঃখের, তাহা সে যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। আকাশের তারা যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া কানে কানে বলিল, 'এমনিই বটে— আমরা তো হাজার হাজার বছর হইতে দেখিয়া আসিলাম, সংসার-জোড়া এই-সমস্ত আয়োজন এত-বড়োই ফাঁকি।'

যতীন গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেবার মতো জিনিস তো আমরা কিছুই দিয়ে যেতে পারি নে।"

"কম কী দিয়ে যাচ্ছ, বাছা। এই ঘরবাড়ি টাকাকড়ির ছল ক'রে তুমি ওকে যে কী দিয়ে গেলে তার মূল্য ও কি কোনোদিন বুঝবে না। যা তুমি দিয়েছ তাই মাথা পেতে নেবার শক্তি বিধাতা ওকে দিন, এই আশীর্বাদ ওকে করি।"

"আর একটু বেদানার রস দাও, আমার গলা শুকিয়ে এসেছে। মণি কি কাল এসেছিল— আমার ঠিক মনে পড়ছে না।"

"এসেছিল। তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। শিয়রের কাছে ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ বাতাস ক'রে তার পরে ধোবাকে তোমার কাপড় দিতে গেল।"

"আশ্চর্য! বোধ হয় আমি ঠিক সেই সময়েই স্বপ্ন দেখছিলুম, যেন মণি আমার ঘরে আসতে চাচ্ছে— দরজা অল্প-একটু ফাঁক হয়েছে— ঠেলাঠেলি করছে কিন্তু কিছুতেই সেইটুকুর বেশি আর খুলছে না। কিন্তু, মাসি, তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছ— ওকে দেখতে দাও যে আমি মরছি— নইলে মৃত্যুকে হঠাৎ সইতে পারবে না।"

"বাবা, তোমার পায়ের উপরে এই পশমের শালটা টেনে দিই— পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

"না, মাসি, গায়ের উপর কিছু দিতে ভালো লাগছে না।"

"জানিস, যতীন? এই শালটা মণির তৈরি, এতদিন রাত জেগে জেগে সে তোমার জন্যে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেছে।"

যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মনে হইল পশমের কোমলতা যেন মণির মনের জিনিস ; সে যে যতীনকে মনে করিয়া রাত জাগিয়া এইটি বুনিয়াছে, তাহার মনের সেই প্রেমের ভাবনাটি ইহার সঙ্গে গাঁথা পড়িয়াছে। কেবল পশম দিয়া নহে, মণির কোমল আঙুলের স্পর্শ দিয়া ইহা বোনা। তাই মাসি যখন শালটা তাহার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন তখন তাহার মনে হইল, মণিই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া তাহার পদসেবা করিতেছে।

"কিন্তু, মাসি, আমি তো জানতুম, মণি সেলাই করতে পারে না— সে সেলাই করতে ভালোই বাসে না।"

"মন দিলে শিখতে কতক্ষণ লাগে। তাকে দেখিয়ে দিতে হয়েছে— ওর মধ্যে অনেক ভুল সেলাইও আছে।"

"তা, ভুল থাক্-না। ও তো প্যারিস এক্‌জিবিশনে পাঠানো হবে না— ভুল সেলাই দিয়ে আমার পা ঢাকা বেশ চলবে।"

সেলাইয়ে যে অনেক ভুল-ত্রুটি আছে সেই কথা মনে করিয়াই যতীনের আরো বেশি আনন্দ হইল। বেচারা মণি পারে না, জানে না, বার বার ভুল করিতেছে, তবু ধৈর্য্য ধরিয়া রাত্রির পর রাত্রি সেলাই করিয়া চলিয়াছে— এই কল্পনাটি তাহার কাছে বড়ো করুণ, বড়ো মধুর লাগিল। এই ভুলে-ভরা শালটাকে আবার সে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া লইল।

"মাসি, ডাক্তার বুঝি নীচের ঘরে ?"

"হাঁ, যতীন, আজ রাত্রে থাকবেন।"

"কিন্তু আমাকে যেন মিছামিছি ঘুমের ওষুধ দেওয়া না হয়। দেখেছ তো, ওতে আমার ঘুম হয় না, কেবল কষ্ট বাড়ে। আমাকে ভালো ক'রে জেগে থাকতে দাও। জান, মাসি ? বৈশাখ-দ্বাদশীর রাত্রে আমাদের বিয়ে হয়েছিল— কাল সেই দ্বাদশী আসছে— কাল সেইদিনকার রাত্রে সব তারা আকাশে জ্বালানো হবে। মণির বোধ হয় মনে নেই— আমি তাকে সেই কথাটি আজ মনে করিয়ে দিতে চাই ; কেবল তাকে তুমি দু মিনিটের জন্যে ডেকে দাও। চুপ ক'রে রইলে কেন। বোধ হয় ডাক্তার তোমাদের বলেছে, আমার শরীর দুর্বল, এখন যাতে আমার মনে কোনো— কিন্তু, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি, মাসি, আজ রাত্রে তার সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নিতে পারলে আমার মন খুব শান্ত হয়ে যাবে— তা হলে বোধ হয় আর ঘুমোবার ওষুধ দিতে হবে না। আমার মন তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে ব'লেই, এই দু রাত্রি আমার ঘুম হয় নি। মাসি, তুমি অমন করে কেঁদো না। আমি বেশ আছি, আমার মন আজ যেমন ভ'রে উঠেছে, আমার জীবনে এমন আর কখনোই হয় নি। সেইজন্যই আমি মণিকে ডাকছি। মনে হচ্ছে, আজ যেন আমার ভরা হৃদয়টি তার হাতে দিয়ে যেতে পারব। তাকে অনেক দিন অনেক কথা বলতে চেয়েছিলুম, বলতে পারি নি, কিন্তু আর এক মুহূর্ত দেরি করা নয়, তাকে এখনি ডেকে দাও— এর পরে আর সময় পাব না। না, মাসি, তোমার ঐ কান্না আমি সইতে পারি নে। এতদিন তো শান্ত ছিলে, আজ কেন তোমার এমন হল।"

"ওরে যতীন, ভেবেছিলুম, আমার সব কান্না ফুরিয়ে গেছে— কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, এখনো বাকি আছে, আজ আর পারছি নে।"

"মণিকে ডেকে দাও— তাকে ব'লে দেব কালকের রাতের জন্যে যেন—"

"যাচ্ছি, বাবা। শম্ভু দরজার কাছে রইল, যদি কিছু দরকার হয় ওকে ডেকো।"

মাসি মণির শোবার ঘরে গিয়া মেজের উপর বসিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "ওরে, আয়— একবার আয়— আয় রে রাক্ষসী, যে তোকে তার সব দিয়েছে তার শেষ কথাটি রাখ্‌— সে মরতে বসেছে, তাকে আর মারিস নে।"

যতীন পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "মণি !"

"না, আমি শম্ভু। আমাকে ডাকছিলেন ?"

"একবার তোর বউঠাকরুনকে ডেকে দে।"

"কাকে ?"

"বউঠাকরুনকে।

"তিনি তো এখনো ফেরেন নি।"

"কোথায় গেছেন ?"

"সীতারামপুরে।"

"আজ গেছেন ?"

"না, আজ তিন দিন হল গেছেন।"

ক্ষণকালের জন্য যতীনের সর্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্‌ করিয়া আসিল— সে চোখে অন্ধকার দেখিল। এতক্ষণ বালিশে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। পায়ের উপর সেই পশমের শাল ঢাকা ছিল, সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে মাসি যখন আসিলেন যতীন মণির কথা কিছুই বলিল না। মাসি ভাবিলেন, সে কথা উহার মনে নাই।

হঠাৎ যতীন এক সময়ে বলিয়া উঠিল, "মাসি, তোমাকে কি আমার সেদিনকার স্বপ্নের কথা বলেছি।"

"কোন্ স্বপ্ন।"

"মণি যেন আমার ঘরে আসবার জন্য দরজা ঠেলছিল— কোনোমতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হল না, সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই ঢুকতে পারল না। মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তাকে অনেক ক'রে ডাকলুম, কিন্তু এখানে তার জায়গা হল না।"

মাসি কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, 'যতীনের জন্য মিথ্যা দিয়া যে একটুখানি স্বর্গ রচিতেছিলাম সে আর টিকিল না। দুঃখ যখন আসে তাহাকে স্বীকার করাই ভালো— প্রবঞ্চনার দ্বারা বিধাতার মার ঠেকাইবার চেষ্টা করা কিছু নয়।'

"মাসি, তোমার কাছে যে স্নেহ পেয়েছি সে আমার জন্মজন্মান্তরের পাথেয়, আমার সমস্ত জীবন ভ'রে নিয়ে চললুম। আর-জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার মেয়ে হয়ে জন্মাবে, আমি তোমাকে বুকে ক'রে মানুষ করব।"

"বলিস্ কী যতীন, আবার মেয়ে হয়ে জন্মাব ? নাহয়, তোরই কোলে ছেলে হয়েই জন্ম হবে— সেই কামনাই কর্-না।"

"না, না, ছেলে না। ছেলেবেলায় তুমি যেমন সুন্দরী ছিলে তেমনি অপরূপ সুন্দরী হয়েই তুমি আমার ঘরে আসবে। আমার মনে আছে, আমি তোমাকে কেমন ক'রে সাজাব।"

"আর বকিস্ নে, যতীন, বকিস্ নে— একটু ঘুমো।"

"তোমার নাম দেব লক্ষ্মীরানী।"

"ও তো একেলে নাম হল না।"

"না, একেলে নাম না। মাসি, তুমি আমার সাবেক-কেলে— সেই সাবেক কাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এসো।"

"তোর ঘরে আমি কন্যাদায়ের দুঃখ নিয়ে আসব, এ কামনা আমি তো করতে পারি নে।"

"মাসি, তুমি আমাকে দুর্বল মনে কর ?— আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাও ?"

"বাছা, আমার যে মেয়েমানুষের মন, আমিই দুর্বল— সেইজন্যেই আমি বড়ো ভয়ে ভয়ে তোকে সকল দুঃখ থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু, আমার সাধ্য কী আছে। কিছুই করতে পারি নি।"

"মাসি, এ জীবনের শিক্ষা আমি এ জীবনে খাটাবার সময় পেলুম না। কিন্তু, এ সমস্তই জমা রইল, আসছে বারে মানুষ যে কী পারে তা আমি দেখাব। চিরটা দিন নিজের দিকে তাকিয়ে থাকা যে কী ফাঁকি, তা আমি বুঝেছি।"

"যাই বল বাছা, তুমি নিজে কিছু নাও নি, পরকেই সব দিয়েছ।"

"মাসি, একটা গর্ব আমি করব, আমি সুখের উপরে জবরদস্তি করি নি— কোনোদিন এ কথা বলি নি, যেখানে আমার দাবি আছে সেখানে আমি জোর খাটাব। যা পাই নি তা কাড়াকাড়ি করি নি। আমি সেই জিনিস চেয়েছিলুম যার উপরে কারও স্বত্ব নেই— সমস্তজীবন হাতজোড় ক'রে অপেক্ষাই করলুম ; মিথ্যাকে চাই নি ব'লেই এতদিন এমন ক'রে বসে থাকতে হল— এইবার সত্য হয়তো দয়া করবেন। ও কে ও— মাসি, ও কে।"

"কই, কেউ তো না, যতীন।"

"মাসি, তুমি একবার ও ঘরটা দেখে এসো গে, আমি যেন—"

"না, বাছা, কাউকে তো দেখলুম না।"

"অমি কিন্তু স্পষ্ট যেন—"

"কিচ্ছু না যতীন— ঐ যে ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

"দেখুন, আপনি ওঁর কাছে থাকলে উনি বড়ো বেশি কথা কন। কয়রাত্রি এমনি ক'রে তো জেগেই

কাটালেন। আপনি শুতে যান, আমার সেই লোকটি এখানে থাকবে।"

"না, মাসি না, তুমি যেতে পাবে না।"

"আচ্ছা, বাছা, আমি নাহয় ঐ কোণটাতে গিয়ে বসছি।"

"না, না, তুমি আমার পাশেই বসে থাকো— আমি তোমার এ হাত কিছুতেই ছাড়ছি নে— শেষ পর্যন্ত না। আমি যে তোমারই হাতের মানুষ, তোমারই হাত থেকে ভগবান আমাকে নেবেন।"

"আচ্ছা বেশ, কিন্তু আপনি কথা কবেন না, যতীনবাবু। সেই ওষুধটা খাওয়াবার সময় হল—"

"সময় হল ? মিথ্যা কথা। সময় পার হয়ে গেছে— এখন ওষুধ খাওয়ানো কেবল ফাঁকি দিয়ে সান্ত্বনা করা। আমার তার কোনো দরকার নেই। আমি মরতে ভয় করি নে। মাসি, যমের চিকিৎসা চলছে, তার উপরে আবার সব ডাক্তার জড়ো করেছ কেন— বিদায় ক'রে দাও, সব বিদায় ক'রে দাও। এখন আমার একমাত্র তুমি— আর আমার কাউকে দরকার নেই— কাউকে না— কোনো মিথ্যাকেই না।"

"আপনার এই উত্তেজনা ভালো হচ্ছে না।"

"তা হলে তোমরা যাও, আমাকে উত্তেজিত কোরো না।— মাসি, ডাক্তার গেছে ? আচ্ছা, তা হলে তুমি এই বিছানায় উঠে বোসো— আমি তোমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শুই।"

"আচ্ছা, শোও, বাবা, লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমোও।"

"না, মাসি, ঘুমোতে বোলো না— ঘুমোতে ঘুমোতে হয়তো আর ঘুম ভাঙবে না। এখনো আর-একটু আমার জেগে থাকবার দরকার আছে। তুমি শব্দ শুনতে পাচ্ছ না ? ঐ যে আসছে। এখনই আসবে।"

৫

"বাবা যতীন, একটু চেয়ে দেখো—ঐ যে এসেছে। একবারটি চাও।"

"কে এসেছে। স্বপ্ন ?"

"স্বপ্ন নয়, বাবা, মণি এসেছে— তোমার শ্বশুর এসেছেন।"

"তুমি কে ?"

"চিনতে পারছ না, বাবা, ঐ তো তোমার মণি।"

"মণি, সেই দরজাটা কি সব খুলে গিয়েছে।"

"সব খুলেছে, বাপ আমার, সব খুলেছে।"

"না মাসি, আমার পায়ের উপর ও শাল নয়, ও শাল নয়, ও শাল মিথ্যে, ও শাল ফাঁকি।"

"শাল নয়, যতীন। বউ তোর পায়ের উপর পড়েছে— ওর মাথায় হাত রেখে একটু আশীর্বাদ কর্।— অমন ক'রে কাঁদিস্ নে, বউ, কাঁদবার সময় আসছে— এখন একটুখানি চুপ কর্।"

আশ্বিন ১৩২১

অপরিচিতা

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলা পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম ; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন এমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এককালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন, সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে ; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকেও ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ— বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিবাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়ো। কিন্তু ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডূষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে— বস্তুত না-মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহাকে শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হুকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, "ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।"

কিছুদিন পূর্বেই এম. এ. পাস করিয়াছি। সামনে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে ; পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই, চাকরি নাই ; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই— থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল— আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, "মেয়ে যদি বল, তবে—।" আমার শরীর মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত।

আমি হরিশকে বলিলাম, "একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।"

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এককালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ

নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একবারে উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এ-সব ভালো কথা। কিন্তু মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই ? না, দোষ নাই— বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন্নগর পর্যন্ত গিয়াছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা, আমার পিস্‌তুতো ভাই। তাহার মত, রুচি এবং দক্ষতার 'পরে আমি ষোলো-আনা নির্ভর করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয় হে ! খাঁটি সোনা বটে।"

বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি 'চমৎকার', সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই'। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।

আশা করি, আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়োই চুপচাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন, যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল— ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শম্ভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না— কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম। কিন্তু, মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক্, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুশি হইলেন। শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তার পরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এ-সমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না ; জানিতাম না, দেনা-পাওনা কী স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার যাঁর উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত, আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে

জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা। এইজন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ— ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধুম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-সুমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যান্ড, বাঁশি, শখের কন্সর্ট প্রভৃতি যেখানে যত প্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত এক-সঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মত্তহস্তী দ্বারা সংগীত-সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া, আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরাতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া, ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠাণ্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়। মুখে তো কথাই নাই। কোমরে চাদর বাঁধা, গলাভাঙা, টাকপড়া, মিসকালো এবং বিপুল শরীর তাঁর একটি উকিল বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া, মাথা হেলাইয়া, নম্রতার স্মিতহাস্যে ও গদ্‌গদ বচনে কন্সর্ট পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই একটা এস্‌পার-ওস্‌পার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, "বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।"

ব্যাপারখানা এই।— সকলের না হউক, কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা-কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয়, তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন— বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া, সওগাদ, লোকবিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন, দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্যাক্‌রাকে সুদ্ধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোশে এবং স্যাক্‌রা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজেয় বসিয়া আছে।

শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার মামা বলিতেছেন, বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল।"

আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, "ও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।"

শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সেই কথা তবে ঠিক ? উনি যা বলিবেন তাই হইবে ? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই ?"

আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম, এ-সব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।

"আচ্ছা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, "অনুপম এখানে কী করিবে। ও সভায় গিয়া বসুক।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।"

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোশের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা— হাল ফ্যাশানের সূক্ষ্ম কাজ নয়— যেমন মোটা, তেমনি ভারী।

স্যাক্‌রা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই— এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।"

এই বলিয়া সে মকরমুখা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল, তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তখনি তাঁর নোটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে-পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায় দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি।

গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে স্যাক্‌রার হাতে দিয়া বলিলেন, "এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।"

স্যাক্‌রা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।"

শম্ভুবাবু এয়ারিংজোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।"

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না, এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "অনুপম, যাও তুমি সভায় গিয়া বোসো গে।"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।"

মামা বলিলেন, "সে কী কথা। লগ্ন—"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "সেজন্য কিছু ভাবিবেন না— এখন উঠুন।"

লোকটি নেহাত ভালোমানুষ ধরনের কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরযাত্রদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু, রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরযাত্রদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, "সে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।"

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কী বল। বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে?"

মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শম্ভুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, "আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—"

মামা বলিলেন, "তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?"

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "ঠাট্টা করিতেছেন নাকি?"

শম্ভুনাথ কহিলেন, "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"

মামা দুই চোখ এতবড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব, এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।"

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তার পরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লণ্ঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড

করিয়া, বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যান্ড রসনচৌকি ও কন্সর্ট একসঙ্গে বাজিল না এবং অভ্রের ঝাড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহানির্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

৩

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল! সকলে বলিল, 'দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।' কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না, এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কী।

সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এতবড়ো সৎপাত্রের কপালে এতবড়ো কলঙ্কের দাগ কোন্ নষ্টগ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া, আঁকিয়া দিল? বরযাত্ররা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, 'বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল— পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।'

'বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব' বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর-একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল— এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি— কেবল আর একটিমাত্র পা-ফেলার অপেক্ষা— এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল!

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম। বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম, মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য, কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তার ছবি; সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল; বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না— এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফোটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বৈকি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো-একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক-একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না। যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না। হঠাৎ বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না।

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা তো লজ্জায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এদিকে আমি শুনিলাম, সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল কিন্তু সে পণ করিয়াছে, বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না ; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, 'আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।' হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, তোর কী হইয়াছে বল আমাকে।' মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, 'কই, কিছুই তো হয় নি, বাবা।' বাপের এক মেয়ে যে— বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনের ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে ? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, 'বেশ তো, আর-একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।' কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, 'যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও— আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসি গে।' তার পরে ? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল— এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর-সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মানুষ। তার পরে ? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো।

৪

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন্ স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বপ্ন ; কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত— আর সবই অজানা অস্পষ্ট ; স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা, এবং যাহা চারি দিকে তাহা যে কতই বহুদূরে, তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন ; আলোর নীচে সবুজ পর্দা টানা ; তোরঙ্গ বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলটপালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিট্‌মিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন-একরকম হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, "শিগগির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।"

মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচমকা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি মানুষের গলা ; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, 'এমন তো আর শুনি নাই।'

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয় কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয়, কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম ; কিছুই দেখিলাম না। প্ল্যাট্‌ফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল ; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম।

আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি— চঞ্চল কালের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল ; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধুয়া— 'গাড়িতে জায়গা আছে।' আছে কি, জায়গা আছে কি। জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে, আছে— শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনেই একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল, যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রেই নামিয়া যায়।

পরদিন সকালে একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্টক্লাসের টিকিট— মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্ল্যাট্‌ফর্মে সাহেবদের আর্দালি-দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন্‌-এক ফৌজের বড়ো জেনারেল-সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম, ফার্স্টক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন্‌ গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় সেকেন্ড ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন-না— এখানে জায়গা আছে।"

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধুর কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধুয়া— 'জায়গা আছে।' ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চল্‌তি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল— গ্রাহ্যই করিলাম না।

তার পরে— কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে, তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব ? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম। তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম ; দেখিলাম, তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি, সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারি দিকের সকলের চেয়ে অধিক— রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সেদিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত

কিছুমাত্র ছিল না— ছোটোদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোটো হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই— তাহারই কোন্ একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন, গল্প নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝরনা ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্যকিরণকে সজীব করিয়া তুলিল: আমার মনে হইল, আমাকে যে-প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্টন করিয়াছে সে ঐ তরুণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার। —পরের স্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল, এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া— আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষমানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাদের বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময় গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই। বার বার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়ে গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল পূর্বে একজন দেশী রেলোয়ে কর্মচারী, নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লট্‌কাইয়া দিয়া আমাকে বলিল, "এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।"

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, "না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।"

সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, "না ছাড়িয়া উপায় নাই।"

কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, "আমি দুঃখিত, কিন্তু—"

শুনিয়া আমি 'কুলি কুলি' করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, "না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।"

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন-মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, "এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।"

বলিয়া নাম-লেখা টিকিট খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পরে মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল, গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানা-মুঠ

খাইতে শুরু করিল, আর আমি লজ্জায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত— স্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী, মা।"

মেয়েটি বলিল, "আমার নাম কল্যাণী।"

শুনিয়া মা এবং আমি দুইজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

"তোমার বাবা—"

"তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁর নাম শম্ভুনাথ সেন।"

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

উপসংহার

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি ; শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, "আমি বিবাহ করিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন।"

সে বলিল, "মাতৃ-আজ্ঞা।"

কী সর্বনাশ ! এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি।

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু, আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে— সে যেন কোন্ ওপারের বাঁশি— আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল— সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল 'জায়গা আছে', সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি ? না, কোনোকালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই একরাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা— জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায় ? তাই বৎসরের পর বৎসর যায়— আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই— আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না ; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

কার্তিক ১৩২১

তপস্বিনী

বৈশাখ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রথমরাত্রে গুমট গেছে, বাঁশগাছের পাতাটা পর্যন্ত নড়ে না, আকাশের তারাগুলো যেন মাথা-ধরার বেদনার মতো দব্‌দব্‌ করিতেছে। রাত্রি তিনটের সময় ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া একটুখানি বাতাস উঠিল। ষোড়শী শূন্য মেঝের উপর খোলা জানালার নীচে শুইয়া আছে, একটা কাপড়ে-মোড়া টিনের বাক্স তার মাথার বালিশ। বেশ বোঝা যায়, খুব উৎসাহের সঙ্গে সে কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে।

প্রতিদিন ভোর চারটের সময় উঠিয়া স্নান সারিয়া ষোড়শী ঠাকুরঘরে গিয়া বসে। আহ্নিক করিতে বেলা হইয়া যায়। তার পরে বিদ্যারত্নমশায় আসেন; সেই ঘরে বসিয়াই তাঁর কাছে সে গীতা পড়ে। সংস্কৃত সে কিছু কিছু শিখিয়াছে। শঙ্করের বেদান্তভাষ্য এবং পাতঞ্জলদর্শন মূল গ্রন্থ হইতে পড়িবে, এই তার পণ। বয়স তার তেইশ হইবে।

ঘরকান্নার কাজ হইতে ষোড়শী অনেকটা তফাত থাকে— সেটা যে কেন সম্ভব হইল তার কারণটা লইয়াই এই গল্প। নামের সঙ্গে মাখনবাবুর স্বভাবের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। তাঁর মন গলানো বড়ো শক্ত ছিল। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন, যতদিন তাঁর ছেলে বরদা অন্তত বি. এ. পাস না করে ততদিন তাঁর বউমার কাছ হইতে সে দূরে থাকিবে। অথচ পড়াশুনাটা বরদার ঠিক ধাতে মেলে না, সে মানুষটি শৌখিন। জীবননিকুঞ্জের মধুসঞ্চয়ের সম্বন্ধে মৌমাছির সঙ্গে তার মেজাজটা মেলে, কিন্তু মৌচাকের পালায় যে পরিশ্রমের দরকার সেটা তার একেবারেই সয় না। বড়ো আশা করিয়াছিল, বিবাহের পর হইতে গোঁফে তা দিয়া সে বেশ একটু আরামে থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটগুলো সদরেই ফুঁকিবার সময় আসিবে। কিন্তু কপালক্রমে বিবাহের পরে তার মঙ্গলসাধনের ইচ্ছা তার বাপের মনে আরো বেশি প্রবল হইয়া উঠিল।

ইস্কুলের পণ্ডিতমশায় বরদার নাম দিয়াছিলেন, গোতমমুনি। বলা বাহুল্য, সেটা বরদার ব্রহ্মতেজ দেখিয়া নয়। কোনো প্রশ্নের সে জবাব দিত না বলিয়াই তাকে তিনি মুনি বলিতেন এবং যখন জবাব দিত তখন তার মধ্যে এমন কিছু গব্য পদার্থ পাওয়া যাইত যাতে পণ্ডিতমশায়ের মতে তার গোতম উপাধি সার্থক হইয়াছিল।

মাখন হেডমাস্টারের কাছে সন্ধান লইয়া জানিলেন, ইস্কুল এবং ঘরের শিক্ষক, এইরূপ বড়ো বড়ো দুই এঞ্জিন আগে পিছে জুড়িয়া দিলে তবে বরদার সদ্গতি হইতে পারে। অধম ছেলেদের যাঁরা পরীক্ষাসাগর তরাইয়া দিয়া থাকেন এমন-সব নামজাদা মাস্টার রাত্রি দশটা সাড়ে-দশটা পর্যন্ত বরদার সঙ্গে লাগিয়া রহিলেন। সত্যযুগে সিদ্ধি লাভের জন্য বড়ো বড়ো তপস্বী যে-তপস্যা করিয়াছে সে ছিল একলার তপস্যা, কিন্তু মাস্টারের সঙ্গে মিলিয়া বরদার এই-যে যৌথতপস্যা এ তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃসহ। সে কালের তপস্যার প্রধান উত্তাপ ছিল অগ্নিকে লইয়া; এখনকার এই পরীক্ষা-তাপসের তাপের প্রধান কারণ অগ্নিশর্মারা; তারা বরদাকে বড়ো জ্বালাইল। তাই এত দুঃখের পর যখন সে পরীক্ষায় ফেল করিল তখন তার সান্ত্বনা হইল এই যে, সে যশস্বী মাস্টারমশায়দের মাথা হেঁট করিয়াছে। কিন্তু এমন অসামান্য নিষ্ফলতাতেও মাখনবাবু হাল ছাড়িলেন না। দ্বিতীয় বছরে আর এক দল মাস্টার নিযুক্ত হইল, তাঁদের সঙ্গে রফা হইল এই যে, বেতন তো তাঁরা পাইবেনই, তার পরে বরদা যদি ফার্স্ট ডিবিজনে পাস করিতে পারে তবে তাঁদের বকশিশ মিলিবে। এবারেও বরদা যথাসময়ে ফেল করিত, কিন্তু এই আসন্ন দুর্ঘটনাকে একটু বৈচিত্র্য দ্বারা সরস করিবার অভিপ্রায়ে একজামিনের ঠিক আগের রাত্রে পাড়ার কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে একটা কড়া রকমের জোলাপের বড়ি খাইল এবং ধন্বন্তরীর কৃপায় ফেল করিবার জন্য তাকে আর সেনেট-হল পর্যন্ত ছুটিতে হইল না, বাড়ি বসিয়াই সে কাজটা বেশ সুসম্পন্ন হইতে পারিল। রোগটা উচ্চ অঙ্গের সাময়িক পত্রের মতো এমনি ঠিক দিনে ঠিক সময়ে প্রকাশ হইল যে, মাখন নিশ্চয় বুঝিল, এ কাজটা বিনা সম্পাদকতায় ঘটিতেই পারে না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া তিনি বরদাকে বলিলেন যে, তৃতীয়বার পরীক্ষার

জন্য তাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থাৎ, তার সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ আরো একটা বছর বাড়িয়া গেল।

অভিমানের মাথায় বরদা একদিন খুব ঘটা করিয়া ভাত খাইল না। তাহাতে ফল হইল এই, সন্ধ্যাবেলাকার খাবারটা তাকে আরো বেশি করিয়া খাইতে হইল। মাখনকে সে বাঘের মতো ভয় করিত, তবু মরিয়া হইয়া তাঁকে গিয়া বলিল, "এখানে থাকলে আমার পড়াশুনো হবে না।"

মাখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেলে সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হতে পারবে?"

সে বলিল, "বিলাতে।"

মাখন তাকে সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, এ সম্বন্ধে তার যে গোলটুকু আছে সে ভূগোলে নয়, সে মগজে। স্বপক্ষের প্রমাণস্বরূপে বরদা বলিল, তারই একজন সতীর্থ এন্‌ট্রেন্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শেষ বেঞ্চিটা হইতে একেবারে এক লাফে বিলাতের একটা বড়ো একজামিন মারিয়া আনিয়াছে। মাখন বলিলেন, বরদাকে বিলাতে পাঠাইতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তার আগে তার বি. এ. পাস করা চাই।

এও তো বড়ো মুশকিল! বি. এ.পাস না করিয়াও বরদা জন্মিয়াছে, বি. এ.পাস না করিলেও সে মরিবে, অথচ জন্মমৃত্যুর মাঝখানটাতে কোথাকার এই বি. এ. পাস বিন্ধ্যপর্বতের মতো খাড়া হইয়া দাঁড়াইল; নড়িতে-চড়িতে সকল কথায় ঐখানটাতে গিয়াই ঠোকর খাইতে হইবে? কলিকালে অগস্ত্য মুনি করিতেছেন কী। তিনিও কি জটা মুড়াইয়া বি. এ. পাসে লাগিয়াছেন।

খুব একটা বড়ো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বরদা বলিল, 'বার বার তিনবার; এইবার কিন্তু শেষ।' আর-একবার পেন্সিলের দাগ-দেওয়া কী-বইগুলা তাকের উপর হইতে পাড়িয়া লইয়া বরদা কোমর বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, এমন সময় একটা আঘাত পাইল, সেটা আর তার সহিল না। স্কুলে যাইবার সময় গাড়ির খোঁজ করিতে গিয়া সে খবর পাইল যে, স্কুলে যাইবার গাড়ি-ঘোড়াটা মাখন বেচিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, 'দুই বছর লোকসান গেল, কত আর এই খরচ টানি!' স্কুলে হাঁটিয়া যাওয়া বরদার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়, কিন্তু লোকের কাছে এই অপমানের সে কী কৈফিয়ত দিবে।

অবশেষে অনেক চিন্তার পর একদিন ভোরবেলায় তার মাথায় আসিল, এ সংসারে মৃত্যু ছাড়া আর-একটা পথ খোলা আছে যেটা বি.এ.পাসের অধীন নয়, এবং যেটাতে দারা সুত ধন জন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে আর কিছু নয়, সন্ন্যাসী হওয়া। এই চিন্তাটার উপর কিছুদিন ধরিয়া গোপনে সে বিস্তর সিগারেটের ধোঁয়া লাগাইল, তার পর একদিন দেখা গেল, স্কুলঘরের মেঝের উপর তার কী-বইয়ের ছেঁড়া টুকরোগুলো পরীক্ষাদুর্গের ভগ্নাবশেষের মতো ছড়ানো পড়িয়া আছে— পরীক্ষার্থীর দেখা নাই। টেবিলের উপর এক টুকরা কাগজ ভাঙা কাঁচের গেলাস দিয়া চাপা, তাহাতে লেখা—

"আমি সন্ন্যাসী— আমার আর গাড়ির দরকার হইবে না।

শ্রীযুক্ত বরদানন্দস্বামী।"

মাখনবাবু কিছুদিন কোনো খোঁজই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, বরদাকে নিজের গরজেই ফিরিতে হইবে, খাঁচার দরজা খোলা রাখা ছাড়া আর-কোনো আয়োজনের দরকার নাই। দরজা খোলাই রহিল, কেবল সেই কী-বইগুলার ছেঁড়া টুকরা সাফ হইয়া গেছে— আর-সমস্তই ঠিক আছে। ঘরের কোণে সেই জলের কুঁজার উপরে কানা-ভাঙা গেলাসটা উপুড় করা, তেলের-দাগে-মলিন চৌকিটার আসনের জায়গায় ছারপোকার উৎপাত ও জীর্ণতার ত্রুটি মোচনের জন্য একটা পুরাতন অ্যাট্‌লাসের মলাট পাতা; এক ধারে একটা শূন্য প্যাক্‌বাক্সের উপর একটা টিনের তোরঙ্গে বরদার নাম আঁকা; দেয়ালের গায়ে তাকের উপর একটা মলাট-ছেঁড়া ইংরেজি-বাংলা ডিক্সনারি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগুলা পাতা, এবং মলাটে রানী ভিক্টোরিয়ার মুখ-আঁকা অনেকগুলো এক্সেসাইজ বই। এই খাতা ঝাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতে অগ্‌ডেন কোম্পানির সিগারেট-বাক্স-বাহিনী বিলাতি নটীদের মূর্তি ঝরিয়া পড়িবে। সন্ন্যাস-আশ্রয়ের সময় পথের সান্ত্বনার জন্য এগুলো যে বরদা সঙ্গে লয় নাই, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, তার মন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

আমাদের নায়কের তো এই দশা ; নায়িকা ষোড়শী তখন সবেমাত্র ত্রয়োদশী। বাড়িতে শেষ পর্যন্ত সবাই তাকে খুকি বলিয়া ডাকিত, শ্বশুরবাড়িতেও সে আপনার এই চিরশৈশবের খ্যাতি লইয়া আসিয়াছিল, এইজন্য তার সামনেই বরদার চরিত্র-সমালোচনায় বাড়ির দাসীগুলোর পর্যন্ত বাধিত না। শাশুড়ি ছিলেন চিররুগ্‌ণা— কর্তার কোনো বিধানের উপরে কোনো কথা বলিবার শক্তি তাঁর ছিল না, এমন-কি, মনে করিতেও তাঁর ভয় করিত। পিস্‌শাশুড়ির ভাষা ছিল খুব প্রখর ; বরদাকে লইয়া তিনি খুব শক্ত শক্ত কথা খুব চোখা চোখা করিয়া বলিতেন। তার বিশেষ একটু কারণ ছিল। পিতামহদের আমল হইতে কৌলীন্যের অপদেবতার কাছে বংশের মেয়েদের বলি দেওয়া, এ বাড়ির একটা প্রথা। এই পিসি যার ভাগে পড়িয়াছিলেন সে একটা প্রচণ্ড গাঁজাখোর। তার গুণের মধ্যে এই যে, সে বেশিদিন বাঁচে নাই। তাই আদর করিয়া ষোড়শীকে তিনি যখন মুক্তাহারের সঙ্গে তুলনা করিতেন তখন অন্তর্যামী বুঝিতেন, ব্যর্থ মুক্তাহারের জন্য যে-আক্ষেপ সে একা ষোড়শীকে লইয়া নয়। এ ক্ষেত্রে মুক্তাহারের যে বেদনাবোধ আছে, সে কথা সকলে ভুলিয়াছিল। পিসি বলিতেন, 'দাদা কেন যে এত মাস্টার-পণ্ডিতের পিছনে খরচ করেন তা তো বুঝি নে। লিখে পড়ে দিতে পারি, বরদা কখনোই পাস করতে পারবে না।' পারিবে না এ বিশ্বাস ষোড়শীরও ছিল, কিন্তু সে একমনে কামনা করিত, যেন কোনো গতিকে পাস করিয়া বরদা অন্তত পিসির মুখের ঝাঁজটা মারিয়া দেয়। বরদা প্রথমবার ফেল করিবার পর মাখন যখন দ্বিতীয়বার মাস্টারের ব্যূহ বাঁধিবার চেষ্টায় লাগিলেন, পিসি বলিলেন, 'ধন্য বলি দাদাকে ! মানুষ ঠেকেও তো শেখে।' তখন ষোড়শী দিনরাত কেবল এই অসম্ভব-ভাবনা ভাবিতে লাগিল, বরদা এবার যেন হঠাৎ নিজের আশ্চর্য গোপন শক্তি প্রকাশ করিয়া অবিশ্বাসী জগৎটাকে স্তম্ভিত করিয়া দেয় ; সে যেন প্রথম শ্রেণীতে সব-প্রথমের চেয়েও আরো আরো আরো অনেক বড়ো হইয়া পাস করে— এত বড়ো যে স্বয়ং লাটসাহেব সওয়ার পাঠাইয়া দেখা করিবার জন্য তাহাকে তলব করেন। এমন সময়ে কবিরাজের অব্যর্থ বড়িটা ঠিক পরীক্ষাদিনের মাথার উপর যুদ্ধের বোমার মতো আসিয়া পড়িল। সেটাও মন্দের ভালো হইত যদি লোকে সন্দেহ না করিত। পিসি বলিলেন, 'ছেলের এদিকে বুদ্ধি নেই, ওদিকে আছে।' লাটসাহেবের তলব পড়িল না। ষোড়শী মাথা হেঁট করিয়া লোকের হাসাহাসি সহ্য করিল। সময়োচিত জোলাপের প্রহসনটায় তার মনেও যে সন্দেহ হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না।

এমন সময় বরদা ফেরার হইল। ষোড়শী বড়ো আশা করিয়াছিল, অন্তত এই ঘটনাকেও বাড়ির লোকে দুর্ঘটনা জ্ঞান করিয়া অনুতাপ পরিতাপ করিবে। কিন্তু তাহাদের সংসার বরদার চলিয়া যাওটাকেও পুরা দাম দিল না। সবাই বলিল, 'এই দেখো-না, এলো ব'লে !' ষোড়শী মনে মনে বলিতে লাগিল, 'কখ্‌খনো না ! ঠাকুর, লোকের কথা মিথ্যা হোক্‌। বাড়ির লোককে যেন হায়-হায় করতে হয় !'

এইবার বিধাতা ষোড়শীকে বর দিলেন ; তার কামনা সফল হইল। এক মাস গেল, বরদার দেখা নাই ; কিন্তু তবু কারও মুখে কোনো উদ্‌বেগের চিহ্ন দেখা যায় না। দুই মাস গেল, তখন মাখনের মনটা একটু চঞ্চল হইয়াছে, কিন্তু বাহিরে সেটা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বউমার সঙ্গে চোখাচোখি হইলে তাঁর মুখে যদি-বা বিষাদের মেঘ-সঞ্চার দেখা যায়, পিসির মুখ একেবারে জ্যৈষ্ঠমাসের অনাবৃষ্টির আকাশ বলিলেই হয়। কাজেই সদর দরজার কাছে একটা মানুষ দেখিলেই ষোড়শী চমকিয়া ওঠে ; আশঙ্কা, পাছে তার স্বামী ফিরিয়া আসে ! এমনি করিয়া যখন তৃতীয় মাস কাটিল, তখন ছেলেটা বাড়ির সকলকে মিথ্যা উদ্‌বিগ্ন করিতেছে বলিয়া পিসি নালিশ শুরু করিলেন। এও ভালো, অবজ্ঞার চেয়ে রাগ ভালো। পরিবারের মধ্যে ক্রমে ভয় ও দুঃখ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। খোঁজ করিতে করিতে ক্রমে এক বছর যখন কাটিল তখন, মাখন যে বরদার প্রতি অনাবশ্যক কঠোরাচরণ করিয়াছেন, সে কথা পিসিও বলিতে শুরু করিলেন। দুই বছর যখন গেল তখন পাড়া-প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিল, বরদার পড়াশুনায় মন ছিল না বটে, কিন্তু মানুষটি বড়ো ভালো ছিল। বরদার অদর্শনকাল যতই দীর্ঘ হইল ততই, তার স্বভাব যে অত্যন্ত নির্মল ছিল, এমন-কি, সে যে তামাকটা পর্যন্ত খাইত না, এই অন্ধ

বিশ্বাস পাড়ার লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্কুলের পণ্ডিতমশায় স্বয়ং বলিলেন, এইজন্যই তো তিনি বরদাকে গোতম মুনি নাম দিয়াছিলেন, তখন হইতেই উহার বুদ্ধি বৈরাগ্যে একেবারে নিরেট হইয়াছিল। পিসি প্রত্যহই অন্তত একবার করিয়া তাঁর দাদার জেদী মেজাজের 'পরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বরদার এত লেখাপড়ার দরকারই বা কী ছিল। টাকার তো অভাব নাই। যাই বল, বাপু, তার শরীরে কিন্তু দোষ ছিল না। আহা, সোনার টুকরো ছেলে!' তার স্বামী যে পবিত্রতার আদর্শ ছিল এবং সংসারসুদ্ধ সকলেই তার প্রতি অন্যায় করিয়াছে, সকল দুঃখের মধ্যে এই সান্ত্বনায়, এই গৌরবে ষোড়শীর মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এদিকে বাপের ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দ্বিগুণ করিয়া ষোড়শীর উপর আসিয়া পড়িল। বউমা যাতে সুখে থাকে, মাখনের এই একমাত্র ভাবনা। তাঁর বড়ো ইচ্ছা, ষোড়শী তাঁকে এমন কিছু ফরমাশ করে যেটা দুর্লভ— অনেকটা কষ্ট করিয়া, লোকসান করিয়া তিনি তাকে একটু খুশি করিতে পারিলে যেন বাঁচেন—তিনি এমন করিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে চান যেটা তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের মতো হইতে পারে।

২

ষোড়শী পনেরো বছরে পড়িল। ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যখন-তখন তার চোখ জলে ভরিয়া আসে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারি দিকে যেন আঁটিয়া ধরে, তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিঙটা, আলিসার উপর যে-কয়টা ফুলের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে, তারা সকলেই যেন অন্তরে অন্তরে তাকে বিরক্ত করিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাটটা, আলনাটা, আলমারিটা— তার জীবনের শূন্যতাকে বিস্তারিত করিয়া ব্যাখ্যা করে; সমস্ত জিনিসপত্রের উপর তার রাগ হইতে থাকে।

সংসারে তার একমাত্র আরামের জায়গা ছিল ঐ জানালার কাছটা। যে-বিশ্বটা তার বাহিরে সেইটেই ছিল তার সব চেয়ে আপন। কেননা, তার 'ঘর হৈল বাহির, বাহির হৈল ঘর'।

একদিন যখন বেলা দশটা— অন্তঃপুরে যখন বাটি, বারকোষ, ধামা, চুপড়ি, শিলনোড়া ও পানের বাক্সের ভিড় জমাইয়া ঘরকন্নার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে— এমন সময় সংসারের সমস্ত ব্যস্ততা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জানালার কাছে ষোড়শী আপনার উদাস মনকে শূন্য আকাশে দিকে দিকে রওনা করিয়া দিতেছিল। হঠাৎ 'জয় বিশ্বেশ্বর' বলিয়া হাঁক দিয়া এক সন্ন্যাসী তাহাদের গেটের কাছে অশথতলা হইতে বাহির হইয়া আসিল। ষোড়শীর সমস্ত দেহতন্তু মীড়টানা বীণার তারের মতো চরম ব্যাকুলতায় বাজিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া পিসিকে বলিল, "পিসিমা, ঐ সন্ন্যাসীঠাকুরের ভোগের আয়োজন করো।"

এই শুরু হইল। সন্ন্যাসীর সেবা ষোড়শীর জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এতদিন পরে শ্বশুরের কাছে বধূর আবদারের পথ খুলিয়াছে। মাখন উৎসাহ দেখাইয়া বলিলেন, বাড়িতে বেশ ভালোরকম একটা অতিথিশালা খোলা চাই। মাখনবাবুর কিছুকাল হইতে আয় কমিতেছিল; কিন্তু তিনি বারো টাকা সুদে ধার করিয়া সৎকর্মে লাগিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীও যথেষ্ট জুটিতে লাগিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ যে খাঁটি নয়, মাখনের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বউমার কাছে তার আভাস দিবার জো কী! বিশেষত জটাধারীরা যখন আহার-আরামের অপরিহার্য ত্রুটি লইয়া গালি দেয়, অভিশাপ দিতে ওঠে, তখন এক-একদিন ইচ্ছা হইত, তাদের ঘাড়ে ধরিয়া বিদায় করিতে। কিন্তু ষোড়শীর মুখ চাহিয়া তাহাদের পায়ে ধরিতে হইত। এই ছিল তাঁর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত।

সন্ন্যাসী আসিলেই প্রথমে অন্তঃপুরে একবার তার তলব পড়িত। পিসি তাকে লইয়া বসিতেন, ষোড়শী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিত এই সাবধানতার কারণ ছিল এই, পাছে সন্ন্যাসী তাকে

প্রথমেই মা বলিয়া ডাকিয়া বসে। কেননা, কী জানি!— বরদার যে-ফোটোগ্রাফখানি ষোড়শীর কাছে ছিল সেটা তার ছেলে বয়সের। সেই বালক-মুখের উপর গোঁফদাড়ি জটাজূট ছাইভস্ম যোগ করিয়া দিলে সেটার যে কিরকম অভিব্যক্তি হইতে পারে তা বলা শক্ত। কতবার কত মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছে, বুঝি কিছু কিছু মেলে; বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুত বহিয়াছে, তার পরে দেখা যায়— কণ্ঠস্বরে ঠিক মিল নাই, নাকের ডগার কাছটা অন্যরকম।

এমনি করিয়া ঘরের কোণে বসিয়াও নূতন নূতন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া ষোড়শী যেন বিশ্বজগতে সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এই সন্ধানই তার সুখ। এই সন্ধানই তার স্বামী, তার জীবনযৌবনের পরিপূর্ণতা। এই সন্ধানটিকেই ঘেরিয়া তার সংসারের সমস্ত আয়োজন। সকালে উঠিয়াই ইহারই জন্য তার সেবার কাজ আরম্ভ হয়— এর আগে রান্নাঘরের কাজ সে কখনো করে নাই, এখন এই কাজেই তার বিলাস। সমস্তক্ষণই মনের মধ্যে তার প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালানো থাকে। রাত্রে শুইতে যাইবার আগে, 'কাল হয়তো আমার সেই অতিথি আসিয়া পৌঁছিবে' এই চিন্তাটিই তার দিনের শেষ চিন্তা। এই যেমন সন্ধান চলিতেছে, অমনি সেইসঙ্গে যেমন করিয়া বিধাতা তিলোত্তমাকে গড়িয়াছিলেন তেমনি করিয়া ষোড়শী নানা সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিলাইয়া বরদার মূর্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। পবিত্র তার সত্তা, তেজঃপুঞ্জ তার দেহ, গভীর তার জ্ঞান, অতি কঠোর তার ব্রত। এই সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কার। সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে এই এক সন্ন্যাসীরই তো পূজা চলিতেছে। স্বয়ং তার শ্বশুরও যে এই পূজার প্রধান পূজারি, ষোড়শীর কাছে এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কিছু ছিল না।

কিন্তু, সন্ন্যাসী প্রতিদিনই তো আসে না। সেই ফাঁকগুলো বড়ো অসহ্য। ক্রমে সে ফাঁকও ভরিল। ষোড়শী ঘরে থাকিয়াই সন্ন্যাসের সাধনায় লাগিয়া গেল। সে মেঝের উপর কম্বল পাতিয়া শোয়, এক বেলা যা খায় তার মধ্যে ফলমূলই বেশি। গায়ে তার গেরুয়া রঙের তসর, কিন্তু সাধব্যের লক্ষণ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য চওড়া তার লাল পাড়, এবং কল্যাণীর সিঁথির অর্ধেকটা জুড়িয়া মোটা একটা সিন্দূরের রেখা। ইহার উপরে শ্বশুরকে বলিয়া সংস্কৃত পড়া শুরু করিল। মুগ্ধবোধ মুখস্থ করিতে তার অধিক দিন লাগিল না; পণ্ডিতমশায় বলিলেন, "একেই বলে পূর্বজন্মার্জিত বিদ্যা।"

পবিত্রতায় সে যতই অগ্রসর হইবে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার অন্তরের মিলন ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে, এই সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল। বাহিরের লোকে সকলেই ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল; এই সন্ন্যাসী সাধুর সাধ্বী স্ত্রীর পায়ের ধুলা ও আশীর্বাদ লইবার লোকের ভিড় বাড়িতে থাকিল— এমন-কি, স্বয়ং পিসিও তার কাছে ভয়ে সম্ভ্রমে চুপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু, ষোড়শী যে নিজের মন জানিত। তার মনের রঙ তো তার গায়ের তসরের রঙের মতো সম্পূর্ণ গেরুয়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। আজ ভোর বেলাটাতে ঐ যে ঝির্‌ঝির্ করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছিল সেটা যেন তার সমস্ত দেহমনের উপর কোন্ একজনের কানে কানে কথার মতো আসিয়া পৌঁছিল। উঠিতে আর ইচ্ছা করিতেছিল না। জোর করিয়া উঠিল, জোর করিয়া কাজ করিতে গেল। ইচ্ছা করিতেছিল, জানালার কাছে বসিয়া তার মনের দূর দিগন্ত হইতে যে বাঁশির সুর আসিতেছে সেইটে চুপ করিয়া শোনে। এক-একদিন তার সমস্ত মন যেন অতিচেতন হইয়া ওঠে, রৌদ্রে নারিকেলের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্ করে, সে যেন তার বুকের মধ্যে কথা কহিতে থাকে। পণ্ডিতমশায় গীতা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেটা ব্যর্থ হইয়া যায়; অথচ সেই সময়ে তার জানালার বাহিরের বাগানে শুকনো পাতার উপর দিয়া যখন কাঠবিড়ালি খস্ খস্ করিয়া গেল, বহুদূর আকাশের হৃদয় ভেদ করিয়া চিলের একটা তীক্ষ্ণ ডাক আসিয়া পৌঁছিল, ক্ষণে ক্ষণে পুকুরপাড়ের রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার একটা ক্লান্ত শব্দ বাতাসকে আবিষ্ট করিল, এই সমস্তই তার মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকুল করে। এ'কে তো কিছুতেই বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা যায় না। যে বিস্তীর্ণ জগৎটা তপ্ত প্রাণের জগৎ— পিতামহ ব্রহ্মার রক্তের উত্তাপ হইতেই যার আদিম বাষ্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছিল; যা তাঁর চতুর্মুখের বেদবেদান্ত-উচ্চারণের অনেক পূর্বের সৃষ্টি; যার রঙের সঙ্গে, ধ্বনির সঙ্গে, গন্ধের সঙ্গে

সমস্ত জীবের নাড়ীতে নাড়ীতে বোঝাপড়া হইয়া গেছে ; তারই ছোটো বড়ো হাজার হাজার দূত জীব-হৃদয়ের খাসমহলে আনাগোনার গোপন পথটা জানে— ষোড়শী তো কৃচ্ছ্রসাধনের কাঁটা গাড়িয়া আজও সে-পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

কাজেই গেরুয়া রঙকে আরো ঘন করিয়া গুলিতে হইবে। ষোড়শী পণ্ডিতমশায়কে ধরিয়া পড়িল, "আমাকে যোগাসনের প্রণালী বলিয়া দিন।"

পণ্ডিত বলিলেন, "মা, তোমার তো এ-সকল পন্থায় প্রয়োজন নাই। সিদ্ধি তো পাকা আমলকীর মতো আপনি তোমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।"

তার পুণ্যপ্রভাব লইয়া চারি দিকে লোকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাতে ষোড়শীর মনে একটা স্তবের নেশা জমিয়া গেছে। এমন একদিন ছিল, বাড়ির ঝি চাকর পর্যন্ত তাকে কৃপাপাত্রী বলিয়া মনে করিয়াছে। তাই আজ যখন তাকে পুণ্যবতী বলিয়া সকলে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল, তখন তার বহুদিনের গৌরবের তৃষ্ণা মিটিবার সুযোগ হইল। সিদ্ধি যে সে পাইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিতে তার মুখে বাধে— তাই পণ্ডিতমশায়ের কাছে সে চুপ করিয়া রহিল।

মাখনের কাছে ষোড়শী আসিয়া বলিল, "বাবা, আমি কার কাছে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে শিখি বলো তো।"

মাখন বলিলেন, "সেটা না শিখিলেও তো বিশেষ অসুবিধা দেখি না। তুমি যত দূরে গেছ, সেইখানেই তোমার নাগাল কজন লোকে পায়।"

তা হউক, প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে। এমনি দুর্দৈব যে, মানুষও জুটিয়া গেল। মাখনের বিশ্বাস ছিল, আধুনিক কালের অধিকাংশ বাঙালিই মোটামুটি তাঁরই মতো— অর্থাৎ খায়-দায় ঘুমায়, এবং পরের কুৎসাঘটিত ব্যাপার ছাড়া জগতে আর কোনো অসম্ভবকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু, প্রয়োজনের তাগিদে সন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, বাংলাদেশে এমন মানুষও আছে যে ব্যক্তি খুলনা জেলায় ভৈরব নদের ধারে খাঁটি নৈমিষারণ্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই আবিষ্কারটা যে সত্য তার প্রধান প্রমাণ, ইহা কৃষ্ণপ্রতিপদের ভোরবেলায় স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং সরস্বতী ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি নিজবেশে আসিয়া আবির্ভূত হইতেন তাহা হইলেও বরঞ্চ সন্দেহের কারণ থাকিত— কিন্তু তনি তাঁর আশ্চর্য দেবীলীলায় হাঁড়িচাঁচা পাখি হইয়া দেখা দিলেন। পাখির লেজে তিনটি মাত্র পালক ছিল, একটি সাদা, একটি সবুজ, মাঝেরটি পাটকিলে। এই পালক তিনটি যে, সত্ত্ব, রজ, তম ; ঋক, যজুঃ, সাম ; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ; আজ, কাল, পর্শু প্রভৃতি যে তিন সংখ্যার ভেল্কি লইয়া এই জগৎ তাহারই নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তার পর হইতে এই নৈমিষারণ্যে যোগী তৈরি হইতেছে। দুইজন এম. এস্‌সি. ক্লাসের ছেলে কলেজ ছাড়িয়া এখানে যোগ অভ্যাস করেন ; একজন সাবজজ তাঁর সমস্ত পেন্সেন্ এই নৈমিষারণ্য-ফন্ডে উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং তাঁর পিতৃমাতৃহীন ভাগনেটিকে এখানকার যোগী ব্রহ্মচারীদের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়া মনে আশ্চর্য শান্তি পাইয়াছেন।

এই নৈমিষারণ্য হইতে ষোড়শীর জন্য যোগ-অভ্যাসের শিক্ষক পাওয়া গেল। সুতরাং মাখনকে নৈমিষারণ্য-কমিটির গৃহী সভ্য হইতে হইল। গৃহী সভ্যের কর্তব্য নিজের আয়ের ষষ্ঠ অংশ সন্ন্যাসী সভ্যদের ভরণপোষণের জন্য দান করা। গৃহী সভ্যদের শ্রদ্ধার পরিমাণ-অনুসারে এই ষষ্ঠ অংশ অনেক সময় থার্মোমিটরের পারার মতো সত্য অঙ্কটার উপরে নীচে ওঠানামা করে। অংশ কষিবার সময় মাখনেরও ঠিকে ভুল হইতে লাগিল। সেই ভুলটার গতি নীচের অঙ্কের দিকে। কিন্তু, এই ভুলচুকে নৈমিষারণ্যের যে ক্ষতি হইতেছিল ষোড়শী তাহা পূরণ করিয়া দিল। ষোড়শীর গহনা আর বড়ো কিছু বাকি রহিল না, এবং তার মাসহারার টাকা প্রতি মাসে সেই অন্তর্হিত গহনাগুলোর অনুসরণ করিল।

বাড়ির ডাক্তার অনাদি আসিয়া মাখনকে কহিলেন, "দাদা, করছ কী। মেয়েটা যে মারা যাবে।"

মাখন উদ্‌বিগ্ন মুখে বলিলেন, "তাই তো, কী করি।"

ষোড়শীর কাছে তাঁর আর সাহস নাই। এক সময়ে অত্যন্ত মৃদুস্বরে তাকে আসিয়া বলিলেন, "মা, এত অনিয়মে কি তোমার শরীর টিকবে।"

ষোড়শী একটুখানি হাসিল। তার মর্মার্থ এই, এমন-সকল বৃথা উদ্‌বেগ সংসারী বিষয়ী লোকেরই যোগ্য বটে।

৩

বরদা চলিয়া যাওয়ার পরে বারো বৎসর পার হইয়া গেছে ; এখন ষোড়শীর বয়স পঁচিশ। একদিন ষোড়শী তার যোগী শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমার স্বামী জীবিত আছেন কি না, তা আমি কেমন করে জানব।"

যোগী প্রায় দশ মিনিট কাল স্তব্ধ হইয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন ; তার পরে চোখ খুলিয়া বলিলেন, "জীবিত আছেন।"

"কেমন ক'রে জানলেন।"

"সে কথা এখনো তুমি বুঝবে না। কিন্তু, এটা নিশ্চয় জেনো, স্ত্রীলোক হয়েও সাধনার পথে তুমি যে এতদূর অগ্রসর হয়েছ সে কেবল তোমার স্বামীর অসামান্য তপোবলে। তিনি দূরে থেকেও তোমাকে সহধর্মিণী ক'রে নিয়েছেন।"

ষোড়শীর শরীর মন পুলকিত হইয়া উঠিল। নিজের সম্বন্ধে তার মনে হইল, ঠিক যেন শিব তপস্যা করিতেছেন আর পার্বতী পদ্মবীজের মালা জপিতে জপিতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।

ষোড়শী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় আছেন তা কি জানতে পারি।"

যোগী ঈষৎ হাস্য করিলেন ; তার পরে বলিলেন, "একখানা আয়না নিয়ে এসো।"

ষোড়শী আয়না আনিয়া যোগীর নির্দেশমত তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

আধ ঘণ্টা গেলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু দেখতে পাচ্ছ ?"

ষোড়শী দ্বিধার স্বরে কহিল, "হাঁ যেন কিছু দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা যে কী তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে।"

"সাদা কিছু দেখছ কি।"

"সাদাই তো বটে।"

"যেন পাহাড়ের উপর বরফের মতো ?"

"নিশ্চয়ই বরফ! কখনো পাহাড় তো দেখি নি, তাই এতক্ষণ ঝাপসা ঠেকছিল।"

এইরূপ আশ্চর্য উপায়ে ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, বরদা হিমালয়ের অতি দুর্গম জায়গায় লংচু পাহাড়ে বরফের উপর অনাবৃত দেহে বসিয়া আছেন। সেখান হইতে তপস্যার তেজ ষোড়শীকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই এক আশ্চর্য কাণ্ড।

সেদিন ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া ষোড়শীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার স্বামীর তপস্যা যে তাকে দিনরাত ঘেরিয়া আছে, স্বামী কাছে থাকিলে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারিত সে বিচ্ছেদও যে তার নাই, এই আনন্দে তার মন ভরিয়া উঠিল। তার মনে হইল, সাধনা আরো অনেক বেশি কঠোর হওয়া চাই। এতদিন এবং পৌষ মাসটাতে যে কম্বল সে গায়ে দিতেছিল এখনি সেটা ফেলিয়া দিতেই শীতে তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ষোড়শীর মনে হইল, সেই লংচু পাহাড়ের হাওয়া তার গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। হাত জোড় করিয়া চোখ বুজিয়া সে বসিয়া রহিল, চোখের কোণ দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল।

সেইদিনই মধ্যাহ্নে আহারের পর মাখন ষোড়শীকে তাঁর ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বড়োই সংকোচের সঙ্গে বলিলেন, "মা, এতদিন তোমার কাছে বলি নি, ভেবেছিলুম, দরকার হবে না, কিন্তু আর চলছে না। আমার সম্পত্তির চেয়ে আমার দেনা অনেক বেড়েছে, কোন্‌দিন আমার বিষয় ক্রোক করে বলা যায় না।"

ষোড়শীর মুখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তার মনে সন্দেহ রহিল না যে, এ-সমস্তই তার স্বামীর কাজ। তার স্বামী তাকে পূর্ণভাবে আপন সহধর্মিণী করিতেছেন— বিষয়ের যেটুকু ব্যবধান মাঝে ছিল

সেও বুঝি এবার ঘুচাইলেন। কেবল উত্তরে হাওয়া নয়, এই-যে দেনা এও সেই লংচু পাহাড় হইতে আসিয়া পৌঁছিতেছে; এ তার স্বামীরই দক্ষিণ হাতের স্পর্শ।

সে হাসিমুখে বলিল, "ভয় কী, বাবা।"

মাখন বলিলেন, "আমরা দাঁড়াই কোথায়?"

ষোড়শী বলিল, "নৈমিষারণ্যে চালা বেঁধে থাকব।"

মাখন বুঝিলেন, ইহার সঙ্গে বিষয়ের আলোচনা বৃথা। তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মোটর গাড়ি দরজার কাছে আসিয়া থামিল। সাহেবি কাপড়-পরা এক যুবা টপ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া মাখনের ঘরে আসিয়া একটা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাবের নমস্কারের চেষ্টা করিয়া বলিল, "চিনতে পারছেন না?"

"এ কী! বরদা নাকি!"

বরদা জাহাজের লস্কর হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বারো বৎসর পরে সে আজ কোন্‌ এক কাপড়-কাচা কল-কোম্পানির ভ্রমণকারী এজেন্ট হইয়া ফিরিয়াছে। বাপকে বলিল, "আপনার যদি কাপড়-কাচা কলের দরকার থাকে খুব সস্তায় ক'রে দিতে পারি।"

বলিয়া ছবি-আঁকা ক্যাটলগ পকেট হইতে বাহির করিল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

পয়লা নম্বর

আমি তামাকটা পর্যন্ত খাই নে। আমার এক অভ্রভেদী নেশা আছে, তারই আওতায় অন্য সকল নেশা একেবারে শিকড় পর্যন্ত শুকিয়ে মরে গেছে। সে আমার বই-পড়ার নেশা। আমার জীবনের মন্ত্রটা ছিল এই—

যাবজ্জীবেৎ নাই-বা জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা বহিং পঠেৎ।

যাদের বেড়াবার শখ বেশি অথচ পাথেয়ের অভাব, তারা যেমন ক'রে টাইম্‌টেব্‌ল্‌ পড়ে, অল্প বয়সে আর্থিক অসদ্ভাবের দিনে আমি তেমনি ক'রে বইয়ের ক্যাটালগ্‌ পড়তুম। আমার দাদার এক খুড়শ্বশুর বাংলা বই বেরবা-মাত্র নির্বিচারে কিনতেন এবং তাঁর প্রধান অহংকার এই যে, সে বইয়ের একখানাও তাঁর আজ পর্যন্ত খোওয়া যায় নি। বোধ হয় বাংলাদেশে এমন সৌভাগ্য আর কারও ঘটে না। কারণ, ধন বল, আয়ু বল, অন্যমনস্ক ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে যতকিছু সরণশীল পদার্থ আছে বাংলা বই হচ্ছে সকলের চেয়ে সেরা। এর থেকে বোঝা যাবে, দাদার খুড়শ্বশুরের বইয়ের আলমারির চাবি দাদার খুড়শাশুড়ির পক্ষেও দুর্লভ ছিল। 'দীন যথা রাজেন্দ্রসংগমে' আমি যখন ছেলেবেলায় দাদার সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যেতুম ঐ রুদ্ধদ্বার আলমারিগুলোর দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েছি। তখন আমার চক্ষুর জিভে জল এসেছে। এই বললেই যথেষ্ট হবে, ছেলেবেলা থেকেই এত অসম্ভব-রকম বেশি পড়েছি যে পাস করতে পারি নি। যতখানি কম পড়া পাস করার পক্ষে অত্যাবশ্যক, তার সময় আমার ছিল না।

আমি ফেল-করা ছেলে বলে আমার একটা মস্ত সুবিধে এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘড়ায় বিদ্যার তোলা জলে আমার স্নান নয়— স্রোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজকাল আমার কাছে অনেক বি. এ., এম. এ. এসে থাকে; তারা যতই আধুনিক হোক, আজও তারা ভিক্টোরীয় যুগের নজরবন্দী হয়ে বসে আছে। তাদের বিদ্যার জগৎ টলেমির পৃথিবীর মতো, আঠারো-উনিশ শতাব্দীর সঙ্গে একেবারে যেন ইস্কু দিয়ে আঁটা; বাংলাদেশের ছাত্রের দল পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাকেই যেন

চিরকাল প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। তাদের মানস-রথযাত্রার গাড়িখানা বহু কষ্টে মিল বেন্থাম পেরিয়ে কার্লাইল-রাস্কিনে এসে কাত হয়ে পড়েছে। মাস্টারমশায়ের বুলির বেড়ার বাইরে তারা সাহস করে হাওয়া খেতে বেরোয় না।

কিন্তু, আমরা যে-দেশের সাহিত্যকে খোঁটার মতো করে মনটাকে বেঁধে রেখে জাওর কাটাচ্ছি সে-দেশে সাহিত্যটা তো স্থাণু নয়— সেটা সেখানকার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। সেই প্রাণটা আমার না থাকতে পারে, কিন্তু সেই চলাটা আমি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজের চেষ্টায় ফরাসি, জর্মান, ইটালিয়ান শিখে নিলুম; অল্পদিন হল রাশিয়ান শিখতে শুরু করেছিলুম। আধুনিকতার যে একস্‌প্রেস গাড়িটা ঘণ্টায় ষাট মাইলের চেয়ে বেগে ছুটে চলেছে, আমি তারই টিকিট কিনেছি। তাই আমি হাক্‌সলি-ডারুয়িনে এসেও ঠেকে যাই নি, টেনিসনকেও বিচার করতে ডরাই নে, এমন-কি, ইবসেন-মেটারলিঙ্কের নামের নৌকা ধরে আমাদের মাসিক সাহিত্যে সস্তা খ্যাতির বাঁধা কারবার চালাতে আমার সংকোচ বোধ হয়।

আমাকেও কোনোদিন একদল মানুষ সন্ধান করে চিনে নেবে, এ আমার আশার অতীত ছিল আমি দেখছি, বাংলাদেশে এমন ছেলেও দু-চারটে মেলে যারা কলেজও ছাড়ে না অথচ কলেজের বাইরে সরস্বতীর যে বীণা বাজে তার ডাকেও উতলা হয়ে ওঠে। তারাই ক্রমে ক্রমে দুটি-একটি করে আমার ঘরে এসে জুটতে লাগল।

এই আমার এক দ্বিতীয় নেশা ধরল— বকুনি। ভদ্রভাষায় তাকে আলোচনা বলা যেতে পারে। দেশের চারি দিকে সাময়িক ও অসাময়িক সাহিত্যে যে-সমস্ত কথাবার্তা শুনি তা এক দিকে এত কাঁচা, অন্য দিকে এত পুরানো যে মাঝে মাঝে তার হাঁফ-ধরানো ভাপ্‌সা গুমোটটাকে উদার চিন্তার খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। অথচ লিখতে কুঁড়েমি আসে। তাই মন দিয়ে কথা শোনে এমন লোকের নাগাল পেলে বেঁচে যাই।

দল আমার বাড়তে লাগল। আমি থাকতুম আমাদের গলির দ্বিতীয় নম্বর বাড়িতে, এদিকে আমার নাম হচ্ছে অদ্বৈতচরণ, তাই আমাদের দলের নাম হয়ে গিয়েছিল দ্বৈতাদ্বৈতসম্প্রদায়। আমাদের এই সম্প্রদায়ের কারও সময়-অসময়ের জ্ঞান ছিল না। কেউ-বা পাঞ্চ-করা ট্রামের টিকিট দিয়ে পত্র-চিহ্নিত একখানা নূতন-প্রকাশিত ইংরেজি বই হাতে করে সকালে এসে উপস্থিত— তর্ক করতে করতে একটা বেজে যায়; তবু তর্ক শেষ হয় না। কেউ-বা সদ্য কলেজের নোট-নেওয়া খাতাখানা নিয়ে বিকেলে এসে হাজির, রাত যখন দুটো তখনো ওঠবার নাম করে না। আমি প্রায় তাদের খেতে বলি। কারণ, দেখেছি, সাহিত্যচর্চা যারা করে তাদের রসজ্ঞতার শক্তি কেবল মস্তিষ্কে নয়, রসনাতেও খুব প্রবল। কিন্তু, যাঁর ভরসায় এই-সমস্ত ক্ষুধিতদের যখন-তখন খেতে বলি তাঁর অবস্থা যে কী হয়, সেটাকে আমি তুচ্ছ বলেই বরাবর মনে করে আসতুম। সংসারে ভাবের ও জ্ঞানের যে-সকল বড়ো বড়ো কুলালচক্র ঘুরছে, যাতে মানবসভ্যতা কতক-বা তৈরি হয়ে আগুনের পোড় খেয়ে শক্ত হয়ে উঠছে, কতক-বা কাঁচা থাকতে থাকতেই ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তার কাছে ঘরকন্নার নড়াচড়া এবং রান্নাঘরের চুলোর আগুন কি চোখে পড়ে।

ভবানীর ভ্রূকুটিভঙ্গি ভবই জানেন, এমন কথা কাব্যে পড়েছি। কিন্তু ভবের তিন চক্ষু; আমার একজোড়া মাত্র, তারও দৃষ্টিশক্তি বই পড়ে পড়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে। সুতরাং অসময়ে ভোজের আয়োজন করতে বললে আমার স্ত্রীর ভ্রূচাপে কিরকম চাপল্য উপস্থিত হত, তা আমার নজরে পড়ত না। ক্রমে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, আমার ঘরে অসময়ই সময় এবং অনিয়মই নিয়ম। আমার সংসারের ঘড়ি তালকানা এবং আমার গৃহস্থালির কোটরে কোটরে ঊনপঞ্চাশ পবনের বাসা। আমার যা কিছু অর্থ সামর্থ্য তার একটিমাত্র খোলা ড্রেন ছিল, সে হচ্ছে বই-কেনার দিকে; সংসারের অন্য প্রয়োজন হ্যাংলা কুকুরের মতো এই আমার শখের বিলিতি কুকুরের উচ্ছিষ্ট চেটে ও শুঁকে কেমন করে যে বেঁচে ছিল, তার রহস্য আমার চেয়ে আমার স্ত্রী বেশি জানতেন।

নানা জ্ঞানের বিষয়ে কথা কওয়া আমার মতো লোকের পক্ষে নিতান্ত দরকার। বিদ্যা জাহির

করবার জন্যে নয়, পরের উপকার করবার জন্যেও নয় ; ওটা হচ্ছে কথা কয়ে কয়ে চিন্তা করা, জ্ঞান হজম করবার একটা ব্যায়ামপ্রণালী। আমি যদি লেখক হতুম, কিংবা অধ্যাপক হতুম, তা হলে বকুনি আমার পক্ষে বাহুল্য হত। যাদের বাঁধা খাটুনি আছে খাওয়া হজম করবার জন্যে তাদের উপায় খুঁজতে হয় না— যারা ঘরে বসে খায় তাদের অন্তত ছাতের উপর হন্‌হন্‌ করে পায়চারি করা দরকার। আমার সেই দশা। তাই যখন আমার দ্বৈতদলটি জমে নি— তখন আমার একমাত্র দ্বৈত ছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি আমার এই মানসিক পরিপাকের সশব্দ প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল নিঃশব্দে বহন করেছেন। যদিচ তিনি পরতেন মিলের শাড়ি এবং তাঁর গয়নার সোনা খাঁটি এবং নিরেট ছিল না, কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে যে আলাপ শুনতেন— সৌজাত্যবিদ্যাই (Eugenics) বল, মেণ্ডেল-তত্ত্বই বল, আর গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্রই বল,তার মধ্যে সস্তা কিংবা ভেজাল-দেওয়া কিছুই ছিল না। আমার দলবৃদ্ধির পর হতে এই আলাপ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেজন্যে তাঁর কোনো নালিশ কোনোদিন শুনি নি।

আমার স্ত্রীর নাম অনিলা। ঐ শব্দটার মানে কী তা আমি জানি নে, আমার শ্বশুরও যে জানতেন তা নয়। শব্দটা শুনতে মিষ্ট এবং হঠাৎ মনে হয়, ওর একটা-কোনো মানে আছে। অভিধানে যাই বলুক, নামটার আসল মানে— আমার স্ত্রী তাঁর বাপের আদরের মেয়ে। আমার শাশুড়ি যখন আড়াই বছরের একটি ছেলে রেখে মারা যান তখন সেই ছোটো ছেলেকে যত্ন করবার মনোরম উপায়স্বরূপে আমার শ্বশুর আর একটি বিবাহ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কিরকম সফল হয়েছিল তা এই বললেই বোঝা যাবে যে, তাঁর মৃত্যুর দুদিন আগে তিনি অনিলার হাত ধরে বললেন, "মা, আমি তো যাচ্ছি, এখন সরোজের কথা ভাববার জন্যে তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না।" তাঁর স্ত্রী ও দ্বিতীয়পক্ষের ছেলেদের জন্যে কী ব্যবস্থা করলেন তা আমি ঠিক জানি নে। কিন্তু, অনিলার হাতে গোপনে তিনি তাঁর জমানো টাকা প্রায় সাড়ে সাত হাজার দিয়ে গেলেন। বললেন, "এ টাকা সুদে খাটাবার দরকার নেই— নগদ খরচ করে এর থেকে তুমি সরোজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ো।"

আমি এই ঘটনায় কিছু আশ্চর্য হয়েছিলুম। আমার শ্বশুর কেবল বুদ্ধিমান ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন যাকে বলে বিজ্ঞ। অর্থাৎ, ঝোঁকের মাথায় কিছুই করতেন না, হিসেব করে চলতেন। তাই তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার ভার যদি কারও উপর তাঁর দেওয়া উচিত ছিল সেটা আমার উপর, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাঁর মেয়ে তাঁর জামাইয়ের চেয়ে যোগ্য এমন ধারণা যে তাঁর কী করে হল তা তো বলতে পারি নে। অথচ টাকাকড়ি সম্বন্ধে তিনি যদি আমাকে খুব খাঁটি বলে না জানতেন তা হলে আমার স্ত্রীর হাতে এত টাকা নগদ দিতে পারতেন না। আসল, তিনি ছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের ফিলিস্‌টাইন, আমাকে শেষ পর্যন্ত চিনতে পারেন নি।

মনে মনে রাগ করে আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম, এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কব না। কথা কইও নি। বিশ্বাস ছিল, কথা অনিলাকেই প্রথম কইতে হবে, এ সম্বন্ধে আমার শরণাপন্ন না হয়ে তার উপায় নেই। কিন্তু, অনিলা যখন আমার কাছে কোনো পরামর্শ নিতে এল না তখন মনে করলুম, ও বুঝি সাহস করছে না। শেষে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, "সরোজের পড়াশুনোর কী করছ।" অনিলা বললে, "মাস্টার রেখেছি, ইস্কুলেও যাচ্ছে।" আমি আভাস দিলুম, সরোজকে শেখাবার ভার আমি নিজেই নিতে রাজি আছি। আজকাল বিদ্যাশিক্ষার যে-সকল নতুন প্রণালী বেরিয়েছে তার কতক কতক ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। অনিলা হাঁ'ও বললে না, না'ও বললে না। এতদিন পরে আমার প্রথম সন্দেহ হল, অনিলা আমাকে শ্রদ্ধা করে না। আমি কলেজে পাস করি নি, সেইজন্য সম্ভবত ও মনে করে, পড়াশুনো সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমার নেই। এতদিন ওকে সৌজাত্য, অভিব্যক্তিবাদ এবং রেডিয়ো-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যা কিছু বলেছি নিশ্চয়ই অনিলা তার মূল্য কিছুই বোঝে নি। ও হয়তো মনে করেছে, সেকেন্ড ক্লাসের ছেলেও এর চেয়ে বেশি জানে। কেননা, মাস্টারের হাতের কান-মলার প্যাঁচে প্যাঁচে বিদ্যেগুলো আঁট হয়ে তাদের মনের মধ্যে বসে গেছে। রাগ করে মনে মনে বললুম, মেয়েদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার আশা সে যেন ছাড়ে বিদ্যাবুদ্ধিই যার প্রধান সম্পদ।

সংসারে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জীবননাট্য যবনিকার আড়ালেই জমতে থাকে, পঞ্চমাঙ্কের শেষে সেই যবনিকা হঠাৎ উঠে যায়। আমি যখন আমার দ্বৈতদের নিয়ে বের্গসঁর তত্ত্বজ্ঞান ও ইব্‌সেনের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করছি তখন মনে করেছিলুম, অনিলার জীবনযজ্ঞবেদীতে কোনো আগুনই বুঝি জ্বলে নি। কিন্তু, আজকে যখন সেই অতীতের দিকে পিছন ফিরে দেখি তখন স্পষ্ট দেখতে পাই, যে-সৃষ্টিকর্তা আগুনে পুড়িয়ে, হাতুড়ি পিটিয়ে, জীবনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন অনিলার মর্মস্থলে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। সেখানে একটি ছোটো ভাই, একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়তই একটা ঘাতপ্রতিঘাতের লীলা চলছিল। পুরাণের বাসুকী যে পৌরাণিক পৃথিবীকে ধরে আছে সে পৃথিবী স্থির। কিন্তু, সংসারে যে-মেয়েকে বেদনার পৃথিবী বহন করতে হয় তার সে-পৃথিবী মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠছে। সেই চলতি ব্যথার ভার বুকে নিয়ে যাকে ঘরকন্নার খুঁটিনাটির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন চলতে হয়, তার অন্তরের কথা অন্তর্যামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ বুঝবে। অন্তত, আমি তো কিছুই বুঝি নি। কত উদ্‌বেগ, কত অপমানিত প্রয়াস, পীড়িত স্নেহের কত অন্তর্গূঢ় ব্যাকুলতা, আমার এত কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মথিত হয়ে উঠছিল আমি তা জানিই নি। আমি জানতুম, যেদিন দ্বৈতদলের ভোজের বার উপস্থিত হত সেইদিনকার উদ্যোগপর্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব। আজ বেশ বুঝতে পারছি, পরম ব্যথার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটো ভাইটিই দিদির সব চেয়ে অন্তরতম হয়ে উঠেছিল। সরোজকে মানুষ করে তোলা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ ও সহায়তা এরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে উপেক্ষা করাতে আমি ওদিকটাতে একেবারে তাকাই নি, তার যে কিরকম চলছে সে কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নি।

ইতিমধ্যে আমাদের গলির পয়লা-নম্বর বাড়িতে লোক এল। এ বাড়িটি সেকালের বিখ্যাত ধনী মহাজন উদ্ধব বড়ালের আমলে তৈরি। তার পরে দুই পুরুষের মধ্যে সে বংশের ধন জন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে, দুটি-একটি বিধবা বাকি আছে। তারা এখানে থাকে না, তাই বাড়িটা পোড়ো অবস্থাতেই আছে। মাঝে মাঝে বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে এ বাড়ি কেউ কেউ অল্পদিনের জন্যে ভাড়া নিয়ে থাকে, বাকি সময়টা এত বড়ো বাড়ির ভাড়াটে প্রায় জোটে না। এবারে এলেন, মনে করো, তাঁর নাম রাজা সিতাংশুমৌলী, এবং ধরে নেওয়া যাক, তিনি নরোত্তমপুরের জমিদার।

আমার বাড়ির ঠিক পাশেই অকস্মাৎ এতবড়ো একটা আবির্ভাব আমি হয়তো জানতেই পারতুম না। কারণ, কর্ণ যেমন একটি সহজ কবচ গায়ে দিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন আমারও তেমনি একটি বিধিদত্ত সহজ কবচ ছিল। সেটি হচ্ছে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা। আমার এ বর্মটি খুব মজবুত ও মোটা। অতএব সচরাচর পৃথিবীতে চারি দিকে যে-সকল ঠেলাঠেলি গোলমাল গালমন্দ চলতে থাকে তার থেকে আত্মরক্ষা করবার উপকরণ আমার ছিল।

কিন্তু, আধুনিক কালের বড়োমানুষরা স্বাভাবিক উৎপাতের চেয়ে বেশি, তারা অস্বাভাবিক উৎপাত। দু হাত, দু পা, এক মুণ্ড যাদের আছে তারা হল মানুষ ; যাদের হঠাৎ কতকগুলো হাত পা মাথামুণ্ড বেড়ে গেছে তারা হল দৈত্য। অহরহ দুদ্দাড় শব্দে তারা আপনার সীমাকে ভাঙতে থাকে এবং আপন বাহুল্য দিয়ে স্বর্গমর্তকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া অসম্ভব। যাদের 'পরে মন দেবার কোনোই প্রয়োজন নেই অথচ মন না দিয়ে থাকবারও জো নেই তারাই হচ্ছে জগতের অস্বাস্থ্য, স্বয়ং ইন্দ্র পর্যন্ত তাদের ভয় করেন।

মনে বুঝলুম, সিতাংশুমৌলী সেই দলের মানুষ। একা একজন লোক যে এত বেজায় অতিরিক্ত হতে পারে, তা আমি পূর্বে জানতুম না। গাড়ি ঘোড়া লোক লস্কর নিয়ে সে যেন দশ-মুণ্ড বিশ-হাতের পালা জমিয়েছে। কাজেই তার জ্বালায় আমার সারস্বত স্বর্গলোকটির বেড়া রোজ ভাঙতে লাগল।

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমাদের গলির মোড়ে। এ গলিটার প্রধান গুণ ছিল এই যে, আমার মতো আনমনা লোক সামনের দিকে না তাকিয়ে, পিঠের দিকে মন না দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রেও এখানে নিরাপদে বিচরণ করতে পারে। এমন-কি, এখানে সেই পথ-চলতি অবস্থায় মেরেডিথের গল্প, ব্রাউনিঙের কাব্য অথবা আমাদের কোনো আধুনিক বাঙালি কবির রচনা

সম্বন্ধে মনে মনে বিতর্ক করেও অপঘাত-মৃত্যু বাঁচিয়ে চলা যায়। কিন্তু, সেদিন খামকা একটা প্রচণ্ড 'হেইয়ো' গর্জন শুনে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা খোলা ব্রুহাম গাড়ির প্রকাণ্ড একজোড়া লাল ঘোড়া আমার পিঠের উপর পড়ে আর-কি! যাঁর গাড়ি তিনি স্বয়ং হাঁকাচ্ছেন, পাশে তাঁর কোচম্যান ব'সে। বাবু সবলে দুই হাতে রাশ টেনে ধরেছেন। আমি কোনোমতে সেই সংকীর্ণ গলির পার্শ্ববর্তী একটা তামাকের দোকানের হাঁটু আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষা করলুম। দেখলুম আমার উপর বাবু ক্রুদ্ধ। কেননা, যিনি অসতর্কভাবে রথ হাঁকান অসতর্ক পদাতিককে তিনি কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারেন না। এর কারণটা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পদাতিকের দুটি মাত্র পা, সে হচ্ছে স্বাভাবিক মানুষ। আর, যে-ব্যক্তি জুড়ি হাঁকিয়ে ছোটে তার আট পা; সে হল দৈত্য। তার এই অস্বাভাবিক বাহুল্যের দ্বারা জগতে সে উৎপাতের সৃষ্টি করে। দুই-পা-ওয়ালা মানুষের বিধাতা এই আট-পা-ওয়ালা আকস্মিকটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

স্বভাবের স্বাস্থ্যকর নিয়মে এই অশ্বরথ ও সারথি সবাইকেই যথাসময়ে ভুলে যেতুম। কারণ, এই পরমাশ্চর্য জগতে এরা বিশেষ ক'রে মনে রাখবার জিনিস নয়। কিন্তু, প্রত্যেক মানুষের যে পরিমাণ গোলমাল করবার স্বাভাবিক বরাদ্দ আছে এঁরা তার চেয়ে ঢের-বেশি জবর দখল করে বসে আছেন। এইজন্যে যদিচ ইচ্ছা করলেই আমার তিননম্বর প্রতিবেশীকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভুলে থাকতে পারি কিন্তু আমার এই পয়লা-নম্বরের প্রতিবেশীকে এক মুহূর্ত আমার ভুলে থাকা শক্ত। রাত্রে তার আট-দশটা ঘোড়া আস্তাবলের কাঠের মেঝের উপর বিনা সংগীতের যে-তাল দিতে থাকে তাতে আমার ঘুম সর্বাঙ্গে টোল খেয়ে তুবড়ে যায়। তার উপর ভোরবেলায় সেই আট-দশটা ঘোড়াকে আট-দশটা সহিস যখন সশব্দে মলতে থাকে তখন সৌজন্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তার পরে তাঁর উড়ে বেহারা, ভোজপুরি বেহারা, তাঁর পাঁড়ে তেওয়ারি দরোয়ানের দল কেউই স্বরসংযম কিংবা মিতভাষিতার পক্ষপাতী নয়। তাই বলছিলুম, ব্যক্তিটি একটিমাত্র কিন্তু তার গোলমাল করবার যন্ত্র বিস্তর। এইটেই হচ্ছে দৈত্যের লক্ষণ। সেটা তার নিজের পক্ষে অশান্তিকর না হতে পারে। নিজের কুড়িটা নাসারন্ধ্রে নাক ডাকবার সময় রাবণের হয়তো ঘুমের ব্যাঘাত হত না, কিন্তু তার প্রতিবেশীর কথাটা চিন্তা করে দেখো। স্বর্গের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে পরিমাণসুষমা, অপর পক্ষে একদা যে-দানবের দ্বারা স্বর্গের নন্দনশোভা নষ্ট হয়েছিল তাদের প্রধান লক্ষণ ছিল অপরিমিতি। আজ সেই অপরিমিতি দানবটাই টাকার থলিকে বাহন ক'রে মানবের লোকালয়কে আক্রমণ করেছে। তাকে যদি-বা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই সে চার ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়ে— এবং উপরন্তু চোখ রাঙায়।

সেদিন বিকেলে আমার দ্বৈতগুলি তখনো কেউ আসে নি। আমি বসে বসে জোয়ার-ভাঁটার তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিলুম, এমন সময়ে আমাদের বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে, দরজা পেরিয়ে আমার প্রতিবেশীর একটা স্মারকলিপি ঝন্‌ঝন্ শব্দে আমার শার্সির উপর এসে পড়ল। সেটা একটা টেনিসের গোলা। চন্দ্রমার আকর্ষণ, পৃথিবীর নাড়ীর চাঞ্চল্য, বিশ্বগীতিকাব্যের চিরন্তন ছন্দতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকে ছাড়িয়ে মনে পড়ল, আমার একজন প্রতিবেশী আছেন, এবং অত্যন্ত বেশি করে আছেন, আমার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক অথচ নিরতিশয় অবশ্যম্ভাবী। পরক্ষণেই দেখি, আমার বুড়ো অযোধ্যা বেহারাটা দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। এই আমার একমাত্র অনুচর। একে ডেকে পাই নে, হেঁকে বিচলিত করতে পারি নে— দুর্লভতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, একা মানুষ কিন্তু কাজ বিস্তর। আজ দেখি, বিনা তাগিদেই গোলা কুড়িয়ে সে পাশের বাড়ির দিকে ছুটছে। খবর পেলুম, প্রত্যেকবার গোলা কুড়িয়ে দেবার জন্যে সে চার পয়সা করে মজুরি পায়।

দেখলুম, কেবল যে আমার শার্সি ভাঙছে, আমার শান্তি ভাঙছে, তা নয়, আমার অনুচর-পরিচরদের মন ভাঙতে লাগল। আমার অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে অযোধ্যা বেহারার অবজ্ঞা প্রত্যহ বেড়ে উঠছে, সেটা তেমন আশ্চর্য নয় কিন্তু আমার দ্বৈতসম্প্রদায়ের প্রধান সর্দার কানাইলালের মনটাও দেখছি পাশের বাড়ির প্রতি উৎসুক হয়ে উঠল। আমার উপর তার যে নিষ্ঠা ছিল সেটা উপকরণমূলক নয়,

অন্তঃকরণমূলক, এই জেনে আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম, এমন সময় একদিন লক্ষ্য করে দেখলুম, সে আমার অযোধ্যাকে অতিক্রম ক'রে টেনিসের পলাতক গোলাটা কুড়িয়ে নিয়ে পাশের বাড়ির দিকে ছুটছে। বুঝলুম, এই উপলক্ষে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সন্দেহ হল, ওর মনের ভাবটা ঠিক ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মতো নয়— শুধু অমৃতে ওর পেট ভরবে না।

আমি পয়লা-নম্বরের বাবুগিরিকে খুব তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করতুম। বলতুম, সাজসজ্জা দিয়ে মনের শূন্যতা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা ঠিক যেন রঙিন মেঘ দিয়ে আকাশ মুড়ি দেবার দুরাশা। একটু হাওয়াতেই মেঘ যায় স'রে, আকাশের ফাঁকা বেরিয়ে পড়ে। কানাইলাল একদিন প্রতিবাদ করে বললে, মানুষটা একেবারে নিছক-ফাঁপা নয়, বি·এ· পাস করেছে। কানাইলাল স্বয়ং বি·এ· পাস-করা, এজন্য ঐ ডিগ্রীটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারলুম না।

পয়লা-নম্বরের প্রধান গুণগুলি সশব্দ। তিনি তিনটে যন্ত্র বাজাতে পারেন, কর্নেট, এস্‌রাজ এবং চেলো। যখন-তখন তার পরিচয় পাই। সংগীতের সুর সম্বন্ধে আমি নিজেকে সুরাচার্য বলে অভিমান করি নে। কিন্তু, আমার মতে গানটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা নয়। ভাষার অভাবে মানুষ যখন বোবা ছিল তখনই গানের উৎপত্তি— তখন মানুষ চিন্তা করতে পারত না বলে চীৎকার করত। আজও যে-সব মানুষ আদিম অবস্থায় আছে তারা শুধু শুধু শব্দ করতে ভালোবাসে। কিন্তু দেখতে পেলুম, আমার দ্বৈতদলের মধ্যে অন্তত চারজন ছেলে আছে, পয়লা-নম্বরে চেলো বেজে উঠলেই যারা গাণিতিক ন্যায়শাস্ত্রের নব্যতম অধ্যায়েও মন দিতে পারে না।

আমার দলের মধ্যে অনেক ছেলে যখন পয়লা-নম্বরের দিকে হেলছে এমন সময়ে অনিলা একদিন আমাকে বললে, "পাশের বাড়িতে একটা উৎপাত জুটেছে, এখন আমরা এখান থেকে অন্য কোনো বাসায় গেলেই তো ভালো হয়।"

বড়ো খুশি হলুম। আমার দলের লোকদের বললুম, "দেখেছ মেয়েদের কেমন একটা সহজ বোধ আছে ? তাই যে-সব জিনিস প্রমাণযোগে বোঝা যায় তা ওরা বুঝতেই পারে না, কিন্তু যে-সব জিনিসের কোনো প্রমাণ নেই তা বুঝতে ওদের একটুও দেরি হয় না।"

কানাইলাল হেসে বললে, "যেমন পেঁচো, ব্রহ্মদৈত্য, ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোর মাহাত্ম্য, পতিদেবতা-পূজার পুণ্যফল ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমি বললুম, "না হে, এই দেখো-না, আমরা এই পয়লা-নম্বরের জাকজমক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি, কিন্তু অনিলা ওর সাজসজ্জায় ভোলে নি।"

অনিলা দু-তিনবার বাড়ি-বদলের কথা বললে। আমার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু কলকাতার গলিতে গলিতে বাসা খুঁজে বেড়াবার মতো অধ্যবসায় আমার ছিল না। অবশেষে একদিন বিকেলবেলায় দেখা গেল, কানাইলাল এবং সতীশ পয়লা-নম্বরে টেনিস খেলছে। তার পরে জনশ্রুতি শোনা গেল, যতি আর হরেন পয়লা-নম্বরে সংগীতের মজলিসে একজন বক্স-হার্মোনিয়ম বাজায় এবং একজন বাঁয়া-তবলায় সংগত করে, আর অরুণ নাকি সেখানে কমিক গান করে খুব প্রতিপত্তি লাভ করেছে। এদের আমি পাঁচ-ছ বছর ধরে জানি কিন্তু এদের যে এ-সব গুণ ছিল তা আমি সন্দেহও করি নি। বিশেষত আমি জানতুম, অরুণের প্রধান শখের বিষয় হচ্ছে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। সে যে কমিক গানে ওস্তাদ তা কী করে বুঝব।

সত্য কথা বলি, আমি এই পয়লা-নম্বরকে মুখে যতই অবজ্ঞা করি মনে মনে ঈর্ষা করেছিলুম। আমি চিন্তা করতে পারি, বিচার করতে পারি, সকল জিনিসের সার গ্রহণ করতে পারি, বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান করতে পারি— মানসিক সম্পদে সিতাংশুমৌলীকে আমার সমকক্ষ বলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু তবু ঐ মানুষটিকে আমি ঈর্ষা করেছি। কেন সে কথা যদি খুলে বলি তো লোকে হাসবে। সকালবেলায় সিতাংশু একটা দুরন্ত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোত— কী আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রাশ বাগিয়ে এই জন্তুটাকে সে সংযত করত। এই দৃশ্যটি রোজই আমি দেখতুম, আর ভাবতুম, 'আহা, আমি যদি এইরকম অনায়াসে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে পারতুম!' পটুত্ব বলে যে জিনিসটি আমার

একেবারেই নেই সেইটের 'পরে আমার ভারি একটা গোপন লোভ ছিল। আমি গানের সুর ভালো বুঝি নে কিন্তু জানলা থেকে কতদিন গোপনে দেখেছি সিতাংশু এস্‌রাজ বাজাচ্ছে। ঐ যন্ত্রটার পরে তার একটি বাধাহীন সৌন্দর্যময় প্রভাব আমার কাছে আশ্চর্য মনোহর বোধ হত। আমার মনে হত, যন্ত্রটা যেন প্রেয়সী-নারীর মতো ওকে ভালোবাসে— সে আপনার সমস্ত সুর ওকে ইচ্ছা করে বিকিয়ে দিয়েছে। জিনিস-পত্র বাড়ি-ঘর জন্তু-মানুষ সকলের 'পরেই সিতাংশুর এই সহজ প্রভাব ভারি একটি শ্রী বিস্তার করত। এই জিনিসটি অনির্বচনীয়, আমি একে নিতান্ত দুর্লভ না মনে করে থাকতে পারতুম না। আমি মনে করতুম, পৃথিবীতে কোনো কিছু প্রার্থনা করা এ লোকটির পক্ষে অনাবশ্যক, সবই আপনি এর কাছে এসে পড়বে, এ ইচ্ছা করে যেখানে গিয়ে বসবে সেইখানেই এর আসন পাতা।

তাই যখন একে একে আমার দ্বৈতগুলির অনেকেই পয়লা-নম্বরে টেনিস খেলতে, কন্সর্ট বাজাতে লাগল, তখন স্থানত্যাগের দ্বারা এই লুব্ধদের উদ্ধার করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলুম না। দালাল এসে খবর দিলে, মনের মতো অন্য বাসা বরানগর-কাশীপুরের কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া যাবে। আমি তাতে রাজি। সকাল তখন সাড়ে ন'টা। স্ত্রীকে প্রস্তুত হতে বলতে গেলুম। তাঁকে ভাঁড়ারঘরেও পেলুম না, রান্নাঘরেও না। দেখি, শোবার ঘরে জানলার গরাদের উপর মাথা রেখে চুপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। আমি বললুম, "পর্শুই নতুন বাসায় যাওয়া যাবে।"

তিনি বললেন, "আর দিন পনেরো সবুর করো।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন।"

অনিলা বললেন, "সরোজের পরীক্ষার ফল শীঘ্র বেরোবে— তার জন্য মনটা উদ্‌বিগ্ন আছে, এ কয়দিন আর নড়াচড়া করতে ভালো লাগছে না।"

অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয় আছে যা নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি কখনো আলোচনা করি নে। সুতরাং আপাতত কিছুদিন বাড়িবদল মুলতবি রইল। ইতিমধ্যে খবর পেলুম, সিতাংশু শীঘ্রই দক্ষিণভারতে বেড়াতে বেরোবে, সুতরাং দুই-নম্বরের উপর থেকে মস্ত ছায়াটা সরে যাবে।

অদৃষ্ট নাট্যের পঞ্চমাঙ্কের শেষ দিকটা হঠাৎ দৃষ্ট হয়ে ওঠে। কাল আমার স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন ; আজ ফিরে এসে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করলেন। তিনি জানেন, আজ রাত্রে আমাদের দ্বৈতদলের পূর্ণিমার ভোজ। তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার অভিপ্রায়ে দরজায় ঘা দিলুম। প্রথমে সাড়া পাওয়া গেল না। ডাক দিলুম, "অনু !" খানিক বাদে অনিলা এসে দরজা খুলে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আজ রাত্রে রান্নার জোগাড় সব ঠিক আছে তো ?"

সে কোনো জবাব না দিয়ে মাথা হেলিয়ে জানালে যে, আছে।

আমি বললুম, "তোমার হাতের তৈরি মাছের কচুরি আর বিলাতি আমড়ার চাট্‌নি ওদের খুব ভালো লাগে, সেটা ভুলো না।"

এই বলে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল বসে আছে।

আমি বললুম, "কানাই, আজ তোমরা একটু সকাল-সকাল এসো।"

কানাই আশ্চর্য হয়ে বললে, "সে কী কথা। আজ আমাদের সভা হবে না কি।"

আমি বললুম, "হবে বৈকি। সমস্ত তৈরি আছে— ম্যাক্সিম গর্কির নতুন গল্পের বই, বের্গসঁর উপর রাসেলের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন-কি, আমড়ার চাট্‌নি পর্যন্ত।"

কানাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে বললে, "অদ্বৈতবাবু, আমি বলি আজ থাক্‌।"

অবশেষে প্রশ্ন করে জানতে পারলুম, আমার শ্যালক সরোজ কাল বিকেলবেলায় আত্মহত্যা করে মরেছে। পরীক্ষায় সে পাস হতে পারে নি, তাই নিয়ে বিমাতার কাছ থেকে খুব গঞ্জনা পেয়েছিল— সইতে না পেরে গলায় চাদর বেঁধে মরেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কোথা থেকে শুনলে ?"

সে বললে, "পয়লা-নম্বর থেকে।"

পয়লা-নম্বর থেকে ! বিবরণটা এই— সন্ধ্যার দিকে অনিলার কাছে যখন খবর এল তখন সে গাড়ি ডাকার অপেক্ষা না ক'রে অযোধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে পথের মধ্যে থেকে গাড়ি ভাড়া করে বাপের বাড়িতে গিয়েছিল। অযোধ্যার কাছ থেকে রাত্রে সিতাংশুমৌলী এই খবর পেয়েই তখনি সেখানে গিয়ে পুলিসকে ঠাণ্ডা ক'রে নিজে শ্মশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সৎকার করিয়ে দেন।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে তখনি অন্তঃপুরে গেলুম। মনে করেছিলুম, অনিলা বুঝি দরজা বন্ধ ক'রে আবার তার শোবার ঘরের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু, এবারে গিয়ে দেখি, ভাঁড়ারের সামনের বারান্দায় বসে সে আমড়ার চাটনির আয়োজন করছে। যখন লক্ষ্য করে তার মুখ দেখলুম তখন বুঝলুম, এক রাত্রে তার জীবনটা উলট-পালট হয়ে গেছে।

আমি অভিযোগ করে বললুম, "আমাকে কিছু বল নি কেন ?"

সে তার বড়ো বড়ো দুই চোখ তুলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালে— কোনো কথা কইলে না। আমি লজ্জায় অত্যন্ত ছোটো হয়ে গেলুম। যদি অনিলা বলত 'তোমাকে ব'লে লাভ কী', তা হলে আমার জবাব দেবার কিছুই থাকত না। জীবনের এই-সব বিপ্লব— সংসারের সুখ দুঃখ— নিয়ে কী ক'রে যে ব্যবহার করতে হয়, আমি কি তার কিছুই জানি।

আমি বললুম, "অনিল, এ-সব রাখো, আজ আমাদের সভা হবে না।"

অনিলা আমড়ার খোসা ছাড়াবার দিকে দৃষ্টি রেখে বললে, "কেন হবে না। খুব হবে। আমি এত ক'রে সমস্ত আয়োজন করেছি, সে আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না।"

আমি বললুম, "আজ আমাদের সভার কাজ হওয়া অসম্ভব।"

সে বললে, "তোমাদের সভা না হয় না হবে, আজ আমার নিমন্ত্রণ।"

আমি মনে একটু আরাম পেলুম। ভাবলুম, অনিলের শোকটা তত বেশি কিছু নয়। মনে করলুম, সেই-যে এক সময়ে ওর সঙ্গে বড়ো বড়ো বিষয়ে কথা কইতুম তারই ফলে ওর মনটা অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে এসেছে। যদিচ সব কথা বোঝবার মতো শিক্ষা এবং শক্তি ওর ছিল না, কিন্তু তবু পার্সোনাল ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ ব'লে একটা জিনিস আছে তো।

সন্ধ্যার সময় আমার দ্বৈতদলের দুই-চারজন কম পড়ে গেল। কানাই তো এলই না। পয়লা-নম্বরে যারা টেনিসের দলে যোগ দিয়েছিল তারাও কেউ আসে নি। শুনলুম, কাল ভোরের গাড়িতে সিতাংশুমৌলী চলে যাচ্ছে, তাই এরা সেখানে বিদায়ভোজ খেতে গেছে। এ দিকে অনিলা আজ যেরকম ভোজের আয়োজন করেছিল এমন আর কোনো দিনই করে নি। এমন-কি, আমার মতো বেহিসাবি লোকেও এ কথা না মনে করে থাকতে পারে নি যে, খরচটা অতিরিক্ত করা হয়েছে।

সেদিন খাওয়াদাওয়া করে সভাভঙ্গ হতে রাত্রি একটা-দেড়টা হয়ে গেল। আমি ক্লান্ত হয়ে তখনি শুতে গেলুম। অনিলাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "শোবে না ?"

সে বললে, "বাসনগুলো তুলতে হবে।"

পরের দিন যখন উঠলুম তখন বেলা প্রায় আটটা হবে। শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর যেখানে আমার চশমাটা খুলে রাখি সেখানে দেখি, আমার চশমা চাপা দেওয়া এক-টুকরা কাগজ, তাতে অনিলের হাতের লেখাটি আছে 'আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খুঁজে পাবে না।'

কিছু বুঝতে পারলুম না। টিপাইয়ের উপরে একটা টিনের বাক্স— সেটা খুলে দেখি, তার মধ্যে অনিলার সমস্ত গয়না— এমন-কি, তার হাতের চুড়ি বালা পর্যন্ত, কেবল তার শাঁখা এবং হাতের লোহা ছাড়া। একটা খোপের মধ্যে চাবির গোছা, অন্য অন্য খোপে কাগজের-মোড়কে-করা কিছু টাকা সিকি দুয়ানি। অর্থাৎ, মাসের খরচ বাঁচিয়ে অনিলের হাতে যা কিছু জমেছিল তার শেষ পয়সাটি পর্যন্ত রেখে গেছে। একটি খাতায় বাসন-কোসন জিনিসপত্রের ফর্দ, এবং ধোবার বাড়িতে যে-সব কাপড় গেছে

তার সব হিসাব। এই সঙ্গে গয়লাবাড়ির এবং মুদির দোকানের দেনার হিসাবও টোকা আছে, কেবল তার নিজের ঠিকানা নেই।

এইটুকু বুঝতে পারলুম, অনিল চলে গেছে। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখলুম— আমার শ্বশুরবাড়িতে খোঁজ নিলুম— কোথাও সে নেই। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা ঘটলে সে সম্বন্ধে কিরকম বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়, কোনোদিন আমি তার কিছুই ভেবে পাই নে। বুকের ভিতরটা হা-হা করতে লাগল। হঠাৎ পয়লা-নম্বরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সে বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ। দেউড়ির কাছে দরোয়ানজি গড়গড়ায় তামাক টানছে। রাজাবাবু ভোররাত্রে চলে গেছেন। মনটার মধ্যে ছ্যাঁক্ করে উঠল। হঠাৎ বুঝতে পারলুম, আমি যখন একমনে নব্যতম ন্যায়ের আলোচনা করছিলুম তখন মানবসমাজের পুরাতনতম একটি অন্যায় আমার ঘরে জাল বিস্তার করছিল। ফ্লোবেয়ার, টলস্টয়, টুর্গেনিভ প্রভৃতি বড়ো বড়ো গল্পলিখিয়েদের বইয়ে যখন এইরকমের ঘটনার কথা পড়েছি তখন বড়ো আনন্দে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক'রে তার তত্ত্বকথা বিশ্লেষণ করে দেখেছি। কিন্তু, নিজের ঘরেই যে এটা এমন সুনিশ্চিত করে ঘটতে পারে, তা কোনোদিন স্বপ্নেও কল্পনা করি নি।

প্রথম ধাক্কাটাকে সামলে নিয়ে আমি প্রবীণ তত্ত্বজ্ঞানীর মতো সমস্ত ব্যাপারটাকে যথোচিত হালকা করে দেখবার চেষ্টা করলুম। যেদিন আমার বিবাহ হয়েছিল সেইদিনকার কথাটা মনে করে শুষ্ক হাসি হাসলুম। মনে করলুম, মানুষ কত আকাঙ্ক্ষা, কত আয়োজন, কত আবেগের অপব্যয় করে থাকে। কত দিন, কত রাত্রি, কত বৎসর নিশ্চিন্ত মনে কেটে গেল ; স্ত্রী বলে একটা সজীব পদার্থ নিশ্চয় আছে ব'লে চোখ বুজে ছিলুম ; এমন সময় আজ হঠাৎ চোখ খুলে দেখি, বুদ্‌বুদ ফেটে গিয়েছে। গেছে যাক গে— কিন্তু জগতে সবই তো বুদ্‌বুদ নয়। যুগযুগান্তরের জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে টিকে রয়েছে এমন-সব জিনিসকে আমি কি চিনতে শিখি নি।

কিন্তু দেখলুম, হঠাৎ এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্যকালের জ্ঞানীটা মূর্ছিত হয়ে পড়ল, আর কোন্ আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগল। বারান্দায় ছাতে পায়চারি করতে করতে, শূন্য বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে, শেষকালে, যেখানে জানালার কাছে কতদিন আমার স্ত্রীকে একলা চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি, একদিন আমার সেই শোবার ঘরে গিয়ে পাগলের মতো সমস্ত জিনিসপত্র ঘাঁটতে লাগলুম। অনিলের চুল বাঁধবার আয়নার দেরাজটা হঠাৎ টেনে খুলতেই রেশমের লাল ফিতেয় বাঁধা একতাড়া চিঠি বেরিয়ে পড়ল। চিঠিগুলি পয়লা-নম্বর থেকে এসেছে। বুকটা জ্বলে উঠল। একবার মনে হল, সবগুলো পুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু, যেখানে বড়ো বেদনা সেইখানেই ভয়ংকর টান। এ চিঠিগুলো সমস্ত না পড়ে আমার থাকবার জো নেই।

এই চিঠিগুলি পঞ্চাশবার পড়েছি। প্রথম চিঠিখানা তিন-চার টুক্‌রো করে ছেঁড়া। মনে হল, পাঠিকা পড়েই সেটি ছিঁড়ে ফেলে তার পরে আবার যত্ন করে একখানা কাগজের উপরে গঁদ দিয়ে জুড়ে রেখেছে। সে চিঠিখানা এই—

'আমার এ চিঠি না পড়েই যদি তুমি ছিঁড়ে ফেলো তবু আমার দুঃখ নেই। আমার যা বলবার কথা তা আমাকে বলতেই হবে।

'আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি, কিন্তু দেখবার মতো দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম ঘটল। চোখের উপরে ঘুমের পর্দা টানা ছিল ; তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছ— আজ আমি নবজাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখলুম, যে-তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার তা পেয়েছি, আর কিছু চাই নে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হতুম তা হলে আমার এই স্তব চিঠিতে তোমাকে লেখবার দরকার হত না, ছন্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগতের কণ্ঠে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতুম। আমার এ চিঠির কোনো উত্তর দেবে না, জানি— কিন্তু, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারি, এমন সন্দেহমাত্র মনে না রেখে আমার পূজা নীরবে গ্রহণ কোরো। আমার এই শ্রদ্ধাকে যদি তুমি শ্রদ্ধা করতে পার তাতে তোমারও ভালো হবে। আমি

কে, সে কথা লেখবার দরকার নেই, কিন্তু নিশ্চয়ই তা তোমার মনের কাছে গোপন থাকবে না।'

এমন পঁচিশখানি চিঠি। এর কোনো চিঠির উত্তর যে অনিলের কাছ থেকে গিয়েছিল, এ চিঠিগুলির মধ্যে তার কোনো নিদর্শন নেই। যদি যেত তা হলে তখনি বেসুর বেজে উঠত— কিংবা তা হলে সোনার কাঠির জাদু একেবারে ভেঙে স্তবগান নীরব হত।

কিন্তু, এ কী আশ্চর্য। সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেছে, আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখলুম। আমার চোখের উপরকার ঘুমের পর্দা কত মোটা পর্দা না জানি! পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেয়েছিলুম, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিই নি। আমি আমার দ্বৈতদলকে এবং নব্যন্যায়কে তার চেয়ে অনেক বড়ো করে দেখেছি। সুতরাং যাকে আমি কোনো দিনই দেখি নি, এক নিমেষের জন্যও পাই নি, তাকে আর-কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কী বলে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করব।

শেষ চিঠিখানা এই—

'বাইরে থেকে আমি তোমার কিছুই জানি নে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেছি তোমার বেদনা। এইখানে বড়ো কঠিন আমার পরীক্ষা। আমার এই পুরুষের বাহু নিশ্চেষ্ট থাকতে চায় না। ইচ্ছা করে, স্বর্গমর্তের সমস্ত শাসন বিদীর্ণ করে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার করে আনি। তার পরে এও মনে হয়, তোমার দুঃখই তোমার অন্তর্যামীর আসন। সেটি হরণ করবার অধিকার আমার নেই। কাল ভোরবেলা পর্যন্ত মেয়াদ নিয়েছি। এর মধ্যে যদি কোনো দৈববাণী আমার এই দ্বিধা মিটিয়ে দেয় তা হলে যা হয় একটা কিছু হবে। বাসনার প্রবল হাওয়ায় আমাদের পথ চলবার প্রদীপকে নিবিয়ে দেয়। তাই আমি মনকে শান্ত রাখব— একমনে এই মন্তর জপ করব যে, তোমার কল্যাণ হোক।'

বোঝা যাচ্ছে দ্বিধা দূর হয়ে গেছে— দুজনার পথ এক হয়ে মিলেছে। মাঝের থেকে সিতাংশুর লেখা এই চিঠিগুলি আমারই চিঠি হয়ে উঠল— ওগুলি আজ আমারই প্রাণের স্তবমন্ত্র।

কত কাল চলে গেল, বই পড়তে আর ভালো লাগে না। অনিলকে একবার কোনোমতে দেখবার জন্যে মনের মধ্যে এমন বেদনা উপস্থিত হল কিছুতেই স্থির থাকতে পারলুম না। খবর নিয়ে জানলুম সিতাংশু তখন মসুরি-পাহাড়ে।

সেখানে গিয়ে সিতাংশুকে অনেকবার পথে বেড়াতে দেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে তো অনিলকে দেখি নি। ভয় হল পাছে তাকে অপমান ক'রে ত্যাগ করে থাকে। আমি থাকতে না পেরে একেবারে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। সব কথা বিস্তারিত করে লেখবার দরকার নেই। সিতাংশু বললে, "আমি তাঁর কাছ থেকে জীবনে কেবল একটিমাত্র চিঠি পেয়েছি— সেটি এই দেখুন।"

এই ব'লে সিতাংশু তার পকেট থেকে একটি ছোটো এনামেল-করা সোনার কার্ডকেস খুলে তার ভিতর থেকে এক-টুকরো কাগজ বের করে দিলে। তাতে লেখা আছে, 'আমি চললুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খোঁজ পাবে না।'

সেই অক্ষর সেই লেখা, সেই তারিখ এবং যে নীলরঙের চিঠির কাগজের অর্ধেকখানা আমার কাছে এই টুকরোটি তারই বাকি অর্ধেক।

আষাঢ় ১৩২৪

পাত্র ও পাত্রী

ইতিপূর্বে প্রজাপতি কখনো আমার কপালে বসেন নি বটে, কিন্তু একবার আমার মানসপদ্মে বসেছিলেন। তখন আমার বয়স ষোলো। তার পরে, কাঁচা ঘুমে চমক লাগিয়ে দিলে যেমন ঘুম আর আসতে চায় না, আমার সেই দশা হল। আমার বন্ধুবান্ধবরা কেউ কেউ দারপরিগ্রহ ব্যাপারে দ্বিতীয় এমন-কি, তৃতীয় পক্ষে প্রোমোশন পেলেন; আমি কৌমার্যের লাস্ট্ বেঞ্চিতে বসে শূন্য সংসারের কড়িকাঠ গণনা করে কাটিয়ে দিলুম।

আমি চোদ্দ বছর বয়সে এন্‌ট্রেন্স পাস করেছিলুম। তখন বিবাহ কিংবা এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় বয়সবিচার ছিল না। আমি কোনোদিন পড়ার বই গিলি নি, সেইজন্যে শারীরিক বা মানসিক অজীর্ণ রোগে আমাকে ভুগতে হয় নি। ইঁদুর যেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই সেটাকে কেটে-কুটে ফেলে, তা সেটা খাদ্যই হোক আর অখাদ্যই হোক, শিশুকাল থেকেই তেমনি ছাপার বই দেখলেই সেটা পড়ে ফেলা আমার স্বভাব ছিল। সংসারে পড়ার বইয়ের চেয়ে না-পড়ার বইয়ের সংখ্যা ঢের বেশি, এইজন্য আমার পুঁথির সৌরজগতে স্কুল-পাঠ্য পৃথিবীর চেয়ে বেস্কুল-পাঠ্য সূর্য চোদ্দ লক্ষগুণে বড়ো ছিল। তবু, আমার সংস্কৃত-পণ্ডিতমশায়ের নিদারুণ ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্ত্বেও, আমি পরীক্ষায় পাস করেছিলুম।

আমার বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তখন আমরা ছিলেম সাতক্ষীরায় কিংবা জাহানাবাদে কিংবা ঐরকম কোনো-একটি জায়গায়। গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো, দেশ কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে আমার এই ইতিহাসে যে-কোনো স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে তার সবগুলোই সুস্পষ্ট মিথ্যা, যাঁদের রসবোধের চেয়ে কৌতূহল বেশি তাঁদের ঠকতে হবে। বাবা তখন তদন্তে বেরিয়েছিলেন। মায়ের ছিল কী-একটা ব্রত; দক্ষিণা এবং ভোজনব্যবস্থার জন্য ব্রাহ্মণ তাঁর দরকার। এইরকম পারমার্থিক প্রয়োজনে আমাদের পণ্ডিতমশায় ছিলেন মায়ের প্রধান সহায়। এইজন্য মা তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন, যদিচ বাবার মনের ভাব ছিল ঠিক তার উলটো।

আজ আহারান্তে দানদক্ষিণার যে ব্যবস্থা হল তার মধ্যে আমিও তালিকাভুক্ত হলুম। সে পক্ষে যে-আলোচনা হয়েছিল তার মর্মটা এই— আমার তো কলকাতায় কলেজে যাবার সময় হল। এমন অবস্থায় পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করবার জন্যে একটা সদুপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। যদি একটি শিশুবধূ মায়ের কোলের কাছে থাকে তবে তাকে মানুষ ক'রে, যত্ন ক'রে তাঁর দিন কাটতে পারে। পণ্ডিতমশায়ের মেয়ে কাশীশ্বরী এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত— কারণ, সে শিশুও বটে, সুশীলাও বটে, আর কুলশাস্ত্রের গণিতে তার সঙ্গে আমার অঙ্কে অঙ্কে মিল। তা ছাড়া ব্রাহ্মণের কন্যাদায়মোচনের পারমার্থিক ফলও লোভের সামগ্রী।

মায়ের মন বিচলিত হল। মেয়েটিকে একবার দেখা কর্তব্য এমন আভাস দেবামাত্র পণ্ডিতমশায় বললেন, তাঁর 'পরিবার' কাল রাত্রেই মেয়েটিকে নিয়ে বাসায় এসে পৌঁচেছেন। মায়ের পছন্দ হতে দেরি হল না; কেননা, রুচির সঙ্গে পুণ্যের বাটখারার যোগ হওয়াতে সহজেই ওজন ভারী হল। মা বললেন, মেয়েটি সুলক্ষণা— অর্থাৎ, যথেষ্টপরিমাণ সুন্দরী না হলেও সান্ত্বনার কারণ আছে।

কথাটা পরম্পরায় আমার কানে উঠল। যে-পণ্ডিতমশায়ের ধাতুরূপকে বরাবর ভয় করে এসেছি তাঁরই কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ— এরই বিসদৃশতা আমার মনকে প্রথমেই প্রবল বেগে আকর্ষণ করলে। রূপকথার গল্পের মতো হঠাৎ সুবন্ত-প্রকরণ যেন তার সমস্ত অনুস্বার বিসর্গ ঝেড়ে ফেলে একেবারে রাজকন্যা হয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে মা তাঁর ঘরে আমাকে ডাকিয়ে বললেন, "সনু, পণ্ডিতমশায়ের বাসা থেকে আম আর মিষ্টি এসেছে, খেয়ে দেখ্।"

মা জানতেন, আমাকে পঁচিশটা আম খেতে দিলে আর-পঁচিশটার দ্বারা তার পাদপূরণ করলে তবে আমার ছন্দ মেলে। তাই তিনি রসনার সরস পথ দিয়ে আমার হৃদয়কে আহ্বান করলেন। কাশীশ্বরী তাঁর কোলে বসেছিল। স্মৃতি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কিন্তু মনে আছে— রাংতা দিয়ে তার

খোঁপা মোড়া, আর গায়ে কলকাতার দোকানের এক সাটিনের জ্যাকেট— সেটা নীল এবং লাল এবং লেস্ এবং ফিতের একটা প্রত্যক্ষ প্রলাপ। যতটা মনে পড়ছে— রঙ শাম্‌লা ; ভুরু-জোড়া খুব ঘন ; এবং চোখদুটো পোষা প্রাণীর মতো, বিনা সংকোচে তাকিয়ে আছে। মুখের বাকি অংশ কিছুই মনে পড়ে না— বোধ হয় বিধাতার কারখানায় তার গড়ন তখনো সারা হয় নি, কেবল একমেটে করে রাখা হয়েছে। আর যাই হোক, তাকে দেখতে নেহাত ভালোমানুষের মতো।

আমার বুকের ভিতরটা ফুলে উঠল। মনে মনে বুঝলুম, ঐ রাংতা-জড়ানো বেণীওয়ালা জ্যাকেট-মোড়া সামগ্রীটি ষোলো-আনা আমার— আমি ওর প্রভু, আমি ওর দেবতা। অন্য সমস্ত দুর্লভ সামগ্রীর জন্যেই সাধনা করতে হয়, কেবল এই একটি জিনিসের জন্য নয় ; আমি কড়ে আঙুল নড়ালেই হয় ; বিধাতা এই বর দেবার জন্যে আমাকে সেধে বেড়াচ্ছেন। মা'কে যে আমি বরাবর দেখে আসছি, স্ত্রী বলতে কী বোঝায় তা আমার ঐ সূত্রে জানা ছিল। দেখেছি, বাবা অন্য সমস্ত ব্রতের উপর চটা ছিলেন কিন্তু সাবিত্রীব্রতের বেলায় তিনি মুখে যাই বলুন, মনে মনে বেশ একটু আনন্দ বোধ করতেন। মা তাঁকে ভালোবাসতেন তা জানি, কিন্তু কিসে বাবা রাগ করবেন, কিসে তাঁর বিরক্তি হবে, এইটেকে মা যে একান্ত মনে ভয় করতেন, এরই রসটুকু বাবা তাঁর সমস্ত পৌরুষ দিয়ে সব চেয়ে উপভোগ করতেন। পূজাতে দেবতাদের বোধ হয় বড়ো-একটা-কিছু আসে যায় না, কেননা সেটা তাঁদের বৈধ বরাদ্দ। কিন্তু মানুষের নাকি ওটা অবৈধ পাওনা, এইজন্যে ঐটের লোভে তাদের অসামাল করে। সেই বালিকার রূপগুণের টান সেদিন আমার উপরে পৌঁছয় নি, কিন্তু আমি যে পূজনীয় সে কথাটা সেই চোদ্দ বছর বয়সে আমার পুরুষের রক্তে গাঁজিয়ে উঠল। সেদিন খুব গৌরবের সঙ্গেই আমগুলো খেলুম, এমন-কি, সগর্বে তিনটে আম পাতে বাকি রাখলুম, যা আমার জীবনে কখনো ঘটে নি ; এবং তার জন্যে সমস্ত অপরাহ্ণকালটা অনুশোচনায় গেল।

সেদিন কাশীশ্বরী খবর পায় নি আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কোন্ শ্রেণীর— কিন্তু বাড়ি গিয়েই বোধ হয় জানতে পেরেছিল। তার পরে যখনই তার সঙ্গে দেখা হত সে শশব্যস্ত হয়ে লুকোবার জায়গা পেত না। আমাকে দেখে তার এই ত্রস্ততা আমার খুব ভালো লাগত। আমার আবির্ভাব বিশ্বের কোনো-একটা জায়গায় কোনো-একটা আকারে খুব একটা প্রবল প্রভাব সঞ্চার করে, এই জৈব-রাসায়নিক তথ্যটা আমার কাছে বড়ো মনোরম ছিল। আমাকে দেখেও যে কেউ ভয় করে বা লজ্জা করে, বা কোনো একটা-কিছু করে, সেটা বড়ো অপূর্ব। কাশীশ্বরী তার পালানোর দ্বারাই আমাকে জানিয়ে যেত, জগতের মধ্যে সে বিশেষভাবে সম্পূর্ণভাবে এবং নিগূঢ়ভাবে আমারই।

এতকালের অকিঞ্চিৎকরতা থেকে হঠাৎ এক মুহূর্তে এমন একান্ত গৌরবের পদ লাভ ক'রে কিছুদিন আমার মাথার মধ্যে রক্ত ঝাঁঝাঁ করতে লাগল। বাবা যেরকম মাকে কর্তব্যের বা রন্ধনের বা ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে সর্বদা ব্যাকুল করে তুলেছেন, আমিও মনে মনে তারই ছবির উপরে দাগা বুলোতে লাগলুম। বাবার অনভিপ্রেত কোনো-একটা লক্ষ্য সাধন করবার সময় মা যেরকম সাবধানে নানাপ্রকার মনোহর কৌশলে কাজ উদ্ধার করতেন, আমি কল্পনায় কাশীশ্বরীকেও সেই পথে প্রবৃত্ত হতে দেখলুম। মাঝে মাঝে মনে মনে তাকে অকাতরে এবং অকস্মাৎ মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্কনোট থেকে আরম্ভ ক'রে হীরের গয়না পর্যন্ত দান করতে আরম্ভ করলুম। এক-একদিন ভাত খেতে ব'সে তার খাওয়াই হল না এবং জানলার ধারে ব'সে আঁচলের খুঁট দিয়ে সে চোখের জল মুচছে, এই করুণ দৃশ্যও আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলুম এবং এটা যে আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হল তা বলতে পারি নে। ছোটো ছেলেদের আত্মনির্ভরতার সম্বন্ধে বাবা অত্যন্ত বেশি সতর্ক ছিলেন। নিজের ঘর ঠিক করা, নিজের কাপড়চোপড় রাখা সমস্তই আমাকে নিজের হাতে করতে হত। কিন্তু আমার মনের মধ্যে গার্হস্থ্যের যে-চিত্রগুলি স্পষ্ট রেখায় জেগে উঠল, তার মধ্যে একটি নীচে লিখে রাখছি। বলা বাহুল্য, আমার পৈতৃক ইতিহাসে ঠিক এইরকম ঘটনাই পূর্বে একদিন ঘটেছিল ; এই কল্পনার মধ্যে আমার ওরিজিন্যালিটি কিছুই নেই। চিত্রটি এই— রবিবারে মধ্যাহ্নভোজনের পর আমি খাটের উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছি। হাতে গুড়গুড়ির নল। ঈষৎ

তন্দ্রাবেশে নলটা নীচে পড়ে গেল। বারান্দায় বসে কাশীশ্বরী ধোবাকে কাপড় দিচ্ছিল, আমি তাকে ডাক দিলুম ; সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাতে নল তুলে দিলে। আমি তাকে বললুম, 'দেখো, আমার বসবার ঘরের বাঁদিকের আলমারির তিনের থাকে একটা নীল রঙের মলাট-দেওয়া মোটা ইংরাজি বই আছে, সেইটে নিয়ে এসো তো।' কাশী একটা নীল রঙের বই এনে দিলে ; আমি বললুম, 'আঃ, এটা নয় ; সে এর চেয়ে মোটা, আর তার পিঠের দিকে সোনালি অক্ষরে নাম লেখা।' এবারে সে একটা সবুজ রঙের বই আনলে— সেটা আমি ধপাস্ করে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে রেগে উঠে পড়লুম। তখন কাশীর মুখ এতটুকু হয়ে গেল এবং তার চোখ ছল্‌ছল্ করে উঠল। আমি গিয়ে দেখলুম, তিনের শেল্‌ফে বইটা নেই, সেটা আছে পাঁচের শেল্‌ফে। বইটা হাতে করে নিয়ে এসে নিঃশব্দে বিছানায় শুলুম কিন্তু কাশীকে ভুলের কথা কিছু বললুম না। সে মাথা হেঁট করে বিমর্ষ হয়ে ধোবাকে কাপড় দিতে লাগল এবং নির্বুদ্ধিতার দোষে স্বামীর বিশ্রামে ব্যাঘাত করেছে, এই অপরাধ কিছুতেই ভুলতে পারলে না।

বাবা ডাকাতি তদন্ত করছেন, আর আমার এইভাবে দিন যাচ্ছে। এ দিকে আমার সম্বন্ধে পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহার আর ভাষা এক মুহূর্তে কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে এসে পৌঁছল এবং সেটা নিরতিশয় সদ্ভাববাচ্য।

এমন সময় ডাকাতি তদন্ত শেষ হয়ে গেল, বাবা ঘরে ফিরে এলেন। আমি জানি, মা আস্তে আস্তে সময় নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাবার বিশেষ প্রিয় তরকারি-রান্নার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে কথাটাকে পাড়বেন বলে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। বাবা পণ্ডিতমশায়কে অর্থলুব্ধ ব'লে ঘৃণা করতেন ; মা নিশ্চয়ই প্রথমে পণ্ডিতমশায়ের মৃদুরকম নিন্দা অথচ তাঁর স্ত্রী ও কন্যার প্রচুর রকমের প্রশংসা করে কথাটার গোড়াপত্তন করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পণ্ডিতমশায়ের আনন্দিত প্রগল্‌ভতায় কথাটা চারি দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বিবাহ যে পাকা, দিনক্ষণ দেখা চলছে, এ কথা তিনি কাউকে জানাতে বাকি রাখেন নি। এমন-কি, বিবাহকালে সেরেস্তাদার বাবুর পাকা দালানটি কয়দিনের জন্যে তাঁর প্রয়োজন হবে, যথাস্থানে সে আলোচনাও তিনি সেরে রেখেছেন। শুভকর্মে সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে। বাবার আদালতের উকিলের দল চাঁদা করে বিবাহের ব্যয় বহন করতেও রাজি। স্থানীয় এন্‌ট্রেন্স-স্কুলের সেক্রেটারি বীরেশ্বরবাবুর তৃতীয় ছেলে তৃতীয় ক্লাসে পড়ে, সে চাঁদ ও কুমুদের রূপক অবলম্বন করে এরই মধ্যে বিবাহসম্বন্ধে ত্রিপদীছন্দে একটা কবিতা লিখেছে। সেক্রেটারিবাবু সেই কবিতাটা নিয়ে রাস্তায় ঘাটে যাকে পেয়েছেন তাকে ধরে ধরে শুনিয়েছেন। ছেলেটির সম্বন্ধে গ্রামের লোক খুব আশান্বিত হয়ে উঠেছে।

সুতরাং ফিরে এসেই বাইরে থেকেই বাবা শুভসংবাদ শুনতে পেলেন। তার পরে মায়ের কান্না এবং অনাহার, বাড়ির সকলের ভীতিবিহ্বলতা, চাকরদের অকারণ জরিমানা, এজ্‌লাসে প্রবলবেগে মামলা ডিস্‌মিস এবং প্রচণ্ড তেজে শাস্তিদান, পণ্ডিতমশায়ের পদচ্যুতি এবং রাংতা-জড়ানো বেণী-সহ কাশীশ্বরীকে নিয়ে তাঁর অন্তর্ধান ; এবং ছুটি ফুরোবার পূর্বেই মাতৃসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে সবলে কলকাতায় নির্বাসন। আমার মনটা ফাটা ফুটবলের মতো চুপসে গেল— আকাশে আকাশে, হাওয়ার উপরে তার লাফালাফি একেবারে বন্ধ হল।

২

আমার পরিণয়ের পথে গোড়াতেই এই বিঘ্ন— তার পরে আমার প্রতি বারেবারেই প্রজাপতির ব্যর্থ-পক্ষপাত ঘটেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করি নে— আমার এই বিফলতার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত নোট দুটো-একটা রেখে যাব। বিশ বছর বয়সের পূর্বেই আমি পুরা দমে এম· এ· পরীক্ষা পাস করে চোখে চশমা পরে এবং গোঁফের রেখাটাকে তা দেবার যোগ্য করে বেরিয়ে এসেছি। বাবা তখন রামপুরহাট কিংবা নোয়াখালি কিংবা বারাসত কিংবা ঐরকম কোনো-একটা জায়গায়।

এতদিন তো শব্দসাগর মন্থন করে ডিগ্রিরত্ন পাওয়া গেল, এবার অর্থসাগর-মন্থনের পালা। বাবা তাঁর বড়ো বড়ো পেট্রন সাহেবদের স্মরণ করতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর সব চেয়ে বড়ো সহায় যিনি তিনি পরলোকে, তাঁর চেয়ে যিনি কিছু কম তিনি পেন্সন নিয়ে বিলেতে, যিনি আরো কমজোরী তিনি পাঞ্জাবে বদলি হয়েছেন, আর যিনি বাংলাদেশে বাকি আছেন তিনি অধিকাংশ উমেদারকেই উপক্রমণিকায় আশ্বাস দেন কিন্তু উপসংহারে সেটা সংহরণ করেন। আমার পিতামহ যখন ডিপুটি ছিলেন তখন মুরুব্বির বাজার এমন কষা ছিল না তাই তখন চাকরি থেকে পেন্সন এবং পেন্সন থেকে চাকরি একই বংশে খেয়া-পারাপারের মতো চলত। এখন দিন খারাপ, তাই বাবা যখন উদ্‌বিগ্ন হয়ে ভাবছিলেন যে, তাঁর বংশধর গভর্মেন্টি আপিসের উচ্চ খাঁচা থেকে সওদাগরি আপিসের নিম্ন দাঁড়ে অবতরণ করবে কি না, এমন সময় এক ধনী ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা তাঁর নোটিশে এল। ব্রাহ্মণটি কনট্র্যাক্টর, তাঁর অর্থাগমের পথটি প্রকাশ্য ভূতলের চেয়ে অদৃশ্য রসাতলের দিক দিয়েই প্রশস্ত ছিল। তিনি সে সময়ে বড়োদিন উপলক্ষে কমলা লেবু ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী যথাযোগ্য পাত্রে বিতরণ করতে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর পাড়ায় আমার অভ্যুদয় হল। বাবার বাসা ছিল তাঁর বাড়ির সামনেই, মাঝে ছিল এক রাস্তা। বলা বাহুল্য, ডেপুটির এম· এ· পাস-করা ছেলে কন্যাদায়িকের পক্ষে খুব 'প্রাংশুলভ্য ফল।' এইজন্যে কনট্র্যাক্টর বাবু আমার প্রতি 'উদ্বাহু' হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বাহু আধূলিলম্বিত ছিল সে পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি— অন্তত সে বাহু ডেপুটিবাবুর হৃদয় পর্যন্ত অতি অনায়াসে পৌঁছল। কিন্তু, আমার হৃদয়টা তখন আরো অনেক উপরে ছিল।

কারণ, আমার বয়স তখন কুড়ি পেরোয়-পেরোয়; তখন খাঁটি স্ত্রীরত্ন ছাড়া অন্য কোনো রত্নের প্রতি আমার লোভ ছিল না। শুধু তাই নয়, তখনো ভাবুকতার দীপ্তি আমার মনে উজ্জ্বল। অর্থাৎ, সহধর্মিণী শব্দের যে-অর্থ আমার মনে ছিল সে-অর্থটা বাজারে চলতি ছিল না। বর্তমান কালে আমাদের দেশে সংসারটা চার দিকেই সংকুচিত; মননসাধনের বেলায় মনকে জ্ঞান ও ভাবের উদার ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত করে রাখা আর ব্যবহারের বেলায় তাকে সেই সংসারের অতি ছোটো মাপে কৃশ করে আনা, এ আমি মনে মনেও সহ্য করতে পারতুম না। যে-স্ত্রীকে আইডিয়ালের পথে সঙ্গিনী করতে চাই সেই স্ত্রী ঘরকন্নার গারদে পায়ের বেড়ি হয়ে থাকবে এবং প্রত্যেক চলাফেরায় ঝংকার দিয়ে পিছনে টেনে রাখবে, এমন দুর্গ্রহ আমি স্বীকার করে নিতে নারাজ ছিলুম। আসল কথা, আমাদের দেশের প্রহসনে যাদের আধুনিক ব'লে বিদ্রূপ করে কলেজ থেকে টাটকা বেরিয়ে আমি সেইরকম নিরবচ্ছিন্ন আধুনিক হয়ে উঠেছিলুম। আমাদের কালে সেই আধুনিকের দল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। আশ্চর্য এই যে, তারা সত্যই বিশ্বাস করত যে, সমাজকে মেনে চলাই দুর্গতি এবং তাকে টেনে চলাই উন্নতি।

এ-হেন আমি শ্রীযুক্ত সনৎকুমার, একটি ধনশালী কন্যাদায়িকের টাকার থলির হাঁ-করা মুখের সামনে এসে পড়লুম। বাবা বললেন, শুভস্য শীঘ্রং। আমি চুপ করে রইলুম; মনে মনে ভাবলুম, একটু দেখে-শুনে বুঝে-পড়ে নিই। চোখ কান খুলে রাখলুম— কিছু পরিমাণ দেখা এবং অনেকটা পরিমাণ শোনা গেল। মেয়েটি পুতুলের মতো ছোটো এবং সুন্দর— সে যে স্বভাবের নিয়মে তৈরি হয়েছে তা তাকে দেখে মনে হয় না— কে যেন তার প্রত্যেক চুলটি পাট ক'রে, তার ভুরুটি এঁকে, তাকে হাতে করে গড়ে তুলেছে। সে সংস্কৃতভাষায় গঙ্গার স্তব আবৃত্তি করে পড়তে পারে। তার মা পাথুরে কয়লা পর্যন্ত গঙ্গার জলে ধুয়ে তবে রাঁধেন; জীবধাত্রী বসুন্ধরা নানা জাতিকে ধারণ করেন বলে পৃথিবীর সংস্পর্শ সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সংকুচিত; তাঁর অধিকাংশ ব্যবহার জলেরই সঙ্গে, কারণ জলচর মৎস্যরা মুসলমান-বংশীয় নয় এবং জলে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় না। তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কাজ আপনার দেহকে গৃহকে কাপড়চোপড় হাঁড়িকুঁড়ি খাটপালঙ বাসনকোসনকে শোধন এবং মার্জন করা। তাঁর সমস্ত কৃত্য সমাপন করতে বেলা আড়াইটে হয়ে যায়। তাঁর মেয়েটিকে তিনি স্বহস্তে সর্বাংশে এমনি পরিশুদ্ধ করে তুলেছেন যে, তার নিজের মত বা নিজের ইচ্ছা বলে কোনো উৎপাত ছিল না। কোনো ব্যবস্থায় যত অসুবিধাই হোক, সেটা পালন করা তার পক্ষে সহজ হয় যদি তার কোনো

সংগত কারণ তাকে বুঝিয়ে না দেওয়া যায়। সে খাবার সময় ভালো কাপড় পরে না পাছে সক্‌ড়ি হয়; সে ছায়া সম্বন্ধেও বিচার করতে শিখেছে। সে যেমন পালকির ভিতরে বসেই গঙ্গাস্নান করে, তেমনি অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে আবৃত থেকে সংসারে চলে ফেরে। বিধি-বিধানের 'পরে আমারও মায়ের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু তাঁর চেয়ে আরো বেশি শ্রদ্ধা যে আর-কারও থাকবে এবং তাই নিয়ে সে মনে মনে গুমর করবে, এটা তিনি সইতে পারতেন না। এইজন্যে আমি যখন তাঁকে বললুম "মা, এ মেয়ের যোগ্যপাত্র আমি নই", তিনি হেসে বললেন, "না, কলিযুগে তেমন পাত্র মেলা ভার!"

আমি বললুম, "তা হলে আমি বিদায় নিই।"

মা বললেন, "সে কি, সুনু, তোর পছন্দ হল না? কেন, মেয়েটিকে তো দেখতে ভালো।"

আমি বললুম, "মা, স্ত্রী তো কেবল চেয়ে চেয়ে দেখবার জন্যে নয়, তার বুদ্ধি থাকাও চাই।"

মা বললেন, "শোনো একবার। এরই মধ্যে তুই তার কম বুদ্ধির পরিচয় কী পেলি।"

আমি বললুম, "বুদ্ধি থাকলে মানুষ দিনরাত এই-সব অনর্থক অকাজের মধ্যে বাঁচতেই পারে না। হাঁপিয়ে মরে যায়।"

মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি জানেন, এই বিবাহ সম্বন্ধে বাবা অপর পক্ষে প্রায় পাকা কথা দিয়েছেন। তিনি আরো জানেন যে, বাবা এটা প্রায়ই ভুলে যান যে, অন্য মানুষেরও ইচ্ছে ব'লে একটা বালাই থাকতে পারে। বস্তুত, বাবা যদি অত্যন্ত বেশি রাগারাগি জবরদস্তি না করতেন তা হলে হয়তো কালক্রমে ঐ পৌরাণিক পুতুলকে বিবাহ করে আমিও একদিন প্রবল রোখে স্নান আহ্নিক এবং ব্রত-উপবাস করতে করতে গঙ্গাতীরে সদ্গতি লাভ করতে পারতুম। অর্থাৎ, মায়ের উপর যদি এই বিবাহ দেবার ভার থাকত তা হলে তিনি সময় নিয়ে, অতি ধীর মন্দ সুযোগে ক্ষণে ক্ষণে কানে মন্ত্র দিয়ে, ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুপাত ক'রে কাজ উদ্ধার করে নিতে পারতেন। বাবা যখন কেবলই তর্জন গর্জন করতে লাগলেন আমি তাঁকে মরিয়া হয়ে বললুম, 'ছেলেবেলা থেকে খেতে-শুতে চলতে-ফিরতে আমাকে আত্মনির্ভরতার উপদেশ দিয়েছেন, কেবল বিবাহের বেলাতেই কি আত্মনির্ভর চলবে না।' কলেজে লজিকে পাস করবার বেলায় ছাড়া ন্যায়শাস্ত্রের জোরে কেউ কোনোদিন সফলতা লাভ করেছে, এ আমি দেখি নি। সংগত যুক্তি কুতর্কের আগুনে কখনো জলের মতো কাজ করে না, বরঞ্চ তেলের মতোই কাজ করে থাকে। বাবা ভেবে রেখেছেন তিনি অন্য পক্ষকে কথা দিয়েছেন, বিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কিছুই নেই। অথচ আমি যদি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতুম যে, পণ্ডিতমশায়কে মাও একদিন কথা দিয়েছিলেন তবু সে কথায় শুধু যে আমার বিবাহ ফেঁসে গেল তা নয়, পণ্ডিতমশায়ের জীবিকাও তার সঙ্গে সহমরণে গেল— তা হলে এই উপলক্ষে একটা ফৌজদারি বাধত। বুদ্ধি বিচার এবং রুচির চেয়ে শুচিতা মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম যে ঢের ভালো, তার কবিত্ব যে সুগভীর ও সুন্দর, তার নিষ্ঠা যে অতি মহৎ, তার ফল যে অতি উত্তম, সিম্বলিজ্‌ম্‌টাই যে আইডিয়ালিজ্‌ম্‌, এ কথা বাবা আজকাল আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সময়ে অসময়ে আলোচনা করেছেন। আমি রসনাকে থামিয়ে রেখেছি কিন্তু মনকে তো চুপ করিয়ে রাখতে পারি নি। যে-কথাটা মুখের আগার কাছে এসে ফিরে যেত সেটা হচ্ছে এই যে, 'এ-সব যদি আপনি মানেন তবে পালবার বেলায় মুরগি পালেন কেন।' আরো একটা কথা মনে আসত; বাবাই একদিন দিনক্ষণ পালপার্বণ বিধিনিষেধ দানদক্ষিণা নিয়ে তাঁর অসুবিধা বা ক্ষতি ঘটলে মাকে কঠোর ভাষায় এ-সব অনুষ্ঠানের পণ্ডতা নিয়ে তাড়না করেছেন। মা তখন দীনতা স্বীকার করে অবলাজাতি স্বভাবতই অবুঝ ব'লে মাথা হেঁটে ক'রে বিরক্তির ধাক্কাটা কাটিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণভোজনের বিস্তারিত আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু বিশ্বকর্মা লজিকের পাকা ছাঁচে ঢালাই করে জীব সৃজন করেন নি। অতএব কোনো মানুষের কথায় বা কাজে সংগতি নেই এ কথা বলে তাকে বাগিয়ে নেওয়া যায় না, রাগিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। ন্যায়শাস্ত্রের দোহাই পাড়লে অন্যায়ের প্রচণ্ডতা বেড়ে ওঠে— যারা পোলিটিকাল বা গার্হস্থ্য অ্যাজিটেশনে শ্রদ্ধাবান তাদের এ কথাটা মনে রাখা উচিত। ঘোড়া যখন তার পিছনের গাড়িটাকে অন্যায় মনে ক'রে তার উপরে লাথি চালায় তখন অন্যায়টা তো থেকেই যায়, মাঝের থেকে তার

পা'কেও জখম করে। যৌবনের আবেগে অল্প একটুখানি তর্ক করতে গিয়ে আমার সেই দশা হল। পৌরাণিকী মেয়েটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বাবার আধুনিক যুগের তহবিলের আশ্রয়ও খোওয়ালুম। বাবা বললেন, "যাও, তুমি আত্মনির্ভর করো গে।"

আমি প্রণাম করে বললুম, "যে আজ্ঞে।"

মা বসে বসে কাঁদতে লাগলেন।

বাবার দক্ষিণ হস্ত বিমুখ হল বটে কিন্তু মাঝখানে মা থাকাতে ক্ষণে ক্ষণে মানি-অর্ডারের পেয়াদার দেখা পাওয়া যেত। মেঘ বর্ষণ বন্ধ করে দিলে, কিন্তু গোপনে স্নিগ্ধ রাত্রে শিশিরের অভিষেক চলতে লাগল। তারই জোরে ব্যাবসা শুরু করে দিলুম। ঠিক উনআশি টাকা দিয়ে গোড়াপত্তন হল ; আজ সেই কারবারে যে-মূলধন খাটছে তা ঈর্ষাকাতর জনশ্রুতির চেয়ে অনেক কম হলেও, বিশ লক্ষ টাকার চেয়ে কম নয়।

প্রজাপতির পেয়াদারা আমার পিছন পিছন ফিরতে লাগল। আগে যে-সব দ্বার বন্ধ ছিল এখন তার আর আগল রইল না। মনে আছে, একদিন যৌবনের দুর্নিবার দুরাশায় একটি ষোড়শীর প্রতি (বয়সের অঙ্কটা এখনকার নিষ্ঠাবান পাঠকদের ভয়ে কিছু সহনীয় করে বললুম) আমার হৃদয়কে উন্মুখ করেছিলুম কিন্তু খবর পেয়েছিলুম, কন্যার মাতৃপক্ষ লক্ষ্য করে আছেন সিবিলিয়ানের প্রতি— অন্তত ব্যারিস্টারের নীচে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছয় না। আমি তাঁর মনোযোগ-মীটরের জিরো-পয়েন্টের নীচে ছিলুম। কিন্তু, পরে সেই ঘরেই অন্য একদিন শুধু চা নয়, লাঞ্চ খেয়েছি, রাত্রে ডিনারের পর মেয়েদের সঙ্গে হুইস্‌ট্ খেলেছি, তাদের মুখে বিলেতের একেবারে খাস মহলের ইংরেজি ভাষার কথাবার্তা শুনেছি। আমার মুশকিল এই যে, র‍্যাসেলস, ডেজার্টেড ভিলেজ এবং অ্যাডিসন্ স্টীল প'ড়ে আমি ইংরিজি পাকিয়েছি, এই মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার কর্ম নয়। O my, O dear O dear প্রভৃতি উদ্ভাষণগুলো আমার মুখ দিয়ে ঠিক সুরে বেরোতেই চায় না। আমার যতটুকু বিদ্যা তাতে আমি অত্যন্ত হাল ইংরেজি ভাষায় বড়োজোর হাটে-বাজারে কেনা-বেচা করতে পারি, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংরিজিতে প্রেমালাপ করার কথা মনে করলে আমার প্রেমই দৌড় মারে। অথচ এদের মুখে বাংলাভাষার যেরকম দুর্ভিক্ষ তাতে এদের সঙ্গে খাঁটি বঙ্কিমি সুরে মধুরালাপ করতে গেলে ঠকতে হবে। তাতে মজুরি পোষাবে না। তা যাই হোক, এই-সব বিলিতি গিল্টি-করা মেয়ে একদিন আমার পক্ষে সুলভ হয়েছিল। কিন্তু রুদ্ধ দরজার ফাঁকের থেকে যে মায়াপুরী দেখেছিলুম দরজা যখন খুলল তখন আর তার ঠিকানা পেলুম না। তখন আমার কেবল মনে হতে লাগল, সেই যে আমার ব্রতচারিণী নিরর্থক নিয়মের নিরন্তর পুনরাবৃত্তির পাকে অহোরাত্র ঘুরে ঘুরে আপনার জড়বুদ্ধিকে তৃপ্ত করত, এই মেয়েরাও ঠিক সেই বুদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদবকায়দার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসর্গগুলিকে প্রদক্ষিণ করে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, অনায়াসে অক্লান্তচিত্তে কাটিয়ে দিচ্ছে। তারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমাত্র স্খলন দেখলে অশ্রদ্ধায় কণ্টকিত হয়ে উঠত, এরাও তেমনি এক্‌সেন্টের একটু খুঁত কিংবা কাঁটা-চামচের অল্প বিপর্যয় দেখলে ঠিক তেমনি করেই অপরাধীর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তারা দিশি পুতুল, এরা বিলিতি পুতুল। মনের গতিবেগে এরা চলে না, অভ্যাসের দম-দেওয়া কলে এদের চালায়। ফল হল এই যে, মেয়েজাতের উপরেই আমার মনে মনে অশ্রদ্ধা জন্মাল ; আমি ঠিক করলুম, ওদের বুদ্ধি যখন কম তখন স্নান-আচমন-উপবাসের অকর্ম-কাণ্ড প্রকাণ্ড না হলে ওরা বাঁচে কী করে। বইয়ে পড়েছি, একরকম জীবাণু আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে। কিন্তু, মানুষ ঘোরে না, মানুষ চলে। সেই জীবাণুর পরিবর্ধিত সংস্করণের সঙ্গেই কি বিধাতা হতভাগ্য পুরুষমানুষের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিয়েছেন।

এ দিকে বয়স যত বাড়তে চলল বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিধাও তত বেড়ে উঠল। মানুষের একটা বয়স আছে যখন সে চিন্তা না করেও বিবাহ করতে পারে। সে বয়স পেরোলে বিবাহ করতে দুঃসাহসিকতার দরকার হয়। আমি সেই বেপরোয়া দলের লোক নই। তা ছাড়া কোনো প্রকৃতিস্থ মেয়ে বিনা কারণে এক নিশ্বাসে আমাকে কেন যে বিয়ে করে ফেলবে আমি তা কিছুতেই ভেবে পাই নে। শুনেছি,

ভালোবাসা অন্ধ, কিন্তু এখানে সেই অন্ধের উপর তো কোনো ভার নেই। সংসারবুদ্ধির দুটো চোখের চেয়ে আরো বেশি চোখ আছে— সেই চক্ষু যখন বিনা নেশায় আমার দিকে তাকিয়ে দেখে তখন আমার মধ্যে কী দেখতে পায় আমি তাই ভাবি। আমার গুণ নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু সেগুলো তো ধরা পড়তে দেরি লাগে, এক চাহনিতেই বোঝা যায় না। আমার নাসার মধ্যে যে খর্বতা আছে বুদ্ধির উন্নতি তা পূরণ করেছে জানি, কিন্তু নাসাটাই থাকে প্রত্যক্ষ হয়ে, আর ভগবান বুদ্ধিকে নিরাকার করে রেখে দিলেন। যাই হোক, যখন দেখি, কোনো সাবালক মেয়ে অত্যল্প কালের নোটিশেই আমাকে বিয়ে করতে অত্যল্পমাত্র আপত্তি করে না, তখন মেয়েদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো কমে। আমি যদি মেয়ে হতুম তা হলে শ্রীযুৎ সনৎকুমারের নিজের খর্ব নাসার দীর্ঘনিশ্বাসে তার আশা এবং অহংকার ধূলিসাৎ হতে থাকত।

এমনি করে আমার বিবাহের বোঝাই-হীন নৌকাটা মাঝে মাঝে চড়ায় ঠেকেছে কিন্তু ঘাটে এসে পৌঁছয় নি। স্ত্রী ছাড়া সংসারের অন্যান্য উপকরণ ব্যাবসার উন্নতির সঙ্গে বেড়ে চলতে লাগল। একটা কথা ভুলে ছিলুম, বয়সও বাড়ছে। হঠাৎ একটা ঘটনায় সে কথা মনে করিয়ে দিলে।

অভ্রের খনির তদন্তে ছোটোনাগপুরের এক শহরে গিয়ে দেখি, পণ্ডিতমশায় সেখানে শালবনের ছায়ায় ছোট্ট একটি নদীর ধারে দিব্যি বাসা বেঁধে বসে আছেন। তাঁর ছেলে সেখানে কাজ করে। সেই শালবনের প্রান্তে আমার তাঁবু পড়েছিল। এখন দেশ জুড়ে আমার ধনের খ্যাতি। পণ্ডিতমশায় বললেন, কালে আমি যে অসামান্য হয়ে উঠব, এ তিনি পূর্বেই জানতেন। তা হবে, কিন্তু আশ্চর্যরকম গোপন করে রেখেছিলেন। তা ছাড়া কোন্ লক্ষণের দ্বারা জেনেছিলেন আমি তো তা বলতে পারি নে। বোধ করি অসামান্য লোকদের ছাত্র-অবস্থায় ষত্বণত্ব জ্ঞান থাকে না। কাশীশ্বরী শ্বশুরবাড়িতে ছিল, তাই বিনা বাধায় আমি পণ্ডিতমশায়ের ঘরের লোক হয়ে উঠলুম। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে— কিন্তু তিনি নাতনিতে পরিবৃত। সবগুলি তাঁর স্বকীয়া নয়, তার মধ্যে দুটি ছিল তাঁর পরলোকগত দাদার। বৃদ্ধ এদের নিয়ে আপনার বার্ধক্যের অপরাহ্নকে নানা রঙে রঙিন করে তুলেছেন। তাঁর অমরুশতক আর্যাসপ্তশতী হংসদূত পদাঙ্কদূতের শ্লোকের ধারা নুড়িগুলির চার দিকে গিরিনদীর ফেনোচ্ছল প্রবাহের মতো এই মেয়েগুলিকে ঘিরে ঘিরে সহাস্যে ধ্বনিত হয়ে উঠছে।

আমি হেসে বললুম, "পণ্ডিতমশায়, ব্যাপারখানা কী!"

তিনি বললেন, "বাবা, তোমাদের ইংরাজি শাস্ত্রে বলে যে, শনিগ্রহ চাঁদের মালা পরে থাকেন— এই আমার সেই চাঁদের মালা।"

সেই দরিদ্র ঘরের এই দৃশ্যটি দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আমি একা। বুঝতে পারলুম, আমি নিজের ভারে নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পণ্ডিতমশায় জানেন না যে তাঁর বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার যে হয়েছে সে আমি স্পষ্ট জানলুম। বয়স হয়েছে বলতে এইটে বোঝায়, নিজের চারি দিককে ছাড়িয়ে এসেছি— চার পাশে ঢিলে হয়ে ফাঁক হয়ে গেছে। সে ফাঁক টাকা দিয়ে, খ্যাতি দিয়ে, বোজানো যায় না। পৃথিবী থেকে রস পাচ্ছি নে কেবল বস্তু সংগ্রহ করছি, এর ব্যর্থতা অভ্যাসবশত ভুলে থাকা যায়। কিন্তু, পণ্ডিতমশায়ের ঘর যখন দেখলুম তখন বুঝলুম, আমার দিন শুষ্ক, আমার রাত্রি শূন্য। পণ্ডিতমশায় নিশ্চয় ঠিক করে বসে আছেন যে, আমি তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ— এই কথা মনে করে আমার হাসি এল। এই বস্তুজগৎকে ঘিরে একটি অদৃশ্য আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগসূত্র না থাকলে আমরা ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে থাকি। পণ্ডিতমশায়ের সেই যোগ আছে, আমার নেই, এই তফাত। আমি আরাম-কেদারার দুই হাতায় দুই পা তুলে দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে ভাবতে লাগলুম পুরুষের জীবনের চার আশ্রমের চার অধিদেবতা। বাল্যে মা ; যৌবনে স্ত্রী ; প্রৌঢ়ে কন্যা, পুত্রবধূ ; বার্ধক্যে নাতনি, নাতবউ। এমনি করে মেয়েদের মধ্য দিয়ে পুরুষ আপনার পূর্ণতা পায়। এই তত্ত্বটা মর্মরিত শালবনে আমাকে আবিষ্ট করে ধরল। মনের সামনে আমার ভাবী বৃদ্ধবয়সের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলুম— দেখে তার নিরতিশয় নীরসতায় হৃদয়টা হাহাকার করে উঠল। ঐ মরুপথের মধ্য দিয়ে মুনফার বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে কোথায় গিয়ে

মুখ থুবড়ে পড়ে মরতে হবে! আর দেরি করলে তো চলবে না। সম্প্রতি চল্লিশ পেরিয়েছি— যৌবনের শেষ থলিটি ঝেড়ে নেবার জন্যে পঞ্চাশ রাস্তার ধারে বসে আছে, তার লাঠির ডগাটা এইখান থেকে দেখা যাচ্ছে। এখন পকেটের কথাটা বন্ধ রেখে জীবনের কথা একটুখানি ভেবে দেখা যাক। কিন্তু, জীবনের যে-অংশে মুলতুবি পড়েছে সে-অংশে আর তো ফিরে যাওয়া চলবে না। তবু তার ছিন্নতায় তালি লাগাবার সময় এখনো সম্পূর্ণ যায় নি।

এখান থেকে কাজের গতিকে পশ্চিমের এক শহরে যেতে হল। সেখানে বিশ্বপতিবাবু ধনী বাঙালি মহাজন। তাঁকে নিয়ে আমার কাজের কথা ছিল। লোকটি খুব হুঁশিয়ার, সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোনো কথা পাকা করতে বিস্তর সময় লাগে। একদিন বিরক্ত হয়ে যখন ভাবছি 'একে নিয়ে আমার কাজের সুবিধা হবে না', এমন-কি, চাকরকে আমার জিনিসপত্র প্যাক করতে বলে দিয়েছি, হেনকালে বিশ্বপতিবাবু সন্ধ্যার সময় এসে আমাকে বললেন, "আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেকরকম লোকের আলাপ আছে, আপনি একটু মনোযোগ করলে একটি বিধবা বেঁচে যায়।"

ঘটনাটি এই।—

নন্দকৃষ্ণবাবু বেরেলিতে প্রথমে আসেন একটি বাঙালি-ইংরাজি স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে। কাজ করেছিলেন খুব ভালো। সকলেই আশ্চর্য হয়েছিল— এমন সুযোগ্য সুশিক্ষিত লোক দেশ ছেড়ে, এত দূরে সামান্য বেতনে চাকরি করতে এলেন কী কারণে। কেবল যে পরীক্ষা পাস করাতে তাঁর খ্যাতি ছিল তা নয়, সকল ভালো কাজেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। এমন সময় কেমন করে বেরিয়ে পড়ল, তাঁর স্ত্রীর রূপ ছিল বটে কিন্তু কুল ছিল না; সামান্য কোন্ জাতের মেয়ে, এমন-কি, তাঁর ছোঁওয়া লাগলে পানীয় জলের পানীয়তা এবং অন্যান্য নিগূঢ় সাত্ত্বিক গুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাঁকে যখন সবাই চেপে ধরলে তিনি বললেন, হাঁ, জাতে ছোটো বটে, কিন্তু তবু সে তাঁর স্ত্রী। তখন প্রশ্ন উঠল, এমন বিবাহ বৈধ হয় কী করে। যিনি প্রশ্ন করেছিলেন নন্দকৃষ্ণবাবু তাঁকে বললেন, "আপনি তো শালগ্রাম সাক্ষী করে পরে পরে দুটি স্ত্রী বিবাহ করেছেন, এবং দ্বিবচনেও সন্তুষ্ট নেই তার বহু প্রমাণ দিয়েছেন। শালগ্রামের কথা বলতে পারি নে কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, আমার বিবাহ আপনার বিবাহের চেয়ে বৈধ, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বৈধ— এর চেয়ে বেশি কথা আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই নে।"

যাকে নন্দকৃষ্ণ এই কথাগুলি বললেন তিনি খুশি হন নি। তার উপরে লোকের অনিষ্ট করবার ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য ছিল। সুতরাং সেই উপদ্রবে নন্দকৃষ্ণ বেরিলি ত্যাগ করে এই বর্তমান শহরে এসে ওকালতি শুরু করলেন। লোকটা অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিলেন— উপবাসী থাকলেও অন্যায় মকদ্দমা তিনি কিছুতেই নিতেন না। প্রথমটা তাতে তাঁর যত অসুবিধা হোক, শেষকালে উন্নতি হতে লাগল। কেননা, হাকিমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। একখানি বাড়ি করে একটু জমিয়ে বসেছেন এমন সময় দেশে মন্বন্তর এল। দেশ উজাড় হয়ে যায়। যাদের উপর সাহায্য বিতরণের ভার ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুরি করছিল বলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতেই ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, "সাধুলোক পাই কোথায়?"

তিনি বললেন, "আমাকে যদি বিশ্বাস করেন আমি এ কাজের কতক ভার নিতে পারি।"

তিনি ভার পেলেন এবং এই ভার বহন করতে করতেই একদিন মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যে এক গাছতলায় মারা যান। ডাক্তার বললে, তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

গল্পের এতটা পর্যন্ত আমার পূর্বেই জানা ছিল। কেমন একটা উচ্চ ভাবের মেজাজে এঁরই কথা তুলে আমাদের ক্লাবে আমি বলেছিলুম, "এই নন্দকৃষ্ণের মতো লোক যারা সংসারে ফেল করে শুকিয়ে মরে গেছে— না রেখেছে নাম, না রেখেছে টাকা— তারাই ভগবানের সহযোগী হয়ে সংসারটাকে উপরের দিকে—"

এইটুকু মাত্র বলতেই ভরা পালের নৌকা হঠাৎ চড়ায় ঠেকে যাওয়ার মতো, আমার কথা মাঝখানে

বন্ধ হয়ে গেল। কারণ, আমাদের মধ্যে খুব একজন সম্পত্তি ও প্রতিপত্তিশালী লোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন— তিনি তাঁর চশমার উপর থেকে আমার প্রতি দৃষ্টি হেনে বলে উঠলেন, "হিয়ার হিয়ার!"

যাক গে। শোনা গেল, নন্দকৃষ্ণের বিধবা স্ত্রী তাঁর একটি মেয়েকে নিয়ে এই পাড়াতেই থাকেন। দেয়ালির রাত্রে মেয়েটির জন্ম হয়েছিল বলে বাপ তার নাম দিয়েছিলেন দীপালি। বিধবা কোনো সমাজে স্থান পান না বলে সম্পূর্ণ একলা থেকে এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। এখন মেয়েটির বয়স পঁচিশের উপর হবে। মায়ের শরীর রুগ্ণ এবং বয়সও কম নয়— কোন্‌দিন তিনি মারা যাবেন, তখন এই মেয়েটির কোথাও কোনো গতি হবে না। বিশ্বপতি আমাকে বিশেষ অনুনয় করে বললেন, "যদি এর পাত্র জুটিয়ে দিতে পারেন তো সেটা একটা পুণ্যকর্ম হবে।"

আমি বিশ্বপতিকে শুকনো স্বার্থপর নিরেট কাজের লোক বলে মনে মনে একটু অবজ্ঞা করেছিলুম। বিধবার অনাথা মেয়েটির জন্য তাঁর এই আগ্রহ দেখে আমার মন গলে গেল। ভাবলুম, প্রাচীন পৃথিবীর মৃত ম্যামথের পাকযন্ত্রের মধ্যে থেকে খাদ্যবীজ বের করে পুঁতে দেখা গেছে, তার থেকে অঙ্কুর বেরিয়েছে— তেমনি মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুল মৃতস্তূপের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ মরতে চায় না।

আমি বিশ্বপতিকে বললুম, "পাত্র আমার জানা আছে, কোনো বাধা হবে না। আপনারা কথা এবং দিন ঠিক করুন।"

"কিন্তু মেয়ে না দেখেই তো আর—"

"না দেখেই হবে।"

"কিন্তু, পাত্র যদি সম্পত্তির লোভ করে সে বড়ো বেশি নেই। মা মরে গেলে কেবল ঐ বাড়িখানি পাবে, আর সামান্য যদি কিছু পায়।"

"পাত্রের নিজের সম্পত্তি আছে, সেজন্যে ভাবতে হবে না।"

"তাঁর নাম বিবরণ প্রভৃতি—"

"সে এখন বলব না, তা হলে জানাজানি হয়ে বিবাহ ফেঁসে যেতে পারে।"

"মেয়ের মাকে তো তার একটা বর্ণনা দিতে হবে।"

"বলবেন, লোকটা অন্য সাধারণ মানুষের মতো দোষে গুণে জড়িত। দোষ এত বেশি নেই যে ভাবনা হতে পারে; গুণও এত বেশি নেই যে লোভ করা চলে। আমি যতদূর জানি তাতে কন্যার পিতামাতার তাকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বয়ং কন্যাদের মনের কথা ঠিক জানা যায় নি।"

বিশ্বপতিবাবু এই ব্যাপারে যখন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন তখন তাঁর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেল। যে-কারবারে ইতিপূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার দরে বনছিল না, সেটাতে লোকসান দিয়েও রেজিস্ট্রী দলিল সই করবার জন্যে আমার উৎসাহ হল। তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, "পাত্রটিকে বলবেন, অন্য সব বিষয়ে যাই হোক, এমন গুণবতী মেয়ে কোথাও পাবেন না।"

যে-মেয়ে সমাজের আশ্রয় থেকে এবং শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত তাকে যদি হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা হলে সে মেয়ে কি আপনাকে উৎসর্গ করতে কিছুমাত্র কৃপণতা করবে। যে মেয়ের বড়ো রকমের আশা আছে তারই আশার অন্ত থাকে না। কিন্তু, এই দীপালির দীপটি মাটির, তাই আমার মতো মেটে ঘরের কোণে তার শিখাটির অমর্যাদা হবে না।

সন্ধ্যার সময় আলো জ্বেলে বিলিতি কাগজ পড়ছি, এমন সময় খবর এল, একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বাড়িতে স্ত্রীলোক কেউ নেই, তাই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। কোনো ভদ্র উপায় উদ্ভাবনের পূর্বেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রণাম করলে। বাইরে থেকে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি অত্যন্ত লাজুক মানুষ। আমি না তার মুখের দিকে চাইলুম, না তাকে কোনো কথা বললুম। সে বললে, "আমার নাম দীপালি।"

গলাটি ভারি মিষ্টি। সাহস করে মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে মুখ বুদ্ধিতে কোমলতাতে মাখানো। মাথায় ঘোমটা নেই— সাদা দিশি কাপড়, এখনকার ফ্যাশানে পরা। কী বলি ভাবছি, এমন

সময় সে বললে, "আমাকে বিবাহ দেবার জন্যে আপনি কোনো চেষ্টা করবেন না।"

আর যাই হোক, দীপালির মুখে এমন আপত্তি আমি প্রত্যাশাই করি নি। আমি ভেবে রেখেছিলুম, বিবাহের প্রস্তাবে তার দেহ মন প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, "জানা অজানা কোনো পাত্রকেই তুমি বিবাহ করবে না?"

সে বললে, "না, কোনো পাত্রকেই না।"

যদিচ মনস্তত্ত্বের চেয়ে বস্তুতত্ত্বেই আমার অভিজ্ঞতা বেশি— বিশেষত নারীচিত্ত আমার কাছে বাংলা বানানের চেয়ে কঠিন, তবু কথাটার সাদা অর্থ আমার কাছে সত্য অর্থ ব'লে মনে হল না। আমি বললুম, "যে-পাত্র আমি তোমার জন্যে বেছেছি সে অবজ্ঞা করবার যোগ্য নয়।"

দীপালি বললে, "আমি তাঁকে অবজ্ঞা করি নে, কিন্তু আমি বিবাহ করব না।"

আমি বললুম, "সে লোকটিও তোমাকে মনের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে।"

"কিন্তু, না, আমাকে বিবাহ করতে বলবেন না।"

"আচ্ছা, বলব না, কিন্তু আমি কি তোমাদের কোনো কাজে লাগতে পারি নে।"

"আমাকে যদি কোনো মেয়ে-ইস্কুলে পড়াবার কাজ জুটিয়ে দিয়ে এখান থেকে কলকাতায় নিয়ে যান তা হলে ভারি উপকার হয়।"

বললুম, "কাজ আছে, জুটিয়ে দিতে পারব।"

এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। মেয়ে-ইস্কুলের খবর আমি কী জানি। কিন্তু, মেয়ে-ইস্কুল স্থাপন করতে তো দোষ নেই।

দীপালি বললে, "আপনি আমাদের বাড়ি গিয়ে একবার মায়ের সঙ্গে এ কথার আলোচনা করে দেখবেন?"

আমি বললুম, "আমি কাল সকালেই যাব।"

দীপালি চলে গেল। কাগজ-পড়া আমার বন্ধ হল। ছাতের উপর বেরিয়ে এসে চৌকিতে বসলুম। তারাগুলোকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোটি কোটি যোজন দূরে থেকে তোমরা কি সত্যই মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মসূত্র ও সম্বন্ধসূত্র নিঃশব্দে বসে বসে বুনছ।'

এমন সময়ে কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ বিশ্বপতির মেজো ছেলে শ্রীপতি ছাতে এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে যে-আলোচনাটা হল, তার মর্ম এই—

শ্রীপতি দীপালিকে বিবাহ করবার আগ্রহে সমাজ ত্যাগ করতে প্রস্তুত। বাপ বলেন, এমন দুষ্কার্য করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন। দীপালি বলে, তার জন্যে এত বড়ো দুঃখ অপমান ও ত্যাগ স্বীকার কেউ করবে, এমন যোগ্যতা তার নেই। তা ছাড়া শ্রীপতি শিশুকাল থেকে ধনীগৃহে লালিত; দীপালির মতে, সে সমাজচ্যুত এবং নিরাশ্রয় হয়ে দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। এই নিয়ে তর্ক চলছে, কিছুতে তার মীমাংসা হচ্ছে না। ঠিক এই সংকটের সময় আমি মাঝখানে প'ড়ে এদের মধ্যে আর-একটা পাত্রকে খাড়া ক'রে সমস্যার জটিলতা অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলেছি। এইজন্যে শ্রীপতি আমাকে এই নাটকের থেকে প্রুফশিটের কাটা অংশের মতো বেরিয়ে যেতে বলছে।

আমি বললুম, "যখন এসে পড়েছি তখন বেরোচ্ছি নে। আর, যদি বেরোই তা হলে গ্রন্থি কেটে তবে বেরিয়ে পড়ব।"

বিবাহের দিনপরিবর্তন হল না। কেবলমাত্র পাত্রপরিবর্তন হল। বিশ্বপতির অনুনয় রক্ষা করেছি কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। দীপালির অনুনয় রক্ষা করি নি কিন্তু ভাবে বোধ হল, সে সন্তুষ্ট হয়েছে। ইস্কুলে কাজ খালি ছিল কি না জানি নে কিন্তু আমার ঘরে কন্যার স্থান শূন্য ছিল, সেটা পূর্ণ হল। আমার মতো বাজে লোক যে নিরর্থক নয় আমার অর্থই সেটা শ্রীপতির কাছে প্রমাণ করে দিলে। তার গৃহদীপ আমার কলকাতার বাড়িতেই জ্বলল। ভেবেছিলুম, সময়মত বিবাহ না সেরে রাখার মুলতবি অসময়ে বিবাহ করে পূরণ করতে হবে, কিন্তু দেখলুম, উপরওয়ালা প্রসন্ন হলে দুটো-একটা ক্লাস ডিঙিয়েও প্রোমোশন পাওয়া যায়। আজ পঞ্চান্ন বছর বয়সে আমার ঘর নাতনিতে

ভরে গেছে, উপরন্তু একটি নাতিও জুটেছে। কিন্তু, বিশ্বপতিবাবুর সঙ্গে আমার কারবার বন্ধ হয়ে গেছে— কারণ, তিনি পাত্রটিকে পছন্দ করেন নি।

পৌষ ১৩২৪

নামঞ্জুর গল্প

আমাদের আসর জমেছিল পোলিটিক্যাল লঙ্কাকাণ্ডের পালায়। হাল আমলের উত্তরকাণ্ডে আমরা সম্পূর্ণ ছুটি পাই নি বটে, কিন্তু গলা ভেঙেছে ; তা ছাড়া সেই অগ্নিদাহের খেলা বন্ধ।

বঙ্গভঙ্গের রঙ্গভূমিতে বিদ্রোহীর অভিনয় শুরু হল। সবাই জানেন, এই নাট্যের পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্য আলিপুর পেরিয়ে পৌঁছল আন্ডামানের সমুদ্রকূলে। পারানির পাথেয় আমার যথেষ্ট ছিল, তবু গ্রহের গুণে এপারের হাজতেই আমার ভোগসমাপ্তি। সহযোগীদের মধ্যে ফাঁসিকাঠ পর্যন্ত যাদের সর্বোচ্চ প্রোমোশন হয়েছিল, তাদের প্রণাম করে আমি পশ্চিমের এক শহরের কোণে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় পসার জমিয়ে তুললেম।

তখনো আমার বাবা বেঁচে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের এক বড়ো মহকুমার সরকারি উকিল। উপাধি ছিল রায়বাহাদুর। তিনি বিশেষ-একটু ঘটা করেই আমার বাড়ি আসা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে আমার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল কি না অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু হয়েছিল পকেটের সঙ্গে। মনি-অর্ডারের সম্পর্ক পর্যন্ত ছিল না। যখন আমি হাজতে তখনই মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। আমার পাওনা শাস্তিটা গেল তাঁর উপর দিয়েই।

আমার পিসি ব'লে যিনি পরিচিত, তিনি আমার স্বোপার্জিত কিংবা আমার পৈতৃক, তা নিয়ে কারও কারও মনে সংশয় আছে। তার কারণ, আমি পশ্চিমে যাবার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সম্পূর্ণই অব্যক্ত ছিল। তিনি আমার কে, তা নিয়ে সন্দেহ থাকে তো থাক, কিন্তু তাঁর স্নেহ না পেলে সেই আত্মীয়তার অরাজকতা-কালে আমাকে বিষম দুঃখ পেতে হত। তিনি আজন্ম পশ্চিমেই কাটিয়েছেন ; সেইখানেই বিবাহ, সেইখানেই বৈধব্য। সেইখানেই স্বামীর বিষয়সম্পত্তি। বিধবা তাই নিয়েই বন্ধ ছিলেন।

তাঁর আরো একটি বন্ধন ছিল। বালিকা অমিয়া। কন্যাটি স্বামীর বটে, স্ত্রীর নয়। তার মা ছিল পিসিমার এক যুবতী দাসী, জাতিতে কাহার। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েটিকে তিনি ঘরে এনে পালন করছেন— সে জানেও না যে, তিনি তার মা নন।

এমন অবস্থায় তাঁর আর-একটি বন্ধন বাড়ল, সে হচ্ছে আমি স্বয়ং। যখন জেলখানার বাইরে আমার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ তখন এই বিধবাই আমাকে তাঁর ঘরে এবং হৃদয়ে আশ্রয় দিলেন। তার পরে বাবার দেহান্তে যখন জানা গেল, উইলে তিনি আমাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করেন নি, তখন সুখে দুঃখে আমার পিসির চোখে জল পড়ল। বুঝলেন, আমার পক্ষে তাঁর প্রয়োজন ঘুচল। তাই বলে স্নেহ তো ঘুচল না।

তিনি বললেন, "বাবা, যেখানেই থাক, আমার আশীর্বাদ রইল।"

আমি বললেম, "সে তো থাকবেই, সেইসঙ্গে তোমাকেও থাকতে হবে, নইলে আমার চলবে না। হাজত থেকে বেরিয়ে যে-মাকে আর দেখতে পাই নি, তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে তোমার কাছে নিয়ে এসেছেন।"

পিসিমা তাঁর এতকালের পশ্চিমের ঘর-সংসার তুলে দিয়ে আমার সঙ্গে কলকাতায় চলে এলেন। আমি হেসে বললেম, "তোমার স্নেহগঙ্গার ধারাকে পশ্চিম থেকে পূর্বে বহন করে এনেছি, আমি কলির

পিসিমা হাসলেন, আর চোখের জল মুছলেন। তাঁর মনের মধ্যে কিছু দ্বিধাও হল ; বললেন, "অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল, মেয়েটার কোনো-একটা গতি করে শেষ বয়সে তীর্থ করে বেড়াব— কিন্তু বাবা, আজ যে তার উলটো পথে টেনে নিয়ে চললি।"

আমি বললুম, "পিসিমা, আমিই তোমার সচল তীর্থ। যে-কোনো ত্যাগের ক্ষেত্রেই তুমি আত্মদান কর-না কেন, সেইখানেই তোমার দেবতা আপনি এসে তা গ্রহণ করবেন। তোমার যে পুণ্য আত্মা !"

সব চেয়ে একটা যুক্তি তাঁর মনে প্রবল হল। তাঁর আশঙ্কা ছিল, স্বভাবতই আমার প্রবৃত্তির ঝোঁকটা আন্ডামান-মুখো, অতএব কেউ আমাকে সামলাবার না থাকলে অবশেষে একদিন পুলিসের বাহুবন্ধনে বদ্ধ হবই। তাঁর মতলব ছিল, যে কোমল বাহুবন্ধন তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ও স্থায়ী, আমার জন্য তারই ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে তিনি তীর্থভ্রমণে বার হবেন। আমার বন্ধন নইলে তাঁর মুক্তি নেই।

আমার চরিত্র সম্বন্ধে এইখানে ভুল হিসেব করেছিলেন। কুষ্ঠিতে আমার বধ-বন্ধনের গ্রহটি অন্তিমে আমাকে শকুনি-গৃধিনীর হাতে সঁপে দিতে নারাজ ছিলেন না, কিন্তু প্রজাপতির হাতে নৈব নৈব চ। কন্যাকর্তারা ত্রুটি করেন নি, তাঁদের সংখ্যাও অজস্র। আমার পৈতৃক সম্পত্তির বিপুল সচ্ছলতার কথা সকলেই জানত ; অতএব, ইচ্ছা করলে সম্ভবপর শ্বশুরকে দেউলে করে দিয়ে কন্যার সঙ্গে সঙ্গে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা নহবতে সাহানা বাজিয়ে হাসতে হাসতে আদায় করতে পারতেম। করি নি। আমার ভাবী চরিতলেখক এ কথা যেন স্মরণ রাখেন যে, স্বদেশসেবার সংকল্পের কাছে এককালীন আমার এই বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার ত্যাগ। জমা-খরচের অঙ্কটা অদৃশ্য কালিতে লেখা আছে বলে যেন আমার প্রশংসার হিসাব থেকে বাদ না পড়ে। পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে আমার মহৎ চরিত্রের এইখানে মিল আছে।

পিসিমা শেষ পর্যন্ত আশা ছাড়েন নি। এমন সময়ে ভারতের পোলিটিক্যাল আকাশে আমাদের সেই ক্ষাত্রযুগের পরবর্তী যুগের হাওয়া বইল। পূর্বেই বলেছি, এখনকার পালায় আমরা প্রধান নায়ক নই, তবু ফুট্‌ লাইটের অনেক পিছনে মাঝে মাঝে নিস্তেজভাবে আমাদের আসা-যাওয়া চলছে। এত নিস্তেজ যে, পিসিমা আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্তই ছিলেন। আমার জন্যে কালীঘাটে স্বস্ত্যয়ন করবার ইচ্ছে এককালে তাঁর ছিল, কিন্তু ইদানীং আমার ভাগ্য-আকাশে লাল-পাগড়ির রক্তমেঘ একেবারে অদৃশ্য থাকাতে তাঁর আর খেয়াল রইল না। এইটেই ভুল করলেন।

সেদিন পুজোর বাজারে ছিল খদ্দরের পিকেটিং। নিতান্ত কেবল দর্শকের মতন গিয়েছিলেম— আমার উৎসাহের তাপমাত্রা ৯৮ অঙ্কেরও নীচে ছিল, নাড়িতে বেশি বেগ ছিল না। সেদিন যে আমার কোনো আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে সে-খবর আমার কুষ্ঠির নক্ষত্র ছাড়া আর-সবার কাছে ছিল অগোচর। এমন সময় খদ্দরপ্রচারকারিণী কোনো বাঙালি মহিলাকে পুলিস-সার্জেন্ট দিলে ধাক্কা। মুহূর্তের মধ্যেই আমার অহিংস অসহযোগের ভাবখানা প্রবল দুঃসহযোগে পরিণত হল। সুতরাং অনতিবিলম্বে থানায় হল আমার গতি। তার পরে যথানিয়মে হাজতের লালায়িত কবলের থেকে জেলখানার অন্ধকার জঠরদেশে অবতরণ করা গেল। পিসিমাকে ব'লে গেলেম, "এইবার কিছুকালের জন্যে তোমার মুক্তি। আপাতত আমার উপযুক্ত অভিভাবকের অভাব রইল না, অতএব এই সুযোগে তুমি তীর্থভ্রমণ করে নাওগে। অমিয়া থাকে কলেজের হস্টেলে ; বাড়িতেও দেখবার-শোনবার লোক আছে ; অতএব, এখন তুমি দেবসেবায় ষোলো আনা মন দিলে দেবমানব কারও কোনো আপত্তির কথা থাকবে না।"

জেলখানাকে জেলখানা বলেই গণ্য করে নিয়েছিলেম। সেখানে কোনোরকম দাবিদাওয়া আবদার উৎপাত করি নি। সেখানে সুখ, সম্মান, সৌজন্য, সুহৃৎ ও সুখাদ্যের অভাবে অত্যন্ত বেশি বিস্মিত হই নি। কঠোর নিয়মগুলোকে কঠোরভাবেই মেনে নিয়েছিলেম। কোনোরকম আপত্তি করাটাই লজ্জার বিষয় ব'লে মনে করতেম।

মেয়াদ পুরো হবার কিছু পূর্বেই ছুটি পাওয়া গেল। চারি দিকে খুব হাততালি। মনে হল যেন বাংলাদেশের হাওয়ায় বাজতে লাগল, 'এন্‌কোর ! এক্‌সেলেন্ট্‌ !' মনটা খারাপ হল। ভাবলেম, যে

ভুগল সেই কেবল ভুগল। আর, মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, রস পেলে দশে মিলে। সেও বেশিক্ষণ নয়; নাট্যমঞ্চের পর্দা পড়ে যায়, আলো নেভে, তার পরে ভোলবার পালা। কেবল বেড়ি-হাতকড়ার দাগ যার হাড়ে গিয়ে লেগেছে তারই চিরদিন মনে থাকে।

পিসিমা এখনো তীর্থে। কোথায়, তার ঠিকানাও জানি নে। ইতিমধ্যে পুজোর সময় কাছে এল। একদিন সকালবেলায় আমার সম্পাদক-বন্ধু এসে উপস্থিত। বললেন, "ওহে, পুজোর সংখ্যার জন্যে একটা লেখা চাই।"

"জিজ্ঞাসা করলেম, কবিতা।"

"আরে, না। তোমার জীবনবৃত্তান্ত।"

"সে তো তোমার এক সংখ্যায় ধরবে না।"

"এক সংখ্যায় কেন। ক্রমে ক্রমে বেরোবে।"

"সতীর মৃতদেহ সুদর্শনচক্রে টুকরো টুকরো করে ছড়ানো হয়েছিল। আমার জীবনচরিত সম্পাদকি চক্রে তেমনি টুকরো টুকরো করে সংখ্যায় সংখ্যায় ছড়িয়ে দেবে, এটা আমার পছন্দসই নয়। জীবনী যদি লিখি গোটা আকারে বের করে দেব।"

"না-হয় তোমার জীবনের কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা লিখে দাও-না।"

"কী রকম ঘটনা।"

"তোমার সব চেয়ে কঠোর অভিজ্ঞতা, খুব যাতে ঝাঁজ।"

"কী হবে লিখে।"

"লোকে জানতে চায় হে।"

"এত কৌতূহল? আচ্ছা, বেশ, লিখব।"

"মনে থাকে যেন সব চেয়ে যেটাতে তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা।"

"অর্থাৎ, সব চেয়ে যেটাতে দুঃখ পেয়েছি, লোকের তাতেই সব চেয়ে মজা। আচ্ছা, বেশ। কিন্তু নামটামগুলো অনেকখানি বানাতে হবে।"

"তা তো হবেই। যেগুলো একেবারে মারাত্মক কথা তার ইতিহাসের চিহ্ন বদল না করলে বিপদ আছে। আমি সেইরকম মরিয়াগোছের জিনিসই চাই। পেজ প্রতি তোমাকে—"

"আগে লেখাটা দেখো, তার পরে দরদস্তুর হবে।"

"কিন্তু, আর-কাউকে দিতে পারবে না বলে রাখছি। যিনি যত দর হাঁকুন, আমি তার উপরে—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে।"

শেষকালটা উঠে যাবার সময় বলে গেলেন, "তোমাদের ইনি— বুঝতে পারছ? নাম করব না— ঐ-যে তোমাদের সাহিত্যধুরন্ধর— মস্ত লেখক ব'লে বড়াই; কিন্তু, যা বল তোমার স্টাইলের কাছে তার স্টাইল যেন ডসনের বুট আর তালতলার চটি।"

বুঝলেম, আমাকে উপরে চড়িয়ে দেওয়াটা উপলক্ষ মাত্র, তুলনায় ধুরন্ধরকে নাবিয়ে দেওয়াটাই লক্ষ্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। এইবার আমার কঠোর অভিজ্ঞতার কাহিনী।

'সন্ধ্যা' কাগজ যেদিন থেকে পড়তে শুরু, সেইদিন থেকেই আহারবিহার সম্বন্ধে আমার কড়া ভোগ। সেটাকে জেলযাত্রার রিহার্সাল বলা হত। দেহের প্রতি অনাদরের অভ্যাস পাকা হয়ে উঠল। তাই প্রথমবার যখন ঠেললে হাজতে, প্রাণপুরুষ বিচলিত হয় নি। তার পর বেরিয়ে এসে নিজের 'পরে কারও সেবাশুশ্রূষার হস্তক্ষেপমাত্র বরদাস্ত করি নি। পিসিমা দুঃখবোধ করতেন। তাঁকে বলতেম, "পিসিমা, স্নেহের মধ্যে মুক্তি, সেবার মধ্যে বন্ধন। তা ছাড়া, একের শরীরে অন্য শরীরধারীর আইন খাটানোকে বলে ডায়ার্কি, দ্বৈরাজ্য— সেইটের বিরুদ্ধে আমাদের অসহযোগ।"

তিনি নিশ্বাস ছেড়ে বলতেন, "আচ্ছা, বাবা, তোমাকে বিরক্ত করব না।"

নির্বোধ, মনে মনে ভাবতেম বিপদ কাটল।

ভুলেছিলেম, স্নেহসেবার একটা প্রচ্ছন্ন রূপ আছে। তার মায়া এড়ানো শক্ত। অকিঞ্চন শিব যখন তাঁর ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দারিদ্র্যগৌরবে মগ্ন তখন খবর পান না যে, লক্ষ্মী কোন্-এক সময়ে সেটা নরম রেশম দিয়ে বুনে রেখেছেন, তার সোনার সুতোর দামে সূর্যনক্ষত্র বিকিয়ে যায়। যখন 'ভিক্ষের অন্ন খাচ্ছি' বলে সন্ন্যাসী নিশ্চিন্ত তখন জানেন না যে, অন্নপূর্ণা এমন মসলায় বানিয়েছেন যে, দেবরাজ প্রসাদ পাবার জন্যে নন্দীর কানে কানে ফিসফিস করতে থাকেন। আমার হল সেই দশা। শয়নে বসনে অশনে পিসিমার সেবার হস্ত গোপনে ইন্দ্রজাল বিস্তার করতে লাগল, সেটা দেশাত্মবোধীর অন্যমনস্ক চোখে পড়ল না। মনে মনে ঠিক দিয়ে বসে আছি, তপস্যা আছে অক্ষুণ্ণ। চমক ভাঙল জেলখানায় গিয়ে। পিসিমা ও পুলিসের ব্যবস্থার মধ্যে যে একটা ভেদ আছে, কোনো-রকম অদ্বৈতবুদ্ধি দ্বারা তার সমন্বয় করতে পারা গেল না। মনে মনে কেবলই গীতা আওড়াতে লাগলেম, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। হায় রে তপস্বী, কখন যে পিসিমার নানা গুণ নানা উপকরণ-সংযোগে হৃদয়দেশ পেরিয়ে একেবারে পাকযন্ত্রে প্রবেশ করেছে, তা জানতেও পারি নি। জেলখানায় এসে সেই জায়গাটাতে বিপাক ঘটতে লাগল।

ফল হল এই যে, বজ্রাঘাত ছাড়া আর-কিছুতে যে-শরীর কাবু হত না সে পড়ল অসুস্থ হয়ে। জেলের পেয়াদা যদি-বা ছাড়লে জেলের রোগগুলোর মেয়াদ আর ফুরোতে চায় না। কখনো মাথা ধরে, হজম প্রায় হয় না, বিকেলবেলা জ্বর হতে থাকে। ক্রমে যখন মালাচন্দন হাততালি ফিকে হয়ে এসেছে তখনো এ আপদগুলো টনটনে হয়ে রইল।

মনে মনে ভাবি, পিসিমা তো তীর্থ করতে গেছেন, তাই বলে অমিয়াটার কি ধর্মজ্ঞান নেই। কিন্তু, দোষ দেব কাকে। ইতিপূর্বে অসুখে-বিসুখে আমার সেবা করবার জন্যে পিসিমা তাকে অনেকবার উৎসাহিত করেছেন— আমিই বাধা দিয়ে বলেছি, ভালো লাগে না।

পিসিমা বলেছেন, "অমিয়ার শিক্ষার জন্যেই বলছি, তোর আরামের জন্যে নয়।"

আমি বলেছি, "হাসপাতালে নার্সিং করতে পাঠাও-না।"

পিসিমা রাগ করে আর জবাব করেন নি।

আজ শুয়ে শুয়ে মনে মনে ভাবছি, 'না-হয় এক সময়ে বাধাই দিয়েছি, তাই বলে কি সেই বাধাই মানতে হবে। গুরুজনের আদেশের 'পরে এত নিষ্ঠা এই কলিযুগে!'

সাধারণত নিকট সংসারের ছোটোবড়ো অনেক ব্যাপারই দেশাত্মবোধীর চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু, অসুখ করে পড়ে আছি বলে আজকাল দৃষ্টি হয়েছে প্রখর। লক্ষ্য করলেম, আমার অবর্তমানে অমিয়ারও দেশাত্মবোধ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে আমার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় তার এত অভাবনীয় উন্নতি হয় নি। আজ অসহযোগের অসহ্য আবেগে সে কলেজ-ত্যাগিনী; ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতেও তার হৃৎকম্প হয় না; অনাথাসদনের চাঁদার জন্যে অপরিচিত লোকের বাড়িতে গিয়েও সে ঝুলি ফিরিয়ে বেড়ায়। এও লক্ষ্য করে দেখলেম, অনিল তার এই কঠিন অধ্যবসায় দেখে তাকে দেবী ব'লে ভক্তি করে— ওর জন্মদিনে সেই ভাবেরই একটা ভাঙা ছন্দের স্তোত্র সে সোনার কালিতে ছাপিয়ে ওকে উপহার দিয়েছিল।

আমাকেও ঐ ধরনের একটা-কিছু বানাতে হবে, নইলে অসুবিধা হচ্ছে। পিসিমার আমলে চাকরবাকরগুলো যথানিয়মে কাজ করত; হাতের কাছে কাউকে-না-কাউকে পাওয়া যেত। এখন এক গ্লাস জলের দরকার হলে আমার মেদিনীপুরবাসী শ্রীমান জলধরের অকস্মাৎ অভ্যাগমের প্রত্যাশায় চাতকের মতো তাকিয়ে থাকি; সময় মিলিয়ে ওষুধ খাওয়া সম্বন্ধে নিজের ভোলা মনের 'পরেই একমাত্র ভরসা। আমার চিরদিনের নিয়মবিরুদ্ধ হলেও রোগশয্যায় হাজিরে দেবার জন্যে অমিয়াকে দুই-একবার ডাকিয়ে এনেছি; কিন্তু দেখতে পাই, পায়ের শব্দ শুনলেই সে দরজার দিকে চমকে তাকায়, কেবলই উসখুস করতে থাকে। মনে দয়া হয়; বলি, "অমিয়া, আজ নিশ্চয় তোদের মীটিং আছে।"

অমিয়া বলে, "তা হোক-না দাদা, এখনো-আর কিছুক্ষণ—"

আমি বলি, "না, না, সে কি হয়। কর্তব্য সব আগে।"

কিন্তু প্রায়ই দেখতে পাই, কর্তব্যের অনেক আগেই অনিল এসে উপস্থিত হয়। তাতে অমিয়ার কর্তব্য-উৎসাহের পালে যেন দমকা হাওয়া লাগে, আমাকে বড়ো বেশি-কিছু বলতে হয় না।

শুধু অনিল নয়, বিদ্যালয়-বর্জক আরো অনেক উৎসাহী যুবক আমার বাড়ির একতলায় বিকেলে চা এবং ইন্‌স্পিরেশন গ্রহণ করতে একত্র হয়। তারা সকলেই অমিয়াকে যুগলক্ষ্মী বলে সম্ভাষণ করে। একরকম পদবী আছে, যেমন রায়বাহাদুর, পাট-করা চাদরের মতো, যাকেই দেওয়া যায় নির্ভাবনায় কাঁধে ঝুলিয়ে বেড়াতে পারে। আর-একরকম পদবী আছে, যার ভাগ্যে জোটে সে বেচারা নিজেকে পদবীর সঙ্গে মাপসই করবার জন্যে অহরহ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। স্পষ্টই বুঝলেম, অমিয়ার সেই অবস্থা। সর্বদাই অত্যন্ত বেশি উৎসাহপ্রদীপ্ত হয়ে না থাকলে তাকে মানায় না। খেতে শুতে তার সময় না-পাওয়াটা বিশেষ সমারোহ করেই ঘটে। এ পাড়ায় ও পাড়ায় খবর পৌঁছয়। কেউ যখন বলে, এমন করলে শরীর টিকবে কী করে, সে একটুখানি হাসে— আশ্চর্য সেই হাসি। ভক্তরা বলে 'আপনি একটু বিশ্রাম করুন গে, একরকম করে কাজটা সেরে নেব', সে তাতে ক্ষুণ্ণ হয়— ক্লান্তি থেকে বাঁচানোই কি বড়ো কথা। দুঃখগৌরব থেকে বঞ্চিত করা কি কম বিড়ম্বনা। তার ত্যাগ স্বীকারের ফর্দের মধ্যে আমিও পড়ে গেছি। আমি যে তার এতবড়ো জেল-খাটা দাদা— উল্লাসকর কানাই বারীন উপেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে এক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে যার স্থান, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পার হয়ে তার যে-দাদা গীতার শেষ দিকের অধ্যায়ের মুখে অগ্রসর হয়েছে, তাকেও যথোচিত পরিমাণে দেখবার সে সময় পায় না। এত বড়ো স্যাক্রিফাইস! যেদিন কোনো কারণে তার দলের লোকের অভাব হয়েছে সেদিন আমিও তার উৎসাহের মৌতাত জোগাবার জন্যে বলেছি, 'অমিয়া, ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ তোর জন্যে নয়, তোর জন্যে বর্তমান যুগ।' আমার কথাটা সে গম্ভীরমুখে নীরবে মেনে নিয়েছে। জেলে যাওয়ার পর থেকে আমার হাসি অন্তঃশীলা বইছে— যারা আমাকে চেনে না তারা বাইরে থেকে আমাকে খুব গম্ভীর বলেই মনে করে।

বিছানায় একলা পড়ে পড়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, বিমুখা বান্ধবা যাস্তি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেদিন কোথা থেকে একটা ন্যাঙলা কুকুর আমার বারান্দার কোণে আশ্রয় খুঁজছিল। গায়ের রোঁওয়া উঠে গেছে, জীর্ণ চামড়ার তলায় কঙ্কালের আব্রু নেই— আধমরা তার অবস্থা। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেম। আজ ভাবছিলেম, এতটা বেশি ঝাঁজের সঙ্গে তাকে তাড়ালেম কেন। বেগানা কুকুর বলে নয়, ওর সর্বাঙ্গে মরণদশা দেখা দিয়েছে বলে। প্রাণের সংগীতসভায় ওর অস্তিত্বটা বেসুরো, ওর রুগ্‌ণতা বেয়াদবি। ওর সঙ্গে নিজের তুলনা মনে এল। চারি দিকের চলমান প্রাণের ধারার মধ্যে আমার অস্বাস্থ্য একটা স্থাবর পদার্থ, স্রোতের বাধা। সে দাবি করে, 'শিয়রের কাছে চুপ করে বসে থাকো।' প্রাণের দাবি, 'দিকে বিদিকে চলে বেড়াও।' রোগের বাঁধনে যে নিজে বদ্ধ অরোগীকে সে বন্দী করতে চায়— এটা একটা অপরাধ। অতএব, জীবলোকের উপর সব দাবি একেবারে পরিত্যাগ করব মনে করে গীতা খুলে বসলেম। প্রায় যখন স্থিতধী অবস্থায় এসে পৌঁচেছি, মনটা রোগ-অরোগের দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে গেছে, এমন সময় অনুভব করলেম, কে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। গীতা থেকে চোখ নামিয়ে দেখি, পিসিমার পোষ্যমণ্ডলীভুক্ত একটি মেয়ে। এ পর্যন্ত দূরের থেকেই সাধারণভাবেই তাকে জানি ; বিশেষভাবে তার পরিচয় জানি নে— তার নাম পর্যন্ত আমার অবিদিত। মাথায় ঘোমটা টেনে ধীরে ধীরে সে আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তখন মনে পড়ল, মাঝে মাঝে সে আমার দরজার বাইরের কোণে ছায়ার মতো এসে বার বার ফিরে ফিরে গেছে। বোধ করি সাহস করে ঘরে ঢুকতে পারেনি। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মাথা-ধরার, গায়ে-ব্যথার ইতিবৃত্তান্ত সে আড়াল থেকে অনেকটা জেনে গিয়েছে। আজ সে লজ্জাভয় দূর করে ঘরের মধ্যে এসে প্রণাম করে বসল। আমি যে একদিন একজন মেয়েকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে দুঃখ-স্বীকারের অর্ঘ্য নারীকে দিয়েছি, সে হয়তো-বা দেশের সমস্ত মেয়ের হয়ে আমার পায়ের

কাছে তারই প্রাপ্তিস্বীকার করতে এসেছে। জেল থেকে বেরিয়ে অনেক সভায় অনেক মালা পেয়েছি, কিন্তু আজ ঘরের কোণে এই-যে অখ্যাত হাতের মানটুকু পেলেম এ আমার হৃদয়ে এসে বাজল। নিস্ত্রৈগুণ্য হবার উমেদার এই জেল-খাটা পুরুষের বহুকালের শুকনো চোখ ভিজে ওঠবার উপক্রম করলে। পূর্বেই বলেছি সেবায় আমার অভ্যেস নেই। কেউ পা টিপে দিতে এলে ভালোই লাগত না, ধমকে তাড়িয়ে দিতেম। আজ এই সেবা প্রত্যাখ্যান করার স্পর্ধা মনেও উদয় হল না।

খুলনা জেলায় পিসিমার আদি শ্বশুরবাড়ি। সেখানকার গ্রামসম্পর্কের দুটি-চারটি মেয়েকে পিসিমা আনিয়ে রেখেছেন। পিসিমার কাজকর্মে পূজা-অর্চনায় তারা ছিল তাঁর সহকারিণী। তাঁর নানারকম ক্রিয়াকর্মে তাদের না হলে তাঁর চলত না। এ বাড়িতে আর সর্বত্রই অমিয়ার অধিকার ছিল, কেবল পুজোর ঘরে না। অমিয়া তার কারণ জানত না, জানবার চেষ্টাও করত না। পিসিমার মনে ছিল, অমিয়া ভালোরকম লেখাপড়া শিখে এমন ঘরে বিয়ে করবে যেখানে আচার-বিচারের বাঁধাবাঁধি নেই, আর দেবদ্বিজ যেখান থেকে খাতির না পেয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসেন। এটা আক্ষেপের কথা। কিন্তু, এ ছাড়া ওর আর-কোনো গতি হতেই পারে না— বাপের পাতক থেকে মেয়েকে সম্পূর্ণ বাঁচাবে কে। সেই কারণে অমিয়াকে তিনি ঢিলেমির ঢালু তট বেয়ে আধুনিক আচারহীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হতে বাধা দেন নি। ছেলেবেলা থেকে অঙ্কে আর ইংরেজিতে ক্লাসে সে হয়েছে ফার্স্ট। বছরে বছরে মিশনারি ইস্কুল থেকে ফ্রক্ প'রে বেণী দুলিয়ে চারটে-পাঁচটা করে প্রাইজ নিয়ে এসেছে। যে-বারে দৈবাৎ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছে সে-বারে শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে; প্রায়োপবেশন করতে যায় আর-কি। এমনি করে পরীক্ষাদেবতার কাছে সিদ্ধির মানত করে সে তারই সাধনায় দীর্ঘকাল তন্ময় ছিল। অবশেষে অসহযোগের যোগিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পরীক্ষাদেবীর বর্জন-সাধনাতেও সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হল। পাস-গ্রহণেও যেমন, পাস-ছেদনেও তেমনি, কিছুতেই সে কারও চেয়ে পিছিয়ে থাকবার মেয়ে নয়। পড়াশুনো করে তার যে খ্যাতি, পড়াশুনো ছেড়ে তার চেয়ে খ্যাতি অনেক বেশি বেড়ে গেল। আজ যে-সব প্রাইজ তার হাতের কাছে ফিরছে তারা চলে, তারা বলে, তারা অশ্রুসলিলে গলে, তারা কবিতাও লেখে।

বলা বাহুল্য, পিসিমার পাড়াগেঁয়ে পোষ্য মেয়েগুলির 'পরে অমিয়ার একটুও শ্রদ্ধা ছিল না; অনাথাসদনে যে-সময়ে চাঁদার টাকার চেয়ে অনাথারই অভাব বেশি, সেই সময়ে এই মেয়েদের সেখানে পাঠাবার জন্যে পিসিমার কাছে অমিয়া অনেক আবেদন করেছে। পিসিমা বলেছেন, "সে কী কথা— এরা তো অনাথা নয়, আমি বেঁচে আছি কী করতে। অনাথ হোক, সনাথ হোক, মেয়েরা চায় ঘর; সদনের মধ্যে তাদের ছাপ মেরে বস্তাবন্দী করে রাখা কেন। তোমার যদি এতই দয়া থাকে তোমার ঘর নেই নাকি।"

যা হোক, মেয়েটি যখন মাথা হেঁট করে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আমি সংকুচিত অথচ বিগলিতচিত্তে একখানা খবরের কাগজ মুখের সামনে ধরে বিজ্ঞাপনের উপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেম। এমন সময় হঠাৎ অকালে অমিয়া ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত; নবযুগের উপযোগী ভাইফোঁটার একটা নূতন ব্যাখ্যা সে লিখেছে। সেইটে ইংরেজিতেও সে প্রচার করতে চায়; আমার কাছে তারই সাহায্য আবশ্যক। এই লেখাটির ওরিজিন্যাল আইডিয়াতে ভক্তদল খুব বিচলিত— এই নিয়ে তারা একটা ধুমধাম করবে বলে কোমর বেঁধেছে।

ঘরে ঢুকেই সেবানিযুক্ত মেয়েটিকে দেখেই অমিয়ার মুখের ভাব অত্যন্ত শক্ত হয়ে উঠল। তার দেশবিশ্রুত দাদা যদি একটু ইশারামাত্র করত তা হলে তার সেবা করবার লোকের কি অভাব ছিল। এত মানুষ থাকতে শেষকালে কি এই—

থাকতে পারলে না। বললে, "দাদা, হরিমতিকে কি তুমি—"

প্রশ্নটা শেষ করতে না দিয়ে ফস্ করে বলে ফেললেম, "পায়ে বড়ো ব্যথা করছিল।"

পুলিস-সার্জেন্টের হাতে একটি মেয়ের অপমান বাঁচাতে গিয়ে জেলখানায় গিয়েছিলেম। আজ এক মেয়ের আক্রোশ থেকে আর-এক মেয়েকে আচ্ছাদন করবার জন্যে মিথ্যে কথা বলে ফেললেম।

এবারেও শাস্তি শুরু হল। অমিয়া আমার পায়ের কাছে বসল। হরিমতি তাকে কুণ্ঠিত মৃদুকণ্ঠে কী একটা বললে, সে ঈষৎ মুখ বাঁকিয়ে জবাবই করলে না। হরিমতি আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। তখন অমিয়া পড়ল আমার পা নিয়ে। বিপদ ঘটল আমার। কেমন করে বলি 'দরকার নেই, আমার ভালোই লাগে না'। এতদিন পর্যন্ত নিজের পায়ের সম্বন্ধে যে স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ বজায় রেখেছিলেম, সে আর টেঁকে না বুঝি!

ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠে বসে বললেম, "অমিয়া, দে তোর লেখাটা, ওটা তর্জমা করে ফেলি।"

"এখন থাক্‌-না, দাদা। তোমার পা কামড়াচ্ছে, একটু টিপে দিই-না?"

"না, পা কেন কামড়াবে। হাঁ হাঁ, একটু কামড়াচ্ছে বটে। তা, দেখ্‌ অমি, তোর এই ভাইফোঁটার আইডিয়াটা ভারি চমৎকার। কী করে তোর মাথায় এল, তাই ভাবি। ঐ যে লিখেছিস বর্তমান যুগে ভাইয়ের ললাট অতি বিরাট, সমস্ত বাংলাদেশে বিস্তৃত, কোনো একটিমাত্র ঘরে তার স্থান হয় না— এটা খুব-একটা বড়ো কথা। দে, আমি লিখে ফেলি : With the advent of the present age, Brother's brow, waiting for its auspicious anointment from the sisters of Bengal, has grown immensely beyond the narrowness of domestic privacy, beyond the boundaries of the individual home। একটা আইডিয়ার মতো আইডিয়া পেলে কলম পাগল হয়ে ছোটে।"

অমিয়ার পা-টেপার ঝোঁক একেবারে থেমে গেল। মাথাটা ধরে ছিল, লিখতে একটুও গা লাগছিল না— তবু অ্যাস্পিরিনের বড়ি গিলে বসে গেলেম।

পরদিন দুপুরবেলায় আমার জলধর যখন দিবানিদ্রায় রত, দেউড়িতে দরোয়ানজি তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছে, গলির মোড় থেকে ভালুকনাচওয়ালার ডুগডুগি শোনা যাচ্ছে, বিশ্রামহারা অমিয়া যখন যুগলক্ষ্মীর কর্তব্যপালনে বেরিয়েছে, এমন সময় দরজার বাইরে নির্জন বারান্দায় একটি ভীরু ছায়া দেখা দিলে। শেষকালে দ্বিধা করতে করতে কখন হঠাৎ এক সময়ে সেই মেয়েটি একটা হাতপাখা নিয়ে আমার মাথার কাছে বসে বাতাস করতে লাগল। বোঝা গেল, কাল অমিয়ার মুখের ভাবখানা দেখে পায়ে হাত দিতে আজ আর সাহস হল না। এতক্ষণে নববঙ্গের ভাইফোঁটা-প্রচারের মীটিং বসেছে। অমিয়া ব্যস্ত থাকবে। তাই ভাবছিলুম ভরসা করে বলে ফেলি, পায়ে বড়ো ব্যথা করছে। ভাগ্যে বলি নি।— মিথ্যে কথাটা মনের মধ্যে যখন ইতস্তত করছে ঠিক সেই সময়ে, অনাথাসদনের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট হাতে, অমিয়ার প্রবেশ। হরিমতির পাখা-দোলনের মধ্যে হঠাৎ চমক লাগল; তার হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য ও মুখশ্রীর বিবর্ণতা আন্দাজ করা শক্ত হল না। অনাথাসদনের এই সেক্রেটারির ভয়ে তার পাখার গতি খুব মৃদু হয়ে এল।

অমিয়া বিছানার এক ধারে বসে খুব শক্ত সুরে বললে, "দেখো দাদা, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে কত আশ্রয়হারা মেয়ে বড়ো বড়ো পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে দিন কাটাচ্ছে, অথচ সে-সব ধনী ঘরে তাদের প্রয়োজন একটুও জরুরি নয়। গরিব মেয়ে, যারা খেটে খেতে বাধ্য, এরা তাদেরই অন্ন-অর্জনে বাধা দেয় মাত্র। এরা যদি সাধারণের কাজে লাগে যেমন আমাদের অনাথাসদনের কাজ— তা হলে—"

বুঝলেম, আমাকে উপলক্ষ করে হরিমতির উপরে বক্তৃতার এই শিলাবৃষ্টি। আমি বললেম, "অর্থাৎ, তুমি চলবে নিজের শখ-অনুসারে, আর আশ্রয়হীনারা চলবে তোমার হুকুম-অনুসারে। তুমি হবে অনাথাসদনের সেক্রেটারি, আর ওরা হবে অনাথাসদনের সেবাকারিণী। তার চেয়ে নিজেই লাগো সেবার কাজে; বুঝতে পারবে, সে কাজ তোমার অসাধ্য। অনাথাদের অতিষ্ঠ করা সহজ, সেবা করা সহজ নয়। দাবি নিজের উপরে করো, অন্যের উপরে কোরো না।"

আমার ক্ষাত্রস্বভাব, মাঝে মাঝে ভুলে যাই 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্‌'। ফল হল এই যে অমিয়া পিসিমারই সদস্যদের মধ্য থেকে আর-একটি মেয়েকে এনে হাজির করলে— তার নাম প্রসন্ন। তাকে আমার পায়ের কাছে বসিয়ে দিয়ে বললে, "দাদার পায়ে ব্যথা করে, তুমি পা টিপে দাও।" সে যথোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার পা টিপতে লাগল। এই হতভাগ্য দাদা এখন কোন্‌ মুখে বলে যে,

তার পায়ে কোনোরকম বিকার হয় নি। কেমন করে জানায় যে, এমনতরো টেঁপাটেপি করে কেবলমাত্র তাকে অপদস্থ করা হচ্ছে। মনে মনে বুঝলেম, রোগশয্যায় রোগীর আর স্থান হবে না। এর চেয়ে ভালো নববঙ্গের ভাইফোঁটা-সমিতির সভাপতি হওয়া। পাখার হাওয়া আস্তে আস্তে থেমে গেল। হরিমতি স্পষ্ট অনুভব করলে, অস্ত্রটা তারই উদ্দেশে। এ হচ্ছে প্রসন্নকে দিয়ে হরিমতিকে উৎখাত করা। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। একটু পরে পাখাটা মাটিতে রেখে সে উঠে দাঁড়াল। আমার পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে আস্তে আস্তে দুই পায়ে হাত বুলিয়ে চলে গেল।

আবার আমাকে গীতা খুলতে হল। তবুও শ্লোকের ফাঁকে ফাঁকে দরজার ফাঁকের দিকে চেয়ে দেখি— কিন্তু সেই একটুখানি ছায়া আর-কোথাও দেখা গেল না। তার বদলে প্রসন্ন প্রায়ই আসে, প্রসন্নের দৃষ্টান্তে আরো দুই-চারিটি মেয়ে অমিয়ার দেশবিশ্রুত দেশভক্ত দাদার সেবা করবার জন্যে জড়ো হল। অমিয়া এমন ব্যবস্থা করে দিলে, যাতে পালা করে আমার নিত্যসেবা চলে। এ দিকে শোনা গেল, হরিমতি একদিন কাউকে কিছু না বলে কলকাতা ছেড়ে তার পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে চলে গেছে।

মাসের বারোই তারিখে সম্পাদক-বন্ধু এসে বললেন— "একি ব্যাপার। ঠাট্টা নাকি। এই কি তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা।"

আমি হেসে বললেম, "পুজোর বাজারে চলবে না কি।"

"একেবারেই না। এটা তো অত্যন্তই হালকা-রকমের জিনিস।"

সম্পাদকের দোষ নেই। জেলবাসের পর থেকে আমার অশ্রুজল অন্তঃশীলা বইছে। লোকে বাইরে থেকে আমাকে খুব হালকা-প্রকৃতির লোক মনে করে।

গল্পটা আমাকে ফেরত দিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে এল অনিল। বললে, "মুখে বলতে পারব না, এই চিঠিটা পড়ুন।"

চিঠিতে অমিয়াকে, তার দেবীকে, যুগলক্ষ্মীকে বিবাহ করবার ইচ্ছে জানিয়েছে ; এ কথাও বলেছে, অমিয়ার অসম্মতি নেই।

তখন অমিয়ার জন্মবৃত্তান্ত তাকে বলতে হল। সহজে বলতেম না ; কিন্তু জানতেম, হীনবর্ণের 'পরে অনিল শ্রদ্ধাপূর্ণ করুণা প্রকাশ করে থাকে। আমি তাকে বললেম, "পূর্বপুরুষের কলঙ্ক জন্মের দ্বারাই স্খলিত হয়ে যায়, এ তো তোমরা অমিয়ার জীবনেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ। সে পদ্ম, তাতে পঙ্কের চিহ্ন নেই।"

নববঙ্গে ভাইফোঁটার সভা তার পরে আর জমল না। ফোঁটা রয়েছে তৈরি, কপাল মেরেছে দৌড়। আর শুনেছি, অনিল কলকাতা ছেড়ে কুমিল্লায় স্বরাজপ্রচারের কী-একটা কাজ নিয়েছে।

অমিয়া কলেজে ভরতি হবার উদ্যোগে আছে। ইতিমধ্যে পিসিমা তীর্থ থেকে ফিরে আসার পর শুশ্রূষার সাত-পাক বেড়ি থেকে আমার পা দুটো খালাস পেয়েছে।

অগ্রহায়ণ ১৩৩২

সংস্কার

চিত্রগুপ্ত এমন অনেক পাপের হিসাব বড়ো অক্ষরে তাঁর খাতায় জমা করেন যা থাকে পাপীর নিজের অগোচরে। তেমনি এমন পাপও ঘটে যাকে আমিই চিনি পাপ বলে, আর-কেউ না। যেটার কথা লিখতে বসেছি সেটা সেই জাতের। চিত্রগুপ্তের কাছে জবাবদিহি করবার পূর্বে আগে-ভাগে কবুল করলে অপরাধের মাত্রাটা হালকা হবে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল কাল শনিবার দিনে। সেদিন আমাদের পাড়ায় জৈনদের মহলে কী একটা পরব ছিল। আমার স্ত্রী কলিকাকে নিয়ে মোটরে করে বেরিয়েছিলুম— চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল বন্ধু নয়নমোহনের বাড়িতে।

স্ত্রীর কলিকা নামটি শ্বশুর-দত্ত, আমি ওর জন্য দায়ী নই। নামের উপযুক্ত তাঁর স্বভাব নয়, মতামত খুবই পরিস্ফুট। বড়োবাজারে বিলিতি কাপড়ের বিপক্ষে যখন পিকেট করতে বেরিয়েছিলেন, তখন দলের লোক ভক্তি করে তাঁর নাম দিয়েছিল ধ্রুবব্রতা। আমার নাম গিরীন্দ্র। দলের লোক আমাকে আমার পত্নীর পতি বলেই জানে, স্বনামের সার্থকতার প্রতি লক্ষ করে না। বিধাতার কৃপায় পৈতৃক উপার্জনের গুণে আমারও কিঞ্চিৎ সার্থকতা আছে। তার প্রতি দলের লোকের দৃষ্টি পড়ে চাঁদা আদায়ের সময়।

স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর স্বভাবের অমিল থাকলেই মিল ভালো হয়, শুকনো মাটির সঙ্গে জলধারার মতো। আমার প্রকৃতি অত্যন্ত ঢিলে, কিছুই বেশি করে চেপে ধরি নে। আমার স্ত্রীর প্রকৃতি অত্যন্ত আঁট, যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না। আমাদের এই বৈষম্যের গুণেই সংসারে শান্তিরক্ষা হয়।

কেবল একটা জায়গায় আমাদের মধ্যে যে-অসামঞ্জস্য ঘটেছে তার আর মিটমাট হতে পারল না। কলিকার বিশ্বাস, আমি স্বদেশকে ভালোবাসি নে। নিজের বিশ্বাসের উপর তাঁর বিশ্বাস অটল— তাই আমার আন্তরিক দেশ-ভালোবাসার যতই প্রমাণ দিয়েছি, তাঁদের নির্দিষ্ট বাহ্য লক্ষণের সঙ্গে মেলে না বলে কিছুতেই তাকে দেশ-ভালোবাসা বলে স্বীকার করাতে পারি নে।

ছেলেবেলা থেকে আমি গ্রন্থবিলাসী, নতুন বইয়ের খবর পেলেই কিনে আনি। আমার শত্রুরাও কবুল করবে যে, সে বই পড়েও থাকি ; বন্ধুরা খুবই জানেন যে, প'ড়ে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেও ছাড়ি নে।— সেই আলোচনার চোটে বন্ধুরা পাশ কাটিয়ে চলাতে অবশেষে একটিমাত্র মানুষে এসে ঠেকেছে, বনবিহারী, যাকে নিয়ে আমি রবিবারে আসর জমাই। আমি তার নাম দিয়েছি কোণবিহারী। ছাদে বসে তার সঙ্গে আলাপ করতে করতে এক-একদিন রাত্তির দুটো হয়ে যায়। আমরা যখন এই নেশায় ভোর তখন আমাদের পক্ষে সুদিন ছিল না। তখনকার পুলিস কারও বাড়িতে গীতা দেখলেই সিডিশনের প্রমাণ পেত। তখনকার দেশভক্ত যদি দেখত কারও ঘরে বিলিতি বইয়ের পাতা কাটা, তবে তাকে জানত দেশবিদ্রোহী। আমাকে ওরা শ্যামবর্ণের প্রলেপ দেওয়া শ্বেত-দ্বৈপায়ন বলেই গণ্য করত। সরস্বতীর বর্ণ সাদা বলেই সেদিন দেশভক্তদের কাছ থেকে তাঁর পূজা মেলা শক্ত হয়েছিল। যে-সরোবরে তাঁর শ্বেতপদ্ম ফোটে সেই সরোবরের জলে দেশের কপাল-পোড়ানো আগুন নেবে না, বরঞ্চ বাড়ে, এমনি একটা রব উঠেছিল।

সহধর্মিণীর সদ্দৃষ্টান্ত ও নিরন্তর তাগিদ সত্ত্বেও আমি খদ্দর পরি নে ; তার কারণ এ নয় যে, খদ্দরে কোনো দোষ আছে বা গুণ নেই বা বেশভূষায় আমি শৌখিন। একেবারে উলটো— স্বাদেশিক চালচলনের বিরুদ্ধে অনেক অপরাধ আমার আছে, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা তার অন্তর্গত নয়। ময়লা মোটা রকমের সাজ, আলুথালু রকমে ব্যবহার করাটাই আমার অভ্যাস। কলিকার ভাবান্তর ঘটবার পূর্ববর্তী যুগে চীনেবাজারের আগা-চওড়া জুতো পরতুম, সে জুতোয় প্রতিদিন কালিমা-লেপন করিয়ে নিতে ভুলতুম, মোজা পরতে আপদ বোধ হত, শার্ট না পরে পাঞ্জাবি পরতে আরাম পেতুম, আর সেই পাঞ্জাবিতে দুটো-একটা বোতামের অভাব ঘটলেও খেয়াল করতুম না— ইত্যাদি কারণে কলিকার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হবার আশঙ্কা ঘটেছিল।

সে বলত "দেখো, তোমার সঙ্গে কোথাও বেরোতে আমার লজ্জা করে।"

আমি বলতুম, "আমার অনুগত হবার দরকার নেই, আমাকে বাদ দিয়েই তুমি বেরিয়ো।"

আজ যুগের পরিবর্তন হয়েছে, আমার ভাগ্যের পরিবর্তন হয় নি। আজও কলিকা বলে, 'তোমার সঙ্গে বেরোতে আমার লজ্জা করে।' তখন কলিকা যে-দলে ছিল তাদের উর্দি আমি ব্যবহার করি নি, আজ যে-দলে ভিড়েছে তাদের উর্দিও গ্রহণ করতে পারলুম না। আমাকে নিয়ে আমার স্ত্রীর লজ্জা সমানই রয়ে গেল। এটা আমারই স্বভাবের দোষ। যে-কোনো দলেরই হোক, ভেক ধারণ করতে

আমার সংকোচ লাগে। কিছুতেই এটা কাটাতে পারলুম না। অপর পক্ষে মতান্তর জিনিসটা কলিকা খতম করে মেনে নিতে পারে না। ঝরনার ধারা যেমন মোটা পাথরটাকে বারে বারে ঘুরে ফিরে তর্জন করে বৃথা ঠেলা দিতেই থাকে, তেমনি ভিন্ন রুচিকে চলতে ফিরতে দিনে রাত্রে ঠেলা না দিয়ে কলিকা থাকতে পারে না ; পৃথক মত-নামক পদার্থের সংস্পর্শমাত্র ওর স্নায়ুতে যেন দুনির্বারভাবে সুড়সুড়ি লাগায়, ওকে একেবারে ছটফটিয়ে তোলে।

কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবার পূর্বেই আমার নিষ্‌খদ্দর বেশ নিয়ে একসহস্র-একতম বার কলিকা যে আলোচনা উত্থাপিত করেছিল, তাতে তার কণ্ঠস্বরে মাধুর্যমাত্র ছিল না। বুদ্ধির অভিমান থাকাতে বিনা তর্কে তার ভর্ৎসনা শিরোধার্য করে নিতে পারি নি— স্বভাবের প্রবর্তনায় মানুষকে এত ব্যর্থ চেষ্টাতেও উৎসাহিত করে। তাই আমিও একসহস্র-একতম বার কলিকাকে খোঁটা দিয়ে বললুম, "মেয়েরা বিধিদত্ত চোখটার উপর কালাপেড়ে মোটা ঘোমটা টেনে আচারের সঙ্গে আঁচলের গাঁট বেঁধে চলে। মননের চেয়ে মাননেই তাদের আরাম। জীবনের সকল ব্যবহারকেই রুচি ও বুদ্ধির স্বাধীন ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে সংস্কারের জেনানায় পর্দানশীন করতে পারলে তারা বাঁচে। আমাদের এই আচারজীর্ণ দেশে খদ্দর-পরাটা সেইরকম মালাতিলকধারী ধার্মিকতার মতোই একটা সংস্কারে পরিণত হতে চলেছে বলেই মেয়েদের ওতে এত আনন্দ।"

কলিকা রেগে অস্থির হয়ে উঠল। তার আওয়াজ শুনে পাশের ঘর থেকে দাসীটা মনে করলে, ভার্যাকে পুরো ওজনের গয়না দিতে কর্তা বুঝি ফাঁকি দিয়েছে। কলিকা বললে, "দেখো, খদ্দর-পরার শুচিতা যেদিন গঙ্গাস্নানের মতোই দেশের লোকের সংস্কারে বাধা পড়ে যাবে সেদিন দেশ বাঁচবে। বিচার যখন স্বভাবের সঙ্গে এক হয়ে যায় তখনই সেটা হয় আচার। চিন্তা যখন আকারে দৃঢ়বদ্ধ হয় তখনই সেটা হয় সংস্কার ; তখন মানুষ চোখ বুজে কাজ করে যায়, চোখ খুলে দ্বিধা করে না।"

এই কথাগুলো অধ্যাপক নয়নমোহনের আপ্তবাক্য, তার থেকে কোটেশনমার্কা ক্ষয়ে গিয়েছে, কলিকা ওগুলোকে নিজের স্বচিন্তিত বলেই জানে।

'বোবার শত্রু নেই' যে পুরুষ বলেছিল সে নিশ্চয় ছিল অবিবাহিত। কোনো জবাব দিলুম না দেখে কলিকা দ্বিগুণ ঝেঁকে উঠে বললে, "বর্ণভেদ তুমি মুখে অগ্রাহ্য কর অথচ কাজে তার প্রতিকারের জন্য কিছুই কর না। আমরা খদ্দর পরে পরে সেই ভেদটার উপর অখণ্ড সাদা রঙ বিছিয়ে দিয়েছি, আবরণভেদ তুলে দিয়ে বর্ণভেদটার ছাল ছাড়িয়ে ফেলেছি।"

বলতে যাচ্ছিলুম, 'বর্ণভেদকে মুখেই অগ্রাহ্য করেছিলুম বটে যখন থেকে মুসলমানের রান্না মুরগির ঝোল গ্রাহ্য করেছিলুম। সেটা কিন্তু মুখস্থ বাক্য নয়, মুখস্থ কার্য— তার গতিটা অন্তরের দিকে। কাপড় দিয়ে বর্ণ-বৈষম্য ঢাকা দেওয়াটা বাহ্যিক ; ওতে ঢাকা দেওয়াই হয়, মুছে দেওয়া হয় না।' তর্কটাকে প্রকাশ করে বলবার যোগ্য সাহস কিন্তু হল না। আমি ভীরু পুরুষমানুষ মাত্র, চুপ করে রইলুম। জানি আপসে আমরা দুজনে যে-সব তর্ক শুরু করি কলিকা সেগুলিকে নিয়ে ধোবার বাড়ির কাপড়ের মতো আছড়িয়ে কচলিয়ে আনে তার বাহিরের বন্ধুমহল থেকে। দর্শনের প্রফেসর নয়নমোহনের কাছ থেকে প্রতিবাদ সংগ্রহ করে তার দীপ্ত চক্ষু নীরব ভাষায় আমাকে বলতে থাকে, "কেমন! জব্দ!"

নয়নের ওখানে নিমন্ত্রণে যাবার ইচ্ছা আমার একটুও ছিল না। নিশ্চয় জানি, হিন্দুকাল্‌চারে সংস্কার ও স্বাধীন বুদ্ধি, আচার ও বিচারের আপেক্ষিক স্থানটা কী, এবং সেই আপেক্ষিকতায় আমাদের দেশকে অন্য সকল দেশের চেয়ে উৎকর্ষ কেন দিয়েছে, এই নিয়ে চায়ের টেবিলে তপ্ত চায়ের ধোঁয়ার মতোই সূক্ষ্ম আলোচনায় বাতাস আর্দ্র ও আচ্ছন্ন হবার আশু সম্ভাবনা আছে। এ দিকে সোনালি পত্রলেখায় মণ্ডিত অখণ্ডিতপত্রবর্তী নবীন বহিগুলি সদ্য দোকান থেকে আমার তাকিয়ার পাশে প্রতীক্ষা করছে, শুভদৃষ্টিমাত্র হয়েছে, কিন্তু এখনো তাদের ব্রাউন মোড়কের অবগুণ্ঠনমোচন হয় নি ; তাদের সম্বন্ধে আমার পূর্বরাগ প্রতি মুহূর্তে অন্তরে অন্তরে প্রবল হয়ে উঠছে। তবু বেরোতে হল ; কারণ ধ্রুবব্রতার ইচ্ছাবেগ প্রতিহত হলে সেটা তার বাক্যে ও অবাক্যে এমন-সকল ঘূর্ণীরূপ ধারণ করে যেটা আমার

পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

বাড়ি থেকে অল্প একটু বেরিয়েছি। যেখানে রাস্তার ধারে কলতলা পেরিয়ে খোলার চালের ধারে স্থূলোদর হিন্দুস্থানী ময়রার দোকানে তেলে-ভাজা নানা প্রকার অপথ্য সৃষ্টি হচ্ছে, তার সামনে এসে দেখি বিষম একটা হল্লা। আমাদের প্রতিবেশী মাড়োয়ারিরা নানা বহুমূল্য পুজোপচার নিয়ে যাত্রা করে সবে-মাত্র বেরিয়েছে। এমন সময় এই জায়গাটাতে এসে ঠেকে গেল। শুনতে পেলেম মার্-মার্ ধ্বনি। মনে ভাবলুম, কোনো গাঁটকাটাকে শাসন চলছে।

মোটরের শিঙা ফুঁকতে ফুঁকতে উত্তেজিত জনতার কেন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখি, আমাদের পাড়ার বুড়ো সরকারি মেথরটাকে বেদম মারছে। একটু আগেই রাস্তার কলতলায় স্নান সেরে সাফ কাপড় পরে ডান হাতে এক বালতি জল ও বগলে ঝাঁটা নিয়ে রাস্তা দিয়ে সে যাচ্ছিল। গায়ে চেক-কাটা মেরজাই, আঁচড়ানো চুল ভিজে ; বাঁ হাত ধরে সঙ্গে চলেছিল আট-নয় বছরের এক নাতি। দুজনকেই দেখতে সুশ্রী, সুঠাম দেহ। সেই ভিড়ে কারও সঙ্গে বা কিছুর সঙ্গে তাদের ঠেকাঠেকি হয়ে থাকবে। তার থেকে এই নিরন্তর মারের সৃষ্টি। নাতিটা কাঁদছে আর সকলকে অনুনয় করছে, "দাদাকে মেরো না।" বুড়োটা হাত জোড় করে বলছে, "দেখতে পাই নি, বুঝতে পারি নি, কসুর মাফ করো।" অহিংসাব্রত পুণ্যার্থীদের রাগ চড়ে উঠছে। বুড়োর ভীত চোখ দিয়ে জল পড়ছে, দাড়ি দিয়ে রক্ত।

আমার আর সহ্য হয় না। ওদের সঙ্গে কলহ করতে নামা আমার পক্ষে অসম্ভব। স্থির করলুম, মেথরকে আমার নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে দেখাব আমি ধার্মিকদের দলে নই।

চঞ্চলতা দেখে কলিকা আমার মনের ভাব বুঝতে পারলে। জোর করে আমার হাত চেপে ধরে বললে, "করছ কী, ও যে মেথর !"

আমি বললুম, "হোক-না মেথর, তাই বলে ওকে অন্যায় মারবে ?"

কলিকা বললে, "ওরই তো দোষ। রাস্তার মাঝখান দিয়ে যায় কেন। পাশ কাটিয়ে গেলে কি ওর মানহানি হত।"

আমি বললুম, "সে আমি বুঝি নে, ওকে আমি গাড়িতে তুলে নেবই।"

কলিকা বললে, "তা হলে এখনই এখানে রাস্তায় নেমে যাব। মেথরকে গাড়িতে নিতে পারব না— হাড়িডোম হলেও বুঝতুম, কিন্তু মেথর !"

আমি বললুম, "দেখছ-না, স্নান করে ধোপ-দেওয়া কাপড় পরেছে ? এদের অনেকের চেয়ে ও পরিষ্কার।"

"তা হোক-না, ও যে মেথর !"

শোফারকে বললে, "গঙ্গাদীন, হাঁকিয়ে চলে যাও।"

আমারই হার হল। আমি কাপুরুষ। নয়নমোহন সমাজতত্ত্বঘটিত গভীর যুক্তি বের করেছিল— সে আমার কানে পৌঁছল না, তার জবাবও দিই নি।

মাদ্রাজ। ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫
আষাঢ় ১৩৩৫

বলাই

মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীবজন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক করে নিয়েছে— আমাদের বাঘ-গোরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে পুরে, অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধরে

রেখেছে। যেমন রাগিণী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সংগীত করে তোলে, তার পর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না। কিন্তু, সংগীতের ভিতরে এক-একটি সুর অন্য-সকল সুরকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে— কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগান্ধার, কোনোটাতে পঞ্চম।

আমার ভাইপো বলাই— তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়ে-চড়ে বেড়ানো নয়। পুবদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে; ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেলবেলাকার রোদ্দুর পড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায়; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী একটা সংগ্রহ করে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে; ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভরে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা বসে বসে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে। অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে একজোড়া অতি পুরানো পাখি বেঙ্গমা বেঙ্গমী, তাদের গল্প। ঐ ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে সর্ব-তাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে পর্যন্ত নেবে গিয়েছে, সেইটে দেখে আর ওর মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না; ওর বোধ হয়, যেন ঐ ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িয়ে-চলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে; প্রায়ই তারই সেই ঢালু বেয়ে ও নিজেও গড়াত— সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত— গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগত আর ও খিলখিল করে হেসে উঠত।

রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনারঙের রোদ্দুর দেবদারুবনের উপরে এসে পড়ে— ও কাউকে না বলে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই দেবদারুবনের নিস্তব্ধ ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছমছম করে— এই-সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়। তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, 'এক যে ছিল রাজা'দের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁকড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠছে এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে পড়ে পড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির-অসমাপ্ত গল্প। সদ্য গজিয়ে-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী যে একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে, 'তোমার নাম কী।' হয়তো বলে, 'তোমার মা কোথায় গেল।' বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই।'

কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এইজন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আমলকী পাড়ে, ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্ ক'রে বকুলগাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়— ওর কাঁদতে লজ্জা করে পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে; এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি

হল্‌দে নামহারা ফুল, অতি ছোটো ছোটো ; মাঝে মাঝে কণ্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা ; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও-বা কালমেঘের লতা, কোথাও-বা অনন্তমূল ; পাখিতে-খাওয়া নিমফলের বিচি পড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা— সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়নি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয় । তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই ।

এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে বসে তার গলা জড়িয়ে বলে, "ঐ ঘাসিয়াড়াকে বলো না, আমার ঐ গাছগুলো যেন না কাটে ।"

কাকি বলে, "বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস । ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন ।"

বলাই অনেকদিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতকগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই— ওর চার দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই ।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে, যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে— সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাঁক আর জল । কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে, দিনে-রাত্রে ।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে, তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে বলে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব ।' বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে দ্যুলোককে দোহন করে ; পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে ; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, 'আমি থাকব ।' সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-একরকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ঐ বলাই । আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলুম ।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত করে ধরে নিয়ে গেল বাগানে । এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাকা, এ গাছটা কী ।"

দেখলুম একটা শিমুলগাছের চারা বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে ।

হায় রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে । এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে । তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই ব্যগ্র হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল । শিমুলগাছ বাড়েও দ্রুত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না । যখন হাত দুয়েক উঁচু হয়েছে তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখবামাত্র মা যেমন মনে করে আশ্চর্য শিশু । বলাই ভাবলে, আমাকেও চমৎকৃত করে দেবে ।

আমি বললুম, "মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে ।"

বলাই চমকে উঠল । এ কী দারুণ কথা । বললে, "না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেলো না ।"

আমি বললুম, "কী যে বলিস তার ঠিক নেই । একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে । বড়ো হলে চার দিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে ।"

আমার সঙ্গে যখন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে । কোলে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "কাকি, তুমি কাকাকে বারণ করে দাও, গাছটা যেন না কাটেন ।"

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল । ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, "ওগো, শুনছ ! আহা, ওর গাছটা

রেখে দাও।”

রেখে দিলুম। গোড়ায় বলাই না যদি দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হত না। কিন্তু, এখন রোজই চোখে পড়ে। বছরখানেকের মধ্যে গাছটা নির্লজ্জের মতো মস্ত বেড়ে উঠল। বলাইয়ের এমন হল, এই গাছটার 'পরেই তার সব চেয়ে স্নেহ।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো। একটা অজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠছে। যে দেখে সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে। আরো দু-চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম, এর বদলে খুব ভালো কতকগুলো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব।

বললেম, “নিতান্তই শিমুলগাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর-একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে পুঁতে দেব, সুন্দর দেখতে হবে।”

কিন্তু কাটবার কথা বললেই বলাই আঁতকে ওঠে, আর ওর কাকি বলে, “আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে।”

আমার বউদিদির মৃত্যু হয়েছে যখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ। বছর দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন বলে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিমলেয়— তার পরে বিলেত নিয়ে যাবার কথা।

কাঁদতে কাঁদতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শূন্য।

তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শূন্য শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া একপাটি জুতো, তার রবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের গল্পওয়ালা ছবির বই নাড়েন-চাড়েন ; এতদিনে এই-সব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে, এই কথা বসে বসে চিন্তা করেন।

কোনো এক সময়ে দেখলুম, লক্ষ্মীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে— এতদূর অসংগত হয়ে উঠেছে যে, আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, “কাকি, আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।”

বিলেত যাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, “ওগো শুনছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো।”

জিজ্ঞাসা করলুম, “কেন।”

বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেম, “সে গাছ তো কাটা হয়ে গেছে।”

বলাইয়ের কাকি দুদিন অন্ন গ্রহণ করলেন না, আর অনেকদিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কন নি। বলাইয়ের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন ওঁর নাড়ি ছিঁড়ে ; আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর যেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর বুকের মধ্যে ক্ষত করে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিরূপ, তারই প্রাণের দোসর।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

চিত্রকর

ময়মনসিংহ ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে আমাদের গোবিন্দ এল কলকাতায়। বিধবা মায়ের অল্প কিছু সম্বল ছিল। কিন্তু, সব চেয়ে তার বড়ো সম্বল ছিল নিজের অবিচলিত সংকল্পের মধ্যে। সে ঠিক করেছিল, 'পয়সা' করবই, সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে। সর্বদাই তার ভাষায় ধনকে সে উল্লেখ করত 'পয়সা' বলে। অর্থাৎ, তার মনে খুব একটা দর্শন স্পর্শন ঘ্রাণের যোগ্য প্রত্যক্ষ পদার্থ ছিল ; তার মধ্যে বড়ো নামের মোহ ছিল না ; অত্যন্ত সাধারণ পয়সা, হাটে হাটে হাতে হাতে ঘুরে ঘুরে ক্ষয়ে-যাওয়া, মলিন-হয়ে-যাওয়া পয়সা, তাম্রগন্ধী পয়সা, কুবেরের আদিম স্বরূপ, যা রুপোয় সোনায় কাগজে দলিলে নানা মূর্তি পরিগ্রহ করে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

নানা বাঁকা পথের ভিতর দিয়ে নানা পঙ্কে আবিল হতে হতে আজ গোবিন্দ তার পয়সাপ্রবাহিণীর প্রশস্তধারার পাকা বাঁধানো ঘাটে এসে পৌঁচেছে। গানিব্যাগওয়ালা বড়োসাহেব ম্যাক্‌ডুগালের বড়োবাবুর আসনে তার ধ্রুব প্রতিষ্ঠা। সবাই তাকে নাম দিয়েছিল ম্যাক্‌দুলাল।

গোবিন্দর পৈতৃব্য ভাই মুকুন্দ যখন উকিল-লীলা সংবরণ করলেন তখন একটি বিধবা স্ত্রী, একটি চার বছরের ছেলে, কলকাতায় একটি বাড়ি কিছু জমা টাকা রেখে তিনি গেলেন লোকান্তরে। সম্পত্তির সঙ্গে কিছু ঋণও ছিল, সুতরাং তাঁর পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান বিশেষ ব্যয়সংক্ষেপের উপর নির্ভর করত। এই কারণে তাঁর ছেলে চুনিলাল যে-সমস্ত উপকরণের মধ্যে মানুষ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে তুলনায় সেগুলি খ্যাতিযোগ্য নয়।

মুকুন্দদাদার উইল-অনুসারে এই পরিবারের সম্পূর্ণ ভার পড়েছিল গোবিন্দর 'পরে। গোবিন্দ শিশুকাল থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রের কানে মন্ত্র দিলে— 'পয়সা করো'।

ছেলেটির দীক্ষার পথে প্রধান বাধা দিলেন তাঁর মা সত্যবতী। স্পষ্ট কথায় তিনি কিছু বলেন নি, বাধাটা ছিল তাঁর ব্যবহারে। শিশুকাল থেকেই তাঁর বাতিক ছিল শিল্পকাজে। ফুল ফল পাতা নিয়ে, খাবারের জিনিস নিয়ে, কাগজ কেটে, কাপড় কেটে, মাটি দিয়ে, ময়দা দিয়ে, জামের রস ফলসার রস জবার রস শিউলিবোঁটার রস দিয়ে, নানা অভূতপূর্ব অনাবশ্যক জিনিস-রচনায় তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। এতে তাঁকে দুঃখও পেতে হয়েছে। কেননা, যা অদরকারি, যা অকারণ, তার বেগ আষাঢ়ের আকস্মিক বন্যাধারার মতো— সচলতা অত্যন্ত বেশি কিন্তু দরকারি কাজের খেয়া বাইবার পক্ষে অচল। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে, জ্ঞাতিবাড়িতে নিমন্ত্রণ, সত্যবতী ভুলেই গেছেন, শোবার ঘরে দরজা বন্ধ, একতাল মাটি চটকে বেলা কাটছে। জ্ঞাতিরা বললে, বড়ো অহংকার। সন্তোষজনক জবাব দেবার জো নেই। এ-সব কাজেও ভালোমন্দর যে মূল্যবিচার চলে, সেটা বইপড়া বিদ্যার যোগেই মুকুন্দ জানতেন। আর্ট শব্দটার মাহাত্ম্যে শরীর রোমাঞ্চিত হত। কিন্তু, তাঁর আপন গৃহিণীর হাতের কাজেও যে এই শব্দটার কোনো স্থান আছে এমন কথা মনে করতেই পারতেন না। এই মানুষটির স্বভাবটিতে কোথাও কাঁটাখোঁচা ছিল না। তাঁর স্ত্রী অনাবশ্যক খেয়ালে অযথা সময় নষ্ট করেন, এটা দেখে তাঁর হাসি পেত, সে হাসি স্নেহরসে ভরা। এ নিয়ে সংসারের লোক কেউ যদি কটাক্ষ করত তিনি তখনই তার প্রতিবাদ করতেন। মুকুন্দর স্বভাবে অদ্ভুত একটা আত্মবিরোধ ছিল— ওকালতির কাজে ছিলেন প্রবীণ, কিন্তু ঘরের কাজে বিষয়বুদ্ধি ছিল না বললেই হয়। পয়সা তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে যথেষ্ট বইত, কিন্তু ধ্যানের মধ্যে আটকা পড়ত না। সেইজন্য মনটা ছিল মুক্ত ; অনুগত লোকদের 'পরে নিজের ইচ্ছে চালাবার জন্যে কখনো দৌরাত্ম্য করতে পারতেন না। জীবনযাত্রার অভ্যাস ছিল খুব সাদাসিধা, নিজের স্বার্থ বা সেবা নিয়ে পরিজনদের 'পরে কোনোদিন অযথা দাবি করেন নি। সংসারের লোকে সত্যবতীর কাজে শৈথিল্য নিয়ে কটাক্ষ করলে মুকুন্দ তখনই সেটা থামিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে আদালত থেকে ফেরবার পথে রাধাবাজার থেকে কিছু রঙ, কিছু রঙিন রেশম, রঙের পেনসিল কিনে এনে সত্যবতীর অজ্ঞাতসারে তাঁর শোবার ঘরে কাঠের সিন্ধুকটার 'পরে সাজিয়ে রেখে আসতেন। কোনোদিন বা সত্যবতীর আঁকা একটা ছবি তুলে নিয়ে বলতেন, "বা, এ

তো বড়ো সুন্দর হয়েছে।" একদিন একটা মানুষের ছবিকে উলটিয়ে ধরে তার পা দুটোকে পাখির মুণ্ড বলে স্থির করলেন ; বললেন, "সতু, এটা কিন্তু বাঁধিয়ে রাখা চাই— বকের ছবি যা হয়েছে চমৎকার !" মুকুন্দ তাঁর স্ত্রীর চিত্ররচনায় ছেলেমানুষি কল্পনা করে মনে মনে যে-রসটুকু পেতেন, স্ত্রী ও তাঁর স্বামীর চিত্রবিচার থেকে ভোগ করতেন সেই একই রস। সত্যবতী মনে নিশ্চিত জানতেন বাংলাদেশের আর-কোনো পরিবারে তিনি এত ধৈর্য, এত প্রশ্রয় আশা করতে পারতেন না। শিল্পসাধনায় তাঁর এই দুর্নিবার উৎসাহকে কোনো ঘরে এত দরদের সঙ্গে পথ ছেড়ে দিত না। এইজন্যে যেদিন তাঁর স্বামী তাঁর কোনো রচনা নিয়ে অদ্ভুত অত্যুক্তি করতেন সেদিন সত্যবতী যেন চোখের জল সামলাতে পারতেন না।

এমন দুর্লভ সৌভাগ্যকেও সত্যবতী একদিন হারালেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্বামী একটা কথা স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন যে, তাঁর ঋণজড়িত সম্পত্তির ভার এমন কোনো পাকা লোকের হাতে দেওয়া দরকার যাঁর চালনার কৌশলে ফুটো নৌকোও পার হয়ে যাবে। এই উপলক্ষে সত্যবতী এবং তার ছেলেটি সম্পূর্ণভাবে গিয়ে পড়লেন গোবিন্দর হাতে। গোবিন্দ প্রথম দিন থেকেই জানিয়ে দিলেন, সর্বাগ্রে এবং সকলের উপরে পয়সা। গোবিন্দর এই উপদেশের মধ্যে এমন একটা সুগভীর হীনতা ছিল যে, সত্যবতী লজ্জায় কুণ্ঠিত হত।

তবু নানা আকারে আহারে-ব্যবহারে পয়সার সাধনা চলল। তা নিয়ে কথায় কথায় আলোচনা না করে তার উপরে যদি একটা আব্রু থাকত তা হলে ক্ষতি ছিল না। সত্যবতী মনে মনে জানতেন, এতে তাঁর ছেলের মনুষ্যত্ব খর্ব করা হয়— কিন্তু সহ্য করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না ; কেননা, যে-চিত্তভাব সুকুমার, যার মধ্যে একটি অসামান্য মর্যাদা আছে, সেই সব চেয়ে অরক্ষিত ; তাকে আঘাত করা, বিদ্রূপ করা, সাধারণ রূঢ়স্বভাব মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

শিল্পচর্চার জন্যে কিছু কিছু উপকরণ আবশ্যক। এতকাল সত্যবতী তা না চাইতেই পেয়েছেন, সেজন্যে কোনোদিন তাঁকে কুণ্ঠিত হতে হয় নি। সংসারযাত্রার পক্ষে এই সমস্ত অনাবশ্যক সামগ্রী, ব্যয়ের ফর্দে ধরে দিতে আজ যেন তাঁর মাথা কাটা যায়। তাই তিনি নিজের আহারের খরচ বাঁচিয়ে গোপনে শিল্পের সরঞ্জাম কিনিয়ে আনাতেন। যা-কিছু কাজ করতেন সেও গোপনে দরজা বন্ধ করে। ভর্ৎসনার ভয়ে নয়, অরসিকের দৃষ্টিপাতের সংকোচে। আজ চুনি ছিল তাঁর শিল্পরচনার একমাত্র দর্শক ও বিচারকারী। এই কাজে ক্রমে তার সহযোগিতাও ফুটে উঠল। তাকে লাগল বিষম নেশা। শিশুর এ অপরাধ ঢাকা পড়ে না, খাতার পাতাগুলো অতিক্রম করে দেয়ালের গায়ে পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে। হাতে মুখে জামার হাতায় কলঙ্ক ধরা পড়ে। পয়সা-সাধনার বিরুদ্ধে ইন্দ্রদেব শিশুর চিত্তকেও প্রলুব্ধ করতে ছাড়েন না। খুড়োর হাতে অনেক দুঃখ তাকে পেতে হল।

এক দিকে শাসন যতই বাড়তে চলল আর-এক দিকে মা তাকে ততই অপরাধে সহায়তা করতে লাগলেন। আপিসের বড়োসাহেব মাঝে মাঝে আপিসের বড়োবাবুকে নিয়ে আপন কাজে মফস্বলে যেতেন, সেই সময়ে মায়েতে ছেলেতে মিলে অবাধ আনন্দ। একেবারে ছেলেমানুষির একশেষ! যে-সব জন্তুর মূর্তি হত বিধাতা এখনো তাদের সৃষ্টি করেন নি— বেড়ালের ছাঁচের সঙ্গে কুকুরের ছাঁচ যেত মিলে, এমন-কি, মাছের সঙ্গে পাখির প্রভেদ ধরা কঠিন হত। এই-সমস্ত সৃষ্টিকার্য রক্ষা করবার উপায় ছিল না— বড়োবাবু ফিরে আসবার পূর্বেই এদের চিহ্ন লোপ করতে হত। এই দুজনের সৃষ্টিলীলায় ব্রহ্মা এবং রুদ্রই ছিলেন, মাঝখানে বিষ্ণুর আগমন হল না।

শিল্পরচনাবায়ুর প্রকোপ সত্যবতীদের বংশে প্রবল ছিল। তারই প্রমাণস্বরূপে সত্যবতীর চেয়ে বয়সে বড়ো তাঁরই এক ভাগনে রঙ্গলাল চিত্রবিদ্যায় হঠাৎ নামজাদা হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ, দেশের রসিক লোক তাঁর রচনার অদ্ভুতত্ব নিয়ে খুব অট্টহাস্য জমালে। তারা যে-রকম কল্পনা করে তার সঙ্গে তাঁর কল্পনার মিল হয় না দেখে তাঁর গুণপনার সম্বন্ধে তাদের প্রচণ্ড অবজ্ঞা হল। আশ্চর্য এই যে, এই অবজ্ঞার জমিতেই বিরোধ-বিদ্রূপের আবহাওয়ায় তাঁর খ্যাতি বেড়ে উঠতে লাগল ; যারা তাঁর যতই নকল করে তারাই উঠে পড়ে লাগল প্রমাণ করতে যে, লোকটা আর্টিস্ট্ হিসাবে ফাঁকি— এমন-কি,

তার টেক্‌নিকে সুস্পষ্ট গলদ। এই পরমনিন্দিত চিত্রকর একদিন আপিসের বড়োবাবুর অবর্তমানে এলেন তাঁর মামির বাড়িতে। দ্বারে ধাক্কা মেরে মেরে ঘরে যখন প্রবেশলাভ করলেন, দেখলেন মেঝেতে পা ফেলবার জো নেই। ব্যাপারখানা ধরা পড়ল। রঙ্গলাল বললেন, "এতদিন পরে দেখা গেল, গুণীর প্রাণের ভিতর থেকে সৃষ্টিমূর্তি তাজা বেরিয়েছে, এর মধ্যে দাগা-বুলোনোর তো কোনো লক্ষণ নেই, যে-বিধাতা রূপ সৃষ্টি করেন তাঁর বয়সের সঙ্গে ওর বয়সের মিল আছে। সব ছবিগুলো বের করে আমাকে দেখাও।"

কোথা থেকে বের করবে। যে-গুণী রঙে রঙে ছায়ায় আলোয় আকাশে আকাশে চিত্র আঁকেন তিনি তাঁর কুহেলিকা-মরীচিকাগুলি যেখানে অকাতরে সরিয়ে ফেলেন, এদের কীর্তিগুলোও সেইখানেই গেছে। রঙ্গলাল মাথার দিব্যি দিয়ে তাঁর মামিকে বললেন, "এবার থেকে তোমরা যা-কিছু রচনা করবে আমি এসে সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।"

বড়োবাবু এখনো আসেন নি। সকাল থেকে শ্রাবণের ছায়ায় আকাশ ধ্যানমগ্ন, বৃষ্টি পড়ছে ; বেলা ঘড়ির কাঁটার কোন্‌ সংকেতের কাছে তার ঠিকানা নেই, তার খোঁজ করতেও মন যায় না। আজ চুনিবাবু নৌকো-ভাসানোর ছবি আঁকতে লেগেছেন। নদীর ঢেউগুলো মকরের পাল, হাঁ করে নৌকোটাকে গিলতে চলেছে এমনিতরো ভাব ; আকাশের মেঘগুলোও যেন উপর থেকে চাদর উড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে— কিন্তু, মকরগুলো সর্বসাধারণের মকর নয়, আর মেঘগুলোকে 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিবেশঃ' বললে অত্যুক্তি করা হবে। এ কথাও সত্যের অনুরোধে বলা উচিত যে, এইরকমের নৌকো যদি গড়া হয় তা হলে ইনসুয়োরেন্স আপিস কিছুতেই তার দায়িত্ব নিতে রাজি হবে না। চলল রচনা, আকাশের চিত্রীও যা-খুশি তাই করছেন, আর ঘরের মধ্যে ঐ মস্ত-চোখ-মেলা ছেলেটিও তথৈবচ।

এদের খেয়াল ছিল না যে, দরজা খোলা। বড়োবাবু এলেন। গর্জন করে উঠলেন, "কী হচ্ছে রে।" ছেলেটার বুক কেঁপে উঠল, মুখ হল ফ্যাকাশে। ছবি কোথায় লুকোবে তার জায়গা পায় না। বড়োবাবু স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, পরীক্ষায় চুনিলালের ইতিহাসে তারিখ ভুল হচ্ছে তার কারণটা কোথায়। ইতিমধ্যে চুনিলাল ছবিটাকে তার জামার মধ্যে লুকোবার ব্যর্থ প্রয়াস করাতে অপরাধ আরো প্রকাশমান হয়ে উঠল। টেনে নিয়ে গোবিন্দ যা দেখলেন তাতে তিনি আরো অবাক— এটা ব্যাপারখানা কী। এর চেয়ে যে ইতিহাসের তারিখ ভুলও ভালো। ছবিটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললেন। চুনিলাল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সত্যবতী একাদশীর দিন প্রায় ঠাকুরঘরেই কাটাতেন। সেইখান থেকে ছেলের কান্না শুনে ছুটে এলেন। ছবির ছিন্ন খণ্ডগুলো মেঝের উপর লুটোচ্ছে আর মেঝের উপর লুটোচ্ছে চুনিলাল। গোবিন্দ তখন ইতিহাসের তারিখ-ভুলের আদি কারণগুলো সংগ্রহ করছিলেন অপসারণের অভিপ্রায়ে।

সত্যবতী এতদিন কখনো গোবিন্দর কোনো ব্যবহারে কোনো কথা বলেন নি। এঁরই 'পরে তাঁর স্বামী নির্ভর স্থাপন করেছেন, এই স্মরণ করেই তিনি নিঃশব্দে সব সহ্য করেছেন। আজ তিনি অশ্রুতে আর্দ্র, ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "কেন তুমি চুনির ছবি ছিঁড়ে ফেললে।"

গোবিন্দ বললেন, "পড়াশুনো করবে না ? আখেরে ওর হবে কী।"

সত্যবতী বললেন, "আখেরে ও যদি পথের ভিক্ষুক হয় সেও ভালো। কিন্তু, কোনোদিন তোমার মতো যেন না হয়। ভগবান ওকে যে-সম্পদ দিয়েছেন তারই গৌরব যেন তোমার পয়সার গর্বের চেয়ে বেশি হয়, এই ওর প্রতি আমার, মায়ের আশীর্বাদ।"

গোবিন্দ বললেন, "আমার দায়িত্ব আমি ছাড়তে পারব না, এ চলবে না কিছুতেই। আমি কালই ওকে বোর্ডিং-স্কুলে পাঠিয়ে দেব— নইলে তুমি ওর সর্বনাশ করবে।"

বড়োবাবু আপিসে গেলেন। ঘনবৃষ্টি নামল, রাস্তা জলে ভেসে যাচ্ছে।

সত্যবতী চুনির হাত ধরে বললেন, "চল্‌, বাবা।"

চুনি বললে, "কোথায় যাবে, মা।"

"এখান থেকে বেরিয়ে যাই।"

রঙ্গলালের দরজায় এক-হাঁটু জল। সত্যবতী চুনিলালকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকলেন ; বললেন, "বাবা,. তুমি নাও এর ভার। বাঁচাও এঁকে পয়সার সাধনা থেকে।"

কার্তিক ১৩৩৬

চোরাই ধন

মহাকাব্যের যুগে স্ত্রীকে পেতে হত পৌরুষের জোরে ; যে অধিকারী সেই লাভ করত রমণীরত্ন। আমি লাভ করেছি কাপুরুষতা দিয়ে, সে কথা আমার স্ত্রীর জানতে বিলম্ব ঘটেছিল। কিন্তু, সাধনা করেছি বিবাহের পরে, যাকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করে পেয়েছি তার মূল্য দিয়েছি দিনে দিনে।

দাম্পত্যের স্বত্ব সাব্যস্ত করতে হয় প্রতিদিনই নতুন করে, অধিকাংশ পুরুষ ভুলে থাকে এই কথাটা। তারা গোড়াতেই কাস্টম্ হৌসে মাল খালাস করে নিয়েছে সমাজের ছাড়চিঠি দেখিয়ে, তার পর থেকে আছে বেপরোয়া। যেন পেয়েছে পাহারাওয়ালার সরকারি প্রতাপ, উপরওয়ালার দেওয়া তকমার জোরে ; উর্দিটা খুলে নিলেই অতি অভাজন তারা।

বিবাহটা চিরজীবনের পালাগান ; তার ধুয়ো একটামাত্র, কিন্তু সংগীতের বিস্তার প্রতিদিনের নব নব পর্যায়ে। এই কথাটা ভালোরকম করে বুঝেছি সুনেত্রার কাছ থেকেই। ওর মধ্যে আছে ভালোবাসার ঐশ্বর্য, ফুরোতে চায় না তার সমারোহ ; দেউড়িতে চার-প্রহর বাজে তার সাহানা রাগিণী। আপিস থেকে ফিরে এসে একদিন দেখি আমার জন্যে সাজানো আছে বরফ-দেওয়া ফল্‌সার শরবত, রঙ দেখেই মনটা চমকে ওঠে ; তার পাশেই ছোটো রুপোর থালায় গোড়ে মালা, ঘরে ঢোকবার আগেই গন্ধ আসে এগিয়ে। আবার কোনোদিন দেখি আইসক্রিমের যন্ত্রে জমানো শাঁসে রসে মেশানো তালশাঁস এক-পেয়ালা, আর পিরিচে একটিমাত্র সূর্যমুখী। ব্যাপারটা শুনতে বেশি কিছু নয়, কিন্তু বোঝা যায়, দিনে দিনে নতুন করে সে অনুভব করেছে আমার অস্তিত্ব। এই পুরোনোকে নতুন করে অনুভব করার শক্তি আর্টিস্টের। আর ইতরে জনাঃ প্রতিদিন চলে দস্তুরের দাগা বুলিয়ে। ভালোবাসার প্রতিভা সুনেত্রার নবনবোন্মেষশালিনী সেবা। আজ আমার মেয়ে অরুণার বয়স সতেরো, অর্থাৎ ঠিক যে-বয়সে বিয়ে হয়েছিল সুনেত্রার। ওর নিজের বয়স আটত্রিশ, কিন্তু সযত্নে সাজসজ্জা করাটাকে ও জানে প্রতিদিন পুজোর নৈবেদ্য-সাজানো, আপনাকে উৎসর্গ করবার আহ্নিক অনুষ্ঠান।

সুনেত্রা ভালোবাসে শান্তিপুরে সাদা শাড়ি কালো পাড়ওয়ালা। খদ্দরপ্রচারকদের ধিক্কারকে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিয়েছে ; কিছুতেই স্বীকার করে নি খদ্দরকে। ও বলে দিশি তাঁতির হাত, দিশি তাঁতির তাঁত, এই আমার আদরের। তারা শিল্পী, তাদেরই পছন্দে সুতো, আমার পছন্দ সমস্ত কাপড়টা নিয়ে। আসল কথা, সুনেত্রা বোঝে হালকা সাদা রঙের শাড়িতে সকল রঙেরই ইশারা খাটে সহজে। ও সেই কাপড়ে নূতনত্ব দেয় নানা আভাসে, মনে হয় না সেজেছে। ও বোঝে, আমার অবচেতন মনের দিগন্ত উদ্ভাসিত হয় ওর সাজে— আমি খুশি হই, জানি নে কেন খুশি হয়েছি।

প্রত্যেক মানুষেই আছে একজন আমি, সেই অপরিমেয় রহস্যের অসীম মূল্য জোগায় ভালোবাসায়। অহংকারের মেকি পয়সা তুচ্ছ হয়ে যায় এর কাছে। সুনেত্রা আপন মনপ্রাণ দিয়ে এই পরম মূল্য দিয়ে এসেছে আমাকে, আজ একুশ বছর ধরে। ওর শুভ্রললাটের কুঙ্কুমবিন্দুর মধ্যে প্রতিদিন লেখা হয় অক্লান্ত বিস্ময়ের বাণী। ওর নিখিল জগতের মর্মস্থান অধিকার করে আছি আমি, সেজন্যে আমাকে আর-কিছু হতে হয় নি সাধারণ জগতে যে-কেউ হওয়া ছাড়া। সাধারণকেই অসাধারণ করে আবিষ্কার করে ভালোবাসা। শাস্ত্রে বলে, আপনাকে জানো। আনন্দে আপনাকেই জানি, আর-একজন যখন প্রেমে জেনেছে আমার আপনকে।

বাবা ছিলেন কোনো নামজাদা ব্যাঙ্কের অন্যতম অধিনায়ক, তারই একজন অংশীদার হলেম আমি। যাকে বলে ঘুমিয়ে-পড়া অংশীদার একেবারেই তা নয়। আষ্টেপৃষ্ঠে লাগাম দিয়ে জুতে দিলে আমাকে আপিসের কাজে। আমার শরীরমনের সঙ্গে এই কাজটা মানানসই নয়। ইচ্ছা ছিল, ফরেস্ট বিভাগে কোথাও পরিদর্শকের পদ দখল করে বসি, খোলা হাওয়ায় দৌড়ধাপ করি, শিকারের শখ নিই মিটিয়ে। বাবা তাকালেন প্রতিপত্তির দিকে; বললেন, যে-কাজ পাচ্ছ সেটা সহজে জোটে না বাঙালির ভাগ্যে। হার মানতে হল। তা ছাড়া মনে হয়, পুরুষের প্রতিপত্তি জিনিসটা মেয়েদের কাছে দামি। সুনেত্রার ভগ্নীপতি অধ্যাপক; ইম্পীরিএল সার্ভিস তার, সেটাতে ওদের মেয়েমহলের মাথা উপরে তুলে রাখে। যদি জংলি 'নিস্‌পেকেট্টর সাহেব' হয়ে সোলার হ্যাট পরে বাঘ-ভালুকের চামড়ায় মেঝে দিতুম ঢেকে, তাতে আমার দেহের গুরুত্ব কমিয়ে রাখত, সেইসঙ্গে কমাত আমার পদের গৌরব আর-পাঁচজন পদস্থ প্রতিবেশীর তুলনায়। কী জানি, এই লাঘবতায় মেয়েদের আত্মাভিমান বুঝি কিছু ক্ষুণ্ণ করে।

এ দিকে ডেস্কে-বাঁধা স্থাবরত্বের চাপে দেখতে দেখতে আমার যৌবনের ধার আসছে ভোঁতা হয়ে। অন্য-কোনো পুরুষ হলে সে কথাটা নিশ্চিন্ত মনে ভুলে গিয়ে পেটের পরিধিবিস্তারকে দুর্বিপাক বলে গণ্য করত না। আমি তা পারি নে। আমি জানি, সুনেত্রা মুগ্ধ হয়েছিল শুধু আমার গুণে নয়, আমার দেহসৌষ্ঠবে। বিধাতার স্বরচিত যে-বরমাল্য অঙ্গে নিয়ে একদিন তাকে বরণ করেছি নিশ্চিত তার প্রয়োজন আছে প্রতিদিনের অভ্যর্থনায়। আশ্চর্য এই যে, সুনেত্রার যৌবন আজও রইল অক্ষুণ্ণ, দেখতে দেখতে আমিই চলেছি ভাঁটার মুখে— শুধু ব্যাঙ্কে জমছে টাকা।

আমাদের মিলনের প্রথম অভ্যুদয়কে আর-একবার প্রত্যক্ষ চোখের সামনে আনল আমার মেয়ে অরুণা। আমাদের জীবনের সেই উষারুণরাগ দেখা দিয়েছে ওদের তারুণ্যের নবপ্রভাতে। দেখে পুলকিত হয়ে ওঠে আমার সমস্ত মন। শৈলেনের দিকে চেয়ে দেখি, আমার সেদিনকার বয়স ওর দেহে আবির্ভূত। যৌবনের সেই ক্ষিপ্রশক্তি, সেই অজস্র প্রফুল্লতা, আবার ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত দুরাশায় ম্লানায়মান উৎসাহের উৎকণ্ঠা। সেই দিন আমি যে-পথে চলতেম সেই পথ ওরও সামনে, তেমনি করেই অরুণার মায়ের মন বশ করবার নানা উপলক্ষ ও সৃষ্টি করছে, কেবল যথেষ্ট লক্ষ্যগোচর নই আমিই। অপর পক্ষে অরুণা জানে মনে মনে, তার বাবা বোঝে মেয়ের দরদ। এক-একদিন কী জানি কেন দুই চক্ষে অদৃশ্য অশ্রুর করুণা নিয়ে চুপ করে এসে বসে আমার পায়ের কাছের মোড়ায়। ওর মা নিষ্ঠুর হতে পারে, আমি পারি নে।

অরুণার মনের কথা ওর মা যে বোঝে না তা নয়; কিন্তু তার বিশ্বাস, এ সমস্তই 'প্রভাতে মেঘডম্বরম্‌', বেলা হলেই যাবে মিলিয়ে। ঐখানেই সুনেত্রার সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য। খিদে মিটতে না দিয়ে খিদে মেরে দেওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন পাত পড়বে তখন হৃদয়ের রসনায় নবীন ভালোবাসার স্বাদ যাবে মরে। মধ্যাহ্নে ভোরের সুর লাগাতে গেলে আর লাগে না। অভিভাবক বলেন, বিবেচনা করবার বয়েস হোক আগে, তার পরে ইত্যাদি। হায় রে, বিবেচনা করবার বয়েস ভালোবাসার বয়েসের উলটো পিঠে।

কয়েকদিন আগেই এসেছিল 'ভরা বাদর মাহ ভাদর'। ঘনবর্ষণের আড়ালে কলকাতার ইটকাঠের বাড়িগুলো এল মোলায়েম হয়ে, শহরের প্রখর মুখরতা অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠস্বরের মতো হল বাষ্পাকুল। ওর মা জানত অরুণা আমার লাইব্রেরি-ঘরে পরীক্ষার পড়ায় প্রবৃত্ত। একখানা বই আনতে গিয়ে দেখি, মেঘাচ্ছন্ন দিনান্তের সজল ছায়ায় জানলার সামনে সে চুপ করে বসে; তখনো চুল বাঁধে নি, পুবে হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে তার এলোচুলে।

সুনেত্রাকে কিছু বললেম না। তখনই শৈলেনকে লিখে দিলেম চায়ের নিমন্ত্রণ চিঠি। পাঠিয়ে দিলেম আমার মোটরগাড়ি ওদের বাড়িতে। শৈলেন এল, তার অকস্মাৎ আবির্ভাব সুনেত্রার পছন্দ নয়, সেটা বোঝা কঠিন ছিল না। আমি শৈলেনকে বললেম, "গণিতে আমার যেটুকু দখল তাতে হাল

আমলের ফিজিক্সের তল পাই নে, তাই তোমাকে ডেকে পাঠানো ; কোয়ান্টম্‌ থিয়োরিটা যথাসাধ্য বুঝে নিতে চাই, আমার সেকেলে বিদ্যেসাধ্যি অত্যন্ত বেশি অথর্ব হয়ে পড়েছে।"

বলা বাহুল্য, বিদ্যাচর্চা বেশিদূর এগোয় নি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস অরুণা তার বাবার চাতুরী স্পষ্টই ধরেছে আর মনে মনে বলেছে, এমন আদর্শ বাবা অন্য-কোনো পরিবারে আজ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয় নি।

কোয়ান্টম্‌ থিয়োরির ঠিক শুরুতেই বাজল টেলিফোনের ঘণ্টা— ধড়ফড়িয়ে উঠে বললেম, "জরুরি কাজের ডাক। তোমরা এক কাজ করো, ততক্ষণ পার্লার টেনিস খেলো, ছুটি পেলেই আবার আসব ফিরে।"

টেলিফোনে আওয়াজ এল, "হ্যালো, এটা কি বারোশো অমুক নম্বর।"

আমি বললেম, "না, এখানকার নম্বর সাতশো অমুক।"

পরক্ষণেই নীচের ঘরে গিয়ে একখানা বাসি খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেম, অন্ধকার হয়ে এল, দিলেম বাতি জ্বেলে।

সুনেত্রা এল ঘরে। অত্যন্ত গম্ভীর মুখ। আমি হেসে বললেম, "মিটিয়রলজিস্ট্‌ তোমার মুখ দেখলে ঝড়ের সিগনাল দিত।"

ঠাট্টায় যোগ না দিয়ে সুনেত্রা বললে, "কেন তুমি শৈলেনকে অমন করে প্রশ্রয় দাও বারে বারে।"

আমি বললেম, "প্রশ্রয় দেবার লোক অদৃশ্যে আছে ওর অন্তরাত্মায়।"

"ওদের দেখাশোনাটা কিছুদিন বন্ধ রাখতে পারলে এই ছেলেমানুষিটা কেটে যেত আপনা হতেই।"

"ছেলেমানুষির কসাইগিরি করতে যাবই বা কেন। দিন যাবে, বয়স বাড়বে, এমন ছেলেমানুষি আর তো ফিরে পাবে না কোনোকালে।"

"তুমি গ্রহনক্ষত্র মান না, আমি মানি। ওরা মিলতে পারে না।"

"গ্রহনক্ষত্র কোথায় কী ভাবে মিলেছে চোখে পড়ে না, কিন্তু ওরা দুজনে যে মিলেছে অন্তরে অন্তরে সেটা দেখা যাচ্ছে খুব স্পষ্ট করেই।"

"তুমি বুঝবে না আমার কথা। যখনই আমরা জন্মাই তখনই আমাদের যথার্থ দোসর ঠিক হয়ে থাকে। মোহের ছলনায় আর-কাউকে যদি স্বীকার করে নিই তবে তাতেই ঘটে অজ্ঞাত অসতীত্ব। নানা দুঃখে বিপদে তার শাস্তি।"

"যথার্থ দোসর চিনব কী করে।"

"নক্ষত্রের স্বহস্তে স্বাক্ষর-করা দলিল আছে।"

৩

আর লুকোনো চলল না।

আমার শ্বশুর অজিতকুমার ভট্টাচার্য। বনেদি পণ্ডিত-বংশে তাঁর জন্ম। বাল্যকাল কেটেছে চতুষ্পাঠী আবহাওয়ায়। পরে কলকাতায় এসে কলেজে নিয়েছেন এম. এ. ডিগ্রি গণিতে। ফলিত জ্যোতিষে তাঁর যেমন বিশ্বাস ছিল তেমনি ব্যুৎপত্তি। তাঁর বাবা ছিলেন পাকা নৈয়ায়িক, ঈশ্বর তাঁর মতে অসিদ্ধ ; আমার শ্বশুরও দেবদেবী কিছুই মানতেন না তার প্রমাণ পেয়েছি। তাঁর সমস্ত বেকার বিশ্বাস ভিড় করে এসে পড়েছিল গ্রহনক্ষত্রের উপর, একরকম গোঁড়ামি বললেই হয়। এই ঘরে জন্মেছে সুনেত্রা ; বাল্যকাল থেকে তার চার দিকে গ্রহনক্ষত্রের কড়া পাহারা।

আমি ছিলুম অধ্যাপকের প্রিয় ছাত্র, সুনেত্রাকেও তার পিতা দিতেন শিক্ষা। পরস্পর মেলবার সুযোগ হয়েছিল বার বার। সুযোগটা যে ব্যর্থ হয় নি সে-খবরটা বেতার বিদ্যুদ্‌বার্তায় আমার কাছে ব্যক্ত হয়েছে। আমার শাশুড়ির নাম বিভাবতী। সাবেককালের আওতার মধ্যে তাঁর জন্ম বটে, কিন্তু স্বামীর সংসর্গে তাঁর মন ছিল সংস্কারমুক্ত, স্বচ্ছ। স্বামীর সঙ্গে প্রভেদ এই, গ্রহনক্ষত্র তিনি একেবারেই

মানতেন না, মানতেন আপন ইষ্টদেবতাকে। এ নিয়ে স্বামী একদিন ঠাট্টা করাতে বলেছিলেন, "ভয়ে ভয়ে তুমি পেয়াদাগুলোর কাছে সেলাম ঠুকে বেড়াও, আমি মানি স্বয়ং রাজাকে।"

স্বামী বললেন, "ঠকবে। রাজা থাকলেও যা না-থাকলেও তা, লাঠি ঘাড়ে নিশ্চিত আছে পেয়াদার দল।"

শাশুড়ি-ঠাকরুন বললেন, "ঠকব সেও ভালো। তাই বলে দেউড়ির দরবারে গিয়ে নাগরা জুতোর কাছে মাথা হেঁট করতে পারব না।"

আমার শাশুড়ি আমাকে বড়ো স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে আমার মনের কথা ছিল অবারিত। অবকাশ বুঝে একদিন তাঁকে বললেম, "মা, তোমার নেই ছেলে, আমার নেই মা। মেয়ে দিয়ে আমাকে দাও তোমার ছেলের জায়গাটি। তোমার সম্মতি পেলে তার পরে পায়ে ধরব অধ্যাপকের।"

তিনি বললেন, "অধ্যাপকের কথা পরে হবে বাছা, আগে তোমার ঠিকুজি এনে দাও আমার কাছে।"

দিলেম এনে। তিনি বললেন, "হবার নয়। অধ্যাপকের মত হবে না। অধ্যাপকের মেয়েটিও তার বাপেরই শিষ্যা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "মেয়ের মা?"

বললেন, "আমার কথা বোলো না। আমি তোমাকে জানি, আমার মেয়ের মনও জানি, তার বেশি জানবার জন্যে নক্ষত্রলোকে ছোটবার শখ নেই আমার।"

আমার মন উঠল বিদ্রোহী হয়ে। বললেম, "এমনতরো অবাস্তব বাধা মানাই অন্যায়। কিন্তু, যা অবাস্তব তার গায়ে ঘা বসে না। তার সঙ্গে লড়াই করব কী দিয়ে।"

এ দিকে মেয়ের সম্বন্ধের কথা আসতে লাগল নানা দিক থেকে। গ্রহতারকার অসম্মতি নেই এমন প্রস্তাবও ছিল তার মধ্যে। মেয়ে জিদ করে বলে বসল, সে চিরকাল কুমারী থাকবে, বিদ্যার সাধনাতেই যাবে তার দিন।

বাপ মানে বুঝলেন না, তাঁর মনে পড়ল লীলাবতীর কথা। মা বুঝলেন, গোপনে জল পড়তে লাগল তাঁর চোখ দিয়ে। অবশেষে একদিন মা আমার হাতে একখানি কাগজ দিয়ে বললেন, "সুনেত্রার ঠিকুজি। এই দেখিয়ে তোমার জন্মপত্রী সংশোধন করিয়ে নিয়ে এসো। আমার মেয়ের অকারণ দুঃখ সইতে পারব না।"

পরে কী হল বলতে হবে না। ঠিকুজির অঙ্কজাল থেকে সুনেত্রাকে উদ্ধার করে আনলেম। চোখের জল মুছতে মুছতে মা বললেন, "পুণ্যকর্ম করেছ, বাছা।"

তার পরে গেছে একুশ বছর কেটে।

৪

হাওয়ার বেগ বাড়তে চলল, বৃষ্টির বিরাম নেই। সুনেত্রাকে বললেম, "আলোটা লাগছে চোখে, নিবিয়ে দিই।" নিবিয়ে দিলেম।

বৃষ্টিধারার মধ্যে দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পের ঝাপসা আভা এল অন্ধকার ঘরে। সোফার উপরে সুনেত্রাকে বসালেম আমার পাশে। বললেম, "সুনি, আমাকে তোমার যথার্থ দোসর বলে মান তুমি?"

"এ আবার কী প্রশ্ন হল তোমার। উত্তর দিতে হবে নাকি।"

"তোমার গ্রহতারা যদি না মানে?"

"নিশ্চয় মানে, আমি বুঝি জানি নে?"

"এতদিন তো একত্রে কাটল আমাদের, কোনো সংশয় কি কোনোদিন উঠেছে তোমার মনে।"

"অমন সব বাজে কথা জিজ্ঞাসা কর যদি রাগ করব।"

"সুনি, দুজনে মিলে দুঃখ পেয়েছি অনেকবার। আমাদের প্রথম ছেলেটি মারা গেছে আট-মাসে। টাইফয়েডে আমি যখন মরণাপন্ন, বাবার হল মৃত্যু। শেষে দেখি উইল জাল করে দাদা নিয়েছেন সমস্ত সম্পত্তি। আজ চাকরিই আমার একমাত্র ভরসা। তোমার মায়ের স্নেহ ছিল আমার জীবনের ধ্রুবতারা। পুজোর ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার পথে নৌকোডুবি হয়ে স্বামীর সঙ্গে মারা গেলেন মেঘনা নদীর গর্ভে। দেখলেম বিষয়-বুদ্ধিহীন অধ্যাপক ঋণ রেখে গেছেন মোটা অঙ্কের; সেই ঋণ স্বীকার করে নিলেম। কেমন করে জানব, এই-সমস্ত বিপত্তি ঘটায় নি আমারই দুষ্টগ্রহ? আগে থাকতে যদি জানতে আমাকে তো বিয়ে করতে না?"

সুনেত্রা কোনো উত্তর না করে আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

আমি বললেম, "সব দুঃখ দুর্লক্ষণের চেয়ে ভালোবাসাই যে বড়ো, আমাদের জীবনে তার কি প্রমাণ হয় নি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয় হয়েছে।"

"মনে করো, যদি গ্রহের অনুগ্রহে তোমার আগেই আমার মৃত্যু হয়, সেই ক্ষতি কি বেঁচে থাকতেই আমি পূরণ করতে পারি নি।"

"থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না।"

"সাবিত্রীর কাছে সত্যবানের সঙ্গে একদিনের মিলনও যে চিরবিচ্ছেদের চেয়ে বড়ো ছিল, তিনি তো ভয় করেন নি মৃত্যুগ্রহকে।"

চুপ করে রইল সুনেত্রা। আমি বললেম, "তোমার অরুণা ভালোবেসেছে শৈলেনকে, এইটুকু জানা যথেষ্ট; বাকি সমস্তই থাক্ অজানা, কী বল, সুনি।"

সুনেত্রা কোনো উত্তর করলে না।

"তোমাকে যখন প্রথম ভালোবেসেছিলুম, বাধা পেয়েছি। আমি সংসারে দ্বিতীয়বার সেই নিষ্ঠুর দুঃখ আসতে দেব না কোনো গ্রহেরই মন্ত্রণায়। ওদের দুজনের ঠিকুজির অঙ্ক মিলিয়ে সংশয় ঘটতে দেব না কিছুতেই।"

ঠিক সেই সময়েই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। শৈলেন নেমে চলে যাচ্ছে। সুনেত্রা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বললে, "কী বাবা শৈলেন। এখুনি তুমি যাচ্ছ না কি।"

শৈলেন ভয়ে ভয়েই বললে, "কিছু দেরি হয়েই গেছে, ঘড়ি ছিল না, বুঝতে পারি নি।"
সুনেত্রা বললে, "না, কিছু দেরি হয় নি। আজ রাত্রে তোমাকে এখানেই খেয়ে যেতে হবে।"

একেই তো বলে প্রশ্রয়।

সেই রাত্রে আমার ঠিকুজি সংশোধনের সমস্ত বিবরণ সুনেত্রাকে শোনালেম। সে বলে উঠল, "না বললেই ভালো করতে।"

"কেন।"

"এখন থেকে কেবলই ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে।"

"কিসের ভয়। বৈধব্যযোগের?"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সুনি। তার পরে বললে, "না, করব না ভয়। আমি যদি তোমাকে ফেলে আগে চলে যাই তা হলে আমার মৃত্যু হবে দ্বিগুণ মৃত্যু।"

কার্তিক ১৩৪০

প্রবন্ধ

সাহিত্যের পথে

উৎসর্গ

কল্যাণীয়

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

কল্যাণীয়েষু

রসসাহিত্যের রহস্য অনেক কাল থেকেই আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করে এসেছি, ভিন্ন ভিন্ন তারিখের এই লেখাগুলি থেকে তার পরিচয় পাবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বার বার নানারকম করে বলেছি। সেটা এই বইয়ের ভূমিকায় জানিয়ে রাখি।

মন নিয়ে এই জগৎটাকে কেবলই আমরা জানছি। সেই জানা দুই জাতের।

জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে, আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে।

ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত।

বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক, কিছুই আসে-যায় না। এমন-কি, সেই অদ্ভুতের সেই অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্যে তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেবে। মানুষ শিশুকাল থেকেই নানা ভাবে আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় ক্ষুধিত ; রূপকথার উদ্‌ভব তারই থেকে। কল্পনার জগতে চায় সে হতে নানাখানা ; রামও হয়, হনুমানও হয়, ঠিক মতো হতে পারলেই খুশি। তার মন গাছের সঙ্গে গাছ হয়, নদীর সঙ্গে নদী। মন চায় মিলতে, মিলে হয় খুশি। মানুষের আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাজ। সে লীলায় সুন্দরও আছে, অসুন্দরও আছে।

একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেম, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু, এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না— সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না।

তখন মনে এল, এতদিন যা উলটো করে বলছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যে কী দিয়ে এই সৌন্দর্যের বোধকে জাগায় সে কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের। তাকে সুন্দর বলি বা না-বলি তাতে কিছু আসে-যায় না, বিশ্বের অনেক উপেক্ষিতের মধ্যে মন তাকেই অঙ্গীকার করে নেয়।

সাহিত্যের বাইরে এই সুন্দরের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। সেখানে প্রাণতত্ত্বের অধিকৃত মানুষকে অনিষ্টকর কিছুতে আনন্দ দেয় না। সাহিত্যে দেয়, নইলে 'ওথেলো' নাটককে কেউ ছুঁতে পারত না। এই প্রশ্ন আমার মনকে উদ্‌বেজিত করেছিল যে, সাহিত্যে দুঃখকর কাহিনী কেন আনন্দ দেয় এবং সেই কারণে কেন তাকে সৌন্দর্যের কোঠায় গণ্য করি।

মনে উত্তর এল, চারি দিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড় থাকে না তখন সেই অস্পষ্টতা দুঃখকর। তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান। আমি যে আমি, এইটে খুব করে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ। যখন সামনে বা চারি দিকে এমন-কিছু থাকে যার সম্বন্ধে উদাসীন নই, যার উপলব্ধি আমার চৈতন্যকে উদ্‌বোধিত করে রাখে. তার আস্বাদনে আপনাকে নিবিড় করে পাই। এইটের অভাবে অবসাদ। বস্তুত, মন নাস্তিত্বের দিকে যতই যায় ততই তার দুঃখ।

দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক ; কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা ; ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম্। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়। আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে ; লীলা যদি না হত তবে বুক যেত ফেটে।

এই কথাটা যেদিন প্রথম স্পষ্ট করে মনে এল সেদিন কবি কীট্‌সের বাণী মনে পড়ল : Truth is beauty, beauty truth। অর্থাৎ, যে সত্যকে আমরা 'হৃদা মনীষা মনসা' উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, যে-কোনো জিনিস আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য করে পাই ব'লেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর।

মানুষ আপনার এই প্রিয়ের ক্ষেত্রকে, অর্থাৎ আপন সুস্পষ্ট উপলব্ধির ক্ষেত্রকে, সাহিত্যে প্রতিদিন বিস্তীর্ণ করছে। তার বাধাহীন বিচিত্র বৃহৎ লীলার জগৎ সাহিত্যে।

সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময়। অর্থাৎ, তিনি আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে। মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানা ভাবে নানা রসে আপনাকে পাচ্ছে। মানুষও লীলাময়। মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস লিখিত অঙ্কিত হয়ে চলেছে।

ইংরেজিতে যাকে বলে real সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়,

একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। মন যাকে বলে 'এই তো নিশ্চিত দেখলুম, অত্যন্ত বোধ করলুম', জগতের হাজার অচিহ্নিতের মধ্যে যার উপর সে আপন স্বাক্ষরের সীলমোহর দিয়ে দেয়, যাকে আপন চিরস্বীকৃত সংসারের মধ্যে ভুক্ত করে নেয়— সে অসুন্দর হলেও মনোরম ; সে রসস্বরূপের সনন্দ নিয়ে এসেছে।

সৌন্দর্যপ্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অলংকারশাস্ত্রে চরম কথা বলা হয়েছে : বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।

মানুষ নানারকম আস্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে। সেই বৃহৎ বিচিত্র লীলাজগতের সৃষ্টি সাহিত্য।

কিন্তু, এর মধ্যে মূল্যভেদের কথা আছে, কেননা এ তো বিজ্ঞান নয়। সকল উপলব্ধিরই নির্বিচারে এক মূল্য নয়। আনন্দসম্ভোগে মানুষের নির্বাচনের কর্তব্য তো আছে। মনস্তত্ত্বের কৌতূহল চরিতার্থ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধিতে মাতলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম এবং অপ্রমত্ত আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পায়। কিন্তু, আনন্দ-সম্ভোগে স্বভাবতই মানুষের বাছবিচার আছে। কখনো কখনো অতিতৃপ্তির অস্বাস্থ্য ঘটলে মানুষ এই সহজ কথাটা ভুলব-ভুলব করে। তখন সে বিরক্ত হয়ে স্পর্ধার সঙ্গে কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায়। কুপথ্যের ঝাঁজ বেশি, তাই মুখ যখন মরে তখন তাকেই মনে হয় ভোজের চরম আয়োজন। কিন্তু, মন একদা সুস্থ হয়, মানুষের চিরকালের স্বভাব ফিরে আসে, আবার আসে সহজ সম্ভোগের দিন, তখনকার সাহিত্য ক্ষণিক আধুনিকতার ভঙ্গিমা ত্যাগ করে চিরকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সরলভাবে মিশে যায়।

শান্তিনিকেতন
৮ আশ্বিন ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের পথে

বাস্তব

লোকেরা কিছুই ঠিকমত করিতেছে না, সংসারে যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন হইতেছে না, সময় খারাপ পড়িয়াছে— এই-সমস্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিয়া মানুষ দিব্য আরামে থাকে, তাহার আহারনিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না, এটা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। দুশ্চিন্তা-আগুনটা শীতের আগুনের মতো উপাদেয়, যদি সেটা পাশে থাকে কিন্তু নিজের গায়ে না লাগে।

অতএব, যদি এমন কথা কেহ বলিত যে, আজকাল বাংলাদেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না, তবে খুব সম্ভব, আমিও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্‌বেগ প্রকাশ করিয়া বলিতাম, কথাটা ঠিক বটে ; এবং নিজেকে এই দলের বাহিরে ফেলিতাম।

কিন্তু, একেবারে আমারই নাম ধরিয়া এই কথাগুলি প্রয়োগ করিলে অন্যের তাহাতে যতই আমোদ হোক, আমি সে আমোদে খোলা মনে যোগ দিতে পারি না।

তবে কিনা, বাসরঘরে বর এবং পাঠকসভায় লেখকের প্রায় একই দশা। কর্ণমূলে অনেক কঠিন কৌতুকে উভয়কে নিঃশব্দে সহ্য করিতে হয়। সহ্য যে করে তাহার কারণ এই, একটা জায়গায় তাহাদের জিত আছে। যে যতই উৎপীড়ন করুক, যে বর তাহার কনেটিকে কেহ হরণ করিবে না ; এবং যে লেখক তাহার লেখাটা তো রহিলই।

অতএব, নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কিন্তু, এই অবকাশে সাধারণভাবে সাহিত্য-সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেননা, যদিচ প্রথম নম্বরেই আমার লেখাটাকে সেসনে সোপরদ্দ করা হইয়াছে তবু এ খবরটারও আভাস আছে যে, আজকালকার প্রায় সকল লেখকেরই এই একই অপরাধ।

বাস্তবতা না থাকা নিশ্চয়ই একটা মস্ত ফাঁকি। বস্তু কিছুই পাইল না অথচ দাম দিল এবং খুশি হইয়া হাসিতে হাসিতে গেল, এমন-সব হতবুদ্ধি লোকের জন্য পাকা অভিভাবক নিযুক্ত হওয়া উচিত। সেই লোকেই অভিভাবকের উপযুক্ত, কবিরা ফস্‌ করিয়া যাহাদিগকে কলাকৌশলে ঠকাইতে না পারে, কটাক্ষে যাহারা বুঝিতে পারে বস্তু কোথায় আছে এবং কোথায় নাই। অতএব, যাঁহারা অবাস্তব-সাহিত্য সম্বন্ধে দেশকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা নাবালক ও নালায়েক পাঠকদের জন্য কোর্ট্‌ অফ ওয়ার্ড্‌স্‌ খুলিবার কাজ করিতেছেন।

কিন্তু, সমালোচক যত বড়ো বিচক্ষণ হোন-না কেন চিরকালই তাঁহারা পাঠকদের কোলে তুলিয়া সামলাইবেন সেটা তো ধাত্রী এবং ধৃত কাহারও পক্ষে ভালো নয়। পাঠকদিগকে স্পষ্ট করিয়া সমজাইয়া দেওয়া উচিত কোন্‌টা বস্তু এবং কোন্‌টা বস্তু নয়।

মুশকিল এই যে, বস্তু একটা নহে এবং সব জায়গায় আমরা একই বস্তুর তত্ত্ব করি না। মানুষের বহুধা প্রকৃতি, তাহার আয়োজন নানা এবং বিচিত্র বস্তুর সন্ধানে তাহাকে ফিরিতে হয়।

এখন কথা এই, সাহিত্যের মধ্যে কোন্‌ বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন, সেটা রসবস্তু। বলা বাহুল্য, এখানে রসসাহিত্যের কথাই হইতেছে। এই রসটা এমন জিনিস যাহার বাস্তবতা

সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায় এবং এক পক্ষ অথবা উভয় পক্ষ ভূমিসাৎ হইলেও কোনো মীমাংসা হয় না।

রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লোকহিতৈষী প্রভৃতি নানা প্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন, কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়া নলের গলায় মালা দিয়াছিলেন, তেমনি রসভারতী স্বয়ম্বরসভায় আর-সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।

সমালোচক বুক ফুলাইয়া তাল ঠুকিয়া বলেন, 'আমিই সেই রসিক।' প্রতিবাদ করিতে সাহস হয় না, কিন্তু অরসিক আপনাকে অরসিক বলিয়া জানিয়াছে, সংসারে এই অভিজ্ঞতাটা দেখা যায় না। আমার কোন্‌টা ভালো লাগিল এবং আমার কোন্‌টা ভালো লাগিল না সেইটেই যে রসপরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা, পনেরো-আনা লোক সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়। এইজন্যই সাহিত্যসমালোচনায় বিনয় নাই। মূলধন না থাকিলেও দালালির কাজে নামিতে কাহারও বাধে না, তেমনি সাহিত্য সমালোচনায় কোনো প্রকার পুঁজির জন্য কেহ সবুর করে না। কেননা, সমালোচকের পদটা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সাহিত্যের যাচাই-ব্যাপারটা এতই যদি অনিশ্চিত, তবে সাহিত্য যাহারা রচনা করে তাহাদের উপায় কী। আশু উপায় দেখি না। অর্থাৎ, তাহারা যদি নিশ্চিত ফল জানিতে চায় তবে সেই জানিবার বরাত তাহাদের প্রপৌত্রের উপর দিতে হয়। নগদ-বিদায় যেটা তাহাদের ভাগ্যে জোটে সেটার উপর অত্যন্ত ভর দেওয়া চলিবে না।

রসবিচারে ব্যক্তিগত এবং কালগত ভুল সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বহু ব্যক্তি ও দীর্ঘ সময়ের ভিতর দিয়া বিচার্য পদার্থটিকে বহিয়া লইয়া গেলে তবে সন্দেহ মেটে।

কোনো কবির রচনার মধ্যে সাহিত্যবস্তুটা আছে কি না তাহার উপযুক্ত সমজদার কবির সমসাময়িকদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু তাহারাই উপযুক্ত কি না তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দাবি করিলে ঠকা অসম্ভব নয়।

এমন অবস্থায় লেখকের একটা সুবিধা আছে এই যে, তাঁহার লেখা যে-লোক পছন্দ করে সেই যে সমজদার তাহা ধরিয়া লইতে বাধা নাই। অপর পক্ষকে তিনি যদি উপযুক্ত বলিয়া গণ্যই না করেন তবে এমন বিচারালয় হাতের কাছে নাই যেখানে তাহারা নালিশ রুজু করিতে পারে। অবশ্য, কালের আদালতে ইহার বিচার চলিতেছে, কিন্তু সেই দেওয়ানি আদালতের মতো দীর্ঘসূত্রী আদালত ইংরেজের মুল্লুকেও নাই। এ স্থলে কবিরই জিত রহিল, কেননা আপাতত দখল যে তাহারই। কালের পেয়াদা যেদিন তাহার খ্যাতি-সীমানার খুঁটি উপড়াইতে আসিবে সেদিন সমালোচক সেই তামাশা দেখিবার জন্য সবুর করিতে পারিবে না।

যাঁহারা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতার তল্লাস করিয়া একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা আমার কথার উত্তরে বলিবেন, 'দাঁড়িপাল্লায় চড়াইয়া রস-জিনিসটার বস্তু পরিমাণ করা যায় না, এ কথা সত্য, কিন্তু রস-পদার্থ কোনো একটা বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তো প্রকাশ পায়। সেইখানেই আমরা বাস্তবতার বিচার করিবার সুযোগ পাইয়া থাকি।'

নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে। সেটা মাপকাঠির আয়ত্তাধীন সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেইটেরই বস্তুপিণ্ড ওজন করিয়া কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়।

রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে-রসটি উপভোগ করিয়াছে আজও তাহা বাতিল হয় নাই। কিন্তু, বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে।

আচ্ছা, মনে করা যাক, কবিতাকে বাস্তব করিবার লোভ আমি আর সামলাইতে পারিতেছি না। খুঁজিতে লাগিলাম, দেশে সব চেয়ে কোন্ ব্যাপারটা বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম, ব্রাহ্মণসভাটা দেশের মধ্যে রেলোয়ে-সিগ্‌নালের স্তম্ভটার মতো চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আপনার একটিমাত্র পায়ে ভর দিয়া খুব উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কায়স্থেরা পৈতা লইবেই আর ব্রাহ্মণসভা তাহার পৈতা কাড়িবে, এই ঘটনাটা বাংলাদেশে বিশ্বব্যাপারের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো। অতএব, বাঙালি কবি যদি ইহাকে তাহার

রচনায় আমল না দেয় তবে বুঝিতে হইবে, বাস্তবতা সম্বন্ধে তাহার বোধশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। এই বুঝিয়া লিখিলাম পৈতাসংহার-কাব্য। তাহার বস্তুপিণ্ডটা ওজনে কম হইল না, কিন্তু হায় রে, সরস্বতী কি বস্তুপিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখিয়াছেন না পদ্মের উপরে?

এই দৃষ্টান্তটি দিবার একটু হেতু আছে। বিচারকদের মতে, বাস্তবতা জিনিসটা কী তাহার একটা সূত্র ধরিতে পারিয়াছি। আমার বিরুদ্ধে একজন ফরিয়াদি বলিয়াছেন, আমার সমস্ত রচনার মধ্যে বাস্তবতার উপকরণ একটু যেখানে জমা হইয়াছে সে কেবল 'গোরা' উপন্যাসে।

গোরা উপন্যাসে কী বস্তু আছে না-আছে উক্ত উপন্যাসের লেখক তাহা সব চেয়ে কম বোঝে। লোকমুখে শুনিয়াছি, প্রচলিত হিঁদুয়ানির ভালো ব্যাখ্যা তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা হইতে আন্দাজ করিতেছি, ওটাই একটা বাস্তবতার লক্ষণ।

বর্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ংকর রুখিয়া উঠিয়াছে। সেটা সম্বন্ধে তাহার মনের ভাব বেশ সহজ অবস্থায় নাই। বিশ্বরচনায় এই হিন্দুত্বই বিধাতার চরম কীর্তি এবং এই সৃষ্টিতেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া আর-কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, এইটে আমাদের বুলি। সাহিত্যের বাস্তবতা ওজনের সময়ে এই বুলিটা হয় বাটখারা। কালিদাসকে আমরা ভালো বলি, কেননা তাঁহার কাব্যে হিন্দুত্ব আছে। বঙ্কিমকে আমরা ভালো বলি, কেননা স্বামীর প্রতি হিন্দুরমণীর যেরূপ মনোভাব হিন্দুশাস্ত্রসম্মত তাহা তাঁহার নায়িকাদের মধ্যে দেখা যায়; অথবা নিন্দা করি, সেটা যথেষ্ট পরিমাণে নাই বলিয়া।

অন্য দেশেও এমন ঘটে। ইংলন্ডে ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের জ্বরোত্তাপ যখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চড়িয়া উঠিতেছিল তখন একদল ইংরেজ কবির কাব্যে তাহারই রক্তবর্ণ বাস্তবতা প্রলাপ বকিতেছিল।

তাহার সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় তবে ওয়ার্ড্‌স্বার্থের কবিতায় বাস্তবতা কোথায়। তিনি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে একটি আনন্দময় আবির্ভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহার সঙ্গে ব্রিটিশ জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষা-অভ্যাস-আচার-বিচারের যোগ ছিল কোথায়। তাঁহার ভাবের রাগিণীটি নির্জনবাসী একলা-কবির চিত্তবাঁশিতে বাজিয়াছিল— ইংরেজের স্বদেশী হাটে ওজনদরে যাহা বিক্রি হয় এমনতরো বস্তুপিণ্ড তাহার মধ্যে কী আছে জানিতে চাই।

আর, কীট্‌স্‌, শেলি— ইহাদের কাব্যের বাস্তবতা কী দিয়া নির্ধারণ করিব। ইংরেজের জাতীয় চিত্তের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া কি ইহারা বকশিশ ও বাহবা পাইয়াছিলেন। যে-সমস্ত সমালোচক সাহিত্যের হাটে বাস্তবতার দালালি করিয়া থাকেন তাঁহারা ওয়ার্ড্‌স্বার্থের কবিতার কিরূপ সমাদর করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে আছে। শেলিকে অস্পৃশ্য অন্ত্যজের মতো তাঁহার দেশ সেদিন ঘরে ঢুকিতে দেয় নাই এবং কীট্‌স্‌কে মৃত্যুবাণ মারিয়াছিল।

আরো আধুনিক দৃষ্টান্ত টেনিসন। তিনি ভিক্টোরীয় যুগের প্রচলিত লোকধর্মের কবি। তাই তাঁহার প্রভাব দেশের মধ্যে সর্বব্যাপী ছিল। কিন্তু, ভিক্টোরীয় যুগের বাস্তবতা যত ক্ষীণ হইতেছে টেনিসনের আসনও তত সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার কাব্য যে গুণে টিকিবে তাহা নিত্যরসের গুণে, তাহাতে ভিক্টোরীয় ব্রিটিশ বস্তু বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া নহে— সেই স্থূল বস্তুটাই প্রতিদিন ধসিয়া পড়িতেছে।

আমাদের কালের লেখকদের মোটা অপরাধটা এই যে, আমরা ইংরেজি পড়িয়াছি। ইংরেজি শিক্ষা বাঙালির পক্ষে বাস্তব নহে, অতএব তাহা বাস্তবতার কারণও নহে, আর সেইজন্যই এখনকার সাহিত্য দেশের লোকসাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিতে পারে না।

উত্তম কথা। কিন্তু, দেশের যে-সব লোক ইংরেজি শেখে নাই তাহাদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা তো নগণ্য। কেহ তাহাদের তো কলম কাড়িয়া লয় নাই। আমরা কেবল আমাদের অবাস্তবতার জোরে দেশের সমস্ত বাস্তবিকদের চেয়ে জিতিয়া যাইব, ইহা স্বভাবের নিয়ম নহে।

হয়তো উত্তরে শুনিব, আমরা হারিতেছি। ইংরেজি যাহারা শেখে নাই তাহারাই দেশের বাস্তব-সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে, তাহাই টিকিবে এবং তাহাতেই লোকশিক্ষা হইবে।

তাই যদি হয় তবে আর ভাবনা কিসের। বাস্তব-সাহিত্যের বিপুল ক্ষেত্র ও আয়োজন দেশ জুড়িয়া রহিয়াছে ; তাহার মধ্যে ছিটাফোঁটা অবাস্তব মুহূর্তকালও টিকিতে পারিবে না।

কিন্তু, সেই বৃহৎ বাস্তব-সাহিত্যকে চোখে দেখিলে কাজে লাগিত, একটা আদর্শ পাওয়া যাইত। যতক্ষণ তাহার পরিচয় নাই ততক্ষণ যদি গায়ের জোরে তাহাকে মানিয়া লই তবে সেটা বাস্তবিক হইবে না, কাল্পনিক হইবে।

অথচ, এ দিকে ইংরেজি-পোড়োরা যে-সাহিত্য সৃষ্টি করিল, রাগিয়া তাহাকে গালি দিলেও, সে বাড়িয়া উঠিতেছে ; নিন্দা করিলেও তাহাকে অস্বীকার করিবার জো নাই। ইহাই বাস্তবের প্রকৃত লক্ষণ। এই-যে কোনো কোনো মানুষ খামকা রাগিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারও কারণ, এ স্বপ্ন নয়, এ মায়া নয়, এ বাস্তব। দেখ নাই কি, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কাগজরা কথায় কথায় বলিয়া থাকে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালি জাতটা গণ্যই নহে ? তাহাদের কথার ঝাঁজ দেখিলেই বুঝা যায়, তাহারা বাঙালিকেই বিশেষভাবে গণ্য করিয়াছে, কোনোমতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মতো আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে ; সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল। এই বাস্তবকে যে-লোক ভয় করে, যে-লোক বাঁধা-নিয়মের শিকলটাকেই শ্রেয় বলিয়া জানে, তাহারা ইংরেজই হউক আর বাঙালিই হউক, এই শিক্ষাকে ভ্রম এবং এই জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতে থাকে। তাহাদের বাঁধা তর্ক এই যে, এক দেশের আঘাত আর-এক দেশকে সচেতন করে না। কিন্তু, দূর দেশের দক্ষিনে হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্যকুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। যেখান হইতে যেমন করিয়াই হউক, জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়া উঠে, মানবচিত্ততত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।

কিন্তু, লোকশিক্ষার কী হইবে।

সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নহে।

লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাস্টারির ভার লয় নাই। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে পড়ে তাহার কারণ এ নয় যে, তাহা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাহাতে দুঃখী-কাঙালের ঘরকরনার কথা বর্ণিত। তাহাতে বড়ো বড়ো রাজা, বড়ো বড়ো রাক্ষস, বড়ো বড়ো বীর এবং বড়ো বড়ো বানরের বড়ো বড়ো লেজের কথাই আছে। আগাগোড়া সমস্তই অসাধারণ। সাধারণ লোক আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িতে শিখিয়াছে।

সাধারণ লোক মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা পড়ে না। খুব সম্ভব দিঙ্‌নাগাচার্য এই-ক'টা বইয়ের মধ্যে বাস্তবের অভাব দেখিয়াছিলেন। মেঘদূতের তো কথাই নাই। কালিদাস স্বয়ং এই বাস্তববাদীদের ভয়ে এক জায়গায় নিতান্ত অকবিজনোচিত কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন— কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।

আমি অকবিজনোচিত এইজন্য বলিতেছি যে, কবিমাত্রই চেতন-অচেতনের মিল ঘটাইয়া থাকেন. কেননা তাঁহারা বিশ্বের মিত্র, তাঁহারা ন্যায়ের অধ্যাপক নহেন। শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক পড়িলেই সেটা বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

কিন্তু আমি বলিতেছি, যদি কালিদাসের কাব্য ভালো হয় তবে সমস্ত মানুষের জন্যই তাহা সকল কালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিল— আজকের সাধারণ মানুষ যাহা বুঝিল না কালকের সাধারণ মানুষ হয়তো তাহা বুঝিবে, অন্তত সেইরূপ আশা করি। কিন্তু, কালিদাস যদি কবি না হইয়া লোকহিতৈষী হইতেন তবে সেই পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কৃষাণদের জন্য হয়তো প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানা বই লিখিতেন— তাহা হইলে তার পর হইতে এতগুলা শতাব্দীর কী দশা হইত।

তুমি কি মনে কর, লোকহিতৈষী তখন কেহ ছিল না। লোকসাধারণের নৈতিক ও জাঠরিক উন্নতি কী করিয়া হইতে পারে, সে কথা ভাবিয়া কেহ কি তখন কোনো বই লেখে নাই। কিন্তু, সে কি সাহিত্য। ক্লাসের পড়া শেষ হইলেই বৎসর-অন্তর ইস্কুলের বইয়ের যে দশা হয় তাহাদেরও সেই দশা

হইয়াছে, অর্থাৎ স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চের ভিতর দিয়া একেবারেই দশম দশা।

যাহা ভালো তাহাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতেই হইবে— রাজার ছেলেকেও করিতে হইবে, কৃষাণের ছেলেকেও। রাজার ছেলের সুবিধা এই যে, তাহার সাধনা করিবার সময় আছে, কৃষাণের ছেলের নাই। কিন্তু সেটা সামাজিক ব্যবস্থার তর্ক— যদি প্রতিকার করিতে পার, করিয়া দাও, কাহারও আপত্তি হইবে না। তানসেন তাই বলিয়া মেঠো-সুর তৈরি করিতে বসিবেন না। তাঁহার সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই; আর-কোনো মতলবে সে আর-কিছু হইতে পারেই না। যাহারা রসপিপাসু তাহারা যত্ন করিয়া শিক্ষা করিয়া সেই ধ্রুপদগুলির নিগূঢ় মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করিবে। অবশ্য, লোক-সাধারণ যতক্ষণ সেই মধুকোষের পথ না জানিবে ততক্ষণ তানসেনের গান তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ অবাস্তব, এ কথা মানিতেই হইবে। তাই বলিতেছিলাম, কোথায় কোন্ বস্তুর খোঁজ করিতে হইবে, কেমন করিয়া খোঁজ করিতে হইবে, কে তাহার খোঁজ পাইবার অধিকারী, সেটা তো নিজের খেয়ালমত এক কথায় প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না।

তবে কবিদের অবলম্বনটা কী। একটা-কিছুর 'পরে জোর করিয়া তাঁহারা তো ভর দিয়াছেন। নিশ্চয়ই দিয়াছেন। সেটা অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ। কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, যদি শিক্ষা অভ্যাস প্রথা শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ববস্তু ও বিশ্বরসকে একেবারে অব্যবহিত ভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার জোর। পূর্বেই বলিয়াছি, বাহিরের হাটে বস্তুর দর কেবলই উঠা-নামা করিতেছে— সেখানে নানা মুনির নানা মত, নানা লোকের নানা ফরমাশ, নানা কালের নানা ফ্যাশান। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে। তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহারই 'পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সে আদর্শ হিন্দুর আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, তাহা লোকহিতের এবং ইস্কুল-মাস্টারির আদর্শ নহে। তাহা আনন্দময় সুতরাং অনির্বচনীয়। কবি জানেন, যেটা তাঁহার কাছে এতই সত্য সেটা কাহারও কাছে মিথ্যা নহে। যদি কাহারও কাছে তাহা মিথ্যা হয় তবে সেই মিথ্যাটাই মিথ্যা; যে-লোক চোখ বুজিয়া আছে তাহার কাছে আলোক যেমন মিথ্যা এও তেমনি মিথ্যা। কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে-প্রমাণ, তিনি জানেন, বিশ্বের মধ্যেই সেই প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের অনুভূতি সকলের নাই— সুতরাং বিচারকের আসনে যে-খুশি বসিয়া যেমন-খুশি রায় দিতে পারেন, কিন্তু ডিক্রিজারির বেলায় যে তাহা খাটিবেই এমন কোনো কথা নাই।

কবির আত্মানুভূতির যে-উপাদানটার কথা বলিলাম এটা সকল কবির সকল সময়েই যে বিশুদ্ধ থাকে তাহা নহে। তাহা নানা কারণে কখনো আবৃত হয়, কখনো বিকৃত হয়, নগদ মূল্যের প্রলোভনে কখনো তাহার উপর বাজারে-চলিত আদর্শের নকলে কৃত্রিম নকশা কাটা হয়— এইজন্য তাহার সকল অংশ নিত্য নহে এবং সকল অংশের সমান আদর হইতেই পারে না। অতএব, কবি রাগই করুন আর খুশিই হউন, তাঁহার কাব্যের একটা বিচার করিতেই হইবে— এবং যে-কেহ তাঁহার কাব্য পড়িবে সকলেই তাঁহার বিচার করিবে— সে বিচারে সকলে একমত হইবে না। মোটের উপরে, যদি নিজের মনে তিনি যথার্থ আত্মপ্রসাদ পাইয়া থাকেন তবে তাঁহার প্রাপ্যটি হাতে হাতে চুকাইয়া লইয়াছেন। অবশ্য, পাওনার চেয়ে উপরি-পাওনায় মানুষের লোভ বেশি। সেইজন্যই বাহিরে আশে-পাশে আড়ালে-আবডালে এত করিয়া হাত পাতিতে হয়। ঐখানেই বিপদ। কেননা লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

শ্রাবণ ১৩২১

কবির কৈফিয়ত

আমরা যে-ব্যাপারটাকে বলি জীবলীলা পশ্চিমসমুদ্রের ওপারে তাকেই বলে জীবনসংগ্রাম।

ইহাতে ক্ষতি ছিল না। একটা জিনিসকে আমি যদি বলি নৌকা-চালানো আর তুমি যদি বল দাঁড়-টানা, একটি কাব্যকে আমি যদি বলি রামায়ণ আর তুমি যদি বল রাম-রাবণের লড়াই, তাহা লইয়া আদালত করিবার দরকার ছিল না।

কিন্তু, মুশকিল হইয়াছে এই যে, কথাটা ব্যবহার করিতে আমাদের আজকাল লজ্জা বোধ হইতেছে। জীবনটা কেবলই লীলা! এ কথা শুনিলে জগতের সমস্ত পালোয়ানের দলেরা কী বলিবে যাহারা তিন ভুবনে কেবলই তাল ঠুকিয়া লড়াই করিয়া বেড়াইতেছে!

আমি কবুল করিতেছি, আমার এখানে লজ্জা নাই। ইহাতে আমার ইংরেজিমাস্টার তাঁর সব চেয়ে বড়ো শব্দভেদী বাণটা আমাকে মারিতে পারেন— বলিতে পারেন, 'ওহে, তুমি নেহাত ওরিয়েন্টাল।' কিন্তু, তাহাতে আমি মারা পড়িব না।

'লীলা' বলিলে সবটাই বলা হইল, আর 'লড়াই' বলিলে লেজামুড়া বাদ পড়ে। এ লড়াইয়ের আগাই বা কোথায় আর গোড়াই বা কোথায়। ভাঙখোর বিধাতার ভাঙের প্রসাদ টানিয়া এ কি হঠাৎ আমাদের একটা মত্ততা। কেন রে বাপু, কিসের জন্যে খামকা লড়াই।

বাঁচিবার জন্য।

আমার না-হক বাঁচিবার দরকার কী।

না বাঁচিলে যে মরিবে।

নাহয় মরিলাম।

মরিতে যে চাও না।

কেন চাই না।

চাও না বলিয়াই চাও না।

এই জবাবটাকে এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, লীলা। জীবনের মধ্যে বাঁচিবার একটা অহেতুক ইচ্ছা আছে। সেই ইচ্ছাটাই চরম কথা। সেইটে আছে বলিয়াই আমরা লড়াই করি, দুঃখকে মানিয়া লই। সমস্ত জোর-জবরদস্তির সব শেষে একটা খুশি আছে— তার ওদিকে আর যাইবার জো নাই, দরকারও নাই। শতরঞ্চ খেলার আগাগোড়াই খেলা— মাঝখানে দাবাবড়ে চালাচালি এবং মহাভাবনা। সেই দুঃখ না থাকিলে খেলার কোনো অর্থই থাকে না। অপর পক্ষে খেলার আনন্দ না থাকিলে দুঃখের মতো এমন নিদারুণ নিরর্থকতা আর-কিছু নাই। এমন স্থলে শতরঞ্চকে আমি যদি বলি খেলা আর তুমি যদি বল দাবাবড়ের লড়াই, তবে তুমি আমার চেয়ে কম বৈ যে বেশি বলিলে এমন কথা আমি মানিব না।

কিন্তু, এ-সব কথা বলা কেন। জীবনটা কিংবা জগৎটা যে লীলা, এ কথা শুনিতে পাইলেই যে মানুষ একদম কাজকর্মে ঢিল দিয়া বসিবে।

এই কথাটা শোনা না-শোনার উপরই যদি মানুষের কাজ করা না-করা নির্ভর করিত তবে যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন গোড়ায় তাঁরই মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। সামান্য কবির উপরে রাগ করায় বাহাদুরি নাই।

কেন, সৃষ্টিকর্তা বলেন কী।

তিনি আর যাই বলুন, লড়াইয়ের কথাটা যত পারেন চাপা দেন। মানুষের বিজ্ঞান বলিতেছে, জগৎ জুড়িয়া অণুতে পরমাণুতে লড়াই। কিন্তু, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া দেখি, সেই যুদ্ধ-ব্যাপার ফুল হইয়া ফোটে, তারা হইয়া জ্বলে, নদী হইয়া চলে, মেঘ হইয়া ওড়ে। সমস্তটার দিকে সমগ্রভাবে যখন দেখি তখন দেখি, ভূমার ক্ষেত্রে সুরের সঙ্গে সুরের মিল, রেখার সঙ্গে রেখার যোগ, রঙের সঙ্গে রঙের মালাবাদল। বিজ্ঞান সেই সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দলাদলি ঠেলাঠেলি হানাহানি দেখিতে

পায়। সেই অবচ্ছিন্ন সত্য বিজ্ঞানের সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা কবির সত্যও নহে, কবিগুরুর সত্যও নয়।

অন্য কবির কথা রাখিয়া দাও, তুমি নিজের হইয়া বলো।

আচ্ছা, ভালো। তোমাদের নালিশ এই যে, খেলা, ছুটি, আনন্দ, এই-সব কথা আমার কাব্যে বার বার আসিয়া পড়িতেছে। কথাটা যদি ঠিক হয় তবে বুঝিতে হইবে, একটা কোনো সত্যে আমাকে পাইয়াছে। তার হাত আমার আর এড়াইবার জো নাই। অতএব, এখন হইতে আমি বিধাতার মতোই বেহায়া হইয়া এক কথা হাজার বার বলিব। যদি আমাকে বানাইয়া বলিতে হইত তবে ফি বারে নূতন কথা না বলিলে লজ্জা হইত। কিন্তু, সত্যের লজ্জা নাই, ভয় নাই, ভাবনা নাই। সে নিজেকেই প্রকাশ করে; নিজেকেই প্রকাশ করা ছাড়া তার আর গতি নাই, এইজন্যই সে বেপরোয়া।

এটা যেন তোমার অহংকারের মতো শোনাইতেছে।

সত্যের দোহাই দিয়া নিন্দা করিলে যদি দোষ না হয়, তবে সত্যের দোহাই দিয়া অহংকার করিলেও দোষ নাই। অতএব, এখানে তোমাতে আমাতে শোধবোধ হইল।

বাজে কথা আসিল। যে কথা লইয়া তর্ক হইতেছিল সেটা—

সেটা এই যে, জগতে শক্তির লড়াইটাকেই প্রধান করিয়া দেখা অবচ্ছিন্ন দেখা— অর্থাৎ গানকে বাদ দিয়া সুরের কসরতকে দেখা। আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। এ কথা আমাদেরই দেশের সব চেয়ে বড়ো কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে।

এই যদি উপনিষদের চরম কথা হয় তবে কি ঋষি বলিতে চান, জগতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, রেষারেষি নাই? আমরা তো ঐগুলোর উপরেই বেশি করিয়া জোর দিতে চাই; নহিলে মানুষের চেতনা হইবে কেমন করিয়া।

উপনিষৎ ইহার উত্তর দিয়াছেন, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কেইবা শরীরের চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করিত— অর্থাৎ, কেইবা দুঃখধন্দা লেশমাত্র স্বীকার করিত— আনন্দ যদি আকাশ ভরিয়া না থাকিত। অর্থাৎ, আনন্দই শেষ কথা বলিয়াই জগৎ দুঃখদ্বন্দ্ব সহিতে পারে। শুধু তাই নয়, দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ। আমরা প্রেমকে ততখানিই সত্য জানি যতখানি সে দুঃখ বহন করে। অতএব, দুঃখ তো আছেই কিন্তু তাহার উপরে আনন্দ আছে বলিয়াই সে আছে। নহিলে কিছুই থাকিত না, হানাহানি মারামারিও না। তোমরা যখন দুঃখকেই স্বীকার কর তখন আনন্দকে বাদ দাও, কিন্তু আনন্দকে স্বীকার করিলে দুঃখকে বাদ দেওয়া হয় না। অতএব, তোমরা যখন বল, হানাহানি করিতে করিতে যাহা টিকিল তাহাই সৃষ্টি, সেটা একটা অবচ্ছিন্ন, কথা, ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাবস্ট্রাক্‌সন্‌— আর আনন্দ হইতেই সমস্ত হইতেছে ও টিকিতেছে, এইটেই হইল পুরা সত্য।

আচ্ছা, তোমার কথাই মানিয়া লইলাম, কিন্তু এটা তো একটা তত্ত্বজ্ঞানের কথা। সংসারের কাজে ইহার দাম কী।

সে জবাবদিহি কবির নয়, এমন-কি, বৈজ্ঞানিকেরও নয়। কিন্তু, যেরকম দিনকাল পড়িয়াছে কবিদের মতো সংসারের নেহাত অনাবশ্যক লোকেরও হিসাবনিকাশের দায় এড়াইয়া চলিবার জো নাই। আমাদের দেশের অলংকারশাস্ত্রে রসকে চিরদিন অহেতুক অনির্বচনীয় বলিয়া আসিয়াছে, সুতরাং যারা রসের কারবারী তাহাদিগকে এ দেশে প্রয়োজনের হাটের মাসুল দিতে হয় নাই। কিন্তু, শুনিতে পাই, পশ্চিমের কোনো কোনো নামজাদা পাকা লোক রসকে কাব্যের চরম পদার্থ বলিয়া মানিতে রাজি নন, রসের তলায় কোনো তলানি পড়ে কি না সেইটে দেখিয়া নিক্তিতে মাপিয়া তাঁরা কাব্যের দাম ঠিক করিতে চান। সুতরাং, কোনো কথাতেই অনির্বচনীয়তার দোহাই দিতে গেলে আজকাল আমাদের দেশেও লোকে সেকেলে এবং ওরিয়েন্টাল বলিয়া নিন্দা করিতে পারে। সে নিন্দা

অসহ্য নয়, তবু কাজের লোকদিগকে যতটুকু খুশি করিতে পারা যায় চেষ্টা করা ভালো। যদিচ আমি কবি মাত্র, তবুও এ সম্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে যা আসে তা একটু গোড়ার দিক হইতে বলিতে চাই।

জগতে সৎ চিৎ ও আনন্দের প্রকাশকে আমরা জ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে পারি, কিন্তু তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। কাষ্ঠবস্তু গাছ নয়, তার রস টানিবার ও প্রাণ ধরিবার শক্তিও গাছ নয়; বস্তু ও শক্তিকে একটি সমগ্রতার মধ্যে আবৃত করিয়া যে একটি অখণ্ড প্রকাশ তাহাই গাছ— তাহা একই কালে বস্তুময়, শক্তিময়, সৌন্দর্যময়। গাছ আমাদিগকে যে আনন্দ দেয় সে এইজন্যই। এইজন্যই গাছ বিশ্বপৃথিবীর ঐশ্বর্য। গাছের মধ্যে ছুটির সঙ্গে কাজের, কাজের সঙ্গে খেলার কোনো বিচ্ছেদ নাই। এইজন্যই গাছপালার মধ্যে চিত্ত এমন বিরাম পায়, ছুটির সত্য রূপটি দেখিতে পায়। সে রূপ কাজের বিরুদ্ধ রূপ নয়। বস্তুত তাহা কাজেরই সম্পূর্ণ রূপ। এই কাজের সম্পূর্ণ রূপটিই আনন্দরূপ, সৌন্দর্যরূপ। তাহা কাজ বটে কিন্তু তাহা লীলা, কারণ তাহার কাজ ও বিশ্রাম একসঙ্গেই আছে।

সৃষ্টির সমগ্রতার ধারাটা মানুষের মধ্যে আসিয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া গেছে। তার প্রধান কারণ, মানুষের নিজের একটা ইচ্ছা আছে, জগতের লীলার সঙ্গে সে সমান তালে চলে না। বিশ্বের তালটা সে আজও সম্পূর্ণ কায়দা করিতে পারিল না। কথায় কথায় তাল কাটিয়া যায়। এইজন্য নিজের সৃষ্টিকে সে টুকরা টুকরা করিয়া ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে তাহাকে কোনো প্রকারে তালে বাঁধিয়া লইতে চায়। কিন্তু, তাহাতে পুরা সংগীতের রস ভাঙিয়া যায় এবং সেই টুকরাগুলার মধ্যেও তালরক্ষা হয় না। ইহাতে মানুষের প্রায় সকল কাজেই যোঝাযুঝিটাই সব চেয়ে প্রকাশ পাইতে থাকে।

একটা দৃষ্টান্ত, ছেলেদের শিক্ষা। মানবসন্তানের পক্ষে এমন নিদারুণ দুঃখ আর কিছুই নাই। পাখি উড়িতে শেখে, মা-বাপের গান শুনিয়া গান অভ্যাস করে, সেটা তার জীবলীলার অঙ্গ— বিদ্যার সঙ্গে প্রাণের ও মনের প্রাণান্তিক লড়াই নয়। সে-শিক্ষা আগাগোড়াই ছুটির দিনের শিক্ষা, তাহার খেলার বেশে কাজ। গুরুমশায় এবং পাঠশালা কী জিনিস ছিল একবার ভাবিয়া দেখো। মানুষের ঘরে শিশু হইয়া জন্মানো যেন এমন অপরাধ যে, বিশ বছর ধরিয়া তার শাস্তি পাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে কোনো তর্ক না করিয়া আমি কেবলমাত্র কবিত্বের জোরেই বলিব, এটা বিষম গলদ। কেননা, সৃষ্টিকর্তার মহলে বিশ্বকর্মার দলবল জগৎ জুড়িয়া গান গাহিতেছে—

মোদের, যেমন খেলা তেমনি যে কাজ জানিস নে কি, ভাই।

একদিন নীতিবিৎরা বলিয়াছিল, লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ। বেত বাঁচাইলে ছেলে মাটি করা হয়, এ কথা সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অথচ আজ দেখিতেছি, শিক্ষার মধ্যে বিশ্বের আনন্দসুর ক্রমে লাগিতেছে— সেখানে বাঁশের জায়গা ক্রমেই বাঁশি দখল করিল।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া যখন দেশে ফিরিতেছিলাম দুইজন মিশনারি আমার পাছু ধরিয়াছিল। তাহাদের মুখ হইতে আমার দেশের নিন্দায় সমুদ্রের হাওয়া পর্যন্ত দূষিয়া উঠিল। কিন্তু, তাহারা নিজের স্বার্থ ভুলিয়া আমার দেশের লোকের যে কত অবিশ্রাম উপকার করিতেছে তাহার লম্বা ফর্দ আমার কাছে দাখিল করিত। তাহাদের ফর্দটি জাল ফর্দ নয়, অঙ্কেও ভুল নাই। তাহারা সত্যই আমাদের উপকার করে, কিন্তু সেটার মতো নিষ্ঠুর অন্যায় আমাদের প্রতি আর কিছুই হইতে পারে না। তার চেয়ে আমাদের পাড়ায় গুর্খাফৌজ লাগাইয়া দেওয়াই ভালো। আমি এই কথা বলি, কর্তব্যনীতি যেখানে কর্তব্যের মধ্যেই বদ্ধ, অর্থাৎ যেখানে তাহা অ্যাবস্ট্র্যাক্‌শন্‌, সেখানে সজীব প্রাণীর প্রতি তাহার প্রয়োগ অপরাধ। এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে বলে, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌। কেননা, দানের সঙ্গে শ্রদ্ধা বা প্রেম মিলিলে তবেই তাহা সুন্দর ও সমগ্র হয়।

কিন্তু, এমনি আমাদের অভ্যাস কদর্য হইয়াছে যে, আমরা নির্লজ্জের মতো বলিতে পারি যে, কর্তব্যের পক্ষে সরস না হইলেও চলে, এমন-কি, না হইলে ভালো চলে। লড়াই, লড়াই, লড়াই! আমাদিগকে বড়াই করিতে হইবে যে, আনন্দকে অবজ্ঞা করি আমরা এমনি বাহাদুর! চন্দন মাখিতে আমাদের লজ্জা, তাই রাই-সরিষার বেলেস্তারা মাখিয়া আমরা দাপাদাপি করি। আমার লজ্জা ঐ

বেলেস্তারাটাকে।

আসলে, মানুষের গলদটা এইখানে যে, পনেরো-আনা লোক ঠিক নিজেকে প্রকাশ করিতে পায় না। অথচ নিজের পূর্ণ প্রকাশেই আনন্দ। গুণী যেখানে গুণী সেখানে তার কাজ যতই কঠিন হোক, সেখানেই তার আনন্দ ; মা যেখানে মা সেখানে তার ঝঞ্ঝাট যত বেশিই হোক-না, সেখানেই তার আনন্দ। কেননা, পূর্বেই বলিয়াছি, যথার্থ আনন্দই সমস্ত দুঃখকে শিবের বিষপানের মতো অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারে। তাই কার্লাইল প্রতিভাকে উলটা দিক দিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন, অসীম দুঃখ স্বীকার করিবার শক্তিকেই বলে প্রতিভা।

কিন্তু, মানুষ যে কাজ করে তার অধিকাংশই নিজেকে প্রকাশের জন্য নয়। সে হয় নিজের মনিবকে নয় কোনো প্রবল পক্ষকে, নয় কোনো বাঁধা দস্তুরের কর্মপ্রণালীকে পেটের দায়ে বা পিঠের দায়ে প্রকাশ করে। পনেরো-আনা মানুষের কাজ অন্যের কাজ। জোর করিয়া মানুষ নিজেকে আর-কেহ কিংবা আর-কিছুর মতো করিতে বাধ্য। চীনের মেয়ের জুতা তার পায়ের মতো নহে, তার পা তার জুতার মতো। কাজেই পাকে দুঃখ পাইতে হয় এবং কুৎসিত হইতে হয়। কিন্তু, এমনতরো কুৎসিত হইবার মস্ত সুবিধা এই যে, সকলেরই সমান কুৎসিত হওয়া সহজ। বিধাতা সকলকে সমান করেন নাই ; কিন্তু নীতিতত্ত্ববিৎ যদি সকলকেই সমান করিতে চায় তবে তো লড়াই ছাড়া, কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়া, কুৎসিত হওয়া ছাড়া আর কথা নাই।

সকল মানুষকেই রাজার, সমাজের, পরিবারের, মনিবের দাসত্ব করিতে হইতেছে। কেমন গোলমালে দায়ে পড়িয়া এইরকমটা ঘটিয়াছে। এইজন্যই লীলা কথাটাকে আমরা চাপা দিতে চাই। আমরা বুক ফুলাইয়া বলি, জিন-লাগাম পরিয়া ছুটিতে ছুটিতে রাস্তায় মুখ থুবড়াইয়া মরাই মানুষের পরম গৌরব। এ-সমস্ত দাসের জাতির দাসত্বের বড়াই। এমনি করিয়া দাসত্বের মন্ত্র আমাদের কানে আওড়ানো হয় পাছে এক মুহূর্তের জন্য আমাদের আত্মা আত্মগৌরবে সচেতন হইয়া উঠে। না, আমরা স্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মতো লাগাম-বাঁধা মরিবার জন্য জন্মাই নাই। আমরা রাজার মতো বাঁচিব, রাজার মতো মরিব।

আমাদের সব চেয়ে বড়ো প্রার্থনা এই যে, আবিরাবীর্ম এধি। হে আবি, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। তুমি পরিপূর্ণ, তুমি আনন্দ। তোমার রূপই আনন্দরূপ। সেই আনন্দরূপ গাছের চ্যালা কাঠ নহে, তাহা গাছ। তার মধ্যে হওয়া এবং করা একই।

আমার কথার জবাবে এ কথা বলা চলে যে, আনন্দরূপ মানুষের মধ্যে একবার ভাঙচুরের মধ্যে দিয়া তবে আবার আপনার অখণ্ড পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে। যতদিন তা না হয় ততদিন লড়াইয়ের মন্ত্র দিনরাত জপিতে হইবে ; ততদিন লাগাম পরিয়া মুখ থুবড়িয়া মরিতে হইবে। ততদিন ইস্কুলে আপিসে আদালতে হাটে বাজারে কেবলই নরমেধযজ্ঞ চলিতে থাকিবে। সেই বলির পশুদের কানে বলিদানের ঢাক-ঢোলই খুব উচ্চৈঃস্বরে বাজাইয়া তাহাদের বুদ্ধিকে ঘুলাইয়া দেওয়া ভালো— বলা ভালো, এই হাড়কাঠই পরম দেবতা, এই খড়্গাঘাতই আশীর্বাদ, আর জল্লাদই আমাদের ত্রাণকর্তা।

তা হোক, বলিদানের ঢাক-ঢোল বাজুক আপিসে, বাজুক আদালতে, বাজুক বন্দীদের শিকলের ঝংকারের সঙ্গে তাল রাখিয়া। মরুক সকলে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া, শুষ্কতালু লইয়া, লাগাম কামড়াইয়া রাস্তার ধুলার উপরে। কিন্তু, কবির বীণায় বরাবর বাজিবে : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। কবির ছন্দে এই মন্ত্রের উচ্চারণ শেষ হইবে না : Truth is beauty, beauty truth। ইহাতে আপিস আদালত কলেজ লাঠি হাতে তাড়া করিয়া আসিলেও সকল কোলাহলের উপরেও এই সুর বাজিবে— সমুদ্রের সঙ্গে, অরণ্যের সঙ্গে, আকাশের আলোকবীণার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজিবে : আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি— যাহা কিছু সমস্তই পরিপূর্ণ আনন্দের দিকেই চলিয়াছে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে রাস্তার-ধুলার উপরে মুখ থুবড়াইয়া মরিবার দিকে নহে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

সাহিত্য

উপনিষদ্ ব্রহ্মস্বরূপের তিনটি ভাগ করেছেন— সত্যম্, জ্ঞানম্, এবং অনন্তম্। চিরন্তনের এই তিনটি স্বরূপকে আশ্রয় ক'রে মানব-আত্মারও নিশ্চয় তিনটি রূপ আছে। তার একটি হল, আমরা আছি ; আর-একটি, আমরা জানি ; আর-একটি কথা তার সঙ্গে আছে তাই নিয়েই আজকের সভায় আমার আলোচনা। সেটি হচ্ছে, আমরা ব্যক্ত করি। ইংরেজিতে বলতে গেলে বলা যায়— I am, I know, I express. মানুষের এই তিন দিক এবং তিন নিয়েই একটি অখণ্ড সত্য। সত্যের এই তিন ভাব আমাদের নানা কাজে ও প্রবর্তনায় নিয়ত উদ্যত করে। টিকতে হবে তাই অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাসস্থান চাই, স্বাস্থ্য চাই। এই নিয়ে তার নানা রকমের সংগ্রহ রক্ষণ ও গঠনকার্য। 'আমি আছি' সত্যের এই ভাবটি তাকে নানা কাজ করায়। এই সঙ্গে আছে 'আমি জানি'। এরও তাগিদ কম নয়। মানুষের জানার আয়োজন অতি বিপুল, আর তা কেবলই বেড়ে চলেছে, তার মূল্য মানুষের কাছে খুব বড়ো। এই সঙ্গে মানবসত্যের আর-একটি দিক আছে 'আমি প্রকাশ করি'। 'আমি আছি' এইটি হচ্ছে ব্রহ্মের সত্য-স্বরূপের অন্তর্গত ; 'আমি জানি' এটি ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপের অন্তর্গত ; 'আমি প্রকাশ করি' এটি ব্রহ্মের অনন্তস্বরূপের অন্তর্গত।

'আমি আছি' এই সত্যকে রক্ষা করাও যেমন মানুষের আত্মরক্ষা, তেমনি 'আমি জানি' এই সত্যকে রক্ষা করাও মানুষের আত্মরক্ষা— কেননা, মানুষের স্বরূপ হচ্ছে জ্ঞানস্বরূপ। অতএব, মানুষ যে কেবলমাত্র জানবে কী দিয়ে, কী খাওয়ার দ্বারা আমাদের পুষ্টি হয়, তা নয়। তাকে নিজের জ্ঞানস্বরূপের গরজে রাত্রির পর রাত্রি জিজ্ঞাসা করতে হবে, মঙ্গলগ্রহে যে-চিহ্নজাল দেখা যায় সেটা কী। জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে হয়তো তাতে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অত্যন্ত পীড়িত হয়। অতএব, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তার জ্ঞানময় প্রকৃতির সঙ্গে সংগত ক'রে জানাই ঠিক জানা, তার প্রাণময় প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত যুক্ত ক'রে জানা ঠিক জানা নয়।

আমি আছি, আমাকে টিকে থাকতে হবে, এই কথাটি যখন সংকীর্ণ সীমায় থাকে, তখন আত্মরক্ষা বংশরক্ষা কেবল আমাদের অহংকে আঁকড়ে থাকে। কিন্তু, যে পরিমাণে মানুষ বলে যে, অন্যের টিকে থাকার মধ্যেই আমার টিকে থাকা, সেই পরিমাণে সে নিজের জীবনের মধ্যে অনন্তের পরিচয় দেয় ; সেই পরিমাণে 'আমি আছি' এবং 'অন্য সকলে আছে' এই ব্যবধানটা তার ঘুচে যায়। এই অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মাহাত্ম্য ঘটে সেইটেই হচ্ছে আত্মার ঐশ্বর্য ; সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে নানা প্রকারে প্রকাশ করতে থাকে। যেখানে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই। টিকে থাকার অসীমতা-বোধকে অর্থাৎ 'আপনার থাকা অন্যের থাকার মধ্যে' এই অনুভূতিকে মানুষ নিজেরই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র দৈনিক ব্যবহারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে না। তখন সেই মহাজীবনের প্রয়োজনসাধনের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার সেবায় ত্যাগে সে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই মহাজীবনের আনন্দকে আবেগকে সে নানা সাহিত্যে স্থাপত্যে মূর্তিতে চিত্রে গানে প্রকাশ করতে থাকে।

পূর্বে বলেছি, কেবলমাত্র নিজে নিজে একান্ত টিকে থাকবার ব্যাপারেও জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু, সে জ্ঞানের দীপ্তি নেই। জ্ঞানের রাজ্যে যেখানে অসীমের প্রেরণা সেখানে মানুষের শিক্ষার কত উদ্যোগ, কত পাঠশালা, কত বিশ্ববিদ্যালয়, কত বীক্ষণ, কত পরীক্ষণ, কত আবিষ্কার, কত উদ্ভাবনা। সেখানে মানুষের জ্ঞান সর্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে মানবাত্মার সর্বত্র প্রবেশের অধিকারকে ঘোষণা করে। এই অধিকারের বিচিত্র আয়োজন বিজ্ঞানে দর্শনে বিস্তৃত হতে থাকে। কিন্তু, তার বিশুদ্ধ আনন্দরসটি নানা রচনায় সাহিত্যে ও আর্টে প্রকাশ পায়।

তবেই একটা কথা দেখছি যে, পশুদের মতো মানুষেরও যেমন নিজে টিকে থাকবার ইচ্ছা প্রবল, পশুদের মতো মানুষেরও যেমন প্রয়োজনীয় জ্ঞানের কৌতূহল সর্বদা সচেষ্ট, তেমনি মানুষের আর-একটি জিনিস আছে যা পশুদের নেই— সে ক্রমাগতই তাকে কেবলমাত্র প্রাণধারণের সীমার বাইরে নিয়ে যায়। এইখানেই আছে প্রকাশতত্ত্ব।

প্রকাশটা একটা ঐশ্বর্যের কথা। যেখানে মানুষ দীন সেখানে তো প্রকাশ নেই, সেখানে সে যা আনে তাই খায়। যাকে নিজেই সম্পূর্ণ শোষণ ক'রে নিয়ে নিঃশেষ না করতে পারি, তাই দিয়েই তো প্রকাশ। লোহা গরম হতে হতে যতক্ষণ না দীপ্ত তাপ পর্যন্ত যায় ততক্ষণ তার প্রকাশ নেই। আলো হচ্ছে তাপের ঐশ্বর্য। মানুষের যে-সকল ভাব স্বকীয় প্রয়োজনের মধ্যেই ভুক্ত হয়ে না যায়, যার প্রাচুর্যকে আপনার মধ্যেই আপনি রাখতে পারে না, যা স্বভাবতই দীপ্যমান তারই দ্বারা মানুষের প্রকাশের উৎসব। টাকার মধ্যে এই ঐশ্বর্য আছে কোন্‌খানে। যেখানে সে আমার একান্ত প্রয়োজনকে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, যেখানে সে আমার পকেটের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নয়, যেখানে তার সমস্ত রশ্মিই আমার কৃষ্ণবর্ণ অহংটার দ্বারা সম্পূর্ণ শোষিত না হয়ে যাচ্ছে, সেইখানেই তার মধ্যে অশেষের আবির্ভাব এবং এই অশেষই নানারূপে প্রকাশমান। সেই প্রকাশের প্রকৃতিই এই যে, আমরা সকলেই বলতে পারি— 'এ যে আমার'। সে যখন অশেষকে স্বীকার করে তখনই সে কোনো একজন অমুক বিশেষ লোকের ভোগ্যতার মলিন সম্বন্ধ হতে মুক্ত হয়। অশেষের প্রসাদ-বঞ্চিত সেই বিশেষভোগ্য টাকার বর্বরতায় বসুন্ধরা পীড়িতা। দৈন্যের ভারের মতো আর ভার নেই। টাকা যখন দৈন্যের বাহন হয় তখন তার চাকার তলায় কত মানুষ ধূলিতে ধূলি হয়ে যায়। সেই দৈন্যেরই নাম প্রতাপ, তা আলোক নয়, তা কেবলমাত্র দাহ— সে যার কেবলমাত্র তারই, এইজন্যে তাকে অনুভব করা যায় কিন্তু স্বীকার করা যায় না। নিখিলের সেই স্বীকার-করাকেই বলে প্রকাশ।

এই প্রতাপের রক্তপঙ্কিল অশুচি স্পর্শকে প্রকৃতি তার শ্যামল অমৃতের ধারা দিয়ে মুছে মুছে দিচ্ছে। ফুলগুলি সৃষ্টির অন্তঃপুর থেকে সৌন্দর্যের ডালি বহন করে নিয়ে এসে প্রতাপের কলুষিত পদচিহ্নগুলোকে লজ্জায় কেবলই ঢাকা দিয়ে দিয়ে চলেছে। জানিয়ে দিচ্ছে যে, 'আমরা ছোটো, আমরা কোমল, কিন্তু আমরাই চিরকালের। কেননা, সকলেই আমাদের বরণ ক'রে নিয়েছে— আর, ঐ-যে উদ্যতমুষ্টি বিভীষিকা, যে পাথরের 'পরে পাথর চাপিয়ে আপনার কেল্লাকে অভ্রভেদী ক'রে তুলছে সে কিছুই নয়, কেননা ওর নিজে ছাড়া আর কেউই ওকে স্বীকার করছে না— মাধবীবিতানের সুন্দরী ছায়াটিও ওর চেয়ে সত্য।'

এই-যে তাজমহল— এমন তাজমহল, তার কারণ সাজাহানের হৃদয়ে তাঁর প্রেম, তাঁর বিরহবেদনার আনন্দ অনন্তকে স্পর্শ করেছিল ; তাঁর সিংহাসনকে তিনি যে কোঠাতেই রাখুন তিনি তাঁর তাজমহলকে তাঁর আপন থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে গেছেন। তার আর আপন-পর নেই, সে অনন্তের বেদি। সাজাহানের প্রতাপ যখন দস্যুবৃত্তি করে তখন তার লুঠের মাল যতই প্রভূত হোক তাতে ক'রে তার নিজের থলিটারও পেট ভরে না, সুতরাং ক্ষুধার অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। আর, যেখানে পরিপূর্ণতার উপলব্ধি তার চিত্তে আবির্ভূত হয় সেখানে সেই দৈববাণীটিকে নিজের কোষাগারে নিজের বিপুল রাজ্যে সাম্রাজ্যে কোথাও সে আর ধ'রে রেখে দিতে পারে না। সর্বজনের ও নিত্যকালের হাতে তাকে সমর্পণ করা ছাড়া আর গতি নেই। একেই বলে প্রকাশ। আমাদের সমস্ত মঙ্গল-অনুষ্ঠানে গ্রহণ করবার মন্ত্র হচ্ছে ওঁ— অর্থাৎ, হাঁ। তাজমহল হচ্ছে সেই নিত্য-উচ্চারিত ওঁ— নিখিলের সেই গ্রহণ-মন্ত্র মূর্তিমান। সাজাহানের সিংহাসনে সেই মন্ত্র পড়া হয় নি ; একদিন তার যতই শক্তি থাক্-না কেন, সে তো 'না' হয়ে কোথায় তলিয়ে গেল। তেমনি কত কত বড়ো বড়ো নামধারী 'না'এর দল আজ দম্ভভরে বিলুপ্তির দিকে চলেছে, তাদের কামানগর্জিত ও বন্দীদের শৃঙ্খল-ঝংকৃত কলরবে কান বধির হয়ে গেল, কিন্তু তার মায়া, তারা নিজেরই মৃত্যুর নৈবেদ্য নিয়ে কালরাত্রিপারাবারের কালীঘাটে সব যাত্রা ক'রে চলেছে। কিন্তু, ঐ সাজাহানের কন্যা জাহানারার একটি কান্নার গান ? তাকে নিয়ে আমরা বলেছি, ওঁ।

কিন্তু, আমরা দান করতে চাইলেই কি দান করতে পারি। যদি বলি 'তুভ্যমহং সম্প্রদদে', তা হলেই কি বর এসে হাত পাতেন। নিত্যকাল এবং নিখিলবিশ্ব এই কথাই বলেন— 'যদেতৎ হৃদয়ং মম' তার সঙ্গে তোমার সম্প্রদানের মিল থাকা চাই। তোমার অনন্তম্ যা দেবেন আমি তাই নিতে পারি। তিনি মেঘদূতকে নিয়েছেন— তা উজ্জয়িনীর বিশেষ সম্পত্তি না, তাকে বিক্রমাদিত্যের সিপাই

শাস্ত্রী পাহারা দিয়ে তাঁর অন্তঃপুরের হংসপদিকাদের মহলে আটকে রাখতে পারে নি। পণ্ডিতরা লড়াই করতে থাকুন, তা খৃস্টজন্মের পাঁচশো বছর পূর্বে কি পরে রচিত। তার গায়ে সকল তারিখেরই ছাপ আছে। পণ্ডিতেরা তর্ক করতে থাকুন, তা শিপ্রাতীরে রচিত হয়েছিল না গঙ্গাতীরে। তার মন্দাক্রান্তার মধ্যে পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সকল নদীরই কলধ্বনি মুখরিত। অপর পক্ষে এমন-সব পাঁচালি আছে যার অনুপ্রাসছটার চকমকি ঠোকা স্ফুলিঙ্গবর্ষণে সভাস্থ হাজার হাজার লোকে মুগ্ধ হয়ে গেছে; তাদের বিশুদ্ধ স্বাদেশিকতায় আমরা যতই উত্তেজিত হই-না কেন, সে-সব পাঁচালির দেশ ও কাল সুনির্দিষ্ট; কিন্তু সর্বদেশ ও সর্বকাল তাদের বর্জন করাতে তারা কুলীনের অনূঢ়া মেয়ের মতো ব্যর্থ কুলগৌরবকে কলাগাছের কাছে সমর্পণ ক'রে নিঃসন্ততি হয়ে চলে যাবে।

উপনিষদ যেখানে ব্রহ্মের স্বরূপের কথা বলেছেন অনন্তম্, সেখানে তাঁর প্রকাশের কথা কী বলেছেন। বলেছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। এইটে হল আমাদের আসল কথা। সংসারটা যদি গারদখানা হত তা হলে সকল সিপাই মিলে রাজদণ্ডের ঠেলা মেরেও আমাদের টলাতে পারত না। আমরা হরতাল নিয়ে বসে থাকতেম, বলতেম 'আমাদের পানাহার বন্ধ'। কিন্তু, আমি তো স্পষ্টই দেখছি, কেবল যে চারি দিকে তাগিদ আছে তা নয়।

বারে বারে আমার হৃদয় যে মুগ্ধ হয়েছে। এর কী দরকার ছিল। টিটাগড়ের পাটকলের কারখানায় যে মজুরেরা খেটে মরে তারা মজুরি পায়, কিন্তু তাদের হৃদয়ের জন্যে তো কারও মাথাব্যথা নেই। তাতে তো কল বেশ ভালোই চলে। যে মালিকেরা শতকরা ৪০০ টাকা হারে মুনাফা নিয়ে থাকে তারা তো মনোহরণের জন্য এক পয়সাও অপব্যয় করে না। কিন্তু, জগতে তো দেখছি, সেই মনোহরণের আয়োজনের অন্ত নেই। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, এ কেবল বোপদেবের মুগ্ধবোধের সূত্রজাল নয়, এ যে দেখি কাব্য। অর্থাৎ, দেখছি ব্যাকরণটা রয়েছে দাসীর মতো পিছনে, আর রসের লক্ষ্মী রয়েছেন সামনেই। তা হলে কি এর প্রকাশের মধ্যে দণ্ডীর দণ্ডই রয়েছে না রয়েছে কবির আনন্দ?

এই-যে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত, এই-যে আকাশ থেকে ধরণী পর্যন্ত সৌন্দর্যের প্লাবন, এর মধ্যে তো কোনো জবরদস্ত্ পাহারাওয়ালার তকমার চিহ্ন দেখতে পাই নে। ক্ষুধার মধ্যে একটা তাগিদ আছে বটে, কিন্তু ওটা তো স্পষ্টই একটা 'না' এর ছাপ-মারা জিনিস। 'হাঁ' আছে বটে ক্ষুধা-মেটাবার সেই ফলটির মধ্যে, রসনা যাকে সরস আগ্রহের সঙ্গে আত্মীয় বলে অভ্যর্থনা করে নেয়। তা হলে কোন্‌টাকে সামনে দেখব আর কোন্‌টাকে পিছনে? ব্যাকরণটাকে না কাব্যটিকে? পাকশালকে না ভোজের নিমন্ত্রণকে? গৃহকর্তার উদ্দেশ্যটি কোন্‌খানে প্রকাশ পায়— যেখানে, নিমন্ত্রণপত্র হাতে, ছাতা মাথায় হেঁটে এলেম না যেখানে আমার আসন পাতা হয়েছে? সৃষ্টি আর সর্জন হল একই কথা। তিনি আপনাকে পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন করেছেন, বিলিয়ে দিয়েছেন ব'লেই আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছেন— তাই আমাদের হৃদয় বলে 'আঃ বাঁচলেম'।

শুক্ল সন্ধ্যার আকাশ জ্যোৎস্নায় উপছে পড়েছে— যখন কমিটি-মিটিঙে তর্ক বিতর্ক চলেছে তখন সেই আশ্চর্য খবরটি ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু তার পর যখন দশটা রাত্রে ময়দানের সামনে দিয়ে বাড়ি ফিরি তখন ঘন চিন্তার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে যে প্রকাশটি আমার মনের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায় তাকে দেখে আর কী বলব। বলি, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। সেই যে যৎ আনন্দরূপে যার প্রকাশ, সে কোন্ পদার্থ। সে কি শক্তি-পদার্থ।

রান্নাঘরে শক্তির প্রকাশ লুকিয়ে আছে। কিন্তু, ভোজের থালায় সে কি শক্তির প্রকাশ। মোগলসম্রাট প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন শক্তিকে। সেই বিপুল কাঠখড়ের প্রকাশকে কি প্রকাশ বলে। তার মূর্তি কোথায়। আওরঙজেবের নানা আধুনিক অবতাররাও রক্তরেখায় শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে অতি বিপুল আয়োজন করেছেন। কিন্তু যিনি আবিঃ, যিনি প্রকাশস্বরূপ, আনন্দরূপে যিনি ব্যক্ত হচ্ছেন, তিনি সেই রক্তরেখার উপরে রবার বুলোতে এখনি শুরু করেছেন। আর, তাঁর আলোকরশ্মির সম্মার্জনী তাদের আয়োজনের আবর্জনার উপর নিশ্চয় পড়তে আরম্ভ হয়েছে। কেননা, তাঁর আনন্দ যে প্রকাশ, আর আনন্দই যে তাঁর প্রকাশ।

এই প্রকাশটিকে আচ্ছন্ন করে তাঁর শক্তিকে যদি তিনি সামনে রাখতেন তা হলে তাঁকে মানার মতো অপমান আমার পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। যখন জাপানে যাচ্ছিলাম জাহাজ পড়ল দারুণ ঝড়ে। আমি ছিলেম ডেকে বসে। আমাকে ডুবিয়ে মারার পক্ষে পবনের একটা ছোটো নিশ্বাসই যথেষ্ট ; কিন্তু কালো সাগরের বুকের উপর পাগলা ঝড়ের যে-নৃত্য তার আয়োজন হচ্ছে আমার ভিতরে যে পাগল মন অছে তাকে মাতিয়ে তোলবার জন্যে। ঐ বিপুল সমারোহের দ্বারাই পাগলের সঙ্গে পাগলের মোকাবিলায় রহস্যালাপ হতে পারল। নাহয় ডুবেই মরতেম— সেটা কি এর চেয়ে বড়ো কথা। রুদ্রবীণার ওস্তাদজি তাঁর এই রুদ্রবীণার শাগরেদকে ফেনিল তরঙ্গ-তাণ্ডবের মধ্যে দুটো-একটা চক্র-হাওয়ার দ্রুত-তালের তান শুনিয়ে দিলেন। সেইখানে বলতে পারলেম, 'তুমি আমার আপনার।'

অমৃতের দুটি অর্থ— একটি যার মৃত্যু নেই, এবং যা পরম রস। আনন্দ যে রূপ ধরেছে এই তো হল রস। অমৃতও যদি সেই রসই হয় তবে রসের কথা পুনরুক্ত হয় মাত্র। কাজেই এখানে বলব অমৃত মানে যা মৃত্যুহীন— অর্থাৎ আনন্দ যেখানে রূপ ধরেছে সেইখানেই সেই প্রকাশ মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে। সবাই দেখাচ্ছে কালের ভয়। কালের রাজত্বে থেকেও কালের সঙ্গে যার অসহযোগ সে কোথায়।

এইবারে আমাদের কথা। কাব্য যেটি ছন্দে গাঁথা হয়, রূপদক্ষ যে-রূপ রচনা করেন, সেটি যদি আনন্দের প্রকাশ হয় তবে সে মৃত্যুজয়ী।— এই 'রূপদক্ষ' কথাটি আমার নূতন পাওয়া। ইনস্‌ক্রিপ্‌শন্ অর্থাৎ একটা প্রাচীনলিপিতে পাওয়া গেছে, আর্টিস্টের একটা চমৎকার প্রতিশব্দ।—

কাব্যের বা চিত্রের তো সমাপ্তিতে সমাপ্তি নেই। মেঘদূত শোনা হয়ে গেল, ছবি দেখে বাড়ি ফিরে এলেম, কিন্তু মনের মধ্যে একটা অবসাদকে তো নিয়ে এলেম না। গান যখন সমে এসে থামল তখন ভারি আনন্দে মাথা ঝাঁকা দিলেম। সম মানে তো থামা, তাতে আনন্দ কেন— তার কারণ হচ্ছে, আনন্দরূপ থামাতে থামে না। কিন্তু, টাকাটা যেই ফুরিয়ে গেল তখন তো সমে মাথা নেড়ে বলি নে— 'আঃ'।

গান থামল— তবু সে শূন্যের মতো অন্ধকারের মতো থামল না কেন। তার কারণ, গানের মধ্যে একটি তত্ত্ব আছে যা সমগ্র বিশ্বের আত্মার মধ্যে আছে— কাজেই সে সেই 'ওঁ'কে আশ্রয় করে থেকে যায় ; তার জন্যে কোনো গর্ত কোথাও নেই। এই গান আমি শুনি বা নাই শুনি, তাকে প্রত্যক্ষত কেউ নিল বা নাই নিল, তাতে কিছুই আসে-যায় না। কত অমূল্যধন চিত্রে কাব্যে হারিয়ে গেছে কিন্তু সেটা একটা বাহ্য ঘটনা, একটা আকস্মিক ব্যাপার। আসল কথা হচ্ছে এই যে, তারা আনন্দের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করেছে, প্রয়োজনের দৈন্যকে করে নি। সেই দৈন্যের রূপটা যদি দেখতে চাও তবে পাটকলের কারখানায় গিয়ে ঢোকো যেখানে গরিব চাষার রক্তকে ঘূর্ণীচাকার পাক দিয়ে বহুশতকরা হারের মুনাফায় পরিণত করা হচ্ছে। গঙ্গাতীরের বটচ্ছায়াসমাশ্রিত যে দেউলটিকে লোপ ক'রে দিয়ে ঐ প্রকাণ্ড-হাঁ-করা কারখানা কালো ধোঁয়া উদ্‌গীর্ণ করছে সেই লুপ্ত দেউলের চেয়েও ঐ কারখানা-ঘর মিথ্যা। কেননা, আনন্দলোকে ওর স্থান নেই।

বসন্তে ফুলের মুকুল রাশি রাশি ঝরে যায় ; ভয় নেই, কেননা ক্ষয় নেই। বসন্তের ডালিতে অমৃতমন্ত্র আছে। রূপের নৈবেদ্য ভরে ভরে ওঠে। সৃষ্টির প্রথম যুগে যে-সব ভূমিকম্পের মহিষ তার শিঙের আক্ষেপে ভূতল থেকে তপ্তপঙ্ক উৎক্ষিপ্ত করে দিচ্ছিল তারা আর ফিরে এল না ; যে-সব অগ্নিনাগিণী রসাতলের আবরণ ফুঁড়ে ক্ষণে ক্ষণে ফণা তুলে পৃথিবীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে দংশন করতে উদ্যত হয়েছিল তারা কোন্ বাঁশি শুনে শান্ত হয়ে গেল। কিন্তু, কচি কচি শ্যামল ঘাসের কোমল চুম্বন আকাশের নীল চোখকে বারে বারে জুড়িয়ে দিচ্ছে। তারা দিনে দিনে ফিরে ফিরে আসে। আমার ঘরের দরজার কাছে কয়েকটি কাঁটাগাছে বসন্তের সোহাগে ফুল ফুটে ওঠে। সে হল কণ্টিকারীর ফুল। তার বেগুনি রঙের কোমল বুকের মাঝখানে একটুখানি হলদে সোনা। আকাশে তাকিয়ে যে-সূর্যের কিরণকে সে ধ্যান করে সেই ধ্যানটুকু তার বুকের মাঝখানটিতে যেন মধুর হয়ে রইল। এই ফুলের কি খ্যাতি আছে। আর, এ কি ঝরে ঝরে পড়ে না। কিন্তু, তাতে ক্ষতি হল কী। পৃথিবীর অতো

বড়ো বড়ো পালোয়ানের চেয়ে সে নির্ভয়। অন্তরের আনন্দের মধ্যে সে রয়েছে, সে অমৃত। যখন বাইরে সে নেই তখনো রয়েছে।

মৃত্যুর হাতুড়ি পিটিয়েই মহাকালের দরবারে অমৃতের যাচাই হতে থাকে। খ্রিস্টের মৃত্যুসংবাদে এই কথাটাই না খ্রিস্টীয় পুরাণে আছে। মৃত্যুর আঘাতেই তাঁর অমৃতের শিখা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ হল না কি। কিন্তু, একটি কথা মনে রাখতে হবে— আমার কাছে বা তোমার কাছে ঘাড়-নাড়া পাওয়াকেই অমৃতের প্রকাশ বলে না। যেখানে সে রয়ে গেল সেখানে আমাদের দৃষ্টি না যেতেও পারে, আমাদের স্মৃতির পরিমাণে তার অমৃতত্বের পরিমাণ নয়। পূর্ণতার আবির্ভাবকে বুকে করে নিয়ে সে যদি এসে থাকে তা হলে মুহূর্তকালের মধ্যেই সে নিত্যকে দেখিয়ে দিয়েছে— আমার ধারণার উপরে তার আশ্রয় নয়।

হয়তো এ-সব কথা তত্ত্বজ্ঞানের কোঠায় পড়ে— আমার মতো আনাড়ির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া অসংগত। কিন্তু, আমি সেই শিক্ষকের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলছি নে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় অন্তরে বাহিরে রসের যে-পরিচয় পেয়েছি আমি তারই কাছ থেকে ক্ষণে ক্ষণে আমার প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করেছি। তাই আমি এখানে আহরণ করছি। আমাদের দেশে পরমপুরুষের একটি সংজ্ঞা আছে; তাঁকে বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দ। এর মধ্যে আনন্দটিই হচ্ছে সবশেষের কথা, এর পরে আর-কোনো কথা নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব তখন এ প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে, আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কি না।

বৈশাখ ১৩৩০

তথ্য ও সত্য

সাহিত্য বা কলা -রচনায় মানুষের যে-চেষ্টার প্রকাশ, তার সঙ্গে মানুষের খেলা করবার প্রবৃত্তিকে কেউ-কেউ এক করে দেখেন। তাঁরা বলেন, খেলার মধ্যে প্রয়োজনসাধনের কোনো কথা নেই, তার উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ অবসরবিনোদন; সাহিত্য ও ললিতকলারও সেই উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে।

আমি কাল বলেছি যে, আমাদের সত্তার একটা দিক হচ্ছে প্রাণধারণ, টিকে থাকা। সেজন্যে আমাদের কতকগুলি স্বাভাবিক বেগ আবেগ আছে। সেই তাগিদেই শিশুরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাত পা নাড়ে, আরো একটু বড়ো হলে অকারণে ছুটোছুটি করতে থাকে। জীবনযাত্রায় দেহকে ব্যবহার করবার প্রয়োজনে প্রকৃতি এইরকম অনর্থকতার ভান করে আমাদের শিক্ষা দিতে থাকেন। ছোটো মেয়ে যে-মাতৃভাব নিয়ে জন্মেছে তার পরিচালনার জন্যেই সে পুতুল নিয়ে খেলে। প্রাণধারণের ক্ষেত্রে জিগীষাবৃত্তি একটি প্রধান অস্ত্র; বালকেরা তাই প্রকৃতির প্রেরণায় প্রতিযোগিতার খেলায় সেই বৃত্তিতে শান দিতে থাকে।

এইরকম খেলাতে আমাদের বিশেষ আনন্দ আছে; তার কারণ এই যে, প্রয়োজন-সাধনের জন্য আমরা যে-সকল প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মেছি, প্রয়োজনের উপস্থিত দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে নিয়ে তাদের খেলায় প্রকাশ করতে পাই। এই হচ্ছে ফলাসক্তিহীন কর্ম; এখানে কর্মই চরম লক্ষ্য, খেলাতেই খেলার শেষ। তৎসত্ত্বেও খেলার বৃত্তি আর প্রয়োজনসাধনের বৃত্তি মূলে একই। সেইজন্যে খেলার মধ্যে জীবনযাত্রার নকল এসে পড়ে। কুকুরের জীবনযাত্রায় যে-লড়াইয়ের প্রয়োজন আছে দুই কুকুরের খেলার মধ্যে তারই নকল দেখতে পাই। বিড়ালের খেলা ইঁদুর-শিকারের নকল। খেলার ক্ষেত্র জীবযাত্রা ক্ষেত্রের প্রতিরূপ।

অপর পক্ষে, যে-প্রকাশচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপন প্রয়োজনের রূপকে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা, সেই চেষ্টারই সাহিত্যগত ফলকে আমি রসসাহিত্য নাম দিয়েছি। বেঁচে থাকবার জন্যে আমাদের যে-মূলধন আছে তারই একটা উদ্‌বৃত্ত অংশকে নিয়ে সাহিত্যে আমরা জীবন-ব্যবসায়েরই নকল করে থাকি, এ কথা বলতে তো মন সায় দেয় না। কবিতার বিষয়টি যাই হোক-না কেন, এমন-কি, সে যদি দৈনিক একটা তুচ্ছ ব্যাপারই হয়, তবু সেই বিষয়টিকে শব্দচিত্রে নকল করে ব্যক্ত করা তার উদ্দেশ্য কখনোই নয়।

বিদ্যাপতি লিখছেন—

যব গোধূলিসময় বেলি
ধনি মন্দিরবাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

গোধূলিবেলায় পূজা শেষ করে বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে ঘরে ফেরে— আমাদের দেশে সংসার-ব্যাপারে এ ঘটনা প্রত্যহই ঘটে। এ কবিতা কি শব্দরচনার দ্বারা তারই পুনরাবৃত্তি। জীবন-ব্যবহারে যেটা ঘটে, ব্যবহারের দায়িত্বমুক্ত ভাবে সেইটেকেই কল্পনায় উপভোগ করাই কি এই কবিতার লক্ষ্য। তা কখনোই স্বীকার করতে পারি নে। বস্তুত, মন্দির থেকে বালিকা বাহির হয়ে ঘরে চলেছে, এই বিষয়টি এই কবিতার প্রধান বস্তু নয়। এই বিষয়টিকে উপলক্ষমাত্র করে ছন্দে-বন্ধে বাক্যবিন্যাসে উপমাসংযোগে যে একটি সমগ্র বস্তু তৈরি হয়ে উঠছে সেইটেই হচ্ছে আসল জিনিস। সে জিনিসটি মূল বিষয়ের অতীত, তা অনির্বচনীয়।

ইংরেজ কবি কীট্‌স্ একটি গ্রীক পূজাপাত্রকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখেছেন। যে-শিল্পী সেই পাত্রকে রচনা করেছিল সে তো কেবলমাত্র একটি আধারকে রচনা করে নি। মন্দিরে অর্ঘ্য নিয়ে যাবার সুযোগ মাত্র ঘটাবার জন্যে এই পাত্রের সৃষ্টি নয়। অর্থাৎ, মানুষের প্রয়োজনকে রূপ দেওয়া এর উদ্দেশ্য ছিল না। প্রয়োজনসাধন এর দ্বারা নিশ্চয়ই হয়েছিল, কিন্তু প্রয়োজনের মধ্যেই এ নিঃশেষ হয় নি। তার থেকে এ অনেক স্বতন্ত্র, অনেক বড়ো। গ্রীক শিল্পী সুষমাকে, পূর্ণতার একটি আদর্শকে, প্রত্যক্ষতা দান করেছে; রূপলোকে অপরূপকে ব্যক্ত করেছে। সে কোনো সংবাদ দেয় নি, বহিঃসংসারের কোনো-কিছুর পুনরাবৃত্তি করে নি। অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করবার যে-চেষ্টা তাকে খেলা না বলে লীলা বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে আমাদের রূপ সৃষ্টি করবার বৃত্তি; প্রয়োজনসাধনের বৃত্তি নয়। তাতে মানুষের নিত্যকর্মের, দৈনিক জীবনের সম্বন্ধ থাকতেও পারে। কিন্তু, সেটা অবান্তর।

আমাদের আত্মার মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ আছে। আমরা যা-কিছু জানি কোনো-না-কোনো ঐক্যসূত্রে জানি। কোনো জানা আপনাতেই একান্ত স্বতন্ত্র নয়। যেখানে দেখি আমাদের পাওয়া বা জানার অস্পষ্টতা সেখানে জানি, মিলিয়ে জানতে না পারাই তার কারণ। আমাদের আত্মার মধ্যে জ্ঞানে ভাবে এই-যে একের বিহার, সেই এক যখন লীলাময় হয়, যখন সে সৃষ্টির দ্বারা আনন্দ পেতে চায়, সে তখন একাকে বাহিরে সুপরিস্ফুট করে তুলতে চায়। তখন বিষয়কে উপলক্ষ ক'রে, উপাদানকে আশ্রয় ক'রে একটি অখণ্ড এক ব্যক্ত হয়ে ওঠে। কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্পকলায় গ্রীক শিল্পীর পূজাপাত্রে বিচিত্র রেখার আবর্তনে যখন আমরা পরিপূর্ণ এককে চরম রূপে দেখি, তখন আমাদের অন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্লোকের একের মিলন হয়। যে-মানুষ অরসিক সে এই চরম এককে দেখতে পায় না; সে কেবল উপাদানের দিক থেকে প্রয়োজনের দিক থেকে এর মূল্য নির্ধারণ করে।—

শরদ-চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে বহল কুসুমগন্ধ,
ফুল্ল মল্লি মালতী যূথী
মত্তমধুপভোরনী।

বিষয়ে ভাবে বাক্যে ছন্দে নিবিড় সম্মিলনের দ্বারা যদি এই কাব্যে একের রূপ পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়, যদি সেই একের আবির্ভাবই চরম হয়ে আমাদের চিত্তকে অধিকার করে, যদি এই কাব্য খণ্ড খণ্ড হয়ে উল্কাবৃষ্টির দ্বারা আমাদের মনকে আঘাত না করতে থাকে, যদি ঐক্যরসের চরমতাকে অতিক্রম করে আর-কোনো উদ্দেশ্য উগ্র হয়ে না ওঠে, তা হলেই এই কাব্যে আমরা সৃষ্টিলীলাকে স্বীকার করব।

গোলাপ-ফুলে আমরা আনন্দ পাই। বর্ণে গন্ধে রূপে রেখায় এই ফুলে আমরা একের সুষমা দেখি। এর মধ্যে আমাদের আত্মারূপী এক আপন আত্মীয়তা স্বীকার করে, তখন এর আর-কোনো মূল্যের দরকার হয় না। অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় বলে এরই নাম দিই আনন্দরূপ।

গোলাপের মধ্যে সুনিহিত সুবিহিত সুষমাযুক্ত যে-ঐক্য নিখিলের অন্তরের মধ্যেও সেই ঐক্য। সমস্তের সংগীতের সঙ্গে এই গোলাপের সুরটুকুর মিল আছে ; নিখিল এই ফুলের সুষমাটিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে।

এই কথাটাকে আর-এক দিক থেকে বোঝাবার চেষ্টা করি। আমি যখন টাকা করতে চাই তখন আমার টাকা করবার নানা প্রকার চেষ্টা ও চিন্তার মধ্যে একটি ঐক্য বিরাজ করে। বিচিত্র প্রয়াসের মধ্যে একটিমাত্র লক্ষ্যের ঐক্য অর্থকামীকে আনন্দ দেয়। কিন্তু, এই ঐক্য আপন উদ্দেশ্যের মধ্যেই খণ্ডিত, নিখিলের সৃষ্টিলীলার সঙ্গে যুক্ত নয়। ধনলোভী বিশ্বকে টুকরো টুকরো করে খাবলে নিয়ে আপন মুনফার মধ্যে সঞ্চিত করতে থাকে। অর্থকামনার ঐক্য বড়ো ঐক্যকে আঘাত করতে থাকে। সেইজন্যে উপনিষদ যেখানে বলেছেন, নিখিল বিশ্বকে একের দ্বারা পূর্ণ করে দেখবে, সেইখানেই বলেছেন, মা গৃধঃ— লোভ করবে না। কারণ, লোভের দ্বারা একের ধারণা থেকে, একের আনন্দ থেকে, বঞ্চিত হতে হয়। লোভীর হাতে কামনার সেই লণ্ঠন যা কেবল একটি বিশেষ সংকীর্ণ জায়গায় তার সমস্ত আলো সংহত করে ; বাকি সব জায়গার সঙ্গে তার অসামঞ্জস্য গভীর অন্ধকারে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। অতএব, লোভের এই সংকীর্ণ ঐক্যের সঙ্গে সৃষ্টির ঐক্যের, রস-সাহিত্য ও ললিতকলার ঐক্যের সম্পূর্ণ তফাত। নিখিলকে ছিন্ন করে হয় লাভ, নিখিলকে এক করে হয় রস। লক্ষপতি টাকার থলি নিয়ে ভেদ ঘোষণা করে ; আর গোলাপ নিখিলের দূত, একের বার্তাটি নিয়ে সে ফুটে ওঠে। যে এক অসীম, গোলাপের হৃদয়টুকু পূর্ণ করে সেই তো বিরাজ করে। কীট্‌স্‌ তাঁর কবিতায় নিখিল একের সঙ্গে গ্রীকপাত্রটির ঐক্যের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

Thou silent form, dost tease us out of thought,
As doth eternity.

হে নীরব মূর্তি, তুমি আমাদের মনকে ব্যাকুল করে সকল চিন্তার বাইরে নিয়ে যাও, যেমন নিয়ে যায় অসীম।

কেননা, অখণ্ড একের মূর্তি যে-আকারেই থাক্-না অসীমকেই প্রকাশ করে ; এইজন্যেই সে অনির্বচনীয়, মন এবং বাক্য তার কিনারা না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে।

অসীম একের সেই আকৃতি যা ঋতুদের ডালায় ডালায় ফুলে ফুলে বারে বারে পূর্ণ হয়েও নিঃশেষিত হল না, সেই সৃষ্টির আকৃতিই তো রূপদক্ষের কারুকলার মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আমাদের চিত্তকে চিন্তার বাইরে উদাস ক'রে নিয়ে যায়। অসীম একের আকৃতিই তো সেই বেদনা যা বেদ বলেছেন, সমস্ত আকাশকে ব্যথিত করে রয়েছে। সে 'রোদসী', 'ক্রন্দসী'— সে কাঁদছে। সৃষ্টির কান্না রূপে রূপে, আলোয়, আলোয় আকাশে আকাশে নানা আবর্তনে আবর্তিত— সূর্যে চন্দ্রে, গ্রহে নক্ষত্রে, অণুতে পরমাণুতে, সুখে দুঃখে, জন্মে মরণে। সমস্ত আকাশের সেই কান্না মানুষের অন্তরে এসে বেজেছে। সমস্ত আকাশের সেই কান্নাই একটি সুন্দর জলপাত্রের রেখায় রেখায় নিঃশব্দ হয়ে দেখা দেয়। এই পাত্র দিয়ে অসীম আকাশের অমৃতনির্ঝরের রসধারা ভরতে হবে ব'লেই শিল্পীর মনে ডাক পড়েছিল ; অব্যক্তের গভীরতা থেকে অনির্বচনীয়ের রসধারা। এতে ক'রে যে-রস মানুষের কাছে এসে পৌঁছবে সে তো শরীরের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে নয়। শরীরের পিপাসা মেটাবার যে-জল তার জন্যে, ভাঁড় হোক, গণ্ডূষ হোক, কিছুতেই আসে যায় না। এমন অপরূপ পাত্রের প্রয়োজন কী ; কী বিচিত্র এর

গড়ন, কত রঙ দিয়ে আঁকা। এঁকে সময় নষ্ট করা বললে প্রতিবাদ করা যায় না। রূপদক্ষ আপনার চিত্তকে এই একটি ঘটের উপর উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছে ; বলতে পার, সমস্তই বাজে খরচ হল। সে কথা মানি ; সৃষ্টির বাজে-খরচের বিভাগেই অসীমের খাস-তহবিল। ঐখানেই যত রঙের রঙ্গিমা, রূপের ভঙ্গি। যারা মুনফার হিসাব রাখে তারা বলে, এটা লোকসান ; যারা সন্ন্যাসী তারা বলে, এটা অসংযম। বিশ্বকর্মা তাঁর হাপর হাতুড়ি নিয়ে ব্যস্ত, এর দিকে তাকান না। বিশ্বকবি এই বাজে-খরচের বিভাগে তাঁর থলি ঝুলি কেবলই উজাড় ক'রে দিচ্ছেন, অথচ রসের ব্যাপার আজও দেউলে হল না।

শরীরের পিপাসা ছাড়া আর-এক পিপাসাও মানুষের আছে। সংগীত চিত্র সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধে সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে। ভোলবার জো কী। সে যে অন্তরবাসী একের বেদনা। সে বলছে, 'আমাকে বাহিরে প্রকাশ করো, রূপে রঙে সুরে বাণীতে নৃত্যে। যে যেমন করে পার আমার অব্যক্ত ব্যথাটিকে ব্যক্ত করে দাও।' এই ব্যাকুল প্রার্থনা যার হৃদয়ের গভীরে এসে পৌঁচেছে সে আপিসের তাড়া, ব্যবসায়ের তাগিদ, হিতৈষীর কড়া হুকুম ঠেলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কিছু না, একখানি তম্বুরা হাতে নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে। কী যে করবে কে জানে। সুরের পর সুর, রাগের পর রাগ যে তার অন্তরে বাজিয়ে তুলবে সে কে। সে তো বিজ্ঞানে যাকে প্রকৃতি ব'লে থাকে সেই প্রকৃতি নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের জমা-খরচের খাতায় তার হিসাব মেলে না। প্রাকৃতিক নির্বাচন তার জঠরের মধ্যে হুকুম জাহির করছে। কিন্তু, মানুষ কি পশু যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের চাবুকের চোখে প্রকৃতির নির্দিষ্ট পথে চলবে। লীলাময় মানুষ প্রকৃতিকে ডেকে বললে, 'আমি রসে ভোর, আমি তোমার তাঁবেদার নই, চাবুক লাগাও তোমার পশুদের পিঠে। আমি তো ধনী হতে চাই নে, আমি তো পালোয়ান হতে চাই নে, আমার মধ্যে সেই বেদনা আছে যা নিখিলের অন্তরে। আমি লীলাময়ের শরিক।'

এই কথাটি জানতে হবে— মানুষ কেন ছবি আঁকতে বসে, কেন গান করে। কখনো কখনো যখন আপন-মনে গান গেয়েছি তখন কীট্‌সের মতোই আমাকেও একটা গভীর প্রশ্ন ব্যাকুল করে তুলেছে, জিজ্ঞাসা করেছি— এ কি একটা মায়ামাত্র না এর কোনো অর্থ আছে। গানের সুরে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেম, আর সব জিনিসের মূল্য যেন এক মুহূর্তে বদলে গেল। যা অকিঞ্চিৎকর ছিল তাও অপরূপ হয়ে উঠল। কেন। কেননা, গানের সুরের আলোয় এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। অন্তরে সর্বদা এই গানের দৃষ্টি থাকে না ব'লেই সত্য তুচ্ছ হয়ে সরে যায়। সত্যের ছোটো বড়ো সকল রূপই যে অনির্বচনীয় তা আমরা অনুভব করতে পারি নে। নিত্য-অভ্যাসের স্থূল পর্দায় তার দীপ্তিকে আবৃত করে দেয়। সুরের বাহন সেই পর্দার আড়ালে সত্যলোকে আমাদের নিয়ে যায় ; সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না, সেখানে যাবার পথ কেউ চোখে দেখে নি।

একটু বেশি কবিত্ব লাগছে ? শ্রোতারা মনে ভাবছেন, বাড়াবাড়ি হচ্ছে। একটু বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করা যাক। আমাদের মন যে জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করে সেটা দুইমুখো পদার্থ ; তার একটা দিক হচ্ছে তথ্য, আর-একটা দিক হচ্ছে সত্য। যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য ; সেই তথ্য যাকে অবলম্বন ক'রে থাকে সেই হচ্ছে সত্য।

আমার ব্যক্তিরূপটি হচ্ছে আমাতে বদ্ধ আমি। এই-যে তথ্যটি এ অন্ধকারবাসী, এ আপনাকে আপনি প্রকাশ করতে পারে না। যখনই এর পরিচয় কেউ জিজ্ঞাসা করবে তখনই একটি বড়ো সত্যের দ্বারা এর পরিচয় দিতে হবে, যে সত্যকে সে আশ্রয় করে আছে। বলতে হবে, আমি বাঙালি। কিন্তু, বাঙালি কী। ও তো একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ, ধরা যায় না, ছোঁওয়া যায় না। তা হোক, ঐ ব্যাপক সত্যের দ্বারাই তথ্যের পরিচয়। তথ্য খণ্ডিত, স্বতন্ত্র— সত্যের মধ্যে সে আপন বৃহৎ ঐক্যকে প্রকাশ করে। আমি ব্যক্তিগত আমি এই তথ্যটুকুর মধ্যে, আমি মানুষ এই সত্যটিকে যখন আমি প্রকাশ করি তখনই বিরাট একের আলোকে আমি নিত্যতায় উদ্ভাসিত হই। তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।

যেহেতু সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এইজন্যে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় ক'রে

আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হচ্ছে একের স্বাদ, অসীমের স্বাদ। আমি ব্যক্তিগত আমি, এটা হল আমার সীমার দিকের কথা ; এখানে আমি ব্যাপক একের থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি মানুষ, এটা হল আমার অসীমের অভিমুখী কথা ; এখানে আমি বিরাট একের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশমান।

চিত্রী যখন ছবি আঁকতে বসেন তখন তিনি তথ্যের খবর দেবার কাজে বসেন না। তখন তিনি তথ্যকে ততটুকু মাত্র স্বীকার করেন যতটুকুর দ্বারা তাকে উপলক্ষ ক'রে কোনো একটা সুষমার ছন্দ বিশুদ্ধ হয়ে দেখা দেয়। এই ছন্দটি বিশ্বের নিত্যবস্তু ; এই ছন্দের ঐক্যসূত্রেই তথ্যের মধ্যে আমরা সত্যের আনন্দ পাই। এই বিশ্বছন্দের দ্বারা উদ্ভাসিত না হলে তথ্য আমাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর।

গোধূলিবেলায় একটি বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে এল, এই তথ্যটি মাত্র আমাদের আছে অতি সামান্য। এই সংবাদমাত্রের দ্বারা এই ছবিটি আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, আমরা শুনেও শুনি নে ; একটি চিরন্তন এক-রূপে এটি আমাদের চিত্তে স্থান পায় না। যদি কোনো নাছোড়বান্দা বক্তা আমাদের মনোযোগ জাগাবার জন্যে এই খবরটির পুনরাবৃত্তি করে, তা হলে আমি বিরক্ত হয়ে বলি, 'না হয় বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে এল, তাতে আমার কী।' অর্থাৎ, আমার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ অনুভব করি নে ব'লে এ ঘটনাটি আমার কাছে সত্যই নয়। কিন্তু, যে-মুহূর্তে ছন্দে সুরে উপমার যোগে এই সামান্য কথাটাই একটি সুষমার অখণ্ড ঐক্যে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল অমনি এ প্রশ্ন শান্ত হয়ে গেল যে, 'তাতে আমার কী।' কারণ, সত্যের পূর্ণরূপ যখন আমরা দেখি তখন তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই নে, সত্যগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই। গোধূলিবেলায় বালিকা মন্দির হতে বাহির হয়ে এল, এই কথাটিকে তথ্য হিসাবে যদি সম্পূর্ণ করতে হত তা হলে হয়তো আরো অনেক কথা বলতে হত ; আশপাশের অধিকাংশ খবরই বাদ গিয়েছে। কবি হয়তো বলতে পারতেন, সে সময়ে বালিকার খিদে পেয়েছিল এবং মনে মনে মিষ্টান্নবিশেষের কথা চিন্তা করছিল। হয়তো সেই সময়ে এই চিন্তাই বালিকার পক্ষে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। কিন্তু, তথ্যসংগ্রহ কবির কাজ নয়। এইজন্যে খুব বড়ো বড়ো কথাই ছাঁটা পড়েছে। সেই তথ্যের বাহুল্য বাদ পড়েছে ব'লেই সংগীতের বাঁধনের ছোটো কথাটি এমন একত্বে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কবিতাটি এমন সম্পূর্ণ অখণ্ড হয়ে জেগেছে, পাঠকের মন এই সামান্য তথ্যের ভিতরকার সত্যকে এমন গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছে। এই সত্যের ঐক্যকে অনুভব করবামাত্র আমরা আনন্দ পাই।

যথার্থ গুণী যখন একটা ঘোড়া আঁকেন তখন বর্ণ ও রেখা সংস্থানের দ্বারা একটি সুষমা উদ্ভাবন ক'রে সেই ঘোড়াটিকে একটি সত্যরূপে আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, তথ্যরূপে নয়। তার থেকে সমস্ত বাজে খুঁটিনাটির বিক্ষিপ্ততা বাদ পড়ে যায়, একখানা ছবি আপনার নিরতিশয় ঐক্যটিকে প্রকাশ করে। তথ্যগত ঘোড়ার বহুল আত্মত্যাগের দ্বারা তবে এই ঐক্যটি বাধামুক্ত বিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত হয়।

কিন্তু, তথ্যের সুবিধা এই যে, তার পরীক্ষা সহজ। ঘোড়ার ছবি যে ঠিক ঘোড়ার মতোই হয়েছে তা প্রমাণ করতে দেরি লাগে না। ঘোর অরসিক ঘোড়ার কানের ডগা থেকে আরম্ভ করে তার লেজের শেষ পর্যন্ত হিসাব করে মিলিয়ে দেখতে পারে। হিসাবে ত্রুটি হলে গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে মার্কা কেটে দেয়। ছবিতে ঘোড়াকে যদি ঘোড়ামাত্রই দেখানো হয় তা হলে পুরাপুরি হিসাব মেলে। আর, ঘোড়া যদি উপলক্ষ হয় আর ছবিই যদি লক্ষ্য হয় তা হলে হিসাবের খাতা বন্ধ করতে হয়।

বৈজ্ঞানিক যখন ঘোড়ার পরিচয় দিতে চান তখন তাঁকে একটা শ্রেণীগত সত্যের আশ্রয় নিতে হয়। এই ঘোড়াটি কী। না, একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ। এইরকম ব্যাপক ভূমিকার মধ্যে না আনলে পরিচয় দেবার কোনো উপায় নেই।

সাহিত্যে ও আর্টেও একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে। সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়। অর্থাৎ, সে বস্তু যদি এমন একটি রূপরেখাগীতের সুষমাযুক্ত ঐক্য লাভ করে যাতে ক'রে আমাদের চিত্ত আনন্দের মূল্যে তাকে সত্য ব'লে স্বীকার করে, তা হলেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। তা যদি না হয় অথচ যদি তথ্য হিসাবে সে বস্তু একেবারে নিখুঁত হয়, তা হলে অরসিক

তাকে বরমাল্য দিলেও রসজ্ঞ তাকে বর্জন করেন।

জাপানি কোনো ওস্তাদের ছবিতে দেখেছিলুম, একটি মূর্তির সামনে সূর্য কিন্তু পিছনে ছায়া নেই। এমন অবস্থায় যে লম্বা ছায়া পড়ে, এ কথা শিশুও জানে। কিন্তু বস্তুবিদ্যার খবর দেবার জন্যে তো ছবির সৃষ্টি নয়। কলা-রচনাতেও যারা ভয়ে ভয়ে তথ্যের মজুরি করে তারা কি ওস্তাদ।

অতএব, রূপের মহলে রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে, তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি নিতে হয়। একটা ছেলে-ভোলানো ছড়া থেকে এর উদাহরণ দিতে চাই—

খোকা এল নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে।

জুতা জিনিসটা তথ্যের কোঠায় পড়ে, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। চীনে মুচির দোকানে নগদ কড়ি দিলেই মাপসই জুতা পছন্দসই আকারে পেতে সবাই পারে। কিন্তু, জুতুয়া? চীনেম্যান দূরে থাক্, বিলিতি দোকানের বড়ো ম্যানেজারও তার খবর রাখে না। জুতুয়ার খবর রাখে মা, আর রাখে খোকা। এইজন্যই এই সত্যটিকে প্রকাশ করতে হবে ব'লে জুতা শব্দের ভদ্রতা নষ্ট করতে হল। তাতে আমাদের শব্দাম্বুধি বিক্ষুব্ধ হতে পারে, কিন্তু তথ্যের জুতা সত্যের মহলে চলে না ব'লেই ব্যাকরণের আক্রোশকেও উপেক্ষা করতে হয়।

কবিতা যে-ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির অভিধাননির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থেই শব্দের তথ্যসীমা। এই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি।

জ্ঞানদাসের একটি পদ মনে পড়ছে—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল,
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল।

তথ্যবাগীশ এই কবিতা শুনে কী বলবেন। ডুবেই যদি মরতে হয় তো জলের পাথার আছে; রূপের পাথার বলতে কী বোঝায়। আর, চোখ যদি ডুবেই যায় তবে রূপ দেখবে কী দিয়ে। আবার যৌবনের বন কোন্ দেশের বন। সেখানে পথ পায়ই বা কে আর হারায়ই বা কী উপায়ে। যাঁরা তথ্য খোঁজেন তাঁদের এই কথাটা বুঝতে হবে যে, নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ যে-তথ্যের দুর্গ ফেঁদে বসে আছে ছলে বলে কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র ক'রে নানা ফাঁকে, নানা আড়ালে সত্যকে দেখাতে হবে। দুর্গের পাথরের গাঁথুনি দেখাবার কাজ তো কবির নয়।

যারা তথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখে তাদের হাতে কবিদের কী দুর্গতি ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমি কবিতায় একটি বৌদ্ধকাহিনী লিখেছিলেম। বিষয়টি হচ্ছে এই—

একদা প্রভাতে অনাথপিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধের নামে শ্রাবস্তীনগরের পথে ভিক্ষা মেগে চলেছেন। ধনীরা এনে দিলে ধন, শ্রেষ্ঠীরা এনে দিলে রত্ন, রাজঘরের বধূরা এনে দিলে হীরামুক্তার কণ্ঠী। সব পথে প'ড়ে রইল, ভিক্ষার ঝুলিতে উঠল না। বেলা যায়, নগরের বাহিরের পথের ধারে গাছের তলায় অনাথপিণ্ডদ দেখলেন এক ভিক্ষুক মেয়ে। তার আর কিছুই নেই, গায়ে একখানি জীর্ণ চীর। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মেয়ে সেই চীরখানি প্রভুর নামে দান করলে। অনাথপিণ্ডদ বললেন, "অনেকে অনেক দিয়েছে, কিন্তু সব তো কেউ দেয় নি। এতক্ষণে আমার প্রভুর যোগ্য দান মিলল, আমি ধন্য হলুম।"

একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ধার্মিক খ্যাতিমান লোক এই কবিতা প'ড়ে বড়ো লজ্জা পেয়েছিলেন; বলেছিলেন, "এ তো ছেলেমেয়েদের পড়বার যোগ্য কবিতা নয়।" এমনি আমার ভাগ্য, আমার খোঁড়া কলম খানার মধ্যে পড়তেই আছে। যদি-বা বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আব্রু নষ্ট হল। নীতিনিপুণের চক্ষে তথ্যটাই বড়ো হয়ে উঠল, সত্যটা ঢাকা পড়ে গেল। হায় রে কবি, একে তো ভিখারিনীর কাছ থেকে দান নেওয়াটাই তথ্য হিসাবে অধর্ম, তার পরে নিতান্ত নিতেই যদি হয় তা হলে তার পাতার কুঁড়ের ভাঙা ঝাঁপটা কিংবা একমাত্র মাটির হাঁড়িটা নিলে তো সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা হতে পারত। তথ্যের দিক থেকে এ কথা নতশিরে মানতেই হবে।

এমন-কি, আমার মতো কবি যদি তথ্যের জগতে ভিক্ষা করতে বেরত তবে কখনোই এমন গর্হিত কাজ করত না এবং তথ্যের জগতের পাগলাগারদের বাইরে এমন ভিক্ষুক মেয়ে কোথাও মিলত না রাস্তার ধারে নিজের গায়ের একখানিমাত্র কাপড় যে ভিক্ষা দিত ; কিন্তু, সত্যের জগতে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য এমন ভিক্ষা নিয়েছেন এবং ভিখারিনী এমন অদ্ভুত ভিক্ষা দিয়েছে ; এবং তার পরে সে মেয়ে যে কেমন ক'রে রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে সে তর্ক সেই সত্যের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথ্যের এতবড়ো অপলাপ ঘটে, ও সত্যের কিছুমাত্র খর্বতা হয় না— সাহিত্যের ক্ষেত্রটা এমনি। রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়। তথ্যজগতের যে আলোকরশ্মি দেয়ালে এসে ঠেকে যায়, রসজগতে সে রশ্মি স্থূলকে ভেদ ক'রে অনায়াসে পার হয়ে যায় ; তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাটতে হয় না। রসজগতে ভিখারির জীর্ণ চীরখানা থেকেও নেই, তার মূল্যও তেমনি লক্ষপতির সমস্ত ঐশ্বর্যের চেয়ে বড়ো। এমনি উলটো-পালটা কাণ্ড।

তথ্যজগতে একজন ভালো ডাক্তার সব হিসাবেই খুব যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু, তাঁর পয়সা এবং পসার যতই অপর্যাপ্ত হোক-না কেন, তার উপরে চোদ্দ লাইনের কবিতা লেখাও চলে না। নিতান্ত যে উমেদার সে যদি-বা লিখে বসে তা হলে বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে যোগ থাকা সত্ত্বেও চোদ্দ দিনও সে কবিতার আয়ুরক্ষা হয় না। অতএব, রসের জগতের আলোকরশ্মি এতবড়ো ডাক্তারের মধ্য দিয়েও পার হয়ে যায়। কিন্তু, এই ডাক্তারকে যে তার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে ভালোবেসেছে তার কাছে ডাক্তার রসবস্তু হয়ে প্রকাশ পায়। হবামাত্র ডাক্তারকে লক্ষ্য ক'রে তার প্রেমাসক্ত অনায়াসে বলতে পারে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন ন তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন ন গেল।

আহ্নিক বলছেন, লাখ লাখ যুগ পূর্বে ডারুয়িনের মতে ডাক্তারের পূর্বতন সত্তা যে কী ছিল সে কথা উত্থাপন করা নীতিবিরুদ্ধ না হলেও রুচিবিরুদ্ধ। যা হোক, সোজা কথা হচ্ছে, ডাক্তারের কুষ্ঠিতে লাখ লাখ যুগের অঙ্কপাত হতেই পারে না।

তর্ক করা মিছে, কারণ শিশুও এ কথা জানে। ডাক্তার যে সে তো সেদিন জন্মেছে ; কিন্তু বন্ধু যে সে নিত্যকালের হৃদয়ের ধন। সে যে কোনো-এক কালে ছিল না, আর কোনো-এক কালে থাকবে না, সে কথা মনেও করতে পারি নে।

জ্ঞানদাসের দুটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ছে—

এক দুই গণইতে অন্ত নাহি পাই,
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই।

এক-দুইয়ের ক্ষেত্র হল বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। কিন্তু, রসসত্যের ক্ষেত্রে যে-প্রাণের আরতি বাড়তে থাকে সে তো অঙ্কের হিসাবে বাড়ে না। সেখানে এক-দুইয়ের বালাই নেই, নামতার দৌরাত্ম্য নেই।

অতএব, কাব্যের বা চিত্রের ক্ষেত্রে যারা সার্ভে-বিভাগের মাপকাঠি নিয়ে সত্যের চার দিকে তথ্যের সীমানা এঁকে পাকা পিল্‌পে গেঁথে তুলতে চায়, গুণীরা চিরকাল তাদের দিকে তাকিয়ে বিধাতার কাছে দরবার করেছে—

ইতর তাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ॥

বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে হানিবে, অবিচল রব তাহে।
রসের নিবেদন অরসিকে ললাটে লিখো না হে, লিখো না হে॥

ভাদ্র ১৩৩১

সৃষ্টি

আজ এই বক্তৃতাসভায় আসব ব'লে যখন প্রস্তুত হচ্ছি তখন শুনতে পেলুম, আমাদের পাড়ার গলিতে সানাই বাজছে। কী জানি কোন্ বাড়িতে বিবাহ। খাম্বাজের করুণ তান শহরের আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল।

উৎসবের দিনে বাঁশি কেন বাজে। সে কেবল সুরের লেপ দিয়ে প্রত্যহের সমস্ত ভাঙাচোরা মলিনতা নিকিয়ে দিতে চায়। যেন আপিসের প্রয়োজনে লৌহপথে কুশ্রীতার রথযাত্রা চলছে না, যেন দরদাম কেনাবেচা ও-সমস্ত কিছুই না। সব ঢেকে দিলে।

ঢেকে দিলে কথাটা ঠিক হল না; পর্দাটা তুলে দিলে— এই ট্রাম-চলাচলের, কেনা-বেচার, হাঁক-ডাকের পর্দা। বরবধূকে নিয়ে গেল নিত্যকালের অন্তঃপুরে, রসলোকে।

তুচ্ছতার সংসারে, কেনাবেচার জগতে, বরবধূরাও তুচ্ছ; কেই-বা জানে তাদের নাম, কেই-বা তাদের আসন ছেড়ে দেয়। কিন্তু, রসের নিত্যলোকে তারা রাজারানী। চারিদিকের ছোটো বড়ো সমস্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে কিংখাবের সিংহাসনে তাদের বরণ করে দিতে হবে। প্রতিদিন তারা তুচ্ছতার অভিনয় করে, এইজন্যেই প্রতিদিন তারা ছায়ার মতো অকিঞ্চিৎকর। আজ তারা সত্যরূপে প্রকাশমান; তাদের মূল্যের সীমা নেই; তাদের জন্যে দীপমালা সাজানো, ফুলের ডালি প্রস্তুত, বেদমন্ত্রে চিরন্তন কাল তাদের আশীর্বাদ করবার জন্যে উপস্থিত।

এই বরবধূ, এই দুটি মানুষ যে সত্য, কোনো রাজা-মহারাজার চেয়ে কম সত্য নয়, সমস্ত সংসার তাদের এই পরিচয়টি গোপন করে রাখে। কিন্তু, সেই নিত্যপরিচয় প্রকাশ করবার ভার নিয়েছে বাঁশি। মনে করো-না কেন, এককালে তপোবনে থাকত একটি মেয়ে; সেদিনকার হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে সেও ছিল সামান্যতার কুহেলিকায় ঢাকা। তাকে দেখে একদিন রাজার মন ভুলেছিল, আর-একদিন রাজা তাকে ত্যাগ করেছিল। সেদিন এমন কত ঘটেছে তার খবর কে রাখে। তাই তো রাজা নিজেকে লক্ষ্য করে বলেছে, 'সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ।' রাজার সকৃৎপ্রণয়ের প্রাত্যহিক উচ্ছিষ্টদের লক্ষ্য ক'রে দেখবার, মনে ক'রে রাখবার, এত সময় আছে কার। কাজকর্ম তো থেমে থাকে না, কেনাবেচা তো চলছেই, হাটের মধ্যে যে ঠেলাঠেলি ভিড়। সেই সংসারের পথে হংসপদিকাদের পদচিহ্ন কোথাও পড়ে না, তাদের ঠেলে সরিয়ে ফেলে জীবনযাত্রার অসংখ্য যাত্রী ব্যস্ত হয়ে চলে যায়। কিন্তু, একটি তপোবনের বালিকাকে অসংখ্যের তুচ্ছলোক থেকে একের সত্যলোকে সুস্পষ্ট ক'রে দাঁড় করালে কে। সেও একটি কবির বাঁশি। যে সত্য প্রতিদিন ট্রামের ঘর্ঘরধ্বনি ও দরদামের হট্টগোলের মধ্যে চাপা পড়ে থাকে, খাম্বাজের করুণ রাগিণী আমাদের গলির মোড়ে সেই সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে সুরের অমৃত বর্ষণ করছে।

তথ্যের সংকীর্ণতার থেকে মানুষ যেমনি সত্যের অসীমতায় প্রবেশ করে অমনি তার মূল্যের কত পরিবর্তন হয়, সে কি আমরা দেখি নে। রাখাল যখন ব্রজের রাখাল হয়ে দেখা দেয় তখন কি মথুরার রাজপুত্র ব'লে তার মূল্য। তখন কি তার পাঁচনির মহিমা গদাচক্রের চেয়ে কম। তার বাঁশি কি পাঞ্চজন্যের কাছে লজ্জা পায়। সত্য যে সে কি মণিমালা ফেলে দিয়ে বনফুলের মালা পরতে কুণ্ঠিত। সেই রাখালবেশের সত্যকে প্রকাশ করতে পারে কে। সে তো কবির বাঁশি। রাজাধিরাজ মহারাজ নিজের মহিমা প্রকাশ করবার জন্যে কী আয়োজনই না করলে। তবু আজ বাদে কাল সেই বিপুল আয়োজনের বোঝা নিয়ে ঝঞ্ঝাশেষের মেঘের মতো দিগন্তরালে সে যায় মিলিয়ে। কিন্তু, সাহিত্যের অমরাবতীতে কলার নিত্য-নিকেতনে একটি পথের ভিক্ষু যে অখণ্ড সত্যে বিরাজ করে সেই সত্যের ক্ষয় নেই। রোমিয়ো-জুলিয়েটকে যখন সাহিত্যভুবনে দেখি তখন কোনো মূঢ় জিজ্ঞাসা করে না, ব্যাঙ্কে তাদের কত টাকা জমা আছে, ষড়্দর্শনে তাদের ব্যুৎপত্তি কত দূর, এমন-কি, দেবদ্বিজে তারা ভক্তিমান কি না এবং নিত্য নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিকে তাদের কী পরিমাণ নিষ্ঠা। তারা সত্য এইমাত্র তাদের মহিমা; সাহিত্য সেই কথাই প্রমাণ করে। সেই সত্যে যদি তিলমাত্র ব্যত্যয় ঘটে, অথচ নায়ক নায়িকা দোঁহে

মিলে যদি দশাবতারের সুনিপুণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা গীতার শ্লোক থেকে দেশাত্মবোধের আশ্চর্য অর্থ উদঘাটন করতে পারে, তবু তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।

শুধু কেবল মানুষ কেন, অজীব সামগ্রীকে যখন আমরা কাব্যকলার রথে তুলে তথ্যসীমার বাহিরে নিয়ে যাই তখন সত্যের মূল্যে সে মূল্যবান হয়ে ওঠে। কলকাতায় আমার এক কাঠা জমির দাম পাঁচ-দশ হাজার টাকা হতে পারে, কিন্তু সত্যের রাজত্বে সেই দামকে আমরা দাম বলেই মানি নে— সে দাম সেখানে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যায়। বৈষয়িক মূল্য সেখানে পরিহাসের দ্বারা অপমানিত। নিত্যলোকে রসলোকে তথ্যবন্ধন থেকে মানুষের এই-যে মুক্তি এ কি কম মুক্তি। এই মুক্তির কথা আপনাকে আপনি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে মানুষ গান গেয়েছে, ছবি এঁকেছে ; আপন সত্য ঐশ্বর্যকে হাটবাজার থেকে বাঁচিয়ে এনে সুন্দরের নিত্য ভাণ্ডারে সাজিয়ে রেখেছে ; তার নিকড়িয়া ধনকে নিকড়িয়া বাঁশির সুরে গেঁথে রেখেছে। আপনাকে আপনি বার বার বলেছে, 'ঐ আনন্দলোকেই তোমার সত্য প্রকাশ।'

আমি কী বোঝাব তোমাদের কাকে বলে সাহিত্য, কাকে বলে চিত্রকলা। বিশ্লেষণ ক'রে কি এর মর্মে গিয়ে পৌঁছতে পারি। কোন্ আদি উৎস থেকে এর স্রোতের ধারা বাহির হয়েছে এক মুহূর্তে তা বোঝা যায়, যখন সেই স্রোতে মন আপনার গা ভাসিয়ে দেয়। আজ সেই বাঁশির সুরে যখন মন ভেসেছিল তখন বুঝেছিলেম, বুঝিয়ে দেবার কথা এর মধ্যে কিছু নেই ; এর মধ্যে ডুব দিলেই সব সহজ হয়ে আসে। নীলাকাশের ইশারা আমাদের প্রতিদিন বলেছে, 'আনন্দধামের মাঝখানে তোমাদের প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ।' এ কথা বলেছে, বসন্তের হাওয়ায় বিরহের মরমিয়া কবি। সকালবেলায় প্রভাতকিরণের দূত এসে ধাক্কা দিল। কী। না, নিমন্ত্রণ আছে। উদাস মধ্যাহ্নে মধুকরগুঞ্জিত বনচ্ছায়া দূত হয়ে এসে ধাক্কা দিল, নিমন্ত্রণ আছে। সন্ধ্যামেঘে অস্তসূর্যচ্ছটায় সে দূত আবার বললে, নিমন্ত্রণ আছে। এত সাজসজ্জা এই দূতের, এত ফুলের মালা এত গৌরবের মুকুট। কার জন্যে। আমার জন্যে। আমি রাজা নই, জ্ঞানী নই, গুণী নই— আমি সত্য, তাই আমার জন্যে সমস্ত আকাশের রঙ নীল ক'রে, সমস্ত পৃথিবীর আঁচল শ্যামল ক'রে, সমস্ত নক্ষত্রের অক্ষর উজ্জ্বল ক'রে আহ্বানের বাণী মুখরিত। এই নিমন্ত্রণের উত্তর দিতে হবে না কি। সে উত্তর ঐ আনন্দধামের বাণীতেই যদি না লিখি তা হলে কি গ্রাহ্য হবে। মানুষ তাই মধুর করেই বললে, 'আমার হৃদয়ের তারে তোমার নিমন্ত্রণ বাজল। রূপে বাজল, ভাবনায় বাজল, কর্মে বাজল ; হে চিরসুন্দর, আমি স্বীকার ক'রে নিলেম। আমিও তেমনি সুন্দর ক'রে তোমাকে চিঠি পাঠাব, যেমন ক'রে তুমি পাঠালে। যেমন তুমি তোমার অনির্বাণ তারকার প্রদীপ জ্বেলে তোমার দূতের হাতে দিয়েছ, আমাকেও তেমনি করে আলো জ্বালতে হবে যে-আলো নেবে না, মালা গাঁথতে হবে যে-মালা শুকোতে জানে না। আমি মানুষ, আমার ভিতর যদি অনন্তের শক্তি থাকে তবে সেই শক্তির ঐশ্বর্য দিয়েই তোমার আমন্ত্রণের উত্তর দেব।' মানুষ এমন কথা সাহস করে বলেছে, এতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো গৌরব।

আজ যখন আমাদের গলিতে বরবধূর সত্যস্বরূপ অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ প্রকাশ করবার ভার নিলে ঐ বাঁশি, তখন আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেম, কী মন্ত্রে বাঁশি আপনার কাজ সমাধা করে। আমাদের তত্ত্বজ্ঞানী তো বলে, অনিশ্চিতের দোলায় সমস্ত সংসার দোদুল্যমান ; বলে, যা দেখ কিছুই সত্য নয়। আমাদের নীতিনিপুণ বলে, ঐ-যে ললাটে ওরা চন্দন পরেছে, ও তো ছলনা, ওর ভিতর আছে মাথার খুলি। ঐ-যে মধুর হাসি দেখতে পাচ্ছ, ঐ হাসির পর্দা তুলে দেখো, বেরিয়ে পড়বে শুকনো দাঁতের পাটি। বাঁশি তর্ক ক'রে তার কোনো জবাব দেয় না ; কেবল তার খাম্বাজের সুরে বলতে থাকে, খুলি বল, দাঁতের পাটি বল, যত কালই টিকে থাক্-না কেন, ওরা মিছে ; কিন্তু ললাটে যে আনন্দের সুগন্ধলিপি আছে, মুখে যে লজ্জার হাসির আভা দিচ্ছে, যা এখন আছে তখন নেই, যা ছায়ার মতো মায়ার মতো, যাকে ধরতে গেলে ধরা যায় না, তাই সত্য, করুণ সত্য, মধুর সত্য, গভীর সত্য। সেই সত্যকেই সংসারের সমস্ত আনাগোনার উপরে উজ্জ্বল ক'রে ধরে বাঁশি বলছে, 'সত্যকে যেদিন প্রত্যক্ষ দেখবে সেই দিনই উৎসব।'

বুঝলুম। কিন্তু, বিনা তর্কে বাঁশি এতবড়ো কথাটাকে সপ্রমাণ করে কী করে। এ কথাটা কাল আলোচনা করেছিলুম। বাঁশি একের আলো জ্বালিয়েছে। আকাশে রাগিণী দিয়ে এমন একটি রূপের সৃষ্টি করেছে যার আর-কোনো উদ্দেশ্য নেই, কেবল ছন্দে সুরে সুসম্পূর্ণ এককে চরমরূপে দেখানো। সেই একের জীয়নকাটি যার উপরে পড়ল আপনার মধ্যে গভীর নিত্যসত্যের চিরজাগ্রত চিরসজীব স্বরূপটি সে দেখিয়ে দিলে; বরবধূ বললে, 'আমরা সামান্য নই, আমরা চিরকালের।' বললে, 'মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যারা আমাদের দেখে তারা মিথ্যা দেখে। আমরা অমৃতলোকের, তাই গান ছাড়া আমাদের পরিচয় আর কিছুতে দিতে পারি না।' বরকনে আজ সংসারের স্রোতে ভাসমান খাপছাড়া পদার্থ নয়; আজ তারা মধুরের ছন্দে একখানি কবিতার মতো, গানের মতো, ছবির মতো আপনাদের মধ্যে একের পরিপূর্ণতা দেখাচ্ছে। এই একের প্রকাশতত্ত্বই হল সৃষ্টির তত্ত্ব, সত্যের তত্ত্ব।

সংগীত কোনো-একটি রাগিণীতে যতই রমণীয় সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করুক-না কেন, সাধারণ ভাষায় এবং বাহিরের দিক থেকে তাকে অসীম বলা যায় না। রূপের সীমা আছে। কিন্তু, রূপ যখন সেই সীমামাত্রকে দেখায় তখন সত্যকে দেখায় না। তার সীমাই যখন প্রদীপের মতো অসীমের আলো জ্বালিয়ে ধরে তখনি সত্য প্রকাশ পায়।

আজকেকার সানাই বাজনাতেই এ কথা আমি অনুভব করছি। প্রথম দুই-একটা তানের পরই বুঝতে পারলুম, এ বাঁশিটা আনাড়ির হাতে বাজছে, সুরটা খেলো সুর। বার বার পুনরাবৃত্তি, তার স্বরের মধ্যে কোথাও সুরের নম্রতা নেই, তরুহীন মাটির মধ্যে ছায়াহীন মধ্যাহ্নরৌদ্রের মতো। যত ঝোঁক সমস্তই আওয়াজের প্রখরতার উপর। সংগীতের আয়তনটাকেই বড়ো ক'রে তোলবার দিকে বলবান প্রয়াস। অর্থাৎ, সীমা এখানে আপনাকেই বড়ো করে দেখাতে চাচ্ছে— তারই 'পরে আমাদের মন না দিয়ে উপায় নেই। তার চরমকে সে আপনার পালোয়ানির দ্বারা ঢেকে ফেলছে। সীমা আপন সংযমের দ্বারা আপনাকে আড়াল ক'রে সত্যকে প্রকাশ করে। সেইজন্যে সকল কলাসৃষ্টিতেই সরলতার সংযম একটা প্রধান বস্তু। সংযমই হচ্ছে সীমার তর্জনী দিয়ে অসীমকে নির্দেশ করা। কোনো জিনিসের অংশগুলিই যখন সমগ্রের তুলনায় বড়ো হয়ে ওঠে তখনই তাকে বলে অসংযম। সেটাই হল একের বিরুদ্ধে অনেকের বিদ্রোহ। সেই বাহ্য অনেকের পরিমাণ যতই বড়ো হতে থাকে অন্তর্যামী এক ততই আচ্ছন্ন হয়। যিশু বলেছেন, 'বরঞ্চ উট ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে গলতে পারে কিন্তু ধনের আতিশয্য নিয়ে কোনো মানুষ দিব্যধামে প্রবেশ করতে পারে না।' তার মানে হচ্ছে, অতিমাত্রায় ধন জিনিসটা মানুষের বাহ্য অসংযম। উপকরণের বাহুল্য দ্বারা মানুষ আত্মার সুসম্পূর্ণ ঐক্য-উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়। তার অধিকাংশ চিন্তা চেষ্টা খণ্ডিত ভাবে বহুল সঞ্চয়ের মধ্যে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। যে-এক সম্পূর্ণ, যে-এক সত্য, যে-এক অসীম, আপনার মধ্যে তার প্রকাশকে ধনী বহুবিচিত্রের মধ্যে ছড়াছড়ি ক'রে নষ্ট করে। জীবন-বাঁশিতে সেই তো খেলো সুর বাজায়— তানের অদ্ভুত কসরত, দুন-চৌদুনের মাতামাতি, তারস্বরের অসহ্য দাম্ভিকতা। এতেই অরসিকের চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়। রূপের সংযমের মধ্যে যারা সত্যের পূর্ণরূপ দেখতে চায় তারা রূপের জঙ্গলের প্রবলতার দস্যুবৃত্তি দেখে পালাবার পথ খুঁজে বেড়ায়। সেখানে রূপ হাঁক দিয়ে দিয়ে বলে, 'আমাকে দেখো।' কেন দেখব। জগতে রূপের সিংহাসনে অরূপকে দেখব বলেই এসেছি। কিন্তু, জগতে বিজ্ঞান যেমন অবস্তুকে খুঁজে বের করে বলছে 'এই তো সত্য', রূপজগতে কলা তেমনি অরূপ রসকে দেখিয়ে বলছে 'ঐ তো আমার সত্য'। যখন দেখলুম সেই সত্য তখন রূপ আর আমাকে লোভ দেখাতে পারে না, তখন কসরতকে বলি 'ধিক্'।

পেটুক মানুষের যখন পেটের ক্ষুধা ঘোচে তখনো তার মনের ক্ষুধা ঘোচে না। মেয়েরা খুশি হয়ে তার পাতে যত পারে পিটেপুলি চাপাতে থাকে। অবশেষে একদিন অম্লশূলরোগীর সেবার জন্য সেই মেয়েদের 'পরেই ডাক পড়ে। সাহিত্যকলার ক্ষেত্রে যারা পেটুক তারাই রূপের লোভে অতিভোগের সন্ধান করে— তাদের মুক্তি নেই। কারণ, রূপের মধ্যে সত্যের আবির্ভাব হলে সত্য সেই রূপ থেকেই মুক্তি দেয়। যারা ফর্মা গণনা ক'রে পুঁথির দাম দেয় তাদের মন পুঁথি চাপা পড়ে কবরস্থ হয়।

কলাসৃষ্টিতে রসসত্যকে প্রকাশ করবার সমস্যা হচ্ছে— রূপের দ্বারাই অরূপকে প্রকাশ করা ; অরূপের দ্বারা রূপকে আচ্ছন্ন ক'রে দেখা ; ঈশোপনিষদের সেই বাণীটিকে গ্রহণ করা, পূর্ণের দ্বারা সমস্ত চঞ্চলকে আবৃত ক'রে দেখা, এবং মা গৃধঃ— লোভ কোরো না— এই অনুশসান গ্রহণ করা। সৃষ্টির তত্ত্বই এই ; জগৎসৃষ্টিই বলো আর কলাসৃষ্টিই বলো। রূপকে মানতেও হবে, না'ও মানতে হবে, তাকে ধরতেও হবে, তাকে ঢাকতেও হবে। রূপের প্রতি লোভ না থাকে যেন।

এই-যে আমাদের একটা আশ্চর্য দেহ, এর ভিতরে আশ্চর্য কতকগুলো কল— হজম করবার কল, রক্তচালনার কল, নিশ্বাস নেবার কল, চিন্তা করবার কল। এই কলগুলোর সম্বন্ধে ভগবানের যেন বিষম একটা লজ্জা আছে। তিনি সবগুলোই খুব ক'রে ঢাকা দিয়েছেন। আমরা মুখের মধ্যে খাবার পুরে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাই, এ কথাটাকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের আগ্রহ নেই। আমাদের মুখ ভাবের লীলাভূমি, অর্থাৎ মুখে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা রক্তমাংসের অতীত, যা অরূপ ক্ষেত্রের ; এইটেতেই মুখের মুখ্য পরিচয়। মাংসপেশী খুবই দরকারি, তার বিস্তর কাজ, কিন্তু মুগ্ধ হলুম কখন। যখন আমাদের সমস্ত দেহের সংগীতকে তারা গতিলীলায় প্রকাশ করে দেখালে। মেডিকেল কলেজে যারা দেহ বিশ্লেষণ ক'রে শরীরতত্ত্ব জেনেছে সৃষ্টিকর্তা তাদের বলেন, 'তোমাদের প্রশংসা আমি চাই নে।' কেননা, সৃষ্টির চরমতা কৌশলের মধ্যে নেই। তিনি বলেন, 'জগৎ-যন্ত্রের যন্ত্রীরূপে আমি যে ভালো এঞ্জিনিয়ার এটা নাই বা জানলে।' তবে কী জানব। 'আনন্দরূপে আমাকে জানো।' ভূস্তরসংস্থানে বড়ো বড়ো পাথরের শিলালিপিতে তার নির্মাণের ইতিহাস গুপ্ত অক্ষরে খোদিত আছে। মাটির উপর মাটি দিয়ে সে সমস্তই বিধাতা চাপা দিয়েছেন। কিন্তু, উপরটিতে যেখানে প্রাণের নিকেতন, আনন্দনিকেতন, সেইখানেই তাঁর সূর্যের আলো চাঁদের আলো ফেলে কত লীলাই চলছে তার সীমা নেই। এই ঢাকাটা যখন ছিল না তখন সে কী ভয়ংকর কাণ্ড। বিশ্বকর্মার কী হাতুড়ি-ঠোকাঠুকি, বড়ো বড়ো চাকার সে কী ঘুরপাক, কী অগ্নিকুণ্ড, কী বাষ্পনিশ্বাস। তার পরে কারখানাঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে, সবুজ নীল সোনার ধারায় সমস্ত ধুয়ে মুছে দিয়ে, তারার মালা মাথায় প'রে, ফুলের পাদপীঠে পা রেখে, তিনি আনন্দে রূপের আসন গ্রহণ করলেন।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা মনে পড়ল। পৃথিবীর যে-সভ্যতার তাল ঠুকে মাংসপেশীর গুমর ক'রে পৃথিবী কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে, কারখানাঘরের চোঙাগুলোকে ধূমকেতুর ধ্বজদণ্ড বানিয়ে আলোকের আঙিনায় কালি লেপে দিচ্ছে, সেই বেআব্রু সভ্যতার 'পরে সৃষ্টিকর্তার লজ্জা দেখতে পাচ্ছ না কি। ঐ বেহায়া যে আজ দেশে বিদেশে আপন দল জমিয়ে ঢাক বাজিয়ে বেড়াচ্ছে। নিউইয়র্ক থেকে টোকিও পর্যন্ত ঘাটে ঘাটে, ঘাটিতে ঘাটিতে, তার উদ্ধত যন্ত্রগুলো উৎকট শৃঙ্গধ্বনি টোকিও দ্বারা সৃষ্টির মঙ্গলশঙ্খধ্বনিকে ব্যঙ্গ করছে। উলঙ্গশক্তির এই দৃপ্ত আত্মম্ভরিতা আপন কলুষকুৎসিত মুষ্টিতে অমৃতলোকের সম্মান লুট করে নিতে চায়। মানবসংসারে আজকের দিনের সব চেয়ে মহৎ দুঃখ, মহৎ অপমান এই নিয়েই।

মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে মানুষ সৃষ্টিকর্তা। আজকের দিনের সভ্যতা মানুষকে মজুর করছে, মিস্ত্রি করছে, মহাজন করছে, লোভ দেখিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে খাটো করে দিচ্ছে। মানুষ নির্মাণ করে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায়। ব্যবসায়ের প্রয়োজন যখন অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠতে থাকে তখন আত্মার বাণী নিরস্ত হয়ে যায়। ধনী তখন দিব্যধামের পথের চিহ্ন লোপ করে দেয়, সকল পথকেই হাটের দিকে নিয়ে আসে।

কোন্‌খানে মানুষের শেষ কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ বাহ্য প্রকৃতির তথ্য-রাজ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে আত্মার চরম সম্বন্ধে নিয়ে যায়— যা সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, কল্যাণের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ, তারই মধ্যে। সেইখানেই মানুষের সৃষ্টির রাজ্য। সেখানে প্রত্যেক মানুষ আপন অসীম গৌরব লাভ করে, সেখানে প্রত্যেক মানুষের জন্যে সমগ্র মানুষের তপস্যা। যেখানে মহাসাধকেরা সাধন করছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে, মহাবীরেরা প্রাণ দিয়েছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে, মহাজ্ঞানীরা জ্ঞান এনেছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে। যেখানে একজন ধনী দশ জনকে শোষণ করছে, যেখানে হাজার হাজার

মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে হরণ ক'রে একজন শক্তিশালী হচ্ছে, যেখানে বহু লোকের ক্ষুধার অন্ন একজন লোকের ভোগবাহুল্যে পরিণত হচ্ছে, সেখানে মানুষের সত্যরূপ, শান্তিরূপ আপন সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পেল না।

যে মানুষ লোভী চিরদিনই সে নির্লজ্জ ; যে লোক শক্তির অভিমানী, সত্যযুগেও নিখিলের সঙ্গে আপন অসামঞ্জস্য নিয়েই সে দম্ভ করেছে। কিন্তু সেকালে তার লজ্জাহীনতাকে, তার দম্ভকে তিরস্কৃত করবার লোক ছিল। মানুষ সেদিন লোভীকে, শক্তিশালীকে, এ কথা বলতে কুণ্ঠিত হয় নি— 'পৃথিবীতে সুন্দরের বাণী এসেছে, তুমি তাতে বেসুর লাগিয়ো না ; জগতে আনন্দলক্ষ্মীর যে সিংহাসন সে যে শতদল পদ্ম, মত্ত করীর মতো তাকে দলতে যেয়ো না।' এই কথাই বলছে কবির কাব্য, চিত্রীর চিত্রকলা। আজ বিবাহের দিনে বাঁশি বলছে, 'বরবধূ, তোমরা যে সত্য এই কথাটাই অন্য সকল কথার চেয়ে বড়ো করে আপনাদের মধ্যে প্রকাশ করো। লাখ দু-লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমছে বলেই যে সত্য তা নয় ; যে-সত্যের বাণী আমি ঘোষণা করি সে-সত্য বিশ্বের ছন্দের ভিতর, চেক বইয়ের অঙ্কের মধ্যেই নয়। সে-সত্য পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের অমৃত সম্বন্ধে— গৃহসজ্জার উপকরণে নয়। সেই হচ্ছে সম্পূর্ণের সত্য, একের সত্য।'

আজ আমি সাহিত্যের কারুকারিতা সম্বন্ধে, তার ছন্দতত্ত্ব, তার রচনারীতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব মনে স্থির করেছিলুম। এমন সময় বাজল বাঁশি। ইন্দ্রদেব সুন্দরকে দিয়ে বলে পাঠালেন, 'ব্যাখ্যা করেই যে-সব কথা বলা যায়, আর তপস্যা করেই যে-সব সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় এমন-সব লোক-প্রচলিত কথাকে তুমি কি কবি হয়েও বিশ্বাস কর। ব্যাখ্যা বন্ধ ক'রে তপস্যা ভঙ্গ ক'রে যে ফল পাওয়া যায় সেই হল অখণ্ড। সে তৈরি-করা জিনিস নয়, সে আপনি ফলে-ওঠা জিনিস।' ধর্মশাস্ত্রে বলে, ইন্দ্রদেব কঠোর সাধনার ফল নষ্ট করবার জন্যেই মধুরকে পাঠিয়ে দেন। আমি দেবতার এই ঈর্ষা, এই প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করি নে। সিদ্ধির পরিপূর্ণ অখণ্ড মূর্তিটি যে কিরকম তাই দেখিয়ে দেবার জন্যেই ইন্দ্র মধুরকে পাঠিয়ে দেন। বলেন, 'এ জিনিস লড়াই ক'রে তৈরি ক'রে তোলবার জিনিস নয় ; এ ক্রমে ক্রমে থাকে থাকে গ'ড়ে ওঠে না। সত্য সুরে গানটিকে যদি সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে চাও, তা হলে রাতদিন বাঁও-কষাকষি ক'রে তা হবে না। তম্বুরার এই খাঁটি মধ্যম-পঞ্চম সুরটিকে প্রত্যক্ষ গ্রহণ করো এবং অখণ্ড সম্পূর্ণতাটিকে অন্তরে লাভ করো, তা হলে সমগ্র গানের ঐক্যটি সত্য হবে।' মেনকা উর্বশী এরা হল ঐ তম্বুরার মধ্যম-পঞ্চম সুর— পরিপূর্ণতার অখণ্ড প্রতিমা। সন্ন্যাসীকে মনে করিয়ে দেয় সিদ্ধির ফল জিনিসটা কী রকমের। স্বর্গকামী, তুমি স্বর্গ চাও ! তাই তোমার তপস্যা ! কিন্তু, স্বর্গ তো পরিশ্রম ক'রে মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি হয় নি। স্বর্গ যে সৃষ্টি। উর্বশীর ওষ্ঠপ্রান্তে যে-হাসিটুকু লেগে আছে তার দিকে চেয়ে দেখো, স্বর্গের সহজ সুরটুকুর স্বাদ পাবে। তুমি মুক্তিকামী, মুক্তি চাও ! একটু একটু ক'রে অস্তিত্বের জাল ছিঁড়ে ফেলাকে তো মুক্তি বলে না। মুক্তি তো বন্ধনহীন শূন্যতা নয়। মুক্তি যে সৃষ্টি। মেনকার কবরীতে যে-পারিজাত ফুলটি রয়েছে তার দিকে চেয়ে দেখো, মুক্তির পূর্ণরূপের মূর্তিটি দেখতে পাবে। বিধাতার রুদ্ধ আনন্দ ঐ পারিজাতের মধ্যে মুক্তি পেয়েছে— সেই অরূপ আনন্দ রূপের মধ্যে প্রকাশ লাভ ক'রে সম্পূর্ণ হয়েছে।

বুদ্ধদেব যখন বোধিদ্রুমের তলায় ব'সে কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন তখন তাঁর পীড়িত চিত্ত বলেছে 'হল না', 'পেলুম না'। তাঁর পাওয়ার পূর্ণ রূপের প্রতিমা বাইরে দেখতে পেলেন কখন। যখন সুজাতা অন্ন এনে দিলে। সে কি কেবল দেহের অন্ন। তার মধ্যে যে ভক্তি ছিল, প্রীতি ছিল, সেবা ছিল, সৌন্দর্য ছিল— সেই পায়স-অন্নের মধ্যেই অমৃত অতি সহজে প্রকাশ পেল। ইন্দ্রদেব কি সুজাতাকে পাঠান নি। সেই সুজাতার মধ্যেই কি অমরাবতীর সেই বাণী ছিল না যে, কৃচ্ছ্রসাধনে মুক্তি নেই, মুক্তি আছে প্রেমে। সেই ভক্তহৃদয়ের অন্ন-উৎসর্গের মধ্যে মাতৃপ্রাণের যে-সত্য ছিল সেই সত্যটি থেকেই কি বুদ্ধ বলেন নি 'এক পুত্রের প্রতি মাতার যে-প্রেম সেই অপরিমেয় প্রেমে সমস্ত বিশ্বকে আপন ক'রে দেখাকেই বলে ব্রহ্মবিহার' ? অর্থাৎ, মুক্তি শূন্যতায় নয়, পূর্ণতায় ; এই পূর্ণতাই সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে না।

মানবাত্মার যে প্রেম অসীম আত্মার কাছে আপনাকে একান্ত নিবেদন ক'রে দিয়েই আনন্দ পায়, তার চেয়ে আর কিছুই চায় না, যিশুখৃস্ট তারই সহজ স্বরূপটিকে বাহিরের মূর্তিতে কোথায় দেখেছিলেন। ইন্দ্রদেব আপন সৃষ্টি থেকে এই মূর্তিটিকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। মার্থা আর ম্যারি দুজনে তাঁর সেবা করতে এসেছিল। মার্থা ছিল কর্তব্যপরায়ণা, সেবার কঠোরতায় সে নিত্যনিয়ত ব্যস্ত। ম্যারি সেই ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে আত্মনিবেদনের পূর্ণতাকে বহু প্রয়াসে প্রকাশ করে নি। সে আপন বহুমূল্য গন্ধতৈল খৃষ্টের পায়ে উজাড় করে ঢেলে দিলে। সকলে বলে উঠল, 'এ যে অন্যায় অপব্যয়।' খৃস্ট বললেন, 'না, না, ওকে নিবারণ কোরো না।' সৃষ্টিই কি অপব্যয় নয়। গানে কি কারও কোনো লাভ আছে। চিত্রকলায় কি অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হয়। কিন্তু, রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ আপন পূর্ণতাকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েই পূর্ণতার ঐশ্বর্য লাভ করে। সেই ঐশ্বর্য শুধু তার সাহিত্যে ললিতকলায় নয়, তার আত্মবিসর্জনের লীলাভূমি সমাজে নানা সৃষ্টিতেই প্রকাশ পায়। সেই সৃষ্টির মূল্য জীবনযাত্রার উপযোগিতায় নয়, মানবাত্মার পূর্ণস্বরূপের বিকাশে— তা অহেতুক, তা আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত। যিশুখৃস্ট ম্যারির চরম আত্মনিবেদনের সহজ রূপটি দেখলেন। তখন তিনি নিজের অন্তরের পূর্ণতাকেই বাহিরে দেখলেন। ম্যারি যেন তাঁর আত্মার সৃষ্টিরূপেই তাঁর সম্মুখে অপরূপ মাধুর্যে প্রকাশিত হল। এমনি করেই মানুষ আপন সৃষ্টিকার্যে আপন পূর্ণতাকে দেখতে চাচ্ছে। কৃচ্ছ্রসাধনে নয়, উপকরণসংগ্রহে নয়। তার আত্মার আনন্দ থেকে তাকে উদ্ভাবিত করতে হবে স্বর্গলোক— লক্ষপতির কোষাগার নয়, পৃথ্বীপতির জয়স্তম্ভ নয়। তাকে যেন লোভে না ভোলায়, দম্ভে অভিভূত না করে; কেননা সে সংগ্রহকর্তা নয়, নির্মাণকর্তা নয়, সে সৃষ্টিকর্তা।

কার্তিক ১৩৩১

সাহিত্যধর্ম

কোটালের পুত্র, সওদাগরের পুত্র, রাজপুত্র, এই তিনজনে বাহির হন রাজকন্যার সন্ধানে। বস্তুত রাজকন্যা ব'লে যে একটি সত্য আছে তিন রকমের বুদ্ধি তাকে তিন পথে সন্ধান করে।

কোটালের পুত্রের ডিটেকটিভ-বুদ্ধি, সে কেবল জেরা করে। করতে করতে কন্যার নাড়ীনক্ষত্র ধরা পড়ে; রূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে শরীরতত্ত্ব, গুণের আবরণ থেকে মনস্তত্ত্ব। কিন্তু এই তত্ত্বের এলেকায় পৃথিবীর সকল কন্যাই সমান দরের মানুষ— ঘুঁটে কুড়োনির সঙ্গে রাজকন্যার প্রভেদ নেই। এখানে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁকে যে-চক্ষে দেখেন সে-চক্ষে রসবোধ নেই, আছে কেবল প্রশ্নজিজ্ঞাসা।

আর-এক দিকে রাজকন্যা কাজের মানুষ। তিনি রাঁধেন বাড়েন, সুতো কাটেন, ফুলকাটা কাপড় বোনেন। এখানে সওদাগরের পুত্র তাঁকে যে চক্ষে দেখেন সে চক্ষে না আছে রস, না আছে প্রশ্ন; আছে মুনফার হিসাব।

রাজপুত্র বৈজ্ঞানিক নন— অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি— তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, বোধ করি, চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তরের মাঠ। দুর্গম পথ পার হয়েছেন জ্ঞানের জন্যে না, ধনের জন্যে না, রাজকন্যারই জন্যে। এই রাজকন্যার স্থান ল্যাবরেটরিতে নয়, হাটবাজারে নয়, হৃদয়ের সেই নিত্য বসন্তলোকে যেখানে কাব্যের কল্পলতায় ফুল ধরে। যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞানির্ণয় করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যার মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়, তারই প্রকাশ সাহিত্যকলায়, রসকলায়। এই কলাজগতে যার প্রকাশ কোনো সমজদার তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে না, 'তুমি কেন।' সে বলে, 'তুমি যে তুমিই, এই আমার যথেষ্ট।' রাজপুত্রও রাজকন্যার কানে কানে এই কথাই বলেছিলেন। এই কথাটা বলবার জন্যে সাজাহানকে তাজমহল বানাতে হয়েছিল।

যাকে সীমায় বাঁধতে পারি তার সংজ্ঞানির্ণয় চলে ; কিন্তু, যা সীমার বাইরে, যাকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাই নে, বোধের মধ্যে পাই। উপনিষদ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁকে না পাই মনে, না পাই বচনে, তাঁকে যখন পাই আনন্দবোধে, তখন আর ভাবনা থাকে না।— আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে-প্রেমে, যে-ধ্যানে, যে-দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে, রূপকলায়।

দেয়ালে-বাঁধা খণ্ড আকাশ আমার আপিস-ঘরটার মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেছে। কাঠা-বিঘের দরে তার বেচাকেনা চলে, তার ভাড়াও জোটে। তার বাইরে গ্রহতারার মেলা যে অখণ্ড আকাশে তার অসীমতার আনন্দ কেবলমাত্র আমার বোধে। জীবলীলার পক্ষে ঐ আকাশটা যে নিতান্তই বাহুল্য, মাটির নীচেকার কীট তারই প্রমাণ দেয়। সংসারে মানবকীটও আছে, আকাশের কৃপণতায় তার গায়ে বাজে না। যে-মনটা গরজের সংসারের গরাদের বাইরে পাখা না মেলে বাঁচে না সে-মনটা ওর মরেছে। এই মরা-মনের মানুষটারই ভূতের কীর্তন দেখে ভয় পেয়ে কবি চতুরাননের দোহাই পেড়ে বলেছিলেন—

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

কিন্তু, রূপকথার রাজপুত্রের মন তাজা। তাই নক্ষত্রের নিত্যদীপবিভাসিত মহাকাশের মধ্যে যে অনির্বচনীয়তা তাই সে দেখেছিল ঐ রাজকন্যায়। রাজকন্যার সঙ্গে তার ব্যবহারটা এই বোধেরই অনুসারে। অন্যদের ব্যবহার অন্যরকম। ভালোবাসায় রাজকন্যার হৃৎস্পন্দন কোন্ ছন্দের মাত্রায় চলে তার পরিমাপ করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক অভাবপক্ষে একটা টিনের চোঙ ব্যবহার করতে একটুও পীড়া বোধ করেন না। রাজকন্যা নিজের হাতে দুধের থেকে যে নবনী মন্থন ক'রে তোলেন সওদাগরের পুত্র তাকে চৌকো টিনের মধ্যে বন্ধ ক'রে বড়োবাজারে চালান দিয়ে দিব্য মনের তৃপ্তি পান। কিন্তু, রাজপুত্র ঐ রাজকন্যার জন্যে টিনের বাজুবন্ধ গড়াবার আভাস স্বপ্নে দেখলেও নিশ্চয় দম আটকে ঘেমে উঠবেন। ঘুম থেকে উঠেই সোনা যদি নাও জোটে, অন্তত চাঁপাকুঁড়ির সন্ধানে তাঁকে বেরোতেই হবে।

এর থেকেই বোঝা যাবে, সাহিত্যতত্ত্বকে অলংকারশাস্ত্র কেন বলা হয়। সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলেই অলংকার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই; সেই হল সাহিত্যের।

অলংকার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ। মা শিশুর মধ্যে পান রসবোধের চরমতা— তাঁর সেই একান্ত বোধটিকে সাজে সজ্জাতেই শিশুর দেহে অনুপ্রকাশিত করে দেন। ভৃত্যকে দেখি প্রয়োজনের বাঁধা সীমানায়, বাঁধা বেতনেই তার মূল্য শোধ হয়। বন্ধুকে দেখি অসীমে, তাই আপনি জেগে ওঠে ভাষায় অলংকার, কণ্ঠের সুরে অলংকার, হাসিতে অলংকার, ব্যবহারে অলংকার। সাহিত্যে এই বন্ধুর কথা অলংকৃত বাণীতে। সেই বাণীর সংকেত-ঝংকারে বাজতে থাকে 'অলম্'— অর্থাৎ, 'বাস, আর কাজ নেই।' এই অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।

ইংরেজিতে যাকে real বলে, বাংলায় তাকে বলি যথার্থ, অথবা সার্থক। সাধারণ সত্য হল এক, আর সার্থক সত্য হল আর। সাধারণ সত্যে একেবারে বাছ-বিচার নেই, সার্থক সত্য আমাদের বাছাই-করা। মানুষমাত্রেই সাধারণ সত্যের কোঠায়, কিন্তু যথার্থ মানুষ 'লাখে না মিলল এক'। করুণার আবেগে বাল্মীকির মুখে যখন ছন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তখন সেই ছন্দকে ধন্য করবার জন্যে নারদঋষির কাছ থেকে তিনি একজন যথার্থ মানুষের সন্ধান করেছিলেন। কেননা, ছন্দ অলংকার। যথার্থ সত্য যে বস্তুতই বিরল তা নয়, কিন্তু আমার মন যার মধ্যে অর্থ পায় না আমার পক্ষে তা অযথার্থ। কবির চিত্তে, রূপকারের চিত্তে, এই যথার্থ-বোধের সীমানা বৃহৎ ব'লে সত্যের সার্থকরূপ তিনি অনেক ব্যাপক ক'রে দেখাতে পারেন। যে-জিনিসের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিসই সার্থক। এক টুকরো কাঁকর আমার কাছে কিছুই নয়, একটি পদ্ম আমার কাছে সুনিশ্চিত। অথচ কাঁকর পদে পদে ঠেলে ঠেলে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়, চোখে পড়লে তাকে ভোলবার জন্যে বৈদ্য

ডাকতে হয়, ভাতে পড়লে দাঁতগুলো আঁতকে ওঠে— তবু তার সত্যের পূর্ণতা আমার কাছে নেই। পদ্ম কনুই দিয়ে বা কটাক্ষ দিয়ে ঠেলাঠেলির উপদ্রব একটুও করে না, তবু আমার সমস্ত মন তাকে আপনি এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করে।

যে-মন বরণীয়কে বরণ ক'রে নেয় তার শুচিবায়ুর পরিচয় দিই। সজনে ফুলে সৌন্দর্যের অভাব নেই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজনে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য, এই খর্বতায় কবির কাছেও সজনে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারালো। বক ফুল, বেগুনের ফুল, কুমড়ো ফুল, এই-সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে; রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে। কবির কথা ছেড়ে দাও, কবির সীমন্তিনীও অলকে সজনে-মঞ্জরি পরতে দ্বিধা করেন, বক ফুলের মালায় তাঁর বেণী জড়ালে ক্ষতি হত না, কিন্তু সে কথাটা মনেও আমল পায় না। কুন্দ আছে, টগর আছে, তাদেরও গন্ধ নেই, তবু অলংকার-মহলে তাদের দ্বার খোলা— কেননা, পেটের ক্ষুধা তাদের গায়ে হাত দেয় নি। বিম্ব যদি ঝোলে-ডালনায় লাগত তা হলে সুন্দরীর অধরের সঙ্গে তার উপমা অগ্রাহ্য হত। তিসি ফুল সর্ষে ফুলের রূপের ঐশ্বর্য প্রচুর, তবু হাটের রাস্তায় তাদের চরম গতি বলেই কবিকল্পনা তাদের নম্র নমস্কারের প্রতিদান দিতে চায় না। শিরীষ ফুলের সঙ্গে গোলাপজাম ফুলের রূপে গুণে ভেদ নেই, তবু কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে ওর কৌলীন্য গেল; কেননা গোলাপজাম নামটা ভোজনলোভের দ্বারা লাঞ্ছিত। যে-কবির সাহস আছে সুন্দরের সমাজে তিনি জাতবিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্ববনের একশ্রেণীতে দাঁড়িয়ে শ্যামজম্বুবনান্তও আষাঢ়ের অভ্যর্থনাভার নিল। কাব্যে সৌভাগ্যক্রমে কোনো শুভক্ষণে রসজ্ঞ দেবতাদের বিচারে মদনের তূণে আমের মুকুল স্থান পেয়েছে। বোধ করি, অমৃতে অনটন ঘটে না বলেই আমের প্রতি দেবতাদের আহারে লোভ নেই। স্বচ্ছ জলের তলে রুইমাছের সন্তরণলীলা আকাশে পাখি ওড়ার চেয়ে কম সুন্দর নয়; কিন্তু, রুইমাছের নাম করবামাত্র পাঠকের রসবোধ পাছে নিঃশেষে রসনার দিকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, এই ভয়ে ছন্দোবন্ধনে বেঁধে ওকে কাব্যের তীরে উত্তীর্ণ করা দুঃসাধ্য হল। সকল ব্যবহারের অতীত বলেই মকর বেঁচে গেছে— ওকে বাহনভুক্ত ক'রে নিতে দেবী জাহ্নবীর গৌরবহানি হল না, নির্বাচনের সময় রুই কাতলাটার নাম মুখে বেধে গেল। তার পিঠে স্থানাভাব বা পাখনায় জোর কম বলেই এমনটা ঘটেছে তা তো মানতে পারি নে। কেননা, লক্ষ্মী সরস্বতী যখন পদ্মকে আসন বলে বেছে নিলেন তার দৌর্বল্য বা অপ্রশস্ততার কথা চিন্তাও করেন নি।

এইখানে চিত্রকলার সুবিধা আছে। কচু গাছ আঁকতে রূপকারের তুলিতে সংকোচ নেই। কিন্তু, বনশোভাসজ্জায় কাব্যে কচু গাছের নাম করা মুশকিল। আমি নিজে জাত-মানা কবির দলে নই, তবু বাঁশবনের কথা পাড়তে গেলে অনেক সময় বেণুবন ব'লে সামলে নিতে হয়। শব্দের সঙ্গে নিত্যব্যবহারগত নানা ভাব জড়িয়ে থাকে। তাই কাব্যে কুরচি ফুলের নাম করবার বেলা কিছু ইতস্তত করেছি, কিন্তু কুরচি ফুল আঁকতে চিত্রকরের তুলির মানহানি হয় না।

এইখানে এ কথাটা বলা দরকার, য়ুরোপীয় কবিদের মনে শব্দ সম্বন্ধে শুচিতার সংস্কার এত প্রবল নয়। নামের চেয়ে বস্তুটা তাঁদের কাছে অনেক বেশি, তাই কাব্যে নাম ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁদের লেখনীতে আমাদের চেয়ে বাধা কম।

যা হোক এটা দেখা গেছে যে, যে-জিনিসটাকে কাজে খাটাই তাকে যথার্থ ক'রে দেখি নে। প্রয়োজনের ছায়াতে সে রাহুগ্রস্ত হয়। রান্নাঘরে ভাঁড়ারঘরে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজন, কিন্তু বিশ্বজনের কাছে গৃহস্থ ঐ দুটো ঘর গোপন ক'রে রাখে। বৈঠকখানা না হলেও চলে, তবু সেই ঘরেই যত সাজসজ্জা, যত মালমসলা; গৃহকর্তা সেই ঘরে ছবি টাঙিয়ে, কার্পেট পেতে, তার উপরে নিজের সাধ্যমত সর্বকালের ছাপ মেরে দিতে চায়। সেই ঘরটিকে সে বিশেষভাবে বাছাই করেছে; তার দ্বারাই সে সকলের কাছে পরিচিত হতে চায় আপন ব্যক্তিগত মহিমায়। সে যে খায় বা খাদ্যসঞ্চয় করে, এটাতে তার ব্যক্তিস্বরূপের সার্থকতা নেই। তার একটি বিশিষ্টতার গৌরব আছে, এই কথাটি বৈঠকখানা দিয়েই জানাতে পারে। তাই বৈঠকখানা অলংকৃত।

জীবধর্মে মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ নেই। আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি তাদের উভয়ের প্রকৃতিতেই প্রবল। এই প্রবৃত্তিতে মনুষ্যত্বের সার্থকতা মানুষ উপলব্ধি করে না। তাই ভোজনের ইচ্ছা ও সুখ যতই প্রবল হোক ব্যাপক হোক, সাহিত্যে ও অন্য কলায় ব্যঙ্গের ভাবে ছাড়া শ্রদ্ধার ভাবে তাকে স্বীকার করা হয় নি। মানুষের আহারের ইচ্ছা প্রবল সত্য, কিন্তু সার্থক সত্য নয়। পেট-ভরানো ব্যাপারটা মানুষ তার কলালোকের অমরাবতীতে স্থান দেয় নি।

স্ত্রীপুরুষের মিলন আহার ব্যাপারের উপরের কোঠায়; কেননা, ওর সঙ্গে মনের মিলনের নিবিড় যোগ। জীবধর্মের মূল প্রয়োজনের দিক থেকে এটা গৌণ, কিন্তু মানুষের জীবনে তা মুখ্যকে বহু দূরে ছাড়িয়ে গেছে। প্রেমের মিলন আমাদের অন্তরবাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। বংশরক্ষার মুখ্য তত্ত্বটুকুতে সেই দীপ্তি নেই। তাই শরীরবিজ্ঞানের কোঠাতেই তার প্রধান স্থান। স্ত্রীপুরুষের মনের মিলনকে প্রকৃতির আদিম প্রয়োজন থেকে ছাড়িয়ে ফেলে তাকে তার নিজের বিশিষ্টতাতেই দেখতে পাই। তাই কাব্যে ও সকল প্রকার কলায় সে এতটা জায়গা জুড়ে বসেছে।

যৌনমিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে তা 'প্রজনার্থং' নয়, কেননা সেখানে সে পশু; সার্থকতা তার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ। তবু যৌনমিলনের জীবধর্ম ও মানুষের চিত্তধর্ম উভয়ের সীমানা-বিভাগ নিয়ে সহজেই গোলমাল বাধে। সাহিত্যে আপন পুরো খাজনা আদায়ের দাবি ক'রে পশুর হাত মানুষের হাত উভয়ে একসঙ্গেই অগ্রসর হয়ে আসে। আধুনিক সাহিত্যে এই নিয়ে দেওয়ানি ফৌজদারি মামলা চলছেই।

উপরে যে পশু-শব্দটা ব্যবহার করেছি ওটা নৈতিক ভালোমন্দ বিচারের দিক থেকে নয়; মানুষের আত্মবোধের বিশেষ সার্থকতার দিক থেকে। বংশরক্ষাঘটিত পশুধর্ম মানুষের মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন। কিন্তু, সে হল বিজ্ঞানের কথা; মানুষের জ্ঞানে ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু, রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা সেখানে এর সিদ্ধান্ত স্থান পায় না। অশোকবনে সীতার দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া হওয়া উচিত ছিল, এ কথাও বিজ্ঞানের; সংসারে এ কথার জোর আছে, কিন্তু কাব্যে নেই। সমাজের অনুশাসন সম্বন্ধেও সেই কথা। সাহিত্যে যৌনমিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক থেকে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে। অর্থাৎ, যৌনমিলনের মধ্যে যে দুটি মহল আছে মানুষ তার কোন্‌টিকে অলংকৃত ক'রে নিত্যকালের গৌরব দিতে চায়, সেইটিই হল বিচার্য।

মাঝে মাঝে এক-একটা যুগে বাহ্য কারণে বিশেষ কোনো উত্তেজনা প্রবল হয়ে ওঠে। সেই উত্তেজনা সাহিত্যের ক্ষেত্র অধিকার ক'রে তার প্রকৃতিকে অভিভূত করে দেয়। য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় সেই যুদ্ধের চঞ্চলতা কাব্যে আন্দোলিত হয়েছিল। সেই সাময়িক আন্দোলনের অনেকটাই সাহিত্যের নিত্যবিষয় হতেই পারে না; দেখতে দেখতে তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে পিউরিটান যুগের পরে যখন চরিত্রশৈথিল্যের সময় এল তখন সেখানকার সাহিত্যসূর্য তারই কলঙ্করেখায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু, সাহিত্যের সৌরকলঙ্ক নিত্যকালের নয়। যথেষ্ট পরিমাণে সেই কলঙ্ক থাকলেও প্রতি মুহূর্তে সূর্যের জ্যোতিস্বরূপ তার প্রতিবাদ করে, সূর্যের সত্তায় তার অবস্থিতিসত্ত্বেও তার সার্থকতা নেই। সার্থকতা হচ্ছে আলোতে।

মধ্যযুগে এক সময় য়ুরোপে শাস্ত্রশাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অভিভূত করেছে। সূর্যের চারি দিকে পৃথিবী ঘোরে, এ কথা বলতে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল; ভুলেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাধিপত্য, তার সিংহাসন ধর্মের রাজত্বসীমার বাইরে। আজকের দিনে তার বিপরীত হল। বিজ্ঞান প্রবল হয়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মানতে চায় না। তার প্রভাব মানবমনের সকল বিভাগেই আপন পেয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার তকমা প'রে কোথাও সে অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তিস্বভাববর্জিত; তার ধর্মই হচ্ছে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখনকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরছে। অথচ সাহিত্যের বিশেষত্বই

হচ্ছে তার পক্ষপাতধর্ম ; সাহিত্যের বাণী স্বয়ম্বরা। বিজ্ঞানের নির্বিচার কৌতূহল সাহিত্যের সেই বরণ ক'রে নেবার স্বভাবকে পরাস্ত করতে উদ্যত। আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব যে একটা উপদ্রব চলছে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেস্‌টোরেশন-যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু, সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটিকা চিরদিনের মতো পায় নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিকতে পারে না।

একদিন আমাদের দেশে নাগরিকতা যখন খুব তপ্ত ছিল তখন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের যথেষ্ট আদর দেখেছি। মদনমোহন তর্কালংকারের মধ্যেও সে ঝাঁজ ছিল। তখনকার দিনের নাগরিক-সাহিত্যে এ জিনিসটার ছড়াছড়ি দেখা গেছে। যারা এই নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল তারা মনে করতে পারত না যে, সেদিনকার সাহিত্যের রসাকাঠের এই ধোঁয়াটাই প্রধান ও স্থায়ী জিনিস নয়, তার আগুনের শিখাটাই আসল। কিন্তু আজ দেখা গেল, সেদিনকার সাহিত্যের গায়ে যে কাদার ছাপ পড়েছিল সেটা তার চামড়ার রঙ নয়, কালস্রোতের ধারায় আজ তার চিহ্ন নেই। মনে তো আছে, যেদিন ঈশ্বরগুপ্ত পাঁঠার উপর কবিতা লিখেছিলেন সেদিন নূতন ইংরেজরাজের এই হঠাৎ-শহর কলকাতার বাবুমহলে কিরকম তার প্রশংসাধ্বনি উঠেছে। আজকের দিনে পাঠক তাকে কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে স্বভাবতই স্থান দেবে না ; পেটুকতার নীতিবিরুদ্ধ অসংযম বিচার ক'রে নয় ভোজনলালসার চরম মূল্য তার কাছে নেই ব'লেই।

সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করছেন নিত্যপদার্থ ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য ; যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।

এই ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো ধুলো-মাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল নেই, পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক ক'রে তুলে তাই চিৎকারশব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব ব'লে গণ্য করেছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙিন করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না, এমন কথা বলি নে। অতএব সাইকো-অ্যানালিসিসে এর কার্যকারণ বহুযত্নে বিচার্য। কিন্তু, মানুষের রসবোধই যে-উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসংগত ব'লেই আপত্তি করব, অসত্য ব'লে নয়।

সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা-মাখামাখির পক্ষ সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি। এ প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাতলামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচোখচকার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্তিত গর্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ করতে থাকে, তখন আর্ত ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কি না, যথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে এটা সংগীত কি না। মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে একরকম উল্লাস হয় ; কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব-একটা জোরও আছে। মাধুর্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মানতে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরি দিতে হবে সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু, ততঃ কিম্! এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্যকলার নয়।

উপসংহারে এ কথাও বলা দরকার যে, সম্প্রতি যে-দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে সাহিত্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবি করছে, সে-দেশের সাহিত্য অনন্ত বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ত দিতে পারে। কিন্তু, যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে

বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায় নি সে-দেশের সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে। ভারতসাগরের ওপারে যদি প্রশ্ন করা যায় 'তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন', উত্তর পাই, 'হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেছে!' ভারতসাগরের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, 'হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরি।'

শ্রাবণ ১৩৩৪

সাহিত্যে নবত্ব

সকল দেশের সাহিত্যেরই প্রধান কাজ হচ্ছে শোনবার লোকের আসনটি বড়ো ক'রে তোলা, যেখান থেকে দাবি আসে। নইলে লেখবার লোকের শক্তি খাটো হয়ে যায়। যে-সব সাহিত্য বনেদি তারা বহু কালের আর বহু মানুষের কানে কথা কয়েছে। তাদের কথা দিন-আনি-দিন-খাই তহবিলের ওজনে নয়। বনেদি সাহিত্যে সেই শোনবার কান তৈরি ক'রে তোলে। যে-সমাজে অনেক পাঠকের সেই শোনবার কান তৈরি হয়েছে সে-সমাজে বড়ো ক'রে লেখবার শক্তি অনেক লেখকের মধ্যে আপনিই দেখা দেয়, কেবলমাত্র খুচরো মালের ব্যাবসা সেখানে চলে না। সেখানকার বড়ো মহাজনদের কারবার আধা নিয়ে নয়, পুরো নিয়ে। তাদের আধা'র ব্যাপারী বলব না, সুতরাং জাহাজের খবর তাদের মেলে।

বাংলাদেশে প্রথম ইংরেজি শিক্ষার যোগে এমন সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের চেনাশোনা হল যার স্থান বিপুল দেশের ও নিরবধি কালের। সে সাহিত্যের বলবার বিষয়টা যতই বিদেশী হোক-না, তার বলবার আদর্শটা সর্বকালীন ও সর্বজনীন। হোমরের মহাকাব্যের কাহিনীটা গ্রীক, কিন্তু তার মধ্যে কাব্যরচনার যে-আদর্শটা আছে যেহেতু তা সার্বভৌমিক এইজন্যেই সাহিত্যপ্রিয় বাঙালিও সেই গ্রীক কাব্য প'ড়ে তার রস পায়। আপেল ফল আমাদের দেশের অনেক লোকের পক্ষেই অপরিচিত, ওটা সর্বাংশেই বিদেশী, কিন্তু ওর মধ্যে যে ফলত্ব আছে সেটাকে আমাদের অত্যন্ত স্বাদেশিক রসনাও মুহূর্তের মধ্যে সাদরে স্বীকার ক'রে নিতে বাধা পায় না। শরৎ চাটুজ্জের গল্পটা বাঙালির, কিন্তু গল্প বলাটা একান্ত বাঙালির নয়; সেইজন্যে তাঁর গল্প-সাহিত্যের জগন্নাথ-ক্ষেত্রে জাত-বিচারের কথা উঠতেই পারে না। গল্প-বলার সর্বজনীন আদর্শটাই ফলাও ক্ষেত্রে সকল লোককে ডাক দিয়ে আনে। সেই আদর্শটা খাটো হলেই নিমন্ত্রণটা ছোটো হয়; সেটা পারিবারিক ভোজ হতে পারে, স্বজাতের ভোজ হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের যে-তীর্থে সকল দেশের যাত্রী এসে মেলে সে-তীর্থের মহাভোজ হবে না।

কিন্তু, মানুষের কানের কাছে সর্বদাই যারা ভিড় ক'রে থাকে, যাদের ফরমাশ সব চেয়ে চড়া গলায়, তাদের পাতে জোগান দেবার ভার নিতে গেলেই ঠকতে হবে; তারা গাল পাড়তে থাকলেও তাদের এড়িয়ে যাবার মতো মনের জোর থাকা চাই। যাদের চিত্ত অত্যন্ত ক্ষণকালবিহারী, যাদের উপস্থিত গরজের দাবি অত্যন্ত উগ্র, তাদেরই হট্টগোল সব চেয়ে বেশি শোনা যায়। সকালবেলার সূর্যালোকের চেয়ে বেশি দৃষ্টিতে পড়ে যে-আলোটা ল্যাম্প-পোস্টের উপরকার কাচফলক থেকে ঠিকরে চোখে এসে বেঁধে। আবদারের প্রাবল্যকেই প্রামাণ্য মনে করার বিপদ আছে।

যে-লেখকের অন্তরেই বিশ্বশ্রোতার আসন তিনিই বাইরের শ্রোতার কাছ থেকে নগদ বিদায়ের লোভ সামলাতে পারেন। ভিতরের মহানীরব যদি তাঁকে বরণমালা দেয় তা হলে তাঁর আর ভাবনা থাকে না, তা হলে বাইরের নিত্যমুখরকে তিনি দূর থেকে নমস্কার ক'রে নিরাপদে চলে যেতে পারেন।

ইংরেজি শিক্ষার গোড়াতেই আমরা যে-সাহিত্যের পরিচয় পেয়েছি তার মধ্যে বিশ্ব-সাহিত্যের আদর্শ ছিল এ কথা মানতেই হবে। কিন্তু, তাই ব'লে এ কথা বলতে পারব না যে, এই আদর্শ য়ুরোপে

সকল সময়েই সমান উজ্জ্বল থাকে। সেখানেও কখনো কখনো গরজের ফরমাশ যখন অত্যন্ত বড়ো হয়ে ওঠে তখন সাহিত্যে খর্বতার দিন আসে। তখন ইকনমিক্‌সের অধ্যাপক, বায়োলজির লেকচারার, সোসিয়লজির গোল্ড মেডালিস্ট সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ভিড় ক'রে ধরনা দিয়ে বসেন।

সকল দেশের সাহিত্যেই দিন একটানা চলে না ; মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গেলেই বেলা পড়ে আসতে থাকে। আলো যখন ক্ষীণ হয়ে আসে তখনি অদ্ভুতের প্রাদুর্ভাব হয়। অন্ধকারের কালটা হচ্ছে বিকৃতির কাল। তখন অলিতে-গলিতে আমরা কন্ধকাটাকে দেখতে পাই, আর তার কুৎসিত কল্পনাটাকেই একান্ত ক'রে তুলি।

বস্তুত সাহিত্যের সায়াহ্নে কল্পনা ক্লান্ত হয়ে আসে ব'লেই তাকে বিকৃতিতে পেয়ে বসে; কেননা, যা-কিছু সহজ তাতে তার আর শানায় না। যে-অক্লিষ্ট শক্তি থাকলে আনন্দসম্ভোগ স্বভাবতই সম্ভবপর সেই শক্তির ক্ষীণতায় উত্তেজনার প্রয়োজন ঘটে। তখন মাতলামিকেই পৌরুষ ব'লে মনে হয়। প্রকৃতিস্থকেই মাতাল অবজ্ঞা করে ; তার সংযমকে হয় মনে করে ভান, নয় মনে করে দুর্বলতা।

বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা , ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন ক'রে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। এ'কেই বলে ওরিজিন্যালিটি। যখনি সে আজগবিকে নিয়ে গলা ভেঙে, মুখ লাল্‌ ক'রে, কপালের শিরগুলোকে ফুলিয়ে তুলে ওরিজিন্যাল হতে চেষ্টা করে, তখনি বোঝা যায় শেষ দশায় এসেছে। জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে সাহিত্যধারায় নৌকো-চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে ; আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি— এতে মাঝিগিরির দরকার নেই— এটা তলিয়ে-যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই। সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজ্‌ম্‌। এর একটিমাত্র কারণ হচ্ছে এই, আলাপের সহজ শক্তি যখন চলে যায় সেই বিকারের দশায় প্রলাপের শক্তি বেড়ে ওঠে। বাইরের দিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রলাপের জোর আলাপের চেয়ে অনেক বেশি, এ কথা মানতেই হয়। কিন্তু, তা নিয়ে শঙ্কা না ক'রে লোকে যখন গর্ব করতে থাকে তখনি বুঝি সর্বনাশ হল ব'লে।

য়ুরোপের সাহিত্যে চিত্রকলায় এই-যে বিহ্বলতা ক্ষণে ক্ষণে ও স্থানে স্থানে বীভৎস হয়ে উঠছে এটা হয়তো একদিন কেটে যাবে, যেমন ক'রে বলিষ্ঠ লোক মারাত্মক ব্যামোকেও কাটিয়ে ওঠে। আমার ভয়, দুর্বলকে যখন ছোঁয়াচ লাগবে তখন তার অন্যান্য নানা দুর্গতির মধ্যে এই আর-একটা উপদ্রবের বোঝা হয়তো দুঃসহ হয়ে উঠবে।

ভাবনার বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের শাস্ত্র-মানা ধাত। এইরকম মানুষরা যখন আচার মানে তখন যেমন গুরুর মুখের দিকে চেয়ে মানে, যখন আচার ভাঙে তখনো গুরুর মুখের দিকে চেয়েই ভাঙে। রাশিয়া বা আর কোনো পশ্চিম দিগন্তে যদি গুরু নবীন বেশে দেখা দেন, লাল টুপি প'রে বা যে কোনো উগ্রসাজেই হোক তবে আমাদের দেশের ইস্কুল-মাস্টাররা অভিভূত হয়ে পড়েন। শাশুড়ির শাসনে যার চামড়া শক্ত হয়েছে সেই বউ শাশুড়ি হয়ে উঠে নিজের বধূর 'পরে শাসন জারি ক'রে যেমন আনন্দ পান, এঁরাও তেমনি স্বদেশের যে-সব নিরীহ মানুষকে নিজেদের স্কুলবয় ব'লে ভাবতে চিরদিন অভ্যস্ত তাদের উপর উপরওয়ালা রাশিয়ান হেডমাস্টারদের কড়া বিধান জারি ক'রে পদোন্নতির গৌরব কামনা করেন। সেই হেডমাস্টারের গদ্‌গদ ভাষার অর্থ কী ও তার কারণ কী, সে কথা বিচার করবার অভ্যাস নেই, কেননা সেই হল আধুনিক কালের আপ্তবাক্য।

আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয় পাকা হবার মতো যথেষ্ট সময় পাই নি, এ কথা আমাকে মানতেই হবে। মাঝে মাঝে ক্ষণকালের দেখাশোনা হয়েছে তাতে বার বার তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জা বোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে ; সাহস আছে, বাহাদুরি নেই। অনেক নবীন কবির লেখায় এই সবলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ; বোঝা যায় যে,

বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ এসেছে। এই নব অভ্যুদয়ের অভিনন্দন করতে আমি কুণ্ঠিত হই নে।

কিন্তু, শক্তির একটা নূতন স্ফূর্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল ক'রে তোলে। সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে, অপটুর দল সেইখানেই উদ্দাম ভঙ্গিতে কেবল জলের নীচেকার পাঁককে উপরে আলোড়িত করতে থাকে। অপটুই কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে ; সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য, নিলর্জ্জতাকে বলে পৌরুষ। বাঁধি গতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই ব'লেই সে হাল-আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলো বাঁধি বুলি সংগ্রহ ক'রে রাখে। বিলিতি পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি ক'রে রাখে ; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে; লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে-সাজানো বাঁধি বুলি আছে— অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি-পাউডর'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর-একটা লালসার অসংযম।

অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্যবেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে ; যখন-তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। আমরাই রিয়ালিটির সঙ্গে কারবার ক'রে থাকি, আমরাই জানি কাকে বলে লাইফ' এই আস্ফালন করবার ওটা একটা সহজ এবং চলতি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের মতো হয়ে উঠছে। অথচ এঁদের মধ্যে অনেকেই দেখা যায় নিজেদের জীবনযাত্রায় 'দরিদ্র-নারায়ণের' ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেন নি ; ভালোরকম উপার্জনও করেন, সুখে স্বচ্ছন্দেও থাকেন ; দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই ঝাল-মসলার মতো ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি-পাউডরের যোগে একটা কৃত্রিম সস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এইজন্যেই অপটু লেখকের পক্ষে এ একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।

সাহিত্যে লালসা ইতিপূর্বে স্থান পায় নি বা এর পরে স্থান পাবে না, এমন কথা সত্যের খাতিরে বলতে পারি নে। কিন্তু, ও জিনিসটা সাহিত্যের পক্ষে বিপদ্‌জনক। বলা বাহুল্য, সামাজিক বিপদের কথাটা আমি তুলছি নে। বিপদের কারণটা হচ্ছে, ওটা অত্যন্ত সস্তা, ধুলোর উপরে শুয়ে পড়ার মতোই সহজসাধ্য। অর্থাৎ, ধুলোয় যার লুটোতে সংকোচ নেই তার পক্ষে একেবারেই সহজ। পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সঞ্চার করা অতি অল্পেই হয়। এইজন্যেই, পাঠকসমাজে এমন একটা কথা যদি ওঠে যে, সাহিত্যে লালসাকে একান্ত উন্মথিত করাটাই আধুনিক যুগের একটা মস্ত ওস্তাদি, তা হলে এজন্যে বিশেষ শক্তিমান লেখকের দরকার হবে না— সাহস দেখিয়ে বাহাদুরি করবার নেশা যাদের লাগবে তারা এতে অতি সহজেই মেতে উঠতে পারবে। সাহসটা সমাজেই কী, সাহিত্যেই কী, ভালো জিনিস। কিন্তু, সাহসের মধ্যেও শ্রেণীবিচার, মূল্যবিচার আছে। কোনো-কিছুকে কেয়ার করি নে ব'লেই যে সাহস, তার চেয়ে বড়ো জিনিস হচ্ছে একটা-কিছুকে কেয়ার করি ব'লেই যে সাহস। মানুষের শরীর-ঘেঁষা যে-সব সংস্কার জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেইগুলো অনেক পুরোনো, প্রথম অধ্যায় থেকেই তাদের আরম্ভ। একটু ছুঁতে-না ছুঁতেই তারা ঝন্‌ঝন্ ক'রেই বেজে ওঠে। মেঘনাদবধের নরকবর্ণনায় বীভৎস রসের অবতারণা উপলক্ষে মাইকেল এক জায়গায় বর্ণনা করেছেন, নারকী বমন ক'রে উদ্‌গীর্ণ পদার্থ আবার খাচ্ছে— এ বর্ণনায় পাঠকের মনে ঘৃণা সঞ্চার করতে কবিত্বশক্তির প্রয়োজন করে না, কিন্তু আমাদের মানসিকতার মধ্যে যে-সব ঘৃণ্যতার মূল তার প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে কল্পনাশক্তির দরকার। ঘৃণাবৃত্তির প্রকাশটা সাহিত্যে জায়গা পাবে না, এ কথা বলব না কিন্তু সেটা যদি একান্তই একটা দৈহিক সস্তা জিনিস হয় তা হলে তাকে অবজ্ঞা করার অভ্যাসটাকে নষ্ট না করলেই ভালো হয়।

তুচ্ছ ও মহতের, ভালো ও মন্দের কাঁকর ও পদ্মের ভেদ অসীমের মধ্যে নেই, অতএব সাহিত্যেই বা

কেন থাকবে, এমন একটা প্রশ্ন পরম্পরায় কানে উঠল। এমন কথারও কি উত্তর দেওয়ার দরকার আছে। যাঁরা তুরীয় অবস্থায় উঠেছেন তাঁদের কাছে সাহিত্যও নেই, আর্টও নেই ; তাঁদের কথা ছেড়েই দেওয়া যায়। কিন্তু, কিছুর সঙ্গে কিছুরই মূল্যভেদ যদি সাহিত্যেও না থাকে তা হলে পৃথিবীতে সকল লেখাই তো সমান দামের হয়ে ওঠে। কেননা, অসীমের মধ্যে নিঃসন্দেহই তাদের সকলেরই এক অবস্থা— খণ্ড দেশকালপাত্রের মধ্যেই তাদের মূল্যভেদ। আম এবং মাকাল অসীমের মধ্যে একই, কিন্তু আমরা খেতে গেলেই দেখি তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ। এইজন্যে অতি বড়ো তত্ত্বজ্ঞানী অধ্যাপকদেরও যখন ভোজে নিমন্ত্রণ করি তখন তাঁদের পাতে আমের অকুলোন হলে মাকাল দিতে পারি নে। তত্ত্বজ্ঞানের দোহাই পেড়ে মাকাল যদি দিতে পারতুম এবং দিয়ে যদি বাহবা পাওয়া যেত, তা হলে সস্তায় ব্রাহ্মণভোজন করানো যেত, কিন্তু পুণ্য খতিয়ে দেখবার বেলায় চিত্রগুপ্ত নিশ্চয় পাতঞ্জলদর্শনের মতে হিসাব করতেন না। পুণ্যলাভ করতে শক্তির দরকার। সাহিত্যেও একটা পুণ্যের খাতা খোলা আছে।

ভালোরকম বিদ্যাশিক্ষার জন্যে মানুষকে নিয়ত যে-প্রয়াস করতে হয় সেটাতে মস্তিষ্কের ও চরিত্রের শক্তি চাই। সমাজে এই বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ একটা আদর আছে ব'লেই সাধারণত এত ছাত্র এতটা শক্তি জাগিয়ে রাখে। সেই সমাজই যদি কোনো কারণে কোনো একদিন ব'লে বসে বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করাটাই আদরণীয়, তা হলে অধিকাংশ ছাত্র অতি সহজেই সাহস প্রকাশ করবার অহংকার করতে পারে। এইরকম সস্তা বীরত্ব করবার উপলক্ষ সাধারণ লোককে দিলে তাদের কর্তব্যবুদ্ধিকে দুর্বল করাই হয়। বীর্যসাধ্য সাধনা বহুকাল বহু লোকেই অবলম্বন করেছে ব'লে তাকে সামান্য ও সেকেলে ব'লে উপেক্ষা করবার স্পর্ধা একবার প্রশ্রয় পেলে অতি সহজেই তা সংক্রামিত হতে পারে— বিশেষভাবে, যারা শক্তিহীন তাদেরই মধ্যে। সাহিত্যে এইরকম কৃত্রিম দুঃসাহসের হাওয়া যদি ওঠে তা হলে বিস্তর অপটু লেখকের লেখনী মুখর হয়ে উঠবে, এই আমাদের আশঙ্কা।

আমি দেখেছি কেউ কেউ বলছেন, এই-সব তরুণ লেখকের মধ্যে নৈতিক চিত্তবিকার ঘটেছে ব'লেই এইরকম সাহিত্যের সৃষ্টি হঠাৎ এমন দ্রুতবেগে প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না। এঁরা অনেকেই সাহিত্যে সহজিয়া সাধন গ্রহণ করেছেন, তার প্রধান কারণ এটাই সহজ। অথচ দুঃসাহসিক ব'লে এতে বাহবাও পাওয়া যায়, তরুণের পক্ষে সেটা কম প্রলোভনের কথা নয়। তারা বলতে চায় 'আমরা কিছু মানি নে'— এটা তরুণের ধর্ম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই না মানতে শক্তির দরকার করে ; সেই শক্তির অহংকার তরুণের পক্ষে স্বাভাবিক। এই অহংকারের আবেগে তারা ভুল করেও থাকে সেই ভুলের বিপদ সত্ত্বেও তরুণের এই স্পর্ধাকে আমি শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু, যেখানে না মানাই হচ্ছে সহজ পন্থা, সেখানে সেই অশক্তের সস্তা অহংকার তরুণের পক্ষেই সব চেয়ে অযোগ্য। ভাষাকে মানি নে যদি বলতে পারি তা হলে কবিতা লেখা সহজ হয়, দৈহিক সহজ উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য বিষয় করতে যদি না বাধে তা হলে সামান্য খরচাতেই উপস্থিতমত কাজ চালানো যায়, কিন্তু এইটেই সাহিত্যিক কাপুরুষতা।

প্লান্‌সিউজ জাহাজ
২৩ অগস্ট, ১৯২৭

সাহিত্যবিচার

সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত শ্রেণীগত নয়। এখানে 'ব্যক্তি' শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরেই জোর দিতে চাই; স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠছে, তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার সম্পূর্ণ অনুরূপ আর দ্বিতীয় নেই।

ব্যক্তিরূপের এই ব্যক্ততা সকলের সমান নয়, কেউ-বা সুস্পষ্ট, কেউ-বা অস্পষ্ট। অন্তত, যে-মানুষ উপলব্ধি করে তার পক্ষে। সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়; বিশ্বের যে-কোনো পদার্থই সাহিত্যে সুস্পষ্ট তাই ব্যক্তি, জীবজন্তু, গাছপালা, নদী, পর্বত, সমুদ্র, ভালো জিনিস, মন্দ জিনিস, বস্তুর জিনিস, ভাবের জিনিস, সমস্তই ব্যক্তি— নিজের ঐকান্তিকতায় সে যদি ব্যক্ত না হল তা হলে সাহিত্যে সে লজ্জিত।

যে গুণে এরা সাহিত্যে সেই পরিমাণে ব্যক্ত হয়ে ওঠে, যাতে আমাদের চিত্ত তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সেই গুণটি দুর্লভ— সেই গুণটিই সাহিত্যরচয়িতার। তা রজোগুণও নয়, তমোগুণও নয়, তা কল্পনাশক্তির ও রচনাশক্তির গুণ।

পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষকে, অসংখ্য জিনিসকে আমরা পুরোপুরি দেখতে পাই নে। প্রয়োজন হিসাবে বা সাংসারিক প্রভাব হিসাবে তারা পুলিস ইন্‌স্পেক্টর বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মতোই অত্যন্ত পরিদৃষ্ট এবং পরিপুষ্ট হতে পারে; কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তারা হাজার হাজার পুলিস ইন্‌স্পেক্টর এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মতোই অকিঞ্চিৎকর, এমন-কি, যাদের প্রতি তারা কর্তৃত্ব করে তাদের অনেকের চেয়ে। সুতরাং তারা অচিরকালীন বর্তমান অবস্থার বাইরে মানুষের অন্তরঙ্গরূপে প্রকাশমান নয়।

কিন্তু, সাহিত্যরচয়িতা আপন সৃষ্টিশক্তির গুণে তাদেরও চিরকালীন রূপে ব্যক্ত করে দাঁড় করাতে পারে। তখন তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দণ্ডবিধাতারূপে কোনো শ্রেণী বা পদের প্রতিনিধিরূপে নয়, কেবলমাত্র আপন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মূল্যে মূল্যবান। ধনী বলে নয়, মানী বলে নয়, জ্ঞানী বলে নয়, সৎ বলে নয়, সত্ত্ব রজ বা তমোগুণান্বিত বলে নয়, তারা স্পষ্ট ব্যক্ত হতে পেরেছে বলেই সমাদৃত। এই ব্যক্ত রূপের সাহিত্যমূল্যটি নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। এইজন্যেই সাহিত্যবিচারে অনেকেই ব্যক্তিপরিচয়ের দুরূহ কর্তব্যে ফাঁকি দিয়ে শ্রেণীর পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই সহজ পন্থাকে সাধারণত আমাদের দেশের পাঠকেরা অশ্রদ্ধা করেন না; বোধ করি তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশ জাত-মানার দেশ। মানুষের পরিচয়ের চেয়ে জাতের পরিচয়ে আমাদের চোখ পড়ে বেশি। আমরা বড়োলোক বলি যার বড়ো পদ, বড়োমানুষ বলি যার অনেক টাকা। আমরা জাতের চাপ, শ্রেণীর চাপ দীর্ঘকাল ধরে পিঠের উপর সহ্য করেছি; ব্যক্তিগত মানুষ পঙ্‌ক্তিপূজক সমাজের তাড়নায় আমাদের দেশে চিরদিন সংকুচিত। বাঁধা রীতির বন্ধন আমাদের দেশে সর্বত্রই। এই কারণেই যে সাধু-সাহিত্য আমাদের দেশে একদা প্রচলিত ছিল তাতে ব্যক্তির বর্ণনা ছিল শিষ্টসাহিত্যপ্রথাসম্মত, শ্রেণীগত। তখন ছিল কুমুদকহ্লারশোভিত সরোবর; যূথীজাতিমল্লিকামালতীবিকশিত বসন্তঋতু; তখনকার সকল সুন্দরীরই গমন গজেন্দ্রগমন, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিম্ব দাড়িম্ব সুমেরুর বাঁধা ছাঁদে। শ্রেণীর কুহেলিকার মধ্যে ব্যক্তি অদৃশ্য। সেই ঝাপসা দৃষ্টির মনোবৃত্তি আমাদের চলে গেছে তা বলতে পারি নে। এই ঝাপসা দৃষ্টিই সাহিত্য-রচনায় ও অনুভূতিতে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। কেননা সাহিত্যে রসরূপের সৃষ্টি। সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ।

সেইজন্যেই দেখি, আমাদের দেশের সাহিত্যবিচারে ব্যক্তির পরিচয় বাদ দিয়ে শ্রেণীর পরিচয়ের দিকেই ঝোঁক দেওয়া হয়।

সাহিত্যে ভালো-লাগা মন্দ-লাগা হল শেষ কথা। বিজ্ঞানে সত্যমিথ্যার বিচারই শেষ বিচার। এই কারণে বিচারকের ব্যক্তিগত সংস্কারের উপরে বৈজ্ঞানিকের চরম আপিল আছে প্রমাণে। কিন্তু, ভালো মন্দ লাগাটা রুচি নিয়ে; এর উপরে আর-কোনো আপিল অযোগ্যতম লোকও অস্বীকার করতে

পারে। এই কারণে জগতে সকলের চেয়ে অরক্ষিত অসহায় জীব হল সাহিত্যরচয়িতা। মৃদুস্বভাব হরিণ পালিয়ে বাঁচে, কিন্তু কবি ধরা পড়ে ছাপার অক্ষরের কালো জালটায়। এ নিয়ে আপেক্ষ ক'রে লাভ নেই; নিজের অনিবার্য কর্মফলের উপরে জোর খাটে না।

রুচির মার যখন খাই তখন চুপ ক'রে সহ্য করাই ভালো, কেননা সাহিত্যরচয়িতার ভাগ্যচক্রের মধ্যেই রুচির কুগ্রহ-সুগ্রহের চিরনির্দিষ্ট স্থান। কিন্তু, বাইরে থেকে যখন আসে উল্কাবৃষ্টি, সম্মার্জনী হাতে আসে ধূমকেতু, আসে উপগ্রহের উপসর্গ, তখন মাথা চাপড়ে বলি, এ যে মারের উপরি-পাওনা। বাংলাসাহিত্যের অন্তঃপুরে শ্রেণীর যাচনদার বাহির হতে ঢুকে পড়েছে; কেউ তাদের দ্বাররোধ করবার নেই। বাউলকবি দুঃখ ক'রে বলেছে, ফুলের বনে জহুরী ঢুকেছে, সে পদ্মফুলকে নিকষে ঘষে ঘষে বেড়ায়, ফুলকে দেয় লজ্জা।

আমরা সহজেই ভুলি যে, জাতিনির্ণয় বিজ্ঞানে, জাতির বিবরণ ইতিহাসে, কিন্তু সাহিত্যে জাতিবিচার নেই, সেখানে আর-সমস্তই ভুলে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার ক'রে নিতে হবে। অমুক কুলীন ব্রাহ্মণ, এই পরিচয়েই অতি অযোগ্য মানুষও ঘরে ঘরে বরমাল্য লুটে বেড়াতে পারে, কিন্তু তাতে ব্যক্তি হিসাবে তার যোগ্যতা সপ্রমাণ হয় না। লোকটা কুলীন কি না কুলপঞ্জিকা দেখলেই সকলেই সেটা বলতে পারে, অথচ ব্যক্তিগত যোগ্যতা নির্ণয় করতে যে সমজদারের প্রয়োজন তাঁকে খুঁজে মেলা ভার। এইজন্যে সমাজে সাধারণত শ্রেণীর কাঠামোতেই মানুষকে বিভক্ত করে; জাতিকুলের মর্যাদা দেওয়া, ধনের মর্যাদা দেওয়া সহজ। সেই বিচারেই ব্যক্তির প্রতি সর্বদাই সমাজে অবিচার ঘটে, শ্রেণীর বেড়ার বাইরে যোগ্যব্যক্তির স্থান অযোগ্যব্যক্তির পঙ্‌ক্তির নীচে পড়ে। কিন্তু, সাহিত্যে জগন্নাথের ক্ষেত্র; এখানে জাতির খাতিরে ব্যক্তির অপমান চলবে না। এমন-কি, এখানে বর্ণসংকর দোষও দোষ নয়; মহাভারতের মতোই উদারতা। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম-ইতিহাস নিয়ে এখানে কেউ তাঁর সম্মান অপহরণ করে না; তিনি তাঁর নিজের মহিমাতেই মহীয়ান। অথচ আমাদের দেশে দেবমন্দির প্রবেশেও যেমন জাতিবিচারকে কেউ নাস্তিকতা মনে করে না, তেমনি সাহিত্যের সরস্বতীর মন্দিরের পাণ্ডারা দ্বারের কাছে কুলের বিচার করতে সংকোচ করে না। হয়তো ব'লে বসে, এ লেখাটার চাল কিংবা স্বভাব বিশুদ্ধ ভারতীয় নয়, এর কূলে যবনস্পর্শ দোষ আছে। দেবী ভারতী স্বয়ং এরকমের মেল-বন্ধন মানেন না, কিন্তু পাণ্ডারা এই নিয়ে তুমুল তর্ক তোলে। চৈন চিত্র-বিশ্লেষণে প্রমাণ হতে পারে যে, তার কোনো অংশে ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্রব ঘটেছে; কিন্তু সেটা নিছক ইতিহাসের কথা, সারস্বত বিচারের কথা নয়। সে চিত্রের ব্যক্তিত্বটি দেখো, যদি রূপব্যক্ততায় কোনো দোষ না থাকে তা হলে সেইখানেই তার ইতিহাসের কলঙ্কভঞ্জন হয়ে গেল। মানুষের মনে মানুষের প্রভাব চারি দিক থেকেই এসে থাকে। যদি অযোগ্য প্রভাব নাহয় তবে তাকে স্বীকার করবার ও গ্রহণ করবার ক্ষমতা না থাকাই লজ্জার বিষয়— তাতে চিত্তের নির্জীবতা প্রমাণ হয়। নীল নদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু, যথাসময়ে সে হয় ভারতেরই বর্ষা। তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে তবে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক তাকে যেন ভর্ৎসনা না করেন; যদি সে না নাচত তবেই বুঝতুম, ময়ূরটা মরেছে বুঝি। এমন মরুভূমি আছে যে সেই মেঘকে তিরস্কার ক'রে আপন সীমানা থেকে বের করে দিয়েছে। সে মরু থাক্ আপন বিশুদ্ধ শুচিতা নিয়ে একেবারে শুভ্র আকারে, তার উপরে রসের বিধাতা শাপ দিয়ে রেখেছেন, সে কোনোদিন প্রাণবান হয়ে উঠবে না। বাংলাদেশেই এমন মন্তব্য শুনতে হয়েছে যে, দাশুরায়ের পাঁচালি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তা বিশুদ্ধ স্বাদেশিক।

এটা অন্ধ অভিমানের কথা। এই অভিমানে একদিন শ্রীমতী বলেছিলেন, 'কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী।' অবস্থাবৈগুণ্যে এরকম মনের ভাব ঘটে সে কথা স্বীকার করা যাক— ওটা হল খণ্ডিতা নারীর মুখের কথা, মনের কথা নয়। কিন্তু, যখন তত্ত্বজ্ঞানী এসে বলেন, সাত্ত্বিকতা হল ভারতীয়ত্ব, রাজসিকতা হল য়ুরোপীয়ত্ব— এই ব'লে সাহিত্যে খানাতল্লাশি করতে থাকেন, লাইন চুনে চুনে রাজসিকতার প্রমাণ বের ক'রে কাব্যের উপরে একঘরে করবার দাগা দিয়ে দেন, কাউকে জাতে রাখেন, কাউকে জাতে ঠেলেন, তখন একেবারে হতাশ হতে হয়।

এক সময়ে ভারতীয় প্রভাব যখন প্রাণপূর্ণ ছিল তখন মধ্য এবং পূর্ব এশিয়া তার নিকট-সংস্পর্শে এসে দেখতে দেখতে প্রভূত শিল্পসম্পদে আশ্চর্যরূপে চরিতার্থ হয়েছিল। তাতে এশিয়ায় এনেছিল নবজাগরণ। এজন্য ভারতের বহির্বর্তী এশিয়ার কোনো অংশ যেন কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়। কারণ, যে-কোনো দানের মধ্যে শাশ্বত সত্য আছে তাকে যে-কোনো লোক যদি যথার্থভাবে আপন ক'রে স্বীকার করতে পারে তবে সে দান সত্যই তার আপনার হয়। অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়। মানুষের সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতা এই স্বীকরণশক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম্যলাভ করেছে।

বর্তমান যুগে য়ুরোপ সর্ববিধ বিদ্যায় ও সর্ববিধ কলায় মহীয়ান। চারি দিকে তার প্রভাব নানা আকারে বিকীর্ণ। সেই প্রভাবের প্রেরণায় য়ুরোপের বহির্ভাগেও দেশে দেশে চিত্তজাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণকে নিন্দা করা অবিমিশ্র মূঢ়তা। য়ুরোপ যে-কোনো সত্যকে প্রকাশ করেছে তাতে সকল মানুষেরই অধিকার। কিন্তু, সেই অধিকারকে আত্মশক্তির দ্বারাই প্রমাণ করতে হয়— তাকে স্বকীয় ক'রে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চাই। আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সাহিত্য য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা। শরৎ চাটুজ্জের গল্প, বেতালপঞ্চবিংশতি হাতেম-তাই গোলেবকাওয়ালী অথবা কাদম্বরী-বাসবদত্তার মতো যে হয় নি, হয়েছে য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের ছাঁদে, তাতে ক'রে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না ; তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা। বাতাসে সত্যের যে প্রভাব ভেসে বেড়ায় তা দূরের থেকেই আসুক বা নিকটের থেকে, তাকে সর্বাগ্রে অনুভব করে এবং স্বীকার করে প্রতিভাসম্পন্ন চিত্ত ; যারা নিষ্প্রতিভ তারাই সেটাকে ঠেকাতে চায় এবং যেহেতু তারা দলে ভারী এবং তাদের অসাড়তা ঘুচতে অনেক দেরি হয় এই কারণেই প্রতিভার ভাগ্যে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ থাকে। তাই বলি, সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।

আরো একটা শ্রেণীবিচারের কথা এই উপলক্ষে আমার মনে পড়ল। মনে পড়বার কারণ এই যে, কিছুদিন পূর্বেই আমার যোগাযোগ উপন্যাসের কুমুর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কোনো লেখিকা আমাকে পত্র লিখেছেন। তাতে বুঝতে পারা গেল, সাহিত্যে নারীকেও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে দাঁড় করিয়ে দেখবার একটা উত্তেজনা সম্প্রতি প্রবল হয়ে উঠেছে। যেমন আজকাল তরুণবয়স্কের দল হঠাৎ ব্যক্তির সীমা অতিক্রম ক'রে দলপতিদের চাটূক্তির চোটে বিনামূল্যে একটা অত্যন্ত উচ্চ এবং বিশেষ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, নারীদেরও সেই দশা। সাহিত্যের নারীতে নারীত্ব-নামক একটা শ্রেণীগত সাধারণ গুণ আছে কি না, এই তর্কটা সাহিত্যবিচারে প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করছে। এরই ফলে কুমু ব্যক্তিগত ভাবে সম্পূর্ণ কুমু কি না এই সাহিত্যসংগত প্রশ্নটা কারও কারও লেখনীতে বদলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কুমু মানবসমাজে নারী-নামক জাতির প্রতিনিধির পদ নিতে পারছে কি না— অর্থাৎ তাকে নিয়ে সমস্ত নারীপ্রকৃতি উৎকর্ষ স্থাপন করা হয়েছে কি না। মানবপ্রকৃতির যা-কিছু সাধারণ গুণ তারই প্রতি লক্ষ মনোবিজ্ঞানের, আর ব্যক্তিবিশেষের যে অনন্যসাধারণ প্রকৃতি তারই প্রতি লক্ষ সাহিত্যের। অবশ্য, এ কথা বলাই বাহুল্য, নারীকে আঁকতে গিয়ে তাকে অ-নারী ক'রে আঁকা পাগলামি। বস্তুত, সে কথা আলোচনা করাই অনাবশ্যক। সাহিত্যে কুমুর যদি কোনো আদর হয় তো সে হবে সে ব্যক্তিগত কুমু ব'লেই, সে নারীশ্রেণীর প্রতিনিধি ব'লে নয়।

কথা উঠেছে, সাহিত্যবিচারে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি শ্রদ্ধেয় কি না। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আলোচ্য এই— কী সংগ্রহ করার জন্যে বিশ্লেষণ। আলোচ্য সাহিত্যের উপাদান-অংশগুলি ? আমি বলি সেটা অত্যাবশ্যক নয় ; কারণ, উপাদানকে একত্র করার দ্বারা সৃষ্টি হয় না। সমগ্র সৃষ্টি আপন সমস্ত অংশের চেয়ে অনেক বেশি। সেই বেশিটুকু পরিমাণগত নয়। তাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, সেটা হল রূপরহস্য, সকল সৃষ্টির মূলে প্রচ্ছন্ন। প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে সেটাই হল অদ্বৈত, বহুর মধ্যে সে ব্যাপ্ত, অথচ বহুর দ্বারা তার পরিমাপ হয় না। সে স-কল অর্থাৎ তার মধ্যে সমস্ত অংশ আছে, তবু সে নিষ্কল, তাকে অংশে খণ্ডিত করলেই সে থাকে না। অতএব সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্রদৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। আজকাল সাইকো-অ্যানালিসিসের বুলি অনেকের মনকে পেয়ে বসে। সৃষ্টিতে

অবিশ্লেষ্য সমগ্রতার গৌরব খর্ব করবার মনোভাব জেগে উঠেছে। মানুষের চিত্তের উপকরণে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে, কাম ক্রোধ অহংকার ইত্যাদি। ছিন্ন ক'রে দেখলে যে বস্তুপরিচয় পাওয়া যায় সম্মিলিত আকারে তা পাওয়া যায় না। প্রবৃত্তিগুলির গূঢ় অস্তিত্ব দ্বারা নয়, সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অভাবনীয় যোগসাধনের দ্বারাই চরিত্রের বিকাশ। সেই যোগের রহস্যকে আজকাল অংশের বিশ্লেষণ লঙ্ঘন করবার উপক্রম করছে। বুদ্ধদেবের চরিত্রের বিচিত্র উপাদানের মধ্যে কামপ্রবৃত্তিও ছিল, তাঁর যৌবনের ইতিহাস থেকে সেটা প্রমাণ করা সহজ। যেটা থাকে সেটা যায় না, গেলে তাতে স্বভাবের অসম্পূর্ণতা ঘটে। চরিত্রের পরিবর্তন বা উৎকর্ষ ঘটে বর্জনের দ্বারা নয়, যোগের দ্বারা। সেই যোগের দ্বারা যে-পরিচয় সমগ্রভাবে প্রকাশমান সেইটেই হল বুদ্ধদেবের চরিত্রগত সত্য। প্রচ্ছন্নতার মধ্য থেকে বিশেষ উপকরণ টেনে বের করে তাঁর সত্য পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভেদ নেই, সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে। সন্দেশে কার্বন আছে, নাইট্রোজেন আছে, কিন্তু সেই উপকরণের দ্বারা সন্দেশের চরম বিচার করতে গেলে বহুতর বিসদৃশ ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাকে এক শ্রেণীতে ফেলতে হয়; কিন্তু এতে করেই সন্দেশের চরম পরিচয় আচ্ছন্ন হয়। কার্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরা পড়া সত্ত্বেও জোর ক'রে বলতে হবে যে, সন্দেশ পচা মাংসের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। কেননা, উভয়ে উপাদানে এক কিন্তু প্রকাশে স্বতন্ত্র। চতুর লোক বলবে, প্রকাশটা চাতুরী; তার উত্তরে বলতে হয়, বিশ্বজগৎটাই সেই চাতুরী।

তা হোক, তবু রসভোগকে বিশ্লেষণ করা চলে। মনে করা যাক, আম। যে-ভাবে সেটা ভোগ্য সে-ভাবে উদ্ভিদবিজ্ঞানের সে অতীত। ভোগ সম্বন্ধে তার রমণীয়তা ব্যাখ্যা করবার উপলক্ষে বলা চলে যে, এই ফলে সব-প্রথমে যেটা মনকে টানে সে হচ্ছে ওর প্রাণের লাবণ্য; এইখানে সন্দেশের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠতা। আমের যে বর্ণমাধুরী তা জীববিধাতার প্রেরণায় আমের অন্তর থেকে উদ্ভাসিত, সমস্ত ফলটির সঙ্গে সে অবিচ্ছেদে এক। চোখ ভোলাবার জন্যে সন্দেশে জাফরান দিয়ে রঙ ফলানো যেতে পারে; কিন্তু সেটা জড়পদার্থের বর্ণযোজন, প্রাণপদার্থের বর্ণ-উদ্ভাবনা নয়। তার সঙ্গে আমের আছে স্পর্শের সৌকুমার্য, সৌরভের সৌজন্য। তার পরে তার আচ্ছাদন উদ্‌ঘাটন করলে প্রকাশ পায় তার রসের অকৃপণতা। এইরূপে আম সম্বন্ধে রসভোগের বিশেষত্বটিকে বুঝিয়ে বলাকে বলব আমের রসবিচার। এইখানে স্বাদেশিক এসে পরিচয়পত্রে বলতে পারেন, আম প্রকৃত ভারতবর্ষীয়, সেটা ওর প্রচুর ত্যাগের দাক্ষিণ্যমূলক সাত্ত্বিকতায় প্রমাণ হয়; আর র‍্যাস্‌পবেরি গুস্‌বেরি বিলাতি, কেননা তার রসের ভাগ তার বীজের ভাগের চেয়ে বেশি নয়, পরের তুষ্টির চেয়ে ওরা আপন প্রয়োজনকেই বড়ো করেছে, অতএব ওরা রাজসিক। এই কথাটা দেশাত্মবোধের অনুকূল কথা হতে পারে; কিন্তু, এইরকমের অমূলক কি সমূলক তত্ত্বালোচনা রসশাস্ত্রে সম্পূর্ণই অসংগত।

সংক্ষেপে আমার কথাটা দাঁড়ালো এই— সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিংবা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে। সেরকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।

কার্তিক ১৩৩৬

আধুনিক কাব্য

মডার‍্ন্‌ বিলিতি কবিদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে। কাজটা সহজ নয়। কারণ, পাঁজি মিলিয়ে মডার‍্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।

নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার‍্ন্‌। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।

বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হল তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক ব'লে গণ্য করা চলত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, কবি বার‍্ন্‌স্‌ থেকে তার শুরু। এই ঝোঁকে একসঙ্গে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়েছিলেন। যথা ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্‌ কোল্‌রিজ শেলি কীট্‌স্‌।

সমাজে সর্বসাধারণের প্রচলিত ব্যবহাররীতিকে আচার বলে। কোনো কোনো দেশে এই আচার ব্যক্তিগত অভিরুচির স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাখে। সেখানে মানুষ হয়ে ওঠে পুতুল, তার চালচলন হয় নিখুঁত কেতা-দুরস্ত। সেই সনাতন অভ্যস্ত চালকেই সমাজের লোকে খাতির করে। সাহিত্যকেও এক-এক সময়ে দীর্ঘকাল আচারে পেয়ে বসে— রচনায় নিখুঁত রীতির ফোঁটাতিলক কেটে চললে লোকে তাকে বলে সাধু। কবি বার‍্ন্‌সের পরে ইংরেজি কাব্যে যে যুগ এল সে-যুগে রীতির বেড়া ভেঙে মানুষের মর্জি এসে উপস্থিত। 'কুমুদকহ্লারসেবিত সরোবর' হচ্ছে সাধু-কারখানায় তৈরি সরকারি ঠুলির বিশেষ ছিদ্র দিয়ে দেখা সরোবর। সাহিত্যে কোনো সাহসিক সেই ঠুলি খুলে ফেলে, বুলি সরিয়ে, পুরো চোখ দিয়ে যখন সরোবর দেখে তখন ঠুলির সঙ্গে সঙ্গে সে এমন একটা পথ খুলে দেয় যাতে ক'রে সরোবর নানা দৃষ্টিতে নানা খেয়ালে নানাবিধ হয়ে ওঠে। সাধু বিচারবুদ্ধি তাকে বলে, 'ধিক্‌।'

আমরা যখন ইংরেজি কাব্য পড়া শুরু করলুম তখন সেই আচার-ভাঙা ব্যক্তিগত মর্জিকেই সাহিত্য স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। এডিন্‌বরা রিভিয়ুতে যে-তর্জনধ্বনি উঠেছিল সেটা তখন শান্ত। যাই হোক, আমাদের সেকাল আধুনিকতার একটা যুগান্তকাল।

তখনকার কালে কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ হচ্ছে ব্যক্তিগত খুশির দৌড়। ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্‌ বিশ্বপ্রকৃতিতে যে আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করেছিলেন সেটাকে প্রকাশ করেছিলেন নিজের ছাঁদে। শেলির ছিল প্ল্যাটোনিক ভাবুকতা, তার সঙ্গে রাষ্ট্রগত ধর্মগত সকলপ্রকার স্থূল বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রূপসৌন্দর্যের ধ্যান ও সৃষ্টি নিয়ে কীট্‌সের কাব্য। ঐ যুগে বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাঁক ফিরিয়েছিল।

কবিচিত্তে যে-অনুভূতি গভীর, ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রেম আপনাকে সজ্জিত করে। অন্তরে তার যে আনন্দ বাইরে সেটাকে সে প্রমাণ করতে চায় সৌন্দর্যে। মানুষের একটা কাল গেছে যখন সে অবসর নিয়ে নিজের সম্পর্কীয় জগৎটাকে নানারকম করে সাজিয়ে তুলত। বাইরের সেই সজ্জাই তার ভিতরের অনুরাগের প্রকাশ। যেখানে অনুরাগ সেখানে উপেক্ষা থাকতে পারে না। সেই যুগে নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলিকে মানুষ নিজের রুচির আনন্দে বিচিত্র ক'রে তুলেছে। অন্তরের প্রেরণা তার আঙুলগুলিকে সৃষ্টিকুশলী করেছিল। তখন দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘটিবাটি গৃহসজ্জা দেহসজ্জা রঙে রূপে মানুষের হৃদয়কে জড়িয়ে দিয়েছিল তার বহিরুপকরণে। মানুষ কত অনুষ্ঠান সৃষ্টি করেছিল জীবনযাত্রাকে রস দেবার জন্যে। কত নূতন নূতন সুর; কাঠে ধাতুতে মাটিতে পাথরে রেশমে পশমে তুলোয় কত নূতন নূতন শিল্পকলা। সেই যুগে স্বামী তার স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছে, প্রিয়শিষ্যাললিতে কলাবিধৌ। যে দাম্পত্যসংসার রচনা করত তার রচনাকার্যের জন্য ব্যাঙ্কে জমানো টাকাটাই প্রধান জিনিস ছিল না, তার চেয়ে প্রয়োজন ছিল ললিতকলার। যেমন-তেমন ক'রে মালা গাঁথলে চলত না; চীনাংশুকের অঞ্চলপ্রান্তে চিত্রবয়ন জানত

তরুণীরা ; নাচের নিপুণতা ছিল প্রধান শিক্ষা ; তার সঙ্গে ছিল বীণা বেণু, ছিল গান। মানুষে মানুষে যে-সম্বন্ধ সেটার মধ্যে আন্তিকতার সৌন্দর্য ছিল।

প্রথম বয়সে যে ইংরেজ কবিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখছিলেন ; জগৎটা হয়েছিল তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা মত ও রুচি সেই বিশ্বকে শুধু যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়, তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত। ওয়ার্ডস্বাথের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ড্স্বার্থীয়, শেলির ছিল শেলীয়, বাইরনের ছিল বাইরনিক। রচনার ইন্দ্রজালে সেটা পাঠকের ও নিজের হয়ে উঠত। বিশেষ কবির জগতে যেটা আমাদের আনন্দ দিত সেটা বিশেষ ঘরের রসের আতিথ্যে। ফুল তার আপন রঙের গন্ধের বৈশিষ্ট্যদ্বারায় মৌমাছিকে নিমন্ত্রণ পাঠায় ; সেই নিমন্ত্রণলিপি মনোহর। কবির নিমন্ত্রণেও স্বভাবতই সেই মনোহারিতা ছিল। যে-যুগে সংসারের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধটা প্রধান সে-যুগে ব্যক্তিগত আমন্ত্রণকে সযত্নে জাগিয়ে রাখতে হয় ; সে-যুগে বেশে-ভূষায় শোভনরীতিতে নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার একটা যেন প্রতিযোগিতা থাকে।

দেখা যাচ্ছে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজি কাব্যে পূর্ববর্তীকালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল। তখনকার কালে সেইটেই হল আধুনিকতা।

কিন্তু, আজকের দিনে সেই আধুনিকতাকে মধ্যভিক্টোরীয় প্রাচীনতা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে পাশের কামরায় আরাম-কেদারায় শুইয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনকার দিনে ছাঁটা কাপড় ছাঁটা চুলের খট্‌খটে আধুনিকতা। ক্ষণে ক্ষণে গালে পাউডার, ঠোঁটে রঙ লাগানো হয় না তা নয় ; কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে, উদ্ধত অসংকোচে। বলতে চায় মোহ জিনিসটাতে আর-কোনো দরকার নেই। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে পদে পদে মোহ ; সেই মোহের বৈচিত্র্যই নানা রূপের মধ্য দিয়ে নানা সুর বাজিয়ে তোলে। কিন্তু, বিজ্ঞান তার নাড়ীনক্ষত্র বিচার ক'রে দেখেছে ; বলছে, মূলে মোহ নেই, আছে কার্বন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিয়লজি, আছে সাইকলজি। আমরা সেকালের কবি, আমরা এইগুলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকেই জানতুম মুখ্য। তাই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দে বন্ধে ভাষায় ভঙ্গিতে মায়া বিস্তার ক'রে মোহ জন্মাবার চেষ্টা করেছি, এ কথা কবুল করতেই হবে। ঈশারা-ইঙ্গিতে কিছু লুকোচুরি ছিল ; লজ্জার যে আবরণ সত্যের বিরুদ্ধ নয়, সত্যের আভরণ, সেটাকে ত্যাগ করতে পারি নি। তার ঈষৎ বাষ্পের ভিতর দিয়ে যে রঙিন আলো এসেছে সেই আলোতে উষা ও সন্ধ্যার একটি রূপ দেখেছি, নববধূর মতো তা সকরুণ। আধুনিক দুঃশাসন জনসভায় বিশ্বদ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে লেগেছে ; ও দৃশ্যটা আমাদের অভ্যস্ত নয়। সেই অভ্যাসপীড়ার জন্যেই কি সংকোচ লাগে। এই সংকোচের মধ্যে কোনো সত্য কি নেই। সৃষ্টিতে যে-আবরণ প্রকাশ করে, আচ্ছন্ন করে না, তাকে ত্যাগ করলে সৌন্দর্যকে কি নিঃস্ব হতে হয় না।

কিন্তু, আধুনিক কালের মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়েরও অভাব। জীবিকা জিনিসটা জীবনের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। তাড়া-লাগানো যন্ত্রের ভিড়ের মধ্যেই মানুষের হু হু ক'রে কাজ, হুড়মুড় ক'রে আমোদ-প্রমোদ। যে-মানুষ একদিন রয়ে-বসে আপনার সংসারকে আপনার ক'রে সৃষ্টি করত সে আজ কারখানার উপর বরাত দিয়ে প্রয়োজনের মাপে তড়িঘড়ি একটা সরকারি আদর্শে কাজ-চালানো কাণ্ড খাড়া ক'রে তোলে। ভোজ উঠে গেছে, ভোজনটা বাকি। মনের সঙ্গে মিল হল কি না সে কথা ভাববার তাগিদ নেই, কেননা মন আছে অতি প্রকাণ্ড জীবিকা-জগন্নাথের রথের দড়ি ভিড়ের লোকের সঙ্গে মিলে টানবার দিকে। সংগীতের বদলে তার কণ্ঠে শোনা যায়, 'মারো ঠেলা হেঁইয়ো।' জনতার জগতেই তাকে বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়, আত্মীয়সম্বন্ধের জগতে নয়। তার চিত্তবৃত্তিটা ব্যস্তবাগীশের চিত্তবৃত্তি। হুড়োহুড়ির মধ্যে অসজ্জিত কুৎসিতকে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রবৃত্তি তার নেই।

কাব্য তা হলে আজ কোন্ লক্ষ্য ধরে কোন রাস্তায় বেরোবে। নিজের মনের মতো ক'রে পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা, এ এখন আর চলবে না। বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা-কিছু আছে তাকে

আছে ব'লেই মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অভিরুচির মূল্যে তাকে যাচাই করে না, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না। এই বৈজ্ঞানিক মনের প্রধান আনন্দ কৌতূহলে, আত্মীয়সম্বন্ধ-বন্ধনে নয়। আমি কী ইচ্ছে করি সেটা তার কাছে বড়ো নয়, আমাকে বাদ দিয়ে জিনিসটা স্বয়ং ঠিকমত কী সেইটেই বিচার্য। আমাকে বাদ দিলে মোহের আয়োজন অনাবশ্যক।

তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্যব্যবস্থায় যে-ব্যয়সংক্ষেপ চলছে তার মধ্যে সব চেয়ে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাত্র বাছাবাছি চুকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়, অতীত যুগের নেশা কাটাবার জন্যে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা। পাছে অভ্যাসের টানে বাছাই-বুদ্ধি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে এইজন্যে পাঁচিলের উপর রূঢ় কুশ্রীভাবে ভাঙা কাঁচ বসানোর চেষ্টা। একজন কবি লিখছেন : I am the greatest laugher of all। বলছেন, 'আমি সবার চেয়ে বড়ো হাসিয়ে, সূর্যের চেয়ে বড়ো, ওক গাছের চেয়ে, ব্যাঙের চেয়ে, অ্যাপলো দেবতার চেয়ে।' Than the frog and Apollo এটা হল ভাঙা কাঁচ। পাছে কেউ মনে করে কবি মিঠে ক'রে সাজিয়ে কথা কইছে। ব্যাঙ না ব'লে যদি বলা হত সমুদ্র তা হলে এখনকার যুগ আপত্তি ক'রে বলতে পারত, ওটা দস্তুরমত কবিয়ানা। হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি উলটো ছাঁদের দস্তুরমত কবিয়ানা হল ঐ ব্যাঙের কথা। অর্থাৎ, ওটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া। এইটেই হালের কায়দা।

কিন্তু, কথা এই যে, ব্যাঙ জীবটা ভদ্র কবিতায় জল-আচরণীয় নয়, এ কথা মানবার দিন গেছে। সত্যের কোঠায় ব্যাঙ অ্যাপলোর চেয়ে বড়ো বৈ ছোটো নয়। আমিও ব্যাঙকে অবজ্ঞা করতে চাই নে। এমন-কি, যথাস্থানে কবিপ্রেয়সীর হাসির সঙ্গে ব্যাঙের মক্‌মক্‌ হাসিকে এক পঙ্‌ক্তিতেও বসানো যেতে পারে, প্রেয়সী আপত্তি করলেও। কিন্তু, অতিবড়ো বৈজ্ঞানিক সাম্যতত্ত্বেও যে-হাসি সূর্যের, যে-হাসি ওক্‌বনস্পতির, যে-হাসি অ্যাপলোর, সে-হাসি ব্যাঙের নয়। এখানে ওকে আনা হয়েছে জোর ক'রে মোহ ভাঙবার জন্যে।

মোহের আবরণ তুলে দিয়ে যেটা যা সেটাকে ঠিক তাই দেখতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে মায়ার রঙে যেটা রঙিন ছিল আজ সেটা ফিকে হয়ে এসেছে ; সেই মিঠের আভাসমাত্র নিয়ে ক্ষুধা মেটে না, বস্তু চাই। 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং' বললে প্রায় বারোআনা অত্যুক্তি করা হয়। একটি আধুনিকা মেয়ে কবি গত যুগের সুন্দরীকে খুব স্পষ্ট ভাষায় যে-সম্ভাষণ করেছেন সেটাকে তর্জমা ক'রে দিই। তর্জমায় মাধুরী সঞ্চার করলে বেখাপ হবে, চেষ্টাও সফল হবে না—

তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি
যেন পুরোনো একটা যাত্রার সুর
বাজছে সেকেলে একটা সারিন্দি যন্ত্রে।
কিংবা তুমি সাবেক আমলের বৈঠকখানায়
যেন রেশমের আসবাব, তাতে রোদ পড়েছে।
তোমার চোখে আয়ুহারা মুহূর্তের
ঝরা গোলাপের পাপড়ি যাচ্ছে জীর্ণ হয়ে।
তোমার প্রাণের গন্ধটুকু অস্পষ্ট, ছড়িয়ে পড়া,
ভাঁড়ের মধ্যে ঢেকে-রাখা মাথাঘষা মসলার মতো তার ঝাঁজ।
তোমার অতিকোমল সুরের আমেজ আমার লাগে ভালো—
তোমার ওই মিলে মিশে-যাওয়া রঙগুলির দিকে তাকিয়ে আমার মন ওঠে মেতে।
আর আমার তেজ যেন টাঁকশালের নতুন পয়সা
তোমার পায়ের কাছে তাকে দিলেম ফেলে।
ধুলো থেকে কুড়িয়ে নাও,
তার ঝক্‌মকানি দেখে হয়তো তোমার মজা লাগবে।

এই আধুনিক পয়সাটার দাম কম কিন্তু জোর বেশি, আর এ খুব স্পষ্ট, টং ক'রে বেজে ওঠে হালের সুরে। সাবেক-কালের যে-মাধুরী তার একটা নেশা আছে, কিন্তু এর আছে স্পর্ধা। এর মধ্যে ঝাপসা কিছুই নেই।

এখনকার কাব্যের যা বিষয় তা লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না। তা হলে সে কিসের জোরে দাঁড়ায়। তার জোর হচ্ছে আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারেক্টার। সে বলে, 'অয়মহং ভোঃ, আম্যকে দেখো।' ঐ মেয়ে কবি, তাঁর নাম এমি লোয়েল, একটি কবিতা লিখেছেন লাল চটিজুতোর দোকান নিয়ে। ব্যাপারখানা এই যে, সন্ধ্যাবেলায় বাইরে বরফের ঝাপটা উড়িয়ে হাওয়া বইছে, ভিতরে পালিশ-করা কাচের পিছনে লম্বা সার করে ঝুলছে লাল চটিজুতোর মালা— like stalactites of blood, flooding the eyes of passers-by with dripping color, jamming their crimson reflections against the windows of cabs and tramcars, screaming their claret and salmon into the teeth of the sleet, plopping their little round maroon lights upon the tops of umbrellas. The row of white, sparkling shop fronts is gashed and bleeding, it bleeds red slippers। সমস্তটা এই চটিজুতো নিয়ে।

একেই বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক, impersonal। ঐ চটিজুতোর মালার উপর বিশেষ আসক্তির কোনো কারণ নেই, না খরিদ্দার না দোকানদার ভাবে। কিন্তু, দাঁড়িয়ে দেখতে হল, সমস্ত ছবির একটা আত্মতা যেই ফুটে উঠল অমনি তার তুচ্ছতা আর রইল না। যারা মানে-কুড়ানিয়া তারা জিজ্ঞাসা করবে, 'মানে কী হল, মশায়। চটিজুতো নিয়ে এত হল্লা কিসের, নাহয় হলই বা তার রঙ লাল।' উত্তরে বলতে হয়, 'চেয়েই দেখো-না।' 'দেখে লাভ কী' তার কোনো জবাব নাই।

নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) সম্বন্ধে এজ্‌রা পৌন্ডের একটি কবিতা আছে। বিষয়টি এই যে, একটি মেয়ে চলেছিল রাস্তা দিয়ে, একটা ছোটো ছেলে, তালি দেওয়া কাপড় পরা, তার মন উঠল জেগে, সে থাকতে পারল না; বলে উঠল, "দেখ্ চেয়ে রে, কী সুন্দর।" এই ঘটনার তিন বৎসর পরে ঐ ছেলেটারই সঙ্গে আবার দেখা। সে বছর জালে সার্ডিন মাছ পড়েছিল বিস্তর। বড়ো বড়ো কাঠের বাক্সে ওর দাদাখুড়োরা মাছ সাজাচ্ছিল, ব্রেস্‌চিয়ার হাটে বিক্রি করতে পাঠাবে। ছেলেটা মাছ ঘাঁটাঘাঁটি করে লাফালাফি করতে লাগল। বুড়োরা ধমক দিয়ে বললে, 'স্থির হয়ে বোস্।' তখন সে সেই সাজানো মাছগুলোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে তৃপ্তির সঙ্গে ঠিক সেই একই কথা আপন মনে বলে উঠল, 'কী সুন্দর।' কবি বলছেন, 'শুনে I was mildly abashed।'

সুন্দরী মেয়েকেও দেখো, সার্ডিন মাছকেও; একই ভাষায় বলতে কুণ্ঠিত হোয়ো না, কী সুন্দর। এ দেখা নৈর্ব্যক্তিক— নিছক দেখা— এর পঙ্‌ক্তিতে চটিজুতোর দোকানকেও বাদ দেওয়া যায় না।

কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলংকারের উপর নয়। কেননা, অলংকারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে।

সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বেই এই আধুনিকতা ছবিতে ভর করেছিল। চিত্রকলা যে ললিতকলার অঙ্গ, এই কথাটাকে অস্বীকার করবার জন্যে সে বিবিধপ্রকারে উৎপাত শুরু করে দিলে। সে বললে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা; তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে। নিজের সম্বন্ধে সেই চেহারা আর-কিছু পরিচয় দিতে চায় না, কেবল জোরের সঙ্গে বলতে চায় 'আমি দ্রষ্টব্য'। তার এই দ্রষ্টব্যতার জোর হাবভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলনবিশির দ্বারা নয়, আত্মগত সৃষ্টিসত্যের দ্বারা। এই সত্য ধর্মনৈতিক নয়, ব্যবহারনৈতিক নয়, ভাবব্যঞ্জক নয়, এ সত্য সৃষ্টিগত। অর্থাৎ, সে হয়ে উঠেছে ব'লেই তাকে স্বীকার করতে হয়। যেমন আমরা ময়ূরকে মেনে নেই, শকুনিকেও মানি, শুয়োরকে অস্বীকার করতে পারি নে, হরিণকেও তাই।

কেউ সুন্দর, কেউ অসুন্দর ; কেউ কাজের, কেউ অকাজের ; কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো ছুতোয় কাউকে বাতিল করে দেওয়া অসম্ভব। সাহিত্যে, চিত্রকলাতেও সেই রকম। কোনো রূপের সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে তো আর-কোনো জবাবদিহি নেই ; যদি না হয়ে থাকে, যদি তার সত্তার জোর না থাকে, শুধু থাকে ভাবলালিত্য, তা হলে সেটা বর্জনীয়।

এইজন্যে আজকের দিনে যে-সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেছে, সে সাবেক-কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই। এলিয়টের কাব্য এইরকম হালের কাব্য, ব্রিজেসের কাব্য তা নয়। এলিয়ট লিখছেন—

এ-ঘরে ও-ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসর গন্ধ,
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।
এখন ছ'টা—
ধোঁয়াটে দিন, পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেকল।
বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে
পোড়ো জমি থেকে ঝুলমাখা শুক্‌নো পাতা
আর ছেঁড়া খবরের কাগজ।
ভাঙা সার্শি আর চিম্‌নির চোঙের উপর
বৃষ্টির ঝাপট লাগে,
আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়িয়ে এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া,
ভাপ উঠছে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুকছে খুর।

তার পরে বাসি বিয়ার-মদের গন্ধ-ওয়ালা কাদামাখা সকালের বর্ণনা। এই সকালে একজন মেয়ের উদ্দেশে বলা হচ্ছে—

বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েছ কম্বলটা,
চিৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,
কখনো ঝিমচ্ছ, দেখছ রাত্রিতে প্রকাশ পাচ্ছে
হাজার খেলো খেয়ালের ছবি
যা দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরি।

তার পরে পুরুষটার খবর এই—

His soul stretched tight across the skies
That fade behind a city block,
Or trampled by insistent feet
At four and five and six o'clock;
And short square fingers stuffing pipes,
And evening newspapers, and eyes
Assured of certain certainties,
The conscience of a blackened street
Impatient to assume the world.

এই ধোঁয়াটে, এই কাদামাখা, এই নানা বাসি গন্ধ ও ছেঁড়া আবর্জনাওয়ালা নিতান্ত খেলো সন্ধ্যা. খেলো সকালবেলার মাঝখানে কবির মনে একটা বিপরীত জাতের ছবি জাগল। বললেন—

I am moved by fancies that are curled
Around these images, and cling;
The notion of some infinitely gentle
Infinitely suffering thing.

এইখানেই অ্যাপলোর সঙ্গে ব্যাঙের মিল আর টিকল না। এইখানে কূপমণ্ডুকের মক্‌মক্‌ শব্দ অ্যাপলোর হাসিকে পীড়া দিল। একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কবি নিতান্তই বৈজ্ঞানিকভাবে নির্বিকার নন। খেলো সংসারটার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এই খেলো সংসারের বর্ণনার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। তাই কবিতাটির উপসংহারে যে কথা বলেছেন সেটা এত কড়া—

মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে হেসে নাও।
দেখো, সংসারটা পাক খাচ্ছে যেন বুড়িগুলো
ঘুঁটে কুড়োচ্ছে পোড়ো জমি থেকে।

এই ঘুঁটে-কুড়োনো বুড়ো সংসারটার প্রতি কবির অনভিরুচি স্পষ্টই দেখা যায়। সাবেক-কালের সঙ্গে প্রভেদটা এই যে, রঙিন স্বপ্ন দিয়ে মনগড়া সংসারে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার ইচ্ছেটা নেই। কবি এই কাদা-ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে দিয়েই কাব্যকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছেন, ধোপ-দেওয়া কাপড়টার উপর মমতা না ক'রে। কাদার উপর অনুরাগ আছে ব'লে নয়, কিন্তু কাদার সংসারে চোখ চেয়ে কাদাটাকেও জানতে হবে, মানতে হবে ব'লেই। যদি তার মধ্যেও অ্যাপলোর হাসি কোথাও ফোটে সে তো ভালোই, যদি না'ও ফোটে, তা হলে ব্যাঙের লম্ফমান অট্টহাস্যকে উপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। ওটাও একটা পদার্থ তো বটে— এই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে ওর দিকেও কিছুক্ষণ চেয়ে দেখা যায়, এর তরফেও কিছু বলবার আছে। সুসজ্জিত ভাষার বৈঠকখানায় ঐ ব্যাঙটাকে মানাবে না, কিন্তু অধিকাংশ জগৎসংসার ঐ বৈঠকখানার বাইরে।

সকালবেলায় প্রথম জাগরণ। সেই জাগরণে প্রথমটা নিজের উপলব্ধি, চৈতন্যের নূতন চাঞ্চল্য। এই অবস্থাটাকে রোমান্টিক বলা যায়। সদ্য-জাগা চৈতন্য বাইরে নিজেকে বাজিয়ে দেখতে বেরোয়। মন বিশ্বসৃষ্টিতে এবং নিজের রচনায় নিজের চিন্তাকে, নিজের বাসনাকে রূপ দেয়। অন্তরে যেটাকে চায় বাইরে সেটাকে নানা মায়া দিয়ে গড়ে। তার পরে আলো তীব্র হয়, অভিজ্ঞতা কঠোর হতে থাকে, সংসারের আন্দোলনে অনেক মায়াজাল ছিন্ন হয়ে যায়। তখন অনাবিল আলোকে, অনাবৃত আকাশে, পরিচয় ঘটতে থাকে স্পষ্টতর বাস্তবের সঙ্গে। এই পরিচিত বাস্তবকে ভিন্ন কবি ভিন্নরকম ক'রে অভ্যর্থনা করে। কেউ দেখে এ'কে অবিশ্বাসের চোখে বিদ্রোহের ভাবে; কেউ-বা এ'কে এমন অশ্রদ্ধা করে যে, এর প্রতি রূঢ়ভাবে নির্লজ্জ ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। আবার খর আলোকে অতিপ্রকাশিত এর যে-আকৃতি তারও অন্তরে কেউ-বা গভীর রহস্য উপলব্ধি করে; মনে করে না, গূঢ় ব'লে কিছুই নেই; মনে করে না, যা প্রতীয়মান তাতেই সব-কিছু নিঃশেষে ধরা পড়ছে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত কর্কশ, এত নিষ্ঠুর হয়েছিল, তার বহুযুগ প্রচলিত যত-কিছু আদব ও আব্রু তা সাংঘাতিক সংকটের মধ্যে এমন অকস্মাৎ ছারখার হয়ে গেল; দীর্ঘকাল যে-সমাজস্থিতিকে একান্ত বিশ্বাস ক'রে সে নিশ্চিন্ত ছিল তা এক মুহূর্তে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেল; মানুষ যে-সকল শোভনরীতি কল্যাণনীতিকে আশ্রয় করেছিল তার বিধ্বস্ত রূপ দেখে এতকাল যা-কিছুকে সে ভদ্র ব'লে জানত তাকে দুর্বল ব'লে, আত্মপ্রতারণার কৃত্রিম উপায় ব'লে, অবজ্ঞা করাতেই যেন সে একটা উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগল; বিশ্বনিন্দুকতাকেই সে সত্যনিষ্ঠতা ব'লে আজ ধরে নিয়েছে।

কিন্তু, আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ি তাল-ঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করি নে। ইনফ্লুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বলব না, ইনফ্লুয়েঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এহ বাহ্য। ইনফ্লুয়েঞ্জাটার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব।

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ; এই

মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।

কিন্তু, এ'কে আধুনিক বলা নিতান্ত বাজে কথা। এই-যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারই। চীনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশি হল। তিনি ছিলেন আধুনিক ; তাঁর ছিল বিশ্বকে সদ্য-দেখা চোখ। চারটি লাইনে সাদা ভাষায় তিনি লিখছেন—

এই সবুজ পাহাড়গুলোর মধ্যে থাকি কেন।
প্রশ্ন শুনে হাসি পায়, জবাব দিই নে। আমার মন নিস্তব্ধ।
যে আর-এক আকাশে আর-এক পৃথিবীতে বাস করি—
সে জগৎ কোনো মানুষের না।
পীচ গাছে ফুল ধরে, জলের স্রোত যায় বয়ে।

আর-একটা ছবি—

নীল জল··· নির্মল চাঁদ,
চাঁদের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেছে।
ওই শোনো, পানফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল ;
তারা বাড়ি ফিরছে রাত্রে গান গাইতে গাইতে।

আর-একটা—

নগ্ন দেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে।
এতই আলস্য যে সাদা পালকের পাখাটা নড়াতে গা লাগছে না।
টুপিটা রেখে দিয়েছি ওই পাহাড়ের আগায়,
পাইন গাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া আসছে
আমার খালি মাথার 'পরে।

একটি বধূর কথা—

আমার ছাঁটা চুল ছিল খাটো, তাতে কপাল ঢাকত না।
আমি দরজার সামনে খেলা করছিলুম, তুলছিলুম ফুল।
তুমি এলে আমার প্রিয়, বাঁশের খেলা-ঘোড়ায় চ'ড়ে,
কাঁচা কুল ছড়াতে ছড়াতে।
চাঙ্কানের গলিতে আমরা থাকতুম কাছে কাছে।
আমাদের বয়স ছিল অল্প, মন ছিল আনন্দে ভরা।
তোমার সঙ্গে বিয়ে হল যখন আমি পড়লুম চোদ্দয়।
এত লজ্জা ছিল যে হাসতে সাহস হত না,
অন্ধকার কোণে থাকতুম মাথা হেঁট ক'রে,
তুমি হাজার বার ডাকলেও মুখ ফেরাতুম না।
পনেরো বছরে পড়তে আমার ভুরুকুটি গেল ঘুচে,
আমি হাসলুম।···
আমি যখন ষোলো তুমি গেলে দূর প্রবাসে—
চ্যুটাঙের গিরিপথে, ঘূর্ণিজল আর পাথরের ঢিবির ভিতর দিয়ে।
পঞ্চম মাস এল, আমার আর সহ্য হয় না।
আমাদের দরজার সামনে রাস্তা দিয়ে তোমাকে যেতে দেখেছিলুম,
সেখানে তোমার পায়ের চিহ্ন সবুজ শ্যাওলায় চাপা পড়ল—
সে শ্যাওলা এত ঘন যে ঝাঁট দিয়ে সাফ করা যায় না।

অবশেষে শরতের প্রথম হাওয়ায় তার উপরে জমে উঠল ঝরা পাতা।
এখন অষ্টম মাস, হলদে প্রজাপতিগুলো
আমাদের পশ্চিম-বাগানের ঘাসের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে; ভয় হয় পাছে আমার রূপ যায় ম্লান হয়ে।
ওগো, যখন তিনটে জেলা পার হয়ে তুমি ফিরবে
আগে থাকতে আমাকে খবর পাঠাতে ভুলো না।
চাঙফেঙ্শার দীর্ঘ পথ বেয়ে আমি আসব, তোমার সঙ্গে দেখা হবে।
দূর ব'লে একটুও ভয় করব না।

এই কবিতায় সেন্টিমেন্টের সুর একটুও চড়ানো হয় নি, তেমনি তার 'পরে বিদ্রূপ বা অবিশ্বাসের কটাক্ষপাত দেখছি নে। বিষয়টা অত্যন্ত প্রচলিত, তবু এতে রসের অভাব নেই। স্টাইল বেঁকিয়ে দিয়ে একে ব্যঙ্গ করলে জিনিসটা আধুনিক হত। কেননা, সবাই যাকে অনায়াসে মেনে নেয় আধুনিকেরা কাব্যে তাকে মানতে অবজ্ঞা করে। খুব সম্ভব, আধুনিক কবি ঐ কবিতার উপসংহারে লিখত, স্বামী চোখের জল মুছে পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে গেল, আর মেয়েটি তখনি লাগল শুকনো চিংড়িমাছের বড়া ভাজতে। কার জন্যে। এই প্রশ্নের উত্তরে থাকত দেড় লাইন ভরে ফুটকি। সেকেলে পাঠক জিজ্ঞাসা করত, 'এটা কী হল।' একেলে কবি উত্তর করত, 'এমনতরো হয়েই থাকে।' 'অন্যটাও তো হয়।' 'হয় বটে, কিন্তু বড়ো বেশি ভদ্র। কিছু দুর্গন্ধ না থাকলে ওর শৌখিন ভাব ঘোচে না, আধুনিক হয় না।' সেকালে কাব্যের বাবুগিরি ছিল, সৌজন্যের সঙ্গে জড়িত। একেলে কাব্যেরও বাবুগিরি আছে, সেটা পচা মাংসের বিলাসে।

চীনে কবিতাটির পাশে বিলিতি কবিদের আধুনিকতা সহজ ঠেকে না। সে আবিল। তাদের মনটা পাঠককে কনুই দিয়ে ঠেলা মারে। তারা যে-বিশ্বকে দেখছে এবং দেখাচ্ছে সেটা ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা, ধুলো-ওড়া। ওদের চিত্ত যে আজ অসুস্থ, অসুখী, অব্যবস্থিত। এ অবস্থায় বিশ্ববিষয় থেকে ওরা বিশুদ্ধভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না। ভাঙা প্রতিমার কাঠ খড় দেখে ওরা অট্টহাস্য করে ; বলে, আসল জিনিসটা এতদিনে ধরা পড়েছে। সেই ঢেলা, সেই কাঠখড়গুলোকে খোঁচা মেরে কড়া কথা বলাকেই ওরা বলে খাঁটি সত্যকে জোরের সঙ্গে স্বীকার করা।

এই প্রসঙ্গে এলিয়টের একটি কবিতা মনে পড়ছে। বিষয়টি এই : বুড়ি মারা গেল, সে বড়ো ঘরের মহিলা। যথানিয়মে ঘরের ঝিলিমিলিগুলো নাবিয়ে দেওয়া, শববাহকেরা এসে দস্তুরমত সময়োচিত ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত। এ দিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড়ো-খান্‌সামা ডিনার-টেবিলের ধারে বসে, বাড়ির মেজো-ঝিকে কোলের উপর টেনে নিয়ে।

ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেকেলে মেজাজের লোকের মনে প্রশ্ন উঠবে, তা হলেই কি যথেষ্ট হল। এ কবিতাটা লেখবার গরজ কী নিয়ে, এটা পড়তেই বা যাব কেন। একটি মেয়ের সুন্দর হাসির খবর কোনো কবির লেখায় যদি পাই তা হলে বলব, এ খবরটা দেবার মতো বটে। কিন্তু, তার পরেই যদি বর্ণনায় দেখি, ডেন্টিস্ট্ এল, সে তার যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েছে, তা হলে বলতে হবে, নিশ্চয়ই এটাও খবর বটে কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার মতো খবর নয়। যদি দেখি কারও এই কথাটা প্রচার করতেই বিশেষ ঔৎসুক্য, তা হলে সন্দেহ করব, তারও মেজাজে পোকা পড়েছে। যদি বলা হয়, আগেকার কবিরা বাছাই ক'রে কবিতা লিখতেন, অতি-আধুনিকরা বাছাই করেন না, সে কথা মানতে পারি নে ; এঁরাও বাছাই করেন। তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই, আর শুকনো পোকায়-খাওয়া ফুল বাছাইও বাছাই। কেবল তফাত এই যে, এঁরা সর্বদাই ভয় করেন পাছে এঁদের কেউ বদনাম দেয় যে এঁদের বাছাই করার শখ আছে। অঘোরপন্থীরা বেছে বেছে কুৎসিত জিনিস খায়, দূষিত জিনিস ব্যবহার করে, পাছে এটা প্রমাণ হয় ভালো জিনিসে তাদের পক্ষপাত। তাতে ফল হয়, অ-ভালো জিনিসেই তাদের পক্ষপাত পাকা হয়ে ওঠে। কাব্যে অঘোরপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয়, তা হলে শুচি জিনিসে যাদের স্বাভাবিক রুচি তারা

যাবে কোথায়। কোনো কোনো গাছে ফুলে পাতায় কেবলই পোকা ধরে, আবার অনেক গাছে ধরে না— প্রথমটাকেই প্রাধান্য দেওয়াকেই কি বাস্তব-সাধনা ব'লে বাহাদুরি করতে হবে।

একজন কবি একটি সম্রান্ত ভদ্রলোকের বর্ণনা করছেন—

রিচার্ড কোডি যখন শহরে যেতেন
পায়ে-চলা পথের মানুষ আমরা তাকিয়ে থাকতুম তাঁর দিকে।
ভদ্র যাকে বলে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত,
ছিপছিপে যেন রাজপুত্র।
সাদাসিধে চালচলন, সাদাসিধে বেশভূষা—
কিন্তু যখন বলতেন 'গুড্ মর্নিং', আমাদের নাড়ী উঠত চঞ্চল হয়ে।
চলতেন যখন ঝলমল করত।
ধনী ছিলেন অসম্ভব।
ব্যবহারে প্রসাদগুণ ছিল চমৎকার।
যা-কিছু এঁর চোখে পড়ত মনে হত,
আহা, আমি যদি হতুম ইনি।
এ দিকে আমরা যখন মরছি খেটে খেটে,
তাকিয়ে আছি কখন জ্বলবে আলো,
ভোজনের পালায় মাংস জোটে না,
গাল পাড়ছি মোটা রুটিকে—
এমন সময় একদিন শান্ত বসন্তের রাত্রে
রিচার্ড কোডি গেলেন বাড়িতে,
মাথার মধ্যে চালিয়ে দিলেন এক গুলি।

এই কবিতার মধ্যে আধুনিকতার ব্যঙ্গকটাক্ষ বা অট্টহাস্য নেই, বরঞ্চ কিছু করুণার আভাস আছে। কিন্তু, এর মধ্যে একটা নীতিকথা আছে, সেটা আধুনিক নীতি। সে হচ্ছে এই যে, যা সুস্থ ব'লে সুন্দর ব'লে প্রতীয়মান তার অন্তরে কোথাও একটা সাংঘাতিক রোগ হয়তো আছে। যাকে ধনী ব'লে মনে হয় তার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ব'সে আছে উপবাসী। যাঁরা সেকেলে বৈরাগ্যপন্থী তাঁরাও এই ভাবেই কথা বলেছেন। যারা বেঁচে আছে তাদের তাঁরা মনে করিয়ে দেন, একদিন বাঁশের দোলায় চড়ে শ্মশানে যেতে হবে। য়ুরোপীয় সন্ন্যাসী উপদেষ্টারা বর্ণনা করেছেন মাটির নীচে গলিত দেহকে কেমন ক'রে পোকায় খাচ্ছে। যে দেহকে সুন্দর ব'লে মনে করি সে যে অস্থিমাংস-রসরক্তের কদর্য সমাবেশ, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের চট্‌কা ভাঙিয়ে দেবার চেষ্টা নীতিশাস্ত্রে দেখা গেছে। বৈরাগ্যসাধনার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়, এইরকম প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রতি বারে বারে অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দেওয়া। কিন্তু কবি তো বৈরাগীর চেলা নয়, সে তো অনুরাগেরই পক্ষ নিতে এসেছে। কিন্তু, এই আধুনিক যুগ কি এমনি জরাজীর্ণ যে সেই কবিকেও লাগল শ্মশানের হাওয়া— এমন কথা সে খুশি হয়ে বলতে শুরু করেছে, যাকে মহৎ ব'লে মনে করি সে ঘুণে ধরা, যাকে সুন্দর ব'লে আদর করি তারই মধ্যে অস্পৃশ্যতা?

মন যাদের বুড়িয়ে গেছে তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ স্বাভাবিকতার জোর নেই। সে মন অশুচি অসুস্থ হয়ে ওঠে। বিপরীত পন্থায় সে মন নিজের অসাড়তাকে দূর করতে চায়, গাঁজিয়ে-ওঠা পচা জিনিসের মতো যত-কিছু বিকৃতি নিয়ে সে নিজেকে ঝাঁঝিয়ে তোলে লজ্জা এবং ঘৃণা ত্যাগ ক'রে তবে তার বলিরেখাগুলোর মধ্যে হাসির প্রবাহ বইতে পারে।

১ মূল কবিতাটি হাতের কাছে না থাকাতে স্মরণ ক'রে তর্জমা করতে হল, কিছু ত্রুটি ঘটতে পারে।

মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগ বাস্তবকে সম্মান ক'রে তাকে শ্রদ্ধেয়রূপেই অনুভব করতে চেয়েছিল, এ যুগ বাস্তবকে অবমানিত ক'রে সমস্ত আব্রু ঘুচিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় ব'লে মনে করে।

বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বলো সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম্‌, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতাকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হোক, মন এমন বিগড়ে গেলে দৃষ্টি সহজ হয় না। অতএব মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগকে যদি অতিভদ্রয়ানার পাণ্ডা ব'লে ব্যঙ্গ কর তবে এডোয়ার্ডি যুগকেও ব্যঙ্গ করতে হয় উলটো বিশেষণ দিয়ে। ব্যাপারখানা স্বাভাবিক নয়, অতএব শাশ্বত নয়। সায়ান্সেই বল আর আর্টেই বল, নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন ; য়ুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েছে কিন্তু সাহিত্যে পায় নি।

বৈশাখ ১৩৩৯

সাহিত্যতত্ত্ব

আমি আছি এবং আর-সমস্ত আছে, আমার অস্তিত্বের মধ্যে এই যুগল মিলন। আমার বাইরে কিছুই যদি অনুভব না করি তবে নিজেকেও অনুভব করি নে। বাইরের অনুভূতি যত প্রবল হয় অন্তরের সত্তাবোধও তত জোর পায়।

আমি আছি, এই সত্যটি আমার কাছে চরম মূল্যবান। সেইজন্য যাতে আমার সেই বোধকে বাড়িয়ে তোলে তাতে আমার আনন্দ। বাইরের যে-কোনো জিনিসের 'পরে আমি উদাসীন থাকতে পারি নে, যাতে আমার ঔৎসুক্য অর্থাৎ যা আমার চেতনাকে জাগিয়ে রাখে, সে যতই তুচ্ছ হোক তাতেই মন হয় খুশি— তা সে হোক-না ঘুড়ি-ওড়ানো, হোক-না লাটিম-ঘোরানো। কেননা, সেই আগ্রহের আঘাতে আপনাকেই অত্যন্ত অনুভব করি।

আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র ক'রে তুলছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানা ভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেয়ে হলে মানুষকে মন-মরা করে।

শাস্ত্রে আছে, এক বললেন, বহু হব। নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। একেই বলে সৃষ্টি। আমাতে যে-এক আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায় ; উপলব্ধির ঐশ্বর্য সেই তার বহুলত্বে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে ; তারই প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে, 'আমি আছি' এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।

একলা কারাগারের বন্দীর আর-কোনো পীড়ন যদি নাও থাকে তবু আবছায়া হয়ে আসে তার আপনার বোধ, সে যেন নেই-হওয়ার কাছাকাছি আসে। 'আমি আছি' এবং 'না-আমি আছে' এই দুই নিরন্তর ধারা আমার মধ্যে ক্রমাগতই একীভূত হয়ে আমাকে সৃষ্টি করে চলেছে ; অন্তর-বাহিরের এই সম্মিলনের বাধায় আমার আপন-সৃষ্টিকে কৃশ বা বিকৃত ক'রে দিলে নিরানন্দ ঘটায়।

এইখানে তর্ক উঠতে পারে যে, আমির সঙ্গে না-আমির মিলনে দুঃখেরও তো উদ্ভব হয়। তা হতে পারে। কিন্তু, এটা মনে রাখা চাই যে, সুখেরই বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয় ; বস্তুত দুঃখ আনন্দেরই অন্তর্ভূত। কথাটা শুনতে স্বতোবিরুদ্ধ কিন্তু সত্য। যা হোক, এ আলোচনাটা আপাতত থাক্‌, পরে হবে।

আমাদের জানা দু-রকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা। অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য-কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা ; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয়, অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে বিশেষ রসে বিশেষ রূপে

আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব করা। সেইজন্যে উপনিষদ বলেছেন, পুত্রকে কামনা করি বলেই যে পুত্র আমাদের প্রিয় তা নয়, আপনাকেই কামনা করি বলেই পুত্র আমাদের প্রিয়। পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ।

আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে-আনন্দ। অনুভূতির গভীরতা দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনে আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে, অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা। প্রতিদিনের ব্যবহারিক ব্যাপারে ছোটো ছোটো ভাগের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রসারণকে অবরুদ্ধ করে, মনকে বেঁধে রাখে বৈষয়িক সংকীর্ণতায়, প্রয়োজনের সংসারটা আমাদের আপনাকে ঘিরে রাখে কড়া পাহারায় ; অবরোধের নিত্য অভ্যাসের জড়তায় ভুলে যাই যে, নিছক বিষয়ী মানুষ অত্যন্তই কম মানুষ— সে প্রয়োজনের কাঁচি-ছাঁটা মানুষ।

প্রয়োজনের দাবি প্রবল এবং তা অসংখ্য। কেননা, যতটা আয়োজন আমাদের জরুরি তা আপন পরিমাণ রক্ষা করে না। অভাবমোচন হয়ে গেলেও তৃপ্তিহীন কামনা হাত পেতে থাকে ; সঞ্চয়ের ভিড় জমে, সন্ধানের বিশ্রাম থাকে না। সংসারের সকল বিভাগেই এই যে 'চাই-চাই'-এর হাট বসে গেছে, এরই আশেপাশে মানুষ একটা ফাঁক খোঁজে যেখানে তার মন বলে 'চাই নে', অর্থাৎ এমন কিছু চাই নে যেটা লাগে সঞ্চয়ে। তাই দেখতে পাই প্রয়োজনের এত চাপের মধ্যেও মানুষ অপ্রয়োজনের উপাদান এত প্রভূত ক'রে তুলেছে, অপ্রয়োজনের মূল্য তার কাছে এত বেশি। তার গৌরব সেখানে, ঐশ্বর্য সেখানে, যেখানে সে প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয় ; তার যে-রস সে অহৈতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার-কাঠি-ছোঁওয়া সামগ্রীকে জাগ্রত ক'রে জানে আপনারই সত্তায়। তার সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে ব'লে জানি নে।

লোকে বলে, সাহিত্য যে আনন্দ দেয় সেটা সৌন্দর্যের আনন্দ। সে কথা বিচার ক'রে দেখবার যোগ্য। সৌন্দর্যরহস্যকে বিশ্লেষণ ক'রে ব্যাখ্যা করবার অসাধ্য চেষ্টা করব না। অনুভূতির বাইরে দেখতে পাই, সৌন্দর্য অনেকগুলি তথ্যমাত্রকে অর্থাৎ ফ্যাক্‌ট্‌স্‌কে অধিকার করে আছে। সেগুলি সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয়। গোলাপের আছে বিশেষ আকার-আয়তনের কতকগুলি পাপড়ি, বোঁটা ; তাকে ঘিরে আছে সবুজ পাতা। এই-সমস্তকে নিয়ে বিরাজ করে এই-সমস্তের অতীত একটি ঐক্যতত্ত্ব, তাকে বলি সৌন্দর্য। সেই ঐক্য উদ্‌বোধিত করে তাকেই যে আমার অন্তরতম ঐক্য, যে আমার ব্যক্তিপুরুষ। অসুন্দর সামগ্রীরও প্রকাশ আছে, সেও একটা সমগ্রতা, একটা ঐক্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, তার বস্তুরূপী তথ্যটাই মুখ্য, ঐক্যটা গৌণ। গোলাপের আকারে আয়তনে, তার সুষমায়, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্যে, বিশেষভাবে নির্দেশ করে দিচ্ছে তার সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এককে ; সেইজন্যে গোলাপ আমাদের কাছে কেবল একটি তথ্যমাত্র নয়, সে সুন্দর।

কিন্তু শুধু সুন্দর কেন, যে-কোনো পদার্থই আপন তথ্যমাত্রাকে অতিক্রম করে সে আমার কাছে তেমনি সত্য হয় যেমন সত্য আমি নিজে। আমি নিজেও সেই পদার্থ যা বহু তথ্যকে আবৃত ক'রে অখণ্ড এক।

উচ্চ-অঙ্গের গণিতের মধ্যে যে-একটি গভীর সৌষম্য, যে-একটি ঐক্যরূপ আছে, নিঃসন্দেহ গাণিতিক তার মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। তার সামঞ্জস্যের তথ্যটি শুধু জ্ঞানের নয়, তা নিবিড় অনুভূতির ; তাতে বিশুদ্ধ আনন্দ। কারণ, জ্ঞানের যে উচ্চ শিখরে তার প্রকাশ সেখানে সে সর্বপ্রকার প্রয়োজন নিরপেক্ষ, সেখানে জ্ঞানের মুক্তি। এ কেন কাব্যসাহিত্যের বিষয় হয় নি এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। হয় নি যে তার কারণ এই যে, এর অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকের মধ্যে বদ্ধ , এ সর্বসাধারণের অগোচর। যে-ভাষার যোগে এর পরিচয় সম্ভব তা পারিভাষিক, বহু লোকের হৃদয়বোধের স্পর্শের দ্বারা সে সজীব উপাদানরূপে গড়ে ওঠে নি। যে-ভাষা হৃদয়ের মধ্যে অব্যবহিত

আবেগে প্রবেশ করতে পারে না সে-ভাষায় সাহিত্যরসের সাহিত্যরূপের সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথচ আধুনিক কাব্যে সাহিত্যে কলকারখানা স্থান নিতে আরম্ভ করেছে। যন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনগত তথ্যকে ছাড়িয়ে তার একটা বিরাট শক্তিরূপ আমাদের কল্পনায় প্রকাশ পেতে পারে, সে আপন অন্তর্নিহিত সুঘটিত সুসংগতিকে অবলম্বন ক'রে আপন উপাদানকে ছাড়িয়ে আবির্ভূত। কল্পনাদৃষ্টিতে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গভীরে যেন তার একটি আত্মস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। সেই আত্মস্বরূপ আমাদেরই ব্যক্তিস্বরূপের দোসর। যে-মানুষ তাকে, যান্ত্রিক জ্ঞানের দ্বারা নয়, অনুভূতির দ্বারা একান্ত বোধ করে সে তার মধ্যে আপনাকে পায়, কলের জাহাজের কাপ্তেন কলের জাহাজের অন্তরে যেমন পরম অনুরাগে আপন ব্যক্তিপুরুষকে অনুভব করতে পারে। কিন্তু, প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন-তত্ত্ব এ জাতের নয়। এ-সব তত্ত্ব জানার দ্বারা নিষ্কাম আনন্দ হয় না তা নয়। কিন্তু, সে আনন্দটি হওয়ার আনন্দ নয়, তা পাওয়ার আনন্দ ; অর্থাৎ এই জ্ঞান জ্ঞানীর থেকে পৃথক, এ তার ব্যক্তিগত সত্তার অন্দর-মহলের জিনিস নয়, ভাণ্ডারের জিনিস।

আমাদের অলংকারশাস্ত্রে বলেছে, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। সৌন্দর্যের রস আছে ; কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে, সব রসেরই সৌন্দর্য আছে। সৌন্দর্যরসের সঙ্গে অন্য সকল রসেরই মিল হচ্ছে ঐখানে, যেখানে সে আমাদের অনুভূতির সামগ্রী। অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার ক'রে তাকে অনির্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা।

বস্তুর ভিড়ের একান্ত আধিপত্যকে লাঘব করতে লেগেছে মানুষ। সে আপন অনুভূতির জন্যে অবকাশ রচনা করছে। তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিই। ঘড়ায় ক'রে সে জল আনে, এই জল আনায় তার নিত্য প্রয়োজন। অগত্যা বস্তুর দৌরাত্ম্য তাকে কাঁখে ক'রে মাথায় ক'রে বইতেই হয়। প্রয়োজনের শাসনই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে তা হলে ঘড়া হয় আমাদের অনাত্মীয়। মানুষ তাকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তুলল। জল বহনের জন্য সৌন্দর্যের কোনো অর্থই নেই। কিন্তু, এই শিল্পসৌন্দর্য প্রয়োজনের রূঢ়তার চারি দিকে ফাঁকা এনে দিল। যে-ঘড়াকে দায়ে পড়ে মেনেছিলেম, নিলেম তাকে আপন ক'রে। মানুষের ইতিহাসে আদিম যুগ থেকেই এই চেষ্টা। প্রয়োজনের জিনিসকে সে অপ্রয়োজনের মূল্য দেয়, শিল্পকলার সাহায্যে বস্তুকে পরিণত করে বস্তুর অতীতে। সাহিত্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি সেই প্রলয়লোকে যেখানে দায় নেই, ভার নেই, যেখানে উপকরণ মায়া, তার ধ্যানরূপটাই সত্য, যেখানে মানুষ আপনাতে সমস্ত আত্মসাৎ ক'রে আছে।

কিন্তু, বস্তুকে দায়ে পড়ে মেনে নিয়ে তার কাছে মাথা হেঁট করা কাকে বলে যদি দেখতে চাও তবে ঐ দেখো কেরোসিনের টিনে ঘটস্থাপনা, বাঁকের দুই প্রান্তে টিনের ক্যানেস্তা বেঁধে জল আনা। এতে অভাবের কাছেই মানুষের একান্ত পরাভব। যে মানুষ সুন্দর ক'রে ঘড়া বানিয়েছে সে-ব্যক্তি তাড়াতাড়ি জলপিপাসাকেই মেনে নেয় নি, সে যথেষ্ট সময় নিয়েছে নিজের ব্যক্তিত্বকে মানতে।

বস্তুর পৃথিবী ধুলোমাটি পাথর লোহায় ঠাসা হয়ে পিণ্ডীকৃত। বায়ুমণ্ডল তার চার দিকে বিরাট অবকাশ বিস্তার করেছে। এরই পরে তার আত্মপ্রকাশের ভূমিকা। এইখান থেকে প্রাণের নিশ্বাস বহমান ; সেই প্রাণ অনির্বচনীয়। সেই প্রাণশিল্পকারের তুলি এইখান থেকেই আলো নিয়ে, রঙ নিয়ে, তাপ নিয়ে, চলমান চিত্রে বার বার ভরে দিচ্ছে পৃথিবীর পট। এইখানে পৃথিবীর লীলার দিক, এইখানে তার সৃষ্টি ; এইখানে তার সেই ব্যক্তিরূপের প্রকাশ যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না ; যার মধ্যে তার বাণী, তার যাথার্থ্য, তার রস, তার শ্যামলতা, তার হিল্লোল। মানুষও নানা জরুরি কাজের দায় পেরিয়ে চায় আপন আকাশমণ্ডল যেখানে তার অবকাশ, যেখানে বিনা প্রয়োজনের লীলায় আপন সৃষ্টিতে আপনাকে প্রকাশই তার চরম লক্ষ্য— যে-সৃষ্টিতে জানা নয়, পাওয়া নয়, কেবল হওয়া। পূর্বেই বলেছি, অনুভব মানেই হওয়া। বাহিরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টিলীলায় উদ্‌বেল হয়ে ওঠে। আমাদের হৃদয়বোধের কাজ আছে জীবিকানির্বাহের

প্রয়োজনে। আমরা আত্মরক্ষা করি, শত্রু হনন করি, সন্তান পালন করি ; আমাদের হৃদয়বৃত্তি সেই-সকল কাজে বেগ সঞ্চার করে, অভিরুচি জাগায়। এই সীমাটুকুর মধ্যে জন্তুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ নেই। প্রভেদ ঘটেছে সেইখানেই যেখানে মানুষ আপন হৃদয়ানুভূতিকে কর্মের দায় থেকে স্বতন্ত্র ক'রে নিয়ে কল্পনার সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেয়, যেখানে অনুভূতির রসটুকুই তার নিঃস্বার্থ উপভোগের লক্ষ্য, যেখানে আপন অনুভূতিকে প্রকাশ করবার প্রেরণায় ফললাভের অত্যাবশ্যকতাকে সে বিস্মৃত হয়ে যায়। এই মানুষই যুদ্ধ করবার উপলক্ষে কেবল অস্ত্রচালনা করে না, যুদ্ধের বাজনা বাজায়, যুদ্ধের নাচ নাচে। তার হিংস্রতা যখন নিদারুণ ব্যবসায়ে প্রস্তুত তখনো সেই হিংস্রতার অনুভূতিকে ব্যবহারের ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে তাকে অনাবশ্যক রূপ দেয়। হয়তো সেটা তার সিদ্ধিলাভে ব্যাঘাত করতেও পারে। শুধু নিজের সৃষ্টিতে নয়, বিশ্বসৃষ্টিতে সে আপন অনুভূতির প্রতীক খুঁজে বেড়ায়। তার ভালোবাসা ফেরে ফুলের বনে, তার ভক্তি তীর্থযাত্রা করতে বেরোয় সাগরসংগমে পর্বতশিখরে। সে আপন ব্যক্তিরূপের দোসরকে পায় বস্তুতে নয়, তত্ত্বে নয় ; লীলাময়কে সে পায় আকাশ যেখানে নীল, শ্যামল যেখানে নবদূর্বাদল। ফুলে যেখানে সৌন্দর্য, ফলে যেখানে মধুরতা, জীবের প্রতি যেখানে আছে করুণা, ভূমার প্রতি যেখানে আছে আত্মনিবেদন, সেখানে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চিরন্তন যোগ অনুভব করি হৃদয়ে। একেই বলি বাস্তব, যে বাস্তবে সত্য হয়েছে আমার আপন।

যেখানে আমরা এই আপনকে প্রকাশের জন্য উৎসুক, যেখানে আমরা আপনের মধ্যে অপরিমিতকে উপলব্ধি করি সেখানে আমরা অমিতব্যয়ী, কী অর্থে কী সামর্থ্যে। যেখানে অর্থকে চাই অর্জন করতে সেখানে প্রত্যেক সিকি পয়সার হিসাব নিয়ে উদ্‌বিগ্ন থাকি ; যেখানে সম্পদকে চাই প্রকাশ করতে সেখানে নিজেকে দেউলে ক'রে দিতেও সংকোচ নেই। কেননা, সেখানে সম্পদের প্রকাশে আপন ব্যক্তিপুরুষেরই প্রকাশ। বস্তুত, 'আমি ধনী' এই কথাটি উপযুক্তরূপে ব্যক্ত করবার মতো ধন পৃথিবীতে কারও নেই। শত্রুর হাত থেকে প্রাণরক্ষা যখন আমাদের উদ্দেশ্য তখন দেহের প্রত্যেক চাল প্রত্যেক ভঙ্গি সম্বন্ধে নিরতিশয় সাবধান হতে হয় ; কিন্তু, যখন নিজের সাহসিকতা প্রকাশই উদ্দেশ্য তখন নিজের প্রাণপাত পর্যন্ত সম্ভব, কেননা এই প্রকাশে ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমরা খরচা করি বিবেচনাপূর্বক, উৎসবের সময় যখন আপনার আনন্দকে প্রকাশ করি তখন তহবিলের সসীমতা সম্বন্ধে বিবেচনাশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, যখন আমরা আপন ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে প্রবলরূপে সচেতন হই, সাংসারিক তথ্যগুলোকে তখন গণ্যই করি নে। সাধারণত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে আমরা পরিমাণ রক্ষা করেই চলি। কিন্তু, যাকে ভালোবাসি অর্থাৎ যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিপুরুষের পরম সম্বন্ধ তার সম্বন্ধে পরিমাণ থাকে না। তার সম্বন্ধে অনায়াসেই বলতে পারি—

> জনম অবধি হম রূপ নেহারনু, নয়ন না|তিরপিত ভেল।
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

তথ্যের দিক থেকে এতবড়ো অদ্ভুত অত্যুক্তি আর-কিছু হতে পারে না, কিন্তু ব্যক্তিপুরুষের অনুভূতির মধ্যে ক্ষণকালের সীমায় সংহত হতে পারে চিরকাল। 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে' বস্তুজগতে এ কথাটা অতথ্য, কিন্তু ব্যক্তিজগতে তথ্যের খাতিরে এর চেয়ে কম করে যা বলতে যাই তা সত্যে পৌঁছয় না।

বিশ্বসৃষ্টিতেও তাই। সেখানে বস্তু বা জাগতিক শক্তির তথ্য হিসাবে কড়াক্রান্তির এদিকে-ওদিক হবার জো নেই। কিন্তু, সৌন্দর্য তথ্যসীমা ছাপিয়ে ওঠে ; তার হিসাবের আদর্শ নেই, পরিমাণ নেই। ঊর্ধ্ব-আকাশের বায়ুস্তরে ভাসমান বাষ্পপুঞ্জ একটা সামান্য তথ্য, কিন্তু উদয়াস্তকালের সূর্যরশ্মির স্পর্শে তার মধ্যে যে অপরূপ বর্ণলীলার বিকাশ হয় সে অসামান্য, সে 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ' মাত্র নয়, সে যেন প্রকৃতির একটা অকারণ অত্যুক্তি, একটা পরিমিত বস্তুগত সংবাদ-বিশেষকে সে যেন একটা অপরিমিত অনির্বচনীয়তায় পরিণত করে দেয়। ভাষার মধ্যেও যখন প্রবল অনুভূতির সংঘাত লাগে তখন তা শব্দার্থের আভিধানিক সীমা লঙ্ঘন করে।

এইজন্যে সে যখন বলে 'চরণনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে', তখন তাকে পাগলামি ব'লে উড়িয়ে দিতে পারি নে। এইজন্য সংসারের প্রাত্যহিক তথ্যকে একান্ত যথাযথভাবে আর্টের বেদির উপরে চড়ালে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। কেননা আর্টের প্রকাশকে সত্য করতে গেলেই তার মধ্যে অতিশয়তা লাগে, নিছক তথ্যে তা সয় না। তাকে যতই ঠিকঠাক ক'রে বলা যাক না, শব্দের নির্বাচনে, ভাষার ভঙ্গিতে, ছন্দের ইশারায় এমন-কিছু থাকে যেটা সেই ঠিকঠাককে ছাড়িয়ে যায়, যেটা অতিশয়। তথ্যের জগতে ব্যক্তিস্বরূপ হচ্ছে সেই অতিশয়। কেজো ব্যবহারের সঙ্গে সৌজন্যের প্রভেদ ঐখানে ; কেজো ব্যবহারে হিসেব করা কাজের তাগিদ, সৌজন্যে আছে সেই অতিশয় যা ব্যক্তিপুরুষের মহিমার ভাষা।

প্রাচীন গ্রীসের প্রাচীন রোমের সভ্যতা গেছে অতীতে বিলীন হয়ে। যখন বেঁচে ছিল তাদের বিস্তর ছিল বৈষয়িকতার দায়। প্রয়োজনগুলি ছিল নিরেট নিবিড় গুরুভার ; প্রবল উদ্‌বেগ, প্রবল উদ্যম ছিল তাদের বেষ্টন ক'রে। আজ তার কোনো চিহ্ন নেই। কেবল এমন-সব সামগ্রী আজও আছে যাদের ভার ছিল না, বস্তু ছিল না, দায় ছিল না, সৌজন্যের অত্যুক্তি দিয়ে সমস্ত দেশ যাদের অভ্যর্থনা করেছে— যেমন ক'রে আমরা সম্ভ্রমবোধের পরিতৃপ্তি সাধন করি রাজচক্রবর্তীর নামের আদিতে পাঁচটা শ্রী যোগ ক'রে। দেশ তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল অতিশয়ের চূড়ায়, সেই নিম্নভূমির সমতলক্ষেত্রে নয় যেখানে প্রাত্যহিক ব্যবহারের ভিড়। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের যে-পরিচয় চিরকালের দৃষ্টিপাত সয়, পাথরের রেখায়, শব্দের ভাষায় তারই সম্বর্ধনাকে স্থায়ী রূপ ও অসীম মূল্য দিয়ে রেখে গেছে।

যা কেবলমাত্র স্থানিক, সাময়িক, বর্তমান কাল তাকে যত প্রচুর মূল্যই দিক, দেশের প্রতিভার কাছ থেকে অতিশয়ের সমাদর সে স্বভাবতই পায় নি, যেমন পেয়েছে জ্যোৎস্নারাতে ভেসে-যাওয়া নৌকোর সেই সারিগান—

মাঝি, তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না।

যেমন পেয়েছে নাইটিঙ্গেল পাখির সেই গান, যে-গান শুনতে শুনতে কবি বলেছেন তাঁর প্রিয়াকে—

Listen Eugenia.
How thick the burst comes crowding through the leaves.
Again— thou hearest?
Eternal passion !
Eetenal pain !

পূর্বেই বলেছি, রসমাত্রেই অর্থাৎ সকলরকম হৃদয়বোধেই আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি, সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ। এইখানেই তর্ক উঠতে পারে, যে-জানায় দুঃখ সেই জানাতেও আনন্দ এ কথা স্বতোবিরুদ্ধ। দুঃখকে, ভয়ের বিষয়কে আমরা পরিহার্য মনে করি তার কারণ, তাতে আমাদের হানি হয়, আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়, তা আমাদের স্বার্থের প্রতিকূলে যায়। প্রাণরক্ষার স্বার্থরক্ষার প্রবৃত্তি আমাদের অত্যন্ত প্রবল, সেই প্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হলে সেটা দুঃসহ হয়। এইজন্যে দুঃখবোধ আমাদের ব্যক্তিগত আত্মবোধকে উদ্দীপ্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও সাধারণত তা আমাদের কাছে অপ্রিয়। এটা দেখা গেছে, যে-মানুষের স্বভাবে ক্ষতির ভয়, প্রাণের ভয় যথেষ্ট প্রবল নয় বিপদকে সে ইচ্ছাপূর্বক আহ্বান করে, দুর্গমের পথে যাত্রা করে, দুঃসাধ্যের মধ্যে পড়ে ঝাঁপ দিয়ে। কিসের লোভে। কোনো দুর্লভ ধন অর্জন করবার জন্যে নয়, ভয়-বিপদের সংঘাতে নিজেকেই প্রবল আবেগে উপলব্ধি করবার জন্যে। অনেক শিশুকে নিষ্ঠুর হতে দেখা যায় ; কীটপতঙ্গ পশুকে যন্ত্রণা দিতে তারা তীব্র আনন্দ বোধ করে। শ্রেয়োবুদ্ধি প্রবল হলে এই আনন্দ সম্ভব হয় না ; তখন শ্রেয়োবুদ্ধি বাধারূপে কাজ করে। স্বভাবত বা অভ্যাসবশত এই বুদ্ধি হ্রাস হলেই দেখা যায়, হিংস্রতার আনন্দ অতিশয় তীব্র, ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ আছে এবং জেলখানার এক শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই দুর্লভ নয়। এই হিংস্রতারই অহৈতুক আনন্দ নিন্দুকদের ; নিজের কোনো বিশেষ ক্ষতির উত্তেজনাতেই যে মানুষ নিন্দা করে, তা নয়। যাকে সে জানে না, যে তার কোনো অপকার করে নি, তার নামে অকারণ কলঙ্ক

আরোপ করায় যে নিঃস্বার্থ দুঃখজনকতা আছে দলে-বলে নিন্দাসাধনার ভৈরবীচক্রে বসে নিন্দুক ভোগ করে তাই। ব্যাপারটা নিষ্ঠুর এবং কদর্য, কিন্তু তীব্র তার আস্বাদন। যার প্রতি আমরা উদাসীন সে আমাদের সুখ দেয় না, কিন্তু নিন্দার পাত্র আমাদের অনুভূতিকে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করে রাখে। এই হেতুই পরের দুঃখকে উপভোগ্য সামগ্রী করে নেওয়া মানুষ-বিশেষের কাছে কেন বিলাসের অঙ্গরূপে গণ্য হয়, কেন মহিষের মতো অত বড়ো প্রকাণ্ড প্রবল জন্তুকে বলি দেবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাখা উন্মত্ত নৃত্য সম্ভবপর হতে পারে, তার কারণ বোঝা সহজ। দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। দুঃখের কটুস্বাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর। ট্রাজেডির মূল্য এই নিয়ে। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামচন্দ্রের নির্বাসন, মন্থরার উল্লাস, দশরথের মৃত্যু, এর মধ্যে ভালো কিছুই নেই। সহজ ভাষায় যাকে আমরা সুন্দর বলি এ ঘটনা তার সমশ্রেণীর নয়, এ কথা মানতেই হবে। তবু এই ঘটনা নিয়ে কত কাব্য নাটক ছবি গান পাঁচালি বহুকাল থেকে চলে আসছে ; ভিড় জমছে কত ; আনন্দ পাচ্ছে সবাই। এতেই আছে বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি। বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

একদিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায় লিখেছিলেম। বলেছিলেম, আমার অন্তরতম আমি আলস্যে আবেশে বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ; নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় ক'রে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।

এত কাল আমি রেখেছিনু তারে যতনভরে
শয়ন-'পরে ;
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে,
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসরশয়ন করেছি রচন কুসুমথরে,
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে গোপন ঘরে।
যতনভরে।

শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান আলসরসে
আবেশবশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার নিশিদিবসে ;
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ মরমে পশে
আবেশবশে।

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা,
প্রাণেতে আমাতে খেলিব দুজনে ঝুলন-খেলা
নিশীথ বেলা।

আমাদের শাস্ত্র বলেন—

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।

সেই বেদনীয় পুরুষকে জানো যাতে মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দেয়।

বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই যাঁকে জানা যায় জানো সেই পুরুষকে অর্থাৎ পার্সোন্যালিটিকে। আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে জানে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদা মনীষা মনসা, তখন তাঁর মধ্যে নিঃসংশয়রূপে জানে আপনাকেও। তখন কী হয়। মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়, কেননা বেদনীয় পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিরুদ্ধ।

এই আধ্যাত্মিক সাধনার কথাটাকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনা চলে। জীবনে শূন্যতাবোধ আমাদের ব্যথা দেয়, সত্তাবোধের ম্লানতায় সংসারে এমন-কিছু অভাব ঘটে যাতে আমাদের অনুভূতির সাড়া জাগে না, যেখানে আমাদের ব্যক্তিবোধকে জাগ্রত রাখবার মতো এমন কোনো বাণী নেই যা স্পষ্ট ভাষায় বলছে 'আমি আছি'। বিরহের শূন্যতায় যখন শকুন্তলার মন অবসাদগ্রস্ত তখন তাঁর দ্বারে উঠেছিল ধ্বনি, 'অয়মহং ভোঃ।' এই-যে আমি আছি। সে বাণী পৌঁছল না তাঁর কানে, তাই তাঁর অন্তরাত্মা জবাব দিল না, 'এই যে আমিও আছি।' দুঃখের কারণ ঘটল সেইখানে। সংসারে 'আমি আছি' এই বাণী যদি স্পষ্ট থাকে তা হলেই আমার আপনার মধ্য থেকে তার নিশ্চিত উত্তর মেলে, 'আমি আছি।' 'আমি আছি' এই বাণী প্রবল সুরে ধ্বনিত হয় কিসে। এমন সত্যে যাতে রস আছে পূর্ণ। আপন অন্তরে ব্যক্তিপুরুষকে নিবিড় করে অনুভব করি যখন আপন বাইরে গোচর হয়েছে রসাত্মক রূপ। তাই বাউল গেয়ে বেড়িয়েছে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।

কেননা, আমার মনের মানুষকেই একান্ত করে পাবার জন্যে পরম মানুষকে চাই, চাই তং বেদ্যং পুরুষং ; তা হলে শূন্যতা ব্যথা দেয় না।

আমাদের পেট ভরাবার জন্যে, জীবনযাত্রার অভাব মোচন করবার জন্যে, আছে নানা বিদ্যা, নানা চেষ্টা ; মানুষের শূন্য ভরাবার জন্যে,তার মনের মানুষকে নানা ভাবে নানা রসে জাগিয়ে রাখবার জন্যে, আছে তার সাহিত্য, তার শিল্প। মানুষের ইতিহাসে এর স্থান কী বৃহৎ, এর পরিমাণ কী প্রভূত। সভ্যতার কোনো প্রলয়ভূমিকম্পে যদি এর বিলোপ সম্ভব হয় তবে মানুষের ইতিহাসে কী প্রকাণ্ড শূন্যতা কালো মরুভূমির মতো ব্যাপ্ত হয়ে যাবে। তার 'কৃষ্টি'র ক্ষেত্র আছে তার চাষে বাসে আপিসে কারখানায় ; তার সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে আপনাকেই সম্যকরূপে করে তুলছে, সে আপনিই হয়ে উঠছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাই বলেছেন, আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি '।

ক্লাসঘরের দেয়ালে মাধব আর-এক ছেলের নামে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে রেখেছে 'রাখালটা বাঁদর'। খুবই রাগ হয়েছে। এই রাগের বিষয়ের তুলনায় অন্য-সকল ছেলেই তার কাছে অপেক্ষাকৃত অগোচর। অস্তিত্ব হিসাবে রাখাল যে কত বড়ো হয়েছে তা অক্ষরের ছাঁদ দেখলেই বোঝা যাবে। মাধব আপন স্বল্প শক্তি-অনুসারে আপন রাগের অনুভূতিকে আপনার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেইটে দিয়ে দেয়ালের উপর এমন একটা কালো অক্ষরের রূপ সৃষ্টি করেছে যা খুব বড়ো করে জানাচ্ছে, মাধব রাগ করেছে ; যা মাধব চাচ্ছে সমস্ত জগতের কাছে গোচর করতে। ঐটেকে একটা গীতিকবিতার বামন অবতার বলা যেতে পারে। মাধবের অন্তরে যে অপরিণত পঙ্গু কবি আছে, রাখালের সঙ্গে বানরের উপমার বেশি তার কলমে আর এগোল না। বেদব্যাস ঐ কথাটাই লিখেছিলেন মহাভারতের পাতায় শকুনির নামে। তার ভাষা স্বতন্ত্র, তা ছাড়া তার কয়লার অক্ষর মুছবে না যতই চুনকাম করা যাক। পুরাতত্ত্ববিদ নানা সাক্ষ্যের জোরে প্রমাণ করে দিতে পারেন, শকুনি নামে কোনো ব্যক্তি কোনো কালেই ছিল না। আমাদের বুদ্ধিও সে কথা মানবে, কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি সাক্ষ্য দেবে, সে নিশ্চিত আছে। ভাঁড়ুদত্তও বাঁদর বৈকি। কবিকঙ্কণ সেটা কালো অক্ষরে ঘোষণা করে দিয়েছেন। কিন্তু, এই বাঁদরগুলোর উপরে আমাদের যে অবজ্ঞার ভাব আসে সেই ভাবটাই উপভোগ্য।

আমাদের দেশে একপ্রকারের সাহিত্যবিচার দেখি যাতে নানা অবান্তর কারণ দেখিয়ে সাহিত্যের এই প্রত্যক্ষগোচরতার মূল্য লাঘব করা হয়। হয়তো কোনো মানবচরিত্রজ্ঞ বলেন, শকুনির মতো অমন অবিমিশ্র দুর্বৃত্ততা স্বাভাবিক নয়, ইয়াগোর অহৈতুক বিদ্বেষবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহদ্‌গুণ থাকা উচিত ছিল ; বলেন, যেহেতু কৈকেয়ী বা লেডি ম্যাক্‌বেথ, হিড়িম্বা বা শূর্পণখা, নারী, 'মায়ের জাত', এইজন্যে এদের চরিত্রে ঈর্ষা বা কদাশয়তার অত নিবিড় কালিমা আরোপ করা অশ্রদ্ধেয়। সাহিত্যের তরফ থেকে বলবার কথা এই যে, এখানে আর কোনো তর্কই গ্রাহ্য নয় ; কেবল এই জবাবটা পেলেই হল, যে-চরিত্রের অবতারণা হয়েছে তা সৃষ্টির কোঠায় উঠেছে, তা প্রত্যক্ষ। কোনো-এক খেয়ালে সৃষ্টিকর্তা জিরাফ জন্তুটাকে রচনা করলেন। তাঁর সমালোচক বলতে পারে, এর গলাটা না গোরুর মতো, না হরিণের মতো, বাঘ ভালুকের মতো তো নয়ই, এর পশ্চাদ্‌ভাগের ঢালু ভঙ্গিটা সাধারণ চতুষ্পদ-সমাজে চলতি নেই, অতএব ইত্যাদি। সমস্ত আপত্তির বিরুদ্ধে একটিমাত্র জবাব এই যে, ঐ জন্তুটা জীবসৃষ্টিপর্যায়ে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ। ও বলছে 'আমি আছি' ; 'না থাকাই উচিত ছিল' বলাটা টিকবে না। যাকে সৃষ্টি বলি তার নিঃসংশয় প্রকাশই তার অস্তিত্বের চরম কৈফিয়ত। সাহিত্যের সৃষ্টির সঙ্গে বিধাতার সৃষ্টির এইখানেই মিল ; সেই সৃষ্টিতেই উট জন্তুটা হয়েছে বলেই হয়েছে, উটপাখিরও হয়ে ওঠা ছাড়া অন্য জবাবদিহি নেই।

মানুষও একেবারে শিশুকাল থেকেই এই আনন্দ পেয়েছে, প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আনন্দ। এই বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদাসর্বদা হয়ে থাকে, যুক্তিসংগত। যে-কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব। ছন্দে ভাষায় ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে যখন সেই বাস্তবতা জাগিয়ে তোলে, সে তখন ভাষায় রচিত একটি শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে। তার কোনো ব্যাবহারিক অর্থ না থাকতে পারে, তাতে এমন একটা কিছু প্রকাশ পায় যা tease us out of thought as doth eternity।

ও পারেতে কালো রঙ।
বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌,
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্‌ করে—
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে।

এর বিষয়টি অতি সামান্য। কিন্তু, ছন্দের দোল খেয়ে এ যেন একটা স্পর্শযোগ্য পদার্থ হয়ে উঠেছে ব্যাকরণের ভুল থাকা সত্ত্বেও।

ডালিমগাছে পরভু নাচে,
তাক্‌ধুমাধুম বাদ্যি বাজে।

শুনে শিশু খুশি হয়ে ওঠে। এ একটা সুস্পষ্ট চলন্ত জিনিস, যেন একটা ছন্দে-গড়া পতঙ্গ ; সে আছে, সে উড়ছে, আর কিছুই নয়, এতেই কৌতুক।

তাই শিশুকাল থেকে মানুষ বলছে 'গল্প বলো' ; সেই গল্পকে বলে রূপকথা। রূপকথাই সে বটে ; তাতে না থাকতে পারে ঐতিহাসিক তথ্য, না থাকতে পারে আবশ্যক সংবাদ, সম্ভবপরতা সম্বন্ধেও তার হয়তো কোনো কৈফিয়ত নেই। সে কোনো-একটা রূপ দাঁড় করায় মনের সামনে, তার প্রতি ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে, তাতে শূন্যতা দূর করে ; সে বাস্তব। গল্প শুরু করা গেল—

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে গিয়ে ঘরে
আয়নাটা পড়েছে নজরে।
এক ছুটে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ গাঁ ক'রে রেগে ওঠে ডেকে,
গায়ে দাগ কে দিয়েছে এঁকে।

টেঁকিশালে মাসি ধান ভানে,
বাঘ এসে দাঁড়ালো সেখানে।
পাকিয়ে ভীষণ দুই গোঁফ
বলে, 'চাই গ্লিসেরিন সোপ!'

ছোটো মেয়ে চোখ দুটো মস্ত ক'রে হাঁ ক'রে শোনে। আমি বলি, 'আজ এই পর্যন্ত।' সে অস্থির হয়ে বলে, 'না, বলো, তার পরে।' সে নিশ্চিত জানে, সাবানের চেয়ে, যারা সাবান মাখে বাঘের লোভ তাদেরই 'পরে বেশি। তবু এই সম্পূর্ণ আজগবি গল্প তার কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব, প্রাণীবৃত্তান্তের বাঘ তার কাছে কিছুই না। ঐ আয়না-দেখা খ্যাপা বাঘকে তার সমস্ত মনপ্রাণ একান্ত অনুভব করাতেই সে খুশি হয়ে উঠছে। এ'কেই বলি মনের লীলা, কিছুই-না নিয়ে তার সৃষ্টি, তার আনন্দ।

সুন্দরকে প্রকাশ করাই রসসাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়, সে কথা পূর্বেই বলেছি। সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতায় একটা স্তর আছে, সেখানে সৌন্দর্য খুবই সহজ। ফুল সুন্দর, প্রজাপতি সুন্দর, ময়ূর সুন্দর। এ সৌন্দর্য একতলাওয়ালা, এর মধ্যে সদর-অন্দরের রহস্য নেই, এক নিমেষেই ধরা দেয়, সাধনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, এই প্রাণের কোঠায় যখন মনের দান মেশে, চরিত্রের সংস্রব ঘটে, তখন এর মহল বেড়ে যায়; তখন সৌন্দর্যের বিচার সহজ হয় না। যেমন মানুষের মুখ! এখানে শুধু চোখে চেয়ে সরাসরি রায় দিতে গেলে ভুল হবার আশঙ্কা। সেখানে সহজ আদর্শে যা অসুন্দর তাকেও মনোহর বলা অসম্ভব নয়। এমন-কি, সাধারণ সৌন্দর্যের চেয়েও তার আনন্দজনকতা হয়তে গভীরতর। ঠুংরির টপ্পা শোনবামাত্র মন চঞ্চল হয়ে থাকে, টোড়ির চৌতাল চৈতন্যকে গভীরতায় উদ্‌বুদ্ধ করে। 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন' মধুর হতে পারে, কিন্তু 'বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী' মনোহর। একটা কানের, আর-একটা মনের; একটাতে চরিত্র নেই, লালিত্য আছে, আর-একটাতে চরিত্রই প্রধান। তাকে চিনে নেবার জন্যে অনুশীলনের দরকার করে।

যাকে সুন্দর বলি তার কোঠা সংকীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদূরপ্রসারিত। মন ভোলাবার জন্যে তাকে অসামান্য হতে হয় না, সামান্য হয়েও সে বিশিষ্ট। যা আমাদের দেখা অভ্যস্ত ঠিক সেইটেকেই যদি ভাষায় আমাদের কাছে অবিকল হাজির ক'রে দেয়, তবে তাকে বলব সংবাদ। কিন্তু, আমাদের সেই সাধারণ অভিজ্ঞতার জিনিসকেই সাহিত্য যখন বিশেষ ক'রে আমাদের সামনে উপস্থিত করে তখন সে আসে অভূতপূর্ব হয়ে, সে হয় সেই একমাত্র, আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র। সন্তানস্নেহে কর্তব্যবিস্মৃত মানুষ অনেক দেখা যায়, মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র আছেন সেই অতি সাধারণ বিশেষণ নিয়ে। কিন্তু, রাজ্যাধিকারবঞ্চিত এই অন্ধ রাজা কবিলেখনীর নানা সূক্ষ্ম স্পর্শে দেখা দিয়েছেন সম্পূর্ণ একক হয়ে। মোটা গুণটা নিয়ে তাঁর সমজাতীয় লোক অনেক আছে, কিন্তু জগতে ধৃতরাষ্ট্র অদ্বিতীয়; এই মানুষের একান্ততা তাঁর বিশেষ ব্যবহারে নয়, কোনো আংশিক পরিচয়ে নয়, সমগ্রভাবে। কবির সৃষ্টিমন্ত্রে প্রকাশিত এই তাঁর অনন্যসদৃশ|স্বকীয় রূপ প্রতিভার কোন্ সহজ নৈপুণ্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে, ক্ষুদ্র সমালোচকের বিশ্লেষণী লেখনী তার অন্ত পাবে না।

সংসারে অধিকাংশ পদার্থ প্রত্যক্ষত আমাদের কাছে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত। রাস্তা দিয়ে হাজার লোক চলে; তারা যদিচ প্রত্যেকেই বিশেষ লোক তবু আমার কাছে তারা সাধারণ মানুষমাত্র, এক বৃহৎ সাধারণতার আস্তরণে তারা আবৃত, তারা অস্পষ্ট। আমার আপনার কাছে আমি সুনিশ্চিত, আমি বিশেষ; অন্য কেউ যখন তার বিশিষ্টতা নিয়ে আসে তখন তাকে আমারই সমপর্যায়ে ফেলি, আনন্দিত হই।

একটা কথা স্পষ্ট করা দরকার। আমার ধোবা আমার কাছে নিশ্চিত সত্য সন্দেহ নেই, এবং তার অনুবর্তী যে-বাহন সেও। ধোবা ব'লেই প্রয়োজনের যোগে সে আমার খুব কাছে, কিন্তু আমার ব্যক্তিপুরুষের সম্যক্ অনুভূতির বাইরে।

পূর্বে অন্যত্র এক জায়গায় বলেছি যে, যে-কোনো পদার্থের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের সম্বন্ধই প্রধান সে-পদার্থ সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়, তার বিশিষ্টতা আমাদের কাছে অগোচর হয়ে পড়ে। কবিতায়

প্রবেশ করতে সজনে ফুলের বিলম্ব হয়েছে এই কারণেই, তাকে জানি ভোজ্য ব'লে একটা সাধারণ ভাবে। চালতা-ফুল এখনো কাব্যের দ্বারের কাছেও এসে পৌঁছয় নি। জামরুলের ফুল শিরীষ ফুলের চেয়ে অযোগ্য নয়; কিন্তু তার দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন সে আপন চরমরূপে প্রকাশ পায় না, তার পরপর্যায়ের খাদ্য ফলেরই পূর্বপরিচয় রূপে তাকে দেখি। তার নিজেরই বিশিষ্টতার ঘোষণা যদি তার মধ্যে মুখ্য হত তা হলে সে এতদিনে কাব্যে আদর পেত। মুরগি পাখির সৌন্দর্য বঙ্গসাহিত্যে কেন যে অস্বীকৃত, সে কথা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। আমাদের চিত্ত এদেরকে নিজেরই স্বরূপে দেখে না, অন্য-কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে তার দ্বারা আবৃত ক'রে দেখে।

যাঁরা আমার কবিতা পড়েছেন তাঁদের কাছে পুনরুক্তি হলেও একটা খবর এখানে বলা চলে। ছিলেম মফস্বলে, সেখানে আমার এক চাকর ছিল; তার বুদ্ধি বা চেহারা লক্ষ্য করবার যোগ্য ছিল না। রাত্রে বাড়ি চলে যায়, সকালে এসে ঝাড়ন কাঁধে কাজকর্ম করে। তার প্রধান গুণ, সে কথা বেশি বলে না। সে যে আছে সে তথ্যটা অনুভব করলুম যেদিন সে হল অনুপস্থিত। সকালে দেখি, স্নানের জল তোলা হয় নি, ঝাড়পোঁছ বন্ধ। এল বেলা দশটার কাছাকাছি। বেশ একটু রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোথায় ছিলি।' সে বললে, 'আমার মেয়েটি মারা গেছে কাল রাতে।' ব'লেই ঝাড়ন নিয়ে নিঃশব্দে কাজে লেগে গেল। বুকটা ধক্ ক'রে উঠল। ভৃত্যরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা, তার আবরণ উঠে গেল; মেয়ের বাপ ব'লে তাকে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হয়ে গেল; সে হল প্রত্যক্ষ, সে হল বিশেষ।

সুন্দরের হাতে বিধাতার পাস্‌পোর্ট আছে; সর্বত্রই তার প্রবেশ সহজ। কিন্তু, এই মোমিন মিঞা, একে কী বলব। সুন্দর বলা তো চলে না। মেয়ের বাপও তো সংসারে অসংখ্য; সেই সাধারণ তথ্যটা সুন্দরও না, অসুন্দরও না। কিন্তু, সেদিন করুণরসের ইঙ্গিতে গ্রাম্য মানুষটা আমার মনের মানুষের সঙ্গে মিলল; প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম ক'রে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞা আমার কাছে হল বাস্তব।

লক্ষপতির ঘরে মেজো মেয়ের বিবাহ। এমন ধুম পাড়ার অতিবৃদ্ধেরাও বলে অভূতপূর্ব। তার ঘোষণার তরঙ্গ খবরের কাগজের সংবাদবীথিকায় উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে। জনশ্রুতির কোলাহলে ঘটনাটা যতই গুরুতর প্রতিভাত হোক, তবু এই বহুব্যয়সাধ্য বিপুল সমারোহেও ব্যাপারটাকে 'মেয়ের বিয়ে' নামক সংবাদের নিতান্ত সাধারণতা থেকে উপরে তুলতে পারে না। সাময়িক উন্মুখরতার জোরে এ স্মরণীয় হয়ে ওঠে না। কিন্তু, 'কন্যার বিবাহ' নামক অত্যন্ত সাধারণ ঘটনাকে তার সাময়িক ও স্থানিক আত্মপ্রচারের আশুম্লানতা থেকে যদি কোনো কবি তাঁর ভাষায় ছন্দে দীপ্তিমান সাহিত্যের সামগ্রী করে তোলেন, তা হলে প্রতিদিনের হাজার-লক্ষ মেয়ের বিবাহের কুহেলিকা ভেদ ক'রে এ দেখা দেবে একটি অদ্বিতীয় মেয়ের বিবাহরূপে, যেমন বিবাহ কুমারসম্ভবের উমার, যেমন বিবাহ রঘুবংশের ইন্দুমতীর। সাংকোপাঞ্জা ডন্‌কুইক্‌সোটের ভৃত্যমাত্র, সংসারের প্রবহমান তথ্যপুঞ্জের মধ্যে তাকে তর্জমা করে দিলে সে চোখেই পড়বে না— তখন হাজার-লক্ষ চাকরের সাধারণ-শ্রেণীর মাঝখানে তাকে সনাক্ত করবে কে। ডন্‌কুইক্‌সোটের চাকর আজ চিরকালের মানুষের কাছে চিরকালের চেনা হয়ে আছে, সবাইকে দিচ্ছে তার একান্ত প্রত্যক্ষতার আনন্দ; এ পর্যন্ত ভারতের যতগুলি বড়োলাট হয়েছে তাদের সকলের জীবনবৃত্তান্ত মেলালেও এই চাকরটির পাশে তারা নিষ্প্রভ। বড়ো বড়ো বুদ্ধিমান রাজনীতিকের দল মিলে অস্ত্রলাঘব ব্যাপার নিয়ে যে বাদবিতণ্ডা তুলেছেন তথ্যহিসাবে সে একটা মস্ত তথ্য; কিন্তু যুদ্ধে-পঙ্গু একটি মাত্র সৈনিকের জীবন যে-বেদনায় জড়িত তাকে সুস্পষ্ট প্রকাশমান করতে পারলে সকল কালের মানুষ রাষ্ট্রনীতিকের গুরুতর মন্ত্রণা-ব্যাপারের চেয়ে তাকে প্রধান স্থান দেবে। এ কথা নিশ্চিত জানি, যে-সময়ে শকুন্তলা রচিত হয়েছিল তখন রাষ্ট্রিক আর্থিক অনেক সমস্যা উঠেছিল যার গুরুত্ব তখনকার দিনে অতি প্রকাণ্ড উদ্‌বেগরূপে ছিল; কিন্তু সে-সমস্তের আজ চিহ্নমাত্র নেই, আছে শকুন্তলা।

মানবের সামাজিক জগৎ দ্যুলোকের ছায়াপথের মতো। তার অনেকখানিই নানাবিধ অবচ্ছিন্ন তত্ত্বের অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাক্‌শনের বহুবিস্তৃত নীহারিকায় অবকীর্ণ; তাদের নাম হচ্ছে সমাজ, রাষ্ট্র, নেশন,

বাণিজ্য, এবং আরো কত কী। তাদের রূপহীনতার কুহেলিকায় ব্যক্তিগত মানবের বেদনাময় বাস্তবতা আচ্ছন্ন। যুদ্ধ-নামক একটিমাত্র বিশেষ্যের তলায় হাজার হাজার ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়দাহকর দুঃখের জ্বলন্ত অঙ্গার বাস্তবতার অগোচরে ভস্মাবৃত। নেশন-নামক একটা শব্দ চাপা দিয়েছে যত পাপ ও বিভীষিকা তার আবরণ তুলে দিলে মানুষের জন্যে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকে না। সমাজ-নামক পদার্থ যত বিচিত্র রকমের মূঢ়তা ও দাসত্বশৃঙ্খল গড়েছে তার স্পষ্টতা আমাদের চোখ এড়িয়ে থাকে ; কারণ, সমাজ একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব, তাতে মানুষের বাস্তবতার বোধ আমাদের মনে অসাড় করেছে— সেই অচেতনতার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে রামমোহন রায়কে, বিদ্যাসাগরকে। ধর্ম-শব্দের মোহযবনিকার অন্তরালে যে-সকল নিদারুণ ব্যাপার সাধিত হয়ে থাকে তাতে সকল শাস্ত্রে বর্ণিত সকল নরকের দণ্ডবিধিকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। ইস্কুলে ক্লাস-নামক একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব আছে ; সেখানে ব্যক্তিগত ছাত্র অগোচর থাকে শ্রেণীগত সাধারণতার আড়ালে, সেই কারণে যখন তাদের মন-নামক সজীব পদার্থ মুখস্থ-বিদ্যার পেষণে গ্রন্থের পাতার মধ্যে পিষ্ট ফুলের মতো শুকোতে থাকে, আমরা থাকি উদাসীন। গবর্মেন্টের আমলাতন্ত্র নামক অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব মানুষের ব্যক্তিগত সত্যবোধের বাহিরে ; সেইজন্য রাষ্ট্রশাসনের হৃদয়সম্পর্কহীন নামের নীচে প্রকাণ্ড আয়তনের নির্দয়তা কোথাও বাধে না।

মানবচিত্তের এই-সকল বিরাট অসাড়তার নীহারিকাক্ষেত্রে বেদনাবোধের বিশিষ্টতাকে সাহিত্য দেদীপ্যমান করে তুলছে। রূপে সেই-সকল সৃষ্টি সসীম, ব্যক্তিপুরুষের আত্মপ্রকাশে সীমাতীত। এই ব্যক্তিপুরুষ মানুষের অন্তরতম ঐক্যতত্ত্ব ; এই মানুষের চরম রহস্য। এ তার চিত্তের কেন্দ্র থেকে বিকীর্ণ হয়ে বিশ্বপরিধিতে পরিব্যাপ্ত— আছে তার দেহে, কিন্তু দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে ; আছে তার মনে, কিন্তু মনকে অতিক্রম ক'রে ; তার বর্তমানকে অধিকার ক'রে অতীত ও ভবিষ্যতের উপকূলগুলিকে ছাপিয়ে চলেছে। এই ব্যক্তিপুরুষ প্রতীয়মানরূপে যে-সীমায় অবস্থিত সত্যরূপে কেবলই তাকে ছাড়িয়ে যায়, কোথাও থামতে চায় না ; তাই এ আপন সত্তার প্রকাশকে এমন রূপ দেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত যে-রূপ আনন্দময়, যা মৃত্যুহীন। সেই-সকল রূপ সৃষ্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা। এই-সকল সৃষ্টিতে ব্যক্তিপুরুষ পরমপুরুষের বাণীর প্রত্যুত্তর পাঠাচ্ছে, যে পরমপুরুষ আলোকহীন তথ্যপুঞ্জের অভ্যন্তর থেকে আমাদের দৃষ্টিতে আপন প্রকাশকে নিরন্তর উদ্ভাসিত করেছেন সত্যের অসীম রহস্যে, সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়তায়।

ভাদ্র ১৩৪০

সাহিত্যের তাৎপর্য

উদ্ভিদের দুই শ্রেণী, ওষধি আর বনস্পতি। ওষধি ক্ষণকালের ফসল-ফলাতে ফলাতে ক্ষণে জন্মায়, ক্ষণে মরে। বনস্পতির আয়ু দীর্ঘ, তার দেহ বিচিত্র রূপে আকৃতিবান, শাখায়িত তার বিস্তার।

ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটাতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে হতে তা লুপ্ত হয়ে যায় ; ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদবহনে তার সমাপ্তি। আর-একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই। সে দৈনিক আশুপ্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত হতে হতে মিলিয়ে যায় না। সে শাল-তমালেরই মতো ; তার কাছ থেকে দ্রুত ফসল ফলিয়ে নিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয় না। অর্থাৎ, বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে, ভাবের এবং রূপের সমবায়ে, সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বেরই চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে এ'কেই আমরা ব'লে থাকি সাহিত্য।

ভাষার যোগে আমরা পরস্পরকে তথ্যগত সংবাদ জানাচ্ছি, তা ছাড়া জানাচ্ছি ব্যক্তিগত মনোভাব। ভালো লাগছে, মন্দ লাগছে, রাগ করছি, ভালোবাসছি, এটা যথাস্থানে ব্যক্ত না ক'রে

থাকতে পারি নে। মূক পশুপাখিরও আছে অপরিণত ভাষা : তাতে কিছু আছে ধ্বনি, কিছু আছে ভঙ্গি ; এই ভাষায় তারা পরস্পরের কাছে কিছু খবরও জানায়, কিছু ভাবও জানায়। মানুষের ভাষা তার এই প্রয়োগসীমা অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে। সন্ধান ও যুক্তির জোরে তথ্যগত সংবাদ পরিণত হয়েছে বিজ্ঞানে। হবা-মাত্র তার প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত বন্ধন ঘুচে গেল। যে জগৎটা 'আমি আছি' এইমাত্র ব'লে আপনাকে জানান দিয়েছে, মানুষ তাকে নিয়ে বিরাট জ্ঞানের জগৎ রচনা করলে। বিশ্বজগতে মানুষের যে-যোগটা ছিল ইন্দ্রিয়বোধের দেখাশোনায়, সেইটেকে জ্ঞানের যোগে বিশেষভাবে অধিকার ক'রে নিলে সকল দেশের সকল কালের মানুষের বুদ্ধি।

ভাবপ্রকাশের দিকেও মানুষের সেই দশা ঘটল। তার খুশি, তার দুঃখ, তার রাগ, তার ভালোবাসাকে মানুষ কেবলমাত্র প্রকাশ করল তা নয়, তাকে প্রকাশের উৎকর্ষ দিতে লাগল ; তাতে সে আশু উদ্‌বেগের প্রবর্তনা ছাড়িয়ে গেল, তাতে মানুষ লাগালে ছন্দ, লাগালে সুর, ব্যক্তিগত বেদনাকে দিলে বিশ্বজনীন রূপ। তার আপন ভালোমন্দলাগার জগৎকে অন্তরঙ্গ ভাবে সকল মানুষের সাহিত্যজগৎ করে নিলে।

সাহিত্য শব্দটার কোনো ধাতুগত অর্থব্যাখ্যা কোনো অলংকারশাস্ত্রে আছে কি না জানি না। ঐ শব্দটার যখন প্রথম উদ্ভাবন হয়েছিল তখন ঠিক কী বুঝে-হয়েছিল তা নিশ্চিত বলবার মতো বিদ্যা আমার নেই। কিন্তু, আমি যাকে সাহিত্য বলে থাকি তার সঙ্গে ঐ শব্দটার অর্থের মিল করে যদি দেখাই তবে তাতে বোধ করি দোষ হবে না।

সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য, অর্থাৎ সম্মিলন। মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলবারই জন্যে, অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশে। শাকসবজির খেতের সঙ্গে মানুষের যোগ ফসল-ফলানোর যোগ। ফুলের বাগানের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ পৃথক জাতের। সবজি খেতের শেষ উদ্দেশ্য খেতের বাইরে, সে হচ্ছে ভোজ্যসংগ্রহ। ফুলের বাগানের যে-উদ্দেশ্য তাকে এক হিসাবে সাহিত্য বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, মন তার সঙ্গে মিলতে চায়— সেখানে গিয়ে বসি, সেখানে বেড়াই, সেখানকার সঙ্গে যোগে মন খুশি হয়।

এর থেকে বুঝতে পারি, ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য কী। তার কাজ হচ্ছে হৃদয়ের যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।

ব্যাবসাদার গোলাপ-জলের কারখানা করে, শহরের হাটে বিক্রি করতে পাঠায় ফুল। সেখানে ফুলের সৌন্দর্যমহিমা গৌণ, তার বাজারদরের হিসাবটাই মুখ্য। বলা বাহুল্য, এই হিসাবটাতে আগ্রহ থাকতে পারে, কিন্তু রস নেই। ফুলের সঙ্গে অহৈতুক মিলনে এই হিসাবের চিন্তাটা আড়াল তুলে দেয়। গোলাপ-জলের কারখানাটা সাহিত্যের সামগ্রী হল না। হতেও পারে কবির হাতে, কিন্তু মালেকের হাতে নয়।

সে অনেক দিনের কথা, বোটে চলেছি পদ্মায়। শরৎকালের সন্ধ্যা ; সূর্য মেঘস্তবকের মধ্যে তাঁর শেষ ঐশ্বর্যের সর্বস্বদান পণ ক'রে সদ্য অস্ত গেছেন। আকাশের নীরবতা অনির্বচনীয় শান্তরসে কানায় কানায় পূর্ণ ; ভরা নদীতে কোথাও একটু চাঞ্চল্য নেই ; স্তব্ধ চিক্কণ জলের উপর সন্ধ্যাভ্রের নানা বর্ণের দীপ্তিচ্ছায়া ম্লান হয়ে মিলিয়ে আসছে। পশ্চিম দিকের তীরে দিগন্তপ্রসারিত জনশূন্য বালুচর প্রাচীন যুগান্তরের অতিকায় সরীসৃপের মতো পড়ে আছে। বোট চলেছে অন্য পারের প্রান্ত বেয়ে, ভাঙন-ধরা খাড়া পাড়ির তলা দিয়ে দিয়ে ; পাড়ির গায়ে শত শত গর্তে গাঙশালিকের বাসা ; হঠাৎ একটা বড়ো মাছ জলের তলা থেকে ক্ষণিক কলশব্দে লাফ দিয়ে উঠে বঙ্কিম ভঙ্গিতে তখনই তলিয়ে গেল। আমাকে চকিত আভাসে জানিয়ে দিয়ে গেল এই জলযবনিকার অন্তরালে নিঃশব্দ জীবলোকে নৃত্যপর প্রাণের আনন্দের কথা, আর সে যেন নমস্কার নিবেদন করে গেল বিলীয়মান দিনান্তের কাছে। সেই মুহূর্তেই তপসিমাঝি চাপা আক্ষেপের সুরে সনিশ্বাসে বলে উঠল, 'ও ! মস্ত মাছটা।' মাছটা ধরা পড়েছে আর সেটা তৈরি হচ্ছে রান্নার জন্যে, এই ছবিটাই তার মনে জেগে উঠল ; চার দিকের অন্য ছবিটা খণ্ডিত হয়ে দূরে গেল স'রে। বলা যেতে পারে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার সাহিত্য গেল নষ্ট হয়ে।

আহারে তার আসক্তি তাকে আপন জঠরগহ্বরের কেন্দ্রে টেনে রাখল। আপনাকে না ভুললে মিলন হয় না।

মানুষের নানা চাওয়া আছে, সেই চাওয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে খাবার জন্যে এই মাছকে চাওয়া। কিন্তু, তার চেয়ে তার বড়ো চাওয়া, বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলন চাওয়া— নদীতীরে সেই সূর্যাস্ত-আলোকে-মহিমান্বিত দিনাবসানকে সমস্ত মনের সঙ্গে মিলিত করতে চাওয়া। এই চাওয়া আপনার অবরোধের মধ্য থেকে আপনাকে বাইরে আনতে চাওয়া। বক দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বনের প্রান্তে সরোবরের তটে, সূর্য উঠছে আকাশে, আরক্ত রশ্মির স্পর্শপাতে জল উঠছে ঝলমল করে— এই দৃশ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্মিলিত আপনার মনটিকে ঐ বক কি চাইতে জানে। এই আশ্চর্য চাওয়ার প্রকাশ মানুষের সাহিত্যে। তাই ভর্তৃহরি বলেছেন, যে-মানুষ সাহিত্যসংগীতকলাবিহীন সে পশু, কেবল তার পুচ্ছবিষাণ নেই এইমাত্র প্রভেদ। পশুপক্ষীর চৈতন্য প্রধানত আপন জীবিকার মধ্যেই বদ্ধ— মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে প্রসারিত করছে নিজেকে, সাহিত্য তারই একটি বড়ো পথ।

আমি যে-টেবিলে বসে লিখছি তার এক ধারে এক পুষ্পপাত্রে আছে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, আর-একটাতে আছে ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সাদা গন্ধরাজ। লেখবার কাজে এর প্রয়োজন নেই। এই অপ্রয়োজনের আয়োজনে আমার একটা আত্মসম্মানের ঘোষণা আছে মাত্র। ঐটেতে আমার একটা কথা নীরবে রয়ে গেছে ; সে এই যে, জীবনযাত্রার প্রয়োজন আমার চার দিকে আপন নীরন্ধ্র প্রাচীর তুলে আমাকে আটক করে নি। আমার মুক্ত স্বরূপ আপনাকে প্রমাণ করছে ঐ ফুলের পাত্রে। চৈতন্য যার বন্দী, বিশ্বের সঙ্গে যথার্থ সাহিত্যলাভের মাঝখানে তার বাধা আছে— তার রিপু, তার দুর্বলতা, তার কল্পনাদৃষ্টির অন্ধতা। আমি বন্দী নই, আমার দ্বার খোলা, তার প্রমাণ দেবে ঐ অনাবশ্যক ফুল ; ওর সঙ্গে যোগ বিশ্বের সঙ্গে যোগেরই একটি মুক্ত বাতায়ন। ওকে চেয়েছি সেই অহৈতুক চাওয়ায় মানুষ যাতে মুক্ত হয় একান্ত আবশ্যিকতা থেকে। এই আপন নিষ্কাম সম্বন্ধটি স্বীকার করবার জন্যে মানুষের কত উদ্যোগ তার সংখ্যা নেই। এই কথাটাই ভালো করে প্রকাশ করবার জন্যে মানবসমাজে রয়েছে কত কবি, কত শিল্পী।

সদ্য-তৈরি নতুন মন্দির, চুনকাম-করা। তার চার দিকে গাছপালা। মন্দিরটা তার আপন শ্যামল পরিবেশের সঙ্গে মিলছে না। সে আছে উদ্ধত হয়ে, স্বতন্ত্র হয়ে। তার উপর দিয়ে কালের প্রবাহ বইতে থাক্‌, বৎসরের পর বৎসর এগিয়ে চলুক। বর্ষার জলধারায় প্রকৃতি তার অভিষেক করুক, রৌদ্রের তাপে তার বালির বাঁধন কিছু কিছু খসতে থাক্‌, অদৃশ্য শৈবালের বীজ লাগুক তার গায়ে এসে ; তখন ধীরে ধীরে বনপ্রকৃতির রঙ লাগবে এর সর্বাঙ্গে, চারি দিকের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হতে থাকবে। বিষয়ী লোক আপনার চার দিকের সঙ্গে মেলে না, সে আপনাতে আপনি পৃথক ; এমন-কি, জ্ঞানীর লোকও মেলে না, সে স্বতন্ত্র ; মেলে ভাবুক লোক। সে আপন ভাবরসে বিশ্বের দেহে আপন রঙ লাগায়, মানুষের রঙ। স্বভাবত বিশ্বজগৎ আমাদের কাছে তার বিশুদ্ধ প্রাকৃতিকতায় প্রকাশ পায়। কিন্তু, মানুষ তো কেবল প্রাকৃতিক নয়, সে মানসিক। মানুষ তাই বিশ্বের উপর অহরহ আপন মন প্রয়োগ করতে থাকে। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তোলে। জগৎটা মানুষের ভাবানুষঙ্গে অর্থাৎ তার অ্যাসোসিয়েশনে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মানবিক পরিণতির পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটে। আদিযুগের মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতি যা ছিল আমাদের কাছে তা নেই। প্রকৃতিকে আমাদের মানবভাবের যতই অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি আমাদের মনের পরিণতিও ততই বিস্তার ও বিশেষত্ব লাভ করেছে।

আমাদের জাহাজ এসে লাগছে জাপান-বন্দরে। চেয়ে দেখলুম দেশটার দিকে— নতুন লাগল, সুন্দর লাগল। জাপানি এসে দাঁড়ালো ডেকের রেলিং ধরে। সে কেবল সুন্দর দেশ দেখলে না ; সে দেখলে যে-জাপানের গাছপালা নদী পর্বত যুগে যুগে মানবমনের সংস্পর্শে বিশেষ রসের রূপ নিয়েছে সেটা প্রকৃতির নয়, সেটা মানুষের। এই রসরূপটি মানুষই প্রকৃতিকে দিয়েছে, দিয়ে তার সঙ্গে

মানবজীবনের একান্ত সাহিত্য ঘটিয়েছে। মানুষের দেশ যেমন কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নয়, তা মানবিক, সেইজন্যে দেশ তাকে বিশেষ আনন্দ দেয়— তেমনি মানুষ সমস্ত জগৎকে হৃদয়রসের যোগে আপন মানবিকতায় আবৃত করছে, অধিকার করছে, তার সাহিত্য ঘটছে সর্বত্রই। মানুষেরা সর্বমেবাবিশন্তি।

বাহিরের তথ্য বা ঘটনা যখন ভাবের সামগ্রী হয়ে আমাদের মনের সঙ্গে রসের প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ স্বভাবতই ইচ্ছা করে, সেই মিলনকে সর্বকালের সর্বজনের অঙ্গীকারভুক্ত করতে। কেননা, রসের অনুভূতি প্রবল হলে সে ছাপিয়ে যায় আমাদের মনকে। তখন তাকে প্রকাশ করতে চাই নিত্যকালের ভাষায়; কবি সেই ভাষাকে মানুষের অনুভূতির ভাষা ক'রে তোলে; অর্থাৎ জ্ঞানের ভাষা নয়, হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা। আমরা যখনই বিশ্বের যে-কোনো বস্তুকে বা ব্যাপারকে ভাবের চক্ষে দেখি তখনই সে আর যন্ত্রের দেখা থাকে না; ফোটোগ্রাফিক লেন্সের যে যথাতথ দেখা তার থেকে তার স্বতই প্রভেদ ঘটে। সেই প্রভেদটাকে অবিকল বর্ণনার ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মায়ের চোখে দেখা খোকার পায়ে ছোট্টো লাল জুতোকে জুতো বললে তাকে যথার্থ করে বলাই হয় না। মাকে তাই বলতে হল—

> খোকা যাবে নায়ে,
> লাল জুতুয়া পায়ে।

অভিধানের কোথাও এ শব্দ নেই। বৈষ্ণবপদাবলীতে যে মিশ্রিত ভাষা চলে গেছে সেটা যে কেবলমাত্র হিন্দিভাষার অপভ্রংশ তা নয়, সেটাকে পদকর্তারা ইচ্ছা ক'রেই রক্ষা করেছেন, কেননা অনুভূতির অসাধারণতা ব্যক্ত করবার পক্ষে সাধারণ ভাষা সহজ নয়। ভাবের সাহিত্য মাত্রেই এমন একটা ভাষার সৃষ্টি হয় যে-ভাষা কিছু-বা বলে, কিছু-বা গোপন করে; কিছু যার অর্থ আছে, কিছু আছে সুর। এই ভাষাকে কিছু আড় ক'রে, বাঁকা ক'রে, এর সঙ্গে রূপক মিশিয়ে, এর অর্থকে উলট-পালট ক'রে তবেই বস্তুবিশ্বের প্রতিঘাতে মানুষের মধ্যে যে ভাবের বিশ্ব সৃষ্টি হতে থাকে তাকে সে প্রকাশ করতে পারে। নইলে কবি বলবে কেন 'দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়।' দেখবার আগ্রহ একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র। সেই ঘটনাকে বাইরের জিনিস ক'রে না রেখে তাকে মনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল যখন, কবি একটা অদ্ভুত কথা বললে, দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়। আগ্রহ যে পাখির মতন ধায় এটা মনের সৃষ্ট ভাষা, বিবরণের ভাষা নয়।

গোধূলিবেলার অন্ধকারে রূপসী মন্দির থেকে বাইরে এল, এ ঘটনাটা বাহ্য ঘটনা এবং অত্যন্ত সাধারণ। কবি বললেন, নববর্ষার মেঘে বিদ্যুতের রেখা যেন দ্বন্দ্ব প্রসারিত করে দিয়ে গেল। এই উপমার যোগে বাহিরের ঘটনা আপন চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল। আমাদের অন্তরে মন এ'কে সৃষ্টির বিষয় করে তুলে আপন করে নিলে।

কোনো এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক কবির লিখিত কোনো-একটি শ্লোকের গদ্য অনুবাদ দিচ্ছি, ইংরেজি তর্জমার থেকে: আপেল গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে ঝুরুঝুরু বইছে শরতের হাওয়া; থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে-ওঠা পাতার মধ্যে থেকে ঘুম আসছে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর দিকে— ছড়িয়ে পড়ছে নদীর ধারার মতো। এই-যে কম্পমান ডালপালার মধ্যে মর্মরমুখর স্নিগ্ধ হাওয়ায় নিঃশব্দ নদীর মতো ব্যাপ্ত হয়ে পড়া ঘুমের রাত্রি, এ আমাদের মনের রাত্রি। এই রাত্রিকে আমরা আপন ক'রে তুলে তবেই পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারি।

কোনো চীনদেশীয় কবি বলছেন—

> পাহাড় একটানা উঠে গেছে বহুশত হাত উচ্চে;
> সরোবর চলে গেছে শত মাইল,
> কোথাও তার ঢেউ নেই;
> বালি ধূ ধূ করছে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র;
> শীতে গ্রীষ্মে সমান অক্ষুণ্ণ সবুজ দেওদার-বন
> নদীর ধারা চলেইছে, বিরাম নেই তার;

গাছগুলো বিশ হাজার বছর
আপন পণ সমান রক্ষা ক'রে এসেছে—
হঠাৎ এরা একটি পথিকের মন থেকে
জুড়িয়ে দিল সব দুঃখবেদনা,
একটি নতুন গান বানাবার জন্যে
চালিয়ে দিল তার লেখনীকে।

মানুষের দুঃখ জুড়িয়ে দিল নদী পর্বত সরোবর। সম্ভব হয় কী ক'রে। নদী পর্বতের অনেক প্রাকৃতিক গুণ আছে কিন্তু সান্ত্বনার মানসিক গুণ তো নেই। মানুষের আপন মন তার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে নিজের সান্ত্বনা সৃষ্টি করে। যা বস্তুগত জিনিস তা মানুষের মনের স্পর্শে তারই মনের জিনিস হয়ে ওঠে। সেই মনের বিশ্বের সম্মিলনে মানুষের মনের দুঃখ জুড়িয়ে যায়, তখন সেই সাহিত্য থেকেই সাহিত্য জাগে।

বিশ্বের সঙ্গে এই মিলনটি সম্পূর্ণ অনুভব করার এবং ভোগ করার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। কারণ, যে-শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে-শক্তি হচ্ছে কল্পনাশক্তি ; এই কল্পনাশক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ ক'রে তোলে, যা-কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়, যা আমাদের মনের জিনিস নয় তার মধ্যেও মন প্রবেশ ক'রে তাকে মনোময় ক'রে তুলতে পারে। এই লীলা মানুষের, এই লীলায় তার আনন্দ। যখন মানুষ বলে 'কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে' তখন বুঝতে হবে, যে-মানুষকে মন দিয়ে নিজেরই ভাবরসে আপন ক'রে তুলতে হয় তাকেই আপন করা হয় নি— সেইজন্যে 'হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।' মন তাকে মনের ক'রে নিতে পারে নি ব'লেই বাইরে বাইরে ঘুরছে। মানুষের বিশ্ব মানুষের মনের বাইরে যদি থাকে সেটাই নিরানন্দের কারণ হয়। মন যখন তাকে আপন ক'রে নেয় তখনই তার ভাষায় শুরু হয় সাহিত্য, তার লেখনী বিচলিত হয় নতুন গানের বেদনায়।

মানুষও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত। নানা অবস্থার ঘাতে প্রতিঘাতে বিশ্ব জুড়ে মানবলোকে হৃদয়াবেগের ঢেউখেলা চলেছে। সমগ্র ক'রে, একান্ত ক'রে, স্পষ্ট ক'রে তাকে দেখার দুটি মস্ত ব্যাঘাত আছে। পর্বত বা সরোবর বিরাজ করে অক্রিয় অর্থাৎ প্যাসিভ্ ভাবে ; আমাদের সঙ্গে তাদের যে-ব্যবহার সেটা প্রাকৃতিক, তার মধ্যে মানসিক কিছু নেই, এইজন্যে মন তাকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে আপন ভাবে ভাবিত করতে পারে সহজেই। কিন্তু, মানবসংসারের বাস্তব ঘটনাবলীর সঙ্গে আমাদের মনের যে-সম্পর্ক ঘটে সেটা সক্রিয়। দুঃশাসনের হাতে কৌরবসভায় দ্রৌপদীর যে-অসম্মান ঘটেছিল তদনুরূপ ঘটনা যদি পাড়ায় ঘটে তা হলে তাকে আমরা মানবভাগ্যের বিরাট শোকাবহ লীলার অঙ্গরূপে বড়ো ক'রে দেখতে পারি নে। নিত্যঘটনাবলীর ক্ষুদ্র সীমায় বিচ্ছিন্ন একটা অন্যায় ব্যাপার ব'লেই তাকে জানি, সে একটা পুলিস-কেস রূপেই আমাদের চোখে পড়ে— ঘৃণার সঙ্গে ধিককারের সঙ্গে প্রাত্যহিক সংবাদ-আবর্জনার মধ্যে তাকে ঝেঁটিয়ে ফেলি। মহাভারতের খাণ্ডববন-দাহ বাস্তবতার একান্ত নৈকট্য থেকে বহু দূরে গেছে— সেই দূরত্ববশত সে অকর্তৃক হয়ে উঠেছে। মন তাকে তেমনি ক'রেই সম্ভোগদৃষ্টিতে দেখতে পারে যেমন ক'রে সে দেখে পর্বতকে সরোবরকে। কিন্তু, যদি খবর পাই, অগ্নিগিরিস্রাবে শত শত লোকালয় শস্যক্ষেত্র পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, দগ্ধ হচ্ছে শত শত মানুষ পশুপক্ষী, তবে সেটা আমাদের করুণা অধিকার ক'রে চিত্তকে পীড়িত করে। ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয় তখনই আমাদের মনের কাছে তার সাহিত্য হয় বিশুদ্ধ ও বাধাহীন।

মানবঘটনাকে সুস্পষ্ট ক'রে দেখবার আর-একটি ব্যাঘাত আছে। সংসারে অধিকাংশ স্থলেই ঘটনাগুলি সুসংলগ্ন হয় না, তার সমগ্রতা দেখতে পাই নে। আমাদের কল্পনার দৃষ্টি ঐক্যকে সন্ধান

করে এবং ঐক্যস্থাপন করে। পাড়ায় কোনো দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য হয়তো জেনেছি বা খবরের কাগজে পড়েছি। কিন্তু, এই ঘটনাটি তার পূর্ববর্তী পরবর্তী দূর-শাখা-প্রশাখাবর্তী একটা প্রকাণ্ড ট্রাজেডিকে অধিকার ক'রে হয়তো রয়েছে— আমাদের সামনে সেই ভূমিকাটি নেই— এই ঘটনাটি হয়তো সমস্ত বংশের মধ্যে পিতামাতার চরিত্রের ভিতর দিয়ে অতীতের মধ্যেও প্রসারিত, কিন্তু সে আমাদের কাছে অগোচর। আমরা তাকে দেখি টুকরো টুকরো ক'রে, মাঝখানে বহু অবান্তর বিষয় ও ব্যাপারের দ্বারা সে পরিচ্ছিন্ন ; সমস্ত ঘটনাটির সম্পূর্ণতার পক্ষে তাদের কোন্‌গুলি সার্থক, কোন্‌গুলি নিরর্থক, তা আমরা বাছাই ক'রে নিতে পারি নে। এইজন্যে তার বৃহৎ তাৎপর্য ধরা পড়ে না। যাকে বলছি বৃহৎ তাৎপর্য তাকে যখন সমগ্র ক'রে দেখি তখনই সাহিত্যের দেখা সম্ভব হয়। ফরাসি-রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় প্রতিদিন যে-সকল খণ্ড খণ্ড ঘটনা ঘটছিল সেদিন তাদের চরম অর্থ কেই-বা দেখতে পেয়েছে ; কার্লাইল তাদের বাছাই ক'রে নিয়ে আপনার কল্পনার পটে সাজিয়ে একটি সমগ্রতার ভূমিকায় যখন দেখলেন, তখন আমাদের মন এই-সকল বিচ্ছিন্নকে নিরবচ্ছিন্নরূপে অধিকার করতে পেরে নিকটে পেলে। খাঁটি ইতিহাসের পক্ষ থেকে তাঁর বাছাইয়ে অনেক দোষ থাকতে পারে, অনেক অত্যুক্তি অনেক ঊনোক্তি হয়তো আছে এর মধ্যে ; বিশুদ্ধ তথ্যবিচারের পক্ষে যে-সব দৃষ্টান্ত অত্যাবশ্যক তার হয়তো অনেক বাদ পড়ে গেছে। কিন্তু, কার্লাইলের রচনায় যে সুনিবিড় সমগ্রতার ছবি আঁকা হয়েছে তার উপরে আমাদের মন অব্যবহিতভাবে যুক্ত ও ব্যাপ্ত হতে বাধা পায় না ; এইজন্যে ইতিহাসের দিক থেকে যদি-বা সে অসম্পূর্ণ হয় তবু সাহিত্যের দিক থেকে সে পরিপূর্ণ।

এই বর্তমানকালেই আমাদের দেশে চার দিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে রাষ্ট্রিক উদ্যোগের নানা প্রয়াস নানা ঘটনায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। ফৌজদারি শাসনতন্ত্রের বিশেষ বিশেষ আইনের কোঠায় তাদের বিবরণ শুনছি সংবাদপত্রের নানাজাতীয় আশুবিলীয়মান মর্মরধ্বনির মধ্যে। ভারতবর্ষের এ যুগের সমগ্র রাষ্ট্ররূপের মধ্যে, তাদের পূর্ণভাবে দেখবার সুযোগ হয় নি ; যখন হবে তখন তারা মানুষের সমস্ত বীর্য সমস্ত বেদনা, সমস্ত ব্যর্থতা বা সার্থকতা, সমস্ত ভুলত্রুটি নিয়ে সংবাদপত্রের ছায়ালোক থেকে উঠবে সাহিত্যের জ্যোতিষ্কলোকে। তখন জজ ম্যাজিস্ট্রেট, আইনের বই, পুলিসের যষ্টি, সমস্ত হবে গৌণ ; তখন আজকের দিনের ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছোটো-বড়ো দ্বন্দ্ব-বিরোধ একটা বৃহৎ ভূমিকায় ঐক্য লাভ ক'রে নিত্যকালের মানবমনে বিরাটমূর্তিতে প্রত্যক্ষ হবার অধিকারী হবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের নানাবিধ সম্বন্ধ ও সংঘাত নিয়ে পৃথিবী জুড়ে আমাদের অভিজ্ঞতা বিচিত্র হয়ে চলেছে। সে একটা মানসজগৎ, বহু যুগের রচনা। তাকে আমরা নৃতত্ত্বের দিক থেকে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে, ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার ক'রে মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারি। সে হল তথ্য-সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ। কিন্তু, এই অভিজ্ঞতার জগতে আমরা প্রকাশবৈচিত্র্যবান মানুষের নৈকট্য কামনা করি। এই চাওয়াটা আমাদের মনে অত্যন্ত গভীর ও প্রবল। শিশুকাল থেকে মানুষ বলেছে 'গল্প বলো' ; সেই গল্প তথ্যের প্রদর্শনী নয়, কোনো-একটা মানবপরিচয়ের সমগ্র ছবি, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বেঁধেছে তার মধ্যে। রূপের মোহিনী শক্তি, বিপদের পথে বীরত্বের অধ্যবসায়, দুর্লভের সন্ধানে দুঃসাধ্য উদ্যম, মন্দের সঙ্গে ভালোর লড়াই, ভালোবাসার সাধনা, ঈর্ষায় তার বিঘ্ন, এ-সমস্ত হৃদয়বোধ নানা অবস্থায় নানা আকারে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে ; এর কোনোটা সুখের কোনোটা দুঃখের, এদের সাজিয়ে গল্পের ছবিতে রূপ দিয়ে রূপকথায় ছেলেদের জন্যে জোগানো হচ্ছে আদিকাল থেকে। এর মধ্যে অলৌকিক জীবের কথাও আছে, কিন্তু তারা মানুষেরই প্রতীক। আছে দৈত্য-দানব, বস্তুত তারা মানুষ ; ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমি, তারাও তাই। এই-সব গল্পে মানুষের বাস্তব জগৎ কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে শিশুমনের জগৎ-রূপে দেখা দেয় ; শিশু আনন্দিত হয়ে ওঠে। মানুষ যে স্বভাবত সৃষ্টিকর্তা তাই সে সব-কিছুকে আপন সৃষ্টিতে পরিণত ক'রে তাতে বাসা বাঁধে ; নিছক বিধাতার সৃষ্টিতে তাকে কুলোয় না। মানুষ আপন হাতে আপনাকে, আপন সংসারকে তৈরি ক'রে, সেই সংসারের ছবি বানায় আপন হাতে— তাতে তাকে নিবিড় আনন্দ দেয়, কেননা সেই ছবি তার মনের নিতান্ত কাছে আসে। যে-শকুন্তলার ঘটনা মানবসংসারে ঘটতে পারে তাকেই কবি

আমাদের মনের কাছে নিবিড়তর সত্য ক'রে দেখিয়ে দেন। রামায়ণ রচিত হল, রচিত হল মহাভারত। রামকে পেলুম ; সে তো একটিমাত্র মানুষের রূপ নয়, অনেক কাল থেকে অনেক মানুষের মধ্যে যে-সকল বিশেষ গুণের ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু স্বাদ পাওয়া গেছে কবির মনে সে-সমস্তই দানা বেঁধে উঠল রামচন্দ্রের মূর্তিতে। রামচন্দ্র হয়ে উঠলেন আমাদের মনের মানুষ। বাস্তব সংসারে অনেক বিক্ষিপ্ত ভালো লোকের চেয়ে রামচন্দ্র আমাদের মনের কাছে সত্যমানুষ হয়ে ওঠেন। মন তাঁকে যেমন ক'রে স্বীকার করে প্রত্যক্ষ হাজার হাজার লোককে তেমন ক'রে স্বীকার করে না। মনের মানুষ বলতে যে বুঝতে হবে আদর্শ ভালো লোক তা নয়। সংসারে মন্দ লোকও আছে ছড়িয়ে, নানা-কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে ; আমাদের পাঁচ-মিশোলি অভিজ্ঞতার মধ্যে তাদের মন্দত্ব অসংলগ্ন হয়েই দেখা দেয়। সেই বহু লোকের বহুবিধ মন্দত্বের খণ্ড খণ্ড পরিচয় সংসারে আমাদের কাছে ক্ষণে ক্ষণে এসে পড়ে ; তারা আসে, তারা যায়, তারা আঘাত করে, নানা ঘটনায় চাপা প'ড়ে তারা অগোচর হতে থাকে। সাহিত্যে তারা সংহত আকারে ঐক্য লাভ ক'রে আমাদের নিত্যমনের সামগ্রী হয়ে ওঠে ; তখন তাদের আর ভুলতে পারি নে। শেক্‌স্‌পীয়রের রচিত ফল্‌স্‌টাফ্‌ একটি বিশিষ্ট মানুষ সন্দেহ নেই। তবু বলতে হবে, আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেক মানুষের কিছু কিছু আভাস আছে, শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিভার গুণে তাদের সমবায় ঘনীভূত হয়েছে ফল্‌স্‌টাফ্‌ চরিত্রে। জোড়া লাগিয়ে তৈরি নয়, কল্পনার রসে জারিত ক'রে তার সৃষ্টি ; তার সঙ্গে আমাদের মনের মিল খুব সহজ, এইজন্যে তাতে আমাদের আনন্দ।

এমন কথা মনে হতে পারে, সাবেক-কালের কাব্য-নাটকে আমরা যাদের দেখতে পাই তারা এক-একটা টাইপ, তারা শ্রেণীগত ; তাই তারা একই-জাতীয় অনেকগুলি মানুষের ভাঙাচোরা উপকরণ নিয়ে তৈরি। কিন্তু, আধুনিক কালে সাহিত্যে আমরা যে-চরিত্র দেখি তা ব্যক্তিগত।

প্রথম কথা এই যে, ব্যক্তিগত মানুষেরও শ্রেণীগত ভিত্তি আছে, একান্ত শ্রেণীবিচ্ছিন্ন মানুষ নেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে বহু মানুষ, আর সেইসঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে সেই এক মানুষ যে বিশেষ। চরিত্রসৃষ্টিতে শ্রেণীকে লঘু ক'রে ব্যক্তিকেই যদি-বা প্রাধান্য দিই তবু সেই ব্যক্তিকে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অধিগম্য করতে হলে তাতে আর্টিস্টের হাত পড়া চাই। এই আর্টিস্টের সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টির ধারা অনুসরণ করে না। এই সৃষ্টিতে যে-মানুষকে দেখি, প্রকৃতির হাতে যদি সে তৈরি হত তা হলে তার মধ্যে অনেক বাহুল্য থাকত ; সে বাস্তব যদি হত তবু সত্য হত না, অর্থাৎ আমাদের হৃদয় তাকে নিঃসংশয় প্রামাণিক ব'লে মানত না। তার মধ্যে অনেক ফাঁক থাকত, অনেক-কিছু থাকত যা নিরর্থক,আগে-পিছের ওজন ঠিক থাকত না। তার ঐক্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হত না। শতদল পদ্মে যে-ঐক্য দেখে আমরা তাকে মুহূর্তেই বলি সুন্দর, তা সহজ— তার সংকীর্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যে কোথাও পরস্পর দ্বন্দ্ব নেই, এমন-কিছু নেই যা অযথা ; আমাদের হৃদয় তাকে অধিকার করতে পারে অনায়াসে, কোথাও বাধা পায় না। মানুষের সংসারে দ্বন্দ্ববহুল বৈচিত্র্যে আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। যদি তার কোনো একটি প্রকাশকে স্পষ্টরূপে হৃদয়গম্য করতে হয় তা হলে আর্টিস্টের সুনিপুণ কল্পনা চাই। অর্থাৎ, বাস্তবে যা আছে বাইরে তাকে পরিণত ক'রে তুলতে হবে মনের জিনিস ক'রে। আর্টিস্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর— সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশমত। তার কোনোটাকে বাড়াতে হবে, কোনোটাকে কমাতে : কোনোটাকে সামনে রাখতে হবে, কোনোটাকে পিছনে। বাস্তবে যা বাহুল্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত তাকে এমন ক'রে সংহত করতে হবে যাতে আমাদের মন তাকে সহজে গ্রহণ ক'রে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। প্রকৃতির সৃষ্টির দূরত্ব থেকে মানুষের ভাষায় সেতু বেঁধে তাকে মর্মঙ্গম নৈকট্য দিতে হবে ; সেই নৈকট্য ঘটায় ব'লেই সাহিত্যকে আমরা সাহিত্য বলি।

মানুষ যে-বিশ্বে জন্মেছে, তাকে দুই দিক থেকে কেবলই আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছে, ব্যবহারের দিক থেকে আর ভাবের দিক থেকে। আগুন যেখানে প্রচ্ছন্ন সেখানে মানুষ জ্বালল আগুন নিজের হাতে ; আকাশের আলো যেখানে অগোচর সেখানে সে বৈদ্যুতিক আলোককে প্রকাশ করলে নিজের কৌশলে ; প্রকৃতি আপনি যে ফলমূল ফসল বরাদ্দ করে দিয়েছে তার অনিশ্চয়তা ও অসচ্ছলতা সে

দূর করেছে নিজের লাঙলের চাষে ; পর্বতে অরণ্যে গুহাগহ্বরে সে বাস করতে পারত, করে নি— সে নিজের সুবিধা ও রুচি-অনুসারে আপন বাসা আপনি নির্মাণ করেছে। পৃথিবীকে সে অযাচিত পেয়েছিল। কিন্তু, সে পৃথিবী তার ইচ্ছার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশ খায় নি ; তাই আদিকাল থেকেই প্রাকৃতিক পৃথিবীকে মানব বুদ্ধিকৌশলে আপন ইচ্ছানুগত মানবিক পৃথিবী ক'রে তুলছে— সেজন্যে তার কত কলবল, কত নির্মাণনৈপুণ্য। এখানকার জলে স্থলে আকাশে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ আপন ইচ্ছাকে প্রসারিত ক'রে দিচ্ছে। উপকরণ পাচ্ছে সেই পৃথিবীরই কাছ থেকে, শক্তি ধার করছে তারই গুপ্ত ভাণ্ডারে প্রবেশ ক'রে। সেগুলিকে আপন পথে আপন মতে চালনা ক'রে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়ে দিচ্ছে। মানুষের নগরপল্লী, শস্যক্ষেত্র, উদ্যান, হাট-ঘাট, যাতায়াতের পথ, প্রকৃতির সহজ অবস্থাকে ছাপিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে উঠছে। পৃথিবীর নানা দেশে ছড়ানো ধনকে মানুষ এক করেছে, নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সে সংহত করেছে ; এমনি করে দেশ-দেশান্তরে পৃথিবী ক্রমশই অভিভূত হয়ে আত্মসমর্পণ করে আসছে মানুষের কাছে। মানুষের বিশ্বজয়ের এই একটা পালা বস্তুজগতে ; ভাবের জগতে তার আছে আর-একটা পালা। ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে এক দিকে তার জয়স্তম্ভ, আর-এক দিকে শিল্পে সাহিত্যে।

যেদিন থেকে মানুষের হাত পেয়েছে নৈপুণ্য, তার ভাষা পেয়েছে অর্থ, সেই দিন থেকেই মানুষ তার ইন্দ্রিয়বোধগম্য জগৎ থেকে নানা উপাদানে উদ্ভাবিত করছে তার ভাবগম্য জগৎকে। তার স্বরচিত ব্যাবহারিক জগতে যেমন এখানেও তেমনি ; অর্থাৎ তার চার দিকে যা-তা যেমন-তেমন ভাবে রয়েছে তাকেই সে অগত্যা স্বীকার করে নেয় নি। কল্পনা দিয়ে তাকে এমন রূপ দিয়েছে, হৃদয় দিয়ে তাতে এমন রস দিয়েছে, যাতে সে মানুষের মনের জিনিস হয়ে তাকে দিতে পারে আনন্দ।

ভাবের জগৎ বলতে আমরা কী বুঝি। হৃদয় যাকে উপলব্ধি করে বিশেষ রসের যোগে ; অনতিলক্ষ্য বহু অবিশেষের মধ্য থেকে কল্পনার দৃষ্টিতে যাকে আমরা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করি ; সেই উপলব্ধি করা, সেই লক্ষ্য করাটাই যেখানে চরম বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলছি, জ্যোৎস্নারাত্রি। সে রাত্রির বিশেষ একটি রস আছে, মনকে তা অধিকার করে। শুধু রস নয়, রূপ আছে তার— দেখি তা কল্পনার চোখে। গাছের ডালে, বনের পথে, বাড়ির ছাদে, পুকুরের জলে নানা ভঙ্গিতে তার আলোছায়ার কোলাকুলি। সেইসঙ্গে নানা ধ্বনির মিলন— পাখির বাসায় হঠাৎ পাখা ঝাড়ার শব্দ, বাতাসে বাঁশপাতার ঝরঝরানি, অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঝোপের মধ্য থেকে উঠছে ঝিল্লিধ্বনি; নদী থেকে শোনা যায় ডিঙি চলেছে তারই দাঁড়ের ঝপ্ ঝপ্, দূরে কোন্ বাড়িতে কুকুরের ডাক। বাতাসে অদেখা অজানা ফুলের মৃদু গন্ধ যেন পা টিপে টিপে চলেছে, কখনো তারই মাঝে মাঝে নিশ্বসিত হয়ে উঠছে জানা ফুলের পরিচয়। বহু প্রকারের স্পষ্ট ও অস্পষ্টকে এক ক'রে নিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রির একটা স্বরূপ দেখতে পায় আমাদের কল্পনা দৃষ্টি। এই কল্পনাদৃষ্টিতে বিশেষ ক'রে সমগ্র ক'রে দেখার জ্যোৎস্নারাত্রি মানুষের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি জিনিস। তাকে নিয়ে মানুষের সেই অত্যন্ত কাছে পাওয়ার, মিলে যাওয়ার আনন্দ।

গোলাপ-ফুল অসামান্য ; সে আপন সৌন্দর্যেই আমাদের কাছে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, সে স্বতই আমাদের মনের সামগ্রী। কিন্তু, যা সামান্য, যা অসুন্দর, তাকে আমাদের মন কল্পনার ঐক্যদৃষ্টিতে বিশিষ্ট ক'রে দেখাতে পারে ; বাইরে থেকে তাকে আতিথ্য দিতে পারে ভিতরের মহলে। জঙ্গলে-আবিষ্ট ভাঙা মেটে পাঁচিলের গা থেকে বাগ্‌দি বুড়ি বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে ঘুঁটে সংগ্রহ ক'রে আপন ঝুড়িতে তুলছে, আর পিছনে পিছনে তার পোষা নেড়ি কুকুরটা লাফালাফি ক'রে বিরক্ত করছে— এই ব্যাপারটি যদি বিশিষ্ট স্বরূপ নিয়ে আমাদের চোখে পড়ে, এ'কে যদি তথ্যমাত্রের সামান্যতা থেকে পৃথক ক'রে এর নিজের অস্তিত্বগৌরবে দেখি, তা হলে এও জায়গা নেবে ভাবের নিত্যজগতে।

বস্তুত, আর্টিস্টরা বিশেষ আনন্দ পায় এইরকম সৃষ্টিতেই। যা সহজেই সাধারণের চোখ ভোলায় তাতে তার নিজের সৃষ্টির গৌরব জোর পায় না। যা আপনিই ডাক দেয় না তার মুখে সে আমন্ত্রণ

জাগিয়ে তোলে ; বিধাতার হাতের পাসপোর্ট নেই যার কাছে তাকে সে উত্তীর্ণ ক'রে দেয় মনোলোকে। অনেক সময় বড়ো আর্টিস্ট অবজ্ঞা করে সহজ মনোহরকে আপন সৃষ্টিতে ব্যবহার করতে। মানুষ বস্তুজগতের উপর আপন বুদ্ধিকৌশল বিস্তার ক'রে নিজের জীবনযাত্রার একান্ত অনুগত একটি ব্যাবহারিক জগৎ সর্বদাই তৈরি করতে লেগেছে। তেমনি মানুষ আপন ইন্দ্রিয়বোধের জগৎকে পরিব্যাপ্ত ক'রে বিচিত্র কলাকৌশলে আপন ভাবরসভোগের জগৎ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত। সেই তার সাহিত্য। ব্যাবহারিক বুদ্ধিনৈপুণ্যে মানুষ কলে বলে কৌশলে বিশ্বকে আপন হাতে পায়, আর কলানৈপুণ্যে কল্পনাশক্তিতে বিশ্বকে সে আপন কাছে পায়। প্রয়োজনসাধনে এর মূল্য নয় ; এর মূল্য আত্মীয়তাসাধনে, সাহিত্যসাধনে।

একবার সেকালের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে তখনকার দিনের মনোভাবের পরিচয় আছে একটি কাহিনীতে ; সেটা আলোচনার যোগ্য। ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটিকে ব্যাধ যখন হত্যা করলে তখন ঘৃণার আবেগে কবির কণ্ঠ থেকে অনুষ্টুভ ছন্দ সহসা উচ্চারিত হল।

কল্পনা করা যাক, বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে সহসা জ্যোতি উঠল জেগে। এই জ্যোতির আছে অফুরান বেগ, আছে প্রকাশশক্তি। স্বতই প্রশ্ন উঠল, অনন্তের মধ্যে এই জ্যোতি নিয়ে কী করা যাবে। তারই উত্তরে জ্যোতিরাত্মক অণুপরমাণুর সংঘ নিত্য-অভিব্যক্ত বিচিত্র রূপ ধরে আকাশে আকাশে আবর্তিত হয়ে চলল— এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহিমা সেই আদিজ্যোতিরই উপযুক্ত।

কবিঋষির মনে যখন সহসা সেই বেগবান শক্তিমান ছন্দের আবির্ভাব হল তখন স্বতই প্রশ্ন জাগল, এরই উপযুক্ত সৃষ্টি হওয়া চাই। তারই উত্তরে রচিত হল রামচরিত। অর্থাৎ, এমন-কিছু যা নিত্যতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য। যার সান্নিধ্য অর্থাৎ যার সাহিত্য মানুষের কাছে আদরণীয়।

মানুষের নির্মাণশক্তি বলশালী, আশ্চর্য তার নৈপুণ্য। এই শক্তি নিয়ে, এই নৈপুণ্য নিয়ে, সে বড়ো বড়ো নগর নির্মাণ করেছে। এই নগরের মূর্তি যেন মানুষের গৌরব করবার যোগ্য হয়, এ কথা সেই জাতির মানুষ না ইচ্ছা ক'রে থাকতে পারে নি যাদের শক্তি আছে, যাদের আত্মসম্মানবোধ আছে, যারা সভ্য। সাধারণত সেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা রিপু এসে ব্যাঘাত ঘটায়— মুনফা করবার লোভ আছে, সস্তায় কাজ সারবার কৃপণতা আছে, দরিদ্রের প্রতি ধনী কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য আছে, অশিক্ষিত বিকৃতরুচি বর্বরতাও এসে পড়ে এর মধ্যে ; তাই নির্লজ্জ নির্মমতায় কুৎসিত পাটকল উঠে দাঁড়ায় গঙ্গাতীরের পবিত্র শ্যামলতাকে পদদলিত ক'রে, তাই প্রাসাদশ্রেণীর অন্তরালে নানাজাতীয় দুর্‌দৃশ্য বস্তিপাড়া অস্বাস্থ্য ও অশোভনতাকে পালন করতে থাকে আপন কলুষিত আশ্রয়ে, যেমন-তেমন কদর্যভাবে যেখানে-সেখানে ঘরবাড়ি তেলকল নোংরা দোকান গলিঘুঁজি চোখের ও মনের পীড়া বিস্তারপূর্বক দেশে ও কালে আপন স্বত্বাধিকার পাকা করতে থাকে। কিন্তু, রিপুর প্রবলতা ও অক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপে এই-সমস্ত ব্যত্যয়কে স্বীকার ক'রে তবুও মোটের উপরে এ কথা মানতে হবে যে, সমস্ত শহরটা শহরবাসীর গৌরব করবার উপযুক্ত যাতে হয় এই ইচ্ছাটাই সত্য। কেউ বলবে না, শহরের সত্য তার কদর্য বিকৃতিগুলো। কেননা, শহরের সঙ্গে শহরবাসীর অত্যন্ত নিকটের যোগ ; সে যোগ স্থায়ী যোগ, সে যোগ আত্মীয়তার যোগ, এমন যোগ নয় যাতে তার আত্মাবমাননা।

সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। তার মধ্যে রিপুর আক্রমণ এসে পড়ে, ভিতরে ভিতরে দুর্বলতার নানা চিহ্ন দেখা দিতে থাকে, মলিনতার কলঙ্ক লাগতে থাকে যেখানে-সেখানে ; কিন্তু, তবু সকল হীনতা-দীনতাকে ছাড়িয়ে উঠে যে-সাহিত্যে সমগ্র ভাবে মানুষের মহিমা প্রকাশ না হয় তাকে নিয়ে গৌরব করা চলবে না, কেননা সাহিত্যে মানুষ আপনারই সঙ্গকে, আপনার সাহিত্যকে প্রকাশ করে স্থায়িত্বের উপাদানে। কেননা চিরকালের মানুষ বাস্তব নয়, চিরকালের মানুষ ভাবুক ; চিরকালের মানুষের মনে যে-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কাজ করেছে তা অভ্রভেদী, তা স্বর্গাভিমুখী, তা অপরাহত পৌরুষের তেজে জ্যোতির্ময়। সাহিত্যে সেই পরিচয়ের ক্ষীণতা যদি কোনো ইতিহাসে দেখা যায় তা হলে লজ্জা পেতে হবে ; কেননা সাহিত্যে মানুষ নিজেরই অন্তরতম পরিচয় দেয় নিজের অগোচরে, যেমন পরিচয় দেয় ফুল তার গন্ধে, নক্ষত্র তার আলোকে। এই পরিচয় সমস্ত

জাতির জীবনযজ্ঞে জ্বালিয়ে তোলা অগ্নিশিখার মতো ; তারই থেকে জ্বলে তার ভাবীকালের পথের মশাল, তার ভাবীকালের গৃহের প্রদীপ।

শান্তিনিকেতন
১২·৭·৩৪

পরিশিষ্ট

সভাপতির অভিভাষণ

সাহিত্যসাধনার ভিন্ন ভিন্ন মার্গ আছে। একটি হচ্ছে কর্মকাণ্ড। সভাসমিতির সভাপতিত্ব করে দরবার জমানো, গ্রন্থাবলী সম্পাদন করা, সংবাদপত্র পরিচালনা করা, এগুলি হল কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। এই মার্গের যাঁরা পথিক তাঁরা জানেন কেমন করে স্বচ্ছন্দে সাহিত্যসংসারের কাজ চালাতে হয়। তার পরের মার্গ হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ড, যেমন ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা। এর দ্বারাও সাহিত্যিক সভা জমিয়ে তুলে কীর্তিখ্যাতি হাততালি লাভ করা যায়।

আমি শিশুকাল থেকেই এই উভয় মার্গ থেকে ভ্রষ্ট। এখন বাকি রইল আর-এক মার্গ, সেটি হচ্ছে রসমার্গ। এই মার্গ অবলম্বন করে রসসাহিত্যের আলোচনা, আমি পারি বা না পারি, করে যে এসেছি সে কথা আর গোপন রইল না। বহুকাল পূর্বে নির্জনে বিরলপথে এই রসাভিসারে বার হয়েছিলুম, দূরে বংশীধ্বনি শুনতে পেয়ে। কিন্তু, এই অভিসারপথ যে নিকটের লোকনিন্দা ও লাঞ্ছনার দ্বারা দুর্গম, তা যাঁরা রসচর্চা করেছেন তাঁরাই জানেন।

ঘরের সীমা হতে, প্রয়োজনের শাসন থেকে, অনেক দূরে বের করে নিয়ে যায় যে-তান সেই তান কানে এসে পৌঁচেছিল, তাই নিকটের বাধা সত্ত্বেও বাহির হতে হয়েছিল। তাই আজ এত বয়স পর্যন্ত বংশীধ্বনি ও গঞ্জনা দুই-ই শুনে এসেছি। যে-পথে চলেছিলাম তা হাট-ঘাটের পথ নয়। তাই আমি নিয়মের রাজ্যের ব্যবস্থা ভালো বুঝি নে। রসমার্গের পথিককে পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করে চলতে হয়, সেই কু-অভ্যাসটি আমার অস্থিমজ্জাগত। তাই নিয়মের ক্ষেত্রে আমাকে টেনে আনলে আমি কর্মের সৌষ্ঠব রক্ষা করতে পারি নে।

তবে কেন সভাপতির পদ গ্রহণ করতে রাজি হওয়া। এর প্রথম কারণ হচ্ছে যে, যিনি[১] আমাকে এই পদে আহ্বান করেন তিনি আমার সম্মানার্হ, তাঁর নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে, বাংলার বাইরে বাঙালির আহ্বান যখন আমার কাছে পৌঁছল, তখন আমি সে আমন্ত্রণ নাড়ীর টানে অস্বীকার করতে পারি নি। এই ডাক শুনে আমার মন কী বলেছিল, আজকার অভিভাষণে সেই কথাটাই সবিস্তারে জানাব।

আজ যেমন বসন্ত-উৎসবের দিনে দক্ষিণসমীরণের অভ্যর্থনায় বিশ্বপ্রকৃতি পুলকিত হয়ে উঠেছে, ধরণীর বক্ষে নবকিশলয়ের উৎস উৎসারিত হয়েছে, আজকার সাহিত্য-সম্মিলনের উৎসবে তেমনি একটি বসন্তেরই ডাক আছে। এ ডাক আজকের ডাক নয়।

কত কাল হল একদা একটি প্রাণসমীরণের হিল্লোল বঙ্গদেশের চিত্তের উপর দিয়ে বয়ে গেল, আর দেখতে দেখতে সাহিত্যের মুদ্রিত দলগুলি বাধাবন্ধ বিদীর্ণ করে বিকশিত হয়ে উঠল। বাধাও ছিল বিস্তর। ইংরাজিসাহিত্যের রসমত্ততায় নূতন মাতাল ইংরাজি-শিক্ষিত ছাত্রেরা সেদিন বঙ্গভাষাকে অবজ্ঞা করেছিল। আবার সংস্কৃতসাহিত্যের ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত সংস্কৃত পণ্ডিতেরাও মাতৃভাষাকে অবহেলা করতে ত্রুটি করেন নি। কিন্তু, বহুকালের উপেক্ষিত ভিখারি মেয়ে যেমন বাহিরের সমস্ত অকিঞ্চনতা সত্ত্বেও হঠাৎ একদিন নিজের অন্তর হতে উন্মেষিত যৌবনের পরিপূর্ণতায় অপরূপ গৌরবে বিশ্বের সৌন্দর্যলোকে আপন আসন অধিকার করে, অনাদৃত বাংলাভাষা তেমনি করে একদিন সহসা কোন্ ভাবাবেগের ঔৎসুক্যে আপন বহুদিনের দীনতার কূল ছাপিয়ে দিয়ে মহিমান্বিত হয়ে উঠল। তার সেদিনকার সেই দৈন্যবিজয়ী ভাবযৌবনের স্বরূপটিকেই আজকার নিমন্ত্রণপত্র আমার স্মৃতিমন্দিরে বহন করে এনেছে।

মানুষের পরিচয় তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন সে যথার্থভাবে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু, প্রকাশ তো একান্ত নিজের মধ্যে হতে পারে না। প্রকাশ হচ্ছে নিজের সঙ্গে অন্য-সকলের সত্য

১ প্রমথনাথ তর্কভূষণ, সম্মিলনের অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি

সম্বন্ধে। ঐক্য একের মধ্যে নয়, অনেকের মধ্যে সম্বন্ধের ঐক্যই ঐক্য। সেই ঐক্যের ব্যাপ্তি ও সত্যতা নিয়েই, কি ব্যক্তিবিশেষের কি সমূহবিশেষের যথার্থ পরিচয়। এই ঐক্যকে ব্যাপক ক'রে, গভীর ক'রে পেলেই আমাদের সার্থকতা।

ভূ-বিবরণের অর্থগত যে-বাংলা তার মধ্যে কোনো গভীর ঐক্যকে পাই না, কেননা বাংলাদেশ কেবল মৃণ্ময় পদার্থ নয়, তা চিন্ময়ও বটে। তা যে কেবল বিশ্বপ্রকৃতিতে আছে তা নয়, তার চেয়ে সত্যরূপে আমাদের চিৎলোকে আছে। মনে রাখতে হবে যে অনেক পশুপক্ষীও বাংলার মাটিতে জন্মেছে। অথচ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হৃদয়ের মধ্যে বাঙালির সঙ্গে একাত্মিকতার বোধ আত্মীয়তার রসযুক্ত নয় বলেই বাঙালিকে ভক্ষণ করতে তার যেমন আনন্দ তেমন আর কিছুতে নয়। কোনো সাধারণ ভূখণ্ডে জন্মলাভ নামক ব্যাপারের মধ্য দিয়েই কোনো মানুষের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না।

তার পর মানুষ জাতিগত ঐক্যের মধ্য দিয়েও আপন পরিচয়কে ব্যক্ত করতে চেয়েছে। যে-সব মানুষ স্বনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানের যোগে এমন একটি রাজতন্ত্র রচনা করে যার দ্বারা পররাজ্যের সঙ্গে স্বরাজ্যের স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে পারে, এবং সেই স্বরাজ্যসীমার শাসন ও পরস্পর সহকারিতার দ্বারা নিজেদের সর্বজনীন স্বার্থকে নিয়মে বিধৃত ও বিস্তীর্ণ করতে পারে, তারাই হল এক নেশন। তাদের মধ্যে অন্য যতরকম ভেদ থাক্ তাতে কিছুই আসে যায় না। বাঙালিকে নেশন বলা যায় না, কেননা বাঙালি এখনো আপন রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠে নি। অপর দিকে সামাজিক ধর্মসম্প্রদায়গত ঐক্যের মধ্যেও বিশেষ দেশের অধিবাসী আত্মপরিচয় দিতে পারে ; যেমন, বলতে পারে, আমরা হিন্দু, বা মুসলমান। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধেও বাংলায় অনৈক্য রয়েছে। তেমনি বর্ণভেদ হিসাবে যে-জাতি সেখানেও বাংলায় ভেদের অন্ত নেই। তার পরে বিজ্ঞানবাদ-অনুসারে বংশগত যে-জাতি তার নির্ণয় করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা মানুষের দৈর্ঘ্য, বর্ণ, নাকের উচ্চতা, মাথার বেড় প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যের মাপজোখ করে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। সে-হিসাবে আমরা বাঙালিরা যে কোন্ বংশে জন্মেছি, পণ্ডিতের মত নিয়ে তা ভাবতে গেলে দিশেহারা হয়ে যেতে হবে।

জন্মলাভের দ্বারা আমরা একটা প্রকাশলাভ করি। এই প্রকাশের পূর্ণতা জীবনের পূর্ণতা। রোগতাপ দুর্বলতা অনশন প্রভৃতি বাধা কাটিয়ে যতই সম্পূর্ণরূপে জীবধর্ম পালন করতে পারি ততই আমার জৈব ব্যক্তিত্বের বিকাশ। আমার এই জৈবপ্রকাশের আধার হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি।

কিন্তু, জলস্থল-আকাশ-আলোকের সম্বন্ধসূত্রে বিশ্বলোকে আমাদের যে-প্রকাশ সেই তো আমাদের একমাত্র প্রকাশ নয়। আমরা মানুষের চিত্তলোকেও জন্মগ্রহণ করেছি। সেই সর্বজনীন চিত্তলোকের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে ব্যক্তিগত চিত্তের পূর্ণতা দ্বারা আমাদের চিন্ময় প্রকাশ পূর্ণ হয়। এই চিন্ময় প্রকাশের বাহন হচ্ছে ভাষা। ভাষা না থাকলে পরস্পরের সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধ অত্যন্ত সংকীর্ণ হত।

তাই বলছি, বাঙালি বাংলাদেশে জন্মেছে বলেই যে বাঙালি তা নয় ; বাংলাভাষার ভিতর দিয়ে মানুষের চিত্তলোকে যাতায়াতের বিশেষ অধিকার পেয়েছে বলেই সে বাঙালি। ভাষা আত্মীয়তার আধার, তা মানুষের জৈব-প্রকৃতির চেয়ে অন্তরতর। আজকার দিনে মাতৃভাষার গৌরববোধ বাঙালির পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হয়েছে ; কারণ, ভাষার মধ্যে দিয়ে তাদের পরস্পরের পরিচয়সাধন হতে পেরেছে এবং অপরকেও তারা আপনার যথার্থ পরিচয় দান করতে পারছে।

মানুষের প্রকাশের দুই পিঠ আছে। এক পিঠে তার স্বানুভূতি ; আর-এক পিঠে অন্য সকলের কাছে আপনাকে জানানো। সে যদি অগোচর হয় তবে সে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়। যদি নিজের কাছেই তার প্রকাশ ক্ষীণ হল তবে সে অন্যের কাছেও নিজেকে গোচর করতে পারল না। যেখানে তার অগোচরতা সেখানেই সে ক্ষুদ্র হয়ে রইল। আর যেখানে সে আপনাকে প্রকাশ করতে পারল সেখানেই তার মহত্ত্ব পরিস্ফুট হল।

এই পরিচয়ের সফলতা লাভ করতে হলে ভাষা সবল ও সতেজ হওয়া চাই। ভাষা যদি অস্বচ্ছ হয়, দরিদ্র হয়, জড়তাগ্রস্ত হয়, তা হলে মনোবিশ্বে মানুষের যে-প্রকাশ তা অসম্পূর্ণ হয়। বাংলাভাষা এক সময়ে গেঁয়োরকমের ছিল। তার সহযোগে তত্ত্বকথা ও গভীর ভাব প্রকাশ করবার অনেক বাধা ছিল।

তাই বাঙালিকে সেদিন সকলে গ্রাম্য বলে জেনেছিল। তাই যাঁরা সংস্কৃতভাষার চর্চা করেছিলেন এবং সংস্কৃতশাস্ত্রের মধ্য দিয়ে বিশ্বসত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁরা বঙ্গভাষায় একান্ত-আবদ্ধ চিত্তের সম্মান করতে পারেন নি। বাংলার পাঁচালিসাহিত্য ও পয়ারের কথা তাঁদের কাছে নগণ্য ছিল। অনাদরের ফল কী হয়। অনাদৃত মানুষ নিজেকে অনাদরণীয় বলে বিশ্বাস করে; মনে করে, স্বভবতই সে জ্যোতির্হীন। কিন্তু, এ কথাটা তো গভীর ভাবে সত্য নয়; আত্মপ্রকাশের অভাবেই তার আত্মবিস্মৃতি। যখন সে আপনাকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত উপলক্ষ পায় তখন সে আর আপনার কাছে আপনি প্রচ্ছন্ন থাকে না। উপযুক্ত আধারটি না পেলে প্রদীপ আপনার শিখা সম্বন্ধে আপনি অন্ধ থাকে। অতএব, যেহেতু মানুষের আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন হচ্ছে তার ভাষা তাই তার সকলের চেয়ে বড়ো কাজ— ভাষার দৈন্য দূর ক'রে আপনার যথার্থ পরিচয় লাভ করা এবং সেই পূর্ণ পরিচয়টি বিশ্বের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করা। আমার মনে পড়ে, আমাদের বাল্যকালে বাংলাদেশে একদিন ভাবের তাপস বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ এক উদ্‌বোধনমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তাতে হঠাৎ যেন বহু দিনের কৃষ্ণপক্ষ তার কালো পৃষ্ঠা উলটিয়ে দিয়ে শুক্লপক্ষরূপে আবির্ভূত হল। তখন যে-সম্পদ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল শুধু তার জন্যেই যে আমাদের আনন্দ ছিল তা নয়। কিন্তু, হঠাৎ সম্মুখে দেখা গেল, একটি অপরিসীম আশার ক্ষেত্র বিস্তারিত। কী যে হবে, কত যে পাব, ভাবীকাল যে কোন্ অভাবনীয়কে বহন করে আনবে. সেই ঔৎসুক্যে মন ভরে উঠল।

এই-যে মনে অনুভূতি জাগে যে, সৌভাগ্যের বুঝি কোথাও শেষ নেই, এই-যে হৃৎস্পন্দনের মধ্যে আগন্তুক অসীমের পদশব্দ শুনতে পাওয়া যায়, এতেই সৃষ্টিকার্য অগ্রসর হয়। সকল বিভাগেই এই ব্যাপারটি ঘটে থাকে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একদিন বাঙালির এবং ভারতবাসীর আশা সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ ছিল। তাই কংগ্রেস মনে করেছিল যে, যতটুকু ইংরাজ হাতে তুলে দেবে সেই প্রসাদটুকু লাভ করেই বড়ো হওয়া যাবে। কিন্তু, এই সীমাবদ্ধ আশা যেদিন ঘুচে গেল সেদিন মনে হল যে, আমার আপনার মধ্যে যে-শক্তি আছে তার দ্বারাই দেশের সকল সম্পদকে আহ্বান করে আনতে পরব। এইরূপ অসীম আশার দ্বারাই অসাধ্য সাধন হয়। আশাকে নিগড়বদ্ধ করলে কোনো বড়ো কাজ হয় না। বাঙালি কোথায় এই অসীমতার পরিচয় পেয়েছে। সেখানেই যেখানে নিজের জগৎকে নিজে সৃষ্টি করে তার মধ্যে বিরাজ করতে পেরেছে। মানুষ নিজের জগতে বিহার করতে না পারলে, পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হলে তার আর দুঃখের অন্ত থাকে না। তাই তো কথা আছে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। আমার যা ধর্ম তাই আমার সৃষ্টির মূলশক্তি, আমিই স্বয়ং আমার আশ্রয়স্থল তৈরি করে তার মধ্যে বিরাজ করব। প্রত্যেক জাতির স্বকীয় সৃষ্টি তার স্বকীয় প্রকৃতি অনুসারে বিচিত্র আকার ধারণ করে থাকে। সে রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে আপন জগৎকে বিশেষভাবে রচনা ক'রে তাতে সঞ্চরণ করার অধিকার লাভ করে থাকে। বাঙালিজাতি তার আনন্দময় সত্তাকে প্রকাশ করবার একমাত্র ক্ষেত্র লাভ করেছে বাংলাভাষার মধ্যে। সেই ভাষাতে একদা এমন এক শক্তির সঞ্চার হয়েছিল যাতে করে সে নানা রচনারূপের মধ্যে যেন অসম্বৃত হয়ে উঠেছিল; বীজ যেমন আপন প্রাণশক্তির উদ্‌বেলতায় নিজের আবরণ বিদীর্ণ ক'রে অঙ্কুরকে উদ্ভিন্ন করে তেমনি আর কি। যদি তার এই শক্তি নিতান্ত ক্ষীণ হত তবে তার সাহিত্য ভালো করে আত্মসমর্থন করতে পারত না। বিদেশ থেকে বন্যার স্রোতের মতো আগত ভাবধারা তাকে ধুয়ে মুছে দিত।

এমন বিলুপ্তির পরিচয় আমরা অন্যত্র পেয়েছি। ভারতবর্ষের অন্য অনেক জায়গায় ইংরাজি-চর্চা খুব প্রবল। সেখানে ইংরাজিভাষায় স্বজাতীয়ের মধ্যে, পরমাত্মীয়ের মধ্যে পত্রব্যবহার হয়ে থাকে। এমন দৈন্যদশা যে, পিতাপুত্রের পরস্পরের মধ্যে শুধু ভাবের নয় সামান্য সংবাদের আদান-প্রদানও বিদেশী ভাষার সহায়তায় ঘটে। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আগ্রহ প্রকাশ করে যে-মুখে বলে বন্দেমাতরম্ সেই মুখেই মাতৃদত্ত পরম অধিকার যে মাতৃভাষা তার অসম্মান করতে মনে কোনো আক্ষেপ বোধ করে না।

বাংলাদেশেও যে এই আত্মাবমাননার লক্ষণ একেবারে নেই তা বলতে পারি নে। তবে কিনা এ

সম্বন্ধে বাঙালির মনে একটা লজ্জার বোধ জন্মেছে। আজকের দিনে বাঙালির ডাকঘরের রাস্তায় বাংলা চিঠিরই ভিড় সব চেয়ে বেশি।

বাস্তবিক মাতৃভাষার প্রতি যদি সম্মানবোধ জন্মে থাকে তবে স্বদেশীকে আত্মীয়কে ইংরাজি লেখার মতো কুকীর্তি কেউ করতে পারে না।

এক সময়ে বাংলাদেশে এমন হয়েছিল যে ইংরাজি কাব্য লিখতে লোকের আগ্রহের সীমা ছিল না। তখন ইংরাজি রচনা, ইংরাজি বক্তৃতা, অসামান্য গৌরবের বিষয় ছিল। আজকাল আবার বাংলাদেশে তারই পাল্টা ব্যাপার ঘটছে। এখন কেউ কেউ আক্ষেপ করে থাকেন যে, মাদ্রাজিরা বাঙালিদের চেয়ে ভালো ইংরাজি বলতে পারে। এই অপবাদ যেন আমরা মাথার মুকুট করে পরি।

আজকে প্রবাসের এই বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনী হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জন্য উৎসুক হয়েছে; এই আগ্রহের কারণ হচ্ছে, বাঙালি আপন প্রাণ দিয়ে একটি প্রাণবান সাহিত্যকে গড়ে তুলেছে। যেখানে বাংলার শুধু ভৌগোলিক অধিকার সেখানে সে মানচিত্রের সীমাপরিধিকে ছাড়াতে পারে না। সেখানে তার দেশ বিধাতার সৃষ্ট দেশ; সম্পূর্ণ তার স্বদেশ নয়। কিন্তু, ভাষা-বসুন্ধরাকে আশ্রয় ক'রে যে মানসদেশে তার চিত্ত বিরাজ করে সেই দেশ তার ভূ-সীমানার দ্বারা বাধাগ্রস্ত নয়, সেই দেশ তার স্বজাতির সৃষ্ট দেশ। আজ বাঙালি সেই দেশটিকে নদী প্রান্তর পর্বত অতিক্রম করে সুদূরপ্রসারিতরূপে দেখতে পাচ্ছে, তাই বাংলার সীমার মধ্য থেকে বাংলার সীমার বাহির পর্যন্ত তার আনন্দ বিস্তীর্ণ হচ্ছে। খণ্ড দেশকালের বাহিরে সে আপন চিত্তের অধিকারকে উপলব্ধি করছে।

ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে এক সময়ে বিরোধের অন্ত ছিল না। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কেমন করে হয়েছিল। শুধু কোনো একজন স্কটল্যাণ্ডের রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে তা হয় নি। আসলে যখন চ্যসার প্রভৃতি কবিদের সময়ে ইংরাজি ভাষা সাহিত্যসম্পদশালী হয়ে উঠল তখন তার প্রভাব বিস্তৃত হয়ে স্কটলণ্ডকে আকৃষ্ট করেছিল। সে-ভাষা আপন ঐশ্বর্যের শক্তিতে স্কটল্যাণ্ডের বরমাল্য অধিকার করে নিয়েছিল। এমনি করেই দুই বিরোধী জাতি ভাষার ক্ষেত্রে একত্র মিলিত হল, জ্ঞানের ভাবের একই পথে সহযাত্রী হয়ে আত্মীয়তার বন্ধনকে অন্তরে স্বীকার করায় তাদের বাহিরের ভেদ দূর হল। দূরপ্রদেশবাসী বাঙালি যে বাংলাভাষাকে আঁকড়ে থাকতে চাচ্ছে, প্রবাসের ভাষাকে যে স্বীকার করে নিতে ইচ্ছে করছে না, তারও কারণ এই যে, সাহিত্যসম্পদশালী বাংলাভাষার শক্তি তার মনকে জিতে নিয়েছে। এইজন্যেই, সে যত দূরেই থাক্‌, আপন ভাষার গৌরববোধের সূত্রে বাংলার বাঙালির সঙ্গে তার যোগ সুগভীর হয়ে রয়েছে। এই যোগকে ছেদন করতে তার ব্যথা বোধ হয়, একে উপলব্ধি করতে তার আনন্দ।

বাল্যকালে এমন আলোচনাও আমি শুনেছি যে, বাঙালি যে বঙ্গভাষার চর্চায় মন দিয়েছে এতে করে ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ, ভাষার শক্তি বাড়তে থাকলে তার দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করা কঠিন হয়। তখনকার দিনে বঙ্গসাহিত্য যদি উৎকর্ষ লাভ না করত তবে আজকে হয়তো তার প্রতি মমতা ছেড়ে দিয়ে আমরা নির্বিকার চিত্তে কোনো একটি সাধারণ ভাষা গ্রহণ করে বসতাম। কিন্তু, ভাষা জিনিসের জীবনধর্ম আছে। তাকে ছাঁচে ঢেলে কলে ফেলে ফরমাশে গড়া যায় না। তার নিয়মকে স্বীকার করে নিয়ে তবেই তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধগামী হলে সে বন্ধ্যা হয়। একদিন মহা-ফ্রেডরিকের সময় ফ্রান্সের ভাষার প্রতি জর্মানির লোলুপতা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সে টিকল না। কেননা ফ্রান্সের প্রকৃতি থেকে ফ্রান্সের ভাষাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাতে প্রাণের কাজ চালানো যায় না। সিংহের চামড়া নিয়ে আসন বা গৃহসজ্জা করতে পারি, কিন্তু সিংহের সঙ্গে চামড়া বদল করতে পারি না।

আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা যেমন মাতৃক্রোড়ে জন্মেছি তেমনি মাতৃভাষার ক্রোড়ে আমাদের জন্ম, এই উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সজীব ও অপরিহার্য।

মাতৃভাষায় আমাদের আপন ব্যবহারের অতীত আর-একটি বড়ো সার্থকতা আছে। আমার ভাষা যখন আমার নিজের মনোভাবের প্রকৃষ্ট বাহন হয় তখনই অন্য ভাষার মর্মগত ভাবের সঙ্গে আমার

সহজ ও সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। আমি যদিচ বাল্যকালে ইস্কুল পালিয়েছি কিন্তু বুড়ো বয়সে সেই ইস্কুল আবার আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। আমি তাই ছেলে পড়িয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার বিদ্যালয়ে নানা শ্রেণীর ছাত্র এসেছে, তার মধ্যে ইংরেজি-শেখা বাঙালি ছেলেও কখনো কখনো আমরা পেয়েছি। আমি দেখেছি, তাদেরই ইংরেজি শেখানো সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার। যে-বাঙালির ছেলে বাংলা জানে না, তাকে ইংরেজি শেখাই কী অবলম্বন করে। ভিক্ষুকের সঙ্গে দাতার যে-সম্বন্ধ তা পরস্পরের আন্তরিক মিলনের সম্বন্ধ নয়। ভাষাশিক্ষায় সেইটে যদি ঘটে, অর্থাৎ এক দিকে শূন্য ঝুলি আর-এক দিকে দানের অন্ন, তা হলে তাতে করে গ্রহীতাকে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। কিন্তু, এই ভিক্ষাবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপজীবিকাতে কখনো কল্যাণ হয় না। নিজের ভাষা থেকে দাম দিয়ে দিয়ে তার প্রতিদানে অন্য ভাষাকে আয়ত্ত করাই সহজ।

সুতরাং প্রত্যেক দেশ যখন তার স্বকীয় ভাষাতে পূর্ণতা লাভ করবে তখনই অন্য দেশের ভাষার সঙ্গে তার সত্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। ভাষার এই সহযোগিতায় প্রত্যেক জাতির সাহিত্য উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশমান হবার সুযোগ পায়। যে-নদী আমার গ্রামের কাছ দিয়ে বহমান, তাতে যেমন গ্রামের এপারে ওপারে খেয়া-পারাপার চলে তেমনি আবার তাতে পণ্যদ্রব্য বহন করে বিদেশের সঙ্গে কারবার হতে পারে। কেননা সেই বহমান নদীর সঙ্গে অন্যান্য নানা নদীর সম্বন্ধ সচল।

য়ুরোপে এক সময়ে লাটিন ভাষা জ্ঞানচর্চার একমাত্র সাধারণ ভাষা ছিল। যতদিন তা ছিল ততদিন য়ুরোপের ঐক্য ছিল বাহ্যিক আর অগভীর। কিন্তু, আজকার দিনে য়ুরোপ নানা বিদ্যাধারার সম্মিলনের দ্বারা যে-মহত্ত্ব লাভ করেছে সেটি আজ পর্যন্ত অন্য কোনো মহাদেশে ঘটে নি। এই ভিন্ন-ভিন্ন দেশীয় বিদ্যার নিরন্তর সচল সম্মিলন কেবলমাত্র য়ুরোপের নানা দেশের নানা ভাষার যোগেই ঘটেছে, এক ভাষার দ্বারা কখনো ঘটতে পারত না। আজকার দিনে য়ুরোপে রাষ্ট্রীয় অসাম্যের অন্ত নেই কিন্তু তার বিদ্যার সাম্য আজও প্রবল। এই জ্ঞান-সম্মিলনের উজ্জ্বলতায় দিক্‌বিদিক্ অভিভূত হয়ে গেছে। সেই মহাদেশে দেয়ালি-উৎসবের যে বিরাট আয়োজন হয়েছে তা সমাধা করতে সেখানকার প্রত্যেক দেশ তার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে এনেছে। যেখানে যথার্থ মিলন সেইখানেই যথার্থ শক্তি। আজকের দিনে য়ুরোপের যথার্থ শক্তি তার জ্ঞানসমবায়ে।

আমাদের দেশেও সেই কথাটি মনে রাখতে হবে। ভারতবর্ষে আজকাল পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরাজি ভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু, এতে করে যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না; হয়তো একাকারত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্ব হতে পারে না। কারণ, এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর, এ শুধু বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াস মাত্র। যেখানে হৃদয়ের বিনিময় হয়, সেখানে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকলেই তবে যথার্থ মিলন হতে পারে। কিন্তু, যদি বাহ্য বন্ধনপাশের দ্বারা মানুষকে মিলিত করতে বাধ্য করা যায়, তবে তার পরিণাম হয় পরম শত্রুতা। কারণ, সে মিলন শৃঙ্খলের মিলন, অথবা শৃঙ্খলার মিলনমাত্র।

রাশিয়া তার অধিকৃত ছোটো ছোটো দেশের ভাষাকে মেরে রাশীয় ভাষার অধিকারভুক্ত করবার চেষ্টা করেছিল, বেলজিয়ান ফ্লেমিশ্‌দের ভাষা ভোলাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু, ভাষার অধিকার যে ভৌগোলিক অধিকারের চেয়ে বড়ো, তাই এখানে জবরদস্তি খাটে না। বেলজিয়াম ফ্লেমিশ্‌দের অনৈক্য সইতে পারে নি, তাই রাষ্ট্রীয় ঐক্যবন্ধনে তাদের বাঁধতে চেয়েছে। কিন্তু, সে-ঐক্য অগভীর বলে তা স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে না। সাম্রাজ্যবন্ধনের দোহাই দিয়ে যে-ঐক্যসাধনের চেষ্টা তা বিষম বিড়ম্বনা। আজ য়ুরোপের বড়ো বড়ো দাসব্যবসায়ী নেশনরা আপন অধীন গণবর্গকে এক জোয়ালে জুড়ে দিয়ে বিষম কশাঘাত করে তার ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের রথ চালিয়ে দিয়েছে। রথের বাহন যে-ঘোড়াকয়টি তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা নেই। কিন্তু, সারথির তাতে আসে যায় না। তার মন রয়েছে এগিয়ে চলার দিকে, তাই সে রথের ঘোড়াকটাকে কষে বেঁধে, টেনে-হিঁচড়ে প্রাণপণে চাবকাচ্ছে। নইলে তার গতিবেগ যে থেমে যায়। এমন বাহ্য সাম্যকে যারা চায় তারা ভাষা-বৈচিত্র্যের উপর স্টীম-রোলার চালিয়ে দিয়ে আপন রাজরথের পথ সমভূম করতে চায়। কিন্তু,

পাঁচটি বিভিন্ন ফুলকে কুটে দলা পাকালেই তাকে শতদল বলা যেতে পারে না। অরণ্যের বিভিন্ন পত্রপুষ্পের মধ্যে যে-ঐক্য আছে তা হল বসন্তের ঐক্য। কারণ, বসন্তসমাগমে ফাল্গুনের সমীরণে তাদের সকলেরই মঞ্জরী মুকুলিত হয়ে ওঠে। তাদের বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে বসন্তের একই বাণীর চলাচলের পথ, সেখানেই তারা এক ও মিলিত। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জবরদস্ত লোকেরা বলে থাকে যে, মানুষকে বড়োরকমের বাঁধনে বেঁধেছেঁদে মেরে কেটেকুটে প্রয়োজন সাধন করতে হবে— এমন দড়াদড়ি দিয়ে বাঁধলেই নাকি ঐক্য সাধিত হতে পারে। অদ্বৈতের মধ্যে যে পরমমুক্ত শিব রয়েছেন তাঁকে তারা চায় না। তারা বেঁধেছেঁদে দ্বৈতকে বস্তাবন্দী করে যে অদ্বৈতের ভান তাকেই মেনে থাকে। কিন্তু যাঁরা যথার্থ অদ্বৈতকে অন্তরে লাভ করেছেন তাঁরা তো তাঁকে বাইরে খোঁজেন না। বাইরের যে-এক তা হচ্ছে প্রলয়, তাই একাকারত্ব ; আর অন্তরের যে-এক তা হল সৃষ্টি, তাই ঐক্য। একটা হল পঞ্চত্ব, আর-একটা হল পঞ্চায়েৎ।

আজকার এই সাহিত্যসম্মিলনে বাংলাদেশের প্রতিবেশী অনেক বন্ধুও সমাগত হয়েছেন। তাঁরা যদি এই সম্মিলনে সমাগত হয়ে নিমন্ত্রণের গৌরবলাভে মনের মধ্যে কোনো বাধাবোধ না করে থাকেন তবে তাতে অনেক কাজ হয়েছে। আমরা যেন বাঙালির স্বাজাত্য-অভিমানের অতিমাত্রায় মিলনযজ্ঞে বিঘ্ন না বাধাই। দক্ষ তো আপন আভিজাত্যের অভিমানেই শিবকে রাগিয়ে দিয়েছিলেন।

যে-দেশে হিন্দি ভাষার প্রচলন সে-দেশে প্রবাসী বাঙালি বাংলাভাষায় ক্ষেত্র তৈরি করেছে, এতে বাঙালিদের এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এই উত্তরভারতে কাশীতে তাঁরা কী পেলেন, দেখলেন, আত্মীয়দের সহযোগিতায় কী লাভ করলেন, তা আমাদের জানাতে হবে। আমরা দূরে যারা বাস করি তারা এখানকার এ-সবের সঙ্গে পরিচিত নই ; উত্তরভারতের লোককে আমরা মানচিত্র বা গেজেটিয়ারের সহযোগে দেখেছি। বাঙালি যখন আপন ভাষার মধ্য দিয়ে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় বিস্তার করে সৌহার্দ্যের পথ মুক্ত করবেন তাতে কল্যাণ হবে। ভালোবাসার সাধনার একটা প্রধান সোপান হচ্ছে জ্ঞানের সাধনা।

পরস্পরের পরিচয়ের অভাবই মানুষের প্রভেদকে বড়ো করে তোলে। যখন অন্তরের পরিচয় না হয় তখন বাইরের অনৈক্যই চোখে পড়ে, আর তাতে পদে পদে অবজ্ঞার সঞ্চার হয়ে থাকে। আজ বাংলাভাষাকে অবলম্বন করে উত্তরভারতের সঙ্গে সেই আন্তরিক পরিচয়ের প্রবাহ বাংলার অভিমুখে ধাবিত হোক। এখানকার সাহিত্যিকেরা আধুনিক ও প্রাচীন উত্তরভারতীয় সাহিত্যের যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা সকলের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবার যোগ্য, তা সংগ্রহ করে দূরে বাংলাদেশে পাঠাবেন— এমনিভাবে ভাষার মধ্য দিয়ে বাংলার সঙ্গে উত্তরভারতের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হবে।

আমি হিন্দি জানি না, কিন্তু আমাদের আশ্রমের একটি বন্ধুর কাছ থেকে প্রথমে আমি প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের আশ্চর্য রত্নসমূহের কিছু কিছু পরিচয় লাভ করেছি। প্রাচীন হিন্দি কবিদের এমন-সকল গান তাঁর কাছে শুনেছি যা শুনে মনে হয় সেগুলি যেন আধুনিক যুগের। তার মানে হচ্ছে, যে-কাব্য সত্য তা চিরকালই আধুনিক। আমি বুঝলুম, যে-হিন্দিভাষার ক্ষেত্রে ভাবের এমন সোনার ফসল ফলেছে সে-ভাষা যদি কিছুদিন আকৃষ্ট হয়ে পড়ে থাকে তবু তার স্বাভাবিক উর্বরতা মরতে পারে না ; সেখানে আবার চাষের সুদিন আসবে এবং পৌষমাসে নবান্ন-উৎসব ঘটবে। এমনি করে এক সময় আমার বন্ধুর সাহায্যে এ দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার যোগ স্থাপিত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমের সঙ্গে সেই শ্রদ্ধার সম্বন্ধটি যেন আমাদের সাধনার বিষয় হয়। মা বিদ্বিষাবহৈ।

আজ বসন্তসমাগমে অরণ্যের পাতায় পাতায় পুলকের সঞ্চার হয়েছে। গাছের যা শুকনো পাতা ছিল তা ঝরে গেল। এমন দিনে যারা হিসাবের নীরস পাতা উলটাতে ব্যস্ত আছে তারা এই দেশব্যাপী বসন্ত-উৎসবের ছন্দে যোগ দিতে পারল না। তারা পিছনে পড়ে রইল। দেশে আজ যে পোলিটিকাল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে তার যতই মূল্য থাক্, 'এহ বাহ্য'। এর সমস্ত লাভ-লোকসানের হিসাবের চেয়ে অনেক বড়ো কথা রয়ে গেছে সেই সুগভীর আত্মিক-প্রেরণার মধ্যে যার প্রভাবে এই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এমন স্বচ্ছন্দবিকাশ হয়েছে। স্বাস্থ্যের যে স্বাভাবিক প্রাণগত ক্রিয়া আছে, তা অগোচরে

কাজ করে বলে ব্যস্তবাগীশ লোকেরা তার চেয়ে দাওয়াইখানার জয়েন্ট স্টক কোম্পানিকে ঢের বড়ো বলে মনে করে— এমন-কি, তার জন্যে স্বাস্থ্য বিসর্জন করতেও রাজি হয়। সম্মানের জন্যে মানুষ শিরোপা প্রার্থনা করে, এবং তার প্রয়োজনও থাকতে পারে, কিন্তু শিরোপা দ্বারা মানুষের মাথা বড়ো হয় না। আসল গৌরবের বার্তা মস্তিষ্কেই আছে, শিরোপায় নেই ; প্রাণের সৃষ্টিঘরে আছে, দোকানের কারখানাঘরে নেই। বসন্ত বাংলার চিত্ত-উপবনে প্রাণদেবতার দাক্ষিণ্য নিয়ে এসে পৌঁচেছে, এ হল একেবারে ভিতরকার খবর, খবরের কাগজের খবর নয় ; এর ঘোষণার ভার কবিদের উপর। আমি আজ সেই কবির কর্তব্য করতে এসেছি ; আমি বলতে এসেছি, অহল্যাপাষাণীর উপর রামচন্দ্রের পদস্পর্শ হয়েছে— এই দৃশ্য দেখা গেছে বাংলাসাহিত্যে, এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো আশার কথা। আজ বাংলা হতে দূরেও বাঙালিদের হৃদয়ক্ষেত্রে সেই আশা ও পুলকের সঞ্চার হোক। খুব বেশি দিনের কথা নয়, বড়ো জোর ষাট বছরের মধ্যে বাংলাসাহিত্য কথায় ছন্দে গানে ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই শক্তির এইখানেই শেষ নয়। আমাদের মনে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হোক। আমরা এই শক্তিকে চিরজীবিনী করি। যেখানেই মানবশক্তি ভাষায় ও সাহিত্যে প্রকাশমান হয়েছে সেইখানেই মানুষ অমরতা লাভ করেছে ও সর্বমানবসভায় আপন আসন ও বরমাল্য পেয়েছে।

অল্প কয়েকদিন পূর্বেই মার্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেখানকার অধ্যাপক ডাক্তার অটো আমাকে লিখেছেন যে, তাঁরা শান্তিনিকেতনে বাংলাসাহিত্যের চর্চা করবার জন্য একজন অধ্যাপককে পাঠাতে চান। তিনি এখান থেকে শিক্ষালাভ করে ফিরে গেলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার 'চেয়ার' সৃষ্টি করা হবে। এই ইচ্ছা দশ বছর আগে কোনো বিদেশীর মনে জাগে নি।

আজ বঙ্গবাণীর উৎস খুলে গেল। যারা তার ধারার সন্ধানে ছুটে এল তাদের পরিবেশনের ভার আমাদের উপর রয়েছে। আমাদের আশা ও সাহস থাকলে এই ব্যাপারটি নিশ্চয়ই ঘটতে পারবে। আমরা সকলে মিলিত হয়ে সেই ভাবীকালের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকব। এই অধ্যবসায়ে বাংলা যদি বিশেষ গৌরব অর্জন করে সে কি সমগ্র ভারতবর্ষের সামগ্রী হবে না। গাছের যে-শাখাতেই ফুল ফুটুক সে কি সকল গাছের নয়। অরণ্যের যে-বনস্পতিটি ফুলে ফলে ভরে উঠল যদি তারই উদ্দেশে মধুকরেরা ছুটে আসে তবে সমগ্র অরণ্য তাদের সমাদরে বরণ করে লয়। আজ বাংলার প্রাঙ্গণেই যদি অতিথিদের সমাগম হয়ে থাকে তবে তাতে ক্ষতি কী। তাঁরা যে ভারতবর্ষেরই ক্ষেত্রে এসে মিলিত হয়েছেন, ভারতবাসীদের তা মানতে হবে। বঙ্গসাহিত্য আজ পরম শ্রদ্ধায় সেই মধুব্রতদের আহ্বান করুক।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০

সভাপতির শেষ বক্তব্য

আমাদের দৈহিক প্রকৃতিতে আমরা দেখতে পাই যে, তার কতকগুলি বিশেষ মর্মস্থান আছে— যেমন, প্রাণের যে-প্রবাহ রক্তচলাচলের সহযোগে অঙ্গের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় তার মর্মস্থান হচ্ছে হৃৎপিণ্ড ; আর, ইন্দ্রিয়বোধের যে-ধারা স্নায়ুতন্তু অবলম্বন ক'রে দেহে বিস্তৃত হয়েছে, তার কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্ক তেমনি প্রত্যেক দেশের চিত্তে যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা প্রবহমান, তার এক-একটি মর্মস্থান আপনিই সৃষ্ট হয়ে থাকে।

পশ্চিম-মহাদেশে আমরা দেখতে পাই যে, ফ্রান্সের চিত্তের কেন্দ্রভূমি প্যারিস, ইতালির রোম, ও প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স। হিন্দু-ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তেমনি দূরে দূরে যত বিদ্যার উৎস উৎসারিত হয়েছে তার ধারা সর্বদাই কোনো-না-কোনো উপলক্ষে কাশীতে এসে মিলিত হয়েছে। ইতিপূর্বে রাধাকুমুদবাবু তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, বৈদিক যুগে কাশী ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার কেন্দ্র ছিল, তার

পরে বৌদ্ধযুগে যখন বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হলেন তখন তিনি কাশীতেই ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। মধ্যযুগেও যত কবি, ভক্ত, সাধু, কোনো-না-কোনো সূত্রে এই নগরীর সঙ্গে তাঁদের জীবন ও কর্মকে মিলিত করেছেন। আজকার দিনে আমাদের বঙ্গসাহিত্যের যে-উদ্যম বঙ্গভাষায় প্রকাশ পেয়েছে ও বাংলায় নবজীবনের সঞ্চার করেছে, এটি কেবল সংকীর্ণ ভাবে বাংলার জিনিস নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ একটি বড়ো উদ্যমের প্রকাশ। সুতরাং স্বতই যদি এর একটা বেগ কাশীতে এসে পৌঁছয়, তবে তাতে ক'রে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা হবে।

নবজাত শিশু জন্মলাভ করে প্রথমে আপন গৃহে, কিন্তু তার পর ক্রমে ক্রমে জাতসংস্কারের দ্বারা সে সমাজে স্থান পায়। তেমনি ভারতবর্ষের সকল প্রচেষ্টাগুলির যেখানে জন্ম সেখানেই তারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে না, তাদের অন্য সংস্কারের প্রয়োজন যার দ্বারা সেগুলি সর্বভারতের জিনিস ব'লে নিজের ও অন্যের কাছে প্রমাণিত হতে পারে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা আপন ভূগোলগত সীমায় স্বীয় বিশেষত্বকে আপন সাহিত্যে চিত্রকলায় প্রকাশ করুক, তাকে উজ্জ্বল করতে থাক্, কিন্তু তার প্রাণের প্রাচুর্য বাংলার বাইরেও নানা প্রতিষ্ঠান অবলম্বন ক'রে আপন শাখা বিস্তার যদি করে তবে কাশী তার সেই আত্মপ্রসার-উদ্যমের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থান হতে পারে। কারণ, কাশী বস্তুত ভারতবর্ষের কোনো বিশেষ প্রদেশভুক্ত নয়, কাশী ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই।

এই প্রবাসে বঙ্গসাহিত্যের যে বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হল তার প্রধান আকাঙ্ক্ষাটি কী। তা হচ্ছে এই যে, বঙ্গসাহিত্যের ফল যেন ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশের হস্তে সহজে নিবেদন করে দেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে যে-সকল তীর্থস্থান আছে তার সর্বপ্রধান কাজই হচ্ছে এই যে, সেখানে যাতে সকল প্রদেশের লোক আপন প্রাদেশিক সত্তার চেয়ে বড়ো সত্তাকে উপলব্ধি করে। সমস্ত হিন্দু-ভারতবর্ষের যে-একটি বিরাট ঐক্য আছে সেটি প্রত্যক্ষ অনুভব করবার স্থান হচ্ছে এই-সব তীর্থ। পুরী প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থের চেয়ে কাশীর বিশেষত্ব এই যে, এখানে যে কেবল ভক্তিধারার সংগমস্থান তা নয়, এখানে ভারতীয় সমস্ত বিদ্যার মিলন হয়েছে। বাংলাপ্রদেশ আপনার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে যদি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের যোগে কাশীর সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন তবে সে জিনিসটিকে ভারতের ভারতী প্রসন্নমনে গ্রহণ করবেন।

বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে শুধু বাংলারই শক্তি বদ্ধ হয়ে রয়েছে, এ কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না ; কেননা সমগ্র ভারতবর্ষের নাড়ীর মধ্য দিয়েই বাংলার হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার হয়েছে, তাই বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা ভারতচিত্তশক্তিরই বিশেষ প্রকাশ বলে জানতে হবে। এই কথা স্মরণ করবার স্থান হোক সেই বারাণসী যেখানে বাংলার ন্যায়ের অধ্যাপক দ্রবিড়ের শ্রুতির অধ্যাপকের সঙ্গে একত্র বসে ভারতের একই ডালিতে বিদ্যার অর্ঘ্যকে সম্মিলিত ক'রে সাজিয়ে তুলছেন।

পরিশেষে আমি একটি কাজের কথা বলতে চাই। বাঙালিরা যে এ দেশে বাস করছেন আমরা বাংলাভাষার মধ্যে তার পরিচয় পাব এই আশা করি। বাঙালি কি সেই পরিচয় দিয়েছে। না, দেয় নি। এটা কি আমাদের চিত্তের অসাড়তার লক্ষণ নয়। যে-চিত্ত যথার্থ প্রাণবান তার ঔৎসুক্য চির-উদ্যমশীল। নির্জীব মনেরই দেখবার ইচ্ছা নেই, দেখবার শক্তি নেই। যা-কিছু তার থেকে পৃথক, সমবেদনার দুর্বলতাবশত তাকে সে অবজ্ঞা করে। এই অবজ্ঞা অজ্ঞতারই নামান্তর। জানবার শক্তির অভাব এবং ভালোবাসবার শক্তির অভাব একসঙ্গেই ঘটে। যে-মানুষ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে সেই তো মানুষকে শ্রদ্ধা করতে পারে ; আত্মার ক্ষীণতাবশতই যার সেই মহৎ অধিকার নেই, দরজা পর্যন্ত গিয়ে আর বেশি যে এগোতে পারে না, অহংকারের দ্বারা সেই তো আপনার দৈন্যকেই প্রকাশ করে। মমত্বের অভাব মাহাত্ম্যেরই অভাব।

বাঙালির প্রধান রিপু হচ্ছে এই আত্মাভিমান, যেজন্য নিরন্তর নিজের প্রশংসাবাদ না শুনতে পেলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাকে অহরহই স্তুতির মদ ঢোকে ঢোকে গেলাতে হয়, তার কমতি হলেই তার অসুখ বোধ হয়। এই চাটুলোলুপ আত্মাভিমান সত্যের অপলাপ বলেই এতে যে মোহান্ধকার সৃষ্টি করে তাতে অন্যকে স্পষ্ট দেখতে দেয় না। এই অন্ধতা দ্বারা আমরা নিজেকে বঞ্চিত করি। আমি জাপানে

বাঙালি ছাত্রদের দেখেছি, তারা জাপানে বোতাম-তৈরি সাবান-তৈরি শিখতে গেছে, কেউ কেউ বা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত, কিন্তু জাপানকে সম্পূর্ণ চোখ মেলে দেখবার আগ্রহ তাদের মনের মধ্যে গভীর ভাবে নেই। যদি থাকত তা হলে বোতাম-শিক্ষার চেয়ে বড়ো শিক্ষা তাদের হত। তারা জাপানকে শ্রদ্ধা করতে না পারার দ্বারা নিজেদের অশ্রদ্ধেয় করেছে। যে-সব বাঙালি উত্তর-পশ্চিম ভারতে দীর্ঘকাল বা অল্পকাল বাস করছে তারা যদি এই মোহান্ধতার বেষ্টন থেকে নিজেদের মুক্ত না করে, তা হলে এখানকার মানবসংস্রব থেকে তাদের সাহিত্য কিছুই সংগ্রহ করতে পারবে না। যে-কয়েদি গারদের বাইরে রাস্তায় এসে কাজ করে সেও যেমন বন্দী, তেমনি যে-বাঙালি আপন ঘর থেকে দূরে সঞ্চরণ করতে আসে তারও মনের পায়ে অভিমান ও অশ্রদ্ধার বেড়ি পরানো। এই উপেক্ষার ভাবকে মন থেকে না তাড়াতে পারলে কাশীর মতো স্থানে সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালির প্রতিষ্ঠান নিরর্থক হবে। বাঙালির চিন্তাপরায়ণ বীক্ষণশীল মন যে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সংস্পর্শে এসেছে তারই প্রমাণ বঙ্গসাহিত্যে ফলবান হয়ে দেখা দেবে, তবেই এখানকার বঙ্গসাহিত্যপরিষৎ নিতান্ত একটা বাহুল্য ব্যাপার বলে গণ্য হবে না। এখানকার ভাষা, সাহিত্য, এখানকার স্থানীয় অভিজ্ঞতা থেকে যা-কিছু তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করা সম্ভব তা সমস্তই বাংলাসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে নিযুক্ত হবে এখানকার বাঙালি-সাহিত্যিক-সংঘ থেকে এই আমরা বিশেষভাবে আশা করি।

এ দেশে যে-সব বহুমূল্য পুঁথি আছে তা ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে। আমি জানি, একজন জাপানি পুরোহিত নেপাল থেকে তিন-চার সিন্ধুক বোঝাই করে মহাযানবৌদ্ধশাস্ত্র জাপানে চালান করে দিয়েছেন। এজন্য সংগ্রহকারকে দোষ দেব কী করে। যারা চেয়েছিল তারা পেয়েছে, যারা চায় নি তারা হারালো, এই তো সংগত। কিন্তু, এইবেলা সতর্ক হতে হবে। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ এবং রক্ষা করবার একটি প্রশস্ত স্থান হচ্ছে কাশী। এখানকার বঙ্গসাহিত্যপরিষদের সভ্যেরা এই কাজকে নিজের কাজ বলে গণ্য করবেন, এই আমি আশা করি।

আমাদের প্রাচীন কীর্তির যা ভগ্নাবশেষ চারি দিকে ছড়িয়ে আছে আন্তরিক শ্রদ্ধার দ্বারা তাদের রক্ষা করতে হবে। আমি দেখেছি, কত ভালো ভালো মূর্তির টুকরো অনেক জায়গায় পা-ধোবার পিঁড়ি বা সিঁড়ির ধাপে পরিণত করা হয়েছে। এই পদাঘাত থেকে এদের বাঁচাতে হবে। আধুনিক কালে পুরাতন শিল্পের যা-কিছু নিদর্শন তার অধিকাংশ পশ্চিমভারতেই বিদ্যমান আছে। বাংলার নরম মাটিতে তার অধিকাংশ তলিয়ে গেছে। কিন্তু, এখানকার পাথুরে জায়গায়, কঠিন ভূমিতে, পুরাতন কীর্তি রক্ষিত হয়েছে ; তার ভগ্নাবশেষ ছড়াছড়ি যাচ্ছে। আপনারা শ্রদ্ধাসহকারে তা সংগ্রহ করুন, এখানে যে 'সারস্বত-ভাণ্ডার' স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছে তা যেন আপনাদের স্থায়ী কাজে প্রবৃত্ত করে, আজকের সভায় এই আমার অনুরোধ। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আমরা ভারতীয় চিত্রকলার সমাদর করি নি। তাকে আপনার জিনিস বলে বরণ করে নিই নি। তাই আশ্চর্য অমূল্য ছবি-সব পথে-ঘাটে সামান্য দরে বিকিয়ে যেত, আমরা চেয়ে দেখি নি। এক সময়ে, মনে আছে, জাপান থেকে কলাসৌন্দর্যের রসজ্ঞ ওকাকুরা বাংলাদেশে এসে এ দেশের চিত্রকলা ও কারুশিল্পের যথার্থ মূল্য আমাদের অশিক্ষিত দৃষ্টির কাছে প্রকাশ করলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করবার পক্ষে কলিকাতার আর্ট স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু, ভারতের চিত্রকলা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাজনিত যে-অবজ্ঞা সে আজও সম্পূর্ণ ঘোচে নি। এইজন্যেই আমাদের দেশের উদাসীন মুষ্টি থেকে ভারতের চিত্রসম্পদ অতি সহজে স্খলিত হয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। এখানকার পরিষৎ এইগুলিকে সংগ্রহ করাকে যদি নিজের কর্তব্য বলে স্থির করেন তা হলে ধন্য হবেন।

সকল দেশেই বিদ্যার একটা ধারাবাহিকতা আছে। মূল-উৎস থেকে নদীর ধারা বদ্ধ হয়ে গেলে যেমন তা বদ্ধ জলের কুণ্ডে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি জ্ঞানের তপস্যা বা কলার সাধনায় অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগ যদি অবরুদ্ধ হয়ে যায় তা হলে সে-সমস্ত ক্ষীণ হয়ে বিলুপ্ত হতে থাকে। ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে আমরা তার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। অজন্তার চিত্রকলায় যে-ধারা ছিল সে-ধারা অনেক দিন বয় নি, তাই ভারতের চিত্রকলা পঙ্ককুণ্ডে অবরুদ্ধ হয়ে ক্রমে তলার পাঁকে এসে

ঠেকেছে। এই ধারাকে যথাসাধ্য উন্মুক্ত করা চাই তো। কিন্তু, প্রাচীন ভারতের ভালো ভালো সব ছবিই যদি বিদেশে চালান যায়, তা হলে আমাদের দেশে চিত্রকলার বিদ্যাকে সজীব ও সচল রাখা কঠিন হবে। আমাদের আধুনিক চিত্রে প্রাচীন চিত্রকলার অনুকরণ করতে হবে, এমন কথা বলি নে। কিন্তু, অতীতের সাধনার মধ্যে যে-একটি প্রাণের বেগ আছে সেই বেগটি আমাদের চিত্তের প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে। অতীতের সৃষ্টিপ্রবাহকে বর্তমান কালের সৃষ্টির উদ্যমের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করলে সেই উদ্যমকে সহায়হীন করা হয়। শুধু নিজেদের অতীত কেন, অন্য দেশের বিদ্যা থেকে আমরা যা পাই তার প্রধান দান হচ্ছে এই উদ্যম। এইজন্যে য়ুরোপে, যেখানে দেশ-বিদেশের সমস্ত মানবসংসার থেকে সকলরকম বিদ্যার সমবায় ঘটছে, সেখানে সাধনার উদ্যম এমন আশ্চর্যরূপে বেড়ে উঠছে। এই কথাটি মনে ক'রে আমাদের দেশের অতীতের লুপ্তপ্রায় সমস্ত কীর্তির যথাসম্ভব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা যেন করি, তাদের পুনরাবৃত্তি করবার জন্যে নয়, নিজেদের চিত্তকে সাধনার বৃহৎ ক্ষেত্রে জাগরূক রাখবার জন্যে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০

সাহিত্যসম্মিলন

যখন আমরা কোনো সত্যবস্তুকে পাই তাহাকে রক্ষণপালনের জন্য বাহির হইতে উপরোধ বা উপদেশের প্রয়োজন হয় না। কোলের ছেলে মানুষ করিবার জন্য মাতাকে গুরুর মন্ত্র বা স্মৃতিসংহিতার অনুশাসন গ্রহণ করিতে বলা অনাবশ্যক।

বাঙালি একটি সত্য বস্তু পাইয়াছে, ইহা তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি গভীর মমত্ব স্বতই বাঙালির চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। এইরূপ একটি সাধারণ প্রীতির সামগ্রী সমগ্র জাতিকে যেরূপ স্বাভাবিক ঐক্য দেয় এমন আর কিছুই না। স্বদেশে বিদেশে আজ যেখানে বাঙালি আছে সেখানেই বাংলাসাহিত্যকে উপলক্ষ করিয়া যে সম্মিলন ঘটিতেছে, তাহার মতো অকৃত্রিম আনন্দকর ব্যাপার আর কী আছে।

ভিক্ষা করিয়া যাহা আমরা পাই তাহা আমাদের আপন নহে, উপার্জন করিয়া যাহা পাই তাহাতেও আমাদের আংশিক অধিকার ; নিজের শক্তিতে যাহা আমরা সৃষ্টি করি, অর্থাৎ যাহাতে আমাদের আত্মপ্রকাশ, তাহার 'পরেই আমাদের পূর্ণ অধিকার। যে-দেশে আমাদের জন্ম সেই দেশে যদি সর্বত্র আমাদের আত্মা আপন বহুধা শক্তিকে নানা বিভাগে নানারূপে সৃষ্টিকার্যে প্রয়োগ করিতে পারিত, তবে দেশকে ভালোবাসিবার পরামর্শ এত উচ্চস্বরে এবং এমন নিষ্ফলভাবে দিতে হইত না। দেশে আমরা আত্মপ্রকাশ করি না বলিয়াই দেশকে আমরা অকৃত্রিম আনন্দে আপন বলিয়া জানি না।

বাংলাসাহিত্য আমাদের সৃষ্টি। এমন-কি, ইহা আমাদের নূতন সৃষ্টি বলিলেও হয়। অর্থাৎ, ইহা আমাদের দেশের পুরাতন সাহিত্যের অনুবৃত্তি নয়। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ধারা যে-খাতে বহিত বর্তমান সাহিত্য সেই খাতে বহে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ আচার-বিচার পুরাতনের নির্জীব পুনরাবৃত্তি। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তাহার অসংগতির সীমা নাই। এইজন্য তাহার অধিকাংশই আমাদিগকে পদে পদে পরাভবের দিকে লইয়া যাইতেছে। কেবল আমাদের সাহিত্যই নূতন রূপ লইয়া নূতন প্রাণে নূতন কালের সঙ্গে আপন যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত। এইজন্য বাঙালিকে তাহার সাহিত্যই যথার্থভাবে ভিতরের দিক হইতে মানুষ করিয়া তুলিতেছে। যেখানে তাহার সমাজের আর-সমস্তই স্বাধীন পন্থার বিরোধী, যেখানে তাহার লোকাচার তাহাকে নির্বিচার অভ্যাসের দাসত্বপাশে অচল করিয়া বাঁধিয়াছে, সেখানে তাহার সাহিত্যই তাহার মনকে মুক্তি দিবার একমাত্র শক্তি। বাহিরে যখন সে

জড়পুত্তলীর মতো হাজার বৎসরের দড়ির টানে বাঁধা কায়দায় চলাফেরা করিতেছে, সেখানে কেবল সাহিত্যই তাহার মন বেপরোয়া হইয়া ভাবিতে পারে ; সেখানে সাহিত্যেই অনেক সময়ে তাহার অগোচরেও জীবনসমস্যার নূতন নূতন সমাধান, প্রথার গণ্ডি পার হইয়া আপনিই প্রকাশ হইতেছে। এই অন্তরের মুক্তি একদা তাহাকে বাহিরেও মুক্তি দিবে। সেই মুক্তিই তাহার দেশের মুক্তির সত্যকার ভিত্তি। চিত্তের মধ্যে যে-মানুষ বন্দী বাহিরের কোনো প্রক্রিয়ার দ্বারা সে কখনোই মুক্ত হইতে পারে না। আমাদের নব সাহিত্য সকল দিক হইতে আমাদের মনের নাগপাশবন্ধন মোচন করুক ; জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে শক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সাহস দিক ; তাহা হইলেই একদা কর্মের ক্ষেত্রের সে সত্যের বলে স্বাধীন হইতে পারিবে। ইন্ধনের নিজের মধ্যে আগুন প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়াই বাহিরের আগুনের স্পর্শে সে জ্বলিয়া উঠে ; পাথরের উপর বাহির হইতে আগুন রাখিলে সে ক্ষণকালের জন্য তাতিয়া উঠে, কিন্তু সে জ্বলে না। বাংলাসাহিত্য বাঙালির মনের মধ্যে সেই ভিতরের আগুনকে সত্য করিয়া তুলিতেছে ; ভিতরের দিক হইতে তাহার মনের দাসত্বের জাল ছেদন করিতেছে। একদিন যখন এই আগুন বাহিরের দিকে জ্বলিবে, তখন ঝড়ের ফুৎকারে সে নিবিবে না, বরং বাড়িয়া উঠিবে। এখনই বাংলাদেশে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি ; বর্তমান কালের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের দিনে মত্ততার তাড়নায় বাঙালি যুবকেরা যদি-বা ব্যর্থতার পথেও গিয়া থাকে, তবু আগুন যদি ভারতবর্ষের কোথাও জ্বলিয়া থাকে সে বাংলাদেশে ; কোথাও যদি দলে দলে দুঃসাহসিকেরা দারুণ দুঃখের পথে আত্মহননের দিকে আগ্রহের সহিত ছুটিয়া গিয়া থাকে সে বাংলাদেশে। ইহার অন্যান্য যে-কোনো কারণ থাক্, একটা প্রধান কারণ এই যে, বাঙালির অন্তরের মধ্যে বাংলাসাহিত্য অনেকদিন হইতে অগ্নিসঞ্চয় করিতেছে— তাহার চিত্তের ভিতরে চিন্তার সাহস আনিয়াছে, তাই কর্মের মধ্যে তাহার নির্ভীকতা স্বভাবতই প্রকাশ পায়। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নহে, তাহার চেয়ে দুঃসাধ্য সমাজক্ষেত্রেও বাঙালিই সকলের চেয়ে কঠোর অধ্যবসায়ে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। পূর্ণ বয়সে বিবাহ, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণবিবাহ, ভোজনপঙ্‌ক্তির বন্ধনচ্ছেদন, সাম্প্রদায়িক ধর্মের বাধামোচন প্রভৃতি ব্যাপারে বাঙালিই সকলের আগে ও সকলের চেয়ে বেশি করিয়া আপন ধর্মবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যকে জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছে। তাহার চিন্তার জ্যোতির্ময় বাহন সাহিত্যই সর্বদা তাহাকে বল দিয়াছে। সে যদি একমাত্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়াই আবহমান কাল সুর করিয়া পড়িয়া যাইত— মনের উদার সঞ্চরণের জন্য যদি তাহার মুক্ত হাওয়া, মুক্ত আলো, মুক্ত ক্ষেত্র না থাকিত— তবে তাহার মনের অসাড়তাই তাহার পক্ষে সকলের চেয়ে প্রবল বেড়ি হইয়া তাহাকে চিন্তায় ও কর্মে সমান অচল করিয়া রাখিত।

মনে আছে, আমাদের দেশের স্বাদেশিকতার একজন লোকপ্রসিদ্ধ নেতা একদা আমার কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাংলাসাহিত্য যে ভাবসম্পদে এমন বহুমূল্য হইয়া উঠিতেছে দেশের পক্ষে তাহা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। অর্থাৎ, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই কারণে বাঙালির মমত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে— সাধারণ দেশহিতের উদ্দেশেও বাঙালির এই কারণে নিজের ভাষাকে ত্যাগ করিতে চাহিবে না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ভারতের ঐক্যসাধনের উপায়স্বরূপে অন্য কোনো ভাষাকে আপন ভাষার পরিবর্তে বাঙালির গ্রহণ করা উচিত ছিল। দেশের ঐক্য ও মুক্তিকে যাঁহারা বাহিরের দিক হইতে দেখেন, তাঁহারা এমনি করিয়াই ভাবেন। তাঁহারা এমনও মনে করিতে পারিতেন যে, দেশের সকল লোকের বিভিন্ন দেহগুলিকে কোনো মন্ত্রবলে একটিমাত্র প্রকাণ্ড দৈত্যদেহ করিয়া তুলিলে আমাদের ঐক্য পাকা হইবে, আমাদের শক্তির বিক্ষেপ ঘটিবে না। শ্যামদেশের জোড়া যমজ যে দৈহিক শক্তির স্বাধীন প্রয়োগে আমাদের চেয়ে জোর বেশি পায় নাই, সে কথা বলা বাহুল্য। নিজের দেহকে তাহার নিজের স্বতন্ত্র জীবনীশক্তি দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দিতে পারিলেই তবে অন্য দেহধারীর সঙ্গে আমাদের যোগ একটা বন্ধন হইয়া উঠে না। বাংলাভাষাকে নির্বাসিত করিয়া অন্য যে-কোনো ভাষাকেই আমরা গ্রহণ করি-না কেন, তাহাতে আমাদের মনের স্বাতন্ত্র্যকে দুর্বল করা হইবে। সেই দুর্বলতাই যে আমাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় বললাভের প্রধান উপায় হইতে পারে, এ কথা একেবারেই

অশ্রদ্ধেয়। যেখানে আমাদের আত্মপ্রকাশ বাধাহীন সেখানেই আমাদের মুক্তি। বাঙালির চিত্তের আত্মপ্রকাশ একমাত্র বাংলাভাষায়, এ কথা বলাই বাহুল্য। কোনো বাহ্যিক উদ্দেশ্যের খাতিরে সেই আত্মপ্রকাশের বাহনকে বর্জন করা, আর মাংস সিদ্ধ করার জন্য ঘরে আগুন দেওয়া, একই-জাতীয় মূঢ়তা। বাংলাসাহিত্যের ভিতর দিয়া বাঙালির মন যতই বড়ো হইবে, ভারতের অন্য জাতির সঙ্গে মিলন তাহার পক্ষে ততই সহজ হইবে। আপনাকে ভালো করিয়া প্রকাশ করিতে না পারার দ্বারাই মনের পঙ্গুতা, মনের অপরিণতি ঘটে ; যে-অঙ্গ ভালো করিয়া চালনা করিতে পারি না সেই অঙ্গই অসাড় হইয়া যায়।

সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব। বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বইয়ের অধিক-সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোণঠেসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দু চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি। চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত কথা কেহ বলে না যে, চীনভাষা ত্যাগ না করিলে তাহাদের মুসলমানির খর্বতা ঘটিবে। বস্তুতই খর্বতা ঘটে যদি জবরদস্তির দ্বারা তাহাদিগকে ফার্সি শেখাইবার আইন করা হয়। বাংলা যদি বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা হয়, তবে সেই ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদের মুসলমানিও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইতে পারে। বর্তমান বাংলাসাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা প্রতিদিন তাহার প্রমাণ দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাশালী তাঁহারা এই ভাষাতেই অমরতা লাভ করিবেন। শুধু তাই নয়, বাংলাভাষাতে তাঁহারা মুসলমানি মালমসলা বাড়াইয়া দিয়া ইহাকে আরো জোরালো করিয়া তুলিতে পারিবেন। বাংলাভাষার মধ্যে তো সেই উপাদানের কমতি নাই— তাহাতে আমাদের ক্ষতি হয় নাই তো। যখন প্রতিদিন মেহন্নৎ করিয়া আমরা হয়রান হই, তখন কি সেই ভাষায় আমাদের হিন্দুভাবের কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটে। যখন কোনো কৃতজ্ঞ মুসলমান রায়ৎ তাহার হিন্দুজমিদারের প্রতি আল্লার দোয়া প্রার্থনা করে, তখন কি তাহার হিন্দুহৃদয় স্পর্শ করে না। হিন্দুর প্রতি বিরক্ত হইয়া, ঝগড়া করিয়া, যদি সত্যকে অস্বীকার করা যায়, তাহাতে কি মুসলমানেরই ভালো হয়। বিষয়সম্পত্তি লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে পরস্পরকে বঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু ভাষাসাহিত্য লইয়া কি আত্মঘাতকর প্রস্তাব কখনো চলে।

কেহ কেহ বলেন, মুসলমানের ভাষা বাংলা বটে, কিন্তু তাহা মুসলমানি বাংলা, কেতাবি বাংলা নয়। স্কটলন্ডের চলতি ভাষাও তো কেতাবি ইংরেজি নয়, স্কটলন্ড কেন, ইংলন্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত ইংরেজি নয়। কিন্তু, তা লইয়া তো শিক্ষাব্যবহারে কোনোদিন দলাদলির কথা শুনি নাই। সকল দেশেই সাহিত্যিক-ভাষার বিশিষ্টতা থাকেই। সেই বিশিষ্টতার নিয়মবন্ধন যদি ভাঙিয়া দেওয়া হয়, তবে হাজার হাজার গ্রাম্যতার উচ্ছৃঙ্খলতায় সাহিত্য খান্‌খান্‌ হইয়া পড়ে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশেও হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ আছে। কিন্তু, দুই তরফের কেহই এ কথা বলিতে পারেন না যে এটা ভালো। মিলনের অন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র আজও প্রস্তুত হয় নাই। পলিটিক্‌স্‌কে কেহ কেহ এইরূপ ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন, সেটা ভুল। আগে মিলনটা সত্য হওয়া চাই, তার পরে পলিটিক্‌স্‌ সত্য হইতে পারে। খানকতক বেজোড় কাঠ লইয়া ঘোড়া দিয়া টানাইলেই যে কাঠ আপনি গাড়িরূপে ঐক্য লাভ করে, এ কথা ঠিক নহে! খুব একটা খড়্‌খড়ে ঝড়্‌ঝড়ে গাড়ি হইলেও সেটা গাড়ি হওয়া চাই। পলিটিক্‌স্‌ও সেইরকমের একটা যানবাহন। যেখানে সেটার জোয়ালে ছাপ্পরে চাকায় কোনোরকমের একটা সংগতি আছে সেখানে সেটা আমাদের ঘরের ঠিকানায় পৌঁছাইয়া দেয়, নইলে সওয়ারকে বহন না করিয়া সওয়ারের পক্ষে সে একটা বোঝা হইয়া উঠে।

বাংলাদেশে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। এইখানে আমাদের আদানে প্রদানে জাতিভেদের কোনো ভাবনা নাই। সাহিত্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ থাকিত তবে গ্রীকসাহিত্যে গ্রীক্-দেবতার লীলার কথা পড়িতে গেলেও আমাদের ধর্মহানি হইতে পারিত। মধুসূদন দত্ত খৃস্টান ছিলেন তিনি শ্বেতভুজা ভারতীর যে-বন্দনা করিয়াছেন সে

সাহিত্যিক-বন্দনা, তাহাতে কবির ঐহিক পারত্রিক কোনো লোকসানের কারণ ঘটে নাই। একদা নিষ্ঠাবান হিন্দুরাও মুসলমান আমলে আরবি ফারসি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন ; তাহাতে তাঁহাদের ফোঁটা ক্ষীণ বা টিকি খাটো হইয়া যায় নাই। সাহিত্য পুরীর জগন্নাথক্ষেত্রের মতো, সেখানকার ভোজে কাহারও জাতি নষ্ট হয় না।

অতএব, সাহিত্যে বাংলাদেশে যে একটি বিপুল মিলনযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, যাহার বেদি আমাদের চিত্তের মধ্যে, সত্যের উপরে ভাবের উপরে যাহার প্রতিষ্ঠা, সেখানেও হিন্দু-মুসলমানকে যাঁহারা কৃত্রিম বেড়া তুলিয়া পৃথক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা মুসলমানেরও বন্ধু নহেন। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তার যোগসূত্রকেও যাঁহারা ছেদন করিতে চাহেন তাঁহাদের অন্তর্যামীই জানেন, তাঁহারা ধর্মের নামে দেশের মধ্যে অধর্মকে আহ্বান করিবার পথ খনন করিতেছেন। কিন্তু, আশা করিতেছি, তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। কারণ, প্রথমেই বলিয়াছি, বাংলাদেশের সাধনা একটি সত্যবস্তু পাইয়াছে ; সেটি তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ না হওয়াই হিন্দু বা মুসলমানের পক্ষে অসংগত। কোনো অস্বাভাবিক কারণে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইতেও পারে, কিন্তু সর্বসাধারণের সহজ বুদ্ধি কখনোই ইহাদের আক্রমণে পরাভূত হইবে না।

বৈশাখ ১৩৩৩

কবির অভিভাষণ

এই পরিষদে[১] কবির অভ্যর্থনা পূর্বেই হয়ে গেছে। সেই কবি বৈদেহিক ; সে বাণীমূর্তিতে ভাবরূপে সম্পূর্ণ। দেহের মধ্যে তার প্রকাশ সংকীর্ণ এবং নানা অপ্রাসঙ্গিক উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত।

আমার বন্ধু[২] এইমাত্র যমের সঙ্গে কবির তুলনা ক'রে বলেছেন, যমরাজ আর কবিরাজ দুটি বিপরীত পদার্থ। বোধ হয় তিনি বলতে চান, যমরাজ নাশ করে আর কবিরাজ সৃষ্টি করে। কিন্তু, এরা উভয়েই যে এক দলের লোক, একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত, সে কথা অমন ক'রে চাপা দিলে চলবে কেন।

নাটকসৃষ্টির সর্বপ্রধান অংশ তার পঞ্চম অঙ্কে। নাটকের মধ্যে যা-কিছু চঞ্চল তা ঝ'রে প'ড়ে গিয়ে তার যেটুকু স্থায়ী সেইটুকুই পঞ্চম অঙ্কের চরম তিরস্করণীর ভিতর দিয়ে হৃদয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। বিশ্বনাট্যসৃষ্টিতেও পঞ্চম অঙ্কের প্রাধান্য ঋষিরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন— সেইজন্য সৃষ্টিলীলায় অগ্নি, সূর্য, বৃষ্টিধারা, বায়ুর নাট্যনৈপুণ্য স্বীকার ক'রে সব শেষে বলেছেন, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। ইনি না থাকলে যা-কিছু ক্ষণকালের তাই জমে উঠে যেটি চিরকালের তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। যেটা স্থূল, যেটা স্থাবর, সেটাকে ঠেলে ফেলবার কাজে মৃত্যু নিয়ত ধাবমান।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

এই যদি হয় যমরাজের কাজ, তবে কবির কাজের সঙ্গে এর মিল আছে বৈকি। ক্ষণকালের তুচ্ছতা থেকে, জীর্ণতা থেকে, নিত্যকালের আনন্দরূপকে আবরণমুক্ত ক'রে দেখাবার ভার কবির। সংসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অঙ্কে নানাপ্রকার কাজের লোক নানাপ্রকার প্রয়োজনসাধনে প্রবেশ করেন ; কিন্তু কবি আসেন 'পঞ্চমঃ' ; আশুপ্রয়োজনের সদ্যঃপাতী আয়োজনের যবনিকা সরিয়ে ফেলে অহৈতুকের রসস্বরূপকে বিশুদ্ধ ক'রে দেখাতে।

১. প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদ
২. সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। আনন্দরূপের অমৃতবাণী বিশ্বে প্রকাশ পাচ্ছে, জলে স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণে গন্ধে, রূপে সংগীতে নৃত্যে, জ্ঞানে ভাবে কর্মে। কবির কাব্যেও সেই বাণীরই ধারা। যে চিত্তযন্ত্রের ভিতর দিয়ে সেই বাণী ধ্বনিত, তার প্রকৃতি-অনুসারে এই প্রকাশ আপন বিশেষত্ব লাভ করে। এই বিশেষত্বই অসীমকে বিচিত্র সীমা দেয়। এই সীমার সাহায্যেই সীমার অতীতকে আপন ক'রে নিয়ে তার রস পাই। এই আপন ক'রে নেওয়াটি ব্যক্তিভেদে কিছু-না-কিছু ভিন্নতা পায়। তাই একই কাব্য কত লোকে আপন মনে কত রকম ক'রে বুঝেছে। সেই বোঝার সম্পূর্ণতা কোথাও বেশি, কোথাও কম, কোথাও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কোথাও অশুদ্ধ। প্রকাশের উৎকর্ষেও যেমন তারতম্য, উপলব্ধির স্পষ্টতাতেও তেমনি। এইজন্যেই কাব্য বোঝবার আনন্দেরও সাধনা করতে হয়।

এই বোঝবার কাজে কেউ কেউ কবির সাহায্য চেয়ে থাকেন। তাঁরা ভুলে যান যে, যে-কবি কাব্য লেখেন তিনি এক মানুষ, আর যিনি ব্যাখ্যা করেন তিনি আর-এক জন। এই ব্যাখ্যাকর্তা পাঠকদেরই সমশ্রেণীয়। তাঁর মুখে ভুল ব্যাখ্যা অসম্ভব নয়।

আমার কাব্য ঠিক কী কথাটি বলছে, সেটি শোনবার জন্যে আমাকে বাইরে যেতে হবে— যাঁরা শুনতে পেয়েছেন তাঁদের কাছে। সম্পূর্ণ ক'রে শোনবার ক্ষমতা সকলের নেই। যেমন অনেক মানুষ আছে যাদের গানের কান থাকে না— তাদের কানে সুরগুলো পৌঁছয়, গান পৌঁছয় না, অর্থাৎ সুরগুলির অবিচ্ছিন্ন ঐক্যটি তারা স্বভাবত ধরতে পারে না। কাব্য সম্বন্ধে সেই ঐক্যবোধের অভাব অনেকেরই আছে। তারা যে একেবারেই কিছু পায় না তা নয়— সন্দেশের মধ্যে তারা খাদ্যকে পায়, সন্দেশকেই পায় না। সন্দেশ চিনি-ছানার চেয়ে অনেক বেশি, তার মধ্যে স্বাদের যে-সমগ্রতা আছে সেটি পাবার জন্যে রসবোধের শক্তি থাকা চাই। বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা, চর্চার দ্বারা, এই সমগ্রতার অনির্বচনীয় রসবোধের শক্তি পরিণতি লাভ করে। যে-ব্যক্তি সেরা যাচনদার এক দিকে তার স্বাভাবিক সূক্ষ্ম অনুভূতি, আর-এক দিকে ব্যাপক অভিজ্ঞতা, দুয়েরই প্রয়োজন।

এই কারণেই এই-যে পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার সার্থকতা আছে। এখানে কয়েকজন যে একত্র হয়েছেন তার একটিমাত্র কারণ, কাব্য থেকে তাঁরা কিছু-না-কিছু শুনতে পেয়েছেন, তাঁরা উদাসীন নন। এই পরস্পরের শোনা নানা দিক থেকে মিলিয়ে নেবার আনন্দ আছে। আর, যাঁরা স্বভাবশ্রোতা, যাঁরা সম্পূর্ণকে সহজে উপলব্ধি করেন, তাঁরা এই পরিষদে আপন যোগ্য আসনটি লাভ করতে পারবেন।

এই পরিষদটি যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। কবির পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো সুযোগ, পাঠকের শ্রদ্ধা। যুক্তিসিদ্ধ বিষয়ের প্রধান সহায় প্রমাণ, রসসৃষ্টি-পদার্থের প্রধান সহায় শ্রদ্ধা। সুন্দরকে দেখবার পক্ষে অশ্রদ্ধার মতো অন্ধতা আর নেই। এই বিশ্বরচনায় সুন্দরের ধৈর্য অপরিসীম। চিত্তে যখন উপেক্ষা, শ্রদ্ধা যখন অসাড়, তখনো প্রভাতে সন্ধ্যায় ঋতুতে ঋতুতে সুন্দর আসেন, কোনো অর্ঘ্য না নিয়ে চলে যান, তাঁকে যে গ্রহণ করতে না পারলে সে জানতেও পারে না যে সে বঞ্চিত। যুগে যুগে মানুষের সৃষ্টিতেও এমন ঘটনা ঘটেছে, অশ্রদ্ধার অন্ধকার রাত্রে সুন্দর অলক্ষ্যে এসেছেন, দীপ জ্বালা হয় নি, অলক্ষ্যে চলে গিয়েছেন। সাহিত্যে ও কলারচনায় আজ আমাদের যে সঞ্চয় তা যুগ-যুগান্তর বহু অপচয়ের পরিশিষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। অনেক অতিথি ফিরে যায় রুদ্ধদ্বারে বৃথা আঘাত ক'রে, কেউ-বা দৈবক্রমে এসে পড়ে যখন গৃহস্থ জেগে আছে। কেউ-বা অনেক দ্বার থেকে ফিরে গিয়ে হঠাৎ দেখে একটা গৃহের দ্বার খোলা। আমার সৌভাগ্য এই যে, এখানে দ্বার খোলা পেয়েছি, আহ্বান শুনতে পাচ্ছি 'এসো'। এই পরিষদ আমাকে শ্রদ্ধার আসন দেবার জন্যে প্রস্তুত ; স্বদেশের আতিথ্য এইখানে অকৃপণ ; এই সভার সভ্যদের কাছে আমার পরিচয় অন্তত ঔদাসীন্যের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হবে না।

দেশবিদেশে আমার সম্মানের বিবরণ আমার বন্ধু এইমাত্র বর্ণনা করেছেন। বাইরের দিক থেকে বিদেশের কাছে আমার পরিচয় পরিমাণ-হিসাবে অতি অল্প। আমার লেখার সামান্য এক অংশের তরজমা তাঁদের কাছে পৌঁচেছে, সে তরজমারও অনেকখানি যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। কিন্তু সাহিত্যে,

কলারচনায়, পরিমাণের হিসাবটা বড়ো হিসাব নয়, সে ক্ষেত্রে অল্প হয়তো বেশির চেয়ে বেশি হতেও পারে। সাহিত্যকে ঠিক ভাবে যে দেখে সে মেপে দেখে না, তলিয়ে দেখে ; লম্বা পাড়ি দিয়ে সাঁতার না কাটলেও তাঁর চলে, সে ডুব দিয়ে পরিচয় পায়, সেই পরিচয় অন্তরতর। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা ঐতিহাসিক তথ্যের জন্যে পরিমাণের দরকার, স্বাদের বিচারের জন্যে এক গ্রাসের মূল্য দুই গ্রাসের চেয়ে কম নয়। বস্তুত এই ক্ষেত্রে অধিক অনেক সময়ে স্বল্পের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় ; অনেককে দেখতে গিয়ে যে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে তাতে এককে দেখবার বাধা ঘটায়। রসসাহিত্যে এই এককে দেখাই আসল দেখা।

একজন য়ুরোপীয় আর্টিস্টকে একদিন বলেছিলুম যে, ইচ্ছা করে ছবি আঁকার চর্চা করি, কিন্তু আমার দৃষ্টি ক্ষীণ বলে চেষ্টা করতে সাহস হয় না। তিনি বললেন, 'ও ভয়টা কিছুই নয়, ছবি আঁকতে গেলে চোখে একটু কম দেখাই দরকার ; পাছে অতিরিক্ত দেখে ফেলি এই আশঙ্কায় চোখের পাতা ইচ্ছে ক'রেই কিছু নামিয়ে দিতে হয়। ছবির কাজ হচ্ছে সার্থক দেখা দেখানো ; যারা নিরর্থক অধিক দেখে তারা বস্তু দেখে বেশি, ছবি দেখে কম।'

দেশের লোক কাছের লোক— তাঁদের সম্বন্ধে আমার ভয়ের কথাটা এই যে, তাঁরা আমাকে অনেকখানি দেখে থাকেন, সমগ্রকে সার্থককে দেখা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আমার নানা মত আছে, নানা কর্ম আছে, সংসারে নানা লোকের সঙ্গে আমার নানা সম্বন্ধ আছে ; কাছের মানুষের কোনো দাবি আমি রক্ষা করি, কোনো দাবি আমি রক্ষা করতে অক্ষম ; কেউ-বা আমার কাছ তাঁদের কাজের ভাবের চিন্তার সম্মতি বা সমর্থন পান কেউ-বা পান না, এই-সমস্তকে জড়িয়ে আমার পরিচয় তাঁদের কাছে নানাখানা হয়ে ওঠে— নানা লোকের ব্যক্তিগত রুচি, অনভিরুচি ও রাগদ্বেষের ধূলি-নিবিড় আকাশে আমি দৃশ্যমান। যে-দূরত্ব দৃশ্যতার অনাবশ্যক আতিশয্য সরিয়ে দিয়ে দৃষ্টিবিষয়ের সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে, দেশের লোকের চোখের সামনে সেই দূরত্ব দুর্লভ। মুক্তকালের আকাশের মধ্যে সঞ্চরণশীল যে-সত্যকে দেখা আবশ্যক, নিকটের লোক সেই সত্যকে প্রায়ই একান্ত বর্তমান কালের আলপিন দিয়ে রুদ্ধ ক'রে ধরে ; তার পাখার পরিধির পরিমাণ দেখে, কিন্তু ওড়ার মধ্যে সেই পাখার সম্পূর্ণ ও যথার্থ পরিচয় দেখে না। এইরকম দেশের লোকের অতি নিকট দৃষ্টির কাছে নিজের যে খর্বতা তা আমি অনেককাল থেকে অনুভব করে এসেছি। দেশের লোকের সভায় এরই সংকোচ আমি এড়াতে পারি নে। অন্যত্র জগদ্‌বরেণ্য লোকদের সামনে আমাকে কথা বলতে হয়েছে, কিছুমাত্র দ্বিধা আমার মনে কোনোদিন আসে নি ; নিশ্চয় জেনেছি, তাঁরা আমাকে স্পষ্ট ক'রে বুঝবেন, একটি নির্মল ও প্রশস্ত ভূমিকার মধ্যে আমার কথাগুলিকে তাঁরা ধ'রে দেখতে পারবেন। এ দেশে, এমন-কি, অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সামনেও দাঁড়াতে আমার সংকোচ বোধ হয়— জানি যে, কত কী ঘরাও কারণে ও ঘর-গড়া অসত্যের ভিতর দিয়ে আমার সম্বন্ধে তাঁদের বিচারের আদর্শ উদার হওয়া সম্ভবপর হয় না।

এইজন্যেই যমরাজের নিন্দার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছি ; কারণ, তাঁর উপরে আমার মস্ত ভরসা। তিনি নৈকট্যের অন্তরাল ঘুচিয়ে দেবেন ; আমার মধ্যে যা-কিছু অবান্তর নিরর্থক ক্ষণকালীন, আর আমার সম্বন্ধে যা-কিছু মিথ্যা সৃষ্টি, সে-সমস্তই তিনি এক অন্তিম নিশ্বাসে উড়িয়ে দেবেন। বাহিরের নৈকট্যকে সরিয়ে ফেলে অন্তরের নৈকট্যকে তিনি সুগম করবেন। কবিরাজদের পরম সুহৃদ যমরাজ। যেদিন তিনি আমাকে তাঁর দরবারে ডেকে নেবেন সেদিন তোমাদের এই রবীন্দ্র-পরিষদ খুব জমে উঠবে।

কিন্তু, এ কথা ব'লে বিশেষ কোনো সান্ত্বনা নেই। মানুষ মানুষের নগদ প্রীতি চায়। মৃত্যুর পরে স্মরণসভার সভাপতির গদ্‌গদ ভাষার করুণ রস যেখানে উচ্ছ্বসিত, সেখানে তৃষার্তের পাত্র পৌঁছয় না। যে জীবলোকে এসেছি এখানে নানা রসের উৎস আছে, সেই সুধারসে মর্তলোকেই আমরা অমৃতের স্বাদ পাই ; বুঝতে পারি, এই মাটির পৃথিবীতেও অমরাবতী আছে। মানুষের কাছে মানুষের প্রীতি তারই মধ্যে একটি প্রধান অমৃতরস— মরবার পূর্বে এ যদি অঞ্জলি ভরে পান করতে পাই তা

হলে মৃত্যু অপ্রমাণ হয়ে যায়। অনেকদিনের কথা বলছি, তখন আমার অল্প বয়স। একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেম, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুশয্যার পাশে আমি বসে আছি। তিনি বললেন, 'রবি, তোমার হাতটা আমাকে দাও দেখি।' হাত বাড়িয়ে দিলেম, কিন্তু তাঁর এই অনুরোধের ঠিক মানেটি বুঝতে পারলেম না। অবশেষে তিনি আমার হাত ধরে বললেন, 'আমি এই যে জীবলোক থেকে বিদায় নিচ্ছি, তোমার হাতের স্পর্শে তারই শেষস্পর্শ নিয়ে যেতে চাই।'

সেই জীবলোকের স্পর্শের জন্যে মনে আকাঙ্ক্ষা থাকে। কেননা, চলে যেতে হবে। আমার কাছে সেই স্পর্শটি কোথায় স্পষ্ট, কোথায় নিবিড়। যেখান থেকে এই কথাটি আসছে, 'তুমি আমাকে খুশি করেছ, তুমি যে জন্মেছ সেটা আমার কাছে সার্থক, তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার মূল্য আমি মানি।' বর্তমানের এই বাণীর মধ্যে ভাবীকালের দানও প্রচ্ছন্ন ; যে-প্রীতি, যে-শ্রদ্ধা সত্য ও গভীর, সকল কালের সীমা সে অতিক্রম করে ; ক্ষণকালের মধ্যে সে চিরকালের সম্পদ দেয়। আমার বিদায়কাল অধিক দূরে নেই ; এই সময়ে জীবলোকের আনন্দস্পর্শ তোমাদের এই পরিষদে আমার জন্য তোমরা প্রস্তুত রেখেছ, তোমাদের যা দেয়া ভাবীকালের উপরে তার বরাত দাও নি।

ভাবীকালকে অত্যন্ত বেশি করে জুড়ে বসে থাকব, এমন আশাও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই। ভবিষ্যতের কবি ভবিষ্যতের আসন সগৌরবে গ্রহণ করবে। আমাদের কাজ তাদেরই স্থান প্রশস্ত করে দেওয়া। মেয়াদ ফুরোলে যে-গাছ মরে যায় অনেকদিন থেকে ঝরা পাতায় সে মাটি তৈরি করে ; সেই মাটিতে খাদ্য জমে থাকে পরবর্তী গাছের জন্যে। ভবিষ্যতের সাহিত্যে আমার জন্যে যদি জায়গার টানাটানিও হয় তবু এ কথা সবাইকে মানতে হবে যে, সাহিত্যের মাটির মধ্যে গোচরে অগোচরে প্রাণের বস্তু কিছু রেখে গেছি। নতুন প্রাণ নতুন রূপ সৃষ্টি করে, কিন্তু পুরাতনের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে প্রাণশক্তি পায় না ; আমাদের বাণীর সপ্তকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবেই ভবিষ্যতের বাণী উপরের সপ্তকে চড়তে পারে। সে সপ্তকের রাগিণী তখন নূতন হবে, কিন্তু পুরাতনকে অশ্রদ্ধা করবার স্পর্ধা যেন তার না হয়। মনে যেন থাকে, তখনকার কালের পুরাতন এখনকার কালে নূতনের গৌরবেই আবির্ভূত হয়েছিল।

নবযুগ একটা কথা মাঝে মাঝে ভুলে যায়— তার বুঝতে সময় লাগে যে, নূতনত্বে আর নবীনত্বে প্রভেদ আছে। নূতনত্ব কালের ধর্ম, নবীনত্ব কালের অতীত। মহারাজা-বাহাদুর আকাশে যে-জয়ধ্বজা ওড়ান আজ সে নতুন, কাল সে পুরানো। কিন্তু সূর্যের রথে যে অরুণধ্বজা ওড়ে কোটি কোটি যুগ ধরে প্রতিদিনই সে নবীন। একটি বালিকা তার স্বাক্ষরখাতায় আমার কাছ থেকে একটি বাংলা শ্লোক চেয়েছিল। আমি লিখে দিয়েছিলুম—

> নূতন সে পলে পলে অতীতে বিলীন,
> যুগে যুগে বর্তমান সেই তো নবীন।
> তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে নূতনের সুরা,
> নবীনের নিত্যসুধা তৃপ্তি করে পুরা।

সৃষ্টিশক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে তখনই মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃতরস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে। সেদিন কোনো একজন বাঙালি হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'। পুরাতন 'রক্ত' শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে তা হলে বুঝব, সেটাতে তাঁরই অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই তাক লাগাতে চান। নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে।

সাহিত্যে এইরকম নতুন হয়ে ওঠবার জন্যে যাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরাই উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের তরুণ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু, আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণবর্ণে সহজে নবীন, চরণ রাঙাবার জন্যে যাঁদের উষাকে নিয়ুমার্কেটে 'খুন' ফরমাশ করতে হয় না। আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক। আর যে-বৃদ্ধদের

মরচে-ধরা চিত্তবীণায় পুরাতনের স্পর্শে নবীন রাগিণী বেজে ওঠে না তাঁদের সঙ্গে আমার মিল হবে না, তাঁদের বয়স নিতান্ত কাঁচা হলেও।

এই পরিষদ সকল বয়সের সেই তরুণদের পরিষদ হোক। পুরাতনের নবীনতা বুঝতে তাঁদের যেন কোনো বাধা না থাকে।

ফাল্গুন ১৩৩৪

সাহিত্যরূপ

আজ এই সভা আহ্বান করা হয়েছে এই ইচ্ছা করে যে, নবীন প্রবীণ সকলে মিলে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করব ; কোনো চরম সিদ্ধান্ত পাকা করে দেওয়া যাবে তা মনে করে নয়। অনেক সময়ে আমরা ঝগড়া করি পরস্পরের কথা স্পষ্ট বুঝি না বলে। শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষের মনে ব্যক্তিগত বিরুদ্ধতা আমরা অনেক সময়ে কল্পনা করে নিই ; তাতে করে মতান্তরের সঙ্গে মনান্তর মিশে যায়, তখন কোনোপ্রকার আপস হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। মোকাবিলায় যখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হব তখন আশা করি এ কথা বুঝতে কারও বিলম্ব হবে না যে, যে-জিনিসটা নিয়ে তর্ক করছি, সেটা আমাদের দুই পক্ষেরই দরদের জিনিস, সেটা বাংলাসাহিত্য। এই মূল জায়গায় আমাদের মিল আছে ; এখন অমিলটা কোথায় সেটা শান্তভাবে স্থির করে দেখা দরকার।

আমার বয়স একদা অল্প ছিল, তখন সেকালের অল্পবয়সীদের সঙ্গে একাসনে বসে আলাপ করা সহজ ছিল। দীর্ঘকাল সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তার কারণ এ নয় যে, আমার পক্ষে কোনো বাধা আছে। এখনকার কালে যাঁরা চিন্তা করছেন, রচনা করছেন, বাংলাসাহিত্যে নেতৃত্ব নেবার যাঁরা উপযুক্ত হয়েছেন বা হবেন, তাঁরা কী মনের ভাব নিয়ে আসরে নেমেছেন সে সম্বন্ধে আমার সঙ্গে সহজভাবে আলাপ-আলোচনা করবার পক্ষে তাঁদের মনের মধ্যে হয়তো কোনো অন্তরায় আছে। এ নিয়ে অনেকে আমাকেই অপরাধী করেন। তাঁরা বলেন, আমি না জেনে অনেক সময় অনেক কথা বলে থাকি। এটা অসম্ভব নয়। আজকের দিনে বাংলাভাষায় প্রতিদিন যে-সব লেখা প্রকাশিত হচ্ছে তা সমস্ত পড়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। সে শক্তিও নেই, অবকাশেরও অভাব আছে। সেই কারণেই আজকের মতো এইরকম উপলক্ষে নূতন লেখকদের কাছ থেকে রচনা -নীতি ও রীতি সম্বন্ধে তাঁদের অন্তরের কথা কিছু শুনে নেব, এই ইচ্ছা করি।

আলোচনাটাকে এগিয়ে দেবার জন্য প্রসঙ্গটার একটা গোড়াপত্তন করে দেওয়া ভালো।

এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকের চেয়ে আমার বয়স বেশি। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য যে-যুগে আরম্ভ হয়েছিল সে আমার জন্মের অদূরবর্তী পূর্বকালে। সেইজন্য এই সাহিত্যসূত্রপাতের চিত্রটি আমার কাছে সুস্পষ্ট।

আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়। পূর্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই নূতন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেন এক ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়ল জলের ভিতর থেকে।

আমরা দেখলুম কী। কোনো একটা নূতন বিষয় ? তা নয়, একটা নূতন রূপ। সাহিত্যে যখন কোনো জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে-ভাবকে অবলম্বন করে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেও গৌণ ; সেই ভাবটি যে বিশেষরূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলীন্য। বিষয়ে কোনো অপূর্বতা না থাকতে পারে, সাহিত্যে হাজার বার যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এমন বিষয় হলেও কোনো দোষ নেই, কিন্তু সেই বিষয়টি যে-একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্বতা। পানপাত্র তৈরির বেলায় পাথরের

যুগে পাথর ও সোনার যুগে সোনাটা উপাদানরূপে নেওয়া হয়েছে, পণ্যের দিক থেকে বিচার করলে তার দামের ইতরবিশেষ থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে বিচার করবার বেলায় আমরা তার রূপটাই দেখি। রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম। সেইটেই আমাদের ভাষায় এবং সাহিত্যে নূতন শক্তি সঞ্চার করে, সাধনার নূতন পথ খুলে দেয়। বলা বাহুল্য, মধুসূদন দত্তের প্রতিভা আত্মপ্রকাশের জন্যে সাহিত্যে একটি রূপের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিল। যাতে সেই লক্ষ্যের দিকে আপন কলমকে নিয়ে যেতে পারেন এমন একটা ছন্দের প্রশস্ত রাজপথ মাইকেল তৈরি করে তুললেন। রূপটিকে মনের মতো গাম্ভীর্য দেবেন বলে ধ্বনিবান শব্দ বেছে বেছে জড়ো করলেন। তাঁর বর্ণনীয় বিষয় যে-রূপের সম্পদ পেল সেইটেতেই সে ধন্য হল। মিল্‌টন ইংরেজিভাষায় লাটিন-ধাতুমূলক শব্দ বহু পরিমাণে ব্যবহার করার দ্বারায় তার ধ্বনিরূপের যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন, মাইকেলেরও তদনুরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল। যদি বিষয়ের গাম্ভীর্যই যথেষ্ট হত তা হলে তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এ কথা সত্য, বাংলাসাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য তার দোহার পেল না। সম্পূর্ণ একলা রয়ে গেল। অর্থাৎ, মাইকেল বাংলাভাষায় এমন একটি পথ খুলেছিলেন যে পথে কেবলমাত্র তাঁরই একটিমাত্র মহাকাব্যের রথ চলেছিল। তিনি বাংলাভাষার স্বভাবকে মেনে চলেন নি। তাই তিনি যে-ফল ফলালেন তাতে বীজ ধরল না, তাঁর লেখা সন্ততিহীন হল, উপযুক্ত বংশাবলী সৃষ্টি করল না। তাঁর পরে হেম বাঁড়ুয্যে বৃত্রসংহার, নবীন সেন রৈবতক লিখলেন ; এ দুটিও মহাকাব্য, কিন্তু তাঁদের কাব্যের রূপ হল স্বতন্ত্র। তাঁদের মহাকাব্যও রূপের বিশিষ্টতার দ্বারা উপযুক্তভাবে মূর্তিমান হয়েছে কি না, এবং তাঁদের এই রূপের ছাঁদ ভাষায় চিরকালের মতো রয়ে গেল কি না, সে তর্ক এখানে করতে চাই নে— কিন্তু রূপের সম্পূর্ণতা-বিচারেই তাঁদেরও কাব্যের বিচার চলবে ; তাঁরা চিন্তাক্ষেত্রে অর্থনীতি ধর্মনীতি বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোন্‌ কোঠা খুলে দিয়েছেন সেটা কাব্যসাহিত্যের মুখ্য বিচার্য নয়। বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রসসাহিত্যে।

মাইকেল তাঁর নবসৃষ্টির রূপটিকে সাহিত্যে চিরপ্রতিষ্ঠা দেন নি বটে, কিন্তু তিনি সাহস দিয়ে গেলেন, নতুন লেখকদের উৎসাহ দিলেন। তিনি বললেন, প্রতিভা আপনসৃষ্ট নব নব রূপের পথে সাহিত্যকে নব নব ধারায় প্রবাহিত করে দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে তাকালে দেখি সেই একই কথা। তিনি গল্পসাহিত্যের এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিলেন। বিজয়বসন্ত বা গোলেবকাওলির যে চেহারা ছিল সে চেহারা আর রইল না। তাঁর পূর্বেকার গল্পসাহিত্যের ছিল মুখোশ-পরা রূপ, তিনি সেই মুখোশ ঘুচিয়ে দিয়ে গল্পের একটি সজীব মুখশ্রীর অবতারণা করলেন। হোমার, বর্জিল, মিলটন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের কাছ থেকে মাইকেল তাঁর সাধনার পথে উৎসাহ পেয়েছিলেন ; বঙ্কিমচন্দ্রও কথাসাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু এঁরা অনুকরণ করেছিলেন বললে জিনিসটাকে সংকীর্ণ করে বলা হয়। সাহিত্যের কোনো-একটি প্রাণবান রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই রূপটিকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন ; সেই রূপটিকে নিজের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনায় তাঁরা সৃষ্টিকর্তার আনন্দ পেয়েছিলেন, সেই আনন্দে তাঁরা বন্ধন ছিন্ন করেছেন, বাধা অতিক্রম করেছেন। এক দিক থেকে এটা অনুকরণ, আর-এক দিক থেকে এটা আত্মীকরণ। অনুকরণ করবার অধিকার আছে কার। যার আছে সৃষ্টি করবার শক্তি। আদান-প্রদানের বাণিজ্য চিরদিনই আর্টের জগতে চলেছে। মূলধন নিজের না হতে পারে, ব্যাঙ্কের থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা নাহয় শুরু হল, তা নিয়ে যতক্ষণ কেউ মুনফা দেখাতে পারে ততক্ষণ সে মূলধন তার আপনারই। যদি ফেল করে তবেই প্রকাশ পায় ধনটা তার নিজের নয়। আমরা জানি, এশিয়াতে এমন এক যুগ ছিল যখন পারস্যে চীনে গ্রীসে রোমে ভারতে আর্টের আদর্শ চালাচালি হয়েছিল। এই ঋণ-প্রতিঋণের আবর্তন-আলোড়নে সমস্ত এশিয়া জুড়ে নবনবোন্মেষশালী একটি আর্টের যুগ এসেছিল— তাতে আর্টিস্টের মন জাগরূক হয়েছিল, অভিভূত হয় নি। অর্থাৎ, সেদিন চীন পারস্য ভারত কে কার কাছ থেকে কী পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করেছে সে কথাটা চাপা পড়েছে,

তাদের প্রত্যেকের স্বকীয় মুনফার হিসাবটাই আজও বড়ো হয়ে রয়েছে। অবশ্য, ঋণ-করা ধনে ব্যাবসা করবার প্রতিভা সকলের নেই। যার আছে সে ঋণ করলে একটুও দোষের হয় না। সেকালের পাশ্চাত্য সাহিত্যিক স্কট বা বুলোয়ার লিটনের কাছ থেকে বঙ্কিম যদি ধার করে থাকেন সেটাতে আশ্চর্যের কথা কিছু নেই। আশ্চর্য এই যে, বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার থেকে তিনি ফসল ফলিয়ে তুললেন। অর্থাৎ তাঁর হাতে সেটা মরা বীজের মতো শুকনো হয়ে ব্যর্থ হল না। কথাসাহিত্যের নতুন রূপ প্রবর্তন করলেন; তাকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের পাঠকদের পরমানন্দ দিলেন। তারা বললে না যে, এটা বিদেশী; এই রূপকে তারা স্বীকার করে নিলে। তার কারণ, বঙ্কিম এমন একটি সাহিত্যরূপে আনন্দ পেয়েছিলেন, এবং সেই রূপকে আপন ভাষায় গ্রহণ করলেন, যার মধ্যে সর্বজনীন আনন্দের সত্য ছিল। বাংলাভাষায় কথাসাহিত্যের এই রূপের প্রবর্তনে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রণী। রূপের এই প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তারই পূজা চালালেন তিনি বাংলাসাহিত্যে। তার কারণ, তিনি এই রূপের রসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ নয় যে, গল্পের কোনো একটি থিওরি প্রচার করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। 'বিষবৃক্ষ' নামের দ্বারাই মনে হতে পারে যে, ঐ গল্প লেখার আনুষঙ্গিকভাবে একটা সামাজিক মতলব তাঁর মাথায় এসেছিল। কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখীকে নিয়ে যে একটা উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা গৃহধর্মের পক্ষে ভালো নয়, এই অতি জীর্ণ কথাটাকে প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য রচনাকালে সত্যই যে তাঁর মনে ছিল, এ আমি বিশ্বাস করি নে— ওটা হঠাৎ পুনশ্চ-নিবেদন; বস্তুত তিনি রূপমুগ্ধ রূপদ্রষ্টা রূপস্রষ্টা রূপেই বিষবৃক্ষ লিখেছিলেন।

নবযুগের কোনো সাহিত্যনায়ক যদি এসে থাকেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করব, সাহিত্যে তিনি কোন্ নবরূপের অবতারণা করেছেন।

ইংরেজি সাহিত্যের থেকে দেখা যাক। একদিন সাহিত্যের আসরে পোপ ছিলেন নেতা। তাঁর ছিল ঝক্‌ঝকে পালিশ-করা লেখা; কাটাকোটা ছাঁটাছোঁটা জোড়া-দেওয়া দ্বিপদীর গাঁথনি। তাতে ছিল নিপুণ ভাষা ও তীক্ষ্ণ ভাবের উজ্জ্বলতা, রসধারার প্রবাহ ছিল না। শক্তি ছিল তাতে, তখনকার লোকে তাতে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিল।

এমন সময়ে এলেন বায়রন্‌স্। তখনকার শান-বাঁধানো সাহিত্যের রাস্তা, যেখানে তক্‌মা-পরা কায়দাকানুনের চলাচল, তার উপর দিয়ে হঠাৎ তিনি প্রাণের বসন্ত-উৎসবের যাত্রীদের চালিয়ে নিলেন। এমন একটি সাহিত্যের রূপ আনলেন যেটা আগেকার সঙ্গে মিলল না। তার পর থেকে ওয়ার্ড্‌স্বার্থ, কোল্‌রিজ, শেলি, কীট্‌স্ আপন আপন কাব্যের স্বকীয় রূপ সৃষ্টি করে চললেন। সেই রূপের মধ্যে ভাবের বিশিষ্টতাও আছে, কিন্তু ভাবগুলি রূপবান হয়েছে ব'লেই তার গৌরব। কাব্যের বিষয় ভাষা ও রূপ সম্বন্ধে ওয়ার্ড্‌স্বার্থের বাঁধা মত ছিল, কিন্তু সেই বাঁধা মতের মানুষটি কবি নন; যেখানে সেই-সমস্ত মতকে বেমালুম পেরিয়ে গেছেন সেইখানেই তিনি কবি। মানবজীবনের সহজ সুখদুঃখে প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্যে আনন্দই সাধারণত ওয়ার্ড্‌স্বার্থের কাব্যের অবলম্বন বলা যেতে পারে। কিন্তু, টম্‌সন্ একেন্‌সাইড প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর কবিদের রচনার মধ্যেও এই বিষয়টি পাওয়া যায়। কিন্তু, বিষয়ের গৌরব তো কাব্যের গৌরব নয়; বিষয়টি রূপে মূর্তিমান যদি হয়ে থাকে তা হলেই কাব্যের অমরলোকে সে থেকে গেল। শরৎকালকে সম্বোধন করে কীট্‌স্ যে-কবিতা লিখেছেন তার বিষয় বিশ্লেষণ করে কীই-বা পাওয়া যায়; তার সমস্তটাতেই রূপের জাদু।

য়ুরোপীয় সাহিত্য আমার যে বিশেষ জানা আছে, এমন অহংকার আমি করি নে। শুনতে পাই, দান্তে, গ্যেটে, ভিক্টর হ্যুগো আপন আপন রূপের জগৎ সৃষ্টি করে গেছেন। সেই রূপের লীলায় ঢেলে দিয়েছেন তাঁদের আনন্দ। সাহিত্যে এই নব নব রূপস্রষ্টার সংখ্যা বেশি নয়।

এই উপলক্ষে একটা কথা বলতে চাই। সম্প্রতি সাহিত্যের যুগ-যুগান্তর কথাটার উপর অত্যন্ত বেশি ঝোঁক দিতে আরম্ভ করেছি। যেন কালে কালে 'যুগ' বলে এক-একটা মৌচাক তৈরি হয়, সেই সময়ের বিশেষ চিহ্ন-ওয়ালা কতকগুলি মৌমাছি তাতে একই রঙের ও স্বাদের মধু বোঝাই করে— বোঝাই সারা হলে তারা চাক ছেড়ে কোথায় পালায় ঠিকানা পাওয়া যায় না। তার পরে আবার নতুন

মৌমাছির দল এসে নতুন যুগের মৌচাক বানাতে লেগে যায়।

সাহিত্যের যুগ বলতে কী বোঝায় সেটা বোঝাপড়া করবার সময় হয়েছে। কয়লার খনিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে। এইরকমের কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায়, এ কথা মানতে পারব না। সাহিত্যের মতো দলছাড়া জিনিস আর কিছু নেই। বিশেষ একটা চাপরাশ-পরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতেই সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। কোনো-একটা চাপরাশের জোরে যে-সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার গৌরব খুব চড়া গলায় প্রমাণ করতে দাঁড়ায়, জানব, তার গোড়ায় একটা দুর্বলতা আছে। তার ভিতরকার দৈন্য আছে বলেই চাপরাশের দেমাক বেশি হয়। য়ুরোপের কোনো কোনো লেখক শ্রমজীবীদের দুঃখের কথা লিখেছে, কিন্তু সেটা যে-ব্যক্তি লিখেছে সেই লিখেছে। দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন নীলদর্পণ নাটক, দীনবন্ধু মিত্রই তার সৃষ্টিকর্তা। ওর মধ্যে যুগের তকমাটাই সাহিত্যের লক্ষণ বানিয়ে বসে নি। আজকের দিনে বারো-আনা লোক যদি চরকা নিয়েই কাব্য ও গল্প লিখতে বসে তা হলেও যুগসাহিত্যের সৃষ্টি হবে না— কেননা তার পনেরোআনাই হবে অসাহিত্য। খাঁটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন তখন তাঁর নিজের মধ্যে একটা একান্ত তাগিদ আছে বলেই করেন ; সেটা সৃষ্টি করবার তাগিদ, সেটা ভিন্ন লোকের ভিন্নরকম। তার মধ্যে পানওয়ালী বা খনিক আপনিই এসে পড়ল তো ভালোই। কিন্তু, সেই এসে পড়াটা যেন যুগধর্মের একটা কায়দার অন্তর্গত না হয়। কোনো-একটা উদ্ভটরকমের ভাষা বা রচনার ভঙ্গি বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি এ কথা বলবার চেষ্টা হয় যে, যেহেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো হয় নি সেইজন্যেই এটাতে সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা হল, সেও অসংগত। পাগলামির মতো অপূর্ব আর কিছুই নেই, কিন্তু তাকেও ওরিজিন্যালিটি বলে গ্রহণ করতে পারি নে। সেটা নূতন কিন্তু কখনো চিরন্তন নয়— যা চিরন্তন নয় তাকে সাহিত্যের জিনিস বলা যায় না।

কোনো ব্যক্তিবিশেষ নিজের সাহিত্যিক পালাটা সাঙ্গ করে চলে যেতে পারেন ; কিন্তু তিনি যে একটা-কোনো যুগকে চুকিয়ে দিয়ে যান কিংবা আর-একজন যখন তাঁর নিজের ব্যক্তিগত প্রতিভাকে প্রকাশ করেন তিনি আর-একটা যুগকে এনে হাজির করে দেন, এটা অদ্ভুত কথা। একজন সাহিত্যিক আর-একজন সাহিত্যিককে লুপ্ত করে দিয়ে যান না, তাঁর একটা পাতার পরে আর-একটা পাতা যুক্ত করে দেন। প্রাচীন কালে যখন কাগজ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না তখন একজনের লেখা চেঁচে মেজে তারই উপরে আর-একজন লিখত— তাতে পূর্বলেখকের চেয়ে দ্বিতীয় লেখকের অধিকতর যোগ্যতা প্রমাণ হত না, এইমাত্র প্রমাণ হত যে, দ্বিতীয় লেখকটি পরবর্তী। এক যুগ আর-এক যুগকে লুপ্ত না করে আপনার স্থান পায় না, এইটেই যদি সত্য হয় তবে তাতে কেবল কালেরই পূর্বাপরতা প্রমাণ হয় ; তার চেয়ে বেশি কিছু নয়— হয়তো দেখা যাবে, ভাবীকাল উপরিবর্তী লেখাটাকে মুছে ফেলে তলবর্তীটাকেই উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে। নূতন কাল উপস্থিতমত খুবই প্রবল— তার তুচ্ছতাও স্পর্ধিত ; সে কিছুতেই মনে করতে পারে না যে, তার মেয়াদ বেশিক্ষণের হয়তো নয়। কোনো-এক ভবিষ্যতে সে যে তার অতীতের চেয়েও জীর্ণতর প্রমাণিত হতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করা তার পক্ষে কঠিন। এইজন্যেই অতি অনায়াসেই সে দম্ভ করে যে, সেই চরম সত্যের পূর্বতন ধারাকে সে অগ্রাহ্য করে দিয়েছে। এ কথা মনে রাখা দরকার, সাহিত্যের সম্পদ চিরযুগের ভাণ্ডারের সামগ্রী— কোনো বিশেষ যুগের ছাড়পত্র দেখিয়ে সে আপনার স্থান পায় না।

যদি নিজের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলি, আশা করি, আপনারা মাপ করবেন। আমার বাল্যকালে আমি দুই-একজন কবিকে জানতুম। তাঁদের মতো লিখতে পারব, এই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। লেখবার চেষ্টাও করেছি, মনে কখনো কখনো নিশ্চয়ই অহংকারও হয়েছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা অতৃপ্তিও ছিল। সাহিত্যের যে-রূপটা অন্যের, আমার আত্মপ্রকাশকে কোনোমতে সেই মাপের সঙ্গে মিলিয়ে তোলবার চেষ্টা করে কখনো যথার্থ আনন্দ হতে পারে না। যা হোক, বাল্যকালে যখন নিজের অন্তরে কোনো আদর্শ উপলব্ধি করতে পারি নি, তখন বাইরের আদর্শের অনুবর্তন করে যতটুকু ফল লাভ করা যেত সেইটেকেই সার্থকতা বলে মনে করতুম।

এক সময়ে যখন আপন মনে একলা ছিলুম, একখানা স্লেট হাতে মনের আবেগে দৈবাৎ একটা কবিতা লিখতেই অপূর্ব একটা গৌরব বোধ হল। যেন আপন প্রদীপের শিখা হঠাৎ জ্বলে উঠল। যে লেখাটা হল সেইটের মধ্যেই কোনো উৎকর্ষ অনুভব করে যে আনন্দ তা নয়। আমার অন্তরের শক্তি সেই প্রথম আপন রূপ নিয়ে দেখা দিল। সেই মুহূর্তেই এতদিনের বাইরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলুম। তখনকার দিনের প্রবীণ সাহিত্যিকরা আমার সেই কাব্যরূপটিকে সমাদর করেন নি, পরিহাসও করেছিলেন। তাতে আমি ক্ষুব্ধ হই নি, কেননা আমার আদর্শের সমর্থন আমার নিজেরই মধ্যে, বাইরেকার মাপকাঠির সাক্ষ্যকে স্বীকার করবার কোনো দরকারই ছিল না। সেদিন যে-কাব্যরূপের দর্শন পেলুম সে নিঃসন্দেহই কোনো-একটা বিষয় অবলম্বন করে এসেছিল, কিন্তু আনন্দ সেই বিষয়টিকে নিয়ে নয়; সেই বিষয়ের মধ্যে কোনো অসামান্যতা ছিল বলেই তৃপ্তি বোধ করেছি তাও নয়। আত্মশক্তিকে অনুভব করেছিলুম কোনো-একটি প্রকাশরূপের স্বকীয় বিশিষ্টতায়। সে-লেখাটি মোটের উপর নিতান্তই কাঁচা; আজকের দিনে তা নিয়ে গৌরব করতে পারি নে। সেদিন আমার যে-বয়স ছিল আজ সে-বয়সের যে-কোনো বালক কবি তার চেয়ে অনেক ভালো লিখতে পারেন। তখনকার কালের ইংরেজি বা রাশীয় বিশেষ একটা পদ্ধতির সঙ্গে আমার সেই লেখাটা খাপ খেয়ে গেল এমন কথা বলতে পারি নে। আজ পর্যন্ত জানি নে, কোনো একটা যুগ-যুগান্তরের কোঠায় তাকে ফেলা যায় কি না। আমার নিজেরই রচনার স্বকীয় যুগের আরম্ভসংকেত ব'লে তাকে গণ্য করা যেতে পারে।

এই রূপসৃষ্টির আবির্ভাব একই কবির জীবনে বার বার ঘটে থাকে। রচনার আনন্দের প্রকাশই হচ্ছে নব নব রূপে। সেই নবরূপ-আবির্ভাবের দিনে প্রত্যেক বারেই অন্তরের প্রাঙ্গণে শাঁখ বেজে ওঠে, এ কথা সকল কবিই জানে। আমার জীবনে, মানসী, সোনার তরী, ক্ষণিকা, পলাতকা আপন বিশেষ বিশেষ রূপ নিয়েই উৎসব করেছে। সেই রূপের আনন্দেই রচনার বিষয়গুলি হয়েছে সার্থক। বিষয়গুলি অনিবার্য কারণে আপনিই কালোচিত হয়ে ওঠে। মানবজীবনের মোটা মোটা কথাগুলো আন্তরিক ভাবে সকল সময়েই সমান থাকে বটে কিন্তু তার বাইরের আকৃতি-প্রকৃতির বদল হয়। মানুষের আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র কালে কালে বিস্তৃত হতে থাকে। আগে হয়তো কেবল ঋষি মুনি রাজা প্রভৃতির মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রকাশ কবিদের কাছে স্পষ্ট ছিল; এখন তার পরিধি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। অতএব, বিষয়ের বৈচিত্র্য কালে কালে ঘটতে বাধ্য। কিন্তু, যখন সাহিত্যে আমরা তার বিচার করি তখন কোন্ কথাটা বলা হয়েছে তার উপরে ঝোঁক থাকে না, কেমন করে বলা হয়েছে সেইটের উপরেই বিশেষ দৃষ্টি দিই। ডারুয়িনের অভিব্যক্তিবাদের মূল কথাটা হয়তো মানবসাহিত্যে কখনো-না-কখনো বলা হয়েছে, জগদীশচন্দ্র বৃক্ষের মধ্যে প্রাণের যে-স্বরূপটি দেখাচ্ছেন হয়তো মোটামুটিভাবে কোনো একটা সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে তার আভাস থাকতে পারে— কিন্তু তাকে সায়ান্স্ বলে না; সায়ান্সের একটা ঠাট আছে, যতক্ষণ সেই ঠাটের মধ্যে কোনো-একটা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা না যায় ততক্ষণ তার বৈজ্ঞানিক মূল্য কিছুই নেই। তেমনি বিষয়টি যত বড়োই হিতকর বা অপূর্ব হোক-না কেন যতক্ষণ সে কোনো-একটা সাহিত্যরূপের মধ্যে চিরপ্রাণের শক্তি লাভ না করে ততক্ষণ কেবলমাত্র বিষয়ের দামে তাকে সাহিত্যের দাম দেওয়া যায় না। রচনার বিষয়টি কালোচিত যুগোচিত, এইটেতেই যাঁর একমাত্র গৌরব তিনি উঁচুদরের মানুষ হতে পারেন, কিন্তু তিনি কবি নন, সাহিত্যিক নন।

আমাদের দেশের লেখকদের একটা বিপদ আছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের এক-একটা বিশেষ মেজাজ যখন আমাদের কাছে প্রকাশ পায় তখন আমরা অত্যন্ত বেশি অভিভূত হই। কোনো সাহিত্যই একেবারে স্তব্ধ নয়। তার চলতি ধারা বেয়ে অনেক পণ্য ভেসে আসে; আজকের হাটে যা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কালই তা আবর্জনাকুণ্ডে স্থান পায়। অথচ আমরা তাকে স্থাবর ব'লে গণ্য করি ও তাকে চরম মূল্য দিয়ে সেটাকে কালচারের লক্ষণ বলে মানি। চলতি স্রোতে যা-কিছু সব-শেষে আসে তারই যে সব চেয়ে বেশি গৌরব, তার দ্বারাই যে পূর্ববর্তী আদর্শ বাতিল হয়ে যায় এবং

ভাবীকালের সমস্ত আদর্শ ধ্রুব রূপ পায়, এমনতরো মনে করা চলে না। সকল দেশের সাহিত্যেই জীবনধর্ম আছে, এইজন্যে মাঝে মাঝে সে সাহিত্যে অবসাদ ক্লান্তি রোগ মূর্ছা আক্ষেপ দেখা দেয়— তার মধ্যে যদি প্রাণের জোর থাকে তবে এ-সমস্তই সে আবার কাটিয়ে যায়। কিন্তু দূরে থেকে আমরা তার রোগকেও স্বাস্থ্যের দরে স্বীকার করে নিই। মনে করি, তার প্রকৃতিস্থ অবস্থার চেয়েও এই লক্ষণগুলো বলবান ও স্থায়ী, যেহেতু এটা আধুনিক। সাহিত্যের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ তখনই প্রকাশ পায় যখনই দেখি বিষয়টা অত্যন্ত বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। আজকালকার দিনে য়ুরোপে নানা কারণে তার ধর্ম সমাজ লোকব্যবহার স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ অত্যন্ত বেশি নাড়া খাওয়াতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেই-সমস্ত সমস্যার মীমাংসা না হলে তার বাঁচাও নেই। এই একান্ত উৎকণ্ঠার দিনে এই সমস্যার দল বাছবিচার করতে পারছে না। যুদ্ধের সময় সৈনিকেরা যেমন প্রয়োজনের দায়ে গৃহস্থের ঘর ও ভাণ্ডার দখল করে বসে, তেমনি প্রব্লেমের রেজিমেন্ট তাদের নিজের বারিক ছাপিয়েও সাহিত্যের সর্বত্রই ঢুকে পড়ছে। লোকে আপত্তি করছে না, কেননা সমস্যাসমাধানের দায় তাদের অত্যন্ত বেশি। এই উৎপাতে সাহিত্যের বাসা যদি প্রব্লেমের বারিক হয়ে ওঠে তবে এ প্রশ্ন মারা যায় যে, স্থাপত্যকলার আদর্শে এই ঘরের রূপটি কী। প্রয়োজনের গরজ যেখানে অত্যন্ত বেশি সেখানে রূপ জিনিসটা অবান্তর। য়ুরোপে সাহিত্যের সব ঘরই প্রব্লেমের ভাণ্ডারঘর হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে ; তাই প্রতিদিনই দেখছি, সাহিত্যে রূপের মূল্যটা গৌণ হয়ে আসছে। কিন্তু, এটা একটা ক্ষণকালীন অবস্থা— আশা করা যেতে পারে যে, বিষয়ের দল বর্তমানের গরজে দাবি ক্রমে ত্যাগ করবে এবং সাহিত্যে রূপের স্বরাজ আবার ফিরে আসবে। মার্শাল ল যেখানে কোনো কারণে চিরকালের হয়ে ওঠে সেখান থেকে গৃহস্থকে দেশান্তরে যাবার ব্যবস্থা করাই কর্তব্য। বিষয়প্রধান সাহিত্যই যদি এই যুগের সাহিত্য হয় তা হলে বলতেই হবে, এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।

সভায় আমার বক্তব্য শেষ হলে পর অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দ বললেন : কাব্যসাহিত্যের বিশিষ্টতা ভাবের প্রগাঢ়তায় (intensity)। কবি টম্‌সন্ ঋতুবর্ণনাচ্ছলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, এইখানে ওয়ার্ডস্বার্থের সঙ্গে তাঁর কাব্যবিষয়ের মিল আছে, কিন্তু পরস্পরের প্রভেদের কারণ হচ্ছে এই যে, টম্‌সনের কবিতায় কাব্যের বিষয়টির গভীরতা নেই, বেগ নেই, ওয়ার্ডস্বার্থের সেটি আছে।

আমি বললুম : তুমি যাকে প্রগাঢ়তা বলছ সেটা বস্তুত রূপসৃষ্টিরই অঙ্গ। সুন্দর দেহের রূপের কথা যখন বলি তখন বুঝতে হবে, সেই রূপের মধ্যে অনেকগুলি গুণের মিলন আছে। দেহটি শিথিল নয়, বেশ আঁটসাট, তা প্রাণের তেজে ও বেগে পরিপূর্ণ, স্বাস্থ্যসম্পদে তা সারবান, ইত্যাদি। অর্থাৎ, এই রকমের যতগুলি গুণ তার বেশি, তার রূপের মূল্যও তত বেশি। এই-সব গুণগুলি একটি রূপের মধ্যে মূর্তিমান হয়ে যখন অবিচ্ছিন্ন ঐক্য পায় তখন তাতে আমরা আনন্দ পেয়ে থাকি। নাইটিঙ্গেল পাখিকে উদ্দেশ করে কীট্‌স্ একটি কবিতা লিখেছেন। তার মাঝখানটায় মানবজীবনের দুঃখতাপ ও নশ্বরতা নিয়ে বিশেষ একটি বেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু, সেই বেদনার তীব্রতাই কবিতার চরম কথা নয় ; মানবজীবন যে দুঃখময়, এই কথাটার সাক্ষ্য নেবার জন্যে কবির দ্বারে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই— তা ছাড়া, কথাটা একটা সর্বাঙ্গীণ ও গভীর সত্যও নয়— কিন্তু এই নৈরাশ্যবেদনাকে উপলক্ষমাত্র করে ঐ কবিতাটি যে একটি রূপ ধরে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে সেইটেই হচ্ছে ওর কাব্য-হিসাবে সার্থকতা। কবি পৃথিবী সম্বন্ধে বলছেন—

Here, where men sit and hear each other groan ;
Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs ;
Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies ;
Where but to think is to be full of sorrow
　　And leaden-eyed despairs ;

Where Beauty cannot keep her lustrous eyes,
Or new Love pine at them beyond to-morrow.

একে ইন্‌টেন্সিটি বলা চলে না, এ রুগ্‌ণ চিত্তের অত্যুক্তি, এতে অস্বাস্থ্যের দুর্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে— তৎসত্ত্বেও মোটের উপর সমস্তটা নিয়ে এই কবিতাটি রূপবান কবিতা। যে ভাবটিকে দিয়ে কবি কাব্য সৃষ্টি করলেন সেটি কবিতাকে আকার দেবার একটা উপাদান।

দেবালয় থেকে বাহির হয়ে গোধূলির অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সুন্দরী চলে গেল, এই একটি তথ্যকে কবি ছন্দে বাঁধলেন—

যব গোধূলিসময় বেলি
ধনী মন্দিরবাহির ভেলি,
নবজলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

তিন লাইনে আমরা একটি সম্পূর্ণ রূপ দেখলুম— সামান্য একটি ঘটনা কাব্যে অসামান্য হয়ে রয়ে গেল। আর-একজন কবি দারিদ্র্যদুঃখ বর্ণনা করছেন। বিষয়হিসাবে স্বভাবতই মনের উপর তার প্রভাব আছে। দরিদ্র ঘরের মেয়ে, অন্নের অভাবে আমানি খেয়ে তাকে পেট ভরাতে হয়— তাও যে পাত্রে করে খাবে এমন সম্বল নেই, মেজেতে গর্ত করে আমানি ঢেলে খায়— দরিদ্র-নারায়ণকে আর্তস্বরে দোহাই পাড়বার মতো ব্যাপার। কবি লিখলেন—

দুঃখ করো অবধান,
দুঃখ করো অবধান,
আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান।

কথাটা রিপোর্ট করা হল মাত্র, তা রূপ ধরল না। কিন্তু, সাহিত্যে ধনী বা দরিদ্রকে বিষয় করা দ্বারায় তার উৎকর্ষ ঘটে না ; ভাব ভাষা ভঙ্গি সমস্তটা জড়িয়ে একটি মূর্তি সৃষ্টি হল কি না এইটেই লক্ষ্য করবার যোগ্য। 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে'— দারিদ্র্যদুঃখের বিষয়-হিসাবে এর শোচনীয়তা অতি নিবিড়, কিন্তু তবু কাব্য-হিসাবে এতে অনেকখানি বাকি রইল।

বঙ্কিমের উপন্যাসে চন্দ্রশেখরের অসামান্য পাণ্ডিত্য ; সেইটি অপর্যাপ্তভাবে প্রমাণ করবার জন্যে বঙ্কিম তার মুখে ষড়্‌দর্শনের আস্ত আস্ত তর্ক বসিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু, পাঠক বলত, আমি পাণ্ডিত্যের নিশ্চিত প্রমাণ চাই নে, আমি চন্দ্রশেখরের সমগ্র ব্যক্তিরূপটি স্পষ্ট করে দেখতে চাই। সেই রূপটি প্রকাশ পেয়ে ওঠে ভাষায় ভঙ্গিতে আভাসে, ঘটনাবলীর নিপুণ নির্বাচনে, বলা এবং না-বলার অপরূপ ছন্দে। সেইখানেই বঙ্কিম হলেন কারিগর, সেইখানে চন্দ্রশেখর-চরিত্রের বিষয়গত উপাদান নিয়ে রূপস্রষ্টার ইন্দ্রজাল আপন সৃষ্টির কাজ করে। আনন্দমঠে সত্যানন্দ ভবানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীরা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের নবযুগ অবতারণ করেছেন কি না তা নিয়ে সাহিত্যের তরফে আমরা প্রশ্ন করব না ; আমাদের প্রশ্ন এই যে, তাঁদের নিয়ে সাহিত্যে নিঃসংশয় সুপ্রত্যক্ষ কোনো একটি চারিত্ররূপ জাগ্রত করা হল কি না। পূর্বযুগের সাহিত্যেই হোক, নবযুগের সাহিত্যেই হোক, চিরকালের প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে : হে গুণী, কোন্‌ অপূর্ব রূপটি তুমি সকল কালের জন্যে সৃষ্টি করলে।

বৈশাখ ১৩৩৫

সাহিত্যসমালোচনা

আমার দুটি কথা বলবার আছে। এক, আমরা গেল বারে যে আলোচনা করেছি তার একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে।[১] সে রিপোর্ট যথাযথ হয় নি। অনেকদিন এ সম্বন্ধে দুঃখ বোধ করেছি, কখনো কোনো রিপোর্ট ঠিকমত পাই নি। সেদিন নানা আলোচনার ভিতর সব কথা ঠিক ধরা পড়েছে কি না জানি নে। আর-একটা বিপদ আছে, কোনো-কিছু সম্বন্ধে যখন যে-কেউ রিপোর্ট নিতে ইচ্ছা করেন তাঁর নিজের মতামত খানিকটা সেটাকে বিচলিত করে থাকে। এটুকু জানিয়ে রাখছি যে, যদি এ সম্বন্ধে রিপোর্ট বেরোয় আমাকে দেখিয়ে নিলে ভালো হয়। তারও প্রয়োজন নেই, একটু সংযতভাবে চিত্তকে স্থির রেখে যদি লেখেন। এর দরকার আছে কেননা এ সম্বন্ধে এখনো উত্তেজনা আছে— সেজন্য অল্পমাত্র যদি বিকৃতি ঘটে তা হলে অন্যায় হবে।

দ্বিতীয় কথা, আমি সতর্ক করতে চাই, ব্যক্তিগতভাবে এই তর্কে আমার কোনো স্থান নাই। এমন কথা নয় যে, আমি এক পক্ষে আছি, আর আধুনিক সাহিত্য আর-এক পক্ষে আছে। এরকম ভাবে তর্ক উঠলে আমি কুণ্ঠিত হব। বর্তমান কালে আমার লেখা মুখরোচক হোক বা না-হোক, আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি নে। লোকমতের কী মূল্য আজকের দিনে আমার বুঝবার মতো বয়স হয়েছে। অল্প বয়স যখন ছিল তখন অবশ্য বুঝি নি, তখন লোকমতকে অত্যন্ত বেশি মূল্য দিতাম। অন্যের মত-অনুযায়ী লিখতে পারলে, অন্যকে অনুকরণ করতে পারলে, সত্য কাজ কিছু করা গেল কল্পনা করেছি— সে যে কত বড়ো অসত্য, বার বার, হাজার বার তা প্রমাণ হয়ে গেছে আমার এই জীবনে। আমি তার উপর বিশেষ কোনো আস্থা রাখি না। আমাকে কেউ পছন্দ করুন বা না-করুন, এখন আমার চেয়ে ভালো লিখতে পারুন বা না-পারুন, সে আলোচনা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

আমি সেদিন যে-আলোচনা উত্থাপিত করেছিলাম সে-প্রসঙ্গে আমার মত আমি ব্যক্ত করেছি। সাহিত্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে, নীতি সম্বন্ধে, যা বক্তব্য সে আমার লেখায় বার বার বলেছি। গত বারে সে কথা কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে। এখনকার যাঁরা তরুণ সাহিত্যিক তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি কেন তাঁদের বিরুদ্ধে লিখেছিলাম কিংবা তাঁদের মতের প্রতিবাদ করেছিলাম। আমি জানি, আমি কোনো ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ করে লিখি নি। কতকগুলি লেখা আমার চোখে পড়েছিল যেগুলিকে সাহিত্যধর্ম-বিগর্হিত মনে হয়েছিল। তাতে সমাজধর্মের যদি কোনো ক্ষতি করে থাকে, সমাজরক্ষার ব্রত যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা সে-বিষয়ে চিন্তা করবেন ; আমি সে দিক থেকে কখনো আলোচনা করি নি। আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি, মানুষ যে-সকল মনের সৃষ্টিকে চিরন্তন মূল্য দিয়ে থাকে, চিরকাল রক্ষা করবার যোগ্য ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করে, তাকে সাহিত্যে এবং আর্টে চিরকালের ভাষায়, চিরকালের চিত্রে চিত্রিত করে। আমাদের সব সাহিত্যের গোড়াতেই যে-মহাকাব্য, স্পষ্টই দেখি, তার লক্ষ্য মানুষের দৈন্য প্রচার, মানুষের লজ্জা ঘোষণা করা নয়— তার মাহাত্ম্য স্বীকার করা। সংসারধর্মে মানবচরিত্রে সত্যের সেই-সব প্রকাশকে তাঁরা চিরকালের মূল্য দিয়েছেন, যাকে তাঁরা সর্বকাল ও সর্বজনের কাছে ব্যক্ত করবার ও রক্ষা করবার যোগ্য মনে করেছেন। যার মধ্যে তাঁরা সৌন্দর্য দেখেছেন, মহিমা দেখেছেন, তাই তাঁদের রচনার আনন্দকে জাগিয়েছে। বাল্মীকি যেদিন ছন্দ পেলেন সেদিন অনুভব করলেন, এ ছন্দ কোনো মহৎ চরিত্র, কোনো পরম অনুভূতি প্রকাশ করবার জন্যে, এমন কিছু যাতে মানবজীবনের পূর্ণতা, যাতে তার গৌরব। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, তখনকার লোক মনুষ্যত্বের কোন্ রূপকে শ্রেষ্ঠ বলে জানতেন। কলাবান বাক্য যে-বিষয়কে প্রকাশ করে তাকে আপন অলংকারের দ্বারা স্থায়ী মূল্য দেয়। সেকালের কবি খুব প্রকাণ্ড পটের উপর খুব বড়ো ছবি এঁকেছেন এবং তাতে মানুষকে বড়ো দেখে মানুষ আনন্দ পেয়েছে। আমাদের মনের ভিতর

১ বাংলার কথা। ৬ চৈত্র, সোমবার, ১৩৩৪

যে-সব বেদনা, যে-সব আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং আমরা যাকে অন্তরে অন্তরে খুব আদর করি, সেই আদরের যোগ্য ভাষা পাই না ব'লে বাইরে প্রকাশ করতে পারি না, পূজা করতে পারি না, অর্ঘ্য দিতে পারি না। আমাদের সে-সম্পদ নেই, আমরা মন্দির রচনা করতে জানি না, যাঁরা রচনা করেন ও যাঁরা দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন আমরা তাঁদের কাছ থেকে সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের পূজা সেখানে দিই। বড়ো বড়ো জাতি সাহিত্যে বড়ো বড়ো পূজার জন্যে আমাদের অবকাশ রচনা করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ সেখানে তাঁদের অর্ঘ্য নিয়ে যাবার সুযোগ লাভ করে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ হয়েছে। সমাজের প্রভাতকালে প্রকাণ্ড একটা বীরত্বদীপ্ত প্রাণসম্পদপূর্ণ মনুষ্যত্বের আনন্দময় চিত্র মনের মধ্যে জাগিয়ে রেখে কবিরা রচনা করতে বেরিয়েছেন। অনেক সময় সমাজের পাথেয় নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং বাইরের নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমে ক্রমে পতন ঘটে। এইজন্য যেটা মানুষের সভ্যতার অতি-পরিণতি তাতে বিকৃতি আসে, এরূপ পরিচয় আমরা প্রাচীন গ্রীস রোম ও অন্যান্য দেশের ইতিহাসে বারংবার পেয়েছি। অবসাদের সময়ে কলুষটাই প্রবল হয়ে ওঠে। আমাদের দেহপ্রকৃতিতে অনেক রোগের বীজ আছে। শরীরের সবল অবস্থায় সেগুলি পরাহত হয়েই থাকে। এমন নয় যে তারা নেই। তাদের পরাভূত করে আরোগ্যশক্তি অব্যাহত থাকে। যে-মুহূর্তে শরীর ক্লান্ত হয়, জীর্ণ হয়, দুর্বল হয়, তখনই সেগুলি প্রবল হয়ে দেখা দেয়। ইতিহাসেও বারংবার এটা দেখেছি। যখন কোনো-একটা প্রবৃত্তি বা মনের ভাব প্রবল হয় তখন তার প্রবলতাকে চিরন্তন সত্য বলে বিশ্বাস না করে থাকতে পারি না, তাকে একান্তভাবে অনুভব করি বলেই। সেই অনুভূতির জোরে প্রবৃত্তিকে নিয়ে আমরা বড়াই করতে শুরু করি। এইজন্য এক-একটা সময় আসে যখন এক-একটা জাতির মধ্যে মানুষের ভিতরকার বিকৃতিগুলিই উগ্র হয়ে দেখা দেয়। ইংরেজিসাহিত্যের ভিতর যখন অত্যন্ত একটা কলুষ এসেছিল সে উদ্ধত হয়েই নির্লজ্জ হয়েই আপনাকে প্রকাশ করেছিল। তার পর আবার সেটা কেটে গেছে। ফরাসীবিপ্লবের সময় ইংরেজ কবিদের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহের কথা বলেছেন; প্রচলিত সমাজনীতি, প্রচলিত ধর্মনীতিকে গুরুতর আঘাত করেছেন। মানুষের মনকে কর্মকে মোহমুক্ত করে পূর্ণতা দান করবার জন্যে তাঁদের কাব্যে সাহিত্যে খুব একটা আগ্রহ দেখা গেছে। তখনকার সমাজে তাঁদের কাব্য নিন্দিত হয়েছে, কিন্তু কালের হাতে তার সমাদর বেড়ে গেল। এ দিকে বিশেষ কোনো যুগে যে-সব লালসার কাব্যকীর্তন প্রকাশিত হয়েছিল তারা সেকালের বিদগ্ধদের কাছে সম্মান পেয়েছে: মনে হয়তো হয়েছিল, এইটেই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। তবু পরে প্রকাশ পেয়েছে, এ জিনিসটা সেই যুগের ক্ষণকালীন উপসর্গ।

আমাদের সংস্কৃতিসাহিত্যেও এই বিকৃতি অনেক দেখা গিয়েছে। যখন সংস্কৃতসাহিত্যে সাধনার দৈন্য এসেছিল তখন কাব্যে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বর্তমান কালের আরম্ভে কবির লড়াই, পাঁচালি, তর্জা প্রভৃতিতে সাহিত্যের যে-বিকার দেখা দিয়েছিল সেগুলিতে বীর্যবান জাতির প্রবল উন্নতির বা মহৎ আকাঙ্ক্ষার পরিচয় নেই। তার ভিতর অত্যন্ত পঙ্কিলতা আছে। সমাজের পথযাত্রার পাথেয় হচ্ছে উৎকর্ষের জন্যে আকাঙ্ক্ষা। জীবনের মধ্যে ব্যবহারে তার প্রকাশ খণ্ডিত হয়ে যায় বলেই মনে তার জন্যে যে-আকাঙ্ক্ষা আছে তাকে রত্নের মতো সাহিত্যের বহুমূল্য কৌটোর মধ্যে রেখে দিই— তাকে সংসারযাত্রায় ব্যক্ত সত্যের চেয়ে সম্পূর্ণতর করে উপলব্ধি করি। এই আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ মহৎ থাকে এবং এই আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ যতক্ষণ লোকের কাছে মূল্য পায়, ততক্ষণ সে জাতির মধ্যে যতই দোষ থাক, তার বিনাশ নেই। য়ুরোপীয় জাতির ভিতর যে-অস্বাস্থ্য রয়েছে তার প্রতিকারও তাদের মধ্যে আছে। যেখানে স্বাস্থ্যের প্রবলতা সেখানে রোগও আপাতত প্রবল হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও মানুষ বাঁচে। দুর্বল শরীরে তার প্রকাশ হলে সে মরে।

আমরা এখন একটা নবযুগের আরম্ভকালে আছি। এখন নূতন কালের উপযোগী বল সংগ্রহ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে প্রতিকূলতার সঙ্গে। আমাদের সমস্ত চিত্তকে ও শক্তিকে জাগরূক করে আমরা যদি দাঁড়াতে পারি তা হলেই আমরা বাঁচব। নইলে পদে পদে আমাদের পরাভব। আমাদের মজ্জার ভিতর জীর্ণতা; এইজন্য অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে আমাদের যেটা তপস্যার দান সেটাকে যেন আমরা

নষ্ট না করি, তপোভঙ্গ যেন আমাদের না হয়। মানবজীবনকে বড়ো করে দেখার শক্তি সব চাইতে বড়ো শক্তি। সেই শক্তিকে আমরা যেন রক্ষা করি। সংকীর্ণতা প্রাদেশিকতার দ্বারা সে-শক্তিকে আমরা খর্ব করব না। এজন্যে আমাদের অনেক লড়াই করতে হবে। সে লড়াই করতে না পারলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। যুদ্ধের পথেই আমরা বীর্য পাব। যে-আত্মসংযমের দ্বারা মানুষ বড়ো শক্তি পেয়েছে তাকে অবিশ্বাস করে যদি বলি, সেটা পুরানো ফ্যাশন, এখন তার সময় গেছে, তা হলে আমাদের মৃত্যু। যে-ফল এখনো পাকবার সময় হয় নি তার ভিতর পোকা ঢুকেছে, এই আক্ষেপ মনের ভিতর যখন জাগে তখন সেটাকে কেউ যেন ব্যক্তিগত কলহের কথা বলে না মনে করেন।

যে-সমস্ত লেখা সমাজের কাছে তিরস্কৃত হতে পারত যখন দেখি তাও সম্ভব হয়েছে, তখন নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে, বাতাসে কিছু ঘোরতর বিষসঞ্চার হয়েছে। এই মনের আক্ষেপ নিয়ে হয়তো কিছু বলে থাকব। বেদনা কিছু ছিল দেশের দিকে, কালের দিকে, সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে। যদি কেউ মনে করেন, এই বেদনা প্রকাশের অধিকার আমাদের নাই, অসংযতভাবে তাঁরা যা বলেন সেটা এখনকার ডেমোক্রাটিক সাহিত্যে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে, তা হলে বলতে হবে, তাঁদের মতের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। যদি কেউ বলেন, আমরা সে দলের নই, আমি খুশি হব। মানুষের জন্য, দেশের জন্য, সমাজের জন্য যাঁরা কাজ করেন, ত্যাগের ভিতর দিয়ে, সংযমের ভিতর দিয়েই করেন। কেউ যেন কখনো না বলেন, উন্মত্ততার দ্বারা পৃথিবীর উপকার করব।

যাকে শ্রদ্ধা বলে তা সৃষ্টি করে, অশ্রদ্ধা নষ্ট করে। যদি বলি, আমি বড়োকে শ্রদ্ধা করি না, তা হলে শুধু যে বড়োকে আঘাত করি তা নয়, সৃষ্টির শক্তিকে একেবারে নষ্ট করি, সেটা আমাদের পতনের কারণ হয়। যারা বিজয়ী হয়েছে তারা শ্রদ্ধার উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে জয় করেছে। বড়ো বড়ো যুদ্ধে যে-সকল সেনাপতিরা জিতেছেন তাঁরা হারতে হারতেও বলেছেন 'আমরা জিতেছি', কখনো হারকে স্বীকার করতে চান নি। সেটা উপস্থিত তথ্যের বিরোধী হতে পারে। হয়তো হেরেছিলেন। কিন্তু, যেহেতু তাঁরা নিজেকে শ্রদ্ধা করেছেন, তার দ্বারা হারের ভিতর দিয়ে জয়কে সৃষ্টি করেছেন। শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত জাতির জয়সম্পদকে সৃষ্টি করা যায়। যখন দেখি, জাতির মনে অশ্রদ্ধা আসন পেতে মহৎকে অট্টহাসির দ্বারা বিদ্রূপ করতে থাকে, তখন সব-চাইতে বেশি আশঙ্কা হয়, তখন হতাশ হয়ে বলতে হয়, পরাভবের সময় এল। আমাদের সিদ্ধি সে তো দূরে রয়েছে, কিন্তু তার অগ্রগামী দূত যে-শ্রদ্ধা সেও যদি না থাকে তা হলে তার চেয়ে এমনতরো সর্বনাশ আর কিছু হতে পারে না।

আমার নিজের লেখাতে যেটা বিকৃত সেটার নজির দেখাতে পারেন, অসম্ভব কিছু নয়। দীর্ঘকালের লেখার ভিতরে কখনো কলুষ লাগে নি, এ কথা বলতে পারব না। যদি বলি, যা-কিছু লিখেছি সমস্ত শ্রদ্ধেয়, সমস্ত ভালো, অতবড়ো দাম্ভিকতা আর-কিছু হতে পারে না। অনেক রকমের অনেক লেখার মধ্য থেকে খুঁটে খুঁটে যেগুলি নিজের পক্ষ সমর্থন করে সেগুলিই যদি গ্রহণ করি তবে তার দ্বারা শেষ কথা বা সম্পূর্ণ কথা বলা হবে না।

আজকের সভায় ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, নিন্দা-প্রশংসার কথা নয়— ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে যাঁরা সাহিত্যের সত্যকে মনের ভিতর দেখতে পেয়েছেন তাঁরা আপনাদের মনের কথা বলবেন, এই বিশ্বাসেই এই সভা আহ্বান করেছিলাম। আমি আশা করেছিলাম, সাহিত্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত যাঁদের আছে তাঁরা সেটা সুস্পষ্ট করে ব্যক্ত করবেন। কোন্ নীতির ভিত্তির উপর সাহিত্য রচিত হয়ে থাকে, কোন্ সাহিত্য মানুষের কাছে চিরকালের গৌরব পাওয়ার যোগ্য, সেই সম্বন্ধে কারও কিছু বিশেষ ভাবে বলবার থাকে সেইটাই বলবেন, এই সংকল্প করেই আমি আপনাদের ডেকেছি। আমি কখনো মনে করি নি, আমার পক্ষের কথা বলে সকলের কথাকে চাপা দেব। আমার নিবেদন এই যে, আপনারা আমার উপর রাগ না করে আপনাদের মত সভায় ব্যক্ত করুন। আমার যেটা মত সেটা আমারই মত। যদি বলেন, এ মত সেকেলে, পুরোনো, তা হলে সেটাকে অনিবার্য বলে মেনে নিতে রাজি আছি। যে-মত নিয়ে কাজ করেছি, লিখেছি, সেটা সত্য জেনেই করেছি, তাকে যদি মূঢ়তা বলে বিচার করেন করুন। আমার সাফাই জবাব থাকে দিতে চেষ্টা করব। আমরা এতদিন যা ভেবে এসেছি সেটা

চিরকালের সাহিত্যে স্থান না পাবার যোগ্য হতেও পারে। এতকাল যা হয়েছে এখন থেকে ভবিষ্যত পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ উলটা রকমের ব্যাপার হবে, এরকমই যদি আপনাদের মত হয় বলুন। সেদিন আপনাদের কেউ কেউ বললেন, আমার সঙ্গে তাঁদের মতের পার্থক্য নেই, সেটাও স্পষ্ট করে বলা দরকার।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায় : সামাজিক প্রাণী হিসাবে সাহিত্যিকের সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে ভাঙবার কতটা অধিকার আছে আপনি বিচার করবেন।

রবীন্দ্রনাথ : সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হয় কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। যেমন এক সময় আমাদের দেশে একান্নবর্তী ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, অবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তি শিথিল হয়েছে। সমাজব্যবস্থার যখন পরিবর্তন হয়, সে-পরিবর্তন যে কারণেই হোক— ধর্মনৈতিক কারণেই যে সব সময় হয় তা নয়, অধিকাংশ স্থলে অর্থনৈতিক কারণেও হয়— তখন একটি কথা ভাববার আছে। তৎকালীন যে-সমস্ত ব্যবস্থা প্রবল ছিল, যার প্রয়োজন ছিল, তখন সেগুলোকে রক্ষা করবার জন্য কতকগুলো বিধিনিষেধ পাকা করে দেওয়া হয়। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে প্রয়োজন চলে যায়, অথচ নিয়ম শিথিল হতে চায় না। সমাজ অন্ধভাবেই আপন নিয়ম আঁকড়ে থাকে। সে বলে, যে-কারণেই হোক, একটাও নিয়ম আলগা হলেই সব নিয়মের জোর চলে যায়। সকল মানুষই সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধি খাটাবার অধিকার দাবি করলে সমাজ টিকতে পারে না। সমাজের পক্ষে এই কথা। সাহিত্য সমাজের এই সতর্কতাকে সম্মান করে না। সর্বকালের নীতির দিকে তাকিয়ে সাহিত্য অনেক সময় তাকে বিদ্রূপ করে তার বিরুদ্ধবাক্য ব'লে। অবশ্য সমাজের এমনও অনেক বিধি আছে যার আয়ু অল্প নয়। রীতির চেয়ে নীতির উপরে যার ভিত্তি। যেমন আমাদের হিন্দু-সমাজে গোহত্যা পাপ বলে গণ্য, অথচ সেই উপলক্ষে মানুষ-হত্যা ততদূর পাপ বলে মনে করি না। মুসলমানের অন্ন খেয়েছে বলে শাস্তি দিই, মুসলমানের সর্বনাশ করেছে বলে শাস্তি দিই নে। সমাজব্যবস্থার জন্য বাঁধাবাঁধি যে-নিয়ম হয়েছে সাহিত্য যদি তাকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা না করে সাহিত্যকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু, যে-সমস্ত নীতি মানুষের চরিত্রের মর্মগত সত্য, যেমন লোককে প্রতারণা করব না, ইত্যাদি সেগুলির ব্যতিক্রম কোনোকালে হতে পারে বলে মনে করি না।

প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় : কিন্তু তরুণরা এই যে লিখেছেন, ভগবান প্রেম আর ভূত মানি না, সাহিত্যে তার স্থান আছে কি।

রবীন্দ্রনাথ : এ কথা পূর্বে বলেছি। মানুষ যেখানে জয়ী হয়েছে সেখানে সে যা পেয়েছে তার বেশি দিয়েছে। ঐশ্বর্য বলতে এই বোঝায়, সে তার মূলধনের বাড়া। সেই ঐশ্বর্যই প্রকাশ পায় সাহিত্যে। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে ঐশ্বর্যই হচ্ছে প্রেম, কামনা নয়। কামনায় উদ্‌বৃত্ত কিছু থাকে না। উদ্‌বৃত্তটাই নানা বর্ণে রূপে প্রেমে প্রকাশ পায়। লোভ-ক্রোধের প্রবলতার মধ্যেও প্রকাশের শক্তি আছে। যুদ্ধের মধ্যে, আঘাতের মধ্যে, নিষ্ঠুরতার মধ্যে আপনাকে সে প্রকাশ করতে পারে। বর্বরতার মধ্যেও সাহিত্যের প্রকাশযোগ্য কিছু আছে, সেটা কলুষ নয়, সেটা তেজ, শক্তি। অনেক সময় অতিসভ্য জাতির প্রাণশক্তিতে শৈথিল্য যখন আসে তখন বাহির হতে বর্বরতার ক্রোধ ও হিংসা কাজে লাগে। অতিসভ্য জাতির চিত্ত যখন ম্লান হয়ে আসে, চিরকালের জিনিস সে যখন কিছু দিতে পারে না, তখন তার দুর্গতি। গ্রীস যখন উন্নতির মধ্যগগনে ছিল তখন সে চিত্তেরই ঐশ্বর্য দিয়েছে, কামনা বা লালসার আভাস সেইসঙ্গে থাকলেও সেটা নগণ্য। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পঙ্কিলতা প্রকাশ পায় এও সেইরূপ। স্রোত ক্ষীণ হয়ে পাঁক বড়ো হলেই বিপদ।

একজন প্রশ্ন করলেন : আপনি সাহিত্য-সৃষ্টির আদর্শের কথা বললেন। সমালোচনারও এরকম কোনো আদর্শ আছে কি না। সাহিত্য-সমালোচনায় লগুড় ও ব্যক্তিগত গালাগালিই যদি একমাত্র জিনিস হয় তা হলে সেটা সাহিত্যের পক্ষে হিতজনক কি না।

রবীন্দ্রনাথ : এটা সাহিত্যিক নীতি-বিগর্হিত। যে-সমালোচনার মধ্যে শান্তি নাই, যা কেবলমাত্র

আঘাত দেয়, কেবলমাত্র অপরাধটুকুর প্রতিই সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করি নে। এরূপ সমালোচনার ভিতর একটা জিনিস আছে যা বস্তুত নিষ্ঠুরতা— এটা আমাকে পীড়ন করে। সাহিত্যিক অপরাধের বিচার সাহিত্যিক ভাবেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ, রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকে দেখতে হবে। অনেক সময়ে টুকরো করতে গেলেই এক জিনিস আর হয়ে যায়। সমগ্র পটের মধ্যে যে-ছবি আছে পটটাকে ছিঁড়ে তার বিচার করা চলে না— অন্তত সেটা আর্টের বিচার নয়। সুবিচার করতে হলে যে-শান্তি মানুষের থাকা উচিত সেটা রক্ষা করে আমরা যদি আমাদের মত প্রকাশ করি তা হলে সে মতের প্রভাব অনেক বেশি হয়। বিচারশক্তির প্রেস্‌টিজ শাসনশক্তির প্রেস্‌টিজের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের গভর্মেন্টের কোনো কোনো ব্যবহারে প্রকাশ পায় যে, তার মতে শাসনের প্রবলতা প্রমাণ করবার জন্যে মারের মাত্রাটা ন্যায়ের মাত্রার চেয়ে বাড়ানো ভালো। আমরা বলি, সুবিচার করবার ইচ্ছাটা দণ্ডবিধান করবার ইচ্ছার চেয়ে প্রবল থাকা উচিত।

সজনীকান্ত দাস : এখানে যে-আলোচনা হচ্ছে সেটা সম্ভবত 'শনিবারের চিঠি' নিয়েই ?

রবীন্দ্রনাথ : হাঁ, 'শনিবারের চিঠি' নিয়েই কথা হচ্ছে।

ইহার পর 'শনিবারের চিঠি'র আদর্শ, 'শনিবারের চিঠি'র 'মণিমুক্তা'র আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্যিক ও সামাজিক doctrine, তাঁহারা যাহা সৃষ্টি করিতেছেন তাহা আদপে সাহিত্য কি না, ইত্যাদি বিষয়ে নানা ভাবের আলোচনা হয়। এই আলোচনায় নীরদচন্দ্র চৌধুরী, অপূর্বকুমার চন্দ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অমলচন্দ্র হোম, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা পর পর লিখিত হইল।

মণিমুক্তা সম্বন্ধে

যা মনকে বিকৃত করে সেগুলিকে সংগ্রহ করে সকলের কাছে প্রকাশ করলে উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে যাওয়া হয়।

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে

যে-জিনিস বরাবর সাহিত্যে বর্জিত হয়ে এসেছে, যাকে কলুষ বলি, তাকেই চরম বর্ণনীয় বিষয় করে দেখানো এক শ্রেণীর আধুনিক সাহিত্যিকদের একটা বিশেষ লক্ষ্য। এবং এইটে অনেকে স্পর্ধার বিষয় মনে করেন। কেউ কেউ বলছেন, এ-সব প্রতিক্রিয়ার ফল। আমি বলব প্রতিক্রিয়া কখনোই প্রকৃতিস্থতা নয়। তা ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মাত্র প্রকাশ করে, তা চিরন্তন হতে পারে না। যেমনতরো কোনোসময় বাতাস গরম হয়ে প্রতিক্রিয়ায় ঝড় আসতে পারে অথচ কেউ বলতে পারেন না, এর পর থেকে বরাবর কেবল ঝড়ই উঠবে।

ঈশ্বরকে মানি নে, ভালোবাসা মানি নে, সুতরাং আমরা সাহিত্যে বিশেষ কৌলীন্য লাভ করেছি, এমন কথা মনে করার চেয়ে মূঢ়তা আর কিছু হতে পারে না। ঈশ্বরকে মানি না বা বিশ্বাস করি না, সেটাতে সাহিত্যিকতা কোথায়। ভালোবাসা মানছি না, অতএব যারা ভালোবাসা মানে তাদেরকে অনেকদূর ছাড়িয়ে গিয়েছি, সাহিত্য প্রসঙ্গে এ কথা বলে লাভ কী।

'শনিবারের চিঠি'র সমালোচনা সম্বন্ধে

'শনিবারের চিঠি' যদি সাহিত্যের সীমার মধ্যে থেকে বিশুদ্ধভাবে সম্পূর্ণভাবে সমালোচনার পথে অগ্রসর হন, তা হলে বেশি ফললাভ করবেন এই আমার বিশ্বাস। যদি একান্তভাবে দোষ নির্ণয় করবার দিকে সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করি তা হলে সেটা মাথায় চেপে যায়, তাতে শক্তির অপচয় ঘটে। 'শনিবারের চিঠি'তে এমন-সব লোকের সম্বন্ধে আলোচনা দেখেছি যাঁরা সাহিত্যিক নন এবং জনগণের মধ্যেও যাঁদের বিশেষ প্রাধান্য নেই। তাঁদের ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে অতি প্রকট করে যে-সব ছবি আঁকা হয় তাতে না সাহিত্যের না সমাজের কোনো উপকার ঘটে। এর ফল হয় এই যে, যেখানে সাধারণের

হিতের প্রতি লক্ষ করে লেখকেরা কঠিন কথা বলেন তার দাম কমে যায়। মনে হয়, কঠিন কথা বলাতেই লেখকের বিশেষ আনন্দ, তাঁর লক্ষ্য যেই হোক আর যাই হোক।

কর্তব্যপালনের যে অবশ্যম্ভাবী কঠোরতা আছে নিজেরও সম্বন্ধে সেটাকে অত্যন্ত দৃঢ় রাখা চাই। 'শনিবারের চিঠি'র লেখকদের সুতীক্ষ্ণ লেখনী, তাঁদের রচনানৈপুণ্যেরও আমি প্রশংসা করি, কিন্তু এই কারণেই তাঁদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি ; তাঁদের খড়্গের প্রখরতা প্রমাণ করবার উপলক্ষে অনাবশ্যক হিংস্রতা লেশমাত্র প্রকাশ না পেলে তবেই তাঁদের শৌর্যের প্রমাণ হবে। সাহিত্যসংস্কার কার্যে তাঁদের কর্তব্যের ক্ষেত্র আছে— কিন্তু কর্তব্যটি অপ্রিয় বলেই এই ক্ষেত্রে সীমা তাঁদেরকে একান্তভাবে রক্ষা করতে হবে। অস্ত্রচিকিৎসায় অস্ত্রচালনার সতর্কতা অত্যন্ত বেশি দরকার, কেননা আরোগ্যবিধানই এর লক্ষ্য, মারা এর লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের চিকিৎসাই 'শনিবারের চিঠি'র লক্ষ্য, এই কারণেই এই লক্ষ্যের একটুমাত্র বাইরে গেলেও তাঁদের প্রতিপত্তি নষ্ট হবে। চিকিৎসকের পক্ষে অস্ত্রচালনার কৌশলই একমাত্র জিনিস নয়। প্রতিপত্তিও মহামূল্য। সেই প্রতিপত্তি রক্ষা করে 'শনিবারের চিঠি' যদি কর্তব্যের খাতিরে নিষ্ঠুরও হন তাকে কেউ নিন্দা করতে পারবে না। যাঁদের শক্তি আছে তাঁদের কাছেই আমরা যথাস্থানে ক্ষান্তি দাবি করি। কর্তব্য যেখানে বড়ো সেখানেই তার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ শুচি রক্ষার প্রয়োজন।

আধুনিক সাহিত্যের doctrine সম্বন্ধে পুনরায়

কেবলমাত্র না-মানার দ্বারা সাহিত্যিক হওয়া যায় না। শুধু ভগবান প্রেম আর ভূত কেন তোমরা আরো অনেক কিছু না মানতে পার। যেমন, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে যদি সে কথাও লিখতে তা হলে বুঝতেম সেটাতে সাহিত্য-বহির্বর্তী বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আছে। সাহিত্য-আলোচনায় যদি বল, অনেকে বলে ভীমনাগের সন্দেশ ভালো, আমি বলি ভালো নয়, তার দ্বারা সাহিত্যিক সাহিসকতা বা অপূর্বতার প্রমাণ হয় না।

সর্বশেষে

অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে কেউ লিখতে পারে না। তোমরা বলতে পার, দরিদ্রের মনোবৃত্তি আমি বুঝি না, এ কথা মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। তোমরা যদি বল, তোমাদের সাহিত্যের বিশেষত্ব দারিদ্র্যের অনুভূতি, আমি বলব সেটা গৌণ। তোমরা যদি সর্বদা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে 'দরিদ্রনারায়ণ' 'দরিদ্রনারায়ণ' কর তাতে ক'রে এমন একটা বায়ুবৃদ্ধি হবে যাতে সাধারণ পাঠকেরা দরিদ্রনারায়ণ বললেই চোখের জলে ভেসে যাবে। তোমরা কথায় কথায় আধুনিক মাসিকপত্রে বল, আমরা আধুনিক কালের লোক, অতএব গরিবের জন্যে কাঁদব। এরকম ভঙ্গিমাবিস্তারের প্রশ্রয় সাহিত্যে অপকার করে। আমরা অর্থশাস্ত্র শেখবার জন্য গল্প পড়ি না। গল্পের জন্য গল্প পড়ি। 'গরিবিয়ানা' 'দরিদ্রিয়ানা'কে সাহিত্যের অলংকার করে তুলো না। ভঙ্গি মাত্রেরই অসুবিধা এই যে, অতি সহজেই তার অনুকরণ করা যায়— অল্পবুদ্ধি লেখকের সেটা আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। যখন তোমাদের লেখা পড়ব তখন এই বলে পড়ব না যে, এইবার গরিবের কথা পড়া যাক। গোড়ার থেকে ছাপ মেরে চিহ্নিত করে তোমরা নিজেদের দাম কমিয়ে দাও। দল বেঁধে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টি যা মানুষ একলাই করেছে। যখন সেটা দল বাঁধার কোঠায় গিয়ে পড়ে তখন সেটা আর সাহিত্য থাকে না। প্রত্যেকের নিজের ভিতর অভিমান থাকা উচিত যে, আমি যা লিখছি 'গরিবিয়ানা' বা 'যুগ' প্রচার করবার জন্য নয়, একমাত্র আমি যেটা বলতে পারি সেটাই আমি লিখছি। এ কথা বললেই লেখক যথার্থ সাহিত্যিকের আসন পায়। উপসংহারে এ কথাও আমি বলে রাখতে চাই, তোমাদের অনেক লেখকের মধ্যে আমি প্রতিভার লক্ষণ দেখেছি। আমি কামনা করি, তাঁরা যুগ-প্রবর্তনের লোভে প'ড়ে তাঁদের লেখার সর্বাঙ্গে কোনো দলের ছাপের উল্‌কি পরিয়ে তাকে সজ্জিত করা হল বলে না মনে করেন। তাঁদের শক্তির বিশুদ্ধ স্বকীয় রূপটি জগতে জয়ী হোক।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

পঞ্চাশোর্ধ্বম্

পঞ্চাশ বছরের পরে সংসার থেকে সরে থাকার জন্য মনু আদেশ করেছেন।

যাকে তিনি পঞ্চাশ বলেছেন, সে একটা গণিতের অঙ্ক নয়, তার সম্বন্ধে ঠিক ঘড়িধরা হিসাব চলে না। ভাবখানা এই যে, নিরন্তরপরিণতি জীবনের ধর্ম নয়। শক্তির পরিব্যাপ্তি কিছুদিন পর্যন্ত এগিয়ে চলে, তার পরে পিছিয়ে আসে। সেই সময়টাতেই কর্মে যতি দেবার সময়; না যদি মানা যায়, তবে জীবনযাত্রার ছন্দোভঙ্গ হয়।

জীবনের ফসল সংসারকে দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যেমন-তেমন করে দিলেই হল না। শাস্ত্র বলে, 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'; যা আমাদের শ্রেষ্ঠ তাই দেওয়াই শ্রদ্ধার দান— সে না কুঁড়ির দান, না ঝরা ফুলের। ভরা ইন্দারায় নির্মল জলের দাক্ষিণ্য, সেই পূর্ণতার সুযোগেই জলদানের পুণ্য; দৈন্য যখন এসে তাকে তলার দিকে নিয়ে যায়, তখন যতই টানাটানি করি ততই ঘোলা হয়ে ওঠে। তখন এ কথা যেন প্রসন্ন মনে বলতে পারি যে, থাক, আর কাজ নেই।

বর্তমান কালে আমরা বড়োবেশি লোকচক্ষুর গোচরে। আর পঞ্চাশ বছর পূর্বেও এত বেশি দৃষ্টির ভিড় ছিল না। তখন আপন মনে কাজ করার অবকাশ ছিল, অর্থাৎ কাজ না-করাটাও আপন মনের উপরই নির্ভর করত, হাজার লোকের কাছে তার জবাবদিহি ছিল না। মনু যে 'বনং ব্রজেৎ' বলেন, সেই ছুটি নেবার বনটা হাতের কাছেই ছিল; আজ সেটা আগাগোড়া নির্মূল। আজ মন যখন বলে 'আর কাজ নেই', বহু দৃষ্টির অনুশাসন দরজা আগলে বলে 'কাজ আছে বৈকি'— পালাবার পথ থাকে না। জনসভায় ঠাসা ভিড়ের মধ্যে এসে পড়া গেছে; পাশ কাটিয়ে চুপিচুপি সরে পড়বার জো নেই। ঘরজোড়া বহু চক্ষুর ভর্ৎসনা এড়াবে, কার সাধ্য? চারি দিক থেকে রব ওঠে, 'যাও কোথায় এরই মধ্যে?' ভগবান মনুর কণ্ঠ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়।

যে কাজটা নিজের অন্তরের ফরমাশে তা নিয়ে বাহিরের কাছে কোনো দায় নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে বাহিরের দাবি দুর্বার। যে-মাছ জলে আছে তার কোনো বালাই নেই, যে-মাছ হাটে এসেছে তাকে নিয়েই মেছোবাজার। সত্য করেই হোক, ছল করেই হোক, রাগের ঝাঁজে হোক, অনুরাগের ব্যথায় হোক, যোগ্য ব্যক্তিই হোক, অযোগ্য ব্যক্তিই হোক, যে-সে যখন-তখন যাকে-তাকে বলে উঠতে পারে, 'তোমার রসের জোগান কমে আসছে, তোমার রূপের ডালিতে রঙের রেশ ফিকে হয়ে এল।' তর্ক করতে যাওয়া বৃথা; কারণ শেষ যুক্তিটা এই যে, 'আমার পছন্দ-মাফিক হচ্ছে না।' 'তোমার পছন্দের বিকার হতে পারে, তোমার সুরুচির অভাব থাকতে পারে' এ কথা বলে লাভ নেই। কেননা, এ হল রুচির বিরুদ্ধে রুচির তর্ক; এ তর্কে দেশকালপাত্রবিশেষে কটুভাষার পঙ্কিলতা মথিত হয়ে ওঠে, এমন অবস্থায় শান্তির কটুত্ব কমাবার জন্যে সবিনয় দীনতা স্বীকার করে বলা ভালো যে, স্বভাবের নিয়মেই শক্তির হ্রাস; অতএব শক্তির পূর্ণতাকালে যে-উপহার দেওয়া গেছে তারই কথা মনে রেখে, অনিবার্য অভাবের সময়কার ত্রুটি ক্ষমা করাই সৌজন্যের লক্ষণ। শ্রাবণের মেঘ আশ্বিনের আকাশে বিদায় নেবার বেলায় ধারাবর্ষণে যদি ক্লান্তি প্রকাশ করে তবে জনপদবধূরা তাই নিয়ে কি তাকে দুয়ো দেয়। আপন নবশ্যামল ধানের খেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে কি করে না আষাঢ়ে এই মেঘেরই প্রথম সমাগমের দাক্ষিণ্যসমারোহের কথা।

কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই সৌজন্যের দাবি প্রায় ব্যর্থ হয়। বৈষয়িক ক্ষেত্রেও পূর্বকৃত কর্মের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভদ্ররীতি আছে। পেন্‌শনের প্রথা তার প্রমাণ। কিন্তু, সাহিত্যেই পূর্বের কথা স্মরণ ক'রে শক্তির হ্রাস ঘটাকে অনেকেই ক্ষমা করতে চায় না। এই তীব্র প্রতিযোগিতার দিনে অনেকেই এতে উল্লাস অনুভব করে। কষ্টকল্পনার জোরে হালের কাজের ত্রুটি প্রমাণ ক'রে সাবেক কাজের মূল্যকে খর্ব করবার জন্যে তাদের উত্তপ্ত আগ্রহ। শোনা যায়, কোনো কোনো দেশে এমন মানুষ আছে যারা তাদের সমাজের প্রবীণ লোকের শক্তির কৃশতা অনুমান করলে

তাকে বিনা বিলম্বে চালের উপর থেকে নীচে গড়িয়ে মারে। মানুষকে উচ্চ চালের থেকে নীচে ভূমিসাৎ করবার ছুতো খুঁজে বেড়ানো, কেবল আফ্রিকায় নয়, আমাদের সাহিত্যেও প্রচলিত। এমনতরো সংকটসংকুল অবস্থায় জনসভার প্রধান আসন থেকে নিষ্কৃতি লওয়া সংগত ; কেননা, এই প্রধান আসনগুলোই চালের উপরিতল, হিংস্রতা-উদ্‌বোধন করবার জায়গা।

আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি কেবলমাত্র সাহিত্যের কৃতিত্বকে কোনো মানুষের পক্ষেই চরম লক্ষ্য বলে মানতে চায় না। একদা তাকে অতিক্রম করবার সাধনাও মনে রাখতে হবে। জীবনের পঁচিশ বছর লাগে কর্মের জন্যে প্রস্তুত হতে, কাঁচা হাতকে পাকাবার কাজে। তার পরে পঁচিশ বছর পূর্ণ শক্তিতে কাজ করবার সময়। অবশেষে ক্রমে ক্রমে সেই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি নেবার জন্যে আরো পঁচিশ বছর দেওয়া চাই। সংসারের পুরোপুরি দাবি মাঝখানটাতে ; আরম্ভেও নয়, শেষেও নয়।

এই ছিল আমাদের দেশের বিধান। কিন্তু পশ্চিমের নীতিতে কর্তব্যটাই শেষ লক্ষ্য, যে-মানুষ কর্তব্য করে সে নয়। আমাদের দেশে কর্মের যন্ত্রটাকে স্বীকার করা হয়েছে, কর্মীর আত্মাকেও। সংসারের জন্যে মানুষকে কাজ করতে হবে, নিজের জন্যে মানুষকে মুক্তি পেতেও হবে।

কর্ম করতে করতে কর্মের অভ্যাস কঠিন হয়ে ওঠে এবং তার অভিমান। এক সময়ে কর্মের চলতি স্রোত আপন বালির বাঁধ আপনি বাঁধে, আর সেই বন্ধনের অহংকারে মনে করে সেই সীমাই চরম সীমা, তার উর্ধ্বে আর গতি নেই। এমনি করে ধর্মতন্ত্র যেমন সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর পাকা করে আপন সীমা নিয়েই গর্বিত হয়, তেমনি সকল প্রকার কর্মই একটা সাম্প্রদায়িকতার ঠাট গড়ে তুলে সেই সীমাটার শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনা ও ঘোষণা করতে ভালোবাসে।

সংসারে যত কিছু বিরোধ এই সীমায় সীমায় বিরোধ,পরস্পরের বেড়ার ধারে এসে লাঠালাঠি। এইখানেই যত ঈর্ষা বিদ্বেষ ও চিত্তবিকার। এই কলুষ থেকে সংসারকে রক্ষা করবার উপায় কর্ম হতে বেরিয়ে পড়বার পথকে বাধামুক্ত রেখে দেওয়া। সাহিত্যে একটা ভাগ আছে যেখানে আমরা নিজের অধিকারে কাজ করি, সেখানে বাহিরের সঙ্গে সংঘাত নেই। আর-একটা ভাগ আছে যেখানে সাহিত্যের পণ্য আমরা বাহিরের হাটে আনি, সেইখানেই হট্টগোল। একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এমন দিন আসে যখন এইখানে গতিবিধি যথাসম্ভব কমিয়ে আনাই ভালো ; নইলে বাইরে ওড়ে ধুলোর ঝড়, নিজের ঘটে অশান্তি, নইলে জোয়ান লোকদের কনুয়ের ঠেলা গায়ে প'ড়ে পাঁজরের উপর অত্যাচার করতে থাকে।

সাহিত্যলোকে বাল্যকাল থেকেই কাজে লেগেছি। আরম্ভে খ্যাতির চেহারা অনেককাল দেখি নি। তখনকার দিনে খ্যাতির পরিসর ছিল অল্প ; এইজন্যই বোধ করি, প্রতিযোগিতার পরুষতা তেমন উগ্র ছিল না। আত্মীয়মহলে যে-কয়জন কবির লেখা সুপরিচিত ছিল, তাঁদের কোনোদিন লঙ্ঘন করব বা করতে পারব, এমন কথা মনেও করি নি। তখন এমন কিছু লিখি নি যার জোরে গৌরব করা চলে, অথচ এই শক্তিদৈন্যের অপরাধে ব্যক্তিগত বা কাব্যগত এমন কটূকাটব্য শুনতে হয় নি যাতে সংকোচের কারণ ঘটে।

সাহিত্যের সেই শিথিল শাসনের দিন থেকে আরম্ভ করে গদ্যে পদ্যে আমার লেখা এগিয়ে চলেছে, অবশেষে আজ সত্তর বছরের কাছে এসে পৌঁছলেম। আমার দ্বারা যা করা সম্ভব সমস্ত অভাব ত্রুটি সত্ত্বেও তা করেছি। তবু যতই করি-না কেন আমার শক্তির একটা স্বাভাবিক সীমা আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কারই-বা নেই।

এই সীমাটি দুই উপকূলের সীমা। একটা আমার নিজের প্রকৃতিগত, আর-একটা আমার সময়ের প্রকৃতিগত। জেনে এবং না-জেনে আমরা এক দিকে প্রকাশ করি নিজের স্বভাবকে এবং অন্য দিকে নিজের কালকে। রচনার ভিতর দিয়ে আপন হৃদয়ের যে-পরিতৃপ্তি সাধন করা যায় সেখানে কোনো হিসাবের কথা চলে না। যেখানে কালের প্রয়োজন সাধন করি সেখানে হিসাবনিকাশের দায়িত্ব আপনি এসে পড়ে। সেখানে বৈতরণীর পারে চিত্রগুপ্ত খাতা নিয়ে বসে আছেন। ভাষায় ছন্দে নূতন শক্তি এবং ভাবে চিন্তের নূতন প্রসার সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করে। কী পরিমাণে তারই আয়োজন

করা গেছে তার একটা জবাবদিহি আছে।

কখন কালের পরিবর্তন ঘটে, সব সময়ে ঠিক বুঝতে পারি নি। নূতন ঋতুতে হঠাৎ নূতন ফুল-ফল-ফসলের দাবি এসে পড়ে। যদি তাতে সাড়া দিতে না পারা যায় তবে সেই স্থাবরতাই স্থবিরত্ব প্রমাণ করে ; তখন কালের কাছ থেকে পারিতোষিকের আশা করা চলে না, তখনই কালের আসন ত্যাগ করবার সময়।

যাকে বলছি কালের আসন সে চিরকালের আসন নয়। স্থায়ী প্রতিষ্ঠা স্থির থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত কালের মহলে ঠাঁইবদলের হুকুম যদি আসে, তবে সেটাকে মানতে হবে। প্রথমটা গোলমাল ঠেকে। নতুন অভ্যাগতের নতুন আকারপ্রকার দেখে তাকে অভ্যর্থনা করতে বাধা লাগে, সহসা বুঝতে পারি নে— সেও এসেছে বর্তমানের শিখর অধিকার করে চিরকালের আসন জয় করে নিতে। একদা সেখানে তারও স্বত্ব স্বীকৃত হবে, গোড়ায় তা মনে করা কঠিন হয় ব'লে এই সন্ধিক্ষণে একটা সংঘাত ঘটতেও পারে।

মানুষের ইতিহাসে কাল সব সময়ে নূতন ক'রে বাসা বদল করে না। যতক্ষণ দ্বারে একটা প্রবল বিপ্লবের ধাক্কা না লাগে ততক্ষণ সে খরচ বাঁচাবার চেষ্টায় থাকে, আপন পূর্বদিনের অনুবৃত্তি ক'রে চলে, দীর্ঘকালের অভ্যস্ত রীতিকেই মাল্যচন্দন দিয়ে পূজা করে, অলসভাবে মনে করে সেটা সনাতন। তখন সাহিত্য পুরাতন পথেই পণ্য বহন ক'রে চলে, পথনির্মাণের জন্য তার ভাবনা থাকে না। হঠাৎ একদিন পুরাতন বাসায় তার আর সংকুলান হয় না। অতীতের উত্তর দিক থেকে হাওয়া বওয়া বন্ধ হয়, ভবিষ্যতের দিক থেকে দক্ষিণ-হাওয়া চলতে শুরু করে। কিন্তু, বদলের হাওয়া বইল বলেই যে নিন্দার হাওয়া তুলতে হবে, তার কোনো কারণ নেই। পুরাতন আশ্রয়ের মধ্যে সৌন্দর্যের অভাব আছে, যে-অকৃতজ্ঞ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেই কথা বলবার উপলক্ষ খোঁজে তার মন সংকীর্ণ, তার স্বভাব রূঢ়। আকবরের সভায় যে দরবারি আসর জমেছিল, নবদ্বীপের কীর্তনে তাকে খাটানো গেল না। তাই ব'লে দরবারি তোড়িকে গ্রাম্যভাষায় গাল পাড়তে বসা বর্বরতা। নূতন কালকে বিশেষ আসন ছেড়ে দিলেও দরবারি তোড়ির নিত্য আসন আপন মর্যাদায় অক্ষুণ্ণ থাকে। গোঁড়া বৈষ্ণব তাকে তাচ্ছিল্য ক'রে যদি খাটো করতে চায় তবে নিজেকেই খাটো করে। বস্তুত নূতন আগন্তুককেই প্রমাণ করতে হবে, সে নূতন কালের জন্য নূতন অর্ঘ্য সাজিয়ে এনেছে কি না।

কিন্তু, নূতন কালের প্রয়োজনটি ঠিক যে কী সে তার নিজের মুখের আবেদন শুনে বিচার করা চলে না, কারণ, প্রয়োজনটি অন্তর্নিহিত। হয়তো কোনো আশু উত্তেজনা, বাইরের কোনো আকস্মিক মোহ, তার অন্তর্গূঢ় নীরব আবেদনের উলটো কথাই বলে ; হয়তো হঠাৎ একটা আগাছার দুর্দমতা তার ফসলের খেতের প্রবল প্রতিবাদ করে ; হয়তো একটা মুদ্রাদোষে তাকে পেয়ে বসে, সেইটেকেই সে মনে করে শোভন ও স্বাভাবিক। আত্মীয়সভায় সেটাতে হয়তো বাহবা মেলে, কিন্তু সর্বকালের সভায় সেটাতে তার অসম্মান ঘটে। কালের মান রক্ষা ক'রে চললেই যে কালের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করা হয়, এ কথা বলব না। এমন দেখা গেছে, যাঁরা কালের জন্য সত্য অর্ঘ্য এনে দেন তাঁরা সেই কালের হাত থেকে বিরুদ্ধ আঘাত পেয়েই সত্যকে সপ্রমাণ করেন।

আধুনিক যুগে, য়ুরোপের চিত্তাকাশে যে হাওয়ার মেজাজ বদল হয় আমাদের দেশের হাওয়ায় তারই ঘূর্ণি-আঘাত লাগে। ভিক্টোরিয়া-যুগ জুড়ে সেদিন পর্যন্ত ইংলন্ডে এই মেজাজ প্রায় সমভাবেই ছিল। এই দীর্ঘকালের অধিক সময় সেখানকার সমাজনীতি ও সাহিত্যরীতি একটানা পথে এমনভাবে চলেছিল যে মনে হয়েছিল যে, এ ছাড়া আর গতি নেই। উৎকর্ষের আদর্শ একই কেন্দ্রের চারি দিকে আবর্তিত হয়ে প্রাগ্রসর উদ্যমকে যেন নিরস্ত করে দিলে। এই কারণে কিছুকাল থেকে সেখানে সমাজে, সাহিত্যকলাসৃষ্টিতে, একটা অধৈর্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সেখানে বিদ্রোহী চিত্ত সব-কিছু উলট-পালট করবার জন্য কোমর বাঁধল, গানেতে ছবিতে দেখা দিল যুগান্তের তাণ্ডবলীলা। কী চাই সেটা স্থির হল না, কেবল হাওয়ায় একটা রব উঠল 'আর ভালো লাগছে না'। যা-করে হোক আর কিছু-একটা ঘটা চাই। যেন সেখানকার ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্ব মনুর বিধান মানতে চায় নি,

পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল তবু ছুটি নিতে তার মন ছিল না। মহাকালের উন্মত্ত চরগুলো একটি একটি করে তার অঙ্গনে ক্রমে জুটতে লাগল : ভাবখানা এই যে, উৎপাত করে ছুটি নেওয়াবেই। সেদিন তার আর্থিক জমার খাতায় ঐশ্বর্যের অঙ্কপাত নিরবচ্ছিন্ন বেড়ে চলেছিল। এই সমৃদ্ধির সঙ্গে শান্তি চিরকালের জন্যে বাঁধা, এই ছিল তার বিশ্বাস। মোটা মোটা লোহার সিন্ধুকগুলোকে কোনো-কিছুতে নড়চড় করতে পারবে, এ কথা সে ভাবতেই পারে নি। এইজন্য একঘেয়ে উৎকর্ষের বিরুদ্ধে অনিবার্য চাঞ্চল্যকে সেদিনের মানুষ ঐ লোহার সিন্ধুকের ভরসায় দমন করবার চেষ্টায় ছিল।

এমন সময় হাওয়ায় এ কী পাগলামি জাগল। একদিন অকালে হঠাৎ জেগে উঠে সবাই দেখে, লোহার সিন্ধুকে ভয়ংকর মাথা-ঠোকাঠুকি ; বহুদিনের সুরক্ষিত শান্তি ও পুঞ্জীভূত সম্বল ধুলোয় ধুলোয় ছড়াছড়ি ; সম্পদের জয়তোরণ তলার উপর তলা গেঁথে ইন্দ্রলোকের দিকে চূড়া তুলেছিল, সেই ঔদ্ধত্য ধরণীর ভারাকর্ষণ সইতে পারল না, এক মুহূর্তে হল ভূমিসাৎ। পুষ্টদেহধারী তুষ্টচিত্ত পুরাতনের মর্যাদা আর রইল না। নূতন যুগ আলুথালু বেশে অত্যন্ত হঠাৎ এসে পড়ল, তাড়াহুড়ো বেধে গেল, গোলমাল চলছে— সাবেক-কালের কর্তাব্যক্তির ধমকানি আর কানে পৌঁছায় না।

অস্থায়িত্বের এই ভয়ংকর চেহারা অকস্মাৎ দেখতে পেয়ে কোনো-কিছুর স্থায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা লোকের একেবারে আলগা হয়ে গেছে। সমাজে সাহিত্যে কলারচনায় অবাধে নানাপ্রকারের অনাসৃষ্টি শুরু হল। কেউ-বা ভয় পায়, কেউ-বা উৎসাহ দেয়, কেউ বলে 'ভালো মানুষের মতো থামো', কেউ বলে 'মরিয়া হয়ে চলো'। এই যুগান্তরের ভাঙচুরের দিনে যাঁরা নূতন কালের নিগূঢ় সত্যটিকে দেখতে পেয়েছেন ও প্রকাশ করছেন তাঁরা যে কোথায়, তা এই গোলমালের দিনে কে নিশ্চিত করে বলতে পারে। কিন্তু, এ কথা ঠিক যে, যে-যুগ পঞ্চাশ পেরিয়েও তক্ত আঁকড়ে গদিয়ান হয়ে বসে ছিল, নূতনের তাড়া খেয়ে লোটাকম্বল হাতে বনের দিকে সে দৌড় দিয়েছে। সে ভালো কি এ ভালো সে তর্ক তুলে ফল নেই ; আপাতত এই কালের শক্তিকে সার্থক করবার উপলক্ষে নানা লোকে নব নব প্রণালীর প্রবর্তন করতে বসল। সাবেক প্রণালীর সঙ্গে মিল হচ্ছে না ব'লে যারা উদ্‌বেগ প্রকাশ করছে তারাও ঐ পঞ্চাশোর্ধ্বের দল, বনের পথ ছাড়া তাদের গতি নেই।

তাই বলছিলেম, ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন পঞ্চাশোর্ধ্বম্ আছে, কালগত হিসাবেও তেমনি। সময়ের সীমাকে যদি অতিক্রম করে থাকি তবে সাহিত্যে অসহিষ্ণুতা মথিত হয়ে উঠবে। নবাগত যাঁরা তাঁরা যে-পর্যন্ত নবযুগে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে নিজেরা প্রতিষ্ঠালাভ না করবেন সে-পর্যন্ত শান্তিহীন সাহিত্য কলুষলিপ্ত হবে। পুরাতনকে অতিক্রম করে নূতনকে অভূতপূর্ব করে তুলবই, এই পণ করে বসে নবসাহিত্যিক যতক্ষণ নিজের মনটাকে ও লেখনীটাকে নিয়ে অত্যন্ত বেশি টানাটানি করতে থাকবেন, ততক্ষণ সেই অতিমাত্র উদ্‌বেজনায় ও আলোড়নে সৃষ্টিকার্যে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

যেটাকে মানুষ পেয়েছে, সাহিত্য তাকেই যে প্রতিবিম্বিত করে, তা নয় ; যা তার অনুপলব্ধ, তার সাধনার ধন, সাহিত্যে প্রধানত তারই জন্য কামনা উজ্জ্বল হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। বাহিরের কর্মে যে-প্রত্যাশা সম্পূর্ণ আকার লাভ করতে পারে নি, সাহিত্যে কলারচনায় তারই পরিপূর্ণতার কল্পরূপ নানা ভাবে দেখা দেয়। শাস্ত্র বলে, ইচ্ছাই সত্তার বীজ। ইচ্ছাকে মারলে ভববন্ধন ছিন্ন হয়। ইচ্ছার বিশেষত্ব অনুসরণ করে আত্মা বিশেষ দেহ ও গতি লাভ করে। বিশেষ যুগের ইচ্ছা, বিশেষ সমাজের ইচ্ছা, সেই যুগের সেই সমাজের আত্মরূপসৃষ্টির বীজশক্তি। এই কারণেই যাঁরা রাষ্ট্রিক লোকগুরু তাঁরা রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইচ্ছাকে সর্বজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করতে চেষ্টা করেন, নইলে মুক্তির সাধনা দেশে সত্যরূপ গ্রহণ করে না।

সাহিত্যে মানুষের ইচ্ছারূপ এমন ক'রে প্রকাশ পায় যাতে সে মনোহর হয়ে ওঠে, এমন পরিস্ফুট মূর্তি ধরে যাতে সে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের চেয়ে প্রত্যয়গম্য হয়। সেই কারণেই সমাজকে সাহিত্য একটি সজীব শক্তি দান করে ; যে ইচ্ছা তার শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা সাহিত্যযোগে তা শ্রেষ্ঠ ভাষায় ও ভঙ্গিতে দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মনে কাজ করতে থাকে এবং সমাজের আত্মসৃষ্টিকে বিশিষ্টতা দান করে। রামায়ণ মহাভারত ভারতবাসী হিন্দুকে বহুযুগ থেকে মানুষ করে এসেছে। একদা ভারতবর্ষ যে-আদর্শ

কামনা করেছে তা ঐ দুই কাব্যে চিরজীবী হয়ে গেল। এই কামনাই সৃষ্টিশক্তি। বঙ্গদর্শনে এবং বঙ্কিমের রচনায় বাংলাসাহিত্যে প্রথম আধুনিক যুগের আদর্শকে প্রকাশ করেছে। তাঁর প্রতিভার দ্বারা অধিকৃত সাহিত্য বাংলাদেশের মেয়েপুরুষের মনকে এক কাল থেকে অন্য কালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে; এদের ব্যবহারে ভাষায় রুচিতে পূর্বকালবর্তী ভাবের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। যা আমাদের ভালো লাগে, অগোচরে তাই আমাদের গড়ে তোলে। সাহিত্যে শিল্পকলায় আমাদের সেই ভালো-লাগার প্রভাব কাজ করে। সমাজসৃষ্টিতে তার ক্রিয়া গভীর। এই কারণেই সাহিত্যে যাতে ভদ্রসমাজের আদর্শ বিকৃত নাহয়, সকল কালেরই এই দায়িত্ব।

বঙ্কিম যে-যুগ প্রবর্তন করেছেন আমার বাস সেই যুগেই। সেই যুগকে তার সৃষ্টির উপকরণ জোগানো এ-পর্যন্ত আমার কাজ ছিল। য়ুরোপের যুগান্তর-ঘোষণার প্রতিধ্বনি ক'রে কেউ কেউ বলছেন, আমাদের সেই যুগেরও অবসান হয়েছে। কথাটা খাঁটি না হতেও পারে। যুগান্তরের আরম্ভে প্রদোষান্ধকারে তাকে নিশ্চিত করে চিনতে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু, সংবাদটা যদি সত্যই হয় তবে এই যুগসন্ধ্যার যাঁরা অগ্রদূত তাঁদের ঘোষণাবাণীতে শুকতারার সুরম্য দীপ্তি ও প্রত্যুষের সুনির্মল শান্তি আসুক; নবযুগের প্রতিভা আপন পরিপূর্ণতার দ্বারাই আপনাকে সার্থক করুক, বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা নয়। রাত্রির চন্দ্রকে যখন বিদায় করবার সময় আসে তখন কুয়াশার কলুষ দিয়ে তাকে অপমানিত করবার প্রয়োজন হয় না, নবপ্রভাতের সহজ মহিমার শক্তিতেই তার অন্তর্ধান ঘটে।

পথে চলতে চলতে মর্তলীলার প্রান্তবর্তী ক্লান্ত পথিকের এই নিবেদনপত্র সসংকোচে 'তরুণসভায়' প্রেরণ করলেম। এই কালের যাঁরা অগ্রণী তাঁদের কৃতার্থতা একান্তমনে কামনা করি। নবজীবনের অমৃতপাত্র যদি সত্যই তাঁরা পূর্ণ ক'রে এনে থাকেন, আমাদের কালের ভাণ্ড আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যদি রিক্ত হয়েই থাকে, আমাদের দিনের ছন্দ যদি এখনকার দিনের সঙ্গে নাই মেলে, তবে তার যাথার্থ্য নূতন কাল সহজেই প্রমাণ করবেন— কোনো হিংস্রনীতির প্রয়োজন হবে না। নিজের আয়ুর্দৈর্ঘ্যের অপরাধের জন্য আমি দায়ী নই; তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, সমাপ্তির জন্য বিলুপ্তি অনাবশ্যক। সাহিত্যে পঞ্চাশোর্ধ্বম নিজের তিরোধানের বন নিজেই সৃষ্টি করে, তাকে কর্কশকণ্ঠে তাড়না ক'রে বনে পাঠাতে হয় না।

অবশেষে যাবার সময় বেদমন্ত্রে এই প্রার্থনাই করি— যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব: যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ করো।

ফাল্গুন ১৩৩৬

বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ

একদিন কলিকাতা ছিল অখ্যাত অসংস্কৃত পল্লী; সেখানে বসল বিদেশী বাণিজ্যের হাট, গ্রামের শ্যামল আবেষ্টন সরিয়ে দিয়ে শহরের উদ্ধত রূপ প্রকাশ পেতে লাগল। সেই শহর আধুনিক কালকে দিল আসন পেতে; বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের পথে দিগন্তের পর দিগন্তে সেই আসন বিস্তৃত হয়ে চলল।

এই উপলক্ষে বর্তমান যুগের বেগমান চিত্তের সংস্রব ঘটল বাংলাদেশে। বর্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ এই যে, সে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় বদ্ধ বা ব্যক্তিগত মূঢ় কল্পনায় জড়িত নয়। কি বিজ্ঞানে কি সাহিত্যে, সমস্ত দেশে সমস্ত কালে তার ভূমিকা। ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সর্বমানবচিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে।

এক দিকে পণ্য এবং রাষ্ট্র-বিস্তারে পাশ্চাত্যমানুষ এবং তার অনুবর্তীদের কঠোর শক্তিতে সমস্ত পৃথিবী অভিভূত, অন্য দিকে পূর্ব-পশ্চিমে সর্বত্রই আধুনিক কালের প্রধান বাহন পাশ্চাত্যসংস্কৃতির অমোঘ প্রভাব বিস্তীর্ণ। বৈষয়িক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের আক্রমণ আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিরোধ করতে পারি নি, কিন্তু পাশ্চাত্যসংস্কৃতিকে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতই স্বীকার করে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত

অঙ্গীকারের স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্বত্রগামিতা— নানা ধারায় এর অবাধ প্রবাহ, এর মধ্যে নিত্য-উদ্যমশীল বিকাশধর্ম নিয়ত উন্মুখ, কোনো দুর্নম্য কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবিরভাবে বদ্ধ নয়, রাষ্ট্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার গৌরবকে এ ঘোষণা করেছে— সকলপ্রকার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্যে এর প্রয়াস। এই সংস্কৃতি আপন বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে বিশ্ব ও মানব-লোকের সকল বিভাগভুক্ত সকল বিষয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত, সকল কিছুই পরীক্ষা করেছে, বিশ্লেষণ সংঘটন বর্ণন করেছে, মনোবৃত্তির গভীরে প্রবেশ করে সূক্ষ্ম স্থূল যত কিছু রহস্যকে অবারিত করছে। তার অন্তহীন জিজ্ঞাসাবৃত্তি প্রয়োজন অপ্রয়োজনে নির্বিচার, তার রচনা তুচ্ছ মহৎ সকল ক্ষেত্রেই উপাদান-সংগ্রহে নিপুণ। এই বিরাট সাধনা আপন বেগবান প্রশস্ত গতির দ্বারাই আপন ভাষা ও ভঙ্গিকে যথাযথ, অত্যুক্তিবিহীন, এবং কৃত্রিমতার-জঞ্জাল-বিমুক্ত করে তোলে।

এই সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল। এ নিয়ে বাঙালি যথার্থই গৌরব করতে পারে। সজল মেঘ নীলনদীর তট থেকেই আসুক আর পূর্বসমুদ্রের বক্ষ থেকেই বাহিত হোক, তার বর্ষণে মুহূর্তেই অন্তর থেকে সাড়া দেয় উর্বরা ভূমি— মরুক্ষেত্র তাকে অস্বীকার করার দ্বারা যে অহংকার করে সেই অহংকারের নিষ্ফলতা শোচনীয়। মানুষের চিত্তসম্ভূত যা-কিছু গ্রহণীয় তাকে সম্মুখে আসবামাত্র চিনতে পারা ও অভ্যর্থনা করতে পারার উদারশক্তিকে শ্রদ্ধা করতেই হবে। চিত্তসম্পদকে সংগ্রহ করার অক্ষমতাই বর্বরতা, সেই অক্ষমতাকেই মানসিক আভিজাত্য বলে যে-মানুষ কল্পনা করে সে কৃপাপাত্র।

প্রথম আরম্ভে ইংরেজি শিক্ষাকে ছাত্ররূপেই বাঙালি যুবক গ্রহণ করেছে। সেটা ধার-করা সাজসজ্জার মতোই তাকে অস্থির করে রাখলে, বাইরে থেকে পাওয়া জিনিসের অহংকার নিয়ত উদ্যত হয়ে রইল। ইংরেজিসাহিত্যের ঐশ্বর্যভোগের অধিকার তখন ছিল দুর্লভ এবং অল্পসংখ্যক লোকের আয়ত্তগম্য, সেই কারণেই এই সংকীর্ণশ্রেণীগত ইংরেজি-পোড়োর দল নূতনলব্ধ শিক্ষাকে অস্বাভাবিক আড়ম্বরের সঙ্গেই ব্যবহার করতেন।

কথায় বার্তায় পত্রব্যবহারে সাহিত্যরচনায় ইংরেজিভাষার বাইরে পা বাড়ানো তখনকার শিক্ষিতদের পক্ষে ছিল অকৌলীন্যের লক্ষণ। বাংলাভাষা তখন সংস্কৃত-পণ্ডিত ও বাংলা-পণ্ডিত দুই দলের কাছেই ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। এ ভাষার দারিদ্র্যে তাঁরা লজ্জাবোধ করতেন। এই ভাষাকে তাঁরা এমন একটি অগভীর শীর্ণ নদীর মতো মনে করতেন যার হাঁটুজলে পাড়াগেঁয়ে মানুষের প্রতিদিনের সামান্য ঘোরো কাজ চলে মাত্র, কিন্তু দেশবিদেশের পণ্যবাহী জাহাজ চলতে পারে না।

তবু এ কথা মানতে হবে, এই অহংকারের মূলে ছিল পশ্চিম-মহাদেশ হতে আহরিত নূতন-সাহিত্যরস-সম্ভোগের সহজ শক্তি। সেটা বিস্ময়ের বিষয়, কেননা, তাঁদের পূর্বতন সংস্কারের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ছিল। অনেককাল মনের জমি ঠিকমত চাষের অভাবে ভরা ছিল আগাছায়, কিন্তু তার অন্তরে অন্তরে সফলতার শক্তি ছিল প্রচ্ছন্ন ; তাই কৃষির সূচনা হবামাত্রই সাড়া দিতে সে দেরি করলে না। পূর্বকালের থেকে তার বর্তমান অবস্থার যে-প্রভেদ দেখা গেল তা দ্রুত এবং বৃহৎ। তার একটা বিস্ময়কর প্রমাণ দেখি রামমোহন রায়ের মধ্যে। সেদিন তিনি যে বাংলাভাষায় ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হলেন সে-ভাষার পূর্ব-পরিচয় এমন কিছুই ছিল না যাতে করে তার উপরে এত বড়ো দুরূহ ভার অর্পণ সহজে সম্ভবপর মনে হতে পারত। বাংলাভাষায় তখন সাহিত্যিক গদ্য সবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে নদীর তটে সদ্যশায়িত পলিমাটির স্তরের মতো। এই অপরিণত গদ্যেই দুর্বোধ তত্ত্বালোচনার ভারবহ ভিত্তি সংঘটন করতে রামমোহন কুণ্ঠিত হলেন না।

এই যেমন গদ্যে, পদ্যে তেমনি অসম সাহস প্রকাশ করলেন মধুসূদন। পাশ্চাত্য হোমর-মিল্‌টন-রচিত মহাকাব্যসঞ্চারী মন ছিল তাঁর। তার রসে তিনি একান্তভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই তার ভোগমাত্রেই স্তব্ধ থাকতে পারেন নি। আষাঢ়ের আকাশে সজলনীল মেঘপুঞ্জ থেকে গর্জন নামল, গিরিগুহা থেকে তার অনুকরণে প্রতিধ্বনি উঠল মাত্র, কিন্তু আনন্দচঞ্চল ময়ূর আকাশে মাথা

তুলে সাড়া দিলে আপন কেকাধ্বনিতেই। মধুসূদন সংগীতের দুর্নিবার উৎসাহ ঘোষণা করবার জন্যে আপন ভাষাকেই বক্ষে টেনে নিলেন। যে-যন্ত্র ছিল ক্ষীণধ্বনি একতারা তাকে অবজ্ঞা করে ত্যাগ করলেন না, তাতেই তিনি গম্ভীর সুরের নানা তার চড়িয়ে তাকে রুদ্রবীণা করে তুললেন। এ যন্ত্র একেবারে নতুন, একমাত্র তাঁরই আপন-গড়া। কিন্তু, তাঁর এই সাহস তো ব্যর্থ হল না। অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনঘর্ঘরমন্দ্রিত রথে চড়ে বাংলাসাহিত্যে সেই প্রথম আবির্ভূত হল আধুনিক কাব্য 'রাজবদুন্নতধ্বনি'— কিন্তু, তাকে সমাদরে আহ্বান করে নিতে বাংলাদেশে অধিক সময় তো লাগে নি। অথচ এর অনতিপূর্বকালবর্তী সাহিত্যের যে-নমুনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে এর কি সুদূর তুলনাও চলে।

আমি জানি, এখনো আমাদের দেশে এমন মানুষ পাওয়া যায় যারা সেই পুরাতনকালের অনুপ্রাসকণ্টকিত শিথিল ভাষার পৌরাণিক পাঁচালি প্রভৃতি গানকেই বিশুদ্ধ ন্যাশনাল সাহিত্য আখ্যা দিয়ে আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রতিকূল কটাক্ষপাত করে থাকেন। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ স্থলেই সেটা একটা ভান মাত্র। তাঁরা যে স্বয়ং যথার্থত সেই সাহিত্যেরই রসসম্ভোগে একান্ত নিবিষ্ট থাকেন, রচনায় বা আলোচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভূনির্মাণের কোনো এক আদিপর্বে হিমালয়পর্বতশ্রেণী স্থিতিলাভ করেছিল, আজ পর্যন্ত সে আর বিচলিত হয় নি; পর্বতের পক্ষেই এটা সম্ভবপর। মানুষের চিত্ত তো স্থাণু নয়; অন্তরে বাহিরে চার দিক থেকেই নানা প্রভাব তার উপর নিয়ত কাজ করছে, তার অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে নিরন্তর; সে যদি জড়বৎ অসাড় না হয় তা হলে তার আত্মপ্রকাশে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটবেই, ন্যাশনাল আদর্শ নাম দিয়ে কোনো-একটি সুদূর ভূতকালবর্তী আদর্শবন্ধনে নিজেকে নিশ্চল করে রাখা তার পক্ষে স্বাভাবিক হতেই পারে না, যেমন স্বাভাবিক নয় চীনে মেয়েদের পায়ের বন্ধন। সেই বন্ধনকে ন্যাশনাল নামের ছাপ দিয়ে গর্ব করা বিড়ম্বনা। সাহিত্যে বাঙালির মন অনেক কালের আচারসংকীর্ণতা থেকে অবিলম্বে মুক্তি যে পেয়েছিল, তাতে তার চিৎশক্তির অসামান্যতাই প্রমাণ করেছে।

নবযুগের প্রাণবান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নবপ্রভাতে উদ্‌বোধিত হল অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলাভাষার পায়ে-চলা পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা বলে মনে করলে না। আপন শক্তির 'পরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলাভাষার 'পরে কবি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন; বাংলাভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতায় দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্গবাণীকে গম্ভীর স্বরনির্ঘোষে মন্দ্রিত করে তোলবার জন্যে সংস্কৃতভাণ্ডার থেকে মধুসূদন নিঃসংকোচে যে-সব শব্দ আহরণ করতে লাগলেন সেও নূতন, বাংলা পয়ারের সনাতন সমদ্বিভক্ত আল ভেঙে দিয়ে তার উপর অমিত্রাক্ষরের যে-বন্যা বইয়ে দিলেন সেও নূতন, আর মহাকাব্য-খণ্ডকাব্য-রচনায় যে-রীতি অবলম্বন করলেন তাও বাংলাভাষায় নূতন। এটা ক্রমে ক্রমে, পাঠকের মনকে সইয়ে সইয়ে, সাবধানে ঘটল না; শাস্ত্রিক প্রথায় মঙ্গলাচরণের অপেক্ষা না রেখে কবিতাকে বহন করে নিয়ে এলেন এক মুহূর্তে ঝড়ের পিঠে— প্রাচীন সিংহদ্বারের আগল গেল ভেঙে।

মাইকেল সাহিত্যে যে-যুগান্তর আনলেন তার অনতিকাল পরেই আমার জন্ম। আমার যখন বয়স অল্প তখন দেখেছি, কত যুবক ইংরেজিসাহিত্যের সৌন্দর্যে ভাববিহ্বল। শেক্‌স্‌পীয়র, মিল্‌টন, বায়রন, মেকলে, বার্ক তাঁরা প্রবল উত্তেজনায় আবৃত্তি করে যেতেন পাতার পর পাতা। অথচ তাঁদের সমকালেই বাংলাসাহিত্যে যে নূতন প্রাণের উদ্যম সদ্য জেগে উঠেছে, সে তাঁরা লক্ষ্যই করেন নি। সেটা যে অবধানের যোগ্য তাও তাঁরা মনে করতেন না। সাহিত্যে তখন যেন ভোরের বেলা— কারও ঘুম ভেঙেছে, অনেকেরই ঘুম ভাঙে নি। আকাশে অরুণালোকের স্বাক্ষরে তখনো ঘোষিত হয় নি প্রভাতের জ্যোতির্ময়ী প্রত্যাশা।

বঙ্কিমের লেখনী তার কিছু পূর্বেই সাহিত্যের অভিযানে যাত্রা আরম্ভ করেছে। তখন অন্তঃপুরে বটতলার ফাঁকে ফাঁকে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা সঞ্চরণ করছে দেখতে পাই। যাঁরা তার

রস পেয়েছেন তাঁরা তখনকার কালের নবীনা হলেও প্রাচীনকালীন সংস্কারের বাহিরে তাঁদের গতি ছিল অনভ্যস্ত। আর কিছু না হোক, ইংরেজি তাঁরা পড়েন নি। এ কথা মানতেই হবে, বঙ্কিম তাঁর নভেলে আধুনিক রীতিরই রূপ ও রস এনেছিলেন। তাঁর ভাষা পূর্ববর্তী প্রাকৃত বাংলা ও সংস্কৃত বাংলা থেকে অনেক ভিন্ন। তাঁর রচনার আদর্শ কি বিষয়ে কি ভাবে কি ভঙ্গিতে পাশ্চাত্যের আদর্শের অনুগত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেকালে ইংরেজিভাষায় বিদ্বান বলে যাঁদের অভিমান তাঁরা তখনো তাঁর লেখার যথেষ্ট সমাদর করেন নি; অথচ সে-লেখা ইংরেজি শিক্ষাহীন তরুণীদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে বাধা পায় নি, এ আমরা দেখেছি। তাই সাহিত্যে আধুনিকতার আবির্ভাবকে আর তো ঠেকানো গেল না। এই নব্য রচনানীতির ভিতর দিয়ে সেদিনকার বাঙালি-মন মানসিক চিরাভ্যাসের অপ্রশস্ত বেষ্টনকে অতিক্রম করতে পারলে— যেন অসূর্যম্পশ্যারূপা অন্তঃপুরচারিণী আপন প্রাচীর-ঘেরা প্রাঙ্গণের বাইরে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল। এই মুক্তি সনাতন রীতির অনুকূল না হতে পারে কিন্তু সে যে চিরন্তন মানবপ্রকৃতির অনুকূল, দেখতে দেখতে তার প্রমাণ পড়ল ছড়িয়ে।

এমন সময়ে বঙ্গদর্শন মাসিক পত্র দেখা দিল। তখন থেকে বাঙালির চিত্তে নব্য বাংলাসাহিত্যের অধিকার দেখতে দেখতে অবারিত হল সর্বত্র। ইংরেজি-ভাষায় যাঁরা প্রবীণ তাঁরাও একে সবিস্ময়ে স্বীকার করে নিলেন। নব্যসাহিত্যের হাওয়ায় তখনকার তরুণী পাঠিকাদের মনঃপ্রকৃতির যে পরিবর্তন হতে আরম্ভ হয়েছিল, সে কথা নিঃসন্দেহ। তরুণীরা সবাই রোমান্টিক হয়ে উঠছে, এইটেই তখনকার দিনের ব্যঙ্গরসিকদের প্রহসনের বিষয় হয়ে উঠল। কথাটা সত্য। ক্লাসিকের অর্থাৎ চিরাগত রীতির বাইরেই রোমান্টিকের লীলা। রোমান্টিকে মুক্ত ক্ষেত্রে হৃদয়ের বিহার। সেখানে অনভ্যস্ত পথে ভাবাবেগের আতিশয্য ঘটতে পারে। তাতে করে পূর্ববর্তী বাঁধা নিয়মানুবর্তনের তুলনায় বিপজ্জনক, এমন-কি, হাস্যজনক হয়ে উঠবার আশঙ্কা থাকে। দাঁড় থেকে ছাড়া পাওয়া কল্পনার পায়ে শিকল বাঁধা না থাকাতে ক্ষণে ক্ষণে হয়তো সে ঝাঁপিয়ে পড়ে অশোভনতায়। কিন্তু, বড়ো পরিপ্রেক্ষণিকায় ছড়িয়ে দেখলে দেখা যায়, অভিজ্ঞতার বিচিত্র শিক্ষার মুক্তি মোটের উপরে সকলপ্রকার স্খলনকে অতিকৃতিকে সংশোধন করে চলে।

যাই হোক, আধুনিক বাংলাসাহিত্যের গতিবেগ বাংলার ছেলেমেয়েকে কোন্ পথে নিয়ে চলেছে, এ সভায় তার আলোচনার উপলক্ষ নেই। এই সভাতেই বাংলাসাহিত্যের বিশেষ সফলতার যে প্রমাণ স্পষ্ট হয়েছে, সভার কার্যারম্ভের পূর্বে সূত্রধাররূপে আর তারই কথা জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

এমন একদিন ছিল যখন বাংলাপ্রদেশের বাইরে বাঙালি-পরিবার দুই-এক পুরুষ যাপন করতে করতেই বাংলাভাষা ভুলে যেত। ভাষার যোগই অন্তরের নাড়ীর যোগ— সেই যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হলেই মানুষের পরম্পরাগত বুদ্ধিশক্তি ও হৃদয়বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। বাঙালিচিত্তের যে-বিশেষত্ব মানবসংসারে নিঃসন্দেহ তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেখানেই তাকে হারাই সেখানেই সমস্ত বাঙালিজাতির পক্ষে বড়ো ক্ষতির কারণ ঘটা সম্ভব। নদীর ধারে যে-জমি আছে তার মাটিতে যদি বাঁধন না থাকে তবে তট কিছু কিছু করে ধ্বসে পড়ে। ফসলের আশা হারাতে থাকে। যদি কোনো মহাবৃক্ষ সেই মাটির গভীর অন্তরে দূরব্যাপী শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে তাকে এঁটে ধরে তা হলে স্রোতের আঘাত থেকে সে ক্ষেত্র রক্ষা পায়। বাংলাদেশের চিত্তক্ষেত্রকে তেমনি করেই ছায়া দিয়েছে, ফল দিয়েছে, নিবিড় ঐক্য ও স্থায়িত্ব দিয়েছে বাংলাসাহিত্য। অল্প আঘাতেই সে খণ্ডিত হয় না। একদা আমাদের রাষ্ট্রপতিরা বাংলাদেশের মাঝখানে বেড়া তুলে দেবার যে-প্রস্তাব করেছিলেন সেটা যদি আরো পঞ্চাশ বছর পূর্বে ঘটত, তবে তার আশঙ্কা আমাদের এক তীব্র আঘাতে বিচলিত করতে পারত না। ইতিমধ্যে বাংলার মর্মস্থলে যে অখণ্ড আত্মবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার প্রধানতম কারণ বাংলাসাহিত্যে। বাংলাদেশকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় খণ্ডিত করার ফলে তার ভাষা তার সংস্কৃতি খণ্ডিত হবে, এই বিপদের সম্ভাবনায় বাঙালি উদাসীন থাকতে পারে নি। বাঙালিচিত্তের এই ঐক্যবোধ সাহিত্যের যোগে বাঙালির চৈতন্যকে ব্যাপকভাবে গভীরভাবে অধিকার করেছে। সেই কারণেই আজ বাঙালি

যত দূরে যেখানেই যাক বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিছুকাল পূর্বে বাঙালির ছেলে বিলাতে গেলে ভাষায় ভাবে ও ব্যবহারে যেমন স্পর্ধাপূর্বক অবাঙালিত্বের আড়ম্বর করত, এখন তা নেই বললেই চলে— কেননা বাংলাভাষার যে-সংস্কৃতি আজ উজ্জ্বল তার প্রতি শ্রদ্ধা না প্রকাশ করা এবং তার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই আজ লজ্জার বিষয় হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার তরফ থেকে ভারতবর্ষে বঙ্গেতর প্রদেশের প্রতি প্রবাস শব্দ প্রয়োগ করায় আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু, মুখের কথা বাদ দিয়ে বাস্তবিকতার যুক্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অকৃত্রিম আত্মীয়তার সাধারণ ভূমিকা পাওয়া যায় কি না, সে তর্ক ছেড়ে দিয়েও সাহিত্যের দিক থেকে ভারতের অন্য প্রদেশ বাঙালির পক্ষে প্রবাস সে কথা মানতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের পার্থক্য এত বেশি যে, অন্য প্রদেশের বর্তমান সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাসংস্কৃতির সামঞ্জস্যসাধন অসম্ভব। এ ছাড়া সংস্কৃতির প্রধান যে বাহন ভাষা সে সম্বন্ধে বাংলার সঙ্গে অন্যপ্রদেশীয় ভাষার কেবল ব্যাকরণের প্রভেদ নয় অভিব্যক্তির প্রভেদ। অর্থাৎ, ভাবের ও সত্যের প্রকাশকল্পে বাংলাভাষা নানা প্রতিভাশালীর সাহায্যে যে রূপ এবং শক্তি উদ্ভাবন করেছে, অন্য প্রদেশের ভাষায় তা পাওয়া যায় না, অথবা তার অভিমুখিতা অন্য দিকে। অথচ সে-সকল ভাষার মধ্যে হয়তো নানা বিষয়ে বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে। অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বাঙালি-হৃদয়ের মিলন অসম্ভব নয় আমরা তার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখেছি, যেমন পরলোকগত অতুলপ্রসাদ সেন। উত্তরপশ্চিমে যেখানে তিনি ছিলেন, মানুষ হিসাবে সেখানকার লোকের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে হৃদয়ে মিল ছিল, কিন্তু সাহিত্যরচয়িতা বা সাহিত্যরসিক হিসাবে সেখানে তিনি প্রবাসীই ছিলেন এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

তাই বলছি, আজ প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন বাঙালির অন্তরতম ঐক্যচেতনাকে সপ্রমাণ করছে। নদী যেমন স্রোতের পথে নানা বাঁকে বাঁকে আপন নানাদিক্‌গামী তটকে এক করে নেয়, আধুনিক বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য তেমনি করেই নানা দেশ-প্রদেশের বাঙালির হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাকে এক প্রাণধারায় মিলিয়েছে। সাহিত্যে বাঙালি আপনাকে প্রকাশ করেছে ব'লেই, আপনার কাছে আপনি সে আর অগোচর নেই ব'লেই, যেখানে যাক আপনাকে আর সে ভুলতে পারে না। এই আত্মানুভূতিতে তার গভীর আনন্দ বৎসরে বৎসরে নানা স্থানে নানা সম্মিলনীতে বারংবার উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।

অথচ সাহিত্য ব্যাপারে সম্মিলনীর কোনো প্রকৃত অর্থ নেই। পৃথিবীতে দশে মিলে অনেক কাজ হয়ে থাকে, কিন্তু সাহিত্য তার অন্তর্গত নয়। সাহিত্য একান্তই একলা মানুষের সৃষ্টি। রাষ্ট্রিক বাণিজ্যিক সামাজিক বা ধর্ম-সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে দল বাঁধা আবশ্যক হয়। কিন্তু, সাহিত্যসাধনা যার, যোগীর মতো তপস্বীর মতো সে একা। অনেক সময়ে তার কাজ দশের মতের বিরুদ্ধে। মধুসূদন বলেছিলেন 'বিরচিব মধুচক্র'। সেই কবির মধুচক্র একলা মধুকরের। মধুসূদন যেদিন মৌচাক মধুতে ভরছিলেন, সেদিন বাংলায় সাহিত্যের কুঞ্জবনে মৌমাছি ছিলই বা কয়টি। তখন থেকে নানা খেয়ালের বশবর্তী একলা মানুষে মিলে বাংলাসাহিত্যকে বিচিত্র করে গড়ে তুলল। এই বহু স্রষ্টার নিভৃত-তপো-জাত সাহিত্যলোকে বাংলার চিত্ত আপন অন্তরতম আনন্দভবন পেয়েছে, সম্মিলনীগুলি তারই উৎসব। বাংলা-সাহিত্য যদি দল-বাঁধা মানুষের সৃষ্টি হত তা হলে আজ তার কী দুর্গতিই ঘটত তা মনে করলেও বুক কেঁপে ওঠে। বাঙালি চিরদিন দলাদলি করতেই পারে; কিন্তু দল গড়ে তুলতে পারে না। পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘোঁট করতে, চক্রান্ত করতে, জাত মারতে তার স্বাভাবিক আনন্দ— আমাদের সনাতন চণ্ডীমণ্ডপের উৎপত্তি সেই 'আনন্দাদ্ধ্যেব'। মানুষের সব চেয়ে নিকটতম যে-সম্বন্ধবন্ধন বিবাহব্যাপারে, গোড়াতেই সেই বন্ধনকে অহৈতুক অপমানে জর্জরিত করবার বরযাত্রিক মনোবৃত্তিই তো বাংলাদেশের সনাতন বিশেষত্ব। তার পরে কবির লড়াইয়ের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত অশ্রাব্য গালিবর্ষণকে যারা উপভোগ করবার জন্যে একদা ভিড় করে সমবেত হত, কোনো পক্ষের প্রতি বিশেষ শত্রুতাবশতই যে তাদের সেই দুয়ো দেবার উচ্ছ্বসিত উল্লাস তা তো নয়, নিন্দার

মাদক রসভোগের নৈর্ব্যক্তিক প্রবৃত্তিই এর মূলে। আজ বর্তমান সাহিত্যেও বাঙালির ভাঙন-ধরানো মনের কুৎসামুখরিত নিষ্ঠুর পীড়ননৈপুণ্য সর্বদাই উদ্যত। সেটা আমাদের ক্রূর অট্টহাস্যোদ্‌বেল গ্রাম্য অসৌজন্যসম্ভোগের সামগ্রী। আজ তা দেখতে পাই বাংলাদেশের ছোটো বড়ো খ্যাত অখ্যাত গুপ্ত প্রকাশ্য নানা কণ্ঠের তূণ থেকে শব্দভেদী রক্তপিপাসু বাণে আকাশ ছেয়ে ফেলল। এই অদ্ভুত আত্মলাঘবকারী মহোৎসাহে বাঙালি আপন সাহিত্যকে খান খান করে ফেলতে পারত, পরস্পরকে তারস্বরে দুয়ো দিতে দিতে সাহিত্যের মহাশ্মশানে ভূতের কীর্তন করতে তার দেরি লাগত না— কিন্তু সাহিত্য যেহেতু কো-অপারেটিভ বাণিজ্য নয়, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি নয়, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নয়, যেহেতু সে নির্জনচর একলা মানুষের, সেইজন্যে সকলপ্রকার আঘাত এড়িয়ে ও বেঁচে গেছে। এই একটা জিনিস ঈর্ষাপরায়ণ বাঙালি সৃষ্টি করতে পেরেছে, কারণ সেটা বহুজনে মিলে করতে হয় নি। এই সাহিত্যরচনায় বাঙালি নিজের একমাত্র কীর্তিকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে ব'লেই এই নিয়ে তার এত আনন্দ। আপন সৃষ্টির মধ্যে বৃহৎ ঐক্যক্ষেত্রে বাঙালি আজ এসেছে গৌরব করবার জন্যে। বিচ্ছিন্ন যারা তারা মিলিত হয়েছে, দূর যারা তারা পরস্পরের নৈকট্যে স্বদেশের নৈকট্য অনুভব করছে। মহৎসাহিত্যপ্রবাহিণীতে বাঙালিচিত্তের পঙ্কিলতাও মিশ্রিত হচ্ছে ব'লে দুঃখ ও লজ্জার কারণ সত্ত্বেও ভাবনার কারণ অধিক নই। কারণ, সর্বত্রই ভদ্রসাহিত্য স্বভাবতই সকল দেশের সকল কালের, যা-কিছু স্থায়িত্বধর্মী তাই আপনিই বাছাই হয়ে তার মধ্যে থেকে যায়; আর-সমস্তই ক্ষণজীবী, তারা গ্লানিজনক উৎপাত করতে পারে কিন্তু নিত্যকালের বাসা বাঁধবার অধিকার তাদের নেই। গঙ্গার পুণ্যধারায় রোগের বীজও ভেসে আসে বিস্তর; কিন্তু স্রোতের মধ্যে তার প্রাধান্য দেখতে পাই নে, আপনি তার শোধন এবং বিলোপ হতে থাকে। কারণ, মহানদী তো মহানর্দমা নয়। বাঙালির যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, শাশ্বত, যা সর্বমানবের বেদীমূলে উৎসর্গ করবার উপযুক্ত, তাই আমাদের বর্তমানকাল রেখে দিয়ে যাবে ভাবীকালের উত্তরাধিকার রূপে। সাহিত্যের মধ্যে বাঙালির যে-পরিচয় সৃষ্ট হচ্ছে বিশ্বসভায় আপন আত্মসম্মান সে রাখবে, কলুষের আবর্জনা সে বর্জন করবে, বিশ্বদেবতার কাছে বাংলাদেশের অর্ঘ্যরূপেই সে আপন সমাদর লাভ করবে। বাঙালি সেই মহৎ প্রত্যাশাকে আজ আপন নাড়ীর মধ্যে অনুভব করছে বলেই বৎসরে বৎসরে নানা স্থানে সম্মিলনী-আকারে পুনঃ পুনঃ বঙ্গভারতীর জয়ধ্বনি ঘোষণা করতে সে প্রবৃত্ত। তার আশা সার্থক হোক, কালে কালে আসুক বাণীতীর্থপথযাত্রীরা, বাংলাদেশের হৃদয়ে বহন করে আনুক উদারতর মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা, অন্তরে বাহিরে সকলপ্রকার বন্ধনমোচনের সাধনমন্ত্র।

মাঘ ১৩৪১

কালান্তর

কালান্তর

কালান্তর

একদিন চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের আখড়া বসত, আলাপ জমত পাড়াপড়শিদের জুটিয়ে, আলোচনার বিষয় ছিল গ্রামের সীমার মধ্যেই বদ্ধ। পরস্পরকে নিয়ে রাগদ্বেষে গল্পে-গুজবে তাসে-পাশায় এবং তার সঙ্গে ঘণ্টা-তিনচার পরিমাণে দিবানিদ্রা মিশিয়ে দিনটা যেত কেটে। তার বাইরে মাঝে মাঝে চিত্তানুশীলনার যে-আয়োজন হত সে ছিল যাত্রা সংকীর্তন কথকতা রামায়ণপাঠ পাঁচালি কবিগান নিয়ে। তার বিষয়বস্তু ছিল পুরাকাহিনীভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত। যে-জগতের মধ্যে বাস সেটা সংকীর্ণ এবং অতি-পরিচিত। তার সমস্ত তথ্য এবং রসধারা বংশানুক্রমে বৎসরে বৎসের বার বার হয়েছে আবর্তিত অপরিবর্তিত চক্রপথে, সেইগুলিকে অবলম্বন করে আমাদের জীবন-যাত্রার সংস্কার নিবিড় হয়ে জমে উঠেছে, সেই-সকল কঠিন সংস্কারের ইঁটপাথর দিয়ে আমাদের বিশেষ সংসারের নির্মাণকার্য সমাধা হয়ে গিয়েছিল। এই সংসারের বাইরে মানব-ব্রহ্মাণ্ডের দিক্‌দিগন্তে বিরাট ইতিহাসের অভিব্যক্তি নিরন্তর চলেছে, তার ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা আদ্যোপান্ত সনাতনপ্রথায় ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর হয়ে ওঠে নি, তার মধ্যে এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের ঘাতসংঘাতে নব নব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, ক্রমাগতই তাদের পরস্পরের সীমানার সংকোচন-প্রসারণে পরিবর্তিত হচ্ছে ইতিহাসের রূপ, এ আমাদের গোচর ছিল না।

বাইরে থেকে প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত লাগল মুসলমানের। কিন্তু সে-মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে সে রাজ্যসংঘটন করেছে কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না। এইজন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল— কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাঁধা মতের। রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে, চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্বতোভাবে প্রবল হয় নি, তারই প্রমাণ দেখি সাহিত্যে। তখনকার ভদ্রসমাজে সর্বত্রই প্রচলিত ছিল পার্সি, তবু বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে এই পার্সি বিদ্যার স্বাক্ষর পড়ে নি— একমাত্র ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে মার্জিত ভাষায় ও অস্খলিত ছন্দে যে নাগরিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে 'পার্সি-পড়া স্মিতপরিহাসপটু বৈদগ্ধ্যের আভাস পাওয়া যায়। তখনকার বাংলা সাহিত্যের প্রধানত দুই ভাগ ছিল, এক মঙ্গলকাব্য আর-এক বৈষ্ণবপদাবলী। মঙ্গলকাব্যে মাঝে মাঝে মুসলমান রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে কিন্তু তার বিষয়বস্তু কিংবা মনস্তত্ত্বে মুসলমান সাহিত্যের কোনো ছাপ দেখি নে, বৈষ্ণবগীতিকাব্যে তো কথাই নেই। অথচ বাংলা ভাষায় পার্সি শব্দ জমেছে বিস্তর, তা ছাড়া সেদিন অন্তত শহরে রাজধানীতে পারসিক আদবকায়দার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। তখনকার কালে দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে কিছুই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় নি তা নয় কিন্তু তা সামান্য। বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোরে লেগেছে, কিন্তু কোনো নতুন চিন্তারাজ্যে কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্যমে তার মনকে চেতিয়ে তোলে নি। তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে। বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করে নি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল, বন্ধ করে দিলে বাহিরের দিকে দরজা। মাঝে মাঝে সেই দরজা-ভাঙাভাঙি চলেছিল

কিন্তু এমন কিছু ঘটে নি যাতে বাহিরের বিশ্বে আমাদের পরিচয় বিস্তারিত হতে পারে। সেইজন্য পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আসর।

তার পরে এল ইংরেজ কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য য়ুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে। মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে। আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে— তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ঘটিয়েছে যোগ-বিয়োগের সমস্যা। অর্থাৎ এই সংখ্যা আমাদের পক্ষে গুণের অঙ্কফল না কষে ভাগেরই অঙ্কফল কষছে। দেশে এরা আছে অথচ রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসাবে এরা না থাকার চেয়েও দারুণতর, তাই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যাতালিকাই তার অতিবহুলত্ব নিয়ে সব চেয়ে শোকাবহ হয়ে উঠল।

ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে— কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর কোনো বিদেশী জাত কোনোদিন এমন করে আসতে পারে নি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে ; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে। এই চেষ্টা যে-ভূখণ্ডে একেবারে না ঘটে সেটা মরুভূমি, তার যে একান্ত অনন্যযোগিতা সে তো মৃত্যুর ধর্ম। আমরা য়ুরোপের কার কাছ থেকে কী কতটুকু পেয়েছি তাই অতি সূক্ষ্ম বিচারে চুনে চুনে অনেক পরিমাণে কল্পনা ও কিছু পরিমাণে গবেষণা বিস্তার করে আজকাল কোনো কোনো সমালোচক আধুনিক লেখকের প্রতি কলম উদ্যত করে নিপুণ ভঙ্গিতে খোঁটা দিয়ে থাকেন। একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্‌বেল হয়ে সমস্ত য়ুরোপের মনে যখন প্রতিহত হয়েছিল তখন ইংলণ্ডের সাহিত্যস্রষ্টাদের মনে তার প্রভাব যে নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিছুই আশ্চর্যের কথা নয়, না হলেই সেই দৈন্যকে বর্বরতা বলা যেত। সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারে না— এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহ সেইখানেই নিয়ত চলেছে যেখানে চিত্ত বেঁচে আছে, চিত্ত জেগে আছে।

বর্তমান যুগের চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে মানব-ইতিহাসের সমস্ত আকাশ জুড়ে উদ্‌ভাসিত, দেখা যাক তার স্বরূপটা কী। একটা প্রবল উদ্যমের বেগে য়ুরোপের মন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে, শুধু তাই নয় সমস্ত জগতে। যেখানেই সে পা বাড়িয়েছে সেইখানটাই সে অধিকার করেছে। কিসের জোরে। সত্যসন্ধানের সততায়। বুদ্ধির আলস্যে, কল্পনার কুহকে, আপাতপ্রতীয়মান সাদৃশ্যে, প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায় নি, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যা বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত থাকতে চায় তার প্রলোভনকেও সে নির্মমভাবে দমন করেছে। নিজের সহজ ইচ্ছার সঙ্গে সংগত করে সত্যকে সে যাচাই করে নি। প্রতিদিন জয় করেছে সে জ্ঞানের জগৎকে, কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্মুক্ত।

যদিও আমাদের চার দিকে আজও পঞ্জিকার প্রাচীর খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্যত করে আছে, তবু তার মধ্যে ফাঁক করে য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে, আমাদের সামনে এনেছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ, মানুষের বুদ্ধির এমন একটা সর্বব্যাপী ঔৎসুক্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে, যা অহৈতুক আগ্রহে নিকটতম দূরতম অণুতম বৃহত্তম প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সমস্তকেই সন্ধান সমস্তকেই অধিকার করতে চায় ; এইটে দেখিয়েছে যে, জ্ঞানের রাজ্যে কোথাও ফাঁক নেই, সকল তথ্যই পরস্পর অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত, চতুরানন বা পঞ্চাননের কোনো বিশেষ বাক্য বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপন অপ্রাকৃত প্রামাণিকতা দাবি করতে পারে না।

বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন, তেমনি চরিত্রনীতি সম্বন্ধেও। নতুন শাসনে যে-আইন এল তাঁর মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না। ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ করুক বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক, হত্যা অপরাধের পঙ্‌ক্তি একই, তার শাসনও সমান— কোনো মুনি ঋষির অনুশাসন ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বিশেষ দৃষ্টি প্রবর্তন করতে পারে না।

সমাজে উচিত-অনুচিতের ওজন, শ্রেণীগত অধিকারের বাটখারাযোগে আপন নিত্য আদর্শের তারতম্য ঘটাতে পারবে না, এ কথাটা এখনো আমরা সর্বত্র অন্তরে অন্তরে মেনে নিতে পেরেছি তা নয়, তবু আমাদের চিন্তায় ও ব্যবহারে অনেকখানি বিপ্লব এনেছে সন্দেহ নেই। সমাজ যাদের অস্পৃশ্যশ্রেণীতে গণ্য করেছে তাদেরও আজ দেবালয়প্রবেশে বাধা দেওয়া উচিত নয়, এই আলোচনাটা তার প্রমাণ। যদিও একদল লোক নিত্যধর্মনীতির উপর ভর না দিয়ে এর অনুকূলে শাস্ত্রের সমর্থন আওড়াচ্ছেন, তবু সেই আপ্তবাক্যের ওকালতিটাই সম্পূর্ণ জোর পাচ্ছে না। আসল এই কথাটাই দেশের সাধারণের মনে বাজছে যে, যেটা অন্যায় সেটা প্রথাগত, শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়ের জোরে শ্রেয় হতে পারে না, শংকরাচার্য-উপাধিধারীর স্বরচিত মার্কা সত্ত্বেও সে শ্রদ্ধেয় নয়।

মুসলমান-আমলের 'বাংলাসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করলে দেখা যায় যে অবাধে অন্যায় করবার অধিকারই যে ঐশ্বর্যের লক্ষণ এই বিশ্বাসটা কলুষিত করেছে তখনকার দেবচরিত্র-কল্পনাকে। তখনকার দিনে যেমন অত্যাচারের দ্বারা প্রবল ব্যক্তি আপন-শাসন পাকা করে তুলত, তেমনি করে অন্যায়ের বিভীষিকায় দেবদেবীর প্রতিপত্তি আমরা কল্পনা করেছি। সেই নিষ্ঠুর বলের হার-জিতেই তাঁদের শ্রেষ্ঠতা-অশ্রেষ্ঠতার প্রমাণ হত। ধর্মের নিয়ম মেনে চলবে সাধারণ মানুষ, সেই নিয়মকে লঙ্ঘন করবার দুর্দাম অধিকার অসাধারণের। সন্ধিপত্রের শর্ত অনুসারে আপনাকে সংযত করা আবশ্যক সত্যরক্ষা ও লোকস্থিতির খাতিরে, কিন্তু প্রতাপের অভিমান তাকে স্ক্র্যাপ্ অফ্ পেপারের মতো ছিন্ন করবার স্পর্ধা রাখে। নীতিবন্ধন-অসহিষ্ণু অধর্ম-সাহসিকতার ঔদ্ধত্যকে একদিন ঈশ্বরত্বের লক্ষণ বলে মানুষ স্বীকার করেছে। তখনকার দিনে প্রচলিত 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা', এই কথাটার অর্থ এই যে, জগদীশ্বরের জগদীশ্বরতা তাঁর অপ্রতিহত শক্তির প্রমাণে, ন্যায়পরতার বিধানে নয়, সেই পন্থায় দিল্লীশ্বরও জগদীশ্বরের তুল্য খ্যাতির অধিকারী। তখন ব্রাহ্মণকে বলেছে ভূদেব, তার দেবত্বে মহত্ত্বের অপরিহার্য দায়িত্ব নেই, আছে অকারণ শ্রেষ্ঠতার নিরর্থক দাবি। এই অকারণ শ্রেষ্ঠতা ন্যায়-অন্যায়ের উপরে, তার প্রমাণ দেখি স্মৃতিশাস্ত্রে, শূদ্রের প্রতি অধর্মাচরণ করবার অব্যাহত অধিকারে। ইংরেজসাম্রাজ্য মোগলসাম্রাজ্যের চেয়েও প্রবল ও ব্যাপক সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন কথা কোনো মূঢ়ের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে না যে, উইলিঙডনো বা জগদীশ্বরো বা। তার কারণ আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে শত্রুপল্লী-বিধ্বংসনের নির্মম শক্তির দ্বারা ঈশ্বরত্বের আদর্শের তুল্যতা আজ কেউ পরিমাপ করে না। আজ আমরা মরতে মরতেও ইংরেজ-শাসনের বিচার করতে পারি ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শে, এ কথা মনে করি নে, কোনো দোহাই পেড়ে শক্তিমানকে অসংযত শক্তি সংহরণ করতে বলা অশক্তের পক্ষে স্পর্ধা। বস্তুত ন্যায়-আদর্শের সর্বভূমিনতা স্বীকার করে এক জায়গায় ইংরেজরাজের প্রভূত শক্তি আপনাকে অশক্তের সমানভূমিতেই দাঁড় করিয়েছে।

যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল-মোচনের ঘোষণা, দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন। তৎপূর্বে আমরা মেনে নিয়েছিলুম, যে জন্মগত নিত্যবিধানে বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে বিশেষ জাতের মানুষ আপন অধিকারের খর্বতা আপন অসম্মান শিরোধার্য করে নিতে বাধ্য, তার হীনতার লাঞ্ছনা কেবলমাত্র দৈবক্রমে ঘুচতে পারে জন্মপরিবর্তনে। আজও আমাদের দেশে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে বহু লোক রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে বলে ; এ কথা ভুলে যায় যে, ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে হাতে পায়ে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবলশক্তি। য়ুরোপের সংস্রব এক দিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা, আর-এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর

বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না। আজ আমরা সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা-পরিবর্তনের জন্যে যে-কোনো চেষ্টা করছি, সে এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে, এবং যে-সকল দাবি আমরা কোনোদিন মোগলসম্রাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারি নি, তাই নিয়ে প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে যে-তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে, "A man is a man for a' that।"

আজ আমার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। বর্তমান যুগে— অর্থাৎ যাকে য়ুরোপীয় যুগ বলতেই হবে, সেই যুগে যখন প্রথম প্রবেশ করলুম সময়টা তখন আঠারশো খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি। এইটিকে ভিক্টোরীয় যুগ নাম দিয়ে এখনকার যুবকেরা হাসাহাসি করে থাকে। য়ুরোপের যে-অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, সেই ইংলন্ড তখন ঐশ্বর্যের ও রাষ্ট্রীয় প্রতাপের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। অনন্তকালে কোনো ছিদ্র দিয়ে তার অন্নভাণ্ডারে যে অলক্ষ্মী প্রবেশ করতে পারে, এ কথা কেউ সেদিন মনেও করে নি। প্রাচীন ইতিহাসে যাই ঘটে থাকুক, আধুনিক ইতিহাসে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্ণধার তাদের সৌভাগ্য যে কোনোদিন পিছু হঠতে পারে, বাতাস বইতে পারে উলটো দিকে, তার কোনো আশঙ্কা ও লক্ষণ কোথাও ছিল না। রিফর্মেশন-যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন-যুগে য়ুরোপে যে-মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জন্যে লড়েছিল, সেদিন তার সেই আদর্শে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয় নি। সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধেছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। ম্যাট্‌সিনি-গারিবালডির বাণীতে কীর্তিতে সেই যুগ ছিল গৌরবান্বিত, সেদিন তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত করে মন্দ্রিত হয়েছিল গ্ল্যাডস্টোনের বজ্রস্বর। আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে এক দিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর-এক দিকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা। কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে ভারতের শাসন-কর্তৃত্বে ইংরেজের শরিক হতেও পারি এমন কথা মনে করা যে সম্ভব হয়েছিল, সেই জোর কোথা থেকে পেয়েছিলেম। কোন্ যুগ থেকে সহসা কোন্ যুগান্তরে এসেছি। মানুষের মূল্য, মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এত আশ্চর্য বড়ো হয়ে দেখা দিল কোন্ শিক্ষায়। অথচ আমাদের নিজের পরিবারে প্রতিবেশে, পাড়ায় সমাজে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা সম্মানের দাবি, শ্রেণীনির্বিচারে ন্যায়সংগত ব্যবহারের সমান অধিকারতত্ত্ব এখনো সম্পূর্ণরূপে আমাদের চরিত্রে প্রবেশ করতে পারে নি। তা হোক, আচরণে পদে পদে প্রতিবাদসত্ত্বেও য়ুরোপের প্রভাব অল্পে অল্পে আমাদের মনে কাজ করছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা। পাঠশালার পথ দিয়ে বিজ্ঞান এসেছে আমাদের দ্বারে, কিন্তু ঘরের মধ্যে পাঁজিপুঁথি এখনো তার সম্পূর্ণ দখল ছাড়ে নি। তবু য়ুরোপের বিদ্যা প্রতিবাদের মধ্য দিয়েও আমাদের মনের মধ্যে সম্মান পাচ্ছে।

তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, আমাদের শিক্ষার অসহযোগ, সেইখানেই আমাদের পরাভব। এই সহযোগ সহজ হয়, যদি আমাদের শ্রদ্ধায় আঘাত না লাগে। পূর্বেই বলেছি য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল, দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সংগত অধিকারকে। এতে করেই সকল প্রকার অভাবত্রুটিসত্ত্বেও আমাদের আত্মসম্মানের পথ খুলে গিয়েছে। এই আত্মসম্মানের গৌরববোধেই আজ পর্যন্ত আমরা স্বজাতি-সম্বন্ধে দুঃসাধ্যসাধনের আশা করছি, এবং প্রবল পক্ষকে বিচার করতে সাহস করছি সেই প্রবল পক্ষেরই বিচারের আদর্শ নিয়ে। বলতেই হবে এই চিত্তগত চরিত্রগত সহযোগ ছিল না আমাদের পূর্বতন রাজদরবারে। তখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের সেই মূলগত দূরত্ব ছিল যাতে করে আমরা আকস্মিক শুভাদৃষ্টক্রমে শক্তিশালীর কাছে কদাচিৎ অনুগ্রহ পেতেও পারতুম, কিন্তু সে তারই নিজ গুণে, বলতে পারতুম না যে, সর্বজনীন ন্যায়ধর্ম অনুসারেই, মানুষ বলেই মানুষের কাছে আনুকূল্যের দাবি আছে।

ইতিমধ্যে ইতিহাস এগিয়ে চলল। বহুকালের সুপ্ত এশিয়ায় দেখা দিল জাগরণে উদ্যম।

পাশ্চাত্যেরই সংঘাতে সংস্রবে জাপান অতি অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বজাতিসংঘের মধ্যে জয় করে নিলে সম্মানের অধিকার। অর্থাৎ জাপান বর্তমান কালের মধ্যেই বর্তমান, অতীতে ছায়াচ্ছন্ন নয়, সে তা সম্যকরূপে প্রমাণ করল। দেখতে পেলেম প্রাচ্য জাতিরা নবযুগের দিকে যাত্রা করেছে। অনেকদিন আশা করেছিলুম, বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্রজাতির রথ চলবে সামনের দিকে, এবং এও মনে ছিল যে, এই চলার পথে টান দেবে স্বয়ং ইংরেজও। অনেকদিন তাকিয়ে থেকে অবশেষে দেখলুম চাকা বন্ধ। আজ ইংরেজ-শাসনের প্রধান গর্ব 'ল' এবং 'অর্ডর', বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর, দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথে ধন-উৎপাদনের সুযোগ-সাধন কিছুই নেই। অদূর ভবিষ্যতে তার যে সম্ভাবনা আছে, তাও দেখতে পাই নে, কেননা দেশের সম্বল সমস্তই তলিয়ে গেল 'ল' এবং 'অর্ডরের' প্রকাণ্ড কবলের মধ্যে। য়ুরোপীয় নব-যুগের শ্রেষ্ঠদানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে য়ুরোপেরই সংস্রবে। নবযুগের সূর্য-মণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষ।

আজ ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্মানি আমেরিকার কাছে ঋণী। ঋণের অঙ্ক খুব মোটা। কিন্তু এর দ্বিগুণ মোটাও যদি হত, তবু সম্পূর্ণ শোধ করা অসাধ্য হত না, দেনদার দেশে যদি কেবলমাত্র 'ল' এবং 'অর্ডর' বজায় রেখে তাকে আর-সকল বিষয়ে বঞ্চিত রাখতে আপত্তি না থাকত। যদি তার অন্নসংস্থান রইত আধপেটা-পরিমাণ, তার পানযোগ্য জলের বরাদ্দ হত সমস্ত দেশের তৃষ্ণার চেয়ে বহুগুণ স্বল্পতর, যদি দেশে শতকরা পাঁচ-সাত জন মানুষের মতো শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও চলত, যদি চিরস্থায়ী রোগে প্রজনানুক্রমে দেশের হাড়ে হাড়ে দুর্বলতা নিহিত করে দেওয়া সত্ত্বেও নিশ্চেষ্টপ্রায় থাকত তার আরোগ্যবিধান। কিন্তু যেহেতু জীবনযাত্রার সভ্য আদর্শ বজায় রাখবার পক্ষে এ-সকল অভাব একেবারেই মারাত্মক, এইজন্যে পাওনাদারকে এমন কথা বলতে শুনলুম যে আমরা দেনাশোধ করব না। সভ্যতার দোহাই দিয়ে ভারতবর্ষ কি এমন কথা বলতে পারে না যে, এই প্রাণ-দেউলে-করা তোমাদের দুর্মূল্য শাসনতন্ত্রের এত অসহ্য দেনা আমরা বহন করতে পারব না যাতে বর্বরদশার জগদ্দল পাথর চিরদিনের মতো দেশের বুকের উপর চেপে থাকে। বর্তমান যুগে য়ুরোপ যে-সভ্যতার আদর্শকে উদ্‌ভাবিত করেছে য়ুরোপই কি স্বহস্তে তার দাবিকে ভূমণ্ডলের পশ্চিম সীমানাতেই আবদ্ধ করে রাখবে। সর্বজনের সর্বকালের কাছে সেই সভ্যতার মহৎ দায়িত্ব কি য়ুরোপের নেই।

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনোদিন কোথাও হয় নি— এক হয়েছিল য়ুরোপীয় সভ্যজাতি যখন নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়া' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে। মধ্যযুগে অসভ্য তাতার বিজিত দেশে নরমুণ্ডের স্তূপ উঁচু করে তুলেছিল ; তার বেদনা অনতিকাল পরে লুপ্ত হয়েছে। সভ্য য়ুরোপ চীনের মতো এত বড়ো দেশকে জোর করে যে বিষ গিলিয়েছে, তাতে চিরকালের মতো তার মজ্জা জর্জরিত হয়ে গেল। একদিন তরুণ পারসিকের দল দীর্ঘকালের অসাড়তার জাল থেকে পারস্যকে উদ্ধার করবার জন্যে যখন প্রাণপণ করে দাঁড়িয়েছিল, তখন সভ্য য়ুরোপ কী রকম করে দুই হাতে তার টুঁটি চেপে ধরেছিল, সেই অমার্জনীয় শোকাবহ ব্যাপার জানা যায় পারস্যের তদানীন্তন পরাহত আমেরিকান রাজস্বসচিব শুস্টারের Strangling of Persia বইখানা পড়লে। ও দিকে আফ্রিকার কন্‌গো প্রদেশে য়ুরোপীয় শাসন যে কী রকম অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল সে সকলেরই জানা। আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সমাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত, এবং সেই-জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতচর্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে ভিড় করে আসে।

তার পরে মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটা পর্দা তুলে দিলে। যেন. কোন্ মাতালের আব্রু গেল ঘুচে। এত মিথ্যা বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহু পূর্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের

জন্যে হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করে নি। তারা আসত কালো আঁধির মতো ধুলায় আপনাকে আবৃত করে, কিন্তু এ এসেছে যেন অগ্নিগিরির আগ্নেয়স্রাব, অবরুদ্ধ পাপের বাধামুক্ত উৎস-উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্তকে রাঙিয়ে তুলে, দগ্ধ করে দিয়ে দূরদূরান্তের পৃথিবীর শ্যামলতাকে। তার পর থেকে দেখছি য়ুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার 'পরে বিশ্বাস হারিয়েছে, আজ সে স্পর্ধা করে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করতে উদ্যত। আজ তার লজ্জা গেছে ভেঙে ; একদা ইংরেজের সংস্রবে আমরা যে-য়ুরোপকে জানতুম, কুৎসিতের সম্বন্ধে তার একটা সংকোচ ছিল, আজ সে লজ্জা দিচ্ছে সেই সংকোচকেই। আজকাল দেখছি আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করবার জন্যে সভ্যতার দায়িত্ববোধ যাচ্ছে চলে। অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্ছে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে। সভ্য য়ুরোপের সর্দার-পোড়ো জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে, তার নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত অধিকার-লঙ্ঘনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্যে নজির বের করে য়ুরোপের ইতিহাস থেকে। আয়র্লন্ডে রক্তপিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল, অনতিপূর্বেও আমরা তা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতুম না। তার পরে চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা। যে-য়ুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজ্‌মের নির্বিচার নিদারুণতা। একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে। ব্যক্তিগত শ্রেয়োবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করবার কথা অল্পবয়সে আমরা য়ুরোপের বেদী থেকে শুনতে পেতুম, আজ সেখানে যারা খৃস্টের উপদেশকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, যারা শত্রুকেও হিংসা করা মনে করে অধর্ম, তাদের কি দশা ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত থেকে কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি।

যুদ্ধবিরোধী ফরাসি যুবক রেনে রেইম লিখছেন :

So after the war I was sent to Guiana... Condemned to fifteen years' penal servitude I have drained to the dregs the cup of bitterness, but the term of penal servitude being completed, there remains always the accessory punishment— banishment for life. One arrives in Guiana sound in health, young, vigorous, one leaves (if one leaves), weakly, old, ill.... One arrives in Guiana honest— a few months later one is corrupted... They (the transportees) are an easy prey to all the maladies of this land— fever, dysentery, tuberculosis and most terrible of all, leprosy.

পোলিটিকাল মতভেদের জন্যে ইটালি যে দ্বীপান্তরবাসের বিধান করেছে, সে কিরকম দুঃসহ নরকবাস, সে কথা সকলেরই জানা আছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যে-সব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জর্মনি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ, এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হল না! যুদ্ধপরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চার দিকে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকল তখন এই কথাই বার বার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ। মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে— বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা। কিন্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি, তুমি অশ্রদ্ধেয়, অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি "বিনিপাত", বলবার জন্যে পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকও দুর্দিনের মধ্যে দেখা দেয়, এই তো সকল দুঃখের, সকল ভয়ের উপরের কথা। আজ পেয়াদার পীড়নে হাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে, তবুও তো আগেকার মতো হাতজোড় করে বলতে পারি নে, দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, বলতে পারি নে, তেজীয়ান যে তার

কিছুই দোষের নয়। বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, তারই দায়িত্ব বড়ো, তারই আদর্শে তারই অপরাধ সকলের চেয়ে নিন্দনীয়। যে দুঃখী, যে অবমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহগর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেই দিনই বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠসম্পদে শেষকড়া-পর্যন্ত দেউলে হল। তার পরে আসুক কল্পান্ত।

শ্রাবণ ১৩৪০

বিবেচনা ও অবিবেচনা

বাংলা দেশে একদিন স্বদেশপ্রেমের বান ডাকিল ; আমাদের প্রাণের ধারা হঠাৎ অসম্ভব রকম ফুলিয়া উঠিয়া পাড়ি ছাপাইয়া পড়ে আর কি। সেই বেগটা যে সত্য তাহার প্রমাণ এই যে, তাহার চাঞ্চল্যে কেবল আমাদের কাগজের নৌকাগুলাকে দোলা দেয় নাই, কেবল সভাতলেই করতালির তুফান উঠিয়া সমস্ত চুকিয়া গেল না।

সেদিন সমাজটাও যেন আগাগোড়া নড়িয়া উঠিল এমনতরো বোধ হইয়াছিল। এক মুহূর্তেই তাঁতের কাজে ব্রাহ্মণের ছেলেদের বাধা ছুটিয়া গেল। ভদ্রসন্তান কাপড়ের মোট বহিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, এমন-কি, হিন্দু-মুসলমানে একত্রে বসিয়া আহার করার আয়োজনটাও হয়-হয় করিতে লাগিল।

তর্ক করিয়া এ-সব হয় নাই—কেহ বিধান লইবার জন্য অধ্যাপকপাড়ায় যাতায়াত করে নাই। প্রাণ জাগিলেই কাহারো পরামর্শ না লইয়া আপনি সে চলিতে প্রবৃত্ত হয় ; তখন সে চলার পথের সমস্ত বাধাগুলাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহাতে গম্ভীরভাবে সিঁদুর চন্দন মাখাইতে বসে না, কিংবা তাহাকে লইয়া বসিয়া বসিয়া সুনিপুণ তত্ত্ব বা সুচারু কবিত্বের সূক্ষ্ম বুনানি বিস্তার করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় না। যেমনি চলিতে যায় অমনি সে আপনিই বুঝিতে পারে কোন্‌গুলা লইয়া তাহার চলিবে না ; তখন যাহা গায়ে ঠেকে তাহাকেই সমস্ত গা দিয়া সে ঠেলা দিতে শুরু করে। সেই সাবেক পাথরগুলা যখন ঠেলার চোটে টলিতে থাকে তখন বোঝা যায় প্রাণ জাগিয়াছে বটে, ইহা মায়া নহে স্বপ্ন নহে।

সেই বন্যার বেগ কমিয়া আসিয়াছে। সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধি বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।

আজ আবার সমাজকে বাহবা দিবার পালা আরম্ভ হইল। জগতের মধ্যে কেবল-মাত্র ভারতেরই জলবাতাসে এমন একটি অদ্ভুত জাদু আছে যে এখানে রীতি আপনিই নীতিকে বরণ করিয়া লয়, আচারের পক্ষে বিচারের কোনো প্রয়োজনই হয় না। আমাদের কিছুই বানাইবার দরকার নাই কেবল মানিয়া গেলেই চলে, এই বলিয়া নিজেকে অভিনন্দন করিতে বসিয়াছি।

যে-লোক কাজের উৎসাহে আছে, স্তবের উৎসাহে তাহার প্রয়োজনই থাকে না। ইহার প্রমাণ দেখো, আমরাও পশ্চিম সমুদ্রপারে গিয়া সেখানকার মানুষদের মুখের উপর বলিয়া আসিয়াছি, "তোমরা মরিতে বসিয়াছ ! আত্মা বলিয়া পদার্থকে কেবলই বস্তুচাপা দিয়া তাহার দম বন্ধ করিবার জো করিয়াছ— তোমরা স্থূলের উপাসক।" এ-সব কঠোর কথা শুনিয়া তাহারা তো মারমূর্তি ধরে নাই। বরঞ্চ ভালোমানুষের মতো মানিয়া লইয়াছে ; মনে মনে বলিয়াছে, 'হবেও বা। আমাদের বয়স অল্প, আমরা কাজ বুঝি— ইহারা অত্যন্ত প্রাচীন, অতএব কাজ কামাই করা সম্বন্ধে ইহারা যে তত্ত্বকথাগুলা বলে নিশ্চয় সেগুলা ইহারা আমাদের চেয়ে ভালোই বোঝে।' এই বলিয়া ইহারা আমাদিগকে দক্ষিণা দিয়া খুশি করিয়া বিদায় করিয়াছে এবং তাহার পর আস্তিন গুটাইয়া যেমন কাজ করিতেছিল তেমনিই কাজ করিতে লাগিয়াছে।

কেননা, হাজারই ইহাদিগকে নিন্দা করি আর ভয় দেখাই ইহারা যে চলিতেছে ; ইহারা যে প্রাণবান তাহার প্রমাণ যে ইহাদের নিজেরই মধ্যে। মরার বাড়া গালি নাই, এ কথা ইহাদের পক্ষে খাটে না। ইহারা জানে মরার বাড়াও গালি আছে— বাঁচিয়া মরা। ইহাদের জীবনযাত্রায় সংকটের সীমা নাই, সমস্যার গ্রন্থিও বিস্তর কিন্তু সকলের উপরে ইহাদিগকে ভরসা দিতেছে ইহাদের প্রাণ। এইজন্য ইহারা নিন্দা অনায়াসে সহিতে পারে এবং নৈরাশ্যের কথাটাকে লইয়া ক্ষণকালের জন্য খেলা করে মাত্র, তাহাতে তাহাদের প্রাণের বেগে আর-একটু উত্তেজনার সঞ্চার করে।

আমরাও তেমনি নিন্দা সহজে সহিতে পারিতাম যদি পুরাদমে কাজের পথে চলিতাম। কারণ তাহা হইলে আপনিই বুঝিতে পারিতাম প্রাণের গতিতে সমস্ত গ্লানিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। পঙ্ক যখন অচল হইয়া থাকে তখন সেটা নিন্দিত, কিন্তু জোয়ারের গঙ্গাকে পঙ্কিল বলিয়া দোষ দিলেও যাহারা স্নান করে তাহাদের তাহাতে বাধা হয় না।

এইজন্য, নিষ্কর্মণ্য যে তাহারই অহোরাত্র স্তবের দরকার হয়। যে ধনীর কীর্তিও নাই, হাতে কোনো কর্মও নাই, চাটুকারের প্রয়োজন সব চেয়ে তাহারই অধিক, নহিলে সে আপনার জড়ত্বের বোঝা বহিবে কেমন করিয়া। তাহাকে পরামর্শ দেওয়া উচিত যে, তোমার এই বনেদি স্থাবরত্ব গৌরব করিবার জিনিস নয়, যেমন করিয়া পার একটা কর্মে লাগিয়া যাও। কিন্তু এ স্থলে পরামর্শদাতার কাজটা নিরাপদ নহে, বাবুর পারিষদবর্গ তখনই হাঁ হাঁ করিয়া আসিবে। সুতরাং বকশিশের প্রত্যাশা থাকিলে বলিতে হয়, "হুজুর, আপনি যে সনাতন তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়াছেন উহার তুলার স্তূপ জগতে অতুল, অতএব বংশের গৌরব যদি রাখিতে চান তো নড়িবেন না।"

আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলই বাধে। এমন স্থলে হয় বলিতে হয়, খাঁচাটাকে ভাঙো, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখাদুটাকে অসাড় করিয়া দিল ; নয় বলিতে হয়, ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র, কারণ, পাখা তো আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন, আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন ; অতএব ঐ খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখাঝাপট সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশ-ভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যে যদি নিতান্তই থাকিতে হয় তবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মন ঠাণ্ডা থাকে।

আমাদের সামাজিক কামারে যে-শলাটি যেমন করিয়া বানাইয়াছে শিশুকাল হইতে তাহারই স্তবের বুলি পড়িয়া পড়িয়া আমরা অন্য সকল গান ভুলিয়াছি, কেননা অন্যথা করিলে বিপদের অন্ত নাই। আমাদের এখানে সকল দিকেই ঐ কামারেরই হইল জয়, আর সব চেয়ে বিড়ম্বিত হইলেন বিধাতা, যিনি আমাদিগকে কর্মশক্তি দিয়াছেন, যিনি মানুষ বলিয়া আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

যাঁহারা বলিতেছেন যেখানে যাহা আছে সমস্তই বজায় থাক্, তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রণম্য— কারণ, তাঁহাদের বয়স অল্পই হউক আর বেশিই হউক তাঁহারা সকলেই প্রবীণ। সংসারে, তাঁহাদের প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না। পৃথিবীতে এমন সমাজ নাই যেখানে তাঁহারা দণ্ড ধরিয়া বসিয়া নাই। কিন্তু বিধাতার বরে যে-সমাজ বাঁচিয়া থাকিবে সে-সমাজে তাঁহাদের দণ্ডই চরম বলিয়া মান পায় না।

সেদিন একটি কুকুরছানাকে দেখা গেল, মাটির উপর দিয়া, একটি কীট চলিতেছে দেখিয়া তাহার ভারি কৌতূহল। সে তাহাকে শুঁকিতে শুঁকিতে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল। যেমনি পোকাটা একটু ধড়ফড় করিয়া উঠিতেছে অমনি কুকুরশাবক চমকিয়া পিছাইয়া আসিতেছে।

দেখা গেল তাহার মধ্যে নিষেধ এবং তাগিদ দুটা জিনিসই আছে। প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়। প্রাণ দুঃসাহসিক— বিপদের ঠোকর খাইলেও সে আপনার জয়যাত্রার পথ হইতে

সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে চায় না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি প্রবীণও আছে, বাধার বিকট চেহারা দেখিবা মাত্রই সে বলে, কাজ কী। বহু পুরাতন যুগ হইতে পুরুষানুক্রমে যত-কিছু বিপদের তাড়না আপনার ভয়ের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছে, অহাকে পুঁথির।আকারে বাঁধাইয়া রাখিয়া একটি বৃদ্ধ তাহারই খবরদারি করিতেছে। নবীন প্রাণ এবং প্রবীণ ভয়, জীবের মধ্যে উভয়েই কাজ করিতেছে। ভয় বলিতেছে 'রোসো রোসো', প্রাণ বলিতেছে 'দেখাই যাক-না'।

অতএব এই প্রবীণতার বিরুদ্ধে আমরা আপত্তি করিবার কে। আপত্তি করিও না। তাঁহার বৈঠকে তিনি গদিয়ান হইয়া থাকিবেন, সেখান হইতে তাঁহাকে আমরা নড়িয়া বসিতে বলি এমন বেআদব আমরা নই। কিন্তু প্রাণের রাজ্যে তাঁহাকেই একেশ্বর করিবার যখন ষড়যন্ত্র হয় তখনই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া বাহির হইবার দিন আসে। দুর্ভাবনা এবং নির্ভাবনা উভয়কেই আমরা খাতির করিয়া চলিতে রাজি আছি।

প্রাণের রাজ্যাধিকারে এই উভয়েই শরিক বটে কিন্তু উভয়ের অংশ যে সমান তাহাও আমরা মানিতে পারি না। নির্ভাবনার অংশটাই বেশি হওয়া চাই নহিলে স্রোত এতই মন্দ বহে যে শেওলা জমিয়া জলটা চাপা পড়ে। মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে জন্মসংখ্যা বেশি হওয়াই কল্যাণের লক্ষণ।

পৃথিবীতে বারো আনা জল চার আনা স্থল। এরূপ বিভাগ না হইলে বিপদ ঘটিত। কারণ জলই পৃথিবীতে গতিসঞ্চার করিতেছে, প্রাণকে বিস্তারিত করিয়া দিতেছে। জলই খাদ্যকে সচল করিয়া গাছপালা পশুপক্ষীকে স্তন্য দান করিতেছে। জলই সমুদ্র হইতে আকাশে উঠিতেছে, আকাশ হইতে পৃথিবীতে নামিতেছে, মলিনকে ধৌত করিতেছে, পুরাতনকে নূতন ও শুষ্ককে সরস করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর উপর দিয়া যে জীবের প্রবাহ নব নব ধারায় চলিয়াছে তাহার মূলে এই জলেরই ধারা। স্থলের একাধিপত্য যে কী ভয়ংকর তাহা মধ্য-এশিয়ার মরুপ্রান্তরের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে। তাহার অচলতার তলে কত বড়ো বড়ো শহর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে পুরাতন পথ বাহিয়া ভারতবর্ষ হইতে চীনে জাপানে পণ্য ও চিত্ত-বিনিময় চলিত, এই রুদ্র মরু সে-পথের চিহ্ন মুছিয়া দিল ; কত যুগের প্রাণচঞ্চল ইতিহাসকে বালুচাপা দিয়া সে কঙ্কালসার করিয়া দিয়াছে। উলঙ্গ ধূর্জটি সেখানে একা স্থাণু হইয়া উর্ধ্বনেত্রে বসিয়া আছেন ; উমা নাই। দেবতারা তাই প্রমাদ গনিতেছেন— কুমারের জন্ম হইবে কেমন করিয়া। নূতন প্রাণের বিকাশ হইবে কী উপায়ে।

জোর করিয়া চোখ বুজিয়া যদি না থাকি তবে নিজের সমাজের দিকে তাকাইলেও এই চেহারাই দেখিতে পাইব। এখানে স্থলের স্থাবরতা ভয়ংকর হইয়া বসিয়া আছে— এ যে পক্ককেশের শুভ্র মরুভূমি। এখানে এককালে যখন প্রাণের রস বহিত তখন ইতিহাস সজীব হইয়া সচল হইয়া কেবল যে এক প্রদেশ হইতে আর-এক প্রদেশে ব্যাপ্ত হইত তাহা নহে— মহতী স্রোতস্বিনীর মতো দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যাইত। বিশ্বের সঙ্গে সেই প্রাণবিনিময়ের সেই পণ্যবিনিময়ের ধারা ও তাহার বিপুল রাজপথ কবে কোন্‌কালে বালুচাপ পড়িয়া গেছে। এখানে-সেখানে মাটি খুঁড়িয়া বাহনদের কঙ্কাল খুঁজিয়া পাওয়া যায়, পুরাতত্ত্ববিদের খনিত্রের মুখে পণ্যসামগ্রীর দুটো-একটা ভাঙাটুকরা উঠিয়া পড়ে। গুহাগহ্বরে গহনে সেকালের শিল্পপ্রবাহিণীর কিছু কিছু অংশ আটকা পড়িয়া গেছে, কিন্তু আজ তাহা স্থির, তাহার ধারা নাই। সমস্ত স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমাদের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ কী। সমস্ত সৃষ্টির স্রোত বন্ধ। যাহা আছে তাহা আছে, যাহা ছিল তাহা কেবলই তলাইয়া যাইতেছে।

চারি দিক এমনি নিস্তব্ধ নিশ্চল যে মনে ভ্রম হয় ইহাই সনাতন। কখনোই নহে, ইহাই নূতন। এই মরুভূমি সনাতন নহে, ইহার বহুপূর্বে এখানে প্রাণের নব নব লীলা চলিত— সেই লীলায় কত বিজ্ঞান দর্শন, শিল্প সাহিত্য, রাজ্য সাম্রাজ্য, কত ধর্ম ও সমাজবিপ্লব তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। কিছু না করিয়া একবার মহাভারতটা পড়িয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, সমাজটা কোনো সংহিতার কারখানাঘরের ঢালাই-পেটাই-করা ও কারিগরের ছাপমারা সামগ্রী ছিল না— তাহাতে বিধাতার নিজের সৃষ্টির সমস্ত লক্ষণ ছিল, কেননা তাহাতে প্রাণ ছিল। তাহা নিখুঁত নয়, নিটোল নয় ; তাহা সজীব, তাহা প্রবল, তাহা কৌতূহলী, তাহা দুঃসাহসিক।

ইজিপ্টের প্রকাণ্ড কবরগুলার তলায় যে-সমস্ত 'মমি' মৃত্যুকে অমর করিয়া দাঁত মেলিয়া জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে তাহাদিগকেই কি বলিবে সনাতন। তাহাদের সিন্দুকের গায়ে যত প্রাচীন তারিখের চিহ্নই খোদা থাক্‌-না কেন, সেই ইজিপ্টের নীলনদীর পলিপড়া মাঠে আজ যে 'ফেলাহীন্' চাষা চাষ করিতেছে তাহারই প্রাণ যথার্থ সনাতন। মৃত্যু যে প্রাণের ছোটো ভাই ; আগে প্রাণ তাহার পরে মৃত্যু। যাহা-কিছু চলিতেছে তাহারই সঙ্গে জগতের চিরন্তন চলার যোগ আছে— যাহা থামিয়া বসিয়াছে তাহার সঙ্গে সনাতন প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আজ ক্ষুদ্র ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে সাহস নাই, সৃষ্টির কোনো উদ্যম নাই, এইজন্যই মহাভারতের সনাতন প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগই নাই। যে-যুগ দর্শন চিন্তা করিয়াছিল, যে-যুগ শিল্প সৃষ্টি করিয়াছিল, যে-যুগ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। অথচ আমরা তারিখের হিসাব করিয়া বলিতেছি জগতে আমাদের মতো সনাতন আর-কিছুই নাই ; কিন্তু তারিখ তো কেবল অঙ্কের হিসাব, তাহা তো প্রাণের হিসাব নয়। তাহা হইলে তো ভস্মও অঙ্ক গণনা করিয়া বলিতে পারে সেই সকলের চেয়ে প্রাচীন অগ্নি।

পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙক্ষার দুঃসাহস। শক্তি কোথাও বাধা মানিতে চায় নাই বলিয়া মানুষ সমুদ্র পর্বত লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, বুদ্ধি আপাতপ্রতীয়মানকে ছাড়াইয়া অন্ধসংস্কারের মোহজালকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া মহৎ হইতে মহীয়ানে, অণু হইতে অণীয়ানে, দূর হইতে দূরান্তরে, নিকট হইতে নিকটতমে সগৌরবে বিহার করিতেছে ; ব্যাধি দৈন্য অভাব অবজ্ঞা কিছুকেই মানুষের আকাঙক্ষা অপ্রতিহার্য মনে করিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া নাই, কেবলই পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া চলিতেছে। যাহাদের সে দুঃসাহস নাই তাহারা আজও মধ্য আফ্রিকার অরণ্যতলে মূঢ়তার স্বকপোলকল্পিত বিভীষিকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে যুগযুগান্তর গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।

এই দুঃসাহসের মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে। আজ যাহারা আকাশযানে উড়িতে উড়িতে আকাশ হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া মরিতেছে তাহাদের মধ্যে সেই দুরন্ত অবিবেচনা কাজ করিতেছে। এমনি করিয়াই একদিন যাহারা সমুদ্র পার হইবার সাধনা করিতে করিতে হাজার হাজার জলে ডুবিয়া মরিয়াছে সেই অবিবেচনাই তাহাদিগকে তাড়া করিয়াছিল। সেই দুর্ধর্ষ অবিবেচনার উত্তেজনাতেই আজও মানুষ তুষারদৈত্যের পাহারা এড়াইয়া কখনো উত্তরমেরু কখনো দক্ষিণমেরুতে কেবলমাত্র দিগ্‌বিজয় করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। এমনি করিয়া যাহারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে।

এই দুঃসাহসিকের দল নিজের সমাজের মধ্যেও যে লক্ষ্মীছেলে হইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে। যাহা আছে তাহাই যে চূড়ান্ত এ কথা কোনোমতেই তাহাদের মন মানিতে চায় না। বিজ্ঞ মানুষদের নিয়ত ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া পুরাতন বেড়া সরাইয়া কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। প্রাণের চাঞ্চল্য তাহাদের স্বভাবতই প্রবল বলিয়াই, তাহাদের সাহসের অন্ত নাই বলিয়াই, সেই বিপুল বেগেতেই তাহারা সমস্ত সীমাকে কেবলই ধাক্কা মারিয়া বেড়ায়। ইহা তাদের স্বভাব। এমনি করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে যেখানে সীমা দেখা যাইতেছিল বস্তুতই সেখানে সীমা নাই। ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে এবং মরিবার বেলায় ইহারাই মরে। কিন্তু বাঁচিবার পথ ইহারাই বাহির করিয়া দেয়।

আমাদের দেশে সেই জন্মলক্ষ্মীছাড়া কি নাই। নিশ্চয়ই আছে। কারণ তাহারাই যে প্রাণের স্বাভাবিক সৃষ্টি, প্রাণ যে আপনার গরজেই তাহাদিগকে জন্ম দেয়। কিন্তু পৃথিবীতে যে-কোনো শক্তিই মানুষকে সম্পূর্ণ আপনার তাঁবেদার করিতে চায় সে প্রাণের লীলাকেই সব চেয়ে ভয় করে— সেই কারণেই আমাদের সমাজ ঐ-সকল প্রাণবহুল দুরন্ত ছেলেকে শিশুকাল হইতে নানাপ্রকার শাসনে এমনই ঠাণ্ডা করিতে চায় যাহাতে তাহাদের ভালোমানুষি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। মানা, মানা, মানা ; শুইতে বসিতে কেবলই তাহাদিগকে মানা মানিয়া চলিতে হইবে। যাহার কোনো

কারণ নাই যুক্তি নাই তাহাকে মানাই যাহাদের নিয়ত অভ্যাস, মানিয়া চলা তাহাদের এমনি আশ্চর্য দুরন্ত হইয়া উঠে যে, যেখানে কাহাকেও মানিবার নাই সেখানে তাহারা চলিতেই পারে না। এইপ্রকার হতবুদ্ধি হতোদ্যম মানুষকে আপন তর্জনিসংকেতে ওঠ্‌বোস্‌ করানো সহজ। আমাদের সমাজ সমাজের মানুষগুলাকে লইয়া এই প্রকারের একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে। তারে তারে আপাদমস্তক কেমন করিয়া বাঁধিয়াছে, কী আশ্চর্য তাহার কৌশল। ইহাকে বাহবা দিতে হয় বটে। বিধাতাকে এমন সম্পূর্ণরূপে হার মানানো, প্রাণীকে এমন কলের পুতুল করিয়া তোলা জগতে আর-কোথায় ঘটিয়াছে।

তবু হাজার হইলেও যাহাদের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য আছে তাহাদিগকে সকল দিক হইতে চাপিয়া পিষিয়াও তাহাদের তেজ একেবারে নষ্ট করা যায় না। এইজন্য আর-কোনো কাজ না পাইয়া সেই উদ্যম সেই তেজ তাহারা সমাজের বেড়ি গড়িবার জন্যই প্রবলবেগে খাটাইতে থাকে। স্বভাবের বিকৃতি না ঘটিলে যাহারা সর্বাগ্রে চলার পথে ছুটিত তাহারাই পথের মধ্যে প্রাচীর তুলিবার জন্য সব চেয়ে উৎসাহের সঙ্গে লাগিয়া থাকে। কাজ করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম, কিন্তু কাজের ক্ষেত্র বন্ধ বলিয়া কাজ বন্ধ করিবার কাজেই তাহারা কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগে।

ইহারা কুন্তীসুত কর্ণের মতো। পাণ্ডবের দলে কর্ণের যথার্থ স্থান ছিল কিন্তু সেখানে অদৃষ্টক্রমে কোনো অধিকার না পাওয়াতে পাণ্ডবদিগকে উচ্ছেদ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যাঁহাদের কথা বলিতেছি তাঁহারা স্বভাবতই চলিষ্ণু, কিন্তু এ দেশে জন্মিয়া সে কথাটা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া বসিয়াছেন— এইজন্য যাঁহারা ঠিক তাঁহাদের একদলের লোক, তাঁহাদের সঙ্গেই অহরহ হাতাহাতি করিতে পারিলে ইঁহারা আর-কিছু চান না।

এই শ্রেণীর লোক আজকাল অনেক দেখা যায়। ইঁহারা তাল ঠুকিয়া বলেন, "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে!" আক্ষেপ করিয়া বলেন, আমাদের প্রভুদের মানা আছে বলিয়াই আমরা পৌরুষ দেখাইতে পারি না। অথচ সমাজের চোখে ঠুলি দিয়া তাহাকে সরু মোটা হাজার বাঁধনে বাঁধিয়া মানার প্রকাণ্ড ঘানিতে জুড়িয়া একই চক্রপথে ঘুরাইবার সব চেয়ে বড়ো ওস্তাদ ইঁহারাই। বলেন, এ ঘানি সনাতন, ইহার পবিত্র স্নিগ্ধ তৈলে প্রকুপিত বায়ু একেবারে শান্ত হইয়া যায়। ইঁহারা প্রচণ্ড তেজের সঙ্গেই দেশের তেজ নিবৃত্তির জন্যই লাগিয়াছেন; সমাজের মধ্যে কোথাও কিছু ব্যস্ততার লক্ষণ না দেখা দেয় সেজন্য ইঁহারা ভয়ংকর ব্যস্ত।

কিন্তু পারিয়া উঠিবেন না। অস্থিরতার বিরুদ্ধে যে চাঞ্চল্য ইঁহাদিগকে এমন অস্থির করিয়া তুলিয়াছে সেটা দেশের নাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহার প্রমাণ তাঁহারা নিজেই। সকালবেলায় জাগিয়া উঠিয়া যদি কেহ কেহ ঘরে আলো আসিতেছে বলিয়া বিরক্ত হইয়া দুড়দাড় শব্দে ঘরের দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করিয়া দিতে চায় তবে নিশ্চয় আরো অনেক লোক জাগিবে যাহারা দরজা খুলিয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিবে। জাগরণের দিনে দুই দলই জাগে এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে আশার কথা।

যাঁহারা দেশকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারা অনেক দিন একাধিপত্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই একেশ্বর রাজত্বের কীর্তিগুলি চারি দিকেই দেখা যাইতেছে; তাহা লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই রাগারাগি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থাকুন, আর বাকি সবাই পথে ঘাটে বাহির হইয়া পড়ুক। সেখানে তারুণ্যের জয় হউক। তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক, জঞ্জাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হোক, তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্যসাধন হইতে থাক্‌।

চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও আবশ্যক; কিন্তু অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব আবার বিবেচনা করিতেও অধিকার দিব না—মানুষকে বলিব, তুমি শক্তিও চালাইয়ো না, বুদ্ধি ও চালাইয়ো না, তুমি কেবলমাত্র ঘানি চালাও, এ বিধান কখনোই চিরদিন চলিবে না। যে পথে চলাফেরা বন্ধ, সে পথে ঘাস জন্মায় এবং ঘাসের মধ্যে নানা রঙের ফুলও ফোটে। সে

ঘাস সে ফুল সুন্দর এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না কিন্তু পথের সৌন্দর্য ঘাসেও নহে ফুলেও নহে, তাহা বাধাহীন বিচ্ছেদহীন বিস্তারে ; তাহা ভ্রমণগুঞ্জনে নহে কিন্তু পথিকদলের অক্লান্ত পদধ্বনিতেই রমণীয়।

বৈশাখ ১৩২১

লোকহিত

লোকসাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের দেশে আছে এটা আমরা কিছুদিন হইতে আন্দাজ করিতেছি এবং এই লোকসাধারণের জন্য কিছু করা উচিত হঠাৎ এই ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়াছে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এই কারণে, ভাবনার জন্যই ভাবনা হয়।

আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর অপকার অতি সহজে করিতে পারে কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলে চলিবে না, ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনোদিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।

কিন্তু আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।

হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না-করা।

এ কথা অনেক সময়েই শোনা যায় যে, মানুষ স্বভাবতই অকৃতজ্ঞ— যাহার কাছে সে ঋণী তাহাকে পরিহার করিবার জন্য তাহার চেষ্টা। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ— এ উপদেশ পারতপক্ষে কেহ মানে না। তাহার মহাজনটি যে-রাস্তা দিয়া চলে মানুষ সে-রাস্তায় চলা একেবারে ছাড়িয়া দেয়।

ইহার কারণ এ নয় যে, স্বভাবতই মানুষের মনটা বিকৃত। ইহার কারণ এই যে, মহাজনকে সুদ দিতে হয়। সে-সুদ আসলকে ছাড়াইয়া যায়। হিতৈষী যে সুদটি আদায় করে সেটি মানুষের আত্মসম্মান ; সেটিও লইবে আবার কৃতজ্ঞতাও দাবি করিবে সে যে শাইলকের বাড়া হইল।

সেইজন্য, লোকহিত করায় লোকের বিপদ আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। লোকের সঙ্গে আপনাকে পৃথক রাখিয়া যদি তাহার হিত করিতে যাই তবে সেই উপদ্রব লোকে সহ্য না করিলেই তাহাদের হিত হইবে।

অল্পদিন হইল এ সম্বন্ধে আমাদের একটা শিক্ষা হইয়া গেছে। যে কারণেই হউক যেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম।

সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই, আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদি-বা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া

দেখিতে দিই না— সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া আপন বলিয়া মানিতে না পারি— দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গি করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারে না।

এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের তো পার্থক্য থাকেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার কাজই এই— সেই পার্থক্যটাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যক্ষগোচর না করা। ধনী-দরিদ্রে পার্থক্য আছে, কিন্তু দরিদ্র তাহার ঘরে আসিলে ধনী যদি সেই পার্থক্যটাকে চাপা না দিয়া সেইটেকেই অত্যুগ্র করিয়া তোলে তবে আর যাই হউক দায়ে ঠেকিলে সেই দরিদ্রের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে যাওয়া ধনীর পক্ষে না হয় সত্য, না হয় শোভন।

হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বশে মানুষ মানুষকে ঠেলিয়া রাখে, অপমানও করে— তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কুস্তির সময়ে কুস্তিগিরদের গায়ে পরস্পরের পা ঠেকে তাহার হিসাব কেহ জমাইয়া রাখে না, কিন্তু সামাজিকতার স্থলে কথায় কথায় কাহারও গায়ে পা ঠেকাইতে থাকিলে তাহা ভোলা শক্ত হয়। আমরা বিদ্যালয়ে ও আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি; সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে তাহা মানি; তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে। কারণ, সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের উপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া।

বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।

সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। বঙ্গ বিচ্ছেদের দিনে হঠাৎ যখন মুসলমানকে আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমরা সেই কূপ-খননেরও চেষ্টা করি নাই— আমরা মনে করিয়াছিলাম, মাটির উপরে ঘটি ঠুকিলেই জল আপনি উঠিবে। জল যখন উঠিল না কেবল ধুলাই উড়িল তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রহিল না। আজ পর্যন্ত সেই কূপখননের কথা ভুলিয়া আছি। আরো বার বার মাটিতে ঘটি ঠুকিতে হইবে, সেইসঙ্গে সে ঘটি আপনার কপালে ঠুকিব।

লোকসাধারণের সম্বন্ধেও আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের ঠিক এ অবস্থা। তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ হিন্দু ভদ্রসমাজ এই শ্রেণীয়দিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।

আমাদের সেই মনের ভাবের কোনো পরিবর্তন হইল না অথচ এই শ্রেণীর হিতসাধনের কথা আমরা কষিয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাই এ কথা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা যাহাদিগকে দূরে রাখিয়া অপমান করি তাহাদের মঙ্গলসাধনের সমারোহ করিয়া সেই অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া কোনো ফল নাই।

একদিন যখন আমরা দেশহিতের ধ্বজা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে দেশের অংশটা প্রায় কিছুই ছিল না, হিতের অভিমানটাই বড়ো ছিল। সেদিন আমরা য়ুরোপের নকলে দেশহিত শুরু করিয়াছিলাম, অন্তরের একান্ত তাগিদে নয়। আজও আমরা লোকহিতের জন্য যে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি তাহার মধ্যে অনেকটা নকল আছে। সম্প্রতি য়ুরোপে লোকসাধারণ

সেখানকার রাষ্ট্রীয় রঙ্গভূমিতে প্রধান নায়কের সাজে দেখা দিয়াছে। আমরা দর্শকরূপে এত দূরে আছি যে, আমরা তাহার হাত-পা নাড়া যতটা দেখি তাহার বাণীটা সে পরিমাণে শুনিতে পাই না। এইজন্যই নকল করিবার সময় ঐ অঙ্গভঙ্গিটাই আমাদের একমাত্র সম্বল হইয়া উঠে।

কিন্তু সেখানে কাণ্ডটা কী হইতেছে সেটা জানা চাই।

য়ুরোপে যাহারা একদিন বিশিষ্টসাধারণ বলিয়া গণ্য হইত তাহারা সেখানকার ক্ষত্রিয় ছিল। তখন কাটাকাটি মারামারির অন্ত ছিল না। তখন য়ুরোপের প্রবল বহিঃশত্রু ছিল মুসলমান; আর ভিতরে ছোটো ছোটো রাজ্যগুলা পরস্পরের গায়ের উপর পড়িয়া কেবলই মাথা ঠোকাঠুকি করিত। তখন দুঃসাহসিকের দল চারি দিকে আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া বেড়াইত— কোথাও শান্তি ছিল না।

সে সময়ে সেখানকার ক্ষত্রিয়েরাই ছিল দেশের রক্ষক। তখন তাহাদের প্রাধান্য স্বাভাবিক ছিল। তখন লোকসাধারণের সঙ্গে তাহাদের যে সম্বন্ধ ছিল সেটা কৃত্রিম নহে। তাহারা ছিল রক্ষাকর্তা এবং শাসনকর্তা। লোকসাধারণে তাহাদিগকে স্বভাবতই আপনাদের উপরিবর্তী বলিয়া মানিয়া লইত।

তাহার পরে ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন য়ুরোপে রাজার জায়গাটা রাষ্ট্রতন্ত্র দখল করিতেছে, এখন লড়াইয়ের চেয়ে নীতিকৌশল প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের আয়োজন পূর্বের চেয়ে বাড়িয়াছে বৈ-কমে নাই কিন্তু এখন যোদ্ধার চেয়ে যুদ্ধবিদ্যা বড়ো; এখন বীর্যের আসনে বিজ্ঞানের অভিষেক হইয়াছে। কাজেই য়ুরোপে সাবেককালের ক্ষত্রিয়বংশীয়েরা এবং সেই-সকল ক্ষত্রিয়-উপাধিধারীরা যদিও এখনো আপনাদের আভিজাত্যের গৌরব করিয়া থাকে তবু লোকসাধারণের সঙ্গে তাহাদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেছে। তাই রাষ্ট্রচালনার কাজে তাহাদের আধিপত্য কমিয়া আসিলেও সেটাকে জাগাইয়া তুলিবার জোর তাহাদের নাই।

শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। লোকসাধারণের কাঁধের উপরে তাহারা চাপিয়া বসিয়াছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষের পেটের জ্বালাই তাহাদের কলের স্টীম উৎপন্ন করে।

পূর্বকালের ক্ষত্রিয়নায়কের সঙ্গে মানুষের যে-সম্বন্ধ ছিল সেটা ছিল মানবসম্বন্ধ। দুঃখ কষ্ট অত্যাচার যতই থাক্, তবু পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের আদানপ্রদানের পথ ছিল। এখন বৈশ্য মহাজনদের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যান্ত্রিক। কর্মপ্রণালী-নামক প্রকাণ্ড একটা জাঁতা মানুষের আর-সমস্তই গুঁড়া করিয়া দিয়া কেবল মজুরটুকু মাত্র বাকি রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

ধনের ধর্মই অসাম্য। জ্ঞান ধর্ম কলাসৌন্দর্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বৈ কমে না, কিন্তু ধন জিনিসটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেঁকে না। এইজন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদজনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনোমতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।

তাই ও দেশে শ্রমজীবীর দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়া ঘুম-পাড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে; তাহাদিগকে অল্পস্বল্প এটা-ওটা দিয়া কোনোমতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা। কেহ বলে উহাদের বাসা একটু ভালো করিয়া দাও, কেহ বলে যাহাতে উহারা দু চামচ সুপ খাইয়া কাজে যাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করো, কেহ-বা তাহাদের বাড়িতে গিয়া মিষ্টমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করে, শীতের দিনে কেহ-বা আপন উদ্‌বৃত্ত গরম কাপড়টা তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেয়।

এমনি করিয়া ধনের প্রকাণ্ড জালের মধ্যে আটকা পড়িয়া লোকসাধারণ ছটফট করিয়া উঠিয়াছে। ধনের চাপটা যদি এত জোরের সঙ্গে তাহাদের উপর না পড়িত তবে তাহারা জমাট বাঁধিত না— এবং তাহারা-যে কেহ-বা কিছু তাহা কাহারও খবরে আসিত না। এখন ও দেশে লোকসাধারণ কেবল সেন্সস-রিপোর্টের তালিকাভুক্ত নহে; সে একটা শক্তি। সে আর ভিক্ষা করে না, দাবি করে। এইজন্য তাহার কথা দেশের লোকে আর ভুলিতে পারিতেছে না; সকলকে সে বিষম ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

এই লইয়া পশ্চিমদেশে নিয়ত যে-সব আলোচনা চলিতেছে আমরা তাহাদের কাগজে পত্রে তাহা সর্বদাই পড়িতে পাই। ইহাতে হঠাৎ এক-একবার আমাদের ধর্মবুদ্ধি চমক খাইয়া উঠে। বলে, তবে তো আমাদেরও ঠিক এই রকম আলোচনা কর্তব্য।

ভুলিয়া যাই ও দেশে কেবলমাত্র আলোচনার নেশায় আলোচনা নহে, তাহা নিতান্তই প্রাণের দায়ে। এই আলোচনার পশ্চাতে নানা বোঝাপড়া, নানা উপায়-অন্বেষণ আছে। কারণ সেখানে শক্তির সঙ্গে শক্তির লড়াই চলিতেছে— যাহারা অক্ষমকে অনুগ্রহ করিয়া চিত্তবিনোদন ও অবকাশযাপন করিতে চায় এ তাহাদের সেই বিলাসকলা নহে।

আমাদের দেশে লোকসাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান দিতেও পারে না। আমরা তাহাদিগকে ইংরেজি বই পড়িয়া জানিব এবং অনুগ্রহ করিয়া জানিব, সে জানায় তাহারা কোনো জোর পায় না, ফলও পায় না। তাহাদের নিজের অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একলার দুঃখ যে একটি বিরাট দুঃখের অন্তর্গত এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। তখন সমাজ, দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে সেই সমস্যার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত। পরের ভাবনা ভাবা তখনই সত্য হয়, পর যখন আমাদিগকে ভাবাইয়া তোলে। অনুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁকে।

সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমরা যদি আপনার উচ্চতার অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে, ঐ-সব সাধারণ লোকদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব তবে এমন জিনিসের আমদানি করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙা কুলা দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। দয়ালু বাবুদের উপর বরাত দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতলার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। সকল সাহিত্যেরই যেমন এই লোকসাহিত্যেরও সেই দশা অর্থাৎ ইহাতে ভালো মন্দ মাঝারি সকল জাতেরই জিনিস আছে। ইহার যাহা ভালো তাহা অপরূপ ভালো— জগতের কোনো রসিকসভায় তাহার কিছুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই। অতএব দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজের কোনো ডিগ্রীধারীকেই লোকসাহিত্যের মুরুব্বিয়ানা করা সাজিবে না। স্বয়ং বিধাতাও অনুগ্রহের জোরে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না, তিনি অহেতুক আনন্দের জোরেই এই যাহা-কিছু রচিয়াছেন। যেখানেই হেতু আসিয়া মুরুব্বি হইয়া বসে সেইখানেই সৃষ্টি মাটি হয়। এবং যেখানেই অনুগ্রহ আসিয়া সকলের চেয়ে বড়ো আসনটা লয় সেইখান হইতেই কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে।

আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে, কেননা আমাদের লোকসাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এইজন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিস তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই। আমরা বড়োজোর ধর্মের দোহাই দিয়া জমিদারকে বলি তোমার কর্তব্য করো, মহাজনকে বলি তোমার সুদ কমাও, পুলিসকে বলি তুমি অন্যায় করিয়ো না— এমন করিয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে কতদিন কতদিক ঠেকাইব। চালুনিতে করিয়া জল আনাইব আর বাহককে বলিব যতটা পারো তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও— সে হয় না ; তাহাতে কোনো এক সময়ে এক মুহূর্তের কাজ চলে কিন্তু চিরকালের এ ব্যবস্থা নয়। সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশি।

অতএব সব-প্রথমে দরকার, লোকেরা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে একটা যোগ দেখিতে পায়। অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকা চাই। সেটা যদি রাজপথ না হয় তো অন্তত গলিরাস্তা হওয়া চাই।

লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা। যদি বলি জ্ঞানশিক্ষা, তাহা হইলে তর্ক উঠিবে, আমাদের চাষাভুষারা যাত্রার দল ও কথকঠাকুরের কৃপায় জ্ঞানশিক্ষায় সকল দেশের অগ্রগণ্য। যদি বলি উচ্চশিক্ষা, তাহা হইলে ভদ্রসমাজে খুব একটা উচ্চহাস্য উঠিবে— সেটাও সহিতে পারিতাম যদি আশু এই প্রস্তাবটার কোনো উপযোগিতা থাকিত।

আমি কিন্তু সব চেয়ে কম করিয়াই বলিতেছি, কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা। তাহা কিছু লাভ নহে তাহা কেবলমাত্র রাস্তা— সেও পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তা। আপাতত এই যথেষ্ট, কেননা এই রাস্তাটা না হইলেই মানুষ আপনার কোণে আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে। তখন তাহাকে যাত্রা-কথকতার যোগে সাংখ্য যোগ বেদান্ত পুরাণ ইতিহাস সমস্তই শুনাইয়া যাইতে পার, তাহার আঙিনায় হরিনামসংকীর্তনেরও ধুম পড়িতে পারে কিন্তু এ কথা তাহার স্পষ্ট বুঝিবার উপায় থাকে না যে, সে একা নহে; তাহার যোগ কেবলমাত্র অধ্যাত্মযোগ নহে, একটা বৃহৎ লৌকিক যোগ।

দূরের সঙ্গে নিকটের, অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধপথটা সমস্ত দেশের মধ্যে অবাধে বিস্তীর্ণ হইলে তবেই তো দেশের অনুভবশক্তিটা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। মনের চলাচল যতখানি, মানুষ ততখানি বড়ো। মানুষকে শক্তি দিতে হইলে মানুষকে বিস্তৃত করা চাই।

তাই আমি এই বলি, লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কী শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে, এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে, তাহার চেতনার অধিকার যে চারি দিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে এইটেই গোড়াকার কথা।

য়ুরোপে লোকসাধারণ আজ যে এক হইয়া উঠিবার শক্তি পাইয়াছে তাহার কারণ এ নয় যে, তাহারা সকলেই পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। হয়তো আমাদের দেশাভিমানীরা প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে পরাবিদ্যা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমাদের দেশের সাধারণ লোকে তাহাদের চেয়ে বেশি বোঝে, কিন্তু ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে য়ুরোপের সাধারণ লোকে লিখিতে পড়িতে শিখিয়া পরস্পরের কাছে পৌঁছিবার উপায় পাইয়াছে, হৃদয়ে হৃদয়ে গতিবিধির একটা মস্ত বাধা দূর হইয়া গেছে। এ কথা নিশ্চিত সত্য যে য়ুরোপে লোকশিক্ষা আপাতত অগভীর হইলেও তাহা যদি ব্যাপ্ত না হইত তবে আজ সেখানে লোকসাধারণ নামক যে সত্তা আপনার শক্তির গৌরবে জাগিয়া উঠিয়া আপন প্রাপ্য দাবি করিতেছে তাহাকে দেখা যাইত না। তাহা হইলে যে গরিব সে ক্ষণে ক্ষণে ধনীর প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইত, যে ভৃত্য সে মনিবের পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকিত এবং যে মজুর সে মহাজনের লাভের উচ্ছিষ্টকণা মাত্র খাইয়া ক্ষুধাদগ্ধ পেটের একটা কোণমাত্র ভরাইত।

লোকহিতৈষীরা বলিবেন, আমরা তো সেই কাজেই লাগিয়াছি— আমরা তো নাইট স্কুল খুলিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনো সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আমরা ভদ্রলোকেরা যে শিক্ষা লাভ করিতেছি সেটাতে আমাদের অধিকার আছে বলিয়া আমরা অভিমান করি— সেটা আমাদিগকে দান করা অনুগ্রহ করা নয়, কিন্তু সেটা হইতে বঞ্চিত করা আমাদের প্রতি অন্যায় করা। এইজন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো খর্বতা ঘটিলে আমরা উত্তেজিত হইয়া উঠি। আমরা মাথা তুলিয়া শিক্ষা দাবি করি। সেই দাবি ঠিক গায়ের জোরের নহে, তাহা ধর্মের জোরের। কিন্তু লোকসাধারণেরও সেই জোরের দাবি আছে; যতদিন তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না হইতেছে ততদিন তাহাদের প্রতি অন্যায় জমা হইয়া উঠিতেছে এবং সেই অন্যায়ের ফল আমরা প্রত্যেকে ভোগ করিতেছি এ কথা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বীকার না করিব ততক্ষণ দয়া করিয়া তাহাদের জন্য এক-আধটা নাইট স্কুল খুলিয়া কিছুই হইবে না। সকলের গোড়ায় দরকার লোকসাধারণকে লোক বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করা।

কিন্তু সমস্যাটা এই যে, দয়া করিয়া গণ্য করাটা টেঁকে না। তাহারা শক্তি লাভ করিয়া যেদিন গণ্য করাইবে সেইদিনই সমস্যার মীমাংসা হইবে। সেই শক্তি যে তাহাদের নাই তাহার কারণ তাহারা অজ্ঞতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি তাহাদের মনের রাস্তা তাহাদের যোগের রাস্তা খুলিয়া না দেয়

তবে দয়ালু লোকের নাইট স্কুল খোলা অশ্রুবর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ নিবারণের চেষ্টার মতো হইবে। কারণ, এই লিখিতে পড়িতে শেখা তখনই যথার্থ ভাবে কাজে লাগিবে যখন তাহা দেশের মধ্যে সর্বব্যাপী হইবে। সোনার আঙটি কড়ে আঙুলের মাপে হইলেও চলে কিন্তু একটা কাপড় সেই মাপের হইলে তাহা ঠাট্টার পক্ষেও নেহাত ছোটো হয়— দেহটাকে এক-আবরণে আবৃত করিতে পারিলেই তবে তাহা কাজে দেখে। সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখা দুই-চারজনের মধ্যে বদ্ধ হইলে তাহা দামি জিনিস হয় না, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইলে তাহা দেশের লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি শক্তির সঙ্গে শক্তির বোঝাপড়া হইলে তবেই সেটা সত্যকার কারবার হয়। এই সত্যকার কারবারে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। য়ুরোপে শ্রমজীবীরা যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার বণিকরা জবাবদিহির দায়ে পড়িয়াছে। ইহাতেই দুই পক্ষের সম্বন্ধ সত্য হইয়া উঠিবে— অর্থাৎ যেটা বরাবর সহিবে সেইটেই দাঁড়াইয়া যাইবে, সেইটেই উভয়েরই পক্ষে কল্যাণের। স্ত্রীলোককে সাধ্বী রাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে— তাই স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের কোনো জবাবদিহি নাই— ইহাতেই স্ত্রীলোকের সহিত সম্বন্ধে পুরুষ সম্পূর্ণ কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; স্ত্রীলোকের চেয়ে ইহাতে পুরুষের ক্ষতি অনেক বেশি। কারণ দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহার করার মতো এমন দুর্গতিকর আর-কিছুই নাই। আমাদের সমাজ লোকসাধারণকে যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে এইখানেই সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে। পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নির্ভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে— এইখানেই মানুষের পতন।

আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজপুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে, ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে। আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি, প্রজাকে অনায়াসে অতিষ্ঠ করিতে পারি, গরিব মূর্খকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি; নিম্নতনদের সহিত ন্যায়ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার 'পরে নির্ভর করে, অপর পক্ষের শক্তির 'পরে নহে, এই নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা। সেই শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে— সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো।

ভাদ্র ১৩২১

লড়াইয়ের মূল

অগ্রহায়ণের সবুজপত্রে সম্পাদক বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহা পাকা কথা, সুতরাং তাহাতে শাঁসও আছে রসও আছে। ইহার উপরে আর-বেশি কিছু বলিবার দরকার নাই— সেই ভরসাতেই লিখিতে বসিলাম।

সম্পাদক বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, এবারকার যে লড়াই তাহা সৈনিকে বণিকে লড়াই, ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে। পৃথিবীতে চিরকালই পুণ্যজীবীর 'পরে অস্ত্রধারীর একটা স্বাভাবিক অবজ্ঞা আছে— বৈশ্যের কর্তৃত্ব ক্ষত্রিয় সহিতে পারে না। তাই জর্মনি আপন ক্ষত্রতেজের দর্পে ভারি একটা অবজ্ঞার সহিত এই লড়াই করিতে লাগিয়াছে।

য়ুরোপে যে চার বর্ণ আছে তার মধ্যে ব্রাহ্মণটি তাঁর যজন-যাজন ছাড়িয়া দিয়া প্রায় সরিয়া পড়িয়াছেন। যে খৃস্টসংঘ বর্তমান য়ুরোপের শিশু বয়সে উঁচু চৌকিতে বসিয়া বেত হাতে গুরুমহাশয়গিরি করিয়াছে আজ সে তার বয়ঃপ্রাপ্ত শিষ্যের দেউড়ির কাছে বসিয়া থাকে— সাবেক কালের খাতিরে কিছু তার বরাদ্দ বাঁধা আছে কিন্তু তার সেই চৌকিও নাই, তার সেই বেতগাছটাও

নাই। এখন তাহাকে এই শিষ্যটির মন জোগাইয়া চলিতে হয়। তাই যুদ্ধে বিগ্রহে, পরজাতির সহিত ব্যবহারে, য়ুরোপ যত-কিছু অন্যায় করিয়াছে খৃস্টসংঘ তাহাতে আপত্তি করে নাই বরঞ্চ ধর্মকথার ফোড়ঙ দিয়া তাহাকে উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে।

এ দিকে ক্ষত্রিয়ের তলোয়ার প্রায় বেবাক গলাইয়া ফেলিয়া লাঙলের ফলা তৈরি হইল। তাই ক্ষত্রিয়ের দল বেকার বসিয়া বৃথা গোঁফে চাড়া দিতেছে। তাহারা শেঠজির মালখানার দ্বারে দরোয়ানগিরি করিতেছে মাত্র। বৈশ্যই সব চেয়ে মাথা তুলিয়া উঠিল।

এখন সেই ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে "অদ্য যুদ্ধ ত্বয়া ময়া"। দ্বাপর যুগে আমাদের হলধর বলরামদাদা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দেন নাই। কলিযুগে তাঁর পরিপূর্ণ মদের ভাঁড়টিতে হাত পড়িবা মাত্র তিনি হুংকার দিয়া ছুটিয়াছেন। এবারকার কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রধান সর্দার কৃষ্ণ নহেন, বলরাম। রক্তপাতে তাঁর রুচি নাই— রজতফেনোচ্ছল মদের ঢোঁক গিলিয়া এতকাল ধরিয়া তাঁর নেশা কেবলই চড়িয়া উঠিতেছিল; এবারকার এই আচম্‌কা উৎপাতে সেই নেশা কিছু ছুটিতে পারে কিন্তু আবার সময়কালে দ্বিগুণ বেগে মৌতাত জমিবে সে আশঙ্কা আছে।

ইহার পরে আর-একটা লড়াই সামনে রহিল, সে বৈশ্যে শূদ্রে, মহাজনে মজুরে— কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্তমান মনুর পালা শেষ হইয়া নূতন মন্বন্তর পড়িবে।

বণিকে সৈনিকে লড়াই তো বাধিল কিন্তু এই লড়াইয়ের মূল কোথায় সেটা জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়। সাবেক-কালের ইতিহাসে দেখা যায় যারা কারবারী তারা রাজশক্তির আশ্রয় পাইয়াছে, কখনো-বা প্রশ্রয় পাইয়াছে, কখনো-বা অত্যাচার ও অপমান সহিয়াছে কিন্তু লড়াইয়ের আসরে তাহাদিগকে নামিতে হয় নাই। সেকালে ধন এবং মান স্বতন্ত্র ছিল, কাজেই ব্যবসায়ীকে তখন কেহ খাতির করিত না, বরঞ্চ অবজ্ঞাই করিত।

কেননা জিনিস লইয়া মানুষের মূল্য নহে, মানুষ লইয়াই মানুষের মূল্য। তাই যে কালে ক্ষত্রিয়েরা ছিল গণপতি এবং বৈশ্যেরা ছিল ধনপতি তখন তাহাদের মধ্যে ঝগড়া ছিল না।

তখন ঝগড়া ছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে। কেননা তখন ব্রাহ্মণ তো কেবলমাত্র যজন-যাজন অধ্যয়ন-অধ্যাপন লইয়া ছিল না— মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। তাই ক্ষত্রিয়-প্রভু ও ব্রহ্মণ-প্রভুতে সর্বদাই ঠেলাঠেলি চলিত; বশিষ্ঠে বিশ্বামিত্রে আপস করিয়া থাকা শক্ত। য়ুরোপেও রাজায় পোপে বাঁও-কষাকষির অন্ত ছিল না।

কারবার জিনিসটা দেনাপাওনার জিনিস; তাহাতে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই উভয়ের মন রাখিবার গরজ আছে। প্রভুত্ব জিনিসটা ঠিক তার উলটা, তাহাতে গরজ কেবল এক পক্ষের। তাহাতে এক পক্ষ বোঝা হইয়া চাপিয়া বসে, অন্য পক্ষই তাহা বহন করে।

প্রভুত্ব জিনিসটা একটা ভার, মানুষের সহজ চলাচলের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বাধা। এইজন্য প্রভুত্বই যত-কিছু বড়ো বড়ো লড়াইয়ের মূল। বোঝা নামাইয়া ফেলিতে যদি না পারি অন্তত বোঝা সরাইতে না পারিলে বাঁচি না। পালকির বেহারা তাই বার বার কাঁধ বদল করে। মানুষের সমাজকেও এই প্রভুত্বের বোঝা লইয়া বার বার কাঁধ বদল করিতে হয়— কেননা তাহা তাহাকে বাহির হইতে চাপ দেয়। বোঝা অচল হইয়া থাকিতে চায় বলিয়াই মানুষের প্রাণশক্তি তাহাকে সচল করিয়া তোলে। এইজন্যই লক্ষ্মী চঞ্চলা। লক্ষ্মী যদি অচঞ্চল হইতেন তবে মানুষ বাঁচিত না।

ইতিপূর্বে মানুষের উপর প্রভুত্বচেষ্টা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের মধ্যেই বদ্ধ ছিল— এই কারণে তখনকার যত-কিছু শস্ত্রের ও শাস্ত্রের লড়াই তাহাদিগকে লইয়া। কারবারীরা হাটে মাঠে গোঠে ঘাটে ফিরিয়া বেড়াইত, লড়াইয়ের ধার ধারিত না।

সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।

এক সময়ে জিনিসই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাবেক-কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত কী তাহা বুঝিয়া দেখা যাক। সে আমলে যেখানে

রাজত্ব রাজাও সেইখানেই— জমাখরচ সব এক জায়গাতেই।

কিন্তু এখন বাণিজ্যপ্রবাহের মতো রাজত্বপ্রবাহেরও দিনরাত আমদানি রফতানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে— তাহা এক দেশের উপর আর-এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।

এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর-কখনো ছিল না।

য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।

এখন মুশকিল হইয়াছে জর্মনির। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষবেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট, মাছেরও গন্ধ পাইতেছে অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড়ো কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তার শরীর গস্‌গস্‌ করিতেছে। সে বলিতেছে আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে আমি নিমন্ত্রণপত্রের অপেক্ষা করিব না। আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া লইব।

এক সময় ছিল যখন কাড়িয়া-কুড়িয়া লইবার বেলায় ধর্মের দোহাই পাড়িবার কোনো দরকার ছিল না। এখন তার দরকার হইয়াছে। জর্মনির নীতিপ্রচারক পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, যারা দুর্বল, ধর্মের দোহাই তাদেরই দরকার ; যার প্রবল তাদের ধর্মের প্রয়োজন নাই, নিজের গায়ের জোরই যথেষ্ট।

আজ ক্ষুধিত জর্মনির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে— যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।

য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে নাই। আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে। কিন্তু জর্মন-পণ্ডিত যে তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মতো জর্মনিকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জর্মন-পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।

পৌষ ১৩২১

ছোটো ও বড়ো

যে সময়ে দেশের লোক তৃষিত চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত, যে সময়ে রাষ্ট্রীয় আবহাওয়ার পর্যবেক্ষকেরা খবর দিলেন যে, হোমরুলের প্রবল মৈসুম-হাওয়া আরব-সমুদ্র পাড়ি দিয়াছে, মুষলধারে বৃষ্টি নামিল বলিয়া ; ঠিক সেই সময়েই মুষলধারে নামিল বেহার অঞ্চলে মুসলমানের প্রতি হিন্দুদের একটা হাঙ্গামা।

অন্য দেশেও সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষ লইয়া মাঝে মাঝে তুমুল দ্বন্দ্বের কথা শুনি। আমাদের দেশে যে বিরোধ বাধে সে ধর্ম লইয়া, যদিচ আমরা মুখে সর্বদাই বড়াই করিয়া থাকি যে, ধর্মবিষয়ে হিন্দুর উদারতার তুলনা জগতে কোথাও নাই। বর্তমানকালে পশ্চিম মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে বিরোধ বাধে তাহা অর্থ লইয়া। সেখানে খনির শ্রমিকেরা, সেখানে ডক ও রেলোয়ের কর্মিকেরা মাঝে মাঝে হুলস্থূল বাধাইয়া তোলে ; তাহা লইয়া আইন করিতে হয়, ফৌজ ডাকিতে হয়, আইন বন্ধ করিতে হয়, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। সে-দেশে এইরূপ বিরোধের সময় দুই পক্ষ থাকে। এক পক্ষ উৎপাত করে, আর-এক পক্ষ উৎপাত নিবারণের উপায় চিন্তা করে। ব্যঙ্গপ্রিয় কোনো তৃতীয় পক্ষ সেখানে বাহির হইতে দুয়ো দেয় না। কিন্তু আমাদের দুঃখের বাসরঘরে শুধু যে বর ও কনের দ্বৈততত্ত্ব তাহা নহে, তৃতীয় একটি কুটুম্বিনী আছেন, অট্টহাস্য এবং কানমলার কাজে তিনি প্রস্তুত।

ইংলন্ডে এক সময় ছিল, যখন এক দিকে তার রাষ্ট্রযন্ত্রটা পাকা হইয়া উঠিতেছে এমন সময়েই প্রটেস্ট্যান্ট্ ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সেই দ্বন্দ্বে দুই সম্প্রদায় যে পরস্পরের প্রতি বরাবর সুবিচার করিয়াছে তাহা নহে। এমনকি, বহুকাল পর্যন্ত ক্যাথলিকরা বহু অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াই কাটাইয়াছে। আজও কোনো বিশেষ একটি সাম্প্রদায়িক চার্চের ব্যয়ভার ইংলন্ডের সমস্ত লোককে বহন করিতে হইতেছে, সে-দেশের অন্য সম্প্রদায়গুলির প্রতি ইহা অন্যায়। অশান্তি ও অসাম্যের এই বাহ্যিক ও মানসিক কারণগুলি আজ ইংলন্ডে নিরুপদ্রব হইয়া উঠিয়াছে কেন। যেহেতু সেখানে সমস্ত দেশের লোকে মিলিয়া একটি আপন শাসনতন্ত্র পাইয়াছে। এই শাসনভার যদি সম্পূর্ণ বিদেশীর 'পরে থাকিত তবে যেখানে জোড়া মেলে নাই সেখানে ক্রমাগত ঠোকাঠুকি বাধিয়া বিচ্ছেদ স্থায়ী হইত। একদিন ব্রিটিশ পলিটিক্সে স্কটলন্ড ও ইংলন্ডের বিরোধ কম তীব্র ছিল না। কেননা উভয় জাতির মধ্যে ভাষা ভাব রুচি প্রথা ও ঐতিহাসিক স্মৃতিধারার সত্যকারই পার্থক্য ছিল। দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই দ্বন্দ্ব ক্রমে ঘুচিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব ঘুচিবার প্রধান কারণ এই যে, ইংরেজ ও স্কচ উভয়েই একটা শাসনতন্ত্র পাইয়াছে যাহা উভয়েরই স্বাধিকারে ; যাহাতে সম্পদে ও বিপদে উভয়েরই শক্তি সমান কাজ করিতেছে। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, আজ ইংলন্ডে স্কটিশ চার্চে ও ইংলিশ চার্চে প্রভেদ থাকিলেও, রোমান ক্যাথলিকে প্রটেস্ট্যান্টে অনৈক্য ঘটিলেও, রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে শক্তির ঐক্যে মঙ্গলসাধনের যোগে তাহাদের মিলন ঘটিয়াছে। ইহাদের মাথার উপর একটি তৃতীয় পক্ষ যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া আপন ইচ্ছামত ইহাদিগকে চালনা করিত, তাহা হইলে কোনোকালেই কি ইহাদের জোড় মিলিত। আয়র্লন্ডের সঙ্গে আজ পর্যন্ত ভালো করিয়া জোড় মেলে নাই কেন। অনেকদিন পর্যন্তই আয়র্লন্ডের সঙ্গে ইংলন্ডের রাষ্ট্রীয় অধিকারের সাম্য ছিল না বলিয়া।

এ কথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেইখানেই শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয়, এমন আর-কিছুই না। এই 'ডগমা' অর্থাৎ শাস্ত্রমতকে বাহির হইতে পালন-করা লইয়া য়ুরোপের ইতিহাস কতবার রক্তে লাল হইয়াছে। অহিংসাকে যদি ধর্ম বলো, তবে সেটাকে কর্মক্ষেত্রে দুঃসাধ্য বলিয়া ব্যবহারে না মানিতে পারি, কিন্তু বিশুদ্ধ আইডিয়ালের ক্ষেত্রে তাহাকে স্বীকার করিয়া ক্রমে সে দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা যায় এবং সেইটে জোর করিয়া যদি অন্য ধর্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনোকালেই মিটিতে পারে না। নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর-কোনো নাম দেওয়া যায় না। আমাদের আশা এই যে, চিরদিন আমাদের ধর্ম আচারপ্রধান হইয়া থাকিবে না। আরো-একটি আশা আছে, একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশহিতসাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল যদি আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে বাস্তব হইয়া উঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য তুচ্ছ হইয়া যাইবে।

অল্পদিন হইল, রেলগাড়িতে আমার এক ইংরেজ সঙ্গী জুটিয়াছিল। তিনি বেহার অঞ্চলের হাঙ্গামার প্রসঙ্গে গল্প করিলেন— সাহাবাদে কিংবা কোনো একটা জায়গায় ইংরেজ কাপ্তেন সেখানকার এক জমিদারকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার রায়তদের তোমরা তো ঠেকাইতে পারিলে না। তোমরাই আবার হোমরুল চাও!" জমিদার কী জবাব করিলেন শুনি নাই। সম্ভবত তিনি লম্বা সেলাম করিয়া বলিয়াছিলেন, "না সাহেব, আমরা হোমরুল চাই না, আমরা অযোগ্য অধম। আপাতত আমার রায়তদের তুমি ঠেকাও।" বেচারা জানিতেন হোমরুল তখন সমুদ্রপারের স্বপ্নলোকে, কাপ্তেন ঠিক সম্মুখেই, আর হাঙ্গামাটা কাঁধের উপর চড়িয়া বসিয়াছে।

আমি বলিলাম, "হিন্দু-মুসলমানের এই দাঙ্গাটা হোমরুলের অধীনে তো ঘটে নাই। নিরস্ত্র জমিদারটি অক্ষমতার অপবাদে বোধ করি একবার সেনাপতি-সাহেবের ফৌজের দিকে নীরবে

তাকাইয়াছিলেন। উপায় রহিল একজনের হাতে আর প্রতিকার করিবে আর-একজনে, এমনতরো শ্রমবিভাগের কথা আমরা কোথাও শুনি নাই। বাংলাদেশেও ঠিক স্বদেশী উত্তেজনার সময়, শুধু জামালপুরের মতো মফস্বলে নয়, একেবারে কলিকাতার বড়োবাজারে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের উপদ্রব প্রচণ্ড হইয়াছিল— সেটা তো শাসনের কলঙ্ক, শুধু শাসিতের নয়। এইরূপ কাণ্ড যদি সদাসর্বদা নিজামের হাইদ্রাবাদে বা জয়পুর বরোদা মৈশুরে ঘটিতে থাকিত তবে সেনাপতি-সাহেবের জবাব খুঁজিবার জন্য আমাদের ভাবিতে হইত।"

আমাদের নালিশটাই যে এই। কর্তৃত্বের দায়িত্ব আমাদের হাতে নাই, কর্তা বাহির হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে। ইহাতে আমরা ক্রমশই অন্তরের মধ্যে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইতেছি ; সেজন্য উলটিয়া কর্তারাই আমাদিগকে অবজ্ঞা করিলে ভয়ে ভয়ে আমরা জবাব দিই না বটে, কিন্তু মনে মনে যে-ভাষা প্রয়োগ করি তাহা সাধু নহে। কর্তৃত্ব যদি থাকিত তবে তাহাকে বজায় রাখিতে ও সার্থক করিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সমান গরজ থাকিত, সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার দায়িত্ব সকলে মিলিয়া অতি সাবধানে বহন করিতে হইত। এমনি করিয়া শুধু আজ নহে চিরদিনের মতো ভারতবর্ষের পোলিটিকাল আশ্রয় নিজের ভিত্তিতে পাকা হইত। কিন্তু এমন যদি হয় যে, একদিন ভারত-ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-পরিবর্তনকালে প্রস্থানের বেলায় ইংরেজ তার সুশাসনের ভগ্নাবশেষের উপর রাখিয়া গেল আত্মনির্ভরে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম, আত্মকল্যাণসাধনে অসিদ্ধ, আত্মশক্তিতে নষ্টবিশ্বাস বহুকোটি নরনারীকে— রাখিয়া গেল এমন ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিবেশী নব উদ্যমে জাগ্রত, নব শিক্ষায় অপরিমিত শক্তিশালী, তবে আমাদের সেই চিরদৈন্যপীড়িত অন্তহীন দুর্ভাগ্যের জন্য কাহাকে আমরা দায়ী করিব। আর যদি কল্পনাই করা যায় যে, মানবের পরিবর্তনশীল ইতিহাসের মাঝখানে একমাত্র ভারতে ইংরেজসাম্রাজ্যের ইতিহাসই ধ্রুব হইয়া অনন্ত ভবিষ্যৎকে সদর্পে অধিকার করিয়া থাকিবে, তবে এই কি আমাদের ললাটের লিখন যে, ভারতের অধিবাসীরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দেশের কল্যাণকর্মবন্ধনের কোনো যোগ থাকিবে না ; চিরদিনের মতোই তাহাদের আশা ক্ষুদ্র, তাহাদের শক্তি অবরুদ্ধ, তাহাদের ক্ষেত্র সংকীর্ণ, তাহাদের ভবিষ্যৎ পরের ইচ্ছার পাষাণ-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ?

এ পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্বে আমরা এক-শাসন পাইয়াছি কিন্তু এক-দায়িত্ব পাই নাই। তাই আমাদের ঐক্য বাহিরের। এ ঐক্যে আমরা মিলি না, পাশে পাশে সাজানো থাকি, বাহিরে বা ভিতরে একটু ধাক্কা পাইলেই ঠোকাঠুকি বাধিয়া যায়। এ ঐক্য জড় অকর্মক, ইহা সজীব সকর্মক নয়। ইহা ঘুমন্ত মানুষের এক মাটিতে শুইয়া থাকিবার ঐক্য, ইহা সজাগ মানুষের এক পথে চলিবার ঐক্য নহে। ইহাতে আমাদের গৌরব করিবার কিছু নাই ; সুতরাং ইহা আনন্দ করিবার নহে ; ইহাতে কেবল স্তুতি করিতে পারি, নতি করিতে পারি, উন্নতি করিতে পারি না।

একদিন আমাদের দেশে যে সমাজ ছিল তাহা সাধারণের প্রতি আমাদের দায়িত্বের আদর্শকে সচেষ্ট রাখিয়াছিল। সেই দায়িত্বের ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ, তখন আমাদের জন্মগ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বলিয়া জানিতাম। তা হউক, সেই ছোটো সীমার মধ্যে ধনীর দায়িত্ব ছিল তার ধন লইয়া, জ্ঞানীর দায়িত্ব ছিল তার জ্ঞান লইয়া। যার যা শক্তি ছিল তার উপরে চারি দিকের দাবি ছিল। সচেষ্ট জীবনের এই যে নানা দিকে বিস্তার, ইহাতেই মানুষের যথার্থ আনন্দ ও গৌরব।

আমাদের সেই দায়িত্ব সমাজ হইতে বাহিরে সরিয়া গেছে। একমাত্র সরকারবাহাদুরই আমাদের বিচার করেন, রক্ষা করেন, পাহারা দেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, শাস্তি দেন, সম্মান দেন, সমাজে কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু আদালত হইতে তার বিধান দেন, মদের ভাঁটির বন্দোবস্ত করেন এবং গ্রামের লোককে বাঘে ধরিয়া খাইতে থাকিলে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে সবান্ধবে শিকার করিবার সুযোগ দিয়া থাকেন। সুতরাং এখন আমাদের সমাজ আমাদের উপর যে পরিমাণে ভার চাপাইয়াছে সে-পরিমাণে ভার বহিতেছে না। ব্রাহ্মণ এখনো দক্ষিণা আদায় করেন কিন্তু শিক্ষা দেন না, ভূস্বামী খাজনা শুষিয়া লন কিন্তু তাঁর কোনো দায় নাই, ভদ্রসম্প্রদায় জনসাধারণের কাছ হইতে সম্মান লন

কিন্তু জনসাধারণকে আশ্রয় দেন না। ক্রিয়াকর্মে খরচপত্র বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই, অথচ সেই বিপুল অর্থব্যয়ে সমাজ-ব্যবস্থাকে ধারণ ও পোষণের জন্য নয়, তাহা রীতিরক্ষা ও সমারোহ করিবার জন্য। ইহাতে দেশের ধনীদরিদ্র সকলেই পীড়া বোধ করে। এ দিকে দলাদলি, জাতে ঠেলাঠেলি, পুঁথির বিধান বেচাকেনা প্রভৃতি সমস্ত উৎপীড়নই আছে। যে-গাভীর বাঁধা খোরাক জোগাইতেছি সে দুধ দেওয়া প্রায় বন্ধ করিল, কিন্তু বাঁকা শিঙের গুঁতা মারাটা তার কমে নাই।

যে-ব্যবস্থা সমাজের ভিতরে ছিল সেটা বাহিরে আসিয়া পড়াতে সুব্যবস্থা হইল কি না সেটা লইয়া তর্ক নয়। মানুষ যদি কতকগুলা পাথরের টুকরা হইত তবে তাহাকে কেমন করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে সাজাইয়া কাজে লাগানো যায় সেইটেই সব চেয়ে বড়ো কথা হইত। কিন্তু মানুষ যে মানুষ। তাকে বাঁচিতে হইবে, বাড়িতে হইবে, চলিতে হইবে। তাই এ কথাটা মানিতেই হইবে যে, দেশের সম্বন্ধে দেশের লোকের চেষ্টাকে নিরুদ্ধ করিয়া যে নিরানন্দের জড়ভার দেশের বুকে চাপিয়া বসিতেছে সেটা শুধু যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, সেটা রাষ্ট্রনীতি হিসাবে নিন্দনীয়। আমরা যে-অধিকার চাহিতেছি তাহা ঔদ্ধত্য করিবার বা প্রভুত্ব করিবার অধিকার নহে; আমরা সকল ক্ষুধাতুরকে ঠেকাইয়া জগৎসংসারটাকে একলা দুহিয়া লইবার জন্য লম্বা লাঠি কাঁধে লইতে চাই না; যুদ্ধে নরঘাত সম্বন্ধে বিশ্বের সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি, বড়ো উদ্যোগ ও বড়ো উৎসাহ রাখি বলিয়া শয়তানকে লজ্জা দিবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই; নিরীহ হিন্দু বলিয়া প্রবল পশ্চিম আমাদের উপরে যে-শ্লেষ প্রয়োগ করে তাহাকেই তিলক করিয়া আমাদের ললাটকে আমরা লাঞ্ছিত রাখিব; আধ্যাত্মিক বলিয়া আমাদের আধুনিক শাসনকর্তারা আমাদের 'পরে যে কটাক্ষবর্ষণ করিয়াছেন তারই শরশয্যায় শেষ পর্যন্ত শয়ান থাকিতে আমরা দুঃখ বোধ করিব না— আমরা কেবলমাত্র আপন দেশের সেবা করিবার, তার দায়িত্বগ্রহণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার চাই। এই অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আশাহীন অকর্মণ্যতার দুঃখ ভিতরে ভিতরে অসহ্য হইয়াছে। এইজন্যই সম্প্রতি জনসেবার জন্য আমাদের যুবকদের মধ্যে একটা প্রবল আগ্রহ দেখিতে পাই। নিরাপদ শান্তির আওতায় মানুষ বাঁচে না। কেননা যেটা মানুষের অন্তরতম আবেগ তাহা বাড়িয়া চলিবার আবেগ। মহৎ লক্ষ্যের প্রতি আত্মোৎসর্গ করিয়া দুঃখ স্বীকার করাই সেই বাড়িয়া চলিবার গতি। সকল বড়ো জাতির ইতিহাসেই এই গতির দুর্নিবার আবেগ ব্যর্থতা ও সার্থক্যের উপলবন্ধুর পথে গর্জিয়া ফেনাইয়া, বাধা ভাঙিয়া চুরিয়া, ঝরিয়া পড়িতেছে। ইতিহাসের সেই মহৎ দৃশ্য আমাদের মতো পোলিটিকাল পঙ্গুদের কাছ হইতেও আড়াল করিয়া রাখা অসম্ভব। এইজন্য যে-সব যুবকের প্রকৃতিতে প্রাণের স্বাভাবিক উত্তেজনা আছে, মহতের উপদেশ ও ইতিহাসের শিক্ষা হইতে প্রেরণা লাভ করা সত্ত্বেও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা তাদের কাছে যে মৃত্যুর চেয়ে দারুণতর, সে কথা আত্মহত্যাকালে শচীন্দ্র দাশগুপ্তের মর্মান্তিক বেদনার পত্রখানি পড়িলেই বুঝা যাইবে। কিন্তু কেবল ক্ষণে ক্ষণে বন্যাদুর্ভিক্ষের নৈমিত্তিক উপলক্ষে অন্তরগূঢ় সমস্ত শুভচেষ্টা নির্মুক্ত হইতে পারে না। দেশব্যাপী নিত্যকর্মের মধ্যেই মানুষের বিচিত্রশক্তি বিচিত্রভাবে সফল হয়। নতুবা তার অধিকাংশই বদ্ধ হইয়া আন্তরিক নৈরাশ্যের উত্তাপে বিকৃত হইতে থাকে। এই বিকার হইতে দেশে নানা গোপন উপদ্রবের সৃষ্টি। এইজন্য দেখা যায় দেশের ধর্মবুদ্ধি ও শুভচেষ্টার প্রতিই কর্তৃপক্ষের সন্দেহ সুতীব্র। যে-লোক স্বার্থপর বেইমান, যে-উদাসীন নিশ্চেষ্ট, বর্তমানের গুপ্ত ব্যবস্থায় তারই জীবনযাত্রা সকলের চেয়ে নিরাপদ, তারই উন্নতি ও পুরস্কারের পথে সকলের চেয়ে বাধা অল্প। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার জবাবদিহি ভয়ংকর হইয়াছে। কেননা সন্দিগ্ধের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন যে, মহৎ অধ্যবসায়ে তোমার দরকার কী। তুমি খাইয়া-দাইয়া বিয়া-থাওয়া করিয়া আপিসে আদালতে ঘুরিয়া মোটা বা সরু মাহিনায় যখন স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পার, তখন ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইতে যাও কেন। বস্তুত কর্তৃপক্ষ জানেন, এই আলো এবং ঐ ধোঁয়া একই কারণ হইতে উঠিতেছে। সে কারণটা, নিষ্ক্রিয়তার অবসাদ হইতে দেশের শুভবুদ্ধির মুক্ত হইবার চেষ্টা। যুক্তিশাস্ত্রে বলে, পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। গুপ্তচরের যুক্তি বলে, পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ। কিন্তু যাই বলুক আর যাই করুক, মাটির তলায় ঐ যে দারুণ সুড়ঙ্গপথ খোলা হইল, যেখানে আলো নাই, শব্দ নাই, বিচার নাই,

নিষ্কৃতির কোনো বৈধ উপায় নাই, এইটেই কি সুপথ হইল। দেশের ব্যাকুল চেষ্টাকে বিনা বাছনিতে একদমে কবরস্থ করিলে তার প্রেতের উৎপাতকে কি কোনোদিন শান্ত করিতে পারিবে। ক্ষুধার ছটফটানিকে বাহির হইতে কানমলা দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া চিরদুর্ভিক্ষকে ভদ্র আকার দান করাই যে যথার্থ ভদ্রনীতি এমন কথা তো বলিতে পারিই না, তাহা যে বিজ্ঞনীতি তাহাও বলা যায় না।

এইরকম চোরা-উৎপাতের সময় সমুদ্রের ওপার হইতে খবর আসিল, আমাদিগকে দান করিবার জন্য স্বাধীন শাসনের একটা খসড়া তৈরি হইতেছে। মনে ভাবিলাম কর্তৃপক্ষ বুঝিয়াছেন যে, শুধু দমনের বিভীষিকায় অশান্তি দূর হয় না, দাক্ষিণ্যেরও দরকার। দেশ আমার দেশ, সে তো কেবল এখানে জন্মিয়াছি বলিয়াই নয়, এ দেশের ইতিহাসসৃষ্টি-ব্যাপারে আমার তপস্যার উপরে সমস্ত দেশের দাবি আছে বলিয়াই এ দেশ আমার দেশ, এই গভীর মহত্ত্ববোধ যদি দেশের লোক অনুভব করিবার উৎসাহ পায় তবেই এ দেশে ইংরেজ-রাজত্বের ইতিহাস গৌরবান্বিত হইবে। কালক্রমে বাহিরে সে ইতিহাসের অবসান ঘটিলেও অন্তরে তাহার মহিমা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তা ছাড়া নিরতিশয় দুর্বলেরও প্রতিকূলতা নৌকার ক্ষুদ্রতম ছিদ্রের মতো। শান্তির সময় নিরন্তর জল সেঁচিয়া সেই ফাটা নৌকা বাওয়া যায়, কিন্তু তুফানের সময় যখন সকল হাতই দাঁড়ে হালে পালে আটক থাকে তখন তলার অতিতুচ্ছ ফাটলগুলিই মুশকিল বাধায়। রাগ করিয়া তার উপরে পুলিসের রেগুলেশন বা নন্‌-রেগুলেশন লাঠি ঠুকিলে ফাটল কেবল বাড়িতেই থাকে। ফাঁকগুলিকে বুজাইবার জন্য সময়-মত সামান্যখরচ করিলে কালক্রমে অসামান্য খরচ বাঁচে। এই কথা যে ইংলণ্ডের মনীষী রাষ্ট্রনৈতিকেরা বুঝিতেছেন না তাহা আমি মনে করি না। বুঝিতেছেন বলিয়াই হোমরুলের কথাটা উঠিয়াছে।

কিন্তু রিপু অন্ধ ; সে উপস্থিত কালকেই বড়ো করিয়া দেখে, অনাগতকে উপেক্ষা করে। ধর্মের দোহাইকে সে দুর্বলতা এবং শৌখিন ভাবুকতা বলিয়া অবজ্ঞা করে। অভাবনীয় প্রত্যাশার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ইংরেজের এই রিপুর কথাটাকে ভারতবর্ষ সামান্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল। যে-সমস্ত ইংরেজ এ দেশে রাজসেরেস্তার আমল বা পণ্যজীবী, তাহারা ভারতবর্ষের অত্যন্ত বেশি নিকটে আছে। এই নিকটের দৃশ্যের মধ্যে তাদেরই প্রতাপ, তাদেরই ধনসঞ্চয় সব চেয়ে সমুচ্চ, আর ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি মানুষ তাদের সমস্ত সুখদুঃখ লইয়া ছায়ার মতো অস্পষ্ট অবাস্তব ও ম্লান। এই কাছের ওজনে, এই উপস্থিত কালের মাপে ভারতবর্ষের দাবি ইহাদের কাছে তুচ্ছ। তাই যে-কোনো বরলাভের প্রভাবে ভারতবর্ষ কিছুমাত্র আত্মশক্তি লাভ করিবে তাহা ক্ষীণ হইয়া, খণ্ডিত হইয়া, রক্তশূন্য হইয়া আমাদের কাছে পৌঁছিবে অথবা অর্ধপথে অপঘাতমৃত্যুতে মরিয়া ভারতভাগ্যের মরুপথকে ব্যর্থ সাধুসংকল্পের কঙ্কালে আকীর্ণ করিবে।

এই বাধা দিবার শক্তি যারা বহন করিতেছে অব্যাহত প্রতাপের মদের নেশায় তারা মাতোয়ারা, কঠিন স্বাজাত্যভিমানের স্তরসঞ্চিত আবরণে তাহাদের মন ভারতবর্ষের মানুষ-সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন। ভারতবর্ষ ইহাদের কাছে একটা অতি প্রকাণ্ড সরকারি বা সওদাগরি আপিস। এ দিকে ইংলণ্ডের যে-ইংরেজ আমাদের ভাগ্যনায়ক তার রক্তের সঙ্গে ইহাদের রক্তের মিল, তার হাতের উপরে ইহাদের হাত, তার কানের কাছে ইহাদের মুখ, তার মন্ত্রণাগৃহে ইহাদের আসন, তার পোলিটিকাল নাট্যশালার নেপথ্যবিধান-গৃহে ইহাদের গতিবিধি। ভারতবর্ষ হইতে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে হইতে ইংলণ্ডের ইংরেজ-সমাজের পরতে পরতে ইহারা মিশিয়াছে ; সেখানকার ইংরেজের মনস্তত্ত্বকে ইহারা গড়িয়া তুলিতেছে। ইহারা নিজের পক্ককেশের শপথ করে, অভিজ্ঞতার দোহাই পাড়ে এবং 'আমরাই ভারতসাম্রাজ্যের শিখরচূড়াকে অপরিমিত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছি' এই বলিয়া ইহারা অপরিমিত প্রশ্রয় দাবি করে। এই অভ্রভেদী অভিমানের ছায়ান্তরালে আমাদের ভাষা, আমাদের আশা, আমাদের অস্তিত্ব কোথায়। ইহাকে উত্তীর্ণ হইয়া, আপিসের প্রাচীর ডিঙাইয়া, ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে মানুষ বলিয়া দেখিতে পায় এমন অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি কার কাছে প্রত্যাশা করিব।

যে দূরবর্তী ইংরেজ য়ুরোপীয় আবহাওয়ার মধ্যে আছে বলিয়াই অন্ধ স্বার্থের কুহক কাটাইয়া ভারতবর্ষকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে পায়, ইহারা তাহাদিগকে জানায় যে, নীচের আকাশের ধূলানিবিড়

বাতাসের মধ্য দিয়া দেখাই বাস্তবকে দেখা, উপরের স্বচ্ছ আকাশ হইতে দেখাই বস্তুতন্ত্রবিরুদ্ধ। ভারতশাসনে দূরের ইংরেজের হস্তক্ষেপ করাকে ইহারা স্পর্ধিত অপরাধ বলিয়া গণ্য করে। ভারতবাসীকে এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে, ইংরেজ বলিয়া যে-একটি মহৎ জাতি আছে প্রকৃতপক্ষে সেই যে ভারতশাসন করিতেছে তাহা নহে ; ভারত-দফ্‌তরখানার বহুকালক্রমাগত সংস্কারের অ্যাসিডে কাঁচাবয়স হইতে জীর্ণ হইয়া যে-একটি আমলা-সম্প্রদায় আমাদের পক্ষে কৃত্রিম মানুষ হইয়া আছে আমরা তাহারই প্রজা। যে-মানুষ তার সমস্ত মনপ্রাণহৃদয় লইয়া মানুষ, সে নয়, যে-মানুষ কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনের মাপে মানুষ— সেই তো কৃত্রিম মানুষ। ফোটোগ্রাফের ক্যামেরাকে কৃত্রিম চোখ বলিতে পারি। এই ক্যামেরা খুব স্পষ্ট করিয়া দেখে কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া দেখে না, তাহা চলতিকে দেখে না, যাহাকে দেখা যায় না তাহাকে দেখে না। এইজন্য বলা যায় যে, ক্যামেরা অন্ধ হইয়া দেখে। সজীব চোখের পিছনে সমগ্র মানুষ আছে বলিয়া তাহার দেখা কোনো আংশিক প্রয়োজনের পক্ষে যত অসম্পূর্ণ হোক মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ব্যবহারক্ষেত্রে তাহাই সম্পূর্ণতর। বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে তিনি চোখের বদলে আমাদিগকে ক্যামেরা দেন নাই। কিন্তু হায়, ভারতশাসনে তিনি এ কী দিলেন। যে বড়ো-ইংরেজ ষোলো-আনা মানুষ, আমাদের ভাগ্যে সে থাকে সমুদ্রের ওপারে, আর এপারে পাড়ি দিতেই প্রয়োজনের কাঁচিকলের মধ্যে আপনার বারো-আনা ছাঁটিয়া সে এতটুকু ছোটো হইয়া বাহির হইয়া আসে। সেই এতটুকুর পরিমাণ কেবল সেইটুকু যাতে বাড়তির ভাগ কিছুই নাই, অর্থাৎ মানুষের যেটা স্বাদ গন্ধ লাবণ্য, যেটা তার কমনীয়তা ও নমনীয়তা, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে যাহা নিজেও বাড়িতে থাকে অন্যকেও বাড়াইতে থাকে সে-সমস্ত কি বাদ পড়িল। এই ছোটোখাটো ছাঁটাছোঁটা ইংরেজ কোনোমতেই বুঝিতে পারে না এমন অত্যন্ত দামি ও নিখুঁত ক্যামেরা পাইয়াও সজীব চোখের চাহনির জন্য ভিতরে-ভিতরে আমাদের এত তৃষ্ণা কেন। বোঝে না তার কারণ, কলে ছাঁট পড়িবার সময় ইহাদের কল্পনাবৃত্তিটা যে বাদ পড়িয়াছে। ইংলন্ডের সরকারি অনাথ-আশ্রমে যারা থাকে তাদের মন কেন পালাই-পালাই এবং প্রাণ কেন ত্রাহি-ত্রাহি করে। কেননা ঐ ওআর্ক-হাউস সম্পূর্ণ ঘরও নয়, সম্পূর্ণ বাহিরও নয়। উহা আত্মীয়তাও দেয় না, মুক্তিও দেয় না। উহা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া কেবলমাত্র আশ্রয় দেয়। আশ্রয়টা অত্যন্ত দরকারি বটে, কিন্তু মানুষ যেহেতু মানুষ সেইজন্য সে ঘরকে চায়, অর্থাৎ দরকারের সঙ্গে বহুল পরিমাণে অ-দরকারকে না পাইলে সে বাঁচে না। নহিলে সে অপমানিত হয়, সুবিধা-সুযোগ ফেলিয়াও সে পালাইতে চেষ্টা করে। অনাথ-আশ্রমের কড়া কার্যাধ্যক্ষ এই অকৃতজ্ঞতায় বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয় এবং কেবল তার ক্রোধের দ্বারাই দুঃখকে দমন করিবার জন্য সে দণ্ডধারণ করে। কেননা, এই কার্যাধ্যক্ষ পুরা মানুষ নয়, ইহার পুরা দৃষ্টি নাই, এই ছোটো মানুষ মনে করে দুর্ভাগা ব্যক্তি কেবলমাত্র আশ্রয়ের শান্তিটুকুর জন্য মুক্তির অসীম আশায় ব্যাকুল আপন আত্মাকে চিরদিনের মতোই বণিকের ঘরে বাঁধা রাখিতে পারে।

বড়ো-ইংরেজ অব্যবহিতভাবে ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে না— সে মাঝখানে রাখিয়াছে ছোটো-ইংরেজকে। এইজন্য বড়ো-ইংরেজ আমাদের কাছে সাহিত্য-ইতিহাসের ইংরেজি পুঁথিতে, এবং ভারতবর্ষ বড়ো-ইংরেজের কাছে আপিসের দফ্‌তরে এবং জমাখরচের পাকা খাতায়। অর্থাৎ ভারতবর্ষ তার কাছে স্তূপাকার স্ট্যাটিস্টিক্সের সমষ্টি। সেই স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা যায় কত আমদানি কত রপ্তানি ; কত আয় কত ব্যয় ; কত জন্মিল কত মরিল ; শান্তিরক্ষার জন্য কত পুলিশ, শাস্তি দিবার জন্য কত জেলখানা। রেলের লাইন কত দীর্ঘ, কলেজের ইমারত কয়তলা উচ্চ। কিন্তু সৃষ্টি তো শুধু নীলাকাশ-জোড়া অঙ্কের তালিকা নয়। সেই অঙ্কমালার চেয়ে অনেক বেশির হিসাবটা ভারত-আপিসের কোনো ডিপার্টমেন্ট্ দিয়া কোনো মানবজীবের কাছে গিয়া পৌঁছায় না।

এ কথা বিশ্বাস করিতে যত বাধাই থাক্, তবু আমাদের দেশের লোকের ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বড়ো-ইংরেজ বলিয়া একটা বড়ো জাতি সত্যই ভূগোলের এক জায়গায় আছে। প্রবলের প্রতি দুর্বল যে অবিচার করে তাহাতে তার দুর্বলতারই পরিচয় হয়— সেই দীনতা হইতে মুক্ত থাকিলেই আমাদের গৌরব। এ কথা শপথ করিয়া বলা যায় যে, এই বড়ো-ইংরেজ সর্বাংশেই মানুষের মতো।

ইহাও নিশ্চিত যে, জগতের সকল বড়ো জাতিই যে-ধর্মের বলে বড়ো হইয়াছে ইংরেজও সেই বলেই বড়ো ; অত্যন্ত রাগ করিয়াও এ কথা বলা চলিবে না যে, সে কেবল তলোয়ারের ডগায় ভর করিয়া উঁচু হইয়াছে কিংবা টাকার থলির উপরে চড়িয়া। কোনো জাতিই টাকা করিতে কিংবা লড়াই করিতে পারে বলিয়াই ইতিহাসে গৌরব লাভ করিয়াছে এ কথা অশ্রদ্ধেয়। মনুষ্যত্বে বড়ো না হইয়াও কোনো জাতি বড়ো হইয়াছে এ কথাটাকে বিনা সাক্ষ্যপ্রমাণে গোড়াতেই ডিসমিস করা যাইতে পারে। ন্যায়, সত্য এবং স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা এই ইংরেজজাতির অন্তরের আদর্শ। সেই আদর্শ ইহাদের সাহিত্যে ও ইতিহাসে নানা আকারে ও অধ্যবসায়ে প্রকাশ পাইয়াছে এবং আজিকার মহাযুদ্ধেও সেই আদর্শ নানা ছলনা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহাদিগকে শক্তিদান করিতেছে।

এই বড়ো-ইংরেজ স্থির নাই, সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইতিহাসের মধ্য দিয়া তার জীবনের পরিবর্তন ও প্রসার ঘটিতেছে। সে কেবল তার রাষ্ট্র ও বাণিজ্য লইয়া নয়, তার শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম ও সমাজ লইয়া পূর্ণপ্রবাহে চলিয়াছে। সে সৃজনধর্মী ; য়ুরোপীয় সভ্যতার বিরাট যজ্ঞে সে একজন প্রধান হোতা। বর্তমান যুদ্ধের মহৎ শিক্ষা তার চিত্তকে প্রতি মুহূর্তে আন্দোলিত করিতেছে। মৃত্যুর উদার বৈরাগ্য-আলোকে সে মানুষের ইতিহাসকে নূতন করিয়া পড়িবার সুযোগ পাইল। সে দেখিল অপমানিত মনুষ্যত্বের প্রতিকূলে স্বাজাত্যের আত্মাভিমানকে একান্ত করিয়া তুলিবার অনিবার্য দুর্যোগটা কী। সে আজ নিজের গোচরে বা অগোচরে প্রত্যহ বুঝিতেছে যে, স্বজাতির যিনি দেবতা সর্বজাতির দেবতাই তিনি, এইজন্য তাঁহার পূজায় নরবলি আনিলে একদিন রুদ্র তাঁর প্রলয়রূপ ধারণ করেন। আজ যদি সে না-ও বুঝিয়া থাকে, একদিন সে বুঝিবেই যে, হাওয়া যেখানেই পাতলা, ঝড়ের কেন্দ্রই সে জায়গাটায়— কেননা চারিদিকের মোটা হাওয়া সেই ফাঁক দখল করিতেই ঝুঁকিয়া পড়ে। তেমনি পৃথিবীর যে-সব দেশ দুর্বল, সবলের দ্বন্দ্বের কারণ সেখানেই ; লোভের ক্ষেত্র সেখানেই ; মানুষ সেখানে আপন মহৎস্বরূপে বিরাজ করে না ; মানুষ প্রত্যহই সেখানে অসতর্ক হইয়া আপন মনুষ্যত্বকে শিথিল করিয়া বর্জন করিতে থাকে। শয়তান সেখানে আসন জুড়িয়া ভগবানকে দুর্বল বলিয়া বিদ্রূপ করে। বড়ো-ইংরেজ এ কথা বুঝিবেই যে, বালির উপর বাড়ি করা চলে না, একের শক্তিহীনতার উপরে অপরের শক্তির ভিত্তি কখনোই পাকা হইতে পারে না।

কিন্তু ছোটো-ইংরেজ অগ্রসর হইয়া চলে না। যে-দেশকে সে নিশ্চল করিয়া বাঁধিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই দেশের সঙ্গে সে আপনি-বাঁধা। তার জীবনের এক পিঠে আপিস, আর-এক পিঠে আমোদ। যে-পিঠে আপিস সে-পিঠে সে ভারতের বহুকোটি মানুষকে রাষ্ট্রিকের রাজদণ্ডের বা বণিকের মানদণ্ডের ডগাটা দিয়া স্পর্শ করে, আর যে-পিঠে আমোদ সে-পিঠটা চাঁদের পশ্চাদ্দিকের মতো, বৎসরের পর বৎসর সম্পূর্ণ অদৃশ্য। তবু কেবলমাত্র কালের অঙ্কপাত হিসাব করিয়া ইহারা অভিজ্ঞতার দাবি করে। ভারত-অধিকারের গোড়ায় ইহারা সৃজনের কাজে রত ছিল, কিন্তু তাহার পর বহুদীর্ঘকাল ইহারা পাকা সাম্রাজ্য ও পাকা বাণিজ্যকে প্রধানত পাহারা দিতেছে ও ভোগ করিতেছে। নিরন্তর রুটিনের ঘানি টানিয়া ইহারা বিষয়ীলোকদের পাকা প্রকৃতি পাইয়াছে, সেই প্রকৃতি কঠিন অসাড়তাকেই বল বলিয়া থাকে। তারা মনে করে তাদের আপিসটা সুনিয়মে চলিতেছে এইটেই বিশ্বের সব চেয়ে বড়ো ঘটনা। কিন্তু আপিসের জালনার বাহিরে রাস্তার ধুলার উপর দিয়া বিশ্বদেবতা তাঁর রথযাত্রায় অতিদীনকেও যে নিজের সারথ্যেই চালাইতেছেন এই চালনাকে তারা অশ্রদ্ধা করে। অক্ষমের সঙ্গে নিয়ত কারবার করিয়া এ কথা তারা ধ্রুব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, যেমন তারা বর্তমানের মালিক তেমনি তারা ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। আমরা এখানে আসিয়াছি এই কথা বলিয়াই তারা চুপ করে না, আমরা এখানে থাকিবই এই কথা বলিয়া তারা স্পর্ধা করে।

অতএব, ওরে মরীচিকালুব্ধ দুর্ভাগা, বড়ো-ইংরেজের কাছ হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া বর আসিতেছে কেবল এই আশাটাকে বুকে করিয়াই পশ্চিমের ঘাটের দিকে অত বেশি কলরব করিতে করিতে ছুটিয়ো না। এই আশঙ্কাটাকেও মনে রাখিয়ো যে, ভারতসাগরের তলায় তলায় ছোটো-ইংরেজের 'মাইন' সার বাঁধিয়া আছে। এটা অসম্ভব নয় যে তোমার ভাগ্যে জাহাজের যে ভাঙা

কাঠ আছে সেটা স্বাধীনশাসনের অন্ত্যেষ্টিসৎকারের কাজে লাগিতে পারে। তার পরে লোনা জলে পেট ভরাইয়া ডাঙায় উঠিতে পারিলেই আমাদের অদৃষ্টের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব।

দেখিতে পাই, বড়ো-ইংরেজের দাক্ষিণ্যকেই চরম সম্পদ গণ্য করিয়া আমাদের লোকে চড়া চড়া কথায় ছোটো-ইংরেজের মুখের উপর জবাব দিতে শুরু করিয়াছেন। ছোটো-ইংরেজের জোর যে কতটা খেয়াল করিতেছেন না। ভুলিয়াছেন, মাঝখানের পুরোহিতের মামুলি বরাদ্দের পাওনা উপরের দেবতার বরকে বিকাইয়া দিতে পারে। এই মধ্যবর্তীর জোর কতটা এবং ইহাদের মেজাজটা কী ধরনের সে কি বারে বারে দেখি নাই। ছোটো-ইংরেজের জোর কত সেটা যে কেবল আমরা লর্ড রিপনের এবং কিছু পরিমাণে লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে দেখিলাম তাহা নহে, আর-একদিন লর্ড ক্যানিং এবং লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলেও দেখা গেছে।

তাই দেশের লোককে বার বার বলি, "কিসের জোরে স্পর্ধা কর। গায়ের জোর? তাহা তোমার নাই। কণ্ঠের জোর? তোমার যেমনি অহংকার থাক্‌ সেও তোমার নাই। মুরুব্বির জোর? সেও তো দেখি না। যদি ধর্মের জোর থাকে তবে তারই প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা রাখো। স্বেচ্ছাপূর্বক দুঃখ পাইবার মহৎ অধিকার হইতে কেহ তোমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, লোকশ্রেয়ের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিবার গৌরব দুর্গম পথের প্রান্তে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বর যদি পাই তবে অন্তর্যামীর কাছ হইতে পাইব।"

দেখ নাই কি, বরদানের সংকল্প-ব্যাপারে ভারত-গবর্মেন্টের উচ্চতম বিভাগের যোগ আছে শুনিয়া এ-দেশী ইংরেজের সংবাদপত্র অট্টহাস্যে প্রশ্ন করিতেছে, "ভারত-সচিবদের স্নায়ুবিকার ঘটিল নাকি। এমন কী উৎপাতের কারণ ঘটিয়াছে যে বজ্রপাত-ডিপার্টমেন্ট্‌ হইতে হঠাৎ বৃষ্টিপাতের আয়োজন হইতেছে।" অথচ আমাদের ইস্কুলের কচি ছেলেগুলোকে পর্যন্ত ধরিয়া যখন দলে দলে আইনহীন রসাতলের নিরালোক ধামে পাঠানো হয় তখন ইহারাই বলেন, "উৎপাত এত গুরুতর যে, ইংরেজ-সাম্রাজ্যের আইন হার মানিল, মগের মুলুকের বেআইনের আমদানি করিতে হইল।" অর্থাৎ মারিবার বেলায় যে আতঙ্কটা সত্য, মলম দিবার বেলাতেই সেটা সত্য নয়। কেননা মারিতে খরচ নাই, মলম লাগাইতে খরচা আছে। কিন্তু তাও বলি, মারিবার খরচার বিল কালে মলমের খরচার চেয়ে বড়ো হইয়া উঠিতে পারে। তোমরা জোরের সঙ্গে ঠিক করিয়া আছ যে, ভারতের যে ইতিহাস ভারতবাসীকে লইয়া, সেটা সামনের দিকে বহিতেছে না ; তাহা ঘূর্ণির মতো একটা প্রবল কেন্দ্রের চারি দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তলার মুখেই ঝুঁকিতেছে। এমন সময় আপিস হইতে বাহির হইবার কালে হঠাৎ একদিন দেখিতে পাও স্রোতটা তোমাদের নকশার রেখা ছাড়াইয়া কিছু দূর আগাইয়া গেছে। তখন রাগিয়া গর্জাইতে গর্জাইতে বল, পাথর দিয়া বাঁধো উস্‌কো, বাঁধ দিয়া উহাকে ঘেরো। প্রবাহ তখন পথ না পাইয়া উপরের দিক হইতে নীচের দিকে তলাইতে থাকে— সেই চোরা-প্রবাহকে ঠেকাইতে গিয়া সমস্ত দেশের বক্ষ দীর্ণ বিদীর্ণ করিতে থাক।

আমার সঙ্গে এই ছোটো-ইংরেজের যে-একটা বিরোধ ঘটিয়াছিল সে কথা বলি। বিনা বিচারে শতশত লোককে বন্দী করার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে একখানি ছোটো চিঠি লিখিয়াছিলাম। ইহাতে ভারতজীবী কোনো ইংরেজি কাগজ আমাকে মিথ্যুক ও extremist বলিয়াছিল। ইহারা ভারতশাসনের তকমাহীন সচিব, সুতরাং আমাদিগকে সত্য করিয়া জানা ইহাদের পক্ষে অনাবশ্যক, অতএব আমি ইহাদিগকে ক্ষমা করিব। এমন-কি, আমাদের দেশের লোক, যাঁরা বলেন আমার পদ্যেও অর্থ নাই, গদ্যেও বস্তু নাই, তাঁদের মধ্যেও যে দুই-একজন ঘটনাক্রমে আমার লেখা পড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্তত এ কথাটুকু কবুল করিতেই হইবে যে, স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি অতিশয়-পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি। আমি এই কথাই বলিয়া আসিতেছি যে, অন্যায় করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহাতে কখনোই শেষ পর্যন্ত ফলের দাম পোষায় না, অন্যায়ের ঋণটাই ভয়ংকর ভারী হইয়া উঠে। সে যাই হোক, দিশি বা বিলিতি যে-কোনো কালিতেই হোক-না আমার নিজের নামে কোনো লাঞ্ছনাতে আমি ভয় করিব না। আমার যেটা বলিবার কথা সে এই যে,

অতিশয়-পন্থা বলিতে আমরা এই বুঝি, যে-পন্থা না ভদ্র, না বৈধ, না প্রকাশ্য ; অর্থাৎ সহজ পথে ফলের আশা ত্যাগ করিয়া অপথে বিপথে চলাকেই 'একস্ট্রিমিজ্‌ম্' বলে। এই পথটা যে নিরতিশয় গর্হিত সে কথা আমি জোরের সঙ্গেই নিজের লোককে বলিয়াছি, সেইজন্যই আমি জোরের সঙ্গেই বলিবার অধিকার রাখি যে, 'একস্ট্রিমিজ্‌ম্' গবর্মেন্টের নীতিতেও অপরাধ। আইনের রাস্তা বাঁধা রাস্তা বলিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে গম্যস্থানে পৌঁছিতে ঘুর পড়ে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বেলজিয়ামের বুকের উপর দিয়া সোজা হাঁটিয়া রাস্তা সংক্ষেপ করার মতো 'একস্ট্রিমিজ্‌ম্' কাহাকেও শোভা পায় না।

ইংরেজিতে যাকে 'শর্টকাট্' বলে আদিমকালের ইতিহাসে তাহা চলিত ছিল। "লে আও, উস্‌কো শির লে আও" এই প্রণালীতে গ্রন্থি খুলিবার বিরক্তি বাঁচিয়া যাইত, এক কোপে গ্রন্থি কাটা পড়িত। য়ুরোপের অহংকার এই যে, সে আবিষ্কার করিয়াছে এই সহজ প্রণালীতে গ্রন্থি কাটা পড়ে বটে কিন্তু মালের গুরুতর লোকসান ঘটে। সভ্যতার একটা দায়িত্ব আছে, সকল সংকটেই সে দায়িত্ব তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। শাস্তি দেওয়ার মধ্যে একটা দারুণতা অনিবার্য বলিয়াই শাস্তিটাকে ন্যায়বিচার-প্রণালীর ফিলটারের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ- ও পক্ষপাত- পরিশূন্য করিয়া সভ্যসমাজ তবে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে। তাহা না হইলেই লাঠিয়ালের লাঠি এবং শাসনকর্তার ন্যায়দণ্ডের মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত হইতে থাকে।

স্বীকার করি, কাজ কঠিন হইয়াছে। বাংলাদেশের একদল বালক ও যুবক স্বদেশের সঙ্গে স্বদেশীর সত্য যোগসাধনের বাধা-অতিক্রমের যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহার জন্য আমরা লজ্জিত আছি। আরো লজ্জিত এইজন্য যে, দেশের প্রতি কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদসাধন করায় অকর্তব্য নাই এ কথা আমরা পশ্চিমের কাছ হইতেই শিখিয়াছি। পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা এবং পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি পশ্চিম সোনার সহিত খাদ মিশানোর মতো মনে করেন, মনে করেন ওটুকু না থাকিলে সোনা শক্ত হয় না। আমরাও শিখিয়াছি যে, মানুষের পরমার্থকে দেশের স্বার্থের উপরে বসাইয়া ধর্ম লইয়া টিক্‌টিক্ করিতে থাকা মূঢ়তা, দুর্বলতা, ইহা সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম্— বর্বরতাকে দিয়াই সভ্যতাকে এবং অধর্মকে দিয়াই ধর্মকে মজবুত করা চাই। এমনি করিয়া আমরা যে কেবল অধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছি তাহা নহে, আমাদের গুরুমশায়দের যেখানে বীভৎসতা, সেই বীভৎসতার কাছে মাথা হেঁট করিয়াছি। নিজের মনের জোরে ধর্মের জোরে গুরুমশায়ের উপরে দাঁড়াইয়াও এ কথা বলিবার তেজ ও প্রতিভা আমাদের আজ নাই যে,

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি,
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অর্থাৎ অধর্মের দ্বারা মানুষ বাড়িয়া উঠে, অধর্ম হইতে সে আপন কল্যাণ দেখে, অধর্মের দ্বারা সে শত্রুদিগকেও জয় করে, কিন্তু একেবারে মূল হইতে বিনাশ পায়। তাই বলিতেছি, গুরুমশায়দের কাছে আমাদের ধর্মবুদ্ধিরও যে এত বড়ো পরাভব হইয়াছে ইহাতেই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা। বড়ো আশা করিয়াছিলাম, দেশে যখন দেশভক্তির আলোক জ্বলিয়া উঠিল তখন আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে মহৎ তাহাই উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে ; আমাদের যাহা যুগসঞ্চিত অপরাধ তাহা আপন অন্ধকার কোণ ছাড়িয়া পালাইয়া যাইবে ; দুঃসহ নৈরাশ্যের পাষাণস্তর বিদীর্ণ করিয়া অক্ষয় আশার উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিবে এবং দুরূহ নিরুপায়তাকেও উপেক্ষা করিয়া অপরাহত ধৈর্য এক-এক পা করিয়া আপনার রাজপথ নির্মাণ করিবে ; নিষ্ঠুর আচারের ভারে এ দেশে মানুষকে মানুষ যে অবনত অপমানিত করিয়া রাখিয়াছে অকৃত্রিম প্রীতির আনন্দময় শক্তির দ্বারা সেই ভারকে দূর করিয়া সমস্ত দেশের লোক একসঙ্গে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে এ কী হইল। দেশভক্তির আলোক জ্বলিল, কিন্তু সেই আলোতে এ কোন্ দৃশ্য দেখা যায়— এই চুরি ডাকাতি গুপ্তহত্যা ? দেবতা যখন প্রকাশিত হইয়াছেন তখন পাপের অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার পূজা ? যে-দৈন্য যে-জড়তায় এতকাল আমরা পোলিটিকাল ভিক্ষাবৃত্তিকেই সম্পদলাভের সদুপায় বলিয়া কেবল রাজদরবারে দরখাস্ত লিখিয়া হাত পাকাইয়া আসিয়াছি, দেশপ্রীতির নববসন্তেও সেই দৈন্য সেই জড়তা

সেই আত্ম-অবিশ্বাস পোলিটিকাল চৌর্যবৃত্তিকেই রাতারাতি ধনী হইবার একমাত্র পথ মনে করিয়া সমস্ত দেশকে কি কলঙ্কিত করিতেছে না। এই চোরের পথ আর বীরের পথ কোনো চৌমাথায় একত্র আসিয়া মিলিবে না। য়ুরোপীয় সভ্যতায় এই দুই পথের সম্মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা ভ্রম করি, কিন্তু বিধাতার দরবারে এখনো পথের বিচার শেষ হয় নাই সে কথা মনে রাখিতে হইবে ; আর বাহ্য ফললাভই যে চরম লাভ এ কথা সমস্ত পৃথিবী যদি মানে তবু ভারতবর্ষ যেন না মানে বিধাতার কাছে এই বর প্রার্থনা করি, তার পর পোলিটিকাল মুক্তি যদি পাই তো ভালো, যদি না পাই তবে তার চেয়ে বড়ো মুক্তির পথকে কলুষিত পলিটিক্সের আবর্জনা দিয়া বাধাগ্রস্ত করিব না।

কিন্তু একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশভক্তির আলোকে বাংলাদেশে কেবল যে চোর-ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনোদিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্মেন্টের চাকরি বা রাজসম্মানের আশা নাই তাহা নহে, ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের সঙ্গেও বিরোধে এ রাস্তা কণ্টকিত। আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে বাংলাদেশে এই ধনমানহীন সংকটময় দুর্গমপথে তরুণ পথিকের অভাব নাই। উপরের দিক হইতে ডাক আসিল, আমাদের যুবকেরা সাড়া দিতে দেরি করিল না ; তারা মহৎ ত্যাগের উচ্চ শিখরে নিজের ধর্মবুদ্ধির সম্বল মাত্র লইয়া পথ কাটিতে কাটিতে চলিবার জন্য দলে দলে প্রস্তুত হইতেছে। ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্তপত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই, ছোটো-ইংরেজ ইহাদের শুভ সংকল্পকে ঠিকমত বুঝিবে কিংবা হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিবে এ দুরাশাও ইহারা মনে রাখে নাই। অন্য সৌভাগ্যবান দেশে, যেখানে জনসেবার ও দেশসেবার বিচিত্র পথ প্রশস্ত হইয়া দিকে দিকে চলিয়া গেছে, যেখানে শুভ ইচ্ছা এবং শুভ ইচ্ছার ক্ষেত্র এই দুইয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ যোগ আছে, সেইখানে এইরকমের দৃঢ়সংকল্প আত্মবিসর্জনশীল বিষয়বুদ্ধিহীন কল্পনাপ্রবণ ছেলেরাই দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ ; আত্মঘাতী শচীন্দ্রের অন্তিমের চিঠি পড়িলে বোঝা যায় যে, এ-ছেলেকে যে-ইংরেজ সাজা দিয়াছে সেই ইংরেজের দেশে এ যদি জন্মিত তবে গৌরবে বাঁচিতে এবং ততোধিক গৌরবে মরিতে পারিত। আদিম কালের বা এখনকার কালের যে-কোনো রাজা বা রাজার আমলা এই শ্রেণীর জীবনবান ছেলেদের শাসন করিয়া দলন করিয়া দেশকে একপ্রান্ত হইতে আর-একপ্রান্ত পর্যন্ত অসাড় করিয়া দিতে পারে। ইহাই সহজ, কিন্তু ইহা ভদ্র নয়, এবং আমরা শুনিয়াছি ইহা ঠিক ইংলিশ নহে। যারা নিরপরাধ অথচ মহৎ, অথবা মহৎ উৎসাহের ক্ষণিক বিকারে যারা পথ ভুল করিয়াছে, যারা উপরে চড়িতে গিয়া নীচে পড়িয়াছে এবং অভয় পাইলেই যারা সে পথ হইতে ফিরিয়া একদিন জীবনকে সার্থক করিতে পারিত, এমন-সকল ছেলেকে সন্দেহমাত্রের 'পরে নির্ভর করিয়া চিরজীবনের মতো পঙ্গু করিয়া দেওয়ার মতো মানবজীবনের এমন নির্মম অপব্যয় আর-কিছুই হইতে পারে না। দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিসের গুপ্তদলনের হাতে নির্বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া— এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি। এ-যে পাপকে হীনতাকে রাজপেয়াদার তকমা পরাইয়া দেওয়া। এ যেন রাতদুপুরে কাঁচা ফসলের খেতে মহিষের পাল ছাড়িয়া দেওয়া। যার খেত সে কপাল চাপড়াইয়া হায় হায় করিয়া মরে, আর যার মহিষ সে বুক ফুলাইয়া বলে— বেশ হইয়াছে, একটা আগাছাও আর বাকি নাই।

আর-একটা সর্বনাশ এই যে, পুলিস একবার যে-চারায় অল্পমাত্রও দাঁত বসাইয়াছে সে-চারায় কোনোকালে ফুলও ফোটে না, ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে। আমি একটি ছেলেকে নিজে জানি, তার যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিদ্যা, তেমনি চরিত্র ; পুলিসের হাত হইতে সে বিক্ষত হইয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু আজ সে তরুণ বয়সে উন্মাদ হইয়া বহরমপুর পাগলা-গারদে জীবন কাটাইতেছে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তার কাছে ব্রিটিশরাজের একচুলমাত্র আশঙ্কার কারণ ছিল না, অথচ তার কাছ থেকে আমাদের দেশ বিস্তর আশা করিতে পারিত। পুলিসের মারের তো

কথাই নাই, তার স্পর্শই সাংঘাতিক। কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা বীরভূমের জেলাস্কুলে পরীক্ষা দিতে গেলে পুলিসের লোক আর-কিছুই না করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের নাম টুকিয়া লইত। আর বেশি কিছু করিবার দরকার নাই ; উহাদের নিশ্বাস লাগিলেই কাঁচা প্রাণের অঙ্কুর শুকাইতে শুরু করে। উহাদের খাতা যে গুপ্ত খাতা, উহাদের চাল যে গুপ্ত চাল। সাপে-খাওয়া ফল যেমন কেহ খায় না, আজকের দিনে তেমনি পুলিসে-ছোঁওয়া মানুষকে কেহ কোনো ব্যবহারে লাগায় না। এমন-কি, যে মরিয়া-মানুষকে বৃদ্ধ রুগ্‌ণ দরিদ্র কুশ্রী কুচরিত্র কেহই পিছু হঠাইতে পারে না, বাংলাদেশের সেই কন্যাদায়িক বাপও তার কাছে ঘটক পাঠাইতে ভয় করে। সে দোকান করিতে গেলে তার দোকান চলে না, সে ভিক্ষা চাহিলে তাহাকে দয়া করিতে পারি কিন্তু দান করিতে বিপদ গনি। দেশের কোনো হিতকর্মে তাহাকে লাগাইলে সে কর্ম নষ্ট হইবে।

যে অধ্যক্ষদের 'পরে এই বিভীষিকা-বিভাগের ভার তাঁরা তো রক্তমাংসের মানুষ ; তাঁরা তো রাগদ্বেষবিবর্জিত মহাপুরুষ নন। রাগ বা আতঙ্কের সময় আমরাও যেমন অল্প প্রমাণেই ছায়াকে বস্তু বলিয়া ঠাহর করি, তাঁরাও ঠিক তাই করেন। সকল মানুষকে সন্দেহ করাটাই যখন তাঁদের ব্যবসায় হয় তখন সকল মানুষকে অবিশ্বাস করাটাই তাঁদের স্বভাব হইয়া ওঠে। সংশয়ের সামান্য আভাসমাত্রকেই চূড়ান্ত করিয়া নিরাপদকে পাকা করিতে তাঁদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হয়— কেননা, উপরে তাঁদের দায়িত্ব অল্প, চারি পাশের লোক ভয়ে নিস্তব্ধ, আর পিছনে ভারতের ইংরেজ হয় উদাসীন নয় উৎসাহদাতা। যেখানে স্বাভাবিক দরদ নাই অথচ ক্রোধ আছে এবং শক্তিও অব্যাহত সেখানে কার্যপ্রণালী যদি গুপ্ত এবং বিচারপ্রণালী যদি বিমুখ হয় তবে সেই ক্ষেত্রেই যে ন্যায়ধর্ম রক্ষিত হইতেছে এ কথা কি আমাদের ছোটো-ইংরেজও সত্যই বিশ্বাস করেন। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তিনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস এই যে, কাজ উদ্ধার হইতেছে। কারণ দেখিয়াছি, জর্মানিও এই বিশ্বাসের জোরে ইন্টারন্যাশনাল আইনকে এবং দয়াধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ জিতিবার নিয়মকে সহজ করিয়াছে। তার কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে জর্মানিতে আজ বড়ো-জর্মানের চেয়ে ছোটো-জর্মানের প্রভাব বড়ো হইয়াছে, যে-জর্মান কাজ করিবার যন্ত্র এবং যুদ্ধ করিবার কায়দামাত্র। আবার বলি, "শির লে আও" বলিতে পারিলে রাজকার্য উদ্ধার হইতে পারে, যে-রাজকার্য উপস্থিতের কিন্তু রাজনীতির অধঃপতন ঘটে, যে-রাজনীতি চিরদিনের। এই রাজনীতির জন্য ইংলন্ডের ইতিহাসে ইংরেজ লড়াই করিয়াছে, এই রাজনীতির ব্যভিচারেই জর্মানির প্রতি মহৎ ঘৃণায় উদ্দীপ্ত ইংরেজ যুবক দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে অখণ্ড করিয়া দেখিবার অধ্যাত্মদৃষ্টি যাহাতে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের বালকদের পক্ষে দুর্বল বা কলুষিত না হয় আমি এই লক্ষ্য দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছি। তাই এই আশ্রমের শুভকার্যে ইংরেজ সাধকেরও জীবন-উপহার দাবি করিতে আমি কুণ্ঠিত হই নাই। পরমসত্যকে আমি কোনো বড়ো নামের দোহাই দিয়া খণ্ডিত করিতে চাই নাই, ইহাতে আমার ধর্মনীতিকে নিজ্‌ঝের ইংরেজ ও এ-দেশী শিষ্যগণ দুর্বলের ধর্মনীতি ও মুমূর্ষুর সান্ত্বনা বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন। আমাদের অবস্থা অস্বাভাবিক ; আমাদের বর্তমানের ক্ষেত্র ও ভবিষ্যতের আশা চারি দিকে সংকীর্ণ ; আমাদের অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তিবিকাশের উৎসাহ ক্ষীণ ও সুযোগ বাধাগ্রস্ত ; বড়ো বড়ো উদ্ধতপদমান ও দায়িত্বের নিম্নতলের আওতায় কৃশ ও খর্ব হইয়া আমরা যে-ফল ফলাইয়া থাকি জগতের হাটে তার প্রয়োজন তুচ্ছ, তার দাম যৎকিঞ্চিৎ ; অথচ সেই খর্বতাটাই আমাদের চিরস্বভাব এই অপবাদ দিয়া সেই আওতাটাকে চিরনিবিড় করিয়া রাখা আমাদের মতো গুল্মের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া দেশে বিদেশে ঘোষণা চলিতেছে। এই অবস্থায় যে-অবসাদ আনে তাহাতে দেশের লোকের মন অন্তরে অন্তরে গুরুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। এই কারণেই ভয়দ্বেষবিবর্জিত আধ্যাত্মিক মুক্তিসাধনের উপদেশ এ দেশে আজকাল শ্রদ্ধা পায় না। তবু আমার বিশ্বাস, এই-সকল বাধার সঙ্গে লড়াই করিয়াও আমাদের আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। কেননা, বাধা দুরূহ হইলেও পরমার্থের সত্যটিকে মানুষের সামনে উপস্থিত করিলে সে তাকে একেবারে অশ্রদ্ধা করিতে পারে না— এমন-কি, আমাদের

দেশের অত্যন্ত আধুনিক ছেলের পক্ষেও তাহা কঠিন হয়। আমাদের এই স্বভাব সম্বন্ধে পাঞ্জাবের লাটের সঙ্গেও আমার মতের মিল আছে। কিন্তু এক-এক সময়ে এমন দুর্যোগ আসে যখন এই বাঙালির ছেলের মতো অত্যন্ত ভালোমানুষের কাছেও উচ্চতম সত্যের কথা অবজ্ঞাভাজন হইয়া উঠে। কেননা, রিপুর সংঘাতে রিপু জাগে, তখন প্রমত্ততার উপরে কল্যাণকে স্বীকার করা দুঃসাধ্য হয়। আমাদের আশ্রমে দুটি ছোটো ছেলে আছে। তাদের অভিভাবকদের অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। বরাবর তারা এখানে থাকিবার খরচ জোগাইয়াছে। কিছুকাল হইল তাদের পরিবারের তিনজন পুরুষের একসঙ্গে অন্তরায়ণ হইয়াছে। এখন আশ্রমবাসের খরচ জোগানো ছেলে-দুটির পক্ষে অসম্ভব, আশ্রমে তাদের শিক্ষা ও আহারাদির ভার এখন আশ্রমকেই লইতে হইল। এই ছেলে-দুটি কেবল যে নিজের গ্লানি বহিতেছে তা নয়, তাদের মায়ের যে দুঃখ কত তা তারা জানে। যে ব্যথায় অভাবে ও নিরানন্দে তাদের ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে তা তাদের অগোচর নাই। বাপকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে, মা ব্যাকুল হইয়া চেষ্টা করিতেছেন যাতে তাঁকে স্বাস্থ্যকর জায়গায় বন্দী রাখা হয়, এই-সমস্ত দুশ্চিন্তার দুঃখ এই শিশু-দুটিকেও পীড়া দিতেছে। এ সম্বন্ধে ছেলে-দুটির মুখে একটি শব্দ নাই, আমরাও কিছু বলি না— কিন্তু এই ছেলেরা যখন সামনে থাকে তখন ধৈর্যের কথা, প্রেমের কথা, নিত্যধর্মের প্রতি নিষ্ঠার কথা, সর্বমানবের ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলিতে আমার কুণ্ঠা বোধ হয়, তখন সেই-সকল লোকের বিদ্রূপহাস্যকুটিল মুখ আমার মনে পড়ে যাঁরা পাঞ্জাবের লাটের মতোই সাত্ত্বিকতার অতিশৈত্যকে পরিহাস করেন। এমনি করিয়া রিপুর সহিত রিপুর চকমকি ঠোকায় আগুন জ্বলিতেছে ; এমনি করিয়া বাংলাদেশের প্রদেশে প্রদেশে দুঃখে আতঙ্কে মানুষ বাহিরের খেদকে অন্তরের নিত্যভাণ্ডারে সঞ্চিত করিতেছে। শাসনকর্তার অদৃশ্য মেঘের ভিতর হইতে হঠাৎ সংসারের মাঝখানে যে-বোমাগুলা আসিয়া পড়িতেছে তাহাতে মরিতেছে বিস্তর অনাথা রমণী এবং অসহায় শিশু। ইহাদিগকে কি non-combatants বলিবে না।

যদি জিজ্ঞাসা কর এই দুষ্ট সমস্যার মূল কোথায়, তবে বলিতেই হইবে স্বাধীন শাসনের অভাবে। ইংরেজের কাছে আমরা বড়োই পর, এমন-কি, চীন-জাপানের সঙ্গেও তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক সামীপ্য অনুভব করেন, এ কথা তাঁদের কোনো কোনো বিদ্বান ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন। তার পরে আমাদের আধ্যাত্মিকতা আছে, শুনিতেছি তাঁদের সে বালাই নাই— এত বড়ো মূলগত প্রভেদ মানুষে মানুষে আর-কিছু হইতেই পারে না। তার পরে তাঁরা আমাদের ভাষা জানেন না, আমাদের সঙ্গ রাখেন না। যেখানে এত দূরত্ব, এত কম জানা, সেখানে সতর্ক সন্দিগ্ধতা একমাত্র পলিসি হইতে বাধ্য। সেখানে দেশের যে-সব লোক স্বার্থপর ও চতুর, যারা অবৈতনিক গুপ্তচরবৃত্তি করাই উন্নতির উপায় বলিয়া জানে, তাদের বিষাক্ত প্রভাব শাসনতন্ত্রের ছিদ্রে ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মিথ্যায় এবং মিথ্যার চেয়ে ভয়ংকর অর্ধসত্যে ভরিয়া রাখে। যারা স্বার্থের চেয়ে আত্মসম্মানকে বড়ো জানে, যারা নিজের উন্নতির চেয়ে দেশের মঙ্গলকে শ্রেয় বলিয়া জানে, তারা যতক্ষণ না পুলিসের গ্রাসে পড়ে ততক্ষণ এই শাসনব্যবস্থা হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকে। এই নিয়ত পা টিপিয়া চলা এবং চুপি চুপি বলা, এই দিনরাত আড়ে আড়ে চাওয়া এবং ঝোপে-ঝাড়ে ঘোরা— আর কিছু নয়, এই যে অবিরত পুলিসের সঙ্গ করা— এই কলুষিত হাওয়ার মধ্যে যে-শাসনকর্তা বাস করেন তাঁর মনের সন্দেহ কাজে নিদারুণ হইয়া উঠিতে কোনো স্বাভাবিক বাধা পায় না। কেননা, তাঁদের কাছে আমরা একটা অবচ্ছিন্ন সত্তা, আমরা কেবলমাত্র শাসিত সম্প্রদায়। সেইজন্য আমাদের ঘরে যখন মা কাঁদিতেছে, স্ত্রী আত্মহত্যা করিতেছে, শিশুদের শিক্ষা বন্ধ ; যখন ভাগ্যহীন দেশের বহু দুঃখের সৎচেষ্টাগুলি সি. আই. ডি.-র বাঁকা ইশারামাত্রে চারি দিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে ; তখন অপর পক্ষের কোনো মানুষের ডিনারের ক্ষুধা বা নিশীথনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না এবং ব্রিজ-খেলাতেও উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহা দোষারোপ করিয়া বলিতেছি না, ইহা স্বাভাবিক। এই-সব মানুষই যেখানে ষোলোআনা মানুষ, সেখানে আপিসের শুকনো পার্চমেন্টের নীচে হইতে তাদের হৃদয়টা সম্ভবত বাহির হইয়া থাকে। ব্যুরোক্রেসি বলিতে সর্বত্রই সেই কর্তাদের বোঝায় যারা বিধাতার সৃষ্ট মনুষ্যলোক

লইয়া কারবার করে না, যারা নিজের বিধানরচিত একটা কৃত্রিম জগতে প্রভুত্বজাল বিস্তার করে। স্বাধীনদেশে এই ব্যুরোক্রেসি সর্বপ্রধান নয়, এইজন্য মানুষ ইহাদের ফাঁকের মধ্য দিয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে। অধীনদেশে এই ব্যুরোক্রেসি কোথাও একটুও ফাঁক রাখিতে চায় না। আমরা যখন খোলা আকাশে মাথা তুলিবার জন্য ফাঁকের দরবার করি, তখন ইহাদের ছোটোবড়ো শাখাপ্রশাখা সমুদ্রের এপারে-ওপারে এমনি প্রচণ্ড বেগে আন্দোলিত হইতে থাকে যে, তখন আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভাবি— ফাঁকে কাজ নাই, এখন ঐ ডালের ঝাপটা খাইয়া ভাঙিয়া না পড়িতে হয়। তবু শেষ কথাটা বলিয়া রাখি ; কোনো অস্বাভাবিকতাকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে অত্যন্ত বলবান জাতিও শেষ পর্যন্ত সঙিনের আগায় সিধা রাখিতে পারে না। ভার বাড়িয়া ওঠে, হাত ক্লান্ত হয় এবং বিশ্বপৃথিবীর বিপুল ভারাকর্ষণ স্বভাবের অসামঞ্জস্যকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়।

স্বাভাবিকতাটা কী। না, শাসনপ্রণালী যেমনি হোক আর যারই হোক, দেশের লোকের সঙ্গে দেশের শাসনতন্ত্রের দায়িত্বের যোগ থাকা, দেশের শাসনতন্ত্রের প্রতি দেশের লোকের মমত্ব থাকা। সেই শাসন নিরবচ্ছিন্ন বাহিরের জিনিস হইলে তার প্রতি প্রজার ঔদাসীন্য বিতৃষ্ণায় পরিণত হইবেই হইবে। আবার সেই বিতৃষ্ণাকে যাঁরা বাহিরের দিক হইতেই দমন করিতে থাকেন তাঁরা বিতৃষ্ণাকে বিদ্বেষে পাকাইয়া তোলেন। এমনি করিয়া সমস্যা কেবলই জটিলতর হইতে থাকে।

বর্তমান যুগসত্যের দূত হইয়া ইংরেজ এ-দেশে আসিয়াছেন। যে-কালের যাহা সব চেয়ে বড়ো বিশ্বসম্পদ তাহা নানা আকারে নানা উপায়ে দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িবেই। যাঁরা সেই সম্পদের বাহন, তাঁরা যদি লোভের বশ হইয়া কৃপণতা করেন, তবে তাঁরা ধর্মের অভিপ্রায়কে অনর্থক বাধা দিয়া দুঃখ সৃষ্টি করিবেন, কিন্তু তাঁরা যে-আগুন বহন করিতেছেন তাকে চাপা দিয়া রাখিতে পারিবেন না। যাহা দিবার তাহা তাঁহাদিগকে দিতেই হইবে, কেননা এ দানে তাঁহারা উপলক্ষ, এ দান এখনকার যুগের দান। কিন্তু অস্বাভাবিকতা হইতেছে এই যে, তাঁদের ঐতিহাসিক শুক্লপক্ষের দিকে তাঁরা যে-সত্যকে বিকীর্ণ করিতেছেন, তাঁদের ঐতিহাসিক কৃষ্ণপক্ষের দিকে তাঁরাই সেই সত্যকে শাসনের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিতেছেন। কিন্তু নিজের প্রকৃতির এক অংশকে তাঁরা আর-এক অংশ দিয়া কিছুতেই প্রবঞ্চিত করিতে পারিবেন না। বড়ো-ইংরেজকে ছোটো-ইংরেজ চিরদিন স্বার্থের বাঁধ দিয়া ঠেকাইবার চেষ্টা করিলে দুঃখ-দুর্গতি বাড়াইতে থাকিবেন। ঐতিহাসিক খেলায় হাতের কাগজ দেখাইয়া খেলা হয় না। তার পরিণাম সমস্ত হিসাবের বিরুদ্ধে হঠাৎ দেখা দিয়া চমক লাগায়। এইজন্য মোটের উপর এই তত্ত্বটা বলা যায় যে, কোনো অস্বাভাবিকতাকে দীর্ঘকাল প্রশ্রয় দিতে দিতে যখন মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে আমার তৈরি নিয়মই নিয়ম, তখনই ইতিহাস হঠাৎ একটা সামান্য ঠোকর খাইয়া উলটাইয়া পড়ে। শত বৎসর ধরিয়া মানুষ মানুষের কাছে আছে অথচ তার সঙ্গে মানবসম্বন্ধ নাই ; তাকে শাসন করিতেছে অথচ তাকে কোনোমতেই আত্মীয় করিতেছে না ; পূর্বধরণীর প্রাচীর ভাঙিয়া পশ্চিম একেবারে তার গোলাবাড়ির ভিতর আসিয়া পড়িল অথচ এ মন্ত্র ছাড়িল না যে, 'never the twain shall meet' ; এতবড়ো অস্বাভাবিকতার দুঃখকর বোঝা বিশ্বে কখনোই অটল হইয়া থাকিতে পারে না। যদি ইহার কোনো স্বাভাবিক প্রতিকার না থাকে তবে একটা ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির পঞ্চমাঙ্কে ইহার যবনিকা পতন হইবে। ভারতবর্ষে আমাদের দুর্গতির যে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি, তারও তো পালা অনেক যুগ ধরিয়া এমনি করিয়া রচিত হইয়াছিল। আমরাও মানুষকে কাছাকাছি রাখিয়াও দূরে ঠেকাইবার বিস্তারিত আয়োজন করিয়াছি ; যে-অধিকারকে সকলের চেয়ে মূল্যবান বলিয়া নিজে গ্রহণ করিলাম, অন্যকে কেবলই তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি ; আমরাও 'স্বধর্ম' বলিয়া একটা বড়ো নাম দিয়া মানুষের অবমাননা করিয়া নিত্যধর্মকে পীড়িত করিয়াছি। শাস্ত্রবিধির অতি কঠিন বাঁধন দিয়াও এই অস্বাভাবিকতাকে, এই অপবিত্র দেবদ্রোহকে আমরা নিজের ইতিহাসের অনুকূল করিয়া তুলিতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম, আমাদের বল এইখানেই, কিন্তু এইখানেই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্বলতা। এইখানেই শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা প্রতি পদে কেবল আপনাকে মারিতে মারিতে মরিয়াছি।

বর্তমানের চেহারা যেমনি হোক, তবু এই আশা এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিয়াছি যে, পশ্চিম পূর্বের সহিত মিলিবে। কিন্তু এইখানে আমাদেরও কর্তব্য আছে। আমরা যদি ছোটো হইয়া ভয় পাই তবে ইংরেজও ছোটো হইয়া ভয় দেখাইবে। ছোটো-ইংরেজের সমস্ত জোর আমাদের ছোটো শক্তির উপরে। পৃথিবীর সেই ভাবী যুগ আসিয়াছে, অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রকে দাঁড়াইতে হইবে। সেদিন, যে মারিতে পারিবে তার জিত হইবে না, যে মরিতে পারিবে তারই জয় হইবে। সেদিন দুঃখ দেয় যে-মানুষ তার পরাভব হইবে, দুঃখ পায় যে-মানুষ তারই শেষ গৌরব। সেদিন মাংসপেশীর সহিত আত্মার শক্তির সংগ্রাম হইয়া মানুষ জানাইয়া দিবে যে সে পশু নয়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম সে অতিক্রম করিয়াছে। এই মহত্ত্ব প্রমাণ করিবার ভার আমাদের উপর আছে। পূর্ব-পশ্চিমের যদি মিলন ঘটে তবে একটা মহৎ আইডিয়ালের উপর হইবে। তাহা নিছক অনুগ্রহের উপরে হইবে না। এবং কামান বন্দুক এবং রণতরীর উপরও হইবে না। দুঃখকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, মৃত্যুকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, তবে মৃত্যুঞ্জয় আমাদের সহায় হইবেন। আমরা যদি শক্তি না পাই তবে অশক্তের সহিত শক্তের মিলন সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। একতরফা আধিপত্যের যোগ যোগই নহে। আমাদিগকে নিজের শক্তিতেই পরের শক্তির সঙ্গে সন্ধি করিতে হইবে। সেই শক্তি ধার-করা শক্তি, ভিক্ষা-করা শক্তি না হউক। তাহা সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য দুঃখ সহিবার অপরিসীম শক্তি হউক। জগতে কাহারও সাধ্য নাই, দুঃখের শক্তিকে ত্যাগের শক্তিকে ধর্মের শক্তিকে বলির পশুর মতো শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে। তাহা হারিয়া জেতে, তাহা মরিয়া অমর হয়, এবং মাংসপেশী আপন জয়স্তম্ভ নির্মাণ করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিতে পায় সে পক্ষাঘাতে অচল হইয়াছে।

অগ্রহায়ণ ১৩২৪

বাতায়নিকের পত্র

এক দিকে আমাদের বিশ্বজগৎ, আর-এক দিকে আমাদের কর্মসংসার। সংসারটাকে নিয়ে আমাদের যত ভাবনা, জগৎটাকে নিয়ে আমাদের কোনো দায় নেই। এইজন্যে জগতের সঙ্গে আমাদের অহেতুক আত্মীয়তার সম্বন্ধটাকে যতটা পারি আড়াল করে রাখতে হয়, নইলে সংসারের ভাগে মনোযোগের কমতি প'ড়ে কাজের ক্ষতি হয়। তাই আমাদের আপিস থেকে বিশ্বকে বারোমাস ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে এমনি হয় যে, দরকার পড়লেও আর তার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

দরকার পড়েও। কেননা বিশ্বটা সত্য। সত্যের সঙ্গে কাজের সম্বন্ধ নাও যদি থাকে, তবু অন্য সম্বন্ধ আছেই। সেই সম্বন্ধকে অন্যমনস্ক হয়ে অস্বীকার করলেও তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশেষে কর্মে ক্লান্তি আসে, দিনের আলো ম্লান হয়, সংসারের বদ্ধ আয়তনের মধ্যে গুমট অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। তখন মন তার হিসাবের পাকা খাতা বন্ধ করে বলে ওঠে, বিশ্বকে আমার চাই, নইলে আর বাঁচি নে।

কিন্তু নিকটের সব দরজাগুলোর তালায় মরচে পড়ে গেছে, চাবি আর খোলে না। রেলভাড়া করে দূরে যেতে হয়। আপিসের ছাদটার উপরেই এবং তার আশেপাশেই যে-আকাশ নীল, যে-ধরণী শ্যামল, যে-জলের ধারা মুখরিত, তাকেই দেখবার জন্যে ছুটে যেতে হয় এটোয়া কাটোয়া ছোটোনাগপুরে।

এত কথা হঠাৎ আমার মনে উদয় হল কেন বলি। তোমরা সবাই জানো, পুরাকালে একসময়ে আমি সম্পূর্ণ বেকার ছিলুম। অর্থাৎ আমার প্রধান সম্বন্ধ ছিল বিশ্বজগতের সঙ্গে। তার পরে কিছুকাল থেকে সেই আমার প্রথম বয়সের সমস্ত অকৃতকর্মের বকেয়া শোধে লেগে গিয়েছিলুম। অর্থাৎ

এখনকার প্রধান সম্বন্ধ হল সংসারের সঙ্গে। অথচ তখনকার সঙ্গে এখনকার দিনের যে এত বড়ো একটা বিচ্ছেদ ঘটেছে, কাজ করতে করতে তা ভুলে গিয়েছিলুম। এই ভোলবার ক্ষমতাই হচ্ছে মনের বিশেষ ক্ষমতা। সে দু নৌকোয় পা দেয় না; সে যখন একটা নৌকোয় থাকে তখন অন্য নৌকোটাকে পিছনে বেঁধে রাখে।

এমন সময় আমার শরীর অসুস্থ হল। সংসারের কাছ থেকে কিছুদিনের মতো ছুটি মিলল। দোতলা ঘরের পুব দিকের প্রান্তে খোলা জানালার ধারে একটা লম্বা কেদারায় ঠেস দিয়ে বসা গেল। দুটো দিন না-যেতেই দেখা গেল অনেক দূরে এসে পড়েছি, রেলভাড়া দিয়েও এতদূরে আসা যায় না।

যখন আমেরিকায় যাই, জাপানে যাই, ভ্রমণের কথায় ভরে ভরে তোমাদের চিঠি লিখে পাঠাই। পথ-খরচাটার সমান ওজনের গৌরব তাদের দিতে হয়। কিন্তু এই যে আমার নিখরচার যাত্রা কাজের পার থেকে অকাজের পারে, তারও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা চলে— মাঝে মাঝে লিখব। মুশকিল এই যে, কাজের মধ্যে মধ্যে অবকাশ মেলে কিন্তু পুরো অবকাশের মধ্যে অবকাশ বড়ো দুর্লভ। আরো একটা কথা এই যে, আমার এই নিখরচার ভ্রমণবৃত্তান্ত বিনা-কড়ি দামের উপযুক্ত নেহাত হালকা হওয়া উচিত— লেখনীর পক্ষে সেই হালকা চাল ইচ্ছা করলেই হয় না; কারণ লেখনী স্বভাবতই গজেন্দ্রগামিনী।

জগৎটাকে কেজো অভ্যাসের বেড়ার পারে ঠেলে রেখে অবশেষে ক্রমে আমার ধারণা হয়েছিল আমি খুব কাজের লোক। এই ধারণাটা জন্মালেই মনে হয় আমি অত্যন্ত দরকারী; আমাকে না হলে চলে না। মানুষকে বিনা মাইনেয় খাটিয়ে নেবার জন্যে প্রকৃতির হাতে যে-সমস্ত উপায় আছে এই অহংকারটা সকলের সেরা। টাকা নিয়ে যারা কাজ করে তারা সেই টাকার পরিমাণেই কাজ করে, সেটা একটা বাঁধা পরিমাণ; কাজেই তাদের ছুটি মেলে— বরাদ্দ ছুটির বেশি কাজ করাকে তারা লোকসান বলে গণ্য করে। কিন্তু অহংকারের তাগিদে যারা কাজ করে তাদের আর ছুটি নেই, লোকসানকেও তারা লোকসান জ্ঞান করে না।

আমাকে নইলে চলে না, এই কথা মনে করে এতদিন ভারি ব্যস্ত হয়ে কাজ করা গেছে, চোখের পলক ফেলতে সাহস হয় নি। ডাক্তার বলেছে, "এইখানেই বাস করো, একটু থামো।" আমি বলেছি, "আমি থামলে চলে কই।" ঠিক এমন সময়ে চাকা ভেঙে আমার রথ এই জানলাটার সামনে এসে থামল। এখানে দাঁড়িয়ে অনেকদিন পরে ঐ মহাকাশের দিকে তাকালুম। সেখানে দেখি মহাকালের রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ অগ্নিচক্র ঘুরতে ঘুরতে চলেছে; না উড়ছে ধুলো, না উঠছে শব্দ, না পথের গায়ে একটুও চিহ্ন পড়ছে। ঐ রথের চলার সঙ্গে বাঁধা হয়ে বিশ্বের সমস্ত চলা অহরহ চলেছে। এক মুহূর্তে আমার যেন চটক ভেঙে গেল। মনে হল স্পষ্ট দেখতে পেলুম, আমাকে না হলেও চলে। কালের ঐ নিঃশব্দ রথচক্র কারও অভাবে, কারও শৈথিল্যে, কোথাও এক তিল বা এক পল বেধে যাবে এমন লক্ষণ তো দেখি নি। 'আমি-নইলে-চলে-না'র দেশ থেকে 'আমি-নইলে-চলে'র দেশে ধাঁ করে এসে পৌঁচেছি কেবলমাত্র ঐ ডেস্কের থেকে এই জানলার ধারটুকুতে এসে।

কিন্তু কথাটাকে এত সহজে মেনে নিতে পারব না। মুখে যদি-বা মানি, মন মানে না। আমি থাকলেও যা আমি গেলেও তা, এইটেই যদি সত্য হবে তবে আমার অহংকার এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বে কোথাও স্থান পেলে কী করে। তার টিঁকে থাকবার জোর কিসের উপরে। দেশকাল জুড়ে আয়োজনের তো অন্ত নেই, তবু এত ঐশ্বর্যের মধ্যে আমাকে কেউ বরখাস্ত করতে পারলে না। আমাকে না হলে চলে না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমি আছি।

আমি যে আছি সেই থাকার মূল্যই হচ্ছে অহংকার। এই মূল্য যতক্ষণ নিজের মধ্যে পাচ্ছি ততক্ষণ নিজেকে টিঁকিয়ে রাখবার সমস্ত দায় সমস্ত দুঃখ অনবরত বহন করে চলেছি। সেইজন্য বৌদ্ধরা বলেছে, এই অহংকারটাকে বিসর্জন করলেই টিঁকে থাকার মূল মেরে দেওয়া হয়, কেননা তখন আর টিকে থাকার মজুরি পোষায় না।

যাই হোক, এই মূল্য তো কোনো-একটা ভাণ্ডার থেকে জোগানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি থাকি এরই

গরজ কোনো-এক জায়গায় আছে ; সেই গরজ অনুসারেই আমাকে মূল্য দেওয়া হয়েছে। আমি থাকি এই ইচ্ছার আনুচর্য সমস্ত বিশ্ব করছে, বিশ্বের সমস্ত অণুপরমাণু। সেই পরম-ইচ্ছার গৌরবই আমার অহংকারে বিকশিত। সেই ইচ্ছার গৌরবেই এই অতিক্ষুদ্র আমি বিশ্বের কিছুর চেয়েই পরিমাণ ও মূল্যে কম নই।

এই ইচ্ছাকে মানুষ দুই রকম ভাবে দেখেছে। কেউ বলেছে এ হচ্ছে শক্তিময়ের খেয়াল, কেউ বলেছে এ হচ্ছে আনন্দময়ের আনন্দ। আর যারা বলেছে, এ হচ্ছে মায়া, অর্থাৎ যা নেই তারই থাকা, তাদের কথা ছেড়ে দিলুম।

আমার থাকাটা শক্তির প্রকাশ, না, প্রীতির প্রকাশ, এইটে যে-যেমন মনে করে সে সেইভাবে জীবনে লক্ষ্যকে স্থির করে। শক্তিতে আমাদের যে-মূল্য দেয় তার এক চেহারা, আর প্রীতিতে আমাদের যে-মূল্য দেয় তার চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। শক্তির জগতে আমার অহংকারের যে দিকে গতি, প্রীতির জগতে আমার অহংকারের গতি ঠিক তার উলটো দিকে।

শক্তিকে মাপা যায় ; তার সংখ্যা, তার ওজন, তার বেগ সমস্তেরই আয়তন গণিতের অঙ্কের মধ্যে ধরা পড়ে। তাই যারা শক্তিকেই চরম বলে জানে তারা আয়তনে বড়ো হতে চায়। টাকার সংখ্যা, লোকের সংখ্যা, উপকরণের সংখ্যা, সমস্তকেই তারা কেবল বহুগুণিত করতে থাকে।

এইজনেই সিদ্ধিলাভের কামনায় এরা অন্যের অর্থ, অন্যের প্রাণ, অন্যের অধিকারকে বলি দেয়। শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। সেই বলির রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে।

বস্তুতন্ত্রের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে তার বাহ্যপ্রকাশের পরিমাপ্যতা— অর্থাৎ তার সসীমতা। মানুষের ইতিহাসে যত-কিছু দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলা তার অধিকাংশই এই সীমানার চৌহদ্দি নিয়ে। পরিমাণের দিকে নিজের সীমানা অত্যন্ত বাড়াতে গেলেই পরিমাণের দিকে অন্যের সীমানা কাড়তে হয়। অতএব শক্তির অহংকার যেহেতু আয়তন বিস্তারেরই অহংকার, সেইজন্যে এই দিকে দাঁড়িয়ে খুব লম্বা দূরবীন কষলেও লড়াইয়ের রক্তসমুদ্র পেরিয়ে শান্তির কূল কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই যে বস্তুতান্ত্রিক বিশ্ব, এই যে শক্তির ক্ষেত্র, এর আয়তনের অঙ্কগুলো যোগ দিতে দিতে হঠাৎ এক জায়গায় দেখি তেরিজটা একটানা বেড়ে চলবার দিকেই ছুটছে না। বেড়ে চলবার তত্ত্বের মধ্যে হঠাৎ উঁচোট খেয়ে দেখা যায় সুষমার তত্ত্ব পথ আগলে। দেখি কেবলই গতি নয়, যতিও আছে। ছন্দের এই অমোঘ নিয়মকে শক্তি যখন অন্ধ অহংকারে অতিক্রম করতে যায় তখনই তার আত্মঘাত ঘটে। মানুষের ইতিহাসে এইরকম বার বার দেখা যাচ্ছে। সেইজন্যে মানুষ বলেছে, অতি দর্পে হতা লঙ্কা। সেইজন্যে ব্যাবিলনের অত্যুদ্ধত সৌধচূড়ার পতনবার্তা এখনো মানুষ স্মরণ করে।

তবেই দেখছি, শক্তিতত্ত্ব, যার বাহ্যপ্রকাশ আয়তনে, সেটাই চরমতত্ত্ব এবং পরমতত্ত্ব নয়। বিশ্বের তাল মেলাবার বেলায় আপনাকে তার থামিয়ে দিতে হয়। সেই সংযমের সিংহদ্বারই হচ্ছে কল্যাণের সিংহদ্বার। এই কল্যাণের মূল্য আয়তন নিয়ে নয়, বহুলতা নিয়ে নয়। যে এঁকে অন্তরে জেনেছে, সে ছিন্ন কন্থায় লজ্জা পায় না, সে রাজমুকুট ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে পারে।

শক্তিতত্ত্ব থেকে সুষমাতত্ত্বে এসে পৌঁছিয়েই বুঝতে পারি, ভুল জায়গায় এতদিন এত নৈবেদ্য জুগিয়েছি। বলির পশুর রক্তে যে-শক্তি ফুলে উঠল সে কেবল ফেটে মরবার জন্যেই। তার পিছনে যতই সৈন্য যতই কামান লাগাই-না কেন, রণতরীর পরিধি যতই বৃদ্ধির দিকে নিয়ে চলি, লুঠের ভাগকে যতই বিপুল করে তুলতে থাকি, অঙ্কের জোরে মিথ্যাকে সত্য করা যাবে না, শেষকালে ঐ অতিবড়ো অঙ্কেরই চাপে নিজের বস্তার নীচে নিজে গুঁড়িয়ে মরতে হবে।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন জিনিসপত্র বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে এই অঙ্ক-কষার রাজ্যে মৈত্রেয়ীকে প্রতিষ্ঠিত করে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখনই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্ ! বহু, বহু, বহু সব বহুকে জুড়ে জুড়েও অঙ্কের পর অঙ্ক যোগ করে করেও তবু তো অমৃতে গিয়ে পৌঁছনো যায় না। শব্দকে কেবলই অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে এবং চড়িয়ে দিয়ে যে-জিনিসটা পাওয়া যায় সেটা হল হুংকার আর শব্দকে সুর দিয়ে লয় দিয়ে সংযত সম্পূর্ণতা দান করলে যে-জিনিসটা পাওয়া যায়

সেইটেই হল সংগীত ; ঐ হুংকারটা হল শক্তি, এর পরিমাণ পাওয়া যায়, আর সংগীতটা হল অমৃত, হাতে বহরে ওকে কোথাও মাপবার জো নেই।

এই অমৃতের ক্ষেত্রে মানুষের অহংকারের স্রোত নিজের উলটো দিকে, উৎসর্জনের দিকে। মানুষ আপনার দিকে কেবলই সমস্তকে টানতে টানতে প্রকাণ্ডতা লাভ করে, কিন্তু আপনাকে সমস্তর দিকে উৎসর্গ করতে করতে সে সামঞ্জস্য লাভ করে। এই সামঞ্জস্যেই শান্তি। কোনো বাহ্য ব্যবস্থাকে বিস্তীর্ণতর করার দ্বারা, শক্তিমানের সঙ্গে শক্তিমানকে জোড়া দিয়ে পুঞ্জীভূত করার দ্বারা, কখনোই সেই শান্তি পাওয়া যাবে না যে-শান্তি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, যে-শান্তি অলোভে, যে-শান্তি সংযমে, যে-শান্তি ক্ষমায়।

প্রশ্ন তুলেছিলুম— আমার সত্তার পরমমূল্যটি কোন্ সত্যের মধ্যে। শক্তিময়ের শক্তিতে, না, আনন্দময়ের আনন্দে ?

শক্তিকেই যদি সেই সত্য বলে বরণ করি তা হলে বিরোধকেও চরম ও চিরন্তন বলে মানতেই হবে য়ুরোপের অনেক আধুনিক লেখক সেই কথাই স্পর্ধাপূর্বক প্রচার করছেন। তাঁরা বলছেন, শান্তির ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, দুর্বলের আত্মরক্ষা করবার কৃত্রিম দুর্গ ; বিশ্বের বিধান এই দুর্গকে খাতির করে না ; শেষ পর্যন্ত শক্তিরই জয় হয়— অতএব ভীরু ধর্মভাবুকের দল যাকে অধর্ম বলে নিন্দা করে, সেই অধর্মই কৃতার্থতার দিকে মানুষকে নিয়ে যায়।

অন্যদল সে কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না ; সমস্ত মেনে নিয়েই তারা বলে :

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

ঐশ্বর্যগর্বেও মানুষের মন বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, আবার দারিদ্র্যের দুঃখে ও অপমানেও মানুষের সমস্ত লোলুপ প্রবৃত্তি বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই দুই অবস্থাতেই মানুষ সকল দেবতার উপরে সেই শক্তিকে আসন দিতে লজ্জিত হয় না— যে ক্রূর শক্তির দক্ষিণহস্তে অন্যায়ের এবং বামহস্তে ছলনার অস্ত্র। প্রতাপসুরামত্ত য়ুরোপের পলিটিক্স এই শক্তিপূজা। এইজন্য সেখানকার ডিপ্লোমেসি কেবলই প্রকাশ্যতাকে এড়িয়ে চলতে চায় ; অর্থাৎ সেখানে শক্তি যে-মূর্তি ধারণ করেছে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গমূর্তি নয় ; কিন্তু তার লেলিহান রসনার উলঙ্গতা কোথাও ঢাকা নেই। ঐ দেখো পীস্-কন্‌ফারেন্সের সভাক্ষেত্রে তা লক্‌লক্ করছে।

অপর পক্ষে একদা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উচ্ছৃঙ্খলতার সময় ভীত পীড়িত প্রজা আপন কবিদের মুখ দিয়ে শক্তিরই স্তবগান করিয়েছে। কবিকঙ্কণচণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান, প্রকৃতপক্ষে অধর্মেরই জয়গান। সেই কাব্যে অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই পরাভবগানকেই মঙ্গলগান নাম দেওয়া হল।

আজকের দিনেও দেখি আমাদের দেশে সেই হাওয়া উঠেছে। আমরা ধর্মের নাম করেই একদল লোক বলছি, ধর্মভীরুতাও ভীরুতা ; বলছি, যারা বীর, অন্যায় তাদের পক্ষে অন্যায় নয়। তাই দেখি সাংসারিকতায় যারা কৃতার্থ এবং সাংসারিকতায় যারা অকৃতার্থ, দুইয়েরই সুর এক জায়গা এসে মেলে। ধর্মকে উভয়েই বাধা বলে জানে— সেই বাধা গায়ের জোরে অতিক্রম করতে চায়। কিন্তু গায়ের জোরই পৃথিবীতে সব চেয়ে বড়ো জোর নয়।

এই বড়ো দুঃসময়ে কামনা করি, শক্তির বীভৎসতাকে কিছুতে আমরা ভয়ও করব না, ভক্তিও করব না— তাকে উপেক্ষা করব, অবজ্ঞা করব। সেই মনুষ্যত্বের অভিমান আমাদের হোক, যে-অভিমানে মানুষ এই স্থূল বস্তুজগতের প্রবল প্রকাণ্ডতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে বলতে পারে, আমার সম্পদ এখানে নয় ; বলতে পারে, শৃঙ্খলে আমি বন্দী হই নে, আঘাতে আমি আহত হই নে, মৃত্যুতে আমি মরি নে ; বলতে পারে যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। আমাদের পিতামহেরা বলে গেছেন, এতদমৃতমভয়ং শান্ত উপাসীত— যিনি অমৃত, যিনি অভয় তাঁকে উপাসনা করে শান্ত হও।

তাঁদের উপদেশকে আমরা মাথায় লই, এবং মৃত্যু ও সকল ভয়ের অতীত যে-শান্তি সেই শান্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করি।

২

কারও উঠোন চষে দেওয়া আমাদের ভাষায় চূড়ান্ত শাস্তি বলে গণ্য। কেননা উঠোনে মানুষ সেই বৃহৎ সম্পদকে আপন করেছে, যেটাকে বলে ফাঁক। বাহিরে এই ফাঁক দুর্লভ নয়, কিন্তু সেই বাহিরের জিনিসকে ভিতরের করে আপনার করে না তুললে তাকে পেয়েও না পাওয়া হয়। উঠোনে ফাঁকটাকে মানুষ নিজের ঘরের জিনিস করে তোলে; ঐখানে সূর্যের আলো তার ঘরের আপনার আলো হয়ে দেখা দেয়, ঐখানে তার ঘরের ছেলে আকাশের চাঁদকে হাততালি দিয়ে ডাকে। কাজেই উঠোনকেও যদি বেকার না রেখে তাকে ফসলের খেত বানিয়ে তোলা যায়, তা হলে যে-বিশ্ব মানুষের আপন ঘরের বিশ্ব, তারই বাসা ভেঙে দেওয়া হয়।

সত্যকার ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ধনী এই ফাঁকটাকে বড়ো করে রাখতে পারে। যে-সমস্ত জিনিসপত্র দিয়ে ধনী আপনার ঘর বোঝাই করে তার দাম খুব বেশি, কিন্তু যে-ফাঁকটা দিয়ে তার আঙিনা হয় প্রশস্ত, তার বাগান হয় বিস্তীর্ণ সেইটেই হচ্ছে সব চেয়ে দামি। সদাগরের দোকানঘর জিনিসপত্রে ঠাসা; সেখানে ফাঁক রাখবার শক্তি তার নেই। দোকানে সদাগর কৃপণ, সেখানে লক্ষপতি হয়েও সে দরিদ্র। কিন্তু সেই সদাগরের বাসের বাড়িতে ঘরগুলো লম্বায় চওড়ায় উঁচুতে সকল দিকেই প্রয়োজনকে ধিক্কার করে ফাঁকটাকেই বেশি আদর দিয়েছে, আর বাগানের তো কথাই নেই। এইখানেই সদাগর ধনী।

শুধু কেবল জায়গার ফাঁকা নয়, সময়ের ফাঁকাও বহুমূল্য। ধনী তার অনেক টাকা দিয়ে এই অবকাশ কিনতে পায়। তার ঐশ্বর্যের প্রধান লক্ষণ এই যে, লম্বা লম্বা সময় সে ফেলে রাখতে পারে। হঠাৎ কেউ তার সময়ের উঠোন চষতে পারে না।

আর-একটা ফাঁকা, যেটা সব চেয়ে দামি, সে হচ্ছে মনের ফাঁকা। যা-কিছু নিয়ে মন চিন্তা করতে বাধ্য হয়, কিছুতেই ছাড় পায় না, তাকেই বলে দুশ্চিন্তা। গরিবের চিন্তা, হতভাগার চিন্তা মনকে একেবারে আঁকড়ে থাকে, অশথগাছের শিকড়গুলো ভাঙা মন্দিরকে যে-রকম আঁকড়ে ধরে। দুঃখ জিনিসটা আমাদের চৈতন্যের ফাঁক বুজিয়ে দেয়। শরীরের সুস্থ অবস্থা তাকেই বলে যেটা হচ্ছে শারীর চৈতন্যের ফাঁকা ময়দান। কিন্তু হোক দেখি বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলের গাঁটের প্রান্তে বাতের বেদনা, অমনি শারীর চৈতন্যের ফাঁক বুজে যায়, সমস্ত চৈতন্য ব্যথায় ভরে ওঠে। মন যে ফাঁকা চায়, দুঃখে সেই ফাঁকা পায় না।

স্থানের ফাঁকা না পেলে যেমন ভালো করে বাঁচা যায় না, তেমনি সময়ের ফাঁকা, চিন্তার ফাঁকা না পেলে মন বড়ো করে ভাবতে পারে না; সত্য তার কাছে ছোটো হয়ে যায়। সেই ছোটো-সত্য মিটমিটে আলোর মত ভয়কে প্রশ্রয় দেয়, দৃষ্টিকে প্রতারণা করে এবং মানুষের ব্যবহারের ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে রাখে।

আজকের দিনে ভারতবাসী হয়ে নিজের সকলের চেয়ে বড়ো দৌর্ভাগ্য অনুভব করছি এই জানলার কাছটাতে এসে। আমাদের ভাগ্যে জানলার ফাঁক গেছে বুজে; জীবনের এ-কোণে ও-কোণে একটু-আধটু যা ছুটির পোড়ো জায়গা ছিল তা কাঁটাগাছে ভরে গেল।

প্রাচীন ভারতে একটা জিনিস প্রচুর ছিল, সেটাকে আমরা খুব মহামূল্য বলেই জানি, সে হচ্ছে সত্যকে খুব বড়ো করে ধ্যান করবার এবং উপলব্ধি করবার মতো মনের উদার অবকাশ। ভারতবর্ষ একদিন সুখ এবং দুঃখ, লাভ এবং অলাভের উপকার সব চেয়ে বড়ো ফাঁকায় দাঁড়িয়ে সেই সত্যকেই সুস্পষ্ট করে দেখছিল, যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

কিন্তু আজকের দিনে ভারতবর্ষের সেই ধ্যানের বড়ো অবকাশটি নষ্ট হল। আজকের দিনের ভারতবাসীর আর ছুটি নেই; তার মনের অন্তরতম ছুটির উৎসটি শুকিয়ে শুকিয়ে মরে গেল, বেদনায়

তার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

তাই আজ যখনই এই বাতায়নে এসে বসেছি, অমনি দেখি আমাদের আঙিনা থেকে উঠছে দুর্বলের কান্না ; সেই দুর্বলের কান্নায় আমাদের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, সমস্ত অবকাশ একেবারে পরিপূর্ণ। আজকের দিনে দুর্বল যত ভয়ংকর দুর্বল, জগতের ইতিহাসে এমন আর-কোনো দিনই ছিল না।

বিজ্ঞানের কৃপায় বাহুবল আজ নিদারুণ দুর্জয়। পালোয়ান আজ জল স্থল আকাশ সর্বত্রই সিংহনাদে তাল ঠুকে বেড়াচ্ছে। আকাশ একদিন মানুষের হিংসাকে আপন সীমানায় ঢুকতে দেয় নি। মানুষের ক্রূরতা আজ সেই শূন্যকেও অধিকার করেছে। সমুদ্রের তলা থেকে আরম্ভ করে বায়ুমণ্ডলের প্রান্ত পর্যন্ত সব জায়গাতেই বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্ত বয়ে চলল।

এমন অবস্থায়, যখন সবলের সঙ্গে দুর্বলের বৈষম্য এত অত্যন্ত বেশি, তখনো যদি দেখা যায় এত বড়ো বলবানেরও ভীরুতা ঘুচল না, তা হলে সেই ভীরুতার কারণটা ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। ভেবে দেখা দরকার এইজন্যে যে, য়ুরোপে আজকের যে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে সেই শান্তি টেকসই হবে কিনা সেটা বিচার করতে হলে এই-সমস্ত বলিষ্ঠদের মনস্তত্ত্ব বুঝে দেখা চাই।

যুদ্ধ যখন প্রবল বেগে চলছিল, যখন হারের আশঙ্কা জিতের আশার চেয়ে কম ছিল না, তখন সেই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সন্ধির শর্তভঙ্গ, অস্ত্রাদি প্রয়োগে বিধিবিরুদ্ধতা, নিরস্ত্র শত্রুদের প্রতি বায়ুরথ থেকে অস্ত্রবর্ষণ প্রভৃতি কাণ্ডকে এ-পক্ষ 'ক্রাইম' অর্থাৎ অপরাধ বলে অভিযোগ করেছিলেন। মানুষ 'ক্রাইম' কখন করে ? যখন সে ধর্মের গরজের চেয়ে আর-কোনো একটা গরজকে প্রবল বলে মনে করে। যুদ্ধে জয়লাভের গরজটাকেই জর্মনি ন্যায়াচরণের গরজের চেয়ে আশু গুরুতর বোধ করেছিল। এ-পক্ষ যখন সেজন্যে আঘাত পাচ্ছিলেন তখন বলছিলেন, জর্মনির পক্ষে কাজটা একেবারেই ভালো হচ্ছে না ; হোক-না যুদ্ধ, তাই বলে কি আইন নেই, ধর্ম নেই। আর যখন বিজিত প্রদেশে জর্মনি লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিতে দয়াবোধ করে নি তখন আশু প্রয়োজনের দিক থেকে জর্মনির পক্ষে তার কারণ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এ-পক্ষে বলেছিল, আশু প্রয়োজন-সাধনাটাই কি মানুষের চরম মনুষ্যত্ব। সভ্যতার কি একটা দায়িত্ব নেই। সেই দায়িত্বরক্ষার চেয়ে যারা উপস্থিত কাজ-উদ্ধারকেই বড়ো মনে করে তারা কি সভ্যসমাজে স্থান পেতে পারে।

ধর্মের দিক থেকে এ-সকল কথার একেবারে জবাব নেই। শুনে আমাদের মনে হয়েছিল যুদ্ধের অগ্নিতে এবার বুঝি কলিযুগের সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে গেল, এতদিন পরে মানুষের দশা ফিরবে, কেননা তার মন ফিরছে। মন না ফিরলে কেবলমাত্র অবস্থা বা ব্যবস্থা পরিবর্তনে কখনোই কোনো ফল পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমাদের তখন হিসাবে একটা ভুল হয়েছিল। আমাদের দেশে শ্মশান-বৈরাগ্যকে লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। তার কারণ, প্রিয়জনের আশু মৃত্যুতে মন যখন দুর্বল তখনকার বৈরাগ্যে বিশ্বাস নেই, সবল মনের বৈরাগ্যই বৈরাগ্য। তেমনি যুদ্ধফলের অনিশ্চয়তায় মন যখন দুর্বল তখনকার ধর্মবাক্যকে ষোলো-আনা বিশ্বাস করা যায় না।

যুদ্ধে এ-পক্ষের জিত হল। এখন কী করলে পৃথিবীতে শান্তির ভিত পাকা হয় তাই নিয়ে পঞ্চায়েত বসে গেছে। কথা-কাটাকাটি, প্রস্তাব-চালাচালি, রাজ্য-ভাগাভাগি চলছে। এই কারখানাঘর থেকে কী আকার এবং কী শক্তি নিয়ে কোন্ যন্ত্র বেরবে তা ঠিক বুঝতে পারছি নে।

আর-কিছু না বুঝি একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে ; এত আগুনেও কলিযুগের অন্ত্যেষ্টিসংকার হল না, মন বদল হয় নি। কলিযুগের সেই সিংহাসনটা আজ কোন্‌খানে। লোভের উপরে। পেতে চাই, রাখতে চাই, কোনোমতেই কোথাও একটুও কিছু ছাড়তে চাই নে। সেইজন্যেই অতিবড়ো বলিষ্ঠের ভয়, কী জানি যদি দৈবাৎ এখন বা সুদূর কালেও একটুখানি লোকসান হয়। যেখানে লোকসান কোনোমতেই সইবে না, সেখানে আইনের দোহাই, ধর্মের দোহাই মিথ্যে। সেখানে অন্যায়কে কর্তব্য বলে আপনাকে ভোলাতে একটুও সময় লাগে না ; সেখানে দোষের বিচার দোষের

পরিমাণের দিক থেকে নয়, আইনের দিক থেকে নয়, নিজের লোভের দিক থেকে।

এই ভয়ংকর লোভের দিনে সবলকে সবল যখন ভয় করতে থাকে, তখন উচ্চতানের ধর্মের দোহাই দিয়ে রফারফির কথা হতে থাকে, তখন আইনের মধ্যে কোনো ছিদ্র কোনো জায়গায় যাতে একটুও না থাকতে পারে সেই চেষ্টা হয়। কিন্তু দুর্বলকে যখন সেই সময়েই সেই লোভেরই তাড়ায় সবল এতটুকু পরিমাণেও ভয় করে, তখন শাসনের উত্তেজনা কোনো দোহাই মানতে চায় না, তখন আইনের মধ্যে বড়ো বড়ো ছিদ্র খনন করা হয়।

প্রবলের ভয়ে এবং দুর্বলের ভয়ে মস্ত একটা তফাত আছে। দুর্বল ভয় পায় সে ব্যথা পাবে, আর প্রবল ভয় পায় সে বাধা পাবে। সকলেই জানেন কিছুকাল থেকে পাশ্চাত্য দেশে Yellow Peril বা পীতসংকট নাম নিয়ে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এই আতঙ্কের মূল কথাটা এই যে, প্রবলের লোভ সন্দেহ করছে পাছে আর কোথাও থেকে সেই লোভ কোনো-একদিন প্রবল বাধা পায়। বাধা পাবার সম্ভাবনা কিসে। যদি আর-কোনো জাতি এই প্রবলদেরই মতো সকল বিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। তাদের মতো বড়ো হওয়া একটা সংকট— এইটে নিবারণ করবার জন্যে অন্যদের চেপে ছোটো করে রাখা দরকার। সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ আজ এই নীতি নিয়ে বাকি জগতের সঙ্গে কারবার করছে। এই নীতিতে নিরন্তর যে-ভয় জাগিয়ে রাখে তাতে শান্তি টিকতে পারে না।

জগদ্‌বিখ্যাত ফরাসী-লেখক আনাতোল ফ্রাঁস লিখছেন :

It does not, however, appear at first sight that the Yellow Peril at which European economists are terrified is to be compared to the White Peril suspended over Asia. The Chinese do not send to Paris, Berlin, and St. Petersburg missionaries to teach Christians the Fungchui, and sow disorder in European affairs. A Chinese expeditionary force did not land in Quiberon Bay to demand of the Government of the Republic extra-territoriality, i.e., the right of trying by a tribunal of mandarins cases pending between Chinese and Europeans. Admiral Togo did not come and bombard Brest Roads with a dozen battleships, for the purpose of improving Japanese trade in France. He did not burn Verseilles in the name of a higher civilisation. The army of the Great Asiatic Powers did not carry away to Tokio and Peking the Louvre paintings and the silver service of the Elysee.

No indeed ! Monsieur Edmond Thery himself admits that the yellow men are not sufficiently civilised to imitate the whites so faithfully. Nor does he foresee that they will ever rise to so high a moral culture. How could it be possible for them to possess our virtues ? They are not Christians. But men entitled to speak consider that the Yellow Peril is none the less to be dreaded for all that it is economic. Japan and China organised by Japan, threaten us in all the markets of Europe, with a competition frightful, monstrous, enormous, and deformed, the mere idea of which causes the hair of the economists to stand on end.

অর্থাৎ লোভ কোথাও বাধা পেতে চায় না। সেইজন্যে যে নীচে আছে তাকে চিরকালই নীচে চেপে রাখতে চায়, এবং যে প্রবল হয়ে ওঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে তাকে অকল্যাণ বলেই গণ্য করে।

যতক্ষণ এই লোভ আছে ততক্ষণ জগতে শান্তি আনে পীস্‌-কন্‌ফারেন্সের এমন সাধ্য নেই। কলে অনেক জিনিস তৈরি হচ্ছে কিন্তু কলে-তৈরি শান্তিকে বিশ্বাস করি নে। কর্মিক-ধনিকদের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, একরাজ্য-অন্যরাজ্যের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, আবার রাজা ও প্রজার মধ্যে যে-অশান্তি তারও কারণ লোভ। তাই শেষকালে দাঁড়ায় এই, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

এমন অবস্থায় সবলপক্ষীয়েরা যখন আপসনিষ্পত্তির যোগে শান্তিকামনা করে তখন তারা নিজেদের

পারে পাকাবাঁধ বেঁধে এবং অন্যদের পারে পাকাখাদ কেটে লোভের স্রোতটাকে নিজেদের দিক থেকে অন্য দিকে সরিয়ে দেয়। বসুন্ধরাকে এমন জায়গায় পরস্পর বখরা করে নিতে চায় যে-জায়গাটা যথেষ্ট নরম, অনায়াসেই যেখানে দাঁত বসে, এবং ছিঁড়তে গিয়ে নখে যদি আঘাত লাগে, নখ তার শোধ তুলতে পারে। কিন্তু জোর করে বলা যায় এমন ভাবে চিরদিন চলবে না ; ভাগ সমান হবে না, লোভের ক্ষুধা সব জায়গায় সমান করে ভরবে না, পাপের ছিদ্র নানা জায়গায় থেকে যাবে ; হঠাৎ একদিন ভরাডুবি হবে।

বিধাতা আমাদের একটা দিকে নিশ্চিন্ত করেছেন, ঐ বলের দিকটায় আমাদের রাস্তা একেবারে শেষ ফাঁকটুকু পর্যন্ত বন্ধ, যে-আশা রাস্তা না পেলেও উড়ে চলে সেই আশারও ডানা কাটা পড়েছে। আমাদের জন্যে কেবল একটা বড়ো পথ আছে, সে হচ্ছে দুঃখের উপরে যাবার পথ। রিপু আমাদের বাইরে থেকে আঘাত দিচ্ছে দিক, তাকে আমরা অন্তরে আশ্রয় দেব না। যারা মারে তাদের চেয়ে আমরা যখন বড়ো হতে পারব তখন আমাদের মার-খাওয়া ধন্য হবে। সেই বড়ো হবার পথ না লড়াই করা, না দরখাস্ত লেখা।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবম্ অধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥

৩

অন্যের সঙ্গে কথা কওয়া এবং অন্যের সঙ্গে চিঠি লেখার ব্যবস্থা আছে সংসার জুড়ে। আর নিজের সঙ্গে ? সেটা কেবল এই বাতায়নটুকুতে। কিন্তু নিজের মধ্যে কার সঙ্গে কে কথা কয়।

একটা উপমা দেওয়া যাক। মাটির জলের খানিকটা সূক্ষ্ম হয়ে মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে যায়। সেখান থেকে সেই নির্মল দূরত্বের সংগীত এবং উদার বেগ নিয়ে ধারায় ধারায় পুনর্বার সে মাটির জলে ফিরে আসতে থাকে।

এই জলেরই মতো মানুষের মনের একটা ভাগ সংসারের ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে উড়ে যায়, সেই আকাশচারী মনটা মাঝে মাঝে আবার যদি এই ভূচর মনের সঙ্গে মিলতে পারে তবে তাতেই পূর্ণতা ঘটে।

কিন্তু এমন-সকল মরুপ্রদেশ আছে যেখানে প্রায় সমস্ত বৎসর ধরেই অনাবৃষ্টি। বাষ্প হয়ে যা উপরে চলে গেল বর্ষণ হয়ে তা আর ধরায় নেমে আসে না। নীচের মনের সঙ্গে উপরের মনের আর মিলন হয় না। সেখানে খাল-কাটা জলে কাজ চলে যায়, কিন্তু সেখানে আকাশের সঙ্গে মাটির শুভসংগমের সংগীত এবং শঙ্খধ্বনি কোথায়। সেখানে বর্ষণমুখরিত রসের উৎসব হল না। সেখানে মনের মধ্যে চিরবিরহের একটা শুষ্কতা রয়ে গেল।

এ তো গেল অনাবৃষ্টির কথা। এ ছাড়া মাঝে মাঝে কাদাবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি প্রভৃতি নানা উৎপাতের কথা শোনা যায়। আকাশের বিশুদ্ধতা যখন চলে যায়, বাতাস যখন পৃথিবীর নানা আবর্জনায় পূর্ণ হয়ে থাকে তখনই এই-সব কাণ্ড ঘটে। তখন আকাশের বাণীও নির্মল হয়ে পৃথিবীকে পবিত্র করে না। পৃথিবীরই পাপ পৃথিবীতে ফিরে আসতে থাকে।

আজকের দিনে সেই দুর্যোগ ঘটেছে। পৃথিবীর পাপের ধূলিতে আকাশের বর্ষণও আবিল হয়ে নামছে। নির্মল ধারায় পুণ্যস্নানের জন্যে অনেক দিনের যে-প্রতীক্ষা তাও আজ বারে বারে ব্যর্থ হল। মনের মধ্যে কাদা লাগছে এবং রক্তের চিহ্ন এসে পড়ছে ; বার বার কত আর মুছব।

রক্তকলঙ্কিত পৃথিবী থেকে ঐ যে আজ একটা শান্তির দরবার উঠেছে, ঊর্ধ্ব আকাশের নির্মল নিঃশব্দতা তার বেসুরকে ধুয়ে দিতে পারছে না।

শান্তি ? শান্তির দরবার সত্য সত্যই কে করতে পারে। ত্যাগের জন্যে যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্যে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা লেজের মতো কিলবিল করছে তারা শান্তি

চায় বটে কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে, দাম দিয়ে নয়। যে-শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীরসর বাটি চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে সেই শান্তি।

দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর এই ক্ষীরসরের বড়ো বড়ো ভাণ্ডগুলো প্রায় আছে দুর্বলদের জিম্মায়। এইজন্য যে-ত্যাগশীলতায় সত্যকার শান্তি সেই ত্যাগের ইচ্ছা প্রবলদের মনে কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। যেখানে শক্ত পাহারা সেখানে লোভ দমন করতে বেশি চেষ্টা করতে হয় না। সেখানে মানুষ সংযত হয় এবং নিজেকে খুব ভালো ছেলে বলেই মনে করে। কিন্তু আলগা পাহারা যেখানে, সেখানে ভয়ও থাকে না, লজ্জাও চলে যায়। এমন-সব জায়গা আছে যেখানে ভালো ছেলে বলে নিজের পরিচয় দিলে লাভ আছে ; কিন্তু দুর্বলের সঙ্গে যেখানে কারবার সেখানে বেচারা প্রবলপক্ষের ভালো হওয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ বলেই যে কত কঠিন তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বিখ্যাত ফরাসীলেখক আনাতোল ফ্রাঁসের লেখা থেকে একটা জায়গা উদ্‌ধৃত করি। তিনি চীনদেশের সঙ্গে য়ুরোপের সম্বন্ধ আলাচনা উপলক্ষে লিখছেন :

In our own times, the Christian acquired the habit of sending jointly or separately into that vast Empire, whenever order was disturbed, soldiers who restored it by means of theft, rape, pillage, murder, and incendiarism and of proceeding at short intervals with the pacific penetration of the country with rifles and guns. The poorly armed Chinese either defend themselves badly or not at all, and so they are massacred with delightful facility... In 1901, order having been disturbed at Peking, the troops of the five Great Powers, under the command of a German Field-Marshal, restored it by the customary means. Having in this fashion covered themselves with military glory, the five Powers signed one of the innumerable treaties by which they guarantee the integrity of the very China whose provinces they divide among themselves.

পীকিনে যে ভাঙচুর, লুটপাট ও উৎপাত হয়েছিল মানুষের দুঃখ এবং অপমানের পক্ষে সে বড়ো কম নয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে লজ্জা-পাওয়া এবং লজ্জা-দেওয়ার পরিমাণ আধুনিক য়ুরোপীয় যুদ্ধঘটিত আলোচনার তুলনায় কতই অণুপরিমাণমাত্র তা সকলেই জানেন। এর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ভালো হওয়ার যে কঠিন আদর্শ মানুষের মনুষ্যত্বকে ঊর্ধ্বে ধারণ করে রাখে দুর্বলের সংসর্গে সেইটে নেমে যায়। মানুষ নিজের অগোচরে নিজের সঙ্গে একটি সন্ধিপত্র লেখাপড়া করে নেয়— বলে, ভালোমন্দর বিচার নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজের যে-একটা নিরন্তর লড়াই চলছে অমুক-অমুক চৌহুদ্দির মধ্যে সেটাকে যথেষ্ট পরিমাণ ঢিল দেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে আমরাও এ কাজ করেছি, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ এত দুর্বল করেছিল যে তার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের না ছিল লজ্জা, না ছিল ভয়। আমাদের সংহিতাগুলি আলোচনা করলে এ কথা ধরা পড়বে। দেশ জুড়ে আজ তার যে ফল ফলেছে তা বোঝবার শক্তি পর্যন্ত চলে গেছে, দুর্গতি এত গভীর।

যে দুর্বল, সবলের পক্ষে সে তেমনি ভয়ংকর, হাতির পক্ষে যেমন চোরাবালি। এই বালি বাধা দিতে পারে না বলেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, কেবলই নীচের দিকে টেনে নেয়। শক্তির আয়তন যত প্রকাণ্ড, তার ভার যতই বেশি, তার প্রতি অশক্তির নীচের দিকের টান ততই ভয়ংকর। যে-মাটি বাধা দেয় না, তাকে পদাঘাত যত জোরেই করবে, পদের পক্ষে ততই বিপদ ঘটবে।

যে-জায়গায় হাওয়া হালকা সেই জায়গাই হচ্ছে ঝড়ের কেন্দ্র। এইজন্যে য়ুরোপের বড়ো বড়ো ঝড়ের আসল জন্মস্থান এশিয়া আফ্রিকা। ঐখানে বাধা কম, ঐখানে ন্যায়পরতার য়ুরোপীয় আদর্শ খাড়া রাখবার প্রেরণা দুর্বল। এবং আশ্চর্য এই যে, সেই ন্যায়পরতার আদর্শ যে নেমে চলেছে বলদর্পে মানুষ সেটা বুঝতেই পারে না। এইটেই হচ্ছে দুর্গতির পরাকাষ্ঠা।

এই অসাড়তা, এই অন্ধতা এতদূর পর্যন্ত যায় যে, এক-এক সময়ে তার কাণ্ড দেখে বড়ো দুঃখেও হাসি আসে। য়ুরোপের শুঁড়িখানা থেকে পোলিটিক্যাল মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে এমন একদল যুবক

আমাদের দেশে আছে। তারা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে। তাই দেখে অনেকবার এই কথাই ভেবেছি, মানুষের স্বদেশী পাপের তো অভাব নেই, এর উপরে যারা বিদেশী পাপের আমদানি করছে তারা আমাদের কলুষের ভার আরো দুর্বহ করে তুলছে। এমন সময়ে আমাদের বাংলাদেশের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা এই-সমস্ত পোলিটিক্যাল হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ করে বলে বসলেন, খুন করা সম্বন্ধে বাংলাদেশের ধর্মবুদ্ধি য়ুরোপের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র ; তিনি বলেন, বাঙালি জানে, খুন করা আর-কিছুই নয়, মানুষকে এক লোক থেকে আর-এক লোকে চালান করে দেওয়া মাত্র।[১] যে-পাশ্চাত্যদের কাছে বাঙালি ছাত্র এই-সমস্ত অপকর্ম শিখেছে অবশেষে তাঁদেরই কাছ থেকে এই বিচার ! পলিটিক্সের হাটে তাঁরা মানুষের প্রাণ যে কী রকম ভয়ংকর সস্তা করে তুলেছেন, সেটা বোধ হয় অভ্যাসবশত নিজে তেমন করে দেখেন না বাইরের লোকে যেমন দেখতে পায়। এই-সব পলিটিক্স-বিলাসীদের কি কোনো বিশেষ মনস্তত্ত্ব নেই। তাঁদের সেই মনস্তত্ত্বের শিক্ষাটাই আজ সমস্ত পৃথিবীময় খুন ছড়িয়ে চলেছে, এ কথা তাঁরাও ভুললেন ?

ওরা আমাদের থেকে আলাদা, একেবারে ভিতরের দিক থেকে আলাদা, এই কথা যারা বলে তারা এরা-ওরার সম্বন্ধকে গোড়া ঘেঁষে কলুষিত করে। এদের সম্বন্ধে যে-নিয়ম ওদের সম্বন্ধে সে-নিয়ম চলতেই পারে না|ব'লে|তারা নিজের ধর্মবুদ্ধিকে ঠাণ্ডা রাখে ; অন্যায়ের মধ্যে নিষ্ঠুরতার মধ্যে যতটুকু চক্ষুলজ্জা এবং অস্বস্তি আছে সেটুকু তারা মেরে রাখতে চায়। যতদিন ধরে প্রাচ্যদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদের সম্বন্ধ হয়েছে ততদিন থেকেই এই-সব বুলির উৎপত্তি। গায়ের জোরে যাদের প্রতি অন্যায় করা সহজ, তাদের সম্বন্ধে অন্যায় করতে পাছে মনের জোরেও কোথাও বাধে সেইজন্যে এরা সে রাস্তাটুকুও সাফ রাখতে চায়।

আমি পূর্বেই বলেছি, দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়, নিজেদের এক আদর্শে বিচার করি, অন্যদের অন্য আদর্শে। নিজেদের ছাত্রেরা যখন গোলমাল করে তখন সেটাকে স্নেহপূর্বক বলি যৌবনোচিত চাঞ্চল্য, অন্যদের ছাত্ররাও যখন মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে সেটাকে চোখ রাঙিয়ে বলি নষ্টামি। পরজাতিবিদ্বেষের লেশমাত্র লক্ষণে ভয়ংকর রাগ হয় যখন সেটা দেখি দুর্বলের তরফে, আর নিজের তরফে তার সাতগুণ বেশি থাকলেও তার এতরকমের সংগত কারণ পাওয়া যায় যে, সেটার প্রতি স্নেহই জন্মায়। আবার আনাতোল ফ্রাঁসের দ্বারস্থ হচ্ছি। তার কারণ, চিত্ত তাঁর স্বচ্ছ, কল্পনা তাঁর দীপ্তিমান, এবং যেটা অসংগত সেটা তাঁর কৌতুকদৃষ্টিতে মুহূর্তে ধরা পড়ে ; পররাজ্যশাসনের বালাই তাঁর কোনোদিন ঘটে নি। চীনেদের কথাই চলছে :

They are polite and ceremonious, but are reproached with cherishing feeble sentiments of affections for Europeans. The grievances we have against them are greatly of the order of those which Mr. Du Chaillu cherished towards his Gorilla. Mr. du Chaillu, while in a forest, brought down with his rifle the mother of a Gorilla. In its death the brute was still pressing its young to its bosom. He tore it from its embrace, and dragged it with him in a cage across Africa, for the purpose of selling it in Europe. Now, the young animal gave him just cause for complaint. It was unsociable, and actually starved itself to death. "I was powerless," says Mr. Du Chaillu, "to correct its evil nature."

তাই বলছি, সবলের সব চেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে দুর্বলের কাছে। দুর্বল তার ধর্মবুদ্ধি এমন করে অপহরণ করে যে, সবল তা দেখতেই পায় না, বুঝতেই পারে না। আজকের দিনে এই বিপদটাই পৃথিবীতে সব চেয়ে বেড়ে উঠেছে। কেননা হঠাৎ বাহুবলের অতিবৃদ্ধি ঘটেছে। দুর্বলকে শাসন করা

১ ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ দ্বীপে প্রতি লক্ষ লোকে ·১৭ অংশ লোকের খুনের অভিযোগে বিচার হয়েছিল। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে বাংলা দেশে প্রতি লক্ষ লোকে ·০৮ অংশ লোকের খুনের চার্জে বিচার হয়েছিল। হাতের কাছে বই না থাকাতে সম্পূর্ণ তালিকা দিতে পারলাম না।

ক্রমেই নিরতিশয় অবাধ হয়ে আসছে। এই শাসন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এতই আটঘাট-বাঁধা যে, এর জালে যে-বেচারা পড়েছে কোথাও কোনোকালে এতটুকু ফাঁক দিয়ে একটুখানি বেরবার তার আশা নেই। তবুও কিছুতেই আশ মিটছে না, কেননা লোভ যে ভীরু, সে অতিবড়ো শক্তিমানকে নিশ্চিন্ত হতে দেয় না। শক্তিমান তাই বসে বসে এই ঠাওরাচ্ছে যে, শাসনের ইস্ক্রু-কলে এমনি কষে প্যাঁচ দিতে হবে যে, নালিশ জানাতে মানুষের সাহস হবে না, সাক্ষ্য দিতে ভয় পাবে, ঘরের কোণেও চেঁচিয়ে কাঁদলে অপরাধ হবে। কিন্তু শাসনকে এত বেশি সহজ করে ফেলে যারা সেই শাসনের ভার নিচ্ছে, নিজের মনুষ্যত্বের তহবিল ভেঙে এই অতিসহজ শাসনের মূল্য তাদের জোগাতে হবে। প্রতিদিন এই যে তহবিল ভেঙে চলা এর ফলটা প্রতিদিন নানা আকারে নিজের ঘরেই দেখা দেবে। এখনো দেখা দিচ্ছে কিন্তু তার হিসাব কেউ মিলিয়ে দেখছে না।

এই তো প্রবলপক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য। আমাদের পক্ষে এ-সব কথা বেশি করে আলোচনা করতে বড়ো লজ্জা বোধ হয়, কেননা বাইরে থেকে এর আকারটা উপদেশের মতো, কিন্তু এর ভিতরের চেহারাটা মার খেয়ে কান্নারই রূপান্তর। এক দিকে ভয় আর-এক দিকে কান্না, দুর্বলের এইটেই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা। প্রবলের সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি আমাদের নেই কিন্তু নিজের সঙ্গে লড়াই আমাদের করতেই হবে। আর যাই করি, ভয় আমরা করব না, এবং কথা বলা যদি বন্ধ করে দেয় তবে সমুদ্রের এ-পার থেকে ও-পার পর্যন্ত নাকি সুরে কান্না আমরা তুলব না।

দুঃখের আগুন যখন জ্বলে তখন কেবল তার তাপেই জ্বলে মরব আর তার আলোটা কোনো কাজেই লাগাব না এটা হলেই সব চেয়ে বড়ো লোকসান। সেই আলোটাতে মোহ-আঁধার ঘুচুক, একবার ভালো করে চেয়ে দেখো। নিজের মনকে একবার জিজ্ঞাসা করো, ঐ বীভৎস শক্তিমান মানুষটাকে যত বড়ো দেখাচ্ছে সে কি সত্যই তত বড়ো। বাইরে থেকে সে ভাঙচুর করতে পারে কিন্তু ভিতর থেকে মানুষের জীবনের সম্পদ লেশমাত্র যোগ করে দিয়ে যাবার সাধ্য ওর আছে? ও সন্ধি করতে পারে কিন্তু শান্তি দিতে পারে কি। ও অভিভূত করতে পারে কিন্তু শক্তি দান করতে পারে কি। আজ প্রায় দু-হাজার বছর আগে সামান্য একদল জাল-জীবীর অখ্যাত এক গুরুকে প্রবল রোম সাম্রাজ্যের একজন শাসনকর্তা চোরের সঙ্গে সমান দণ্ডকাষ্ঠে বিঁধে মেরেছিল। সেদিন সেই শাসনকর্তার ভোজের অন্নে কোনো ব্যঞ্জনের ত্রুটি হয় নি এবং সে আপন রাজপালঙ্কে আরামেই ঘুমতে গিয়েছিল। সেদিন বাইরে থেকে বড়ো দেখিয়েছিল কাকে। আর আজ? সেদিন সেই মশানে বেদনা এবং মৃত্যু এবং ভয়, আর রাজপ্রাসাদে ভোগ এবং সমারোহ। আর আজ? আমরা কার কাছে মাথা নত করব। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

৪

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়টা হচ্ছে, এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আর-এক দেবতার অভ্যুদয়। সহজেই এই কথা মনে হয় যে, দুই-দেবতার মধ্যে যদি কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকে তা হলে সেটা ধর্মনীতিগত আদর্শেরই তারতম্য নিয়ে। যদি মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে নূতন দেবতা পুরাতন দেবতার চেয়ে বেশি তৃপ্তি দিতে পারেন তা হলেই তাঁকে বরণ করবার সংগত কারণ পাওয়া যায়।

কিন্তু এখানে দেখি একেবারেই উলটো। এককালে পুরুষদেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়েদেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পুজো চাই। অর্থাৎ যে-জায়গায় আমার দখল নেই, সে-জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কী। গায়ের জোর। কী উপায়ে দখল করবে। যে উপায়েই হোক। তার পরে যে-সকল উপায় দেখা গেল মানুষের সদ্‌বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই-সকল উপায়েরই জয় হল। ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল-করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে

আপন জয়গান গাইয়ে নিলে। লজ্জিত কবিরা কৈফিয়ত দেবার ছলে মাথা চুলকিয়ে বললেন, কী করব, আমার উপর স্বপ্নে আদেশ হয়েছে। এই স্বপ্ন একদিন আমাদের সমস্ত দেশের উপর ভর করেছিল।

সেদিনকার ইতিহাস স্পষ্ট নয়। ইতিহাসের যে-একটা আবছায়া দেখতে পাচ্ছি সেটা এইরকম— বাংলা সাহিত্য যখন তার অব্যক্ত কারণ-সমুদ্রের ভিতর থেকে প্রবাল-দ্বীপের মতো প্রথম মাথা তুলে দেখা দিলে তখন বৌদ্ধধর্ম জীর্ণ হয়ে বিদীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে নানাপ্রকার বিকৃতিতে পরিণত হচ্ছে। স্বপ্নে যেমন এক থেকে আর হয়, তেমনি করেই বুদ্ধ তখন শিব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শিব ত্যাগী, শিব ভিক্ষু, শিব বেদবিরুদ্ধ, শিব সর্বসাধারণের। বৈদিক দক্ষের সঙ্গে এই শিবের বিরোধের কথা কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গলের গোড়াতেই প্রকাশিত আছে। শিবও দেখি বুদ্ধের মতো নির্বাণমুক্তির পক্ষে ; প্রলয়েই তাঁর আনন্দ।

কিন্তু এই শান্তির দেবতা, ত্যাগের দেবতা টিকল না। য়ুরোপেও আধুনিক শক্তিপূজক বলছেন, যিশুর মতো অমন গরিবের দেবতা, নিরীহ দেবতা, অমন নেহাত ফিকে রক্তের দেবতা নিয়ে আমাদের চলবে না। আমাদের এমন দেবতা চাই জোর করে যে কেড়ে নিতে পারে, যেমন করে হোক যে নিজেকে জাহির করতে গিয়ে না মানে বাধা, না পায় ব্যথা, না করে লজ্জা। কিন্তু য়ুরোপে এই-যে বুলি উঠেছে সে কাদের পান-সভার বুলি। যারা জিতেছে, যারা লুটেছে, পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে যারা তাদের মদের চাট বানিয়ে খাচ্ছে।

আমাদের দেশের মঙ্গলগানের আসরেও ঐ বুলিই উঠেছিল। কিন্তু এ বুলি কোন্‌খান থেকে উঠল। যাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, সম্মান নেই সেই হতভাগাদের স্বপ্নের থেকে। তারা স্বপ্ন দেখল। কখন। যখন—

> নারায়ণ, পরাশর, এড়াইল দামোদর,
> উপনীত কুচট্যানগরে।
> তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান, করিলুঁ উদকপান,
> শিশু কাঁদে ওদনের তরে।
> আশ্রম পুখরি-আড়া, নৈবেদ্য শালুক পোড়া,
> পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
> ক্ষুধাভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা যাই সেই ধামে,
> চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।

সেদিনকার শক্তির স্বপ্ন স্বপ্নমাত্র, সে স্বপ্নের মূল ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমের মধ্যে।

শোনা গেছে ইতিহাসের গান অমিত্রাক্ষরে হয় না, এর চরণে-চরণে মিল। সেই পাঁচশো বছর পূর্বের এক চরণের সঙ্গে আজ পাঁচশো বছর পরের এক চরণের চমৎকার মিল শোনা যাচ্ছে না কি। য়ুরোপের শক্তিপূজক আজ বুক ফুলিয়ে বড়ো সমারোহেই শক্তির পূজো করছেন ; মদে তাঁর দুই চক্ষু জবাফুলের মতো টক্‌টক্ করছে ; খাঁড়া শাণিত ; বলির পশু যূপে বাঁধা। তাঁরা কেউ কেউ বলছেন, আমরা যিশুকে মানি নে, আবার কেউ কেউ ভারতচন্দ্রের মতো গোঁজামিলন দিয়ে বলছেন, যিশুর সঙ্গে শক্তির সঙ্গে ভেদ করে দেওয়া ঠিক নয়, অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে দুজনকেই সমান মানবার মন্ত্র আছে। অর্থাৎ, একদল মদ খাচ্ছেন রাজাসনে বসে, আর-এক দল পুল্‌পিটে চড়ে।

আর আমরাও বলছি, শিবকে মানব না। শিবকে মানা কাপুরুষতা। আমরা চণ্ডীর মঙ্গল গাইতে বসেছি। কিন্তু সে মঙ্গলগান স্বপ্নলব্ধ। ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমের স্বপ্ন। জয়ীর চণ্ডীপূজায় আর পরাজিতের চণ্ডীগানে এই তফাত।

স্বপ্নেতেই যে আমাদের চণ্ডীগানের আদি এবং স্বপ্নেতেই যে তার অন্ত তার প্রমাণ কী। ঐ দেখো-না ব্যাধের দশা, তার স্ত্রী ফুল্লরার বারমাস্যা একবার শোনো ; কিন্তু হল কী। হঠাৎ খামখেয়ালী শক্তি বিনা কারণে তাকে এমন-একটা আঙটি দিলেন যে, ঘরে আর টাকা ধরে না। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে

এই সামান্য ব্যাধ যখন লড়াই করল, তখন খামকা স্বয়ং হনুমান এসে তার পক্ষ নিয়ে কলিঙ্গের সৈন্যকে কিলিয়ে লাথিয়ে একাকার করে দিলে। একেই বলে শক্তির স্বপ্ন, ক্ষুধা এবং ভয়ের বরপুত্র। হঠাৎ একটা কিছু হবে। তাই সেই অতি-অদ্ভুত হঠাতের আশায় আমরা দলে দলে উচ্চৈঃস্বরে মা মা করে চণ্ডীগান করতে লেগে গেছি। সেই চণ্ডী ন্যায় অন্যায় মানে না, সুবিধার খাতিরে সত্যমিথ্যায় সে ভেদ করে না, সে যেন-তেন প্রকারে ছোটোকে বড়ো, দরিদ্রকে ধনী, অশক্তকে শক্তিমান করে দেয়। তার জন্য যোগ্য হবার দরকার নেই, অন্তরের দারিদ্র্য দূর করবার প্রয়োজন হবে না, যেখানে যা যেমনভাবে আছে আলস্যভরে সেখানে তাকে তেমনি ভাবেই রাখা চলবে। কেবল করজোড়ে তারস্বরে বলতে হবে— মা মা মা!

যখন মোগল পাঠানের বন্যা দেশের উপর ভেঙে পড়ল, তখন সংসারের যে-বাহ্যরূপ মানুষ প্রবল করে দেখতে পেলে সেটা শক্তিরই রূপ। সেখানে ধর্মের হিসাব পাওয়া যায় না,. সেখানে শিবের পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মানুষ যদি তখনো সমস্ত দুঃখ এবং পরাভবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, আমি সব সহ্য করব তবুও কিছুতেই একে দেবতা বলে মানতে পারব না, তা হলেই মানুষের জিত হয়। চাঁদসদাগর কিংবা ধনপতির বিদ্রোহের মধ্যে কিছুদূর পর্যন্ত মানুষের সেই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। মারের পর মার খেয়েছে কিন্তু ভক্তিকে ঠিক জায়গা থেকে নড়তে দেয় নি। মিথ্যা এবং অন্যায় চার দিক থেকে তাদের আক্রমণ করলে; চণ্ডী বললেন, ভয়ে অভিভূত করে, দুঃখে জর্জর করে, ক্ষতিতে দুর্বল করে, মারের চোটে মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে জোর করে আমার পূজা আদায় করবই। নইলে? নইলে আমার প্রেস্টিজ যায়। ধর্মের প্রেস্টিজের জন্যে চণ্ডীর খেয়াল নেই, তাঁর প্রেস্টিজ হচ্ছে ক্ষমতার প্রেস্টিজ। অতএব মারের পর মার, মারের পর মার!

অবশেষে দুঃখের যখন চূড়ান্ত হল, তখন শিবকে সরিয়ে রেখে শক্তির কাছে আধমরা সদাগর মাথা হেঁট করলে। শক্তি তাদের এতদিন যে এত দুঃখ দিয়েছিল সে দুঃখে তেমন অপমান নেই যেমন অপমান শেষকালে এই মাথা হেঁট করে। যে-আত্মা অভয়, যে-আত্মা অমর, সে আপন প্রতিষ্ঠা থেকে নেমে এসে ভয়কে মৃত্যুকে দেবতা বলে, আপনার চেয়ে বড়ো বলে মানলে। এইখানেই শক্তির সকলের চেয়ে বীভৎস পরিচয় পাওয়া গেল।

আমরা আজ য়ুরোপের দেবতাকে স্বপ্নে পূজো করতে বসেছি, এইটেতেই য়ুরোপের কাছে আমাদের সব চেয়ে পরাভব হয়েছে। যদি সে আমাদের আঘাত করতে চায় করুক, আমরা সহ্য করব, কিন্তু তাই বলে পূজো করব? সে চলবে না; কেননা পূজো করতে হবে ধর্মরাজকে। সে দুঃখ দেবে, দিক গে। কিন্তু হারিয়ে দেবে? কিছুতে না। মরার বাড়া গাল নেই; কিন্তু মরেও অমর হওয়া যায় এই কথা যদি কিছুতে ভুলিয়ে দেয় তা হলে তার চেয়ে সর্বনেশে মৃত্যু আর নেই।

মহান্তং বিভুম্ আত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।

৫

মানুষের ইতিহাসের রথ আজ যত বড়ো ধাক্কা খেয়েছে এমন আর কোনোদিনই খায় নি। তার কারণ আধুনিক ইতিহাসের রথটা কলের গাড়ি, বহু কৌশলে ওর লোহার রাস্তা বাঁধা, আর এক-একটা এঞ্জিনের পিছনে গাড়ির শ্রেণী প্রকাণ্ড লম্বা হয়ে বাঁধা পড়েছে। তার পরে ওর পথ চলেছে জগৎ জুড়ে, নানা জায়গায় নানা পথে কাটাকাটি। কাজেই কলে কলে যদি একবার সংঘাত বাধল, যদি পরস্পরকে বাঁচিয়ে চলতে না পারল, তা হলে সেই দুর্যোগে ভাঙচুরের পরিমাণ অতি ভয়ানক হয়ে ওঠে, এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে থাকে।

এই কলের গাড়ির সংঘাত এবারে খুব প্রবল ধাক্কায় ঘটেছে, কী মাল কী সওয়ারী নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। তাই চারি দিকে প্রশ্ন উঠেছে, এ কী হল, কেমন করে হল, কী করলে ভবিষ্যতে এমন আর না হতে পারে।

মানুষের ইতিহাসে এই প্রশ্ন এবং বিচার যখন উঠে পড়েছে তখন আমাদেরও কি ভাবতে হবে না। তখন শুধুই কি পরের নামে নালিশ করব। নিজের দায়িত্বের কথা স্মরণ করব না?

আমি পূর্বেও আভাস দিয়েছি এখনো বলছি দুর্বলের দায়িত্ব বড়ো ভয়ানক। বাতাসে যেখানে যা-কিছু ব্যাধির বীজ ভাসছে দুর্বল তাকেই আতিথ্য দান করে তাকে নিজের জীবন দিয়ে জিইয়ে রাখে। ভীরু কেবল ভয়ের কারণকে বাড়িয়ে চলে, অবনত কেবল অপমানকে সৃষ্টি করে।

চোখে যেখানে আমরা দেখতে পাই নে সেখানে আমাদের ব্যথা পৌঁছয় না; মাটির উপর যে-সব পোকামাকড় আছে তাদের আমরা অবাধে মাড়িয়ে চলি কিন্তু যদি সামনে একটা পাখি এসে পড়ে তার উপরে পা ফেলতে সহজে পারি নে। পাখির সম্বন্ধে যে-বিচার করি পিঁপড়ের সম্বন্ধে সে-বিচার করি নে।

অতএব মানুষের প্রধান কর্তব্য তাকে এমনটি হতে হবে যাতে তাকে মানুষ বলে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এ কর্তব্য কেবল তার নিজের সুবিধের জন্যে নয়, পরের দায়িত্বের জন্যেও। মানুষ মানুষকে মাড়িয়ে যাবে, এটা, যে-লোক মাড়ায় এবং যাকে মাড়ানো হয় কারও পক্ষে কল্যাণের নয়। আপনাকে যে খর্ব করে সে যে কেবল নিজেকেই কমিয়ে রাখে তা নয় মোটের উপর সমস্ত মানুষের মূল্য সে হ্রাস করে। কেননা, যেখানে আমরা মানুষকে বড়ো দেখি সেখানেই আপনাকে বড়ো বলে চিনতে পারি— এই পরিচয় যত সত্য হয় নিজেকে বড়ো রাখবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে তত সহজ হয়।

প্রত্যেক মানুষের যে-দেশে মূল্য আছে সমস্ত জাতি সে-দেশে আপনিই বড়ো হয়। সেখানে মানুষ বড়ো করে বাঁচবার জন্যে নিজের চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করে, এবং বাধা পেলে শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকে। সে মানুষ যারই সামনে আসুক, তার চোখে সে পড়বেই, কাজেই ব্যবহারের বেলায় তার সঙ্গে ভেবে চিন্তে ব্যবহার করতেই হবে। তাকে বিচার করবার সময় কেবলমাত্র বিচারকের নিজের বিচারবুদ্ধির উপরেই যে ভরসা তা নয়, যথোচিত বিচার পাবার দাবি তার নিজের মধ্যেই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

অতএব যে-জাতি উন্নতির পথে বেড়ে চলেছে তার একটা লক্ষণ এই যে, ক্রমশই সে-জাতির প্রত্যেক বিভাগের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অকিঞ্চিৎকরতা চলে যাচ্ছে। যথাসম্ভব তাদের সকলেই মনুষ্যত্বের পুরো গৌরব দাবি করবার অধিকার পাচ্ছে। এইজন্যেই সেখানে মানুষ ভাবছে, কী করলে সেখানকার প্রত্যেকেই ভদ্র বাসায় বাস করবে, ভদ্রোচিত শিক্ষা পাবে, ভালো খাবে, ভালো পরবে, রোগের হাত থেকে বাঁচবে, এবং যথেষ্ট অবকাশ ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে।

কিন্তু আমাদের দেশে কী হয়েছে। আমরা বিশেষ শিক্ষা দীক্ষা ও ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের অধিকাংশ লোককেই খাটো করে রেখেছি। তারা যে খাটো এটা কোনো তর্ক বা বিচারের উপরে নির্ভর করে না, এটাকে বিধিমতে সংস্কারগত করে তুলেছি। এমনি হয়েছে যে, যাকে ছোটো করেছি সে নিজে হাত জোড় করে বলছে আমি ছোটো। সমাজে তাদের অধিকারকে বড়োর সমতুল্য করতে চেষ্টা করতে তারাই সব চেয়ে বেশি আপত্তি করে।

এমনি করে অপমানকে স্বীকার করে নেবার শিক্ষা ও অভ্যাস সমাজের স্তরে স্তরে নানা আকারে বিধিবদ্ধ হয়ে আছে। যারা নীচে পড়ে আছে সংখ্যায় তারাই বেশি, তাদের জীবনযাত্রার আদর্শ সকল বিষয়েই হীন হলেও উপরের লোককে সেটা বাজে না। বরঞ্চ তাদের চালচলন যদি উপরের আদর্শ অবলম্বন করতে যায় তা হলে সেটাতে বিরক্তি বোধ হয়।

তার পরে এই-সব চির-অপমানে-দীক্ষিত মানুষগুলো যখন মানবসভায় স্বভাবতই জোরগলায় সম্মান দাবি করতে না পারে, যখন তারা এত সংকুচিত হয়ে থাকে যে বিদেশী উদ্ধতভাবে তাদের অবজ্ঞা করতে অন্তরে বাহিরে বাধা বোধ না করে, তখন সেটাকে কি আমাদের নিজেরই কৃতকর্ম বলে গ্রহণ করব না।

আমরা নিজেরা সমাজে যে-অন্যায়কে আটেঘাটে বিধিবিধানে বেঁধে চিরস্থায়ী করে রেখেছি সেই অন্যায় যখন পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অন্যের হাত দিয়ে আমাদের উপর ফিরে আসে তখন সেটা সম্বন্ধে

সর্বতোভাবে আপত্তি করবার জোর আমাদের কোথায়।

জোর করি সেই বিদেশীরই ধর্মবুদ্ধির দোহাই দিয়ে। সে দোহাইয়ে কি লজ্জা বেড়ে ওঠে না। এ কথা বলতে কি মাথা হেঁট হয়ে যায় না যে, সমাজে আমাদের আদর্শকে আমরা ছোটো করে রাখব, আর পলিটিক্সে তোমাদের আদর্শকে তোমরা উঁচু করে রাখো? আমরা দাসত্বের সমস্ত বিধি সমাজের মধ্যে বিচিত্র আকারে প্রবল করে রাখব আর তোমরা তোমাদের ঔদার্যের দ্বারা প্রভুত্বের সমান অধিকার আমাদের হাতে নিজে তুলে দেবে? যেখানে আমাদের এলেকা সেখানে ধর্মের নামে আমরা অতি কঠোর কৃপণতা করব, কিন্তু যেখানে তোমাদের এলেকা সেখানে সেই ধর্মের দোহাই দিয়ে অপর্যাপ্ত বদান্যতার জন্যে তোমাদের কাছে দরবার করতে থাকব এমন কথা বলি কোন্ মুখে। আর যদি আমাদের দরবার মঞ্জুর হয়? যদি আমরা আমাদের দেশের লোককে প্রত্যহ অপমান করতে কুণ্ঠিত না হই, অথচ বিদেশের লোক এসে আপন ধর্মবুদ্ধিতে সেই অপমানিতদের সম্মানিত করে তা হলে ভিতরে বাহিরেই কি আমাদের পরাভব সম্পূর্ণ হয় না।

আজকের দিনে যে কারণে হোক দুঃখ এবং অপমানের বেদনা নিরতিশয় প্রবল হয়ে উঠেছে; এই উপলক্ষে আমাদের মনে একটা কথা আশা করবার আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, ধর্মবুদ্ধিতে যখন অন্যপক্ষের পরাভব হচ্ছে তখন সেইখানে আমরা এদের উপরে উঠব। তা হলে এদের হাতের আঘাতে আমাদের গৌরব হানি করবে না বরং বাড়াবে। কিন্তু সেখানেও কি আমরা বলব ধর্মবুদ্ধিতে তোমরা আমাদের চেয়ে বড়ো হয়ে থাকো; নিজেদের সম্বন্ধে আমরা যে-রকম ব্যবহার করবার আশা করি নে আমাদের সম্বন্ধে তোমরা সেই রকম ব্যবহারই করো? অর্থাৎ চিরদিনই নিজের ব্যবস্থায় আমরা নিজেদের খাটো করে রাখি, আর চিরদিনই তোমরা নিজগুণে আমাদের বড়ো করে তোলো। সমস্ত বরাতই অন্যের উপরে, আর নিজের উপরে একটুও নয়? এত অশ্রদ্ধা নিজেকে, আর এতই শ্রদ্ধা অন্যকে? বাহুবলগত অধমতার চেয়ে এই ধর্মবুদ্ধিগত অধমতা কি আরো বেশি নিকৃষ্ট নয়।

অল্পকাল হল একটা আলোচনা আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তার সিদ্ধান্ত এই যে, পরস্পরের মধ্যে পাকা দেওয়ালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এক চালের নীচে হিন্দু-মুসলমান আহার করতে পারবে না, এমন-কি, সেই আহারে হিন্দু-মুসলমানের নিষিদ্ধ কোনো আহার্য যদি নাও থাকে। যাঁরা এ কথা বলতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না, হিন্দুমুসলমানের বিরোধের সময় তাঁরাই সন্দেহ করেন যে বিদেশী কর্তৃপক্ষেরা এই বিরোধ ঘটাবার মূলে। এই সন্দেহ যখন করেন তখন ধর্মবিচারে তাঁরা বিদেশীকে দণ্ডনীয় মনে করেন। এর একমাত্র কারণ ধর্মের দাবি নিজের উপরে তাঁদের যতটা, বিদেশীর উপরে তার চেয়ে অনেক বেশি। স্বদেশে মানুষে মানুষে ব্যবধানকে আমরা দুঃসহরূপে পাকা করে রাখব সেইটেই ধর্ম, কিন্তু বিদেশী সেই ব্যবধানকে কোনো কারণেই কোনোমতেই নিজের ব্যবহারে লাগালে সেটা অধর্ম। আত্মপক্ষে দুর্বলতাকে সৃষ্টি করব ধর্মের নামে, বিরুদ্ধপক্ষে সেই দুর্বলতাকে ব্যবহার করলেই সেটাকে অন্যায় বলব।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, পাকা দেওয়ালের অপর পারে যেখানে মুসলমান খাচ্ছে দেওয়ালের এপারে সেখানে হিন্দু কেন খেতে পারে না, তা হলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই আবশ্যক হবে না। হিন্দুর পক্ষে এ প্রশ্নে বুদ্ধি খাটানো নিষেধ এবং সেই নিষেধটা বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে কত অদ্ভুত ও লজ্জাকর তা মনে উদয় হবার শক্তি পর্যন্ত চলে গেছে। সমাজের বিধানে নিজের বারো-আনা ব্যবহারের কোনোপ্রকার সংগত কারণ নির্দেশ করতে আমরা বাধ্য নই; যেমন বাধ্য নয় গাছপালা কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী। পলিটিক্সে বিদেশীর সঙ্গে কারবারে আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শিখেছি— সে ক্ষেত্রে সকল রকম বিধিবিধানের একটা বুদ্ধিগত জবাবদিহি আছে বলে মানতে অভ্যাস করছি; কিন্তু সমাজে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার, যার উপরে পরস্পরের গুরুতর সুখদুঃখ শুভাশুভ প্রত্যহ নির্ভর করে সে সম্বন্ধে বুদ্ধির কোনো কৈফিয়ত নেওয়া চলে এ কথা আমরা ভাবতেও একেবারে ভুলে গেছি।

এমনি করে যে-দেশে ধর্মবুদ্ধিতে এবং কর্মবুদ্ধিতে মানুষ নিজেকে দাসানুদাস করে রেখেছে, সে-দেশে কর্তৃত্বের অধিকার চাইবার সত্যকার জোর মানুষের নিজের মধ্যে থাকতেই পারে না।

সে-দেশে এই-সকল অধিকারের জন্যে পরের বদান্যতার উপরে নির্ভর করতে হয়।

কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি মানুষ যেখানে নিজেকে নিজে অত্যন্ত ছোটো এবং অপমানিত করে রাখে সেখানে তার কোনো দাবি স্বভাবত কারও মনে গিয়ে পৌঁছয় না। সেইজন্যে তাদের সঙ্গে যে-সকল প্রবলের ব্যবহার চলে সেই প্রবলদের প্রতিদিন দুর্গতি ঘটতে থাকে। মানুষের সঙ্গে আচরণের আদর্শ তাদের না নেমে গিয়ে থাকতে পারে না। ক্রমশই তাদের পক্ষে অন্যায়, ঔদ্ধত্য এবং নিষ্ঠুরতা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে থাকে। নিজের ইচ্ছাকে অন্যের প্রতি প্রয়োগ করা তাদের পক্ষে একান্ত সহজ হওয়াতেই মানবস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা নিজের অগোচরেই তাদের মনে শিথিল হয়ে আসে। ক্ষমতা যতই অবাধ হয় ক্ষমতা ততই মানুষকে নীচের দিকে নিয়ে যায়। এইজন্যে ক্ষমতাকে যথোচিত পরিমাণে বাধা দেবার শক্তি যার মধ্যে নেই তার দুর্বলতা সমস্ত মানুষেরই শত্রু। আমাদের সমাজ মানুষের ভিতর থেকে সেই বাধা দূর করবার একটা অতি ভয়ংকর এবং অতি প্রকাণ্ড যন্ত্র। এই যন্ত্র এক দিকে বিধান-অক্ষৌহিণী দিয়ে আমাদের চার দিকে বেড়ে ধরেছে, আর-এক দিকে, যে-বুদ্ধি যে-যুক্তি দ্বারা আমরা এর সঙ্গে লড়াই করে মুক্তিলাভ করতে পারতুম, সেই বুদ্ধিকে সেই যুক্তিকে একেবারে নির্মূল করে কেটে দিয়েছে। তার পরে অন্য দিকে অতি লঘু ক্রটির জন্যে অতি গুরুদণ্ড। খাওয়া শোওয়া ওঠা বসার তুচ্ছতম স্খলন সম্বন্ধে শাস্তি অতি কঠোর। এক দিকে মূঢ়তার ভারে অন্য দিকে ভয়ের শাসনে মানুষকে অভিভূত করে জীবনযাত্রার অতি ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও তার স্বাভিরুচি ও স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। তার পরে? তার পরে ভিক্ষা, ভিক্ষা না মিললে কান্না। এই ভিক্ষা যদি অতি সহজেই মেলে, আর এই কান্না যদি অতি সহজেই থামে, তা হলে সকল প্রকার মারের চেয়ে অপমানের চেয়ে সে আমাদের বড়ো দুর্গতির কারণ হবে। নিজেকে আমরা নিজে ছোটো করে রাখব, আর অন্যে আমাদের বড়ো অধিকার দিয়ে প্রশ্রয় দেবে এই অভিশাপ বিধাতা আমাদের দেবেন না বলেই আমাদের এত দুঃখের পর দুঃখ।

জাহাজের খোলের ভিতরটায় যখন জল বোঝাই হয়েছে তখনই জাহাজের বাইরেকার জলের মার সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ভিতরকার জলটা তেমন দৃশ্যমান নয়, তার চালচলন তেমন প্রচণ্ড নয়, সে মারে ভারের দ্বারা, আঘাতের দ্বারা নয়, এইজন্যে বাইরের ঢেউয়ের চড়-চাপড়ের উপরেই দোষারোপ করে তৃপ্তি লাভ করা যেতে পারে; কিন্তু হয় মরতে হবে নয় একদিন এই সুবুদ্ধি মাথায় আসবে যে আসল মরণ ঐ ভিতরকার জলের মধ্যে, ওটাকে যত-শীঘ্র পারা যায় সেঁচে ফেলতেই হবে। কাজটা যদি দুঃসাধ্যও হয় তবু এ কথা মনে রাখা চাই যে, সমুদ্র সেঁচে ফেলা সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ, খোলের জল সেঁচে ফেলা। এ কথা মনে রাখতে হবে, বাইরে বাধাবিঘ্ন বিরুদ্ধতা চিরদিনই থাকবে, থাকলে ভালো বৈ মন্দ নয়— কিন্তু অন্তরে বাধা থাকলেই বাইরের বাধা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। এইজন্যে ভিক্ষার দিকে না তাকিয়ে সাধনার দিকে তাকাতে হবে, তাতে অপমানও যাবে, ফলও পাব।

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শক্তিপূজা

'বাতায়নিকের পত্রে' আমি শক্তিপূজার যে আলোচনা করেছি সে সম্বন্ধে সাময়িকপত্রে একাধিক লোকে প্রতিবাদ লিখেছেন।

আমাদের দেশে শিব এবং শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি ধারা দেখতে পাই। তার মধ্যে একটিকে শাস্ত্রিক এবং আর-একটিকে লৌকিক বলা যেতে পারে। শাস্ত্রিক শিব যতী, বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখতে পাই। এমন-কি, রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শিবের যে চরিত্র বর্ণিত সে আর্যসমাজসম্মত নয়।

শক্তির যে শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় আমি তা স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু বাংলা মঙ্গলকাব্যে শক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সে লৌকিক, এবং তার ভাব অন্যরূপ। সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোনো ধর্মসংগত কারণ দেখতে পাচ্ছে না, তারা স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ বলে ধরে নিয়েছে এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা পূজার দ্বারা শান্ত করবার আশাই এই-সকল মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা।

প্রচণ্ড দেবতার যথেচ্ছাচারের বিভীষিকা মানবজাতির প্রথম পূজার মূলে দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ মানুষ তখনো বিশ্বের মূলে বিশ্বনিয়মকে দেখতে পায় নি এবং তখন সে সর্বদাই ভয়বিপদের দ্বারা বেষ্টিত। তখন শক্তিমানের আকস্মিক ঐশ্বর্যলাভ সর্বদাই চোখে পড়ছে, এবং আকস্মিকতারই প্রভাব মানবসমাজে সব চেয়ে উগ্রভাবে দৃশ্যমান।

যে-সময়ে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী অন্নদামঙ্গল লিখিত হয়েছে সে-সময়ে মানুষের আকস্মিক উত্থানপতন বিস্ময়করূপে প্রকাশিত হত। তখন চার দিকেই শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত চলছে, এবং কার ভাগ্যে কোন্‌দিন যে কী আছে তা কেউ বলতে পারছে না। যে-ব্যক্তি শক্তিমানকে ঠিকমত স্তব করতে জানে, যে-ব্যক্তি সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় বিচার করে না তার সমৃদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত তখন সর্বত্র প্রত্যক্ষ। চণ্ডীশক্তিকে প্রসন্ন করে তাকে নিজের ব্যক্তিগত ইষ্টলাভের অনুকূল করা তখন অন্তত একশ্রেণীর ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল, তখনকার ধনীমানীরাই বিশেষত এই শ্রেণীভুক্ত ছিল, কেননা তখনকার শক্তির ঝড় তাদের উচ্চচূড়ার উপরেই বিশেষ করে আঘাত করত।

শাস্ত্রে দেবতার যে-স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সেইটেই যে আদিম এবং লৌকিকটাই যে আধুনিক এ কথা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত মানা যায় না। আমার বিশ্বাস, অনার্যদের দেবতাকে একদিন আর্যভাবের দ্বারা শোধন করে স্বীকার করে নেবার সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সময়ে যে-সব দেবতা ভারতবর্ষের সাধুসমাজে প্রবেশ করেছিল তাদের চরিত্রে অসংগতি একেবারে দূর হতে পারে নি, তাদের মধ্যে আজও আর্য অনার্য দুই ধারা মিশ্রিত হয়ে আছে এবং লৌকিক ব্যবহারে সেই অনার্যধারারই প্রবলতা অধিক।

খৃস্টধর্মের বিকাশেও আমরা এই জিনিসটি দেখতে পাই। য়িহুদির জিহোবা এককালে মুখ্যত য়িহুদিজাতিরই পক্ষপাতী দেবতা ছিলেন। তিনি কী রকম নিষ্ঠুর ঈর্ষাপরায়ণ ও বলিপ্রিয় দেবতা ছিলেন তা ওল্ড্ টেস্টামেন্ট্ পড়লেই বোঝা যায়। সেই দেবতা ক্রমশ য়িহুদি সাধুঋষিদের বাণীতে এবং অবশেষে যিশুখৃস্টের উপদেশে সর্বমানবের প্রেমের দেবতা হয়ে প্রকাশ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে আজও যে দুই বিরুদ্ধভাব জড়িয়ে আছে তা লৌকিক ব্যবহারে স্পষ্ট দেখতে পাই। আজও তিনি যুদ্ধের দেবতা, ভাগাভাগির দেবতা, সাম্প্রদায়িক দেবতা। অখৃস্টানের প্রতি খৃস্টানের অবজ্ঞা ও অবিচার তাঁর নামের জোরে যত সজীব হয়ে আছে এমন আর-কিছুতে নয়।

আমাদের দেশে সাধারণত শাক্তধর্মসাধনা এবং বৈষ্ণবধর্মসাধনার মধ্যে দুই স্বতন্ত্রভাব প্রাধান্য লাভ করেছে। এক সাধনায় পশুবলি এবং মাংসভোজন, অন্য সাধনায় অহিংসা ও নিরামিষ আহার— এটা নিতান্ত নিরর্থক নয়। বিশেষ শাস্ত্রে এই পশু এবং অপরাপর মকারের যে ব্যাখ্যাই থাক্ সাধারণ ব্যবহারে তা প্রচলিত নেই। এইজন্যেই 'শক্তি' শব্দের সাধারণ যে-অর্থ, যে-অর্থ নানা চিহ্নে, অনুষ্ঠানে ও ভাবে শক্তিপূজার মধ্যে ওতপ্রোত এবং বাংলাদেশের মঙ্গলকাব্যে যে-অর্থ প্রচারিত হয়েছে আমি সেই অর্থই আমার রচনায় গ্রহণ করেছি।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, দস্যুর উপাস্য দেবতা শক্তি, ঠগীর উপাস্য দেবতা শক্তি, কাপালিকের উপাস্য দেবতা শক্তি। আরো একটি ভাববার কথা আছে, পশুবলি বা নিজের রক্তপাত, এমন-কি, নরবলি স্বীকার করে মানত দেবার প্রথা শক্তিপূজায় প্রচলিত। মিথ্যা মামলায় জয় থেকে শুরু করে জ্ঞাতিশত্রুর বিনাশ কামনা পর্যন্ত সকল প্রকার প্রার্থনাই শক্তিপূজায় স্থান পায়। এক দিকে দেবচরিত্রের হিংস্রতা, অপর দিকে মানুষের ধর্মবিচারহীন ফলকামনা এই দুইয়ের যোগ যে-পূজায়

আছে, তার চেয়ে বড়ো শক্তিপূজার কথা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে নিগূঢ় আছে কি না সেটা আমার আলোচ্য ছিল না। শক্তিপূজার যে-অর্থ লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, সে-অর্থকে অসংগত বলা যায় না ; কারণ লোকপ্রচলিত কাহিনী এবং রূপকচিহ্নে সেই অর্থই প্রবল এবং সভ্য ও বর্বর সকল দেশে সকল ভাবেই শক্তিপূজা চলছে— অন্যায় অসত্য সে পূজায় লজ্জিত নয়, লোভ তার লক্ষ্য এবং হিংসা তার পূজোপচার। এই লোভ মন্দ নয়, ভালোই, হিংস্রশক্তি মনুষ্যত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক এমন সকল তর্ক শক্তিপূজক য়ুরোপে স্পর্ধার সঙ্গে চলছে, য়ুরোপের ছাত্ররূপে আমাদের মধ্যেও চলছে— সে-সম্বন্ধে আমার যা বলবার অন্যত্র বলেছি ; এখানে এইটুকু বক্তব্য যে, সাধারণ লোকের মনে শক্তিপূজার সঙ্গে একটি উলঙ্গ নিদারুণতার ভাব, নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বলপূর্বক দুর্বলকে বলি দেবার ভাব সংগত হয়ে আছে— 'বাতায়নিকের পত্রে' আমি তারই উল্লেখ করেছি।

কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করা উচিত যে, কোনো ধর্মসাধনার উচ্চ অর্থ যদি দেশের কোনো বিশেষ শাস্ত্র বা সাধকের মধ্যে কথিত বা জীবিত থাকে তবে তাকে সম্মান করা কর্তব্য। এমন-কি, ভূরিপরিমিত প্রচলিত ব্যবহারের চেয়েও তাকে বড়ো বলে জানা চাই। ধর্মকে পরিমাণের দ্বারা বিচার না করে তার উৎকর্ষের দ্বারা বিচার করাই শ্রেয়।—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

কার্তিক ১৩২৬

সত্যের আহ্বান

পরাসক্ত কীট বা জন্তু পরের রস রক্ত শোষণ করে বাঁচে ; খাদ্যকে নিজের শক্তিতে নিজ দেহের উপকরণে পরিণত করবার দেহযন্ত্র তাদের বিকল হয়ে যায় ; এমনি করে শক্তিকে অলস করবার পাপে প্রাণিলোকে এই-সকল জীবের অধঃপতন ঘটে। মানুষের ইতিহাসেও এই কথা খাটে। কিন্তু পরাসক্ত মানুষ বলতে কেবল যে পরের প্রতি জড়ভাবে আসক্ত মানুষকেই বোঝায় তা নয়। চিরদিন যা চলে আসছে তার সঙ্গে যে আপনাকে জুড়ে রেখে দেয়, প্রচলিতের স্রোতের টানে যে হালছাড়া ভাবে আত্মসমর্পণ করে, সেও পরাসক্ত। কেননা বাহির আমাদের অন্তরের পক্ষে পর, সে যখন কেবল অভ্যাসের তাগিদে আমাদের চালিয়ে নিয়ে যায় তখন আমাদের পরাসক্ত অন্তর নিরুদ্যম হয়ে ওঠে এবং মানুষের 'পরে অসাধ্যসাধন করবার যে-ভার আছে সে সিদ্ধ হয় না।

এই হিসাবে জন্তুরা এ জগতে পরাসক্ত। তারা প্রচলিতের ধারায় গা-ভাসান দিয়ে চলে। তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের শাসনে বাঁচে মরে, এগোয় বা পিছোয়। এইজন্যেই তাদের অন্তঃকরণটা বাড়তে পারল না, বেঁটে হয়ে রইল। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে মৌমাছি যে চাক তৈরি করে আসছে সেই চাক তৈরি করার একটানা ঝোঁক কিছুতেই সে কাটিয়ে বেরতে পারছে না। এতে করে তাদের চাক নিখুঁত-মতো তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ এই চিরাভ্যাসের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছে, সে আপনাকে নানা দিকে মেলে দিতে পারছে না। এই-সকল জীবের সম্বন্ধে প্রকৃতির যেন সাহসের অভাব দেখতে পাই। সে এদের নিজের আঁচলে ঢেকে চালায়, পাছে নিজে চলতে গেলে বিপদ বাধিয়ে বসে— এই ভয়ে এদের অন্তরের চলৎশক্তিকে ছেঁটে রেখে দিয়েছে।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার জীবরচনা-পরীক্ষায় মানুষের সম্বন্ধে হঠাৎ খুব একটা সাহস দেখতে পাওয়া যায়। তিনি তার অন্তঃকরণটাকে বাধা দিলেন না। বাহিরে প্রাণীটিকে সর্বপ্রকারে বিবস্ত্র নিরস্ত্র দুর্বল করে এর অন্তঃকরণকে ছেড়ে দেওয়া হল। এই মুক্তি পাওয়ার আনন্দে সে বলে উঠল— আমি অসাধ্য সাধন করব। অর্থাৎ যা চিরদিন হয়ে আসছে তাই যে চিরদিন হতে থাকবে সে আমি সইব না, যা হয় না তাও হবে সেইজন্যে মানুষ তার প্রথম যুগে যখন চার দিকে অতিকায় জন্তুদের বিকট নখদন্তের

মাঝখানে পড়ে গেল, তখন সে হরিণের মতো পালাতে চাইল না, কচ্ছপের মতো লুকোতে চাইল না, সে অসাধ্য সাধন করলে— চকমকি পাথর কেটে কেটে ভীষণতর নখদন্তের সৃষ্টি করলে। যেহেতু জন্তুদের নখদন্ত তাদের বাহিরের দান এইজন্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের 'পরেই এই নখদন্তের পরিবর্তন বা উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের নখদন্ত তার অন্তঃকরণের সৃষ্টি ; এইজন্যে সেই পাথরের বর্শাফলকের 'পরেই সে ভর করে রইল না, তার সমস্ত হাতিয়ার পাথরের কোঠা থেকে লোহার কোঠায় এসে পৌঁছল। এতে প্রমাণ হয় মানুষের অন্তঃকরণ সন্ধান করছে ; যা তার চারি দিকে আছে তাতেই সে আসক্ত হয়ে নেই, যা তার হাতের কাছে নেই তাকে হাতের তলায় আনছে। পাথর আছে তার সামনে, তাতে সে সন্তুষ্ট নয় ; লোহা আছে মাটির নীচে, সেখানে গিয়ে সে ধাক্কা দেয়, পাথরকে ঘষে-মেজে তার থেকে হাতিয়ার তৈরি করা সহজ ; কিন্তু তাতেও তার মন উঠল না, লোহাকে আগুনে গলিয়ে হাতুড়িতে পিটিয়ে ছাঁচে ঢালাই করে যা সব চেয়ে বাধা দেয় তাকেই আপনার সব চেয়ে অনুগত করে তুললে। মানুষের অন্তঃকরণের ধর্মই হচ্ছে এই, আপনাকে খাটিয়ে কেবল যে তার সফলতা তা নয়, তার আনন্দ ; সে কেবলই উপরিতল থেকে গভীরতলে পৌঁছতে চায়, প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষে, সহজ থেকে কঠিনে, পরাসক্তি থেকে আত্মকর্তৃত্বে, প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিচারের ব্যবস্থায়। এমনি করে সে জয়ী হয়েছে। কিন্তু কোনো একদল মানুষ যদি বলে, 'এই পাথরের ফলা আমাদের বাপ-পিতামহের ফলা, এ ছাড়া আর যা-কিছু করতে যাব তাতে আমাদের জাত নষ্ট হবে', তা হলে একেবারে তাদের মনুষ্যত্বের মূলে ঘা লাগে ; তা হলে যাকে তারা জাতরক্ষা বলে তা হতে পারে, কিন্তু তাদের সব চেয়ে যে বড়ো জাত মনুষ্যজাত সেইখানে তাদের কৌলীন্য মারা যায়। আজও যারা সেই পাথরের ফলার বেশি এগোয় নি মানুষ তাদের জাতে ঠেলেছে, তারা বনে জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। তারা বহিরবস্থার কাছে পরাসক্ত, তারা প্রচলিতের জিন-লাগামের টানে চোখে ঠুলি লাগিয়ে চলে ; তারা অন্তরের স্বরাজ পায় নি, বাহিরের স্বরাজের অধিকার থেকে তাই তারা ভ্রষ্ট। এ কথা তারা জানেই না যে, মানুষকে আপনার শক্তিতে অসাধ্যসাধন করতে হবে ; যা হয়েছে তার মধ্যে সে বদ্ধ থাকবে না, যা হয় নি তার দিকে সে এগোবে ; তাল ঠুকে বুক ফুলিয়ে নয়, অন্তঃকরণের সাধনার বলে, আত্মশক্তির উদ্বোধনে।

আজ ত্রিশ বৎসর হয়ে গেল, যখন 'সাধনা' কাগজে আমি লিখছিলুম,[১] তখন আমার দেশের লোককে এই কথাই বলবার চেষ্টা করেছি। তখন ইংরেজি-শেখা ভারতবর্ষ পরের কাছে অধিকার-ভিক্ষার কাজে বিষম ব্যস্ত ছিল। তখন বারে বারে আমি কেবল একটি কথা বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি যে মানুষকে অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করতে হবে। কেননা মানুষ প্রধানত অন্তরের জীব, অন্তরেই সে কর্তা ; বাহিরের লাভে অন্তরে লোকসান ঘটে। আমি বলেছিলেম, অধিকার-বঞ্চিত হবার দুঃখভার আমাদের পক্ষে তেমন বোঝা নয় যেমন বোঝা আমাদের মাথার উপরে 'আবেদন আর নিবেদনের থালা'। তার পরে যখন আমার হাতে 'বঙ্গদর্শন' এসেছিল[২] তখন বঙ্গবিভাগের ছুরি-শানানোর শব্দে সমস্ত বাংলাদেশ উতলা। মনের ক্ষোভে বাঙালি সেদিন ম্যাঞ্চেস্টরের কাপড় বর্জন করে বোম্বাই মিলের সদাগরদের লোভটাকে বৈদেশিক ডিগ্রিতে বাড়িয়ে তুলেছিল। যেহেতু ইংরেজ সরকারের 'পরে অভিমান ছিল এই বস্ত্রবর্জনের মূলে, সেইজন্যে সেই দিন এই কথা বলতে হয়েছিল 'এহ বাহ্য'। এর প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ইংরেজ, ভারতবাসী উপলক্ষ, এর মুখ্য উত্তেজনা দেশের লোকের প্রতি প্রেম নয়, বিদেশী লোকের প্রতি ক্রোধ। সেদিন দেশের লোককে এই কথা বলে সাবধান করবার দরকার ছিল যে, ভারতে ইংরেজ যে আছে এটা বাইরের ঘটনা, দেশ যে আছে এটাই আমাদের ভিতরের কথা। এই ভিতরের কথাটাই হচ্ছে চিরসত্য, আর বাইরের ব্যাপারটা মায়া। মায়াকে ততক্ষণ অত্যন্ত বড়ো দেখায় যতক্ষণ রাগেই হোক বা অনুরাগেই হোক বাইরের দিক

১ ১৩০০, ১৩০১ সালের সাধনায় প্রকাশিত রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধাবলী। রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম (সুলভ পঞ্চম) খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২ বঙ্গদর্শন-সম্পাদনার কাল ১৩০৮-১২।

থেকে তার প্রতি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাকিয়ে থাকি। তেড়ে গিয়ে তার পায়ে দাঁত বসিয়ে দেওয়া সেও একটা তীব্র আসক্তি, আর ভক্তিতে তার পা জড়িয়ে ধরা সেও তথৈবচ— তাকে চাই নে বললেও তার ধ্যানে আমাদের সমস্ত হৃদয় রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে, আর চাই বললে তো কথাই নেই। মায়া জিনিসটা অন্ধকারের মতো, বাইরের দিক থেকে কলের গাড়ি চালিয়েও তাকে অতিক্রম করতে পারি নে, তাকে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে চাইলে সাত সমুদ্র তেরো নদী শুকিয়ে যাবে। সত্য আলোর মতো, তার শিখাটা জ্বলবামাত্র দেখা যায় মায়া নেই। এইজন্যেই শাস্ত্রে বলেছেন : স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। ভয় হচ্ছে মনের নাস্তিকতা, তাকে না'এর দিক থেকে নিকেশ করা যায় না, উপস্থিতমত তার একটা কারণ গেলেও রক্তবীজের মতো আর-একটা কারণরূপে সে জন্ম নেয়। ধর্ম হচ্ছে সত্য, সে মনের আস্তিকতা, তার অল্পমাত্র আবির্ভাবে হাঁ প্রকাণ্ড না'কে একেবারে মূলে গিয়ে অভিভূত করে। ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব -নামক ব্যাপারটি বহুরূপী ; আজ সে ইংরেজের মূর্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্তিতে এবং তার পরদিন সে নিজের দেশী লোকের মূর্তিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে। এই পরতন্ত্রতাকে ধনুর্বাণ হাতে বাইরে থেকে তাড়া করলে সে আপনার খোলস বদলাতে বদলাতে আমাদের হয়রান করে তুলবে। কিন্তু আমার দেশ আছে এইটি হল সত্য, এইটিকে পাওয়ার দ্বারা বাহিরের মায়া আপনি নিরস্ত হয়।

আমার দেশ আছে এই আস্তিকতার একটি সাধনা আছে। দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই-সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্যব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে, এইজন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে, আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।[৩] বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা, দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি, এইজন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।

যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আমার আপন করে তুলতে হবে বহুকাল পূর্বে 'স্বদেশী সমাজ' নামক প্রবন্ধে[৪] তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেই আলোচনাতে যে-কোনো ত্রুটি থাকুক এই কথাটি জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয় নিজের নৈষ্কর্ম্য থেকে, ঔদাসীন্য থেকে। দেশের যে-কোনো উন্নতি সাধনের জন্যে যে উপলক্ষে আমরা ইংরেজ-রাজসরকারের দ্বারস্থ হয়েছি সেই উপলক্ষেই আমাদের নৈষ্কর্ম্যকে নিবিড়তর করে তুলেছি মাত্র। কারণ, ইংরেজ-রাজসরকারের কীর্তি আমাদের কীর্তি নয়, এইজন্য বাহিরের দিক থেকে সেই কীর্তিতে আমাদের যতই উপকার হোক, ভিতরের দিক থেকে তার দ্বারা আমাদের দেশকে আমরা হারাই, অর্থাৎ আত্মার মূল্যে সফলতা পাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন : ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি। দেশ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। দেশ আমারই আত্মা, এইজন্যই দেশ আমার প্রিয়— এ কথা যখন জানি তখন দেশের সৃষ্টিকার্যে পরের মুখাপেক্ষা করা সহ্যই হয় না।

আমি সেদিন দেশকে যে কথা বলবার চেষ্টা করেছিলুম সে বিশেষ কিছু নতুন কথা নয় এবং তার মধ্যে এমন-কিছু ছিল না যাতে স্বদেশহিতৈষীর কানে সেটা কটু শোনায়। কিন্তু আর-কারও মনে না

৩ 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের প্রকাশ, আশ্বিন ১৩১২। রবীন্দ্র-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড (সুলভ দ্বিতীয়) এবং 'স্বদেশী সমাজ' (১৩৬৯) দ্রষ্টব্য)।

৪ রবীন্দ্র-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড (সুলভ দ্বিতীয়) দ্রষ্টব্য। অপিচ 'স্বদেশী সমাজ' (১৩৬৯) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

থাকতে পারে, আমার স্পষ্টই মনে আছে যে, আমার এই-সকল কথায় দেশের লোক বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। যারা কটুভাষা-ব্যবসায়ী সাহিত্যিক গুণ্ডা আমি তাদের কথা বলছি নে, কিন্তু গণ্যমান্য এবং শিষ্টশান্ত ব্যক্তিরাও আমার সম্বন্ধে ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন নি। এর দুটি মাত্র কারণ ; প্রথম— ক্রোধ, দ্বিতীয়— লোভ। ক্রোধের তৃপ্তিসাধন হচ্ছে এক রকমের ভোগসুখ ; সেদিন এই ভোগসুখের মাতলামিতে আমাদের বাধা অতি অল্পই ছিল— আমরা মনের আনন্দে কাপড় পুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, পিকেট করছি, যারা আমাদের পথে চলছিল না তাদের পথে কাঁটা দিচ্ছি এবং ভাষায় আমাদের কোনো আব্রু রাখছি নে। এইসকল অমিতাচারের কিছুকাল পরে একজন জাপানি আমাকে একদিন বলেছিলেন, "তোমরা নিঃশব্দে দৃঢ় এবং গূঢ় ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে পার না কেন। কেবলই শক্তির বাজে খরচ করা তো উদ্দেশ্যসাধনের সদুপায় নয়।" তার জবাবে সেই জাপানিকে আমার বলতে হয়েছিল যে, "উদ্দেশ্যসাধনের কথাটাই যখন আমাদের মনে উজ্জ্বল থাকে তখন মানুষ স্বভাবতই আত্মসংযম করে নিজের সকল শক্তিকেই সেই দিকে নিযুক্ত করে। কিন্তু ক্রোধের তৃপ্তিসাধন যখন মত্ততার সপ্তকে সপ্তকে উদ্দেশ্যসাধনকে ছাড়িয়ে উঠতে থাকে তখন শক্তিকে খরচ করে দেউলে হতে আমাদের বাধা থাকে না।" যাই হোক সেদিন ঠিক যে সময়ে বাঙালি কিছুকালের জন্যে ক্রোধতৃপ্তির সুখভোগে বিশেষ বিঘ্ন পাচ্ছিল না, সমস্তই যেন একটা আশ্চর্য স্বপ্নের মতো বোধ হচ্ছিল, সেই সময়ে তাকে অন্য পথের কথা বলতে গিয়ে আমি তার ক্রোধের ভাজন হয়েছিলেম। তা ছাড়া আরো একটি কথা ছিল, সে হচ্ছে লোভ। ইতিহাসে সকল জাতি দুর্গম পথ দিয়ে দুর্লভ জিনিস পেয়েছে, আমরা তার চেয়ে অনেক সস্তায় পাব— হাত-জোড়-করা ভিক্ষের দ্বারা নয়, চোখ-রাঙানো ভিক্ষের দ্বারা পাব, এই ফন্দির আনন্দে সেদিন দেশ মেতেছিল। ইংরেজ দোকানদার যাকে বলে reduced price sale, সেদিন যেন ভাগ্যের হাটে বাঙালির কপালে পোলিটিকাল মালের সেইরকম সস্তা দামের মৌসুম পড়েছিল। যার সম্বল কম, সস্তার নাম শোনবামাত্র সে এত বেশি খুশি হয়ে ওঠে যে, মালটা যে কী আর তার কী অবস্থা তার খোঁজ রাখে না, আর যে ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করে তাকে তেড়ে মারতে যায়। মোট কথা সেদিনও আমাদের লক্ষ্য ছিল, ধ্যান ছিল, ঐ বাইরের মায়াটা নিয়ে। তাই তখনকার কালের একজন নেতা বলেছিলেন, আমার এক হাত ইংরেজ সরকারের টুঁটিতে, আর-এক হাত তার পায়ে। অর্থাৎ কোনো হাতই বাকি ছিল না দেশের জন্য। তৎকালে এবং তার পরবর্তী কালে এই দ্বিধা হয়তো অনেকের একেবারে ঘুচে গেছে, এক দলের দুই হাতই হয়তো উঠেছে সরকারের টুঁটিতে আর-এক দলের দুই হাতই হয়তো নেমেছে সরকারের পায়ে, কিন্তু মায়া থেকে মুক্তিসাধনের পক্ষে দুইই হচ্ছে বাইরের পথ। হয় ইংরেজ সরকারের দক্ষিণে নয় ইংরেজ সরকারের বামে পোড়া মন ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার হাঁ'ই বল আর না'ই বল দুইই হচ্ছে ইংরেজকে নিয়ে।

সেদিন চারি দিক থেকে বাংলাদেশের হৃদয়াবেগের উপরেই কেবল তাগিদ এসেছে। কিন্তু শুধু হৃদয়াবেগ আগুনের মতো জ্বালানি বস্তুকে খরচ করে, ছাই করে ফেলে— সে তো সৃষ্টি করে না। মানুষের অন্তঃকরণ ধৈর্যের সঙ্গে, নৈপুণ্যের সঙ্গে, দূরদৃষ্টির সঙ্গে এই আগুনে কঠিন উপাদানকে গলিয়ে আপনার প্রয়োজনের সামগ্রীকে গড়ে তুলতে থাকে। দেশের সেই অন্তঃকরণকে সেদিন জাগানো হল না, সেইজন্যে এত বড়ো একটা হৃদয়াবেগ থেকে কোনো একটা স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারল না।

এমনটা যে হল তার কারণ বাইরে নেই, তার কারণ আছে আমাদের নিজেরই ভিতরে। অনেক দিন থেকেই আমাদের ধর্মে কর্মে এক দিকে আছে হৃদয়াবেগ, আর-এক দিকে আছে অভ্যস্ত আচার। আমাদের অন্তঃকরণ অনেক দিন থেকে কোনো কাজ করে নি ; তাকে ভয়ে ভয়ে চেপে রাখা হয়েছে। এইজন্যে যখন আমাদের কাছ থেকে কোনো কাজ আদায় করার দরকার পড়ে তখন তাড়াতাড়ি হৃদয়াবেগের উপর বরাত দিতে হয় এবং নানারকম জাদুমন্ত্র আওড়িয়ে মনকে মুগ্ধ করবার প্রয়োজন ঘটে। অর্থাৎ সমস্ত দেশ জুড়ে এমন একটা অবস্থা উৎপাদন করা হয় যেটা অন্তঃকরণের কাজ করার পক্ষে বিষম প্রতিকূল।

অন্তঃকরণের জড়তায় যে ক্ষতি সে ক্ষতিকে কোনো কিছুতেই পূরণ করা যায় না। কোনোমতে

যখন পূরণ করতে চাই তখন মোহকে সহায় করতে ইচ্ছা হয়, তখন অক্ষমের লোভ আলাদিনের প্রদীপের গুজব শুনলেই একেবারে লাফিয়ে ওঠে। এ কথা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করতে হবে যে, আলাদিনের প্রদীপের মতো এমন আশ্চর্য সুবিধার জিনিস আর নেই, কেবল ওর একটি মাত্র অসুবিধা এই যে, ও জিনিস কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু পাওয়া যে যায় না এ কথা খুব জোরের সঙ্গে সে মানুষ কিছুতেই বলতে পারে না যার লোভ বেশি অথচ যার সামর্থ্য কম। এইজন্যে তার উদ্যম তখনই পুরোদমে জেগে ওঠে যখন তাকে কেউ আলাদিনের প্রদীপের আশ্বাস দিয়ে থাকে। সেই আশ্বাসকে হরণ করতে গেলে সে এমনি চিৎকার করতে থাকে যেন তার সর্বস্বান্ত করা হল।

সেই বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার দিনে একদল যুবক রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তর আনবার উদ্যোগ করেছিলেন। আর যাই হোক, এই প্রলয়হুতাশনে তাঁরা নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন, এইজন্যে তাঁরা কেবল আমাদের দেশে কেন সকল দেশেই সকলেরই নমস্য। তাঁদের নিষ্ফলতাও আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তাঁরা পরমত্যাগে পরমদুঃখে আজ একটা কথা স্পষ্ট জেনেছেন যে, রাষ্ট্র যখন তৈরি নেই তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টা করা পথ ছেড়ে অপথে চলা— পথের চেয়ে অপথ মাপে ছোটো, কিন্তু সেটাকে অনুসরণ করতে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না, মাঝের থেকে পা-দুটোকে কাঁটায় কাঁটায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়। যে-জিনিসের যা দাম তা পুরো না দিতে পারলে দাম তো যায়ই জিনিসও জোটে না। সেদিনকার সেই দুঃসাহসিক যুবকেরা ভেবেছিলেন সমস্ত দেশের হয়ে তাঁরা কয়জন আত্মোৎসর্গ দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবেন ; তাঁদের পক্ষে এটা সর্বনাশ, কিন্তু দেশের পক্ষে এটা সস্তা। সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার কোনো একটা অংশ থেকে নয়। রেলযানে ফার্স্টক্লাস গাড়ির মূল্য এবং সৌষ্ঠব যেমনি থাক্ সে তার নিজের সঙ্গে সংযুক্ত থার্ডক্লাস গাড়িকে কোনোমতেই এগিয়ে যেতে পারে না। আমার মনে হয় তাঁরা আজ বুঝেছেন, সমগ্র দেশ বলে একটি জিনিস সমস্ত দেশের লোকের সৃষ্টি ; এই সৃষ্টি তার সমস্ত হৃদয়বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ইচ্ছাশক্তির প্রকাশে। এ হচ্ছে যোগলব্ধ ধন, অর্থাৎ যে যোগের দ্বারা মানুষের সকল বৃত্তি আপন সৃষ্টির মধ্যে সংহত হয়ে রূপলাভ করে। পোলিটিকাল যোগ বা ইকনমিক যোগ পূর্ণ যোগ নয়, সর্বশক্তির যোগ চাই। অন্য দেশের ইতিহাস যখন লক্ষ্য করে দেখি তখন পোলিটিকাল ঘোড়াটাকে সকলের আগে দেখি, মনে মনে ঠিক করি ঐ চতুষ্পদটারই টানে সমস্ত জাত এগিয়ে চলেছে। তখন হিসাব করে দেখি নে, এর পিছনে দেশ ব'লে যে গাড়িটা আছে সেটা চলবার যোগ্য গাড়ি, তার এক চাকার সঙ্গে আর-এক চাকার সামঞ্জস্য আছে, তার এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের ভালোরকম জোড় মেলানো আছে। এই গাড়িটি তৈরি করে তুলতে শুধু আগুন এবং হাতুড়ি-করাত এবং কলকব্জা লেগেছে তা নয়, এর মধ্যে অনেক দিনের অনেক লোকের অনেক চিন্তা অনেক সাধনা অনেক ত্যাগ আছে। আরো এমন দেশ আমরা দেখেছি, সে বাহ্যত স্বাধীন, কিন্তু পোলিটিকাল বাহনটি যখন তাকে টানতে থাকে তখন তার ঝড়্ঝড়্ খড়্খড়্ শব্দে পাড়ার ঘুম ছুটে যায়, ঝাঁকানির চোটে সওয়ারির বুকে পিঠে খিল ধরতে থাকে, পথ চলতে চলতে দশবার করে সে ভেঙে ভেঙে পড়ে, দড়ি-দড়া দিয়ে তাকে বাঁধতে বাঁধতে দিন কাবার হয়ে যায়। তবু ভালো হোক আর মন্দ হোক, স্ক্রু আলগা হোক আর চাকা বাঁকা হোক, এ গাড়িও গাড়ি, কিন্তু যে জিনিসটা ঘরে বাইরে সাত টুকরো হয়ে আছে, যার মধ্যে সমগ্রতা কেবল যে নেই তা নয়, যা বিরুদ্ধতায় ভরা, তাকে উপস্থিতমত ক্রোধ হোক বা লোভ হোক কোনো-একটা প্রবৃত্তির বাহ্যবন্ধনে বেঁধে হেঁইহেঁই শব্দে টান দিলে কিছুক্ষণের জন্যে তাকে নড়ানো যায়— কিন্তু একে কি দেশদেবতার রথযাত্রা বলে। এই প্রবৃত্তির বন্ধন এবং টান কি টেঁকসই জিনিস। অতএব ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে আপাতত এই গড়াপেটার কাজটাই কি সব চেয়ে দরকার নয়। যমের ফাঁসি-বিভাগের সিংহদ্বার থেকে বাংলাদেশের যে-সব যুবক ঘরে ফিরে এসেছেন তাঁদের লেখা পড়ে কথা শুনে আমার মনে হয় তাঁরা এই কথাই ভাবছেন। তাঁরা বলছেন, সকলের আগে আমাদের যোগসাধন চাই, দেশের সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্মিলন ও পরিপূর্ণতা-সাধনের যোগ। বাইরের দিক থেকে কোনো অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা এ হতেই পারে না, ভিতরের দিক থেকে জ্ঞানালোকিত চিত্তে আত্মোপলব্ধি দ্বারাই এ সম্ভব।

যা-কিছুতে সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ উদ্‌বোধিত হয় না, অভিভূত হয়, এ কাজের পক্ষে তা অন্তরায়।

নিজের সৃষ্টিশক্তির দ্বারা দেশকে নিজের করে তোলবার যে আহ্বান সে খুব একটা বড়ো আহ্বান। সে কোনো-একটা বাহ্য অনুষ্ঠানের জন্যে তাগিদ দেওয়া নয়। কারণ, পূর্বেই বলেছি মানুষ তো মৌমাছির মতো কেবল একই মাপে মৌচাক গড়ে না, মাকড়সার মতো নিরন্তর একই প্যাটার্নে জাল বোনে না। তার সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি হচ্ছে তার অন্তঃকরণে— সেই অন্তঃকরণের কাছে তার পুরো দাবি, জড় অভ্যাস-পরতার কাছে নয়। যদি কোনো লোভে পড়ে তাকে আজ বলি, তুমি চিন্তা কোরো না, কর্ম করো, তা হলে যে মোহে আমাদের দেশ মরেছে সেই মোহকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এতকাল ধরে আমরা অনুশাসনের কাছে, প্রথার কাছে মানবমনের সর্বোচ্চ অধিকার অর্থাৎ বিচারের অধিকার বিকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অলস হয়ে বসে আছি। বলেছি, আমরা সমুদ্রপারে যাব না, কেননা মনুতে তার নিষেধ ; মুসলমানের পাশে বসে খাব না, কেননা শাস্ত্র তার বিরোধী। অর্থাৎ যে প্রণালীতে চললে মানুষের মন বলে জিনিসের কোনোই দরকার হয় না, যা কেবলমাত্র চিন্তাহীন অভ্যাসনিষ্ঠতার কাজ, আমাদের সংসারযাত্রার পনেরো-আনা কাজই সেই প্রণালীতে চালিত। যে মানুষ সকল বিষয়েই দাসের প্রতি নির্ভর করে চলে তার যেরকম পঙ্গুতা, যারা বাহ্য আচারের দ্বারাই নিয়ত চালিত তাদেরও সেইরকম। কেননা পূর্বেই বলেছি অন্তরের মানুষই প্রভু, সে যখন একান্তভাবে বাহ্য প্রথার পরাসক্ত জীব হয়ে ওঠে তখন তার দুর্গতির সীমা থাকে না। আচারে চালিত মানুষ কলের পুতুল, বাধ্যতার চরম সাধনায় সে উত্তীর্ণ হয়েছে। পরতন্ত্রতার কারখানাঘরে সে তৈরি ; এইজন্যে এক চালকের হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিতে গেলে আর-এক চালকের হাতে সমর্পণ করতে হয়। পদার্থবিদ্যায় যাকে ইনর্শিয়া বলে, যে মানুষ তারই একান্ত সাধনাকে পবিত্রতা বলে অভিমান করে তার স্থাবরতাও যেমন জঙ্গমতাও তেমন, উভয়েই তার নিজের কর্তৃত্ব নেই। অন্তঃকরণের যে জড়ত্ব সর্বপ্রকার দাসত্বের কারণ, তার থেকে মুক্তি দেবার উপায় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বাধ্যতাও নয়, কলের পুতুলের মতো বাহ্যানুষ্ঠানও নয়।

বঙ্গবিভাগের আন্দোলনের পরে এবার দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার পরিমাণ আরো অনেক বড়ো; সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তার প্রভাব। বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিকাল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান নি, কেননা তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজি-ইতিহাস পড়া একটা পুঁথিগত দেশ। সে দেশ ইংরেজি ভাষার বাষ্পরচিত একটা মরীচিকা, তাতে বার্ক্ গ্লাড্‌স্টোন ম্যাট্‌সীনি গারিবাল্‌ডির অস্পষ্ট মূর্তি ভেসে বেড়াত। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায় নি। এমন সময় মহাত্মা গান্ধি এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে— তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এইজন্যেই তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে। আত্মার মধ্যে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শমাত্রে। সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধদ্বারে যে মুহূর্তে এসে দাঁড়াল অমনি তা খুলে গেল। কারও মনে আর কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে সত্য জেগে উঠল। চাতুরি দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে নীতি বন্ধ্যা, অনেক দিন থেকে এই শিক্ষার আমাদের দরকার ছিল। সত্যের যে কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি ; কিন্তু চাতুরী হচ্ছে ভীরু ও দুর্বলের সহজ ধর্ম, সেটাকে ছিন্ন করতে হলে তার চামড়া কেটে ছিন্ন করতে হয়। সেইজন্যে আজকের দিনেও দেশের অনেক বিজ্ঞ লোকেই মহাত্মার চেষ্টাকেও নিজেদের পোলিটিকাল জুয়োখেলার একটা গোপন চালেরই সামিল করে নিতে চান। মিথ্যায় জীর্ণ তাঁদের মন এই কথাটা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, প্রেমের দ্বারা দেশের হৃদয়ে এই যে প্রেম উদ্‌বেলিত হয়েছে এটা একটা অবান্তর বিষয় নয়— এইটেই মুক্তি, এইটেই দেশের আপনাকে পাওয়া— ইংরেজ দেশে আছে কি নেই এর মধ্যে সে কথার কোনো জায়গাই নেই। এই প্রেম হল স্বপ্রকাশ, এই হচ্ছে হাঁ— কোনো না'এর সঙ্গে এ তর্ক করতে যায় না, কেননা তর্ক করবার দরকারই থাকে না।

প্রেমের ডাকে ভারতবর্ষের হৃদয়ের এই-যে আশ্চর্য উদ্‌বোধন, এর কিছু সুর সমুদ্রপারে আমার কানে গিয়ে পৌঁচেছিল। তখন বড়ো আনন্দে এই কথা আমার মনে হয়েছিল, যে, এইবার এই উদ্‌বোধনের দরবারে আমাদের সকলেরই ডাক পড়বে, ভারতবাসীর চিত্তে শক্তির যে বিচিত্র রূপ প্রচ্ছন্ন আছে সমস্তই প্রকাশিত হবে। কারণ, আমি একেই আমার দেশের মুক্তি বলি— প্রকাশই হচ্ছে মুক্তি। ভারতবর্ষে একদিন বুদ্ধদেব সর্বভূতের প্রতি মৈত্রীমন্ত্র নিজের সত্যসাধনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন ; তার ফল হয়েছিল এই যে, সেই সত্যের প্রেরণায় ভারতের মনুষ্যত্ব শিল্পকলায় বিজ্ঞানে ঐশ্বর্যে পরিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রশাসনের দিক থেকে সেদিনও ভারত বারে বারে এক হবার ক্ষণিক প্রয়াসের পর বারে বারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার চিত্ত সুপ্তি থেকে— অপ্রকাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। এই মুক্তির জোর এত যে, সে আপনাকে দেশের কোনো ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ করে রাখতে পারে নি— সমুদ্রমরুপারেও যে দূরদেশকে সে স্পর্শ করেছে তারই চিত্তের ঐশ্বর্যকে উদ্‌ঘাটন করেছে। আজকের দিনে কোনো বণিক কোনো সৈনিক এ কাজ করতে পারে নি ; তারা পৃথিবীকে যেখানেই স্পর্শ করেছে সেইখানেই বিরোধ পীড়া এবং অপমান জাগিয়েছে, সেইখানেই বিশ্বপ্রকৃতির শ্রী নষ্ট করে দিয়েছে। কেন। কেননা, লোভ সত্য নয়, প্রেমই সত্য। এইজন্য প্রেম যখন মুক্তি দেয় সে একেবারে ভিতরের দিক থেকে। কিন্তু লোভ যখন স্বাতন্ত্র্যের জন্যে চেষ্টা করে তখন সে জবর্দস্তির দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে অস্থির হয়ে ওঠে। বঙ্গবিভাগের দিনে এইটে আমরা লক্ষ্য করেছি— সেদিন গরিবদের আমরা ত্যাগদুঃখ স্বীকার করতে বাধ্য করেছি প্রেমের দ্বারা নয়, বাইরে থেকে নানাপ্রকারে চাপ দিয়ে। তার কারণ, লোভ অল্প সময়ের মধ্যে একটা বিশেষ সংকীর্ণ ফললাভের চেষ্টা করে ; প্রেমের যে ফল সে একদিনের নয়, অল্পদিনের জন্যও নয়, সে ফলের সার্থকতা আপনার মধ্যেই।

এতদিন পরে আমার দেশে সেই আনন্দময় মুক্তির হাওয়া বইছে এইটেই আমি কল্পনা করে এসেছিলুম। এসে একটা জিনিস দেখে আমি হতাশ হয়েছি। দেখছি, দেশের মনের উপর বিষম একটা চাপ। বাইরে থেকে কিসের একটা তাড়নায় সবাইকে এক কথা বলাতে এক কাজ করাতে ভয়ংকর তাগিদ দিয়েছে।

আমি যখন প্রশ্ন করতে যাই, বিচার করতে যাই, আমার হিতৈষীরা ব্যাকুল হয়ে আমার মুখ চাপা দিয়ে বলেন, আজ তুমি কিছু বোলো না। দেশের হাওয়ায় আজ প্রবল একটা উৎপীড়ন আছে— সে লাঠি-সড়কির উৎপীড়ন নয়, তার চেয়ে ভয়ংকর সে অলক্ষ্য উৎপীড়ন। বর্তমান প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যাঁদের মনে কিছুমাত্র সংশয় আছে, তাঁরা সেই সংশয় অতি ভয়ে ভয়ে, অতি সাবধানে প্রকাশ করলেও পরমুহূর্তেই তার বিরুদ্ধে একটা শাসন ভিতরে ভিতরে উদ্যত হয়ে ওঠে। কোনো একটি খবরের কাগজে একদিন কাপড় পোড়ানো সম্বন্ধে অতি মৃদুমন্দ মধুর কণ্ঠে একটুখানি আপত্তির আভাসমাত্র প্রকাশ পেয়েছিল ; সম্পাদক বলেন, তার পরদিনই পাঠকমণ্ডলীর চাঞ্চল্য তাঁকে চঞ্চল করে তুললে। যে আগুনে কাপড় পুড়েছে সেই আগুনে তাঁর কাগজ পুড়তে কতক্ষণ। দেখতে পাচ্ছি এক পক্ষের লোক অত্যন্ত ব্যস্ত, আর-এক পক্ষের লোক অত্যন্ত ত্রস্ত। কথা উঠেছে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে চাপা দিতে হবে, বিদ্যাকেও। কেবল বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। কার কাছে বাধ্যতা। মন্ত্রের কাছে, অন্ধবিশ্বাসের কাছে।

কেন বাধ্যতা। আবার সেই রিপুর কথা এসে পড়ে, সেই লোভ। অতি সত্বর অতি দুর্লভ ধন অতি সস্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সামনে জাগছে। এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস। এই আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধি অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে এবং অন্য যারা জলাঞ্জলি দিতে রাজি হয় না তাদের 'পরে বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বাহিরের স্বাতন্ত্র্যের নামে মানুষের অন্তরের স্বাতন্ত্র্যকে এইরূপে বিলুপ্ত করা সহজ হয়। সকলের চেয়ে আক্ষেপের বিষয় এই যে সকলেই যে এই আশ্বাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তা নয়, কিন্তু তারা বলে, এই প্রলোভনে দেশের একদল লোককে দিয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। "সত্যমেব জয়তে

নানৃতম্‌" এটা যে ভারতের কথা সে ভারত এঁদের মতে স্বরাজ পেতেই পারে না। আরো মুশকিল এই যে, যে লাভের দাবি করা হচ্ছে তার একটা নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি। ভয়ের কারণটা অস্পষ্ট হলে সে যেমন অতি ভয়ংকর হয়ে ওঠে, লোভের বিষয়টা অস্পষ্ট হলে তারও প্রবলতা বেড়ে যায়— কেননা তার মধ্যে কল্পনার কোনো বাধা থাকে না এবং প্রত্যেক লোকেরই তাকে সম্পূর্ণ নিজের মনের মতো করে গড়ে নিতে পারে। জিজ্ঞাসা দ্বারা তাকে চেপে ধরতে গেলে সে এক আড়াল থেকে আর-এক আড়ালে অতি সহজেই গা ঢাকা দেয়। এমনি করে এক দিকে লোভের লক্ষ্যটাকে অনির্দিষ্টতার দ্বারা অত্যন্ত বড়ো করে তোলা হয়েছে, অন্য দিকে তার প্রাপ্তির সাধনাকে সময়ে এবং উপায়ে অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে লোকের মনকে মোহাবিষ্ট করে তার পরে যখন তাকে বলা হয়, তোমার বুদ্ধিবিদ্যা প্রশ্নবিচার সমস্ত দাও ছাই করে, কেবল থাক্‌ তোমার বাধ্যতা, তখন সে রাজি হতে বিলম্ব করে না। কিন্তু কোনো একটা বাহ্যানুষ্ঠানের দ্বারা অদূরবর্তী কোনো একটা বিশেষ মাসের বিশেষ তারিখে স্বরাজ লাভ হবে এ কথা যখন অতি সহজেই দেশের অধিকাংশ লোক বিনা তর্কে স্বীকার করে নিলে এবং গদা হাতে সকল তর্ক নিরস্ত করতে প্রবৃত্ত হল, অর্থাৎ নিজের বুদ্ধির স্বাধীনতা বিসর্জন দিলে এবং অন্যের বুদ্ধির স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হল, তখন সেটাই কি একটা বিষম ভাবনার কথা হল না। এই ভূতকেই ঝাড়াবার জন্যে কি আমরা ওঝার খোঁজ করি নে। কিন্তু স্বয়ং ভূতই যদি ওঝা হয়ে দেখা দেয় তা হলেই তো বিপদের আর সীমা রইল না।

মহাত্মা তাঁর সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন, সেখানে আমরা সকলেই তাঁর কাছে হার মানি। এই সত্যের শক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করলুম এজন্য আজ আমরা কৃতার্থ। চিরন্তন সত্যকে আমরা পুঁথিতে পড়ি, কথায় বলি, যেক্ষণে তাকে আমরা সামনে দেখি সে আমাদের পুণ্যক্ষণ। বহুদিনে অকস্মাৎ আমাদের এই সুযোগ ঘটে। কন্‌গ্রেস আমরা প্রতিদিন গড়তে পারি, প্রতিদিন ভাঙতে পারি, ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ইংরেজি ভাষায় পোলিটিকাল বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানোও আমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু সত্যপ্রেমের যে সোনার কাঠিতে শত বৎসরের সুপ্ত চিত্ত জেগে ওঠে সে তো আমাদের পাড়ার স্যাকরার দোকানে গড়াতে পারি নে। যাঁর হাতে এই দুর্লভ জিনিস দেখলুম তাঁকে আমরা প্রণাম করি।

কিন্তু সত্যকে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সত্যের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা যদি দৃঢ় না হয় তা হলে ফল হল কী। প্রেমের সত্যকে প্রেমের দিকে যেমন মানি, বুদ্ধির সত্যকে বুদ্ধির দিকে তেমনি আমাদের মানতে হবে। কন্‌গ্রেস প্রভৃতি কোনোরকম বাহ্যানুষ্ঠানে দেশের হৃদয় জাগে নি, মহৎ অন্তরের অকৃত্রিম প্রেমের স্পর্শে জাগল। আন্তরিক সত্যের এই প্রভাব যখন আমরা আজ এমন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তখন স্বরাজলাভের বেলাতেই কি সেই সত্যকে আর আমরা বিশ্বাস করব না। উদ্‌বোধনের পালায় যাকে মানলুম, অনুষ্ঠানের পালায় তাকে বিসর্জন দিয়ে বসব?

মনে করো আমি বীণার ওস্তাদ খুঁজছি। পূর্বে পশ্চিমে আমি নানা লোককে পরীক্ষা করে দেখলুম কিন্তু হৃদয়ের তৃপ্তি হল না। তারা শব্দ করে খুব, তারা কৌশল জানে বিস্তর, তারা রোজগার করে যথেষ্ট, কিন্তু, তাদের বাহাদুরিতে মনে প্রশংসা জাগে, প্রেম জাগে না। অবশেষে হঠাৎ একজনকে খুঁজে পাওয়া গেল তিনি তাঁর তারে দুটি-চারটি মীড় লাগাবামাত্র অন্তরের আনন্দ-উৎসের মুখে এতদিন যে পাথর চাপা ছিল সেটা যেন এক মুহূর্তে গেল গলে। এর কারণ কী। এই ওস্তাদের মনে যে আনন্দময়ী শক্তি আছে সে একটি সত্যকার জিনিস, সে আপন আনন্দশিখা থেকে অতিসহজেই হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দশিখাকে জ্বালিয়ে তোলে। আমি বুঝে নিলুম, তাঁকে ওস্তাদ বলে মানলুম। তার পর আমার দরকার হল একটি বীণা তৈরি করানো। কিন্তু এই বীণা তৈরির বিদ্যায় যে সত্যের দরকার সে আর-এক জাতের সত্য। তার মধ্যে অনেক চিন্তা, অনেক শিক্ষা, অনেক বস্তুতত্ত্ব, অনেক মাপজোখ, অনেক অধ্যবসায়। সেখানে আমার ওস্তাদ যদি আমার দরিদ্র অবস্থার প্রতি দয়া করে হঠাৎ বলে বসেন, "বাবা, বীণা তৈরি করাতে বিস্তর আয়োজনের দরকার, সে তুমি পেরে উঠবে না, তুমি বরঞ্চ

এই কাঠির গায়ে একটা তার বেঁধে ঝংকার দাও ; তা হলে অমুক মাসের অমুক তারিখে এই কাঠিই বীণা হয়ে বাজতে থাকবে", তবে সে কথা খাটবে না। আসলে আমার গুরুর উচিত নয় আমার অক্ষমতার প্রতি দয়া করা। এ কথা তাঁর বলাই চাই, "এ-সব জিনিস সংক্ষেপে এবং সস্তায় সারা যায় না।" তিনিই তো আমাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দেবেন যে, বীণার একটি মাত্র তার নয়, এর উপকরণ বিস্তর, এর রচনাবলী সূক্ষ্ম, নিয়মে একটুমাত্র ত্রুটি হলে বেসুর বাজবে, অতএব জ্ঞানের তত্ত্বকে ও নিয়মকে বিচারপূর্বক সযত্নে পালন করতে হবে। দেশের হৃদয়ের গভীরতা থেকে সাড়া বের করা এই হল ওস্তাদজির বীণা বাজানো— এই বিদ্যায় প্রেম যে কত বড়ো সত্য জিনিস সেই কথাটা আমরা মহাত্মাজির কাছ থেকে বিশুদ্ধ করে শিখে নিতে বসেছি, এ সম্বন্ধে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাক্। কিন্তু স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য ; তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই। তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে। অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগতে হবে। তাতে দেশের লোকের জিজ্ঞাসাবৃত্তি যেন সর্বদা নির্মল ও নিরভিভূত থাকে, কোনো গূঢ় বা প্রকাশ্য শাসনের দ্বারা সকলের বুদ্ধিকে যেন ভীরু এবং নিশ্চেষ্ট করে তোলা না হয়। এই যে দেশের বিচিত্র শক্তিকে তলব দেওয়া এবং তাকে নিজের নিজের কাজে লাগানো, এ পারে কে। সকল ডাকে তো দেশ সাড়া দেয় না, পূর্বে তো বারংবার তার পরীক্ষা হয়ে গেছে। দেশের সকল শক্তিকে দেশের সৃষ্টিকার্যে আজ পর্যন্ত কেউ যোগযুক্ত করতে পারে নি বলেই তো এতদিন আমাদের সময় বয়ে গেল। তাই এতকাল অপেক্ষা করে আছি, দেশের লোককে ডাক দেবার যাঁর সত্য অধিকার আছে তিনিই সকলকে সকলের আত্মশক্তিতে নিযুক্ত করে দেবেন। একদিন ভারতের তপোবনে আমাদের দীক্ষাগুরু তাঁর সত্যজ্ঞানের অধিকারে দেশের সমস্ত ব্রহ্মচারীদের ডেকে বলেছিলেন—

যথাপঃ প্রবতায়ন্তি যথা মাসা অহর্জরম্।
এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা ॥

জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক থেকে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন, স্বাহা। সেদিনকার সেই সত্যদীক্ষার ফল আজও জগতে অমর হয়ে আছে এবং তার আহ্বান এখনো বিশ্বের কানে বাজে। আজ আমাদের কর্মগুরু তেমনি করেই দেশের সমস্ত কর্ম-শক্তিকে কেন আহ্বান করবেন না, কেন বলবেন না, আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা— তারা সকল দিক থেকে আসুক। দেশের সকল শক্তির জাগরণেই দেশের জাগরণ, এবং সেই সর্বতোভাবে জাগরণেই মুক্তি। মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে, অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো। এই ডাক কি সেই "আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা"। এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক। বিশ্বপ্রকৃতি যখন মৌমাছিকে মৌচাকের সংকীর্ণ জীবনযাত্রায় ডাক দিলেন তখন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি সেই আহ্বানে কর্মের সুবিধার জন্য নিজেকে ক্লীব করে দিলে ; আপনাকে খর্ব করার দ্বারা এই-যে তাদের আত্মত্যাগ এতে তারা মুক্তির উলটো পথে গেল। যে দেশের অধিকাংশ লোক কোনো প্রলোভনে বা অনুশাসনে অন্ধভাবে নিজের শক্তির ক্লীবত্ব সাধন করতে কুণ্ঠিত হয় না, তাদের বন্দিদশা যে তাদের নিজের অন্তরের মধ্যেই। চরকা কাটা এক দিকে অত্যন্ত সহজ, সেইজন্যে সকল মানুষের পক্ষে তা শক্ত। সহজের ডাক মানুষের নয়, সহজের ডাক মৌমাছির। মানুষের কাছে তা চূড়ান্ত শক্তির দাবি করলে তবেই সে আত্ম-প্রকাশের ঐশ্বর্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। স্পার্টা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে মানুষের শক্তিকে সংকীর্ণ করে তাকে বল দেবার চেষ্টা করেছিল, স্পার্টার জয় হয় নি ; এথেন্স্ মানুষের সকল শক্তিকে উন্মুক্ত করে তাকে পূর্ণতা দিতে চেয়েছিল, এথেন্সের জয় হয়েছে ; তার সেই জয়পতাকা আজও মানবসভ্যতার শিখরচূড়ায় উড়ছে। য়ুরোপে সৈনিকাবাসে কারখানাঘরে মানবশক্তির ক্লীবত্বসাধন

করছে না কি— লোভের বশে উদ্দেশ্যসাধনের খাতিরে মানুষের মনুষ্যত্বকে সংকীর্ণ করে ছেঁটে দিচ্ছে না কি। আর এইজনোই কি য়ুরোপীয় সমাজে আজ নিরানন্দ ঘনীভূত হয়ে উঠছে না। বড়ো কলের দ্বারাও মানুষকে ছোটো করা যায়, ছোটো কলের দ্বারাও করা যায়। এঞ্জিনের দ্বারাও করা যায়, চরকার দ্বারাও। চরকা যেখানে স্বাভাবিক সেখানে সে কোনো উপদ্রব করে না, বরঞ্চ উপকার করে— মানবমনের বৈচিত্র্যবশতই চরকা যেখানে স্বাভাবিক নয় সেখানে চরকায় সুতা কাটার চেয়ে মন কাটা যায় অনেকখানি। মন জিনিসটা সুতার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।

একটি কথা উঠেছে এই যে, ভারতে শতকরা আশি জন লোক চাষ করে এবং তারা বছরে ছয় মাস বেকার থাকে তাদের সুতা কাটতে উৎসাহিত করবার জন্যে কিছুকাল সকল ভদ্রলোকেরই চরকা ধরা দরকার। প্রথম আবশ্যক হচ্ছে যথোচিত উপায়ে তথ্যানুসন্ধান দ্বারা এই কথাটি প্রতিপন্ন করা। অর্থাৎ কী পরিমাণ চাষা কতদিন পরিমাণ বেকার থাকে। যখন চাষ বন্ধ তখন চাষারা কোনো উপায়ে যে পরিমাণ জীবিকা অর্জন করে সুতাকাটার দ্বারা তার চেয়ে বেশি অর্জন করবে কি না। চাষ ব্যতিরেকে জীবিকার একটিমাত্র উপায়ের দ্বারা সমস্ত কৃষাণকে বদ্ধ করা দেশের কল্যাণের পক্ষে উচিত কি না সে সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। কিন্তু মূল কথা এই যে, কারও মুখের কথায় কোনো অনুমানমাত্রের উপর নির্ভর করে আমরা সর্বজনীন কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারব না, আমরা বিশ্বাসযোগ্য প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধান দাবি করি। তার পরে উপায়ের যথাযোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করা সম্ভবপর।

আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, দেশের চিত্তশক্তিকে আমরা তো চিরদিনের জন্যে সংকীর্ণ করতে চাই নে, কেবল অতি অল্পকালের জন্যে। কেনই-বা অল্পকালের জন্যে। যেহেতু এই অল্পকালের মধ্যে এই উপায়ে আমরা স্বরাজ পাব? তার যুক্তি কোথায়। স্বরাজ তো কেবল নিজের কাপড় নিজে জোগানো নয়। স্বরাজ তো একমাত্র আমাদের বস্ত্রস্বচ্ছলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর, সেই মন তার বহুধাশক্তির দ্বারা এবং সেই আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা, স্বরাজ সৃষ্টি করতে থাকে। এই স্বরাজসৃষ্টি কোনো দেশেই তো শেষ হয় নি— সকল দেশেই কোনো-না-কোনো অংশে লোভ বা মোহের প্ররোচনায় বন্ধনদশা থেকে গেছে। কিন্তু সেই বন্ধনদশার কারণ মানুষের চিত্তে। সে-সকল দেশে নিরন্তর এই চিত্তের উপর দাবি করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও সেই চিত্তের বিকাশের উপরেই স্বরাজ দাঁড়াতে পারবে। তার জন্যে কোনো বাহ্য ক্রিয়া বাহ্য ফল নয়, জ্ঞান বিজ্ঞান চাই। দেশের চিত্তপ্রতিষ্ঠিত এই স্বরাজকে অল্পকাল কয়েকদিন চরকা কেটে আমরা পাব, এর যুক্তি কোথায়। যুক্তির পরিবর্তে উক্তি তো কোনোমতেই চলবে না। মানুষের মুখে যদি আমরা দৈববাণী শুনতে আরম্ভ করি তা হলে আমাদের দেশে, যে হাজার রকমের মারাত্মক উপসর্গ আছে এই দৈববাণী যে তারই মধ্যে অন্যতম এবং প্রবলতম হয়ে উঠবে। একবার যদি দেখা যায় যে, দৈববাণী ছাড়া আর-কিছুতেই আমাদের দেশ নড়ে না, তা হলে আশু প্রয়োজনের গরজে সকালে সন্ধ্যায় দৈববাণী বানাতে হবে, অন্য সকল রকম বাণীই নিরস্ত হয়ে যাবে। যেখানে যুক্তির অধিকার সেখানে উক্তি দিয়ে যাদের ভোলাতে হবে, তাদের পক্ষে, যেখানে আত্মার অধিকার সেখানে কোনো-না-কোনো কতার আসন পড়বেই। তারা স্বরাজের গোড়া কেটে বসে আছে, আগায় জল ঢেলে কোনো ফল হবে না। এ কথা মানছি আমাদের দেশে দৈববাণী দৈব ঔষধ, বাহ্যব্যাপারে দৈবক্রিয়া, এ-সবের প্রভাব খুবই বেশি— কিন্তু সেইজন্যে আমাদের দেশে স্বরাজের ভিতপত্তন করতে হলে দৈববাণীর আসনে বিশেষ করে বুদ্ধির বাণীকে পাকা করে বসাতে হবে। কেননা, আমার পূর্বের প্রবন্ধে বলেছি, দৈব স্বয়ং আধিভৌতিক রাজ্যে বুদ্ধির রাজ্যাভিষেক করেছেন। তাই আজ বাইরের বিশ্বে তারাই স্বরাজ পাবে এবং তাকে রক্ষা করতে পারবে যারা আত্মবুদ্ধির জোরে আত্মকর্তৃত্বের গৌরব উপলব্ধি করতে পারে— যারা সেই গৌরবকে কোনো লোভে কোনো মোহে পরের পদানত করতে চায় না। এই-যে আজ বস্ত্রাভাবে লজ্জাকাতরা মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করে কাপড় পোড়ানো চলছে, কোন্ বাণীতে দেশের কাছে আজ তার তাগিদ আসছে। সে কি ঐ দৈববাণীতে নয়। কাপড় ব্যবহার বা বর্জন ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রিকতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এ-সম্বন্ধে সেই তত্ত্বের ভাষাতেই দেশের সঙ্গে কথা

কইতে হবে ; বুদ্ধির ভাষা মান্য করা যদি বহুদিন থেকে দেশের অভ্যাসবিরুদ্ধ হয়, তবে আর-সব ছেড়ে দিয়ে ঐ অনভ্যাসের সঙ্গেই লড়াই করতে হবে। কেননা এই অনভ্যাসই আমাদের পক্ষে গোড়ায় গলদ, original sin। সেই গলদটারই খাতিরে সেই গলদকেই প্রশ্রয় দিয়ে আজ ঘোষণা করা হয়েছে, বিদেশী কাপড় অপবিত্র অতএব তাকে দগ্ধ করো। অর্থশাস্ত্রকে বহিষ্কৃত করে তার জায়গায় ধর্মশাস্ত্রকে জোর করে টেনে আনা হল। অপবিত্র কথাটা ধর্মশাস্ত্রের কথা— অর্থের নিয়মের উপরের কথা। মিথ্যাকে বর্জন করতে হবে কেন, মিথ্যা অপবিত্র কেন, তার দ্বারা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বা নষ্ট হয় বলেই যে তা নয়। হোক বা না হোক, তার দ্বারা আমাদের আত্মা মলিন হয়। অতএব এ-ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র বা রাষ্ট্রশাস্ত্রের কথা খাটে না, এখানে ধর্মশাস্ত্রেই বাণী প্রবল। কিন্তু কোনো কাপড় পরা বা না-পরার মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে তবে সেটা অর্থতত্ত্বের বা স্বাস্থ্যতত্ত্বের বা সৌন্দর্যতত্ত্বের ভুল— এটা ধর্মতত্ত্বের ভুল নয়। এর উত্তরে কেউ কেউ বলেন, যে ভুলে দেহমনের দুঃখ আনয়ন করে সেইটেই অধর্ম। আমি তার উত্তরে এই বলি, ভুলমাত্রেই দুঃখ আছে— জিয়োমেট্রির ভুলে রাস্তা খারাপ হয়, ভিত বাঁকা হয়, সাঁকো নির্মাণে এমন গলদ ঘটে যে, তার উপর রেলগাড়ি চললে ভয়ংকর দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই ভুলের সংশোধন ধর্মশাস্ত্রের মতে হয় না। অর্থাৎ ছেলেরা যে খাতায় জিয়োমেট্রির ভুল করে, অপবিত্র বলে সেই খাতা নষ্ট ক'রে এ ভুলের সংশোধন হয় না, জিয়োমেট্রিরই সত্য নিয়মে সেই খাতাকে সংশোধন করতে হবে। কিন্তু মাস্টারমশায়ের মনে এ কথা উঠতে পারে যে, ভুলের খাতাকে অপবিত্র যদি না বলি, তা হলে এরা ভুলকে ভুল বলে গণ্য করবে না। তা যদি সত্য হয়, তা হলে অন্য-সব কাজ ছেড়ে সকলপ্রকার উপায়ে এই চিত্তগত দোষকে সংশোধন করতে হবে, তবেই এ ছেলেরা মানুষ হতে পারবে। কাপড় পোড়ানোর হুকুম আজ আমাদের 'পরে এসেছে। সেই হুকুমকে হুকুম বলে আমি মানতে পারব না, তার প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, চোখ বুজে হুকুম মানার বিষম বিপত্তি থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে আমাদের লড়তে হবে— এ হুকুম থেকে আর-এক হুকুমে তাকে ঘুরিয়ে হুকুম-সমুদ্রের সাতঘাটে তাকে জল খাইয়ে মারতে পারব না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, যে কাপড় পোড়ানোর আয়োজন চলছে সে আমার কাপড় নয়, বস্তুত দেশবাসীদের মধ্যে যাদের আজ কাপড় নেই এ কাপড় তাদেরই, ও কাপড় আমি পোড়াবার কে। যদি তারা বলে 'পোড়াও' তা হলে অন্তত আত্মঘাতীর 'পরেই আত্মহত্যার ভার দেওয়া হয়, তাকে বধ করবার ভার আমাদের উপর পড়ে না। যে মানুষ ত্যাগ করছে তার অনেক কাপড় আছে আর যাকে জোর করে ত্যাগদুঃখ ভোগ করাচ্ছি কাপড়ের অভাবে সে ঘরের বার হতে পারছে না। এমনতরো জবর্দস্তির প্রায়শ্চিত্তে পাপক্ষালন হয় না। বার বার বলেছি আবার বলব, বাহ্য ফলের লোভে আমরা মনকে খোয়াতে পারব না। যে কলের দৌরাত্ম্যে সমস্ত পৃথিবী পীড়িত মহাত্মাজি সেই কলের সঙ্গে লড়াই করতে চান, এখানে আমরা তাঁর দলে। কিন্তু যে মোহমুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ অন্ধবাধ্যতা আমাদের দেশের সকল দৈন্য ও অপমানের মূলে, তাকে সহায় করে এ লড়াই করতে পারব না। কেননা তারই সঙ্গে আমাদের প্রধান লড়াই, তাকে তাড়াতে পারলে তবেই আমরা অন্তরে বাহিরে স্বরাজ পাব।

কাপড় পোড়াতে আমি রাজি আছি, কিন্তু কোনো উক্তির তাড়নায় নয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা যথেষ্ট সময় নিয়ে যথোচিত উপায়ে প্রমাণ সংগ্রহ করুন এবং সুযুক্তি দ্বারা আমাদের বুঝিয়ে দিন যে, কাপড়-পরা সম্বন্ধে আমাদের দেশ অর্থনৈতিক যে অপরাধ করেছে অর্থনৈতিক কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা তার প্রতিকার হতে পারে। বিনা প্রমাণে বিনা যুক্তিতে কেমন করে নিশ্চিত বলব যে, বিশেষ একটা কাপড় পরে আমরা আর্থিক যে অপরাধ করেছি কাপড়টাকে পুড়িয়ে সেই অপরাধের মূলটাকে আরো বিস্তারিত করে দিচ্ছি নে, ম্যাঞ্চেস্টারের ফাঁস তাতে পরিণামে ও পরিমাণে আরো কঠিন হয়ে উঠবে না? এ তর্ক আমি বিশেষজ্ঞভাবে উত্থাপিত করছি নে, কেননা আমি বিশেষজ্ঞ নই, আমি জিজ্ঞাসুভাবেই করছি। বিশেষজ্ঞ যা বলেন তাই যে বেদবাক্য আমি তা বলি নে। কিন্তু সুবিধা এই যে, বেদবাক্যের ছন্দে তাঁরা কথা বলেন না। প্রকাশ্য সভায় তাঁরা আমাদের বুদ্ধিকে আহ্বান করেন।

একটি কথা আমাদের মনে ভাববার দিন এসেছে, সে হচ্ছে এই— ভারতের আজকের এই

উদ্‌বোধন সমস্ত পৃথিবীর উদ্‌বোধনের অঙ্গ। একটি মহাযুদ্ধের তূর্যধ্বনিতে আজ যুগারম্ভের দ্বার খুলেছে। মহাভারতে পড়েছি, আত্মপ্রকাশের পূর্ববর্তী কাল হচ্ছে অজ্ঞাতবাসের কাল। কিছুকাল থেকে পৃথিবীতে মানুষ যে পরস্পর কী রকম ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে সে কথাটা স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত ছিল। অর্থাৎ ঘটনাটা বাইরে ছিল, আমাদের মনে প্রবেশ করে নি। যুদ্ধের আঘাতে এক মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যখন বিচলিত হয়ে উঠল তখন এই কথাটা আর লুকোনো রইল না। হঠাৎ এক দিনে আধুনিক সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত কেঁপে উঠল। বোঝা গেল এই কেঁপে ওঠার কারণটা স্থানিক নয় এবং ক্ষণিক নয়— এর কারণ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আর-এক মহাদেশে ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘটবে ততক্ষণ এই কারণের নিবৃত্তি হবে না। এখন থেকে যে-কোনো জাত নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র করে দেখবে বর্তমান যুগের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে, সে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্যে যে চিন্তা করতে হবে তার সে চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা। কিছুদিন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারতরাষ্ট্রশাসনে একটা মূলনীতির পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের মূলে আছে ভারতরাষ্ট্রসমস্যাকে বিশ্বসমস্যার অন্তর্গত করে দেখবার চেষ্টা। যুদ্ধ আমাদের মনের সামনে থেকে একটা পর্দা ছিঁড়ে দিয়েছে— যা বিশ্বের স্বার্থ নয় তা যে আমাদের নিজের স্বার্থের বিরোধী এই কথাকে মানুষ, পুঁথির পাতায় নয়, ব্যবহারের ক্ষেত্রে আজ দেখতে পাচ্ছে; এবং সে বুঝছে, যেখানে অন্যায় আছে সেখানে বাহ্য অধিকার থাকলেও সত্য অধিকার থাকে না। বাহ্য অধিকারকে খর্ব করেও যদি সত্য অধিকার পাওয়া যায় তবে সেটাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। মানুষের মধ্যে এই-যে একটা বুদ্ধির বিরাট পরিবর্তন ঘটছে, তার চিত্ত সংকীর্ণ থেকে ভূমার দিকে যাচ্ছে, তারই হাত এই ভারতরাষ্ট্রনীতি-পরিবর্তনের মধ্যে কাজ করতে আরম্ভ করেছে। এর মধ্যে যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা ও প্রভূত বাধা আছে— স্বার্থবুদ্ধি শুভবুদ্ধিকে পদে পদে আক্রমণ করবেই; তাই বলে এ কথা মনে করা অন্যায় যে, এই শুভবুদ্ধিই সম্পূর্ণ কপটতা এবং স্বার্থবুদ্ধিই সম্পূর্ণ অকৃত্রিম। আমার এই ষাট বৎসরের অভিজ্ঞতায় একটি কথা জেনেছি যে, কপটতার মতো দুঃসাধ্য অতএব দুর্লভ জিনিস আর নেই। খাঁটি কপট মানুষ হচ্ছে ক্ষণজন্মা লোক, অতি অকস্মাৎ তার আবির্ভাব ঘটে। আসল কথা, সকল মানুষের মধ্যেই কমবেশি পরিমাণে চারিত্রের দ্বৈধ আছে। আমাদের বুদ্ধির মধ্যে লজিকের যে কল পাতা তাতে দুই বিরোধী পদার্থকে ধরানো কঠিন বলেই ভালোর সঙ্গে যখন মন্দকে দেখি তখন তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিই, এর মধ্যে ভালোটাই চাতুরী। আজকের দিনে পৃথিবীতে সর্বজনীন যে-সকল প্রচেষ্টা চলছে তার মধ্যে পদে পদে মানুষের এই চারিত্রের দ্বৈধ দেখা যাবে। সে অবস্থায় তাকে যদি তার অতীত-যুগের দিক থেকে বিচার করি তা হলে তার স্বার্থবুদ্ধিকে মনে করব খাঁটি, কারণ, তার অতীতের নীতি ছিল ভেদবুদ্ধির নীতি। কিন্তু তাকে যদি আমাদের আগামীকালের দিক থেকে বিচার করি তা হলে বুঝব শুভবুদ্ধিটাই খাঁটি। কেননা ভাবী যুগের একটা প্রেরণা এসেছে মানুষকে সংযুক্ত করবার জন্যে। যে বুদ্ধি সকলকে সংযুক্ত করে সেই হচ্ছে শুভবুদ্ধি। এই-যে লীগ অফ নেশনস্‌-প্রতিষ্ঠা বা ভারতশাসনসংস্কার, এ-সব হচ্ছে ভাবী যুগ সম্বন্ধে পশ্চিমদেশের বাণী। এ বাণী সত্যকে যদি-বা সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে, এর চেষ্টা হচ্ছে সেই সত্যের অভিমুখে।

আজ এই বিশ্বচিত্ত-উদ্‌বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোনো প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সর্বজনীন কোনো বাণী না থাকে তা হলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে। আমি বলছি নে, আমাদের আশু প্রয়োজনের যা-কিছু কাজ আছে তা আমরা ছেড়ে দেব। সকালবেলায় পাখি যখন জাগে তখন কেবলমাত্র আহার-অন্বেষণে তার সমস্ত জাগরণ নিযুক্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার দুই অক্লান্ত পাখা সায় দেয় এবং আলোকের আনন্দে তার কণ্ঠে গান জেগে ওঠে। আজ সর্বমানবের চিত্ত আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে; আমাদের চিত্ত আমাদের ভাষায় তার সাড়া দিক— কেননা ডাকের যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণশক্তির লক্ষণ। একদা যখন পরমুখাপেক্ষী পলিটিক্সে

সংসক্ত ছিলুম, তখন আমরা কেবলই পরের অপরাধের তালিকা আউড়ে পরকে তার কর্তব্যত্রুটি স্মরণ করিয়েছি— আজ যখন আমরা পরপরায়ণতা থেকে আমাদের পলিটিক্সকে ছিন্ন করতে চাই, আজও সেই পরের অপরাধ জপের দ্বারাই আমাদের বর্জননীতির পোষণপালন করতে চাচ্ছি। তাতে উত্তরোত্তর আমাদের যে মনোভাব প্রবল হয়ে উঠছে সে আমাদের চিত্তের আকাশে রক্তবর্ণ ধুলো উড়িয়ে বৃহৎ জগৎ থেকে আমাদের চিন্তাকে আবৃত করে রাখছে। প্রবৃত্তির দ্রুত চরিতার্থতার দিকে আমাদের উত্তেজনা সে কেবলই বাড়িয়ে তুলছে। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত ভারতের বিরাট রূপ চোখে না পড়াতে আমাদের কর্মে ও চিন্তায় ভারতের যে পরিচয় আমরা দিতে প্রবৃত্ত হয়েছি সে অতি ছোটো, তার দীপ্তি নেই ; সে আমাদের ব্যবসায়বুদ্ধিকেই প্রধান করে তুলছে। এই বুদ্ধি কখনো কোনো বড়ো জিনিসকে সৃষ্টি করে নি। আজ পশ্চিম দেশে এই ব্যবসায়বুদ্ধিকে অতিক্রম করে শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোলবার জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্যম দেখা দিয়েছে। সেখানে কত লোক দেখেছি যারা এই সংকল্পকে মনের মধ্যে নিয়ে আজ সন্ন্যাসী। অর্থাৎ যারা স্বাজাত্যের বাঁধন কেটে ঐক্যের সাধনায় ঘরছাড়া হয়ে বেরিয়েছে, যারা নিজের অন্তরে মানুষের ভিতরকার অদ্বৈতকে দেখেছে। সেই-সব সন্ন্যাসীকে ইংরেজের মধ্যে অনেক দেখেছি ; তাঁরা তাঁদের স্বজাতির আত্মম্ভরিতা থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবার সাধনায় স্বজাতির কাছ থেকে আঘাত ও অপমান স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। সেইরকম সন্ন্যাসী দেখেছি ফ্রান্সে, যেমন রোম্যা রলাঁ— তিনি তাঁর দেশের লোকের দ্বারা বর্জিত। সেইরকম সন্ন্যাসী আমি য়ুরোপের অপেক্ষাকৃত অখ্যাত দেশের প্রান্তে দেখেছি। দেখেছি য়ুরোপের কত ছাত্রের মধ্যে ; সর্বমানবের ঐক্যসাধনায় তাদের মুখচ্ছবি দীপ্যমান। তারা ভাবী যুগের মহিমায় বর্তমান যুগের সমস্ত আঘাত ধৈর্যের সঙ্গে বহন করতে চায়, সমস্ত অপমান বীর্যের সঙ্গে ক্ষমা করতে চায়। আর আমরাই কি কেবল যেমন "পঞ্চকন্যাং স্মরেন্নিত্যং" তেমনি করে আজ এই শুভদিনের প্রভাতে কেবল পরের অপরাধ স্মরণ করব, এবং আমাদের জাতীয় সৃষ্টিকার্য একটা কলহের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে থাকব। আমরা কি এই প্রভাবে সেই শুভবুদ্ধিদাতাকে স্মরণ করব না— য একঃ, যিনি এক ; অবর্ণঃ, যিনি বর্ণহীন, যাঁর মধ্যে সাদা কালো নেই ; বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি, যিনি বহুধাশক্তির যোগে অনেক বর্ণের লোকের জন্য তাদের অন্তর্নিহিত প্রয়োজন বিধান করেছেন ; আর তাঁরই কাছে কি প্রার্থনা করব না, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন !

কার্তিক ১৩২৮

সমস্যা

যে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসে, তাদের সংখ্যা দশ-বিশ হাজার হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের সকলেরই পক্ষে একই প্রশ্ন, এক কালিতে একই অক্ষরে ছাপানো। সেই একই প্রশ্নের একই সত্য উত্তর দিতে পারলে তবে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পদবী পায়। এইজন্যে পার্শ্ববর্তী পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর চুরি করেও কাজ চলে। কিন্তু বিধাতার পরীক্ষার নিয়ম এত সহজ নয়। এক-এক জাতির কাছে তিনি এক-একটি স্বতন্ত্র সমস্যা পাঠিয়েছেন। সেই সমস্যার সত্য মীমাংসা তারা নিজে উদ্ভাবন করলে তবেই তারা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাবে ও মান পাবে। ভারতকেও তিনি একটি বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন, যতদিন না তার সত্য মীমাংসা হবে ততদিন ভারতের দুঃখ কিছুতেই শান্ত হবে না। আমরা চাতুরী খাটিয়ে য়ুরোপের পরীক্ষাপত্র থেকে উত্তর চুরি করছি। একদিন বোকার মতো করছিলুম মাছি-মারা নকল, আজকে বুদ্ধিমানের মতো করছি ভাষার কিছু বদল ঘটিয়ে। পরীক্ষক বারে বারে তার পাশে নীল পেনসিল দিয়ে যে গোল গোল চিহ্ন কাটছেন তার সব-কটাকেও একত্র যোগ করতে গেলে বিয়োগান্ত হয়ে ওঠে।

বায়ুমণ্ডলে ঝড় জিনিসটাকে আমরা দুর্যোগ বলেই জানি। সে যেন রাগী আকাশটার কিল চড় লাথি ঘুষোর আকারে আসতে থাকে। এই প্রহারটা তো হল একটা লক্ষণ। কিসের লক্ষণ। আসল কথা, যে বায়ুস্তরগুলো পাশাপাশি আছে, যে প্রতিবেশীদের মধ্যে মিল থাকা উচিত ছিল, তাদের মধ্যে ভেদ ঘটেছে। এক অংশের বড়ো বেশি গৌরব, আর-এক অংশের বড়ো বেশি লাঘব হয়েছে। এ তো সহ্য হয় না, তাই ইন্দ্রদেবের বজ্র গড়্‌গড়্‌ করে ওঠে, পবনদেবের ভেঁপু হু-হু করে হুংকার দিতে থাকে। যতক্ষণ প্রতিবেশীদের মধ্যে সাম্যসাধন না হয়, হাওয়ায় হাওয়ায় পঙ্‌ক্তিভেদ ঘুচে না যায়, ততক্ষণ শান্তি হয় না, ততক্ষণ দেবতার রাগ মেটে না। যাদের মধ্যে পরস্পর মিলে চলবার সম্বন্ধ তাদের মধ্যে ভেদ ঘটলেই তুমুল কাণ্ড বেধে যায়। তখন ঐ-যে অরণ্যটার গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যায়, ঐ-যে সমুদ্রটা পাগলামি করতে থাকে, তাদের দোষ দিয়ে বা তাদের কাছে শান্তিশতক আউড়িয়ে কোনো ফল নেই। কান পেতে শুনে নাও, স্বর্গে মর্তে এই রব উঠল, "ভেদ ঘটেছে, ভেদ ঘটেছে।"

এই হাওয়ার মধ্যে যে কথা, মানুষের মধ্যেও তাই। বাইরে থেকে যারা কাছাকাছি ভিতরের থেকে তাদের যদি ভেদ ঘটল, তা হলে ঐ ভেদটাই হল মূল বিপদ। যতক্ষণ সেটা আছে ততক্ষণ ইন্দ্রদেবের বজ্রকে, উনপঞ্চাশ পবনের চপেটাঘাতকে, বৈধ বা অবৈধ আন্দোলনের দ্বারা দমন করবার চেষ্টা করে ঝড়ের আন্দোলন কিছুতেই থামানো যায় না।

আমরা যখন বলি স্বাধীনতা চাই তখন কী চাই, সেটা ভেবে দেখা চাই। মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ একলা সেইখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেখানে তার কারও সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, কারও কাছে কোনো দায়িত্ব নেই, কারও প্রতি কোনো নির্ভর নেই, সেখানে তার স্বাতন্ত্র্যে লেশমাত্র হস্তক্ষেপ করবার কোনো মানুষই নেই। কিন্তু মানুষ এ স্বাধীনতা কেবল যে চায় না তা নয়, পেলে বিষম দুঃখ বোধ করে। রবিন্‌সন্ ক্রুসো তার জনহীন দ্বীপে যতখন একেবারে একলা ছিল ততখন সে একেবারে স্বাধীন ছিল। যখনই ফ্রাইডে এল তখনই তার সেই একান্ত স্বাধীনতা চলে গেল। তখন ফ্রাইডের সঙ্গে তার একটা পরস্পর-সম্বন্ধ বেধে গেল। সম্বন্ধ মাত্রেই অধীনতা। এমন-কি, প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধে প্রভুও ভৃত্যের অধীন। কিন্তু রবিন্‌সন্ ক্রুসো ফ্রাইডের সঙ্গে পরস্পর-দায়িত্বে জড়িত হয়েও নিজের স্বাধীনতার ক্ষতিজনিত দুঃখ কেন বোধ করে নি। কেননা, তাদের সম্বন্ধের মধ্যে ভেদের বাধা ছিল না। সম্বন্ধের মধ্যে ভেদ আসে কোথায়। যেখানে অবিশ্বাস আসে, ভয় আসে, যেখানে উভয়ে উভয়কে ঠকিয়ে জিততে চায়, যেখানে উভয়ের সঙ্গে উভয়ের ব্যবহারে সহজভাব থাকে না। ফ্রাইডে যদি হিংস্র বর্বর অবিশ্বাসী হত তা হলে তার সম্বন্ধে রবিন্‌সন্ ক্রুসোর স্বাধীনতা নষ্ট হত। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা নেই, অর্থাৎ যার প্রতি আমি উদাসীন, সে আমাকে টেনে রাখে না, কিন্তু তাই বলেই যে তারই সম্পর্কে আমি স্বাধীনতার যথার্থ আনন্দ ভোগ করি তা নয়। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা, যে আমার পরম বন্ধু, সুতরাং যে আমাকে বাঁধে, আমার চিত্ত তারই সম্বন্ধের মধ্যে স্বাধীনতা পায়, কোনো বাধা পায় না। যে স্বাধীনতা সম্বন্ধহীনতায় সেটা নেতিসূচক, সেই শূন্যতামূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেয়। এর কারণ হচ্ছে, অসম্বন্ধ মানুষ সত্য নয়, অন্যের সঙ্গে— সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই সে নিজের সত্যতা উপলব্ধি করে। এই সত্যতা-উপলব্ধির বাধায় অর্থাৎ সম্বন্ধের ভেদে, অসম্পূর্ণতায়, বিকৃতিতেই তার স্বাধীনতার বাধা। কেননা, ইতিসূচক স্বাধীনতাই মানুষের যথার্থ স্বাধীনতা। মানুষের গার্হস্থ্যের মধ্যে বা রাজ্যের মধ্যে বিপ্লব বাধে কখন, না, যখন পরস্পরের সহজ সম্বন্ধের বিপর্যয় ঘটে। যখন ভাইদের মধ্যে সন্দেহ বা ঈর্ষা বা লোভ প্রবেশ ক'রে তাদের সম্বন্ধকে পীড়িত করতে থাকে— তখন তারা পরস্পরের মধ্যে বাধা পায়, কেবলই ঠোকর খেয়ে খেয়ে পড়ে, তাদের জীবনযাত্রার প্রবাহ পদে পদে প্রতিহত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন পরিবারে বিপ্লব ঘটে। রাষ্ট্রবিপ্লবও সম্বন্ধভেদের বিপ্লব। কারণ সম্বন্ধভেদেই অশান্তি, সেই অশান্তিতেই স্বাধীনতার ক্ষতি। আমাদের ধর্মসাধনাতেও কোন্ মুক্তিকে মুক্তি বলে। যে মুক্তিতে অহংকার দূর করে দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে চিত্তের পূর্ণ যোগ সাধন করে। তার কারণ, বিশ্বের সঙ্গে যোগেই মানুষ সত্য— এইজন্যে সেই সত্যের মধ্যেই মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা পায়। আমরা একান্ত স্বাধীনতার শূন্যতাকে চাই

নে, আমরা ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সম্বন্ধের পরিপূর্ণতাকে চাই, তাকেই বলি মুক্তি। যখন দেশের স্বাধীনতা চাই, তখন নেতিসূচক স্বাধীনতা চাই নে, তখন দেশের সকল লোকের সঙ্গে সম্বন্ধকে যথাসম্ভব সত্য বাধামুক্ত করতে চাই। সেটা হয় ভেদের কারণ দূর করে দিয়ে, কিন্তু সে কারণ ভিতরেও থাকতে পারে, বাইরেও থাকতে পারে। আমরা পশ্চিমের ইতিহাসে পড়েছি, সেখানকার লোকেরা স্বাধীনতা চাই বলে প্রায় মাঝে মাঝে কোলাহল তুলেছে। আমরাও সেই কোলাহলের অনুকরণ করি, আমরাও বলি আমরা স্বাধীনতা চাই। আমাদের এই কথাটি স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে, য়ুরোপ যখন বলেছে স্বাধীনতা চাই তখন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে তার সমাজদেহের মধ্যে ভেদের দুঃখ ঘটেছিল— সমাজবর্তী লোকদের মধ্যে কোনো-না-কোনো বিষয়ে কোনো-না-কোনো আকারে সম্বন্ধের বিচ্ছেদ বা বিকৃতি ঘটেছিল, সেইটেকে দূর করার দ্বারাই তারা মুক্তি পেয়েছে। আমরাও যখন বলি স্বাধীনতা চাই তখন ভাবতে হবে কোন্ ভেদটা আমাদের দুঃখ-অকল্যাণের কারণ— নইলে স্বাধীনতা শব্দটা কেবল ইতিহাসের বুলি-রূপে ব্যবহার করে কোনো ফল হবে না। যারা ভেদকে নিজেদের মধ্যে ইচ্ছা করে পোষণ করে তারা স্বাধীনতা চায় এ কথার কোনো অর্থই নেই। সে কেমন হয়, না, মেজোবউ বলছেন যে তিনি স্বামীর মুখ দেখতে চান না, সন্তানদের দূরে রাখতে চান, প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না, কিন্তু বড়োবউয়ের হাত থেকে ঘরকরনা নিজের হাতে কেড়ে নিতে চান।

য়ুরোপের কোনো কোনো দেশে দেখেছি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘ'টে তার থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্‌ভাবন হয়েছে। গোড়াকার কথাটা এই যে, তাদের মধ্যে শাসিত ও শাসয়িতা এই দুই দলের মধ্যে ভেদ ঘটেছিল। সে ভেদ জাতিগত ভেদ নয়, শ্রেণীগত ভেদ। সেখানে এক দিকে রাজা ও রাজপুরুষ, অন্য দিকে প্রজা, যদিচ একই জাতের মানুষ তবু তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠেছিল। এইজন্যে তাদের বিপ্লবের একটি মাত্র কাজ ছিল, এই শ্রেণীগত ভেদটাকে রাষ্ট্রনৈতিক সেলাইয়ের কলে বেশ পাকারকম সেলাই করে ঘুচিয়ে দেওয়া। আজ আবার সেখানে দেখছি, আর-একটা বিপ্লবের হাওয়া বইছে। খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে বাণিজ্যক্ষেত্রে যারা টাকা খাটাচ্ছে, আর যারা মজুর খাটছে, তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশি। এই ভেদে পীড়া ঘটায়, সেই পীড়ায় বিপ্লব। ধনীরা ভীত হয়ে উঠে কর্মীরা যাতে ভালো বাসস্থান পায়, যাতে তাদের ছেলেপুলেরা লেখাপড়া শিখতে পারে, যাতে তারা সকল বিষয়ে কতকটা পরিমাণে আরামে থাকে, দয়া করে মাঝে মাঝে সে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু ভেদ যে রয়ে গেল। ধনীর অনুগ্রহের ছিটেফোঁটায় সেই ভেদ তো ঘোচে না, তাই আপদও মিটতে চায় না।

বহুকাল হল ইংলন্ড থেকে একদল ইংরেজ আমেরিকায় গিয়ে বসতি করে। ইংলন্ডের ইংরেজ সমুদ্রপার থেকে আমেরিকার ইংরেজের উপর শাসন বিস্তার করেছিল ; এই শাসনের দ্বারা সমুদ্রের দুই পারের ভেদ মেটে নি। এ ক্ষেত্রে নাড়ির টানের চেয়ে দড়ির টানটাই প্রবল হওয়াতে বন্ধন জোর করে ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছিল। অথচ এখানে দুই পক্ষই সহোদর ভাই।

একদিন ইটালিতে অস্ট্রিয়ান ছিল রাষ্ট্রের মুড়োয়, আর ইটালিয়ান ছিল ল্যাজায়। অথচ ল্যাজায় মুড়োয় প্রাণের যোগ ছিল না। এই প্রাণহীন বন্ধন ভেদকেই দুঃসহরূপে প্রকাশ করেছিল। ইটালি তার থেকে মুক্তিলাভ করে সমস্যার সমাধান করেছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে ভেদের দুঃখ থেকে, ভেদের অকল্যাণ থেকে মুক্তিই হচ্ছে মুক্তি। এমন-কি, আমাদের দেশের ধর্মসাধনার মূল কথাটা হচ্ছে ঐ— তাতে বলে, ভেদবুদ্ধিতেই অসত্য, সেই ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে দিলেই সত্যের মধ্যে আমাদের পরিত্রাণ।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি বিধাতার পরীক্ষাশালায় সব পরীক্ষার্থীর একই প্রশ্ন নয়। ভেদ এক রকম নয়। এক পায়ে খড়ম আর-এক পায়ে বুট, সে এক রকমের ভেদ ; এক পা বড়ো আর-এক পা ছোটো, সে আর-এক রকমের ভেদ ; পায়ের হাড় ভেঙে গিয়ে পায়ের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের বিচ্ছেদ, সে অন্য রকমের ভেদ ; এই সব-রকম ভেদই স্বাধীনশক্তিযোগে চলাফেরা করায় বাধা দেয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভেদের প্রতিকার ভিন্ন রকমের। খড়ম-পায়ের কাছ থেকে তার প্রশ্নের উত্তর চুরি করে নিয়ে

ভাঙা-পা নিজের বলে চালাতে গেলে তার বিপদ আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে।

ঐ-যে পূর্বেই বলেছি একদা ইংরেজ-জাতের মধ্যে ভেদের যে ছিন্নতা ছিল সেটাকে একটা রাষ্ট্রনৈতিক সেলাইয়ের কল দিয়ে তারা পাকা করে জুড়েছে। কিন্তু যেখানে কাপড়টা তৈরিই হয় নি, সুতোগুলো কতক আলাদা হয়ে কতক জটা পাকিয়ে পড়ে আছে, সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক সেলাইয়ের কলের কথা ভাবাই চলে না, সেখানে আরো গোড়ায় যেতে হয়, সেখানে সমাজনৈতিক তাঁতে চড়িয়ে বহু সুতোকে এক অখণ্ড কাপড়ে পরিণত করা চাই। তাতে বিলম্ব হবে, কিন্তু সেলাইয়ের কলে কিছুতেই বিলম্ব সারা যায় না।

শিবঠাকুরের তিনটি বধূ সম্বন্ধে ছড়ায় বলছে :

এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান,
এক কন্যে না পেয়ে বাপের বাড়ি যান।

তিন কন্যেরই আহারের সমান প্রয়োজন ছিল— কিন্তু দ্বিতীয় কন্যেটি যে সহজ উপায়ে আহার করেছিলেন, বিশেষ কারণে তৃতীয় কন্যের সেটা আয়ত্তাধীন ছিল না ; অতএব উদর এবং আহারসমস্যার পূরণ তিনি অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত উপায়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন— বাপের বাড়ি ছুটেছিলেন। প্রথম কন্যের ক্ষুধানিবৃত্তি সম্বন্ধে পুরাবৃত্তের বিবরণটি অস্পষ্ট। আমার বিশ্বাস, তিনি আয়োজন মাত্র করেছিলেন, আর মধ্যমাটি তার ফলভোগ করে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। ইতিহাসে এ-রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

আমাদের এই জন্মভূমিটি শিবঠাকুরের মধ্যমা প্রেয়সী নন, সে কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। বহু শতাব্দী ধরে বার বার তার পরিচয় পাওয়া গেল। কাজেই লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মধ্যমার পথটি তাঁর পথ হতেই পারে না। হয় তিনি রাঁধেন নি অথচ ভোজের দাবি করেছেন, শেষে শিবঠাকুরের ধমক খেয়ে সনাতন বাপের বাড়ির দিকে চলতে চলতে বেলা বইয়ে দিয়েছেন— নয়তো রেঁধেছেন, বেড়েছেন, কিন্তু খাবার বেলায় দেখেছেন আর-একজন পাত শূন্য করে দিয়েছে। অতএব তাঁর পক্ষে সমস্যা হচ্ছে, যে কারণে এমনটা ঘটে আর যে কারণে তিনি কথায় কথায় শিবঠাকুরকে চটিয়ে তোলেন সেটা সর্বাগ্রে দূর করে দেওয়া ; আবদার করে বললেই হবে না যে, মেজোবউ যেমন করে খাচ্ছে আমিও ঠিক তেমনি করে খাব।

আমরা সর্বদাই বলে থাকি, বিদেশী আমাদের রাজা,এই দুঃখ ঘুচলেই আমাদের সব দুঃখ ঘুচবে। বিদেশী রাজা আমি পছন্দ করি নে। পেট-জোড়া পিলেও আমার পছন্দসই নয়। কিন্তু অনেকদিন থেকে দেখছি পিলেটি আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে আপনি এসে পেট জুড়ে বসেছে। বহুযত্নে অন্তরের প্রকোষ্ঠে তাকে পালন করলেও বিপদ, আবার রাগের মাথায় ঘুষি মেরে তাকে ফাটিয়ে দিলেও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা বলেন, তোমাদের আশে-পাশে চার দিকেই ম্যালেরিয়া-বাহিনী ডোবা, সেইগুলো ভরাট না করলে তোমার পিলের ভরাট ছুটবে না। মুশকিলের ব্যাপার এই যে, পিলের উপরেই আমাদের যত রাগ, ডোবার উপরে নয়। আমরা বলি, আমাদের সনাতন ডোবা, ওগুলি যদি লুপ্ত হয় তা হলে ভূতকালের পবিত্র পদচিহ্নের গভীরতাই লোপ পাবে। সেই গভীরতা বর্তমানের অবিরল অশ্রুধারায় কানায় কানায় পূর্ণ হয় হোক কিন্তু আমাদের লোকালয় চিরদিন যেন ডোবায় ডোবায় শতধা হয়ে থাকে।

পাঠকেরা অধৈর্য হয়ে বলবেন, আর ভূমিকা নয়, এখন আমাদের বিশেষ সমস্যাটা কী বলেই ফেলো। বলতে সংকোচ হচ্ছে ; কারণ, কথাটা অত্যন্ত বেশি সহজ। শুনে সবাই অশ্রদ্ধা করে বলবেন, ও তো সবাই জানে। এইজন্যেই রোগের পরিচয় সম্বন্ধে ডাক্তারবাবু অনিদ্রা না বলে যদি ইন্‌সমনিয়া বলেন, তা হলে মনে হয় তাঁকে ষোলো টাকা ফি দেওয়া ষোলো-আনা সার্থক হল। আসল কথা, আমরা এক নই, আমাদের নিজেদের মধ্যে ভেদের অন্ত নেই। প্রথমেই বলেছি— ভেদটাই দুঃখ, ঐটেই পাপ। সে ভেদ বিদেশীর সঙ্গেই হোক আর স্বদেশীর সঙ্গেই হোক। সমাজটাকে একটা ভেদবিহীন বৃহৎ দেহের মতো ব্যবহার করতে পারি কখন। যখন তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে

বোধশক্তি ও কর্মশক্তির প্রাণগত যোগ থাকে ; যখন তার পা কাজ করলে হাত তার ফল পায়, হাত কাজ করলে পা তার ফল পায়। কল্পনা করা যাক, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিছাড়া ভুলে দেহের আকৃতিধারী এমন একটা অপদার্থ তৈরি হয়েছে যার প্রত্যেক বিভাগের চার দিকে নিষেধের বেড়া ; যার ডান-চোখে বাঁ-চোখে, ডান-হাতে বাঁ হাতে ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের সম্পর্ক ; যার পায়ের শিরার রক্ত বুকের কাছে উঠতে গেলেই দাবড়ানি খেয়ে ফিরে যায় ; যার তর্জনীটা কড়ে-আঙুলের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে কাজ করতে গেলে প্রায়শ্চিত্তের দায়িক হয় ; যার পায়ে তেল-মালিশের দরকার হলে ডান-হাত হরতাল করে বসে। এই অত্যন্ত নড়বড়ে পদার্থটা অন্য পাড়ার দেহটার মতো সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পায় না। সে-দেখে, অন্য দেহটা জুতো জামা প'রে লাঠি ছাতা নিয়ে পথে অপথে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। তখন সে ভাবে যে, ঐ দেহটার মতো জুতো জামা লাঠি ছাতা জুটলেই আমার সব দুঃখ ঘুচবে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ভুলের 'পরে নিজের ভুল যোগ করে দিয়ে সংশোধন চলে না। জুতো পেলেও তার জুতো খসে পড়বে, ছাতি পেলেও তার ছাতি হাওয়ায় দেবে উড়িয়ে, আর মনের মতো লাঠি যদি সে কোনোমতে জোগাড় করতে পারে অন্য পাড়ার দেহটি সে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে তার নড়বড়ে জীবলীলার প্রহসনটাকে হয়তো ট্র্যাজেডিতে সমাপ্ত করে দিতে পারে। এখানে জুতো জামা ছাতি লাঠির অভাবটাই সমস্যা নয়, প্রাণগত ঐক্যের অভাবটাই সমস্যা। কিন্তু বিধাতার উক্ত দেহরূপী বিদ্রূপটি হয়তো বলে থাকে যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনৈক্যের কথাটা এখন চাপা থাক্‌, আপাতত সবার আগে যদি কোনো গতিকে একটা জামা জোগাড় করে নিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকতে পারি তা হলে সেই জামাটার ঐক্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঐক্য আপনা-আপনি ঘটে উঠবে। আপনিই ঘটবে এ কথা বলা হচ্ছে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। এই ফাঁকি সর্বনেশে ; কেননা, নিজকৃত ফাঁকিকে মানুষ ভালোবাসে, তাকে যাচাই করে দেখতেই প্রবৃত্তি হয় না।

মনে আছে, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখন দেশে দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে একটা তর্ক প্রায় শোনা যেত, আমরা কি নেশন না নেশন নই। কথাটা সম্পূর্ণ বুঝতুম তা বলতে পারি নে, কিন্তু আমরা নেশন নই এ কথা যে মানুষ বলত রাজা হলে তাকে জেলে দিতুম, সমাজপতি হলে তার ধোবা নাপিত বন্ধ করতুম। তার প্রতি অহিংস্রভাব রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হত। তখন এ সম্বন্ধে একটা বাঁধা তর্ক এই ছিল যে, সুইজরল্যান্ডে তিন ভিন্ন জাত পাশাপাশি রয়েছে তবুও তো তারা এক নেশন, তবে আর কী ! শুনে ভাবতুম, যাক, ভয় নেই। কিন্তু মুখে ভয় নেই বললেও আসলে ভয় ঘোচে কই। ফাঁসির আসামীকে তার মোক্তার যখন বলেছিল 'ভয় কী, দুর্গা বলে ঝুলে পড়ো' তখন সে সান্ত্বনা পায় নি ; কেননা দুর্গা বলতে সে রাজি কিন্তু ঐ ঝুলে পড়াটাতেই আপত্তি। সুইজরল্যান্ডের লোকেরাও নেশন আর আমরাও নেশন, এ কথা কেবল তর্কে সাব্যস্ত করে সান্ত্বনাটা কী— ফলের বেলায় দেখি, আমরা ঝুলে পড়েছি আর তারা মাটির উপর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। রাধিকা চালুনিতে করে জল এনে কলঙ্কভঞ্জন করেছিলেন। যে হতভাগিনী নারী রাধিকা নয় তারও চালুনিটা আছে, কিন্তু তার কলঙ্কভঞ্জন হয় না, উলটোই হয়। মূলে যে প্রভেদ থাকাতে ফলের এই প্রভেদ, সেই কথাটাই ভাববার কথা। সুইজরল্যান্ডের ভেদ যতগুলোই থাক্‌, ভেদবুদ্ধি তো নেই। সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধা নেই ধর্মে বা আচারে বা সংস্কারে। এখানে সে বাধা এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিঘ্ন দূর করবার প্রস্তাব হবা মাত্র হিন্দুসমাজপতি উদ্‌বেগে ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে হরতাল করবার ভয় দেখিয়েছিলেন। সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়িতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত বলে কল্পনা করেন তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ির মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্যে যদি অবরুদ্ধ থাকে, তা হলে তাঁদের মিলন কখনোই প্রাণের মিলন হবে না, সুতরাং সকলে এক হয়ে প্রাণ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হতে পারবে না। তাঁদের প্রাণ যে এক প্রাণ নয়। আমার কোনো বন্ধু ভারতের প্রত্যন্তবিভাগে ছিলেন। সেখানে পাঠান দস্যুরা মাঝে মাঝে হিন্দু লোকালয়ে চড়াও হয়ে স্ত্রীহরণ করে থাকে। একবার এইরকম ঘটনায় আমার বন্ধু কোনো স্থানীয় হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সমাজের উপর এমন অত্যাচার তোমরা সহ্য করো কেন। সে

নিতান্ত উপেক্ষার সঙ্গে বললে, উয়ো তো বেনিয়াকী লড়কী। 'বেনিয়াকী লড়কী' হিন্দু আর যে-ব্যক্তি তার হরণ ব্যাপারে উদাসীন সেও হিন্দু, উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রগত যোগ থাকতে পারে কিন্তু প্রাণগত যোগ নেই। সেইজন্যে একের আঘাত অন্যের মর্মে গিয়ে বাজে না। জাতীয় ঐক্যের আদিম অর্থ হচ্ছে জন্মগত ঐক্য, তার চরম অর্থও তাই।

যেটা অবাস্তব, কোনোমতেই তার উপরে কোনো বড়ো সিদ্ধির পত্তন করা যায় না। মানুষ যখন দায়ে পড়ে তখন আপনাকে আপনি ফাঁকি দিয়ে আপনার কাছ থেকে কাজ উদ্ধার করবার চেষ্টা করে থাকে। বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে, নিজেকে বাম হাতে ফাঁকি দিয়ে ডান হাতে লাভ করা যেতেও পারে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার মূলে একটা মস্ত জাতীয় অবাস্তবতা আছে সে কথা আমরা ভিতরে ভিতরে সবাই জানি, সেইজন্যে সে দিকটাকে আমরা অগোচরে রেখে তার উপরে স্বাজাত্যের যে জয়স্তম্ভ গড়ে তুলতে চাই তার মালমসলাটাকেই খুব প্রচুর করে গোচর করতে ইচ্ছা করি। কাঁচা ভিতকে মালমসলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিতমত চাপা দিলেই সে তো পাকা হয়ে ওঠে না। বরঞ্চ একদিন সেই বাহুল্যেরই গুরুভারে ভিতের দুর্বলতা ভীষণরূপে সপ্রমাণ হয়ে পড়ে। খেলাফতের ঠেকো-দেওয়া সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূলে ভুল থাকলে কোনো উপায়েই স্থূলে সংশোধন হতে পারে না। এ-সব কথা শুনলে অধৈর্য হয়ে কেউ কেউ বলে ওঠেন, আমাদের চার দিকে যে বিদেশী তৃতীয় পক্ষ শত্রুরূপে আছে সেই আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাচ্ছে, অতএব দোষ আমাদের নয়, দোষ তারই— ইতিপূর্বে আমরা হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি নির্বিরোধেই ছিলুম. কিন্তু ইত্যাদি ইত্যাদি।— শাস্ত্রে বলে, কলি শনি ব্যাধি মানুষের ছিদ্র খোঁজে। পাপের ছিদ্র পেলেই তারা ভিতরে প্রবেশ করে সর্বনাশের পালা আরম্ভ করে দেয়। বিপদটা বাইরের, আর পাপটা আমার, এই কারণে বিপদের প্রতি ক্রোধ ও পাপের প্রতি মমতা করাই হচ্ছে সকল বিপদের সেরা।

জাহাজের খোলের মধ্যে ফাটল ছিল, যতদিন ঝড় তুফান ছিল না ততদিন সে জাহাজ খেয়া দিয়েছে। মাঝে মাঝে লোনা জল সেঁচতেও হয়েছিল, কিন্তু সে দুঃখটা মনে রাখবার মতো নয়। যেদিন তুফান উঠল সেদিন খোলের ফাটল বেড়ে বেড়ে জাহাজ-ডুবি আসন্ন হয়েছে। কাপ্তেন যদি বলে, যত দোষ ঐ তুফানের, অতএব সকলে মিলে ঐ তুফানটাকে উচ্চৈঃস্বরে গাল পাড়ি, আর আমার ফাটলটি যেমন ছিল তেমনই থাক্, তা হলে ঐ কাপ্তেনের মতো নেতাটি পারে নিয়ে যাবে না, তলায় নিয়ে যাবে। তৃতীয় পক্ষ যদি আমাদের শত্রুপক্ষই হয় তা হলে এই কথাটা মনে রাখতে হবে, তারা তুফানরূপে আমাদের ফাটল মেরামতের কাজে লাগতে আসে নি। তারা ভয়ংকর বেগে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে কোন্‌খানে আমাদের তলা কাঁচা। দুর্বলাত্মাকে বাস্তবের কথাটা তারা ডাইনে বাঁয়ে চাপড় মেরে মেরে স্মরণ করিয়ে দেবে। বুঝিয়ে দেবে ডাইনের সঙ্গে বাঁয়ের যার মিল নেই রসাতলের রাস্তা ছাড়া আর সব রাস্তাই তার পক্ষে বন্ধ। এক কথায় তারা শিরিষের আঠার ঢেউ নয়, তারা লবণাম্বু। যতক্ষণ তাদের উপর রাগারাগি করে বৃথা মেজাজ খারাপ ও সময় নষ্ট করছি ততক্ষণ যথাসর্বস্ব দিয়ে ফাটল বন্ধ করার কাজে লাগলে পরিত্রাণের আশা থাকে। বিধাতা যদি আমাদের সঙ্গে কৌতুক করতে চান, বর্তমান তৃতীয় পক্ষের তুফানটাকে আপাতত দমিয়ে দিতেও পারেন, কিন্তু তুফানের সম্পূর্ণ বংশলোপ করে সমুদ্রকে ডোবা বানিয়ে দেবেন আমাদের মতো ধর্মপ্রাণ হিন্দুরও এত বড়ো আবদার তিনি শুনবেন না। অতএব কাপ্তেনদের কাছে দোহাই পাড়ছি, যেন তাঁরা কণ্ঠস্বরে ঝড়ের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ফাটল মেরামতের কথাটা একেবারে চাপা না দেন।

কাপ্তেনরা বলেন, সে দিকে যে আমাদের লক্ষ আছে তার একটা প্রমাণ দেখো যে, যদিও আমরা সনাতনপন্থী তবু আমরা স্পর্শদোষ সম্বন্ধে দেশের লোকের সংস্কার দূর করতে চাই। আমি বলি, এহ বাহ্য। স্পর্শদোষ তো আমাদের ভেদবুদ্ধির একটিমাত্র বাহ্য লক্ষণ। যে সনাতন ভেদবুদ্ধির বনস্পতি আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে একটি কাঠি ভেঙে নিলেই তো পথ খোলসা হবে না।

আমি পূর্বে অন্যত্র বলেছি, ধর্ম যাদের পৃথক করে তাদের মেলবার দরজায় ভিতর দিক থেকে আগল দেওয়া। কথাটা পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করি। সকলেই বলে থাকে, ধর্ম শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে যা আমাদের ধারণ করে। অর্থাৎ, আমাদের যে-সকল আশ্রয় ধ্রুব তারা হচ্ছে ধর্মের অধিকারভুক্ত। তাদের সম্বন্ধে তর্ক নেই। এই-সকল আশ্রয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এদের সঙ্গে ব্যবহারে যদি চঞ্চলতা করি, কথায় কথায় যদি মত বদল ও পথ বদল করতে থাকি, তা হলে বাঁচি নে।

কিন্তু সংসারের এমন একটা বিভাগ আছে যেখানে পরিবর্তন চলছে, যেখানে আকস্মিকের আনাগোনার অন্ত নেই ; সেখানে নূতন নূতন অবস্থার সম্বন্ধে নূতন করে বারে বারে আপস-নিষ্পত্তি না করলে আমরা বাঁচি নে। এই নিত্যপরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধ্রুবকে অধ্রুবের জায়গায়, অধ্রুবকে ধ্রুবের জায়গায় বসাতে গেলে বিপদ ঘটবেই। যে মাটির মধ্যে গাছ শিকড় চালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শিকড়ের পক্ষে সেই ধ্রুব মাটি খুব ভালো, কিন্তু তাই বলে ডালপালাগুলোকেও মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলা কল্যাণকর নয়। পৃথিবী নিত্য আমাকে ধারণ করে ; পৃথিবী ধর্মের মতো ধ্রুব হলেই আমার পক্ষে ভালো, তার নড়চড় হতে থাকলেই সর্বনাশ। আমার গাড়িটাও আমাকে ধারণ করে ; সেই ধারণ ব্যাপারটাকে যদি ধ্রুব করে তুলি তা হলে গাড়ি আমার পক্ষে পৃথিবী হবে না, পিঁজরে হবে। অবস্থা বুঝে আমাকে পুরোনো গাড়ি বেচতে হয় বা মেরামত করতে হয়, নতুন গাড়ি কিনতে হয় বা ভাড়া করতে হয়, কখনো-বা গাড়িতে ঢুকতে হয়, কখনো-বা গাড়ি থেকে বেরোতে হয়, আর গাড়িটা কাত হবার ভাব দেখালে তার থেকে লাফিয়ে পড়বার পূর্বে বিধান নেবার জন্যে ভাটপাড়ায় সইস পাঠাতে হয় না। ধর্ম যখন বলে 'মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী করো' তখন কোনো তর্ক না করেই কথাটাকে মাথায় করে নেব। ধর্মের এ কথাটা আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতোই নিত্য। কিন্তু ধর্ম যখন বলে 'মুসলমানের ছোঁওয়া অন্ন গ্রহণ করবে না' তখন আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে, কেন করব না। এ কথাটা আমার কাছে ঘড়ার জলের মতো অনিত্য, তাকে রাখব কি ফেলব সেটার বিচার যুক্তির দ্বারা। যদি বল এ-সব কথা স্বাধীনবিচারের অতীত, তা হলে শাস্ত্রের সমস্ত বিধানের সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে, বিচারের যোগ্য বিষয়কে যারা নির্বিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার ধিক্কার আছে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ— যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। তারা পাণ্ডাকে দেবতার চেয়ে বেশি ভয় ও শ্রদ্ধা করে, এমনি করে তারা দেবপূজার অপমান করতে কুণ্ঠিত হয় না।

সংসারের যে ক্ষেত্রটা বুদ্ধির ক্ষেত্র, সেখানে বুদ্ধির যোগেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যমিলন সম্ভবপর। সেখানে অবুদ্ধির উৎপাত বিষম বাধা। সে যেন মানুষের বাসার মধ্যে ভুতুড়ে কাণ্ড। কেন, কী বৃত্তান্ত, ব'লে ভূতের কোনো জবাবদিহি নেই। ভূত বাসা তৈরি করে না, বাসা ভাড়া দেয় না, বাসা ছেড়েও যায় না। এতবড়ো জোর তার কিসের। না, সে বাস্তব নয়, অথচ আমার ভীরু মন তাকে বাস্তব বলে মেনে নিয়েছে। প্রকৃত বাস্তব যে সে বাস্তবের নিয়মে সংযত ; যদি-বা সে বাড়ি-ভাড়া নাও কবুল করে, অন্তত সরকারি ট্যাক্সো দিয়ে থাকে। অবাস্তবকে বাস্তব বলে মানলে তাকে জ্ঞানের কোনো নিয়মে পাওয়া যায় না। সেইজন্যে কেবল বুক দুর্‌দুর্‌ করে, গা ছম্‌ছম্‌ করে, আর বিনা বিচারে মেনেই চলি। যদি কেউ প্রশ্ন করে 'কেন', জবাব দিতে পারি নে, কেবল পিঠের দিকে বুড়ো-আঙুলটা দেখিয়ে দিয়ে বলি, ঐ যে! তার পরেও যদি বলে 'কই যে', তাকে নাস্তিক বলে তাড়া করে যাই। মনে ভাবি, গোঁয়ারটা বিপদ ঘটালে বুঝি— ভূতকে অবিশ্বাস করলে যদি সে ঘাড় মটকে দেয়! তবুও যদি প্রশ্ন ওঠে 'কেন' তা হলে উত্তরে বলি, 'আর যেখানেই কেন খাটাও এখানে কেন খাটাতে এসো না বাপু, মানে মানে বিদায় হও— মরবার পরে তোমাকে পোড়াবে কে সে ভাবনাটা ভেবে রেখে দিয়ো।'

চিত্তরাজ্যে যেখানে বুদ্ধিকে মানি সেখানে আমার স্বরাজ ; সেখানে আমি নিজেকে মানি, অথচ সেই মানার মধ্যে সর্বদেশের ও চিরকালের মানবচিত্তকে মানা আছে। অবুদ্ধিকে যেখানে মানি সেখানে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া শাসনকে মানি যা না আমার না সর্বমানবের। সুতরাং সে একটা কারাগার, সেখানে কেবল আমার মতো হাত-পা-বাঁধা এক কারায় অবরুদ্ধ অকালজরাগ্রস্তদের সঙ্গেই আমার

মিল আছে, বাইরের কোটি কোটি স্বাধীন লোকদের সঙ্গে কোনো মিল নেই। বৃহতের সঙ্গে এই ভেদ থাকাটাই হচ্ছে বন্ধন। কেননা পূর্বেই বলেছি, ভেদটাই সকল দিক থেকে আমাদের মূল বিপদ ও চরম অমঙ্গল। অবুদ্ধি হচ্ছে ভেদবুদ্ধি, কেননা চিত্তরাজ্যে সে আমাদের সকল মানবের থেকে পৃথক করে দেয়, আমরা একটা অদ্ভুতের খাঁচায় বসে কয়েকটা শেখানো বুলি আবৃত্তি করে দিন কাটাই।

জীবনযাত্রায় পদে পদেই অবুদ্ধিকে মানা যাদের চিরকালের অভ্যাস, চিত্রগুপ্তের কোনো একটা হিসাবের ভুলে হঠাৎ তারা স্বরাজের স্বর্গে গেলেও তাদের ঢেঁকি-লীলার শান্তি হবে না, সুতরাং পরপদপীড়নের তালে তালে তারা মাথা কুটে মরবে, কেবল মাঝে মাঝে পদযুগলের পরিবর্তন হবে এইমাত্র প্রভেদ।

যন্ত্রচালিত বড়ো বড়ো কারখানায় মানুষকে পীড়িত ক'রে যন্ত্রবৎ করে ব'লে আমরা আজকাল সর্বদাই তাকে কটূক্তি করে থাকি। এই উপায়ে পশ্চিমের সভ্যতাকে গাল পাড়ছি জেনে মনে বিশেষ সান্ত্বনা পাই। কারখানায় মানুষের এমন পঙ্গুতা কেন ঘটে ; যেহেতু সেখানে তার বুদ্ধিকে ইচ্ছাকে কর্মকে একটা বিশেষ সংকীর্ণ ছাঁচে ঢালা হয়, তার পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। কিন্তু লোহা দিয়ে গড়া কলের কারখানাই একমাত্র কারখানা নয়। বিচারহীন বিধান লোহার চেয়ে শক্ত, কলের চেয়ে সংকীর্ণ। যে বিপুল ব্যবস্থাতন্ত্র অতি নিষ্ঠুর শাসনের বিভীষিকা সর্বদা উদ্যত রেখে বহু যুগ ধরে বহু কোটি নরনারীকে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের পুনরাবৃত্তি করতে নিয়ত প্রবৃত্ত রেখেছে সেই দেশজোড়া মানুষ-পেষা জাঁতাকল কি কল হিসাবে কারও চেয়ে খাটো। বুদ্ধির স্বাধীনতাকে অশ্রদ্ধা করে এত বড়ো সুসম্পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ চিত্তশূন্য বজ্রকঠোর বিধিনিষেধের কারখানা মানুষের রাজ্যে আর কোনোদিন আর কোথাও উদভাবিত হয়েছে বলে আমি তো জানি নে। চটকল থেকে যে পাটের বস্তা তৈরি হয়ে বেরোয় জড়ভাবে বোঝা গ্রহণ করবার জন্যেই তার ব্যবহার। মানুষ-পেষা কল থেকে ছাঁটাকাটা যে-সব অতি-ভালোমানুষ পদার্থের উৎপত্তি হয় তারাও কেবল বাহিরের বোঝা বইতেই আছে। একটা বোঝা খালাস হতেই আর-একটা বোঝা তাদের অধিকার করে বসে।

প্রাচীন ভারত একদিন যখন বিধাতার কাছে বর চেয়েছিলেন তখন বলেছিলেন— স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, য একঃ অবর্ণঃ— যিনি এক, যিনি বর্ণভেদের অতীত, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন। তখন ভারত ঐক্য চেয়েছিলেন, কিন্তু পোলিটিকাল বা সামাজিক কলে-গড়া ঐক্যের বিড়ম্বনা চান নি। বুদ্ধ্যা শুভয়া, শুভবুদ্ধির দ্বারাই মিলতে চেয়েছিলেম— অন্ধ বশ্যতার লম্বা শিকলের দ্বারা নয়, বিচারহীন বিধানের কঠিন কান-মলার দ্বারা নয়।

সংসারে আকস্মিকের সঙ্গে মানুষকে সর্বদাই নতুন করে বোঝাপড়া করতেই হয়। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সেই কাজটাই খুব বড়ো কাজ। আমরা বিশ্বসৃষ্টিতে দেখতে পাই, আকস্মিক— বিজ্ঞানে যাকে variation বলে— আচমকা এসে পড়ে। প্রথমটা সে থাকে একঘরে, কিন্তু বিশ্বনিয়ম বিশ্বছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে সবার করে নেন। অথচ সে এক নূতন বৈচিত্র্যের প্রবর্তন করে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, মানুষের সমাজে, আকস্মিক প্রায়ই অনাহূত এসে পড়ে। তার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করলে এই নূতন আগন্তুকটি চার দিকের সঙ্গে সুসংগত হয়, অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিকে রুচিকে চারিত্রকে, আমাদের কাণ্ডজ্ঞানকে, পীড়িত অবমানিত না করে, সতর্ক বুদ্ধি দ্বারাতেই সেটা সাধন করতে হয়। মনে করা যাক, একদা এক ফকির বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার মাঝখানে খুঁটি পুঁতে তাঁর ছাগলটাকে বেঁধে হাট করতে গিয়েছিলেন। হাটের কাজ সারা হল, ছাগলটারও একটা চরম সদ্গতি হয়ে গেল। উচিত ছিল, এই আকস্মিক খুঁটিটাকে সর্বকালীনের খাতিরে রাস্তার মাঝখান থেকে উদ্ধার করা। কিন্তু উদ্ধার করবে কে। অবুদ্ধি করে না, কেননা তার কাজ হচ্ছে যা আছে তাকেই চোখ বুজে স্বীকার করা ; বুদ্ধিই করে, যা নূতন এসেছে তার সম্বন্ধে সে বিচারপূর্বক নূতন ব্যবস্থা করতে পারে। যে দেশে যা আছে তাকেই স্বীকার করা— যা ছিল তাকেই পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা সনাতন পদ্ধতি, সে দেশে খুঁটিটা শত শত বৎসর ধরে রাস্তার মাঝখানেই রয়ে গেল। অবশেষে একদিন খামকা কোথা থেকে একজন ভক্তিগদ্‌গদ মানুষ এসে তার গায়ে একটু সিঁদুর লেপে তার উপর একটা মন্দির তুলে

বসল। তার পর থেকে বছর বছর পঞ্জিকাতে ঘোষণা দেখা গেল, শুক্লপক্ষের কার্তিকসপ্তমীতে যে ব্যক্তি খুঁটীশ্বরীকে এক সের ছাগদুগ্ধ ও তিন তোলা রজত দিয়ে পূজা দেয় তার সেই পূজা ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ। এমনি করে অবুদ্ধির রাজত্বে আকস্মিক খুঁটি সমস্তই সনাতন হয়ে ওঠে, লোকচলাচলের রাস্তায় চলার চেয়ে বাঁধা পড়ে থাকাটা সহজ হয়ে ওঠে। যাঁরা নিষ্ঠাবান তাঁরা বলেন, আমরা বিধাতার বিশেষ সৃষ্টি, অন্য কোনো জাতের সঙ্গে আমাদের মেলে না, অতএব রাস্তা বন্ধ হলেও আমাদের চলে কিন্তু খুঁটি না থাকলে আমাদের ধর্ম থাকে না। যারা খুঁটীশ্বরীকে মানেও না, এমন-কি, যারা বিদেশী ভাবুক, তারাও বলে, আহা, একেই তো বলে আধ্যাত্মিকতা— নিজের জীবনযাত্রার সমস্ত সুযোগ-সুবিধাই এরা মাটি করতে রাজি, কিন্তু মাটি থেকে একটা খুঁটি এক ইঞ্চি পরিমাণও ওপড়াতে চায় না। সেইসঙ্গে এও বলে, আমাদের বিশেষত্ব অন্য রকমের, অতএব আমরা এদের অনুকরণ করতে চাই নে, কিন্তু এরা যেন হাজার খুঁটিতে ধর্মের বেড়াজালে এইরকম বাঁধা হয়ে অত্যন্ত শান্ত সমাহিত হয়ে পড়ে থাকে— কারণ, এটি দূর থেকে দেখতে বড়ো সুন্দর।

সৌন্দর্য নিয়ে তর্ক করতে চাই নে। সেটা রুচির কথা। যেমন ধর্মের নিজের অধিকারে ধর্ম বড়ো, তেমনি সুন্দরের নিজের অধিকারে সুন্দর বড়ো। আমার মতো অর্বাচীনেরা বুদ্ধির অধিকারের দিক থেকে প্রশ্ন করবে, এমনতরো খুঁটি-কণ্টকিত পথ দিয়ে কখনো স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধির রথ কি এগোতে পারে। বুদ্ধির অভিমানে বুক বেঁধে নব্যতন্ত্রী প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু রাত্রে আর ঘুম হয় না। যেহেতু গৃহিণীরা স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করে বলেন, 'ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর, কী জানি কোন্ খুঁটি কোন্ দিন বা দৃষ্টি দেয়। তোমরা চুপ করে থাকো-না। কলিকালে খুঁটি নাড়া দেবার মতো ডানপিটে ছেলের তো অভাব নেই।' শুনে আমাদের মতো নিছক আধুনিকদেরও বুক ধুক্‌ধুক্ করতে থাকে, কেননা রক্তের ভিতর থেকে সংস্কারটাকে তো ছেঁকে ফেলতে পারি নে। কাজেই পরের দিন ভোরবেলাতেই এক সেরের বেশি ছাগদুগ্ধ, তিন তোলার বেশি রজত খরচ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

এই তো গেল আমাদের সব চেয়ে প্রধান সমস্যা। যে বুদ্ধির রাস্তায় কর্মের রাস্তায় মানুষ পরস্পরে মিলে সমৃদ্ধির পথে চলতে পারে সেইখানে খুঁটি গেড়ে থাকার সমস্যা; যাদের মধ্যে সর্বদা আনাগোনার পথ সকল রকমে খোলসা রাখতে হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড়া তুলে পরস্পরের ভেদকে বহুধা ও স্থায়ী করে তোলার সমস্যা; বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা; খুঁটিরূপিণী ভেদবুদ্ধির কাছে ভক্তিভরে বিচার-বিবেককে বলিদান করবার সমস্যা! ভাবুক লোকে এই সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে ছলছল নেত্রে বলেন, আহা, এখানে ভক্তিটাই হল বড়ো কথা এবং সুন্দর কথা, খুঁটিটা তো উপলক্ষ। আমাদের মতো আধুনিকেরা বলে, এখানে বুদ্ধিটাই হল বড়ো কথা, সুন্দর কথা, খুঁটিটাও জঞ্জাল, ভক্তিটাও জঞ্জাল। কিন্তু আহা, গৃহিণী যখন অশুভ-আশঙ্কায় করজোড়ে গলবস্ত্র হয়ে দেবতার কাছে নিজের ডান হাত বাঁধা রেখে আসেন তার কী অনির্বচনীয় মাধুর্য! আধুনিক বলে, যেখানে ডান হাত উৎসর্গ করা সার্থক, যেখানে তাতে নেই অন্ধতা, যেখানে তাতে আছে সাহস, সেখানেই তার মাধুর্য; কিন্তু যেখানে অশুভ-আশঙ্কা মূঢ়তা-রূপে দীনতা-রূপে তার কুশ্রী কবলে সেই মাধুর্যকে গিলে খাচ্ছে সুন্দর সেখানে পরাস্ত— কল্যাণ সেখানে পরাহত।

আমাদের আর-একটি প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচলভাবে আপনাদের সীমানির্দেশ করেছে। সেই ধর্মই তাদের মানববিশ্বকে সাদা কালো ছক কেটে দুই সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করেছে— আত্ম ও পর। সংসারে সর্বত্রই আত্মপরের মধ্যে কিছু পরিমাণে স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই ভেদের পরিমাণটা অতিমাত্র হলেই তাতে অকল্যাণ হয়। বুশ্‌ম্যান-জাতীয় লোক পরকে দেখবা মাত্র তাকে নির্বিশেষে বিষবাণ দিয়ে মারে। তার ফল হচ্ছে, পরের সঙ্গে সত্য মিলনে মানুষের যে মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হয় বুশ্‌ম্যানের তা হতে পারে নি, সে চূড়ান্ত বর্বরতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। এই ভেদের মাত্রা যে জাতির মধ্যে অন্তরের দিক থেকে যতই কমে এসেছে সেই জাতি ততই উচ্চশ্রেণীর মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ

হতে পেরেছে। সে জাতি সকলের সঙ্গে যোগে,চিন্তার,কর্মের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছে।

হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচয় দেয়, মুসলমানও তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্মের বাহিরে উভয়েরই জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে এরা নিজ নিজ ধর্ম দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এই-যে দূরত্বের ভেদ এরা নিজেদের চারি দিকে অত্যন্ত মজবুত করে গেঁথে রেখেছে, এতে করে সকল মানুষের সঙ্গে সত্যযোগে মনুষ্যত্বের যে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ধর্মগত ভেদবুদ্ধি সত্যের অসীম স্বরূপ থেকে এদের সংকীর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এইজন্যেই মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে নিত্যসত্যের চেয়ে বাহ্যবিধান কৃত্রিমপ্রথা এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে।

পূর্বেই বলেছি, মানবজগৎ এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মের দ্বারাই আত্ম ও পর এই দুই ভাগে অতিমাত্রায় বিভক্ত হয়েছে। সেই পর চিরকালই পর হয়ে থাক্‌ হিন্দুর এই ব্যবস্থা ; সেই পর, সেই ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ কোনো ফাঁকে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে না পড়ে এই তার ইচ্ছা। মুসলমানের তরফে ঠিক এর উলটো। ধর্মগণ্ডীর বহির্বর্তী পরকে সে খুব তীব্রভাবেই পর বলে জানে ; কিন্তু সেই পরকে, সেই কাফেরকে বরাবরকার মতো ঘরে টেনে এনে আটক করতে পারলেই সে খুশি। এদের শাস্ত্রে কোনো একটা খুঁটে-বের-করা শ্লোক কী বলে সেটা কাজের কথা নয়, কিন্তু লোক ব্যবহারে এদের এক পক্ষ শত শত বৎসর ধরে ধর্মকে আপন দুর্গম দুর্গ করে পরকে দূরে ঠেকিয়ে আত্মগত হয়ে আছে, আর অপর পক্ষ ধর্মকে আপন ব্যূহ বানিয়ে পরকে আক্রমণ করে তাকে ছিনিয়ে এনেছে। এতে করে এদের মনঃপ্রকৃতি দুইরকম ছাঁদের ভেদবুদ্ধিতে একেবারে পাকা হয়ে গেছে। বিধির বিধানে এমন দুই দল ভারতবর্ষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রধান স্থান অধিকার করে নিয়েছে— আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে ; আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে ম্লেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে।

একটা জায়গায় দুই পক্ষ ক্ষণে ক্ষণে মেলবার চেষ্টা করে, সে হচ্ছে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে। শিবঠাকুরের ছড়াটা যদি আজ সম্পূর্ণ পাওয়া যেত তা হলে দেখা যেত, ঐ যে প্রথমা কন্যাটি রাঁধেন বাড়েন অথচ খেতে পান না, আর সেই যে তৃতীয়া কন্যাটি না খেয়ে বাপের বাড়ি যান, এদের উভয়ের মধ্যে একটা সন্ধি ছিল— সে হচ্ছে ঐ মধ্যমা কন্যাটির বিরুদ্ধে। কিন্তু যেদিন মধ্যমা কন্যা বাপের বাড়ি চলে যেত সেদিন অবশিষ্ট দুই সতিন এই দুই পোলিটিকাল ally দের মধ্যে চুলোচুলি বেধে উঠত। পদ্মায় ঝড়ের সময় দেখেছি কাক ফিঙে উভয়েই চরের মাটির উপর চঞ্চু আটকাবার চেষ্টায় একেবারে গায়ে গায়ে হয়ে পাখা ঝটপট করেছে। তাদের এই সাযুজ্য দেখে তাড়াতাড়ি মুগ্ধ হবার দরকার নেই। ঝড়ের সময় যতক্ষণ এদের সন্ধি স্থায়ী হয়েছে তার চেয়ে বহুদীর্ঘকাল এরা পরস্পরকে ঠোকর মেরে এসেছে। বাংলাদেশে স্বদেশী-আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান মেলে নি। কেননা, বাংলার অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গ করার দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব ছিল না। আজ অসহকার-আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে, তার কারণ রুম-সাম্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গীকরণের দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব। এমনতরো মিলনের উপলক্ষটা কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা সত্যতঃ মিলি নি ; আমরা একদল পূর্বমুখ হয়ে, অন্যদল পশ্চিমমুখ হয়ে কিছুক্ষণ পাশাপাশি পাখা ঝাপটেছি। আজ সেই পাখার ঝাপট বন্ধ হল, এখন উভয় পক্ষের চঞ্চু এক মাটি কামড়ে না থেকে পরস্পরের অভিমুখে সবেগে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রনৈতিক অধিনেতারা চিন্তা করছেন, আবার কী দিয়ে এদের চঞ্চুদুটোকে ভুলিয়ে রাখা যায়। আসল ভুলটা রয়েছে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে ভাঙা যাবে না। কম্বল চাপা দিয়ে যে মনে ভাবে বরফটাকে গরম করে তোলা গেল সে একদিন দেখতে পায় তাতে করে তার শৈত্যটাকে স্থায়ী করা গেছে।

হিন্দুতে মুসলমানে কেবল যে এই ধর্মগত ভেদ তা নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির অসমকক্ষতা ঘটেছে। মুসলমানের ধর্মসমাজের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জমে উঠেছে, আর হিন্দুর ধর্মসমাজের সনাতন অনুশাসনের প্রভাবেই তার

আপনার মধ্যে একটা প্রবল অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এর ফল এই যে, কোনো বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেও মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয়, মুসলমানের গায়ে জোর আছে, হিন্দুর নেই ; তার আসল কারণ, তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। এক দল আভ্যন্তরিক বলে বলী, আর-এক দল আভ্যন্তরিক দুর্বলতায় নির্জীব। এদের মধ্যে সমকক্ষভাবে আপস ঘটবে কী করে। অত্যন্ত দুর্যোগের মুখে ক্ষণকালের জন্যে তা সম্ভব, কিন্তু যেদিন অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারার সময় উপস্থিত হয় সেদিন সিংহের ভাগটা বিসদৃশরকম বড়ো হয়ে ওঠে, তার কারণটা তার থাবার মধ্যে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে যখন সমস্ত ইংরেজ জাতের মুখশ্রী পাংশুবর্ণ হয়ে উঠেছিল, তখন আমাদের মতো ক্ষীণপ্রাণ জাতকেও তারা আদর করে সহায়তার জন্যে ডেকেছিল। শুধু তাই নয়, ঘোর বিষয়ী লোকেরও যেমন শ্মশানবৈরাগ্যে কিছুক্ষণের জন্যে নিষ্কাম বিশ্বপ্রেম জন্মায়, তেমনি যুদ্ধশেষের কয়েক দণ্ড পরেও রক্ত-আহুতি-যজ্ঞে তাদের সহযোগী ভারতীয়দের প্রতি তাদের মনে দাক্ষিণ্যেরও সঞ্চার হয়েছিল। যুদ্ধের ধাক্কাটা এল নরম হয়ে, আর তার পরেই দেখা দিল জালিয়ান-বাগে দানবলীলা, আর তার পরে এল কেনিয়ায় সাম্রাজ্যের সিংহদ্বারে ভারতীয়দের জন্যে অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা। রাগ করি বটে, কিন্তু সত্য সমকক্ষ না হয়ে উঠলে সমকক্ষের ব্যবহার পাওয়া যায় না। এই কারণেই মহাত্মাজি খুব একটা ঠেলা দিয়ে প্রজাপক্ষের শক্তিটাকে রাজপক্ষের অনুভবযোগ্য করে তোলবার চেষ্টা করেছেন। উভয় পক্ষের মধ্যে আপসনিষ্পত্তিই তাঁর লক্ষ্য ছিল। এই আপসনিষ্পত্তি সবল-দুর্বলের একান্ত ভেদ থাকলে হতেই পারে না। আমরা যদি ধর্মবলে রাজার সিংহাসনে ভূমিকম্প ঘটাতে পারতুম, তা হলে রাজার বাহুবল একটা ভালোরকম রফা করবার জন্যে আপনিই আমাদের ডাক পাড়ত। ভারতবর্ষে হিন্দুতে মুসলমানে প্রতিনিয়তই পরস্পর রফানিষ্পত্তির কারণ ঘটবে। অসমকক্ষতা থাকলে সে নিষ্পত্তি নিয়তই বিপত্তির আকার ধারণ করবে। ঝরনার জল পানের অধিকার নিয়ে একদা বাঘ ও মেষের মধ্যে একটা আপসের কন্‌ফারেন্স্ বসেছিল ; ঈশপের কথামালায় তার ইতিহাস আছে। উপসংহারে প্রবলতর চতুষ্পদটি তর্কের বিষয়টাকে কিরকম অত্যন্ত সরল করে এনেছিল সে কথা সকলেরই জানা আছে। ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দু-মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয়পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।

মালাবারে মোপলাতে-হিন্দুতে যে কুৎসিত কাণ্ড ঘটেছিল সেটা ঘটেছিল খিলাফৎ সূত্রে হিন্দু-মুসলমানের সন্ধির ভরা জোয়ারের মুখেই। যে দুই পক্ষে বিরোধ তারা সুদীর্ঘকাল থেকেই ধর্মের ব্যবহারকে নিত্যধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এসেছে। নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের ধর্ম মুসলমানকে ঘৃণা করেছে, মোপলা মুসলমানের ধর্ম নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেছে। আজ এই দুই পক্ষের কন্‌গ্রেসমঞ্চ-ঘটিত ভ্রাতৃভাবের জীর্ণ মসলার দ্বারা তাড়াতাড়ি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খুব মজবুত করে পোলিটিকাল সেতু বানাবার চেষ্টা বৃথা। অথচ আমরা বার বারই বলে আসছি, আমাদের সনাতন ধর্ম যেমন আছে তেমনিই থাক্, আমরা অবাস্তবকে দিয়েই বাস্তব ফল লাভ করব, তার পরে ফললাভ হলে আপনিই সমস্ত গলদ সংশোধন হয়ে যাবে। বাজিমাৎ করে দিয়ে তার পরে চালের কথা ভাবব ; আগে স্বরাট হব, তার পরে মানুষ হব।

মালাবার-উৎপাত সম্বন্ধে এই তো গেল প্রথম কথা। তার পরে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের অসমকক্ষতা। ডাক্তার মুঞ্জে এই উপদ্রবের বিবরণ আলোচনা করে দক্ষিণের হিন্দুসমাজ গুরু শঙ্করাচার্যের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন ; তাতে বলেছেন :

The Hindus of Malabar are generally speaking mild and docile and have come to entertain such a mortal fear of the Moplas that the moment any such trouble arises, the only way of escape the Hindus can think of, is to run for life

leaving their children and womenfolk behind, to take care of themselves as best as they could, thinking perhaps honestly that if the Moplas attack them without any previous molestation, God, the almighty and the Omniscient, is there to teach them a lesson and even to take a revenge on their behalf.

ডাক্তার মুঞ্জের এ কথাটির মানে হচ্ছে এই যে, হিন্দু ঐহিককে ঐহিকের নিয়মে ব্যবহার করতে অভ্যাস করে নি, সে নিত্যে অনিত্যে খিচুড়ি পাকিয়ে বুদ্ধিটাকে দিয়েছে জলে। বুদ্ধির জায়গায় বিধি, এবং আত্মশক্তির জায়গায় ভগবানকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এরা আত্মাবমাননায় স্বয়ং ভগবানের অবমাননা করে বলেই দুঃখ পায়, সে কথা মনের জড়ত্ববশতই বোঝে না।

ডাক্তার মুঞ্জের রিপোর্টের আর-একটা অংশে তিনি বলছেন, আটশো বৎসর আগে মালাবারের হিন্দুরাজা ব্রাহ্মণমন্ত্রীদের পরামর্শে তাঁর রাজ্যে আরবদের বাসস্থাপনের জন্যে বিশেষভাবে সুবিধা করে দিয়েছিলেন। এমন-কি, হিন্দুদের মুসলমান করবার কাজে তিনি আরবদের এতদূর প্রশ্রয় দিয়েছিলেন যে, তাঁর আইন-মতে প্রত্যেক জেলে পরিবার থেকে একজন হিন্দুকে মুসলমান হতেই হত। এর প্রধান কারণ, ধর্মপ্রাণ রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা সমুদ্রযাত্রা ধর্মবিরুদ্ধ বলেই মেনে নিয়েছিলেন, তাই মালাবারের সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্যরক্ষার ভার সেই-সকল মুসলমানের হাতেই ছিল, সমুদ্রযাত্রার বৈধতা সম্বন্ধে যারা বুদ্ধিকে মানত, মনুকে মানত না। বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। তারা কর্মের মধ্যাহ্নকালকেও সুপ্তির নিশীথরাত্রি বানিয়ে তোলে। এইজন্যেই তাদের

ঠিক দুপ্‌প'র বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।

মালাবারের রাজা একদা নিজে রাজার মুখোশ-মাত্র প'রে অবুদ্ধিকে রাজাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই অবুদ্ধি মালাবারের হিন্দুসিংহাসনে এখনো রাজা আছে। তাই হিন্দু এখনো মার খায় আর উপরের দিকে তাকিয়ে বলে, ভগবান আছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা অবুদ্ধিকে রাজা করে দিয়ে তার কাছে হাত জোড় করে আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে— সেই বিধাতার বিধিবিরুদ্ধ ভয়ংকর ফাঁকটাকে কখনো পাঠান, কখনো মোগল, কখনো ইংরেজ এসে পূর্ণ করে বসছে। বাইরে থেকে এদের মারটাকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এরা হল উপলক্ষ। এরা এক-একটা ঢেলামাত্র, এরা ভূত নয়। আমরা মধ্যাহ্নকালের আলোতেও বুদ্ধির চোখ বুজিয়ে দিয়ে অবুদ্ধির ভূতকে ডেকে এনেছি, সমস্ত তারই কর্ম। তাই ঠিক দুপ্‌প'র বেলায় যখন জাগ্রত বিশ্বসংসার চিন্তা করছে, কাজ করছে, তখন পিছন দিক থেকে কেবল আমাদেরই পিঠের উপর—

ঠিক দুপ্‌প'র বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।

আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে। সেই আমাদের চারি দিকে ভেদ এনেছে, সেই আমাদের কাঁধের উপর পরবশতাকে চড়িয়ে দিয়েছে— সেই আমাদের এতদূর অন্ধ করে দিয়েছে যে যখন চীৎকারশব্দে ঢেলাকে গাল পেড়ে গলা ভাঙছি তখন সেই ভূতটাকে পরমাত্মীয় পরমারাধ্য বলে তাকেই আমাদের সমস্ত বাস্তুভিটে দেবত্র করে ছেড়ে দিয়েছি। ঢেলার দিকে তাকালে আমাদের পরিত্রাণের আশা থাকে না ; কেননা জগতে ঢেলা অসংখ্য, ঢেলা পথে ঘাটে, ঢেলা একটা ফুরোলে হাজারটা আসে— কিন্তু ভূত একটা। সেই ভূতটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে ঢেলাগুলো পায়ে পড়ে থাকে, গায়ে পড়ে না। ভারতবর্ষের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ করবার সময় এসেছে, শুধু কণ্ঠ দিয়ে নয়, চিন্তা দিয়ে, কর্ম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দিয়ে : য একঃ অবর্ণঃ, যিনি এক এবং সকল বর্ণভেদের অতীত, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনিই আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করুন।

অগ্রহায়ণ ১৩৩০

সমাধান

সমস্যার দিকে কেউ যদি অঙ্গুলি নির্দেশ করে অমনি দেশের কৃতী অকৃতী সকলে সেই ব্যক্তিকেই সমাধানের জন্য দায়িক করে জবাব চেয়ে বসে। তারা বলে, আমরা তো একটা তবু যা হোক কিছু সমাধানে লেগেছি, তুমিও এমনি একটা সমাধান খাড়া করো, দেখা যাক তোমারই বা কত বড়ো যোগ্যতা।

আমি জানি, কোনো ঔষধসত্রে এক বিলাতি ডাক্তার ছিলেন। তাঁর কাছে এক বৃদ্ধ এসে করুণ স্বরে যেমনি বলেছে 'জ্বর' অমনি তিনি ব্যস্ত হয়ে তখনই তাকে একটা অত্যন্ত তিতো জ্বরঘ্ন রস গিলিয়ে দিলেন, সে লোকটা হাঁপিয়ে উঠল কিন্তু আপত্তি করবার সময় মাত্র পেল না। সেই সংকটের সময়ে আমি যদি ডাক্তারকে বাধা দিয়ে বলতুম, জ্বর ওর নয়, জ্বর ওর মেয়ের, তা হলে কি ডাক্তার রেগে আমাকে বলতে পারতেন যে, তবে তুমিই চিকিৎসা করো না ; আমি তো তবু যা হয় একটা-কোনো ওষুধ যাকে হয় একজনকে খাইয়েছি, তুমি তো কেবল ফাঁকা সমালোচনাই করলে। আমার এইটুকু মাত্র বলবার কথা যে, আসল সমস্যাটা হচ্ছে, বাপের জ্বর নয়, মেয়ের জ্বর, অতএব বাপকে ওষুধ খাওয়ালে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সুবিধার কথাটা এই যে, আমি যেটাকে সমস্যা বলে নির্ণয় করছি, সে আপন সমাধানের ইঙ্গিত আপনিই প্রকাশ করছে। অবুদ্ধির প্রভাবে আমাদের মন দুর্বল ; অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন— শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ ; অবুদ্ধির প্রভাবে বাস্তব জগৎকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করতে পারি নে বলেই জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত পরাহত ; অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটেই যখন আমাদের সমস্যা তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আজকাল আমরা এই একটা বুলি ধরেছি, ঘরে যখন আগুন লেগেছে তখন শিক্ষাদীক্ষা সব ফেলে রেখে সর্বাগ্রে আগুন নেবাতে কোমর বেঁধে দাঁড়ানো চাই, অতএব সকলকেই চরকায় সুতো কাটতে হবে। আগুন লাগলে আগুন নেবানো চাই এ কথাটা আমার মতো মানুষের কাছেও দুর্বোধ নয়। এর মধ্যে দুরূহ ব্যাপার হচ্ছে কোন্‌টা আগুন সেইটে স্থির করা, তার পরে স্থির করতে হবে কোন্‌টা জল। ছাইটাকেই আমরা যদি আগুন বলি তা হলে ত্রিশ কোটি ভাঙাকুলো লাগিয়েও সে আগুন নেবাতে পারব না। নিজের চরকার সুতো, নিজের তাঁতের কাপড় আমরা যে ব্যবহার করতে পারছি নে সেটা আগুন নয়, সেটা ছাইয়ের একটা অংশ অর্থাৎ আগুনের চরম ফল। নিজের তাঁত চালাতে থাকলেও এ আগুন জ্বলতে থাকবে। বিদেশী আমাদের রাজা এটাও আগুন নয়, এটা ছাই ; বিদেশীকে বিদায় করলেও আগুন জ্বলবে— এমন-কি, স্বদেশী রাজা হলেও দুঃখদহনের নিবৃত্তি হবে না। এমন নয় যে হঠাৎ আগুন লেগেছে, হঠাৎ নিবিয়ে ফেলব। হাজার বছরের ঊর্ধ্বকাল যে আগুন দেশটাকে হাড়ে মাসে জ্বালাচ্ছে, আজ স্বহস্তে সুতো কেটে কাপড় বুনলেই সে আগুন দু দিনে বশ মানবে এ কথা মেনে নিতে পারি নে। আজ দুশো বছর আগে চরকা চলেছিল, তাঁতও বন্ধ হয় নি, সেই সঙ্গে আগুনও দাউ-দাউ করে জ্বলছিল। সেই আগুনের জ্বালানিকাঠটা হচ্ছে ধর্মে কর্মে অবুদ্ধির অন্ধতা।

যেখানে বর্বর অবস্থায় মানুষ ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকে সেখানে বনে জঙ্গলে ফলমূল খেয়ে চলে, কিন্তু যেখানে বহু লোকের সমাবেশে সভ্যতার বিচিত্র উদ্যম প্রকাশ পেতে চায় সেখানে ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে বেশ ভালোরকম করে চাষ করা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। সকল বড়ো সভ্যতারই অন্নরূপের আশ্রয় হচ্ছে কৃষিক্ষেত্র। কিন্তু সভ্যতার একটা বুদ্ধিরূপ আছে, সে তো অন্নের চেয়ে বড়ো বৈ ছোটো নয়। ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মনের ক্ষেত্র কর্ষণ করে বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ -ভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুলতে পারলে তবেই সে সভ্যতা মনস্বী হয়। কিন্তু যেখানে অধিকাংশ লোক মূঢ়তায় আবিষ্ট হয়ে

অন্ধসংস্কারের নানা বিভীষিকায় সর্বদা ত্রস্ত হয়ে গুরু-পুরোহিত-গণৎকারের দরজায় অহরহ ছুটোছুটি করে মরছে সেখানে এমন কোনো সর্বজনীন স্বাধীনতামূলক রাষ্ট্রিক বা সামাজিক ব্যবস্থাতন্ত্র ঘটতেই পারে না যার সাহায্যে অধিকাংশ মানুষ নিজের অধিকাংশ ন্যায্য প্রাপ্য পেতে পারে। আজকালকার দিনে আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলি যার ভিতর দিয়ে সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি স্বাধীন শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার উপায় পায়। কোনো দেশেই আজ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ আদর্শ দেখি নি। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপে আমেরিকায় এই আদর্শের অভিমুখে প্রয়াস দেখতে পাই। এই প্রয়াস কখন থেকে পাশ্চাত্য দেশে বললাভ করেছে। যখন থেকে সেখানে জ্ঞান ও শক্তি-সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বহুলপরিমাণে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে। যখন থেকে সংসারযাত্রার ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বুদ্ধিকে স্বীকার করতে সাহস করেছে। তখন থেকেই জনসাধারণ রাজা গুরু জড়প্রথা ও অন্ধসংস্কারগত শাস্ত্রবিধির বিষম চাপ কাটিয়ে উঠে মুক্তির সর্বপ্রকার বাধা আপন বুদ্ধির যোগে দূর করতে চেষ্টা করেছে। অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা চালিত হবার চিরাভ্যাস নিয়ে মুক্তির বিপুল দায়িত্ব কোনো জাতি কখনো ভালো করে বুঝতেই পারবে না, বহন করা তো দূরের কথা। হঠাৎ এক সময়ে যাঁকে তারা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে তাঁর বাণীকে দৈববাণী বলে জেনে তারা ক্ষণকালের জন্যে একটা দুঃসাধ্য সাধনও করতে পারে, অর্থাৎ যে আত্মশক্তি তাদের নিজের মধ্যে থাকা উচিত ছিল সেইটাকে বাইরে কোথাও খাড়া করে কোনো-এক সময়ে কোনো-একটা কাজ তারা মরিয়া হয়ে চালিয়ে নিতে পারে। নিত্য ব্যবহারের জন্যে যে আগুন জ্বালাবার কাজটা তাদের নিজের বুদ্ধির হাতেই থাকা উচিত ছিল কোনো একদিন সেই কাজটা কোনো অগ্নিগিরির আকস্মিক উচ্ছ্বাসের সহায়তায় তারা সাধন করে নিতে পারে। কিন্তু ক্বচিৎ-বিস্ফুরিত অগ্নিগিরির উপরেই যাদের ঘরের আলো জ্বালাবার ভার, নিজেদের বুদ্ধিশক্তির উপর নয়, মুক্তির নিত্যোৎসবে তাদের প্রদীপ জ্বলবে না এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। অতএব যে শিক্ষার চর্চায় তারা আগুন নিজে জ্বালাতে পারে, নিজে জ্বালানো অসাধ্য নয় এই ভরসা লাভ করতে পারে, সেই শিক্ষা পাওয়াই ঘরের অন্ধকার দূর হওয়ার একমাত্র সদুপায়।

এমন লোককে জানা আছে যে মানুষ জন্ম-বেকার, মজ্জাগত অবসাদে কাজে তার গা লাগে না। পৈতৃক সম্পত্তি তার পক্ষে পরম বিপত্তি, তাও প্রায় উজাড় হয়ে এল। অর্থ না হলে তার চলে না, কিন্তু উপার্জনের দ্বারা অর্থসঞ্চয়ের পথ এত দীর্ঘ, এত বন্ধুর যে, সে পথের সামনে বসে বসে পথটাকে হ্রস্ব করবার দৈব উপায়-চিন্তায় আধ-বোজা চোখে সর্বদা নিযুক্ত ; তাতে কেবল তার চিন্তাই বেড়ে চলেছে, পথ কমছে না। এমন সময় সন্ন্যাসী এসে বললে, তিন মাসের মধ্যেই সহজ উপায়ে তোমাকে লক্ষপতি করে দিতে পারি। এক মুহূর্তে তার জড়তা ছুটে গেল। সেই তিনটে মাস সন্ন্যাসীর কথামত সে দুঃসাধ্য সাধন করতে লাগল। এই জড়পদার্থের মধ্যে সহসা এতটা প্রচুর উদ্যম দেখে সকলেই সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তিতে বিস্মিত হয়ে গেল। কেউ বুঝলে না, এটা সন্ন্যাসীর শক্তির লক্ষণ নয়, ঐ মানুষটারই অশক্তির লক্ষণ। আত্মশক্তির পথে চলতে যে বুদ্ধি যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, যে মানুষের তা নেই তাকে অলৌকিক শক্তি-পথের আভাস দেবা মাত্রই সে তার জড়শয্যা থেকে লাফ দিয়ে ওঠে। তা না হলে আমাদের দেশে এত তাগাতাবিজ বিক্রি হবে কেন। যারা রোগ তাপ বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাবার বুদ্ধিসংগত উপায়ের 'পরে মানসিক জড়ত্ব-বশত আস্থা রাখে না, তাগাতাবিজ স্বস্ত্যয়ন তন্ত্র মন্ত্র মানতে তারা প্রভূত ত্যাগ এবং অজস্র সময় ও চেষ্টা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ কথা ভুলে যায় যে, এই তাগাতাবিজ-গ্রস্তদেরই রোগ-তাপ-বিপদ-আপদের অবসান দেবতা বা অপদেবতা কারও কৃপাতেই ঘটে না, এই তাগাতাবিজ-গ্রস্তদেরই ঘরে অকল্যাণের উৎস শতধারায় চিরদিন উৎসারিত।

যে দেশে বসন্তরোগের কারণটা লোকে বুদ্ধির দ্বারা জেনেছে এবং সে কারণটা বুদ্ধির দ্বারা নিবারণ করেছে সে দেশে বসন্ত মারীরূপ ত্যাগ করে দৌড় মেরেছে। আর যে দেশের মানুষ মা-শীতলাকে বসন্তের কারণ বলে চোখ বুজে ঠিক করে বসে থাকে সে দেশে মা-শীতলাও থেকে যান, বসন্তও যাবার নাম করে না। সেখানে মা-শীতলা হচ্ছেন মানসিক পরবশতার একটি প্রতীক, বুদ্ধির স্বরাজচ্যুতির কদর্য লক্ষণ।

আমার কথার একটা মস্ত জবাব আছে। সে হচ্ছে এই যে দেশের একদল লোক তো বিদ্যাশিক্ষা করেছে। তারা তো পরীক্ষা পাস করবার বেলায় জাগতিক নিয়মের নিত্যতা অমোঘতা সম্বন্ধে ব্যাকরণবিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় সাক্ষ্য দিয়ে ডিগ্রি নিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে এই ডিগ্রিধারীদেরই ব্যবহারে কি আত্মবুদ্ধির 'পরে, বিশ্ববিধির 'পরে বিশ্বাস সপ্রমাণ হচ্ছে ? তারাও কি বুদ্ধির অন্ধতায় সংসারে সকল রকমেরই দৈন্য বিস্তার করে না।

স্বীকার করতেই হয়, তাদের অনেকের মধ্যেই বুদ্ধিমুক্তির জোর বড়ো বেশি দেখতে পাই নে ; তারাও উচ্ছৃঙ্খলভাবে যা-তা মেনে নিতে প্রস্তুত ; অন্ধভক্তিতে অদ্ভুত পথে অকস্মাৎ চালিত হতে তারা উন্মুখ হয়ে আছে ; আধিভৌতিক ব্যাপারের আধিদৈবিক ব্যাখ্যা করতে তাদের কিছুমাত্র সংকোচ নেই ; তারাও নিজের বুদ্ধিবিচারের দায়িত্ব পরের হাতে সমর্পণ করতে লজ্জা বোধ করে না, আরাম বোধ করে।

তার একটা প্রধান কারণ এই যে, মূঢ়তার বিপুল ভারাকর্ষণ জিনিসটা ভয়ংকর প্রবল। নিজের সতর্ক বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে সচেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। যে সমাজ দৈব গুরু ও অপ্রাকৃত প্রভাবের 'পরে আস্থাবান নয়, যে সমাজ বুদ্ধিকে বিশ্বাস করতে শিখেছে, সে সমাজে পরস্পরের উৎসাহে ও সহায়তায় মানুষের মনের শক্তি সহজেই নিরলস থাকে। আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রণালীর দোষে একে তো শিক্ষা অগভীর হয়, তার উপরে সেই শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরতিশয় সংকীর্ণ। এইজন্যে সর্বজনের সম্মিলিত মনের শক্তি আমাদের মনকে অগ্রসরতার দিকে, আত্মশক্তির দিকে উন্মুখ করে রাখতে পারে না। সে সহজেই অলস হয়ে পড়ে এবং প্রচলিত বিশ্বাস ও চিরাগত প্রথার হাতে গা ঢেলে দিয়ে ছুটি পায়। তার পরে অশিক্ষিতদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ ঘটে এই যে, তারা আপন অন্ধবিশ্বাসে বিনা দ্বিধায় সহজ ঘুম ঘুমোয়, আমরা নিজেকে ভুলিয়ে আফিঙের ঘুম ঘুমোই ; আমরা কুতর্ক করে লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টা করি, জড়তা বা ভীরুত্ব -বশত যে কাজ করি তার একটা সুনিপুণ বা অনিপুণ ব্যাখ্যা বানিয়ে দিয়ে সেটাকে গর্বের বিষয় করে দাঁড় করাতে চাই। কিন্তু ওকালতির জোরে দুর্গতিকে চাপা দেওয়া যায় না।

দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে, এ কথাটা হঠাৎ এত অতিরিক্ত মস্ত বলে ঠেকে যে একে আমাদের সমস্যার সমাধান বলে মেনে নিতে মন রাজি হয় না।

দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড়ো অথচ তার উপায়টা খুব ছোটো হবে, এ কথা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাঁকির 'পরে বিশ্বাস— বাস্তবের 'পরে নয়, নিজের শক্তির 'পরে নয়।

অগ্রহায়ণ ১৩৩০

শূদ্রধর্ম

মানুষ জীবিকার জন্যে নিজের সুযোগমত নানা কাজ করে থাকে। সাধারণত সেই কাজের সঙ্গে ধর্মের যোগ নেই, অর্থাৎ তার কর্তব্যকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয় না।

ভারতবর্ষে একদিন জীবিকাকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। তাতে মানুষকে শান্ত করে। আপনার জীবিকার ক্ষেত্রকে তার সমস্ত সংকীর্ণতা সমেত মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে।

জীবিকা নির্বাচন সম্বন্ধে ইচ্ছার দিকে যাদের কোনো বাধা নেই, অধিকাংশ স্থলে ভাগ্যে তাদের বাধা দেয়। যে মানুষ রাজমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখে কাজের বেলায় তাকে রাজার ফরাসের কাজ করতে হয়। এমন অবস্থায় কাজের ভিতরে ভিতরে তার বিদ্রোহ থামতে চায় না।

মুশকিল এই যে, রাজসংসারে ফরাসের কাজের প্রয়োজন আছে, কিন্তু রাজমন্ত্রীর পদেরই সম্মান। এমন-কি, যে স্থলে তার পদই আছে, কর্ম নেই, সেখানেও সে তার খেতাব নিয়ে মানের দাবি করে। ফরাস এ দিকে খেটে খেটে হয়রান হয় আর মনে মনে ভাবে, তার প্রতি দৈবের অবিচার। পেটের দায়ে অগত্যা দীনতা স্বীকার করে, কিন্তু ক্ষোভ মেটে না।

ইচ্ছার স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভাগ্যও যদি যোগ দিত, সব ফরাসই যদি রাজমন্ত্রী হয়ে উঠত, তা হলে মন্ত্রণার কাজ যে ভালো চলত তা নয়, ফরাসের কাজও একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত।

দেখা যাচ্ছে, ফরাসের কাজ অত্যাবশ্যক, অথচ ফরাসের পক্ষে তা অসন্তোষজনক। এমন অবস্থায় বাধ্য হয়ে কাজ করা অপমানকর।

ভারতবর্ষ এই সমস্যার মীমাংসা করেছিল বৃত্তিভেদকে পুরুষানুক্রমে পাকা করে দিয়ে। রাজশাসনে যদি পাকা করা হত তা হলে তার মধ্যে দাসত্বের অবমাননা থাকত এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনোই থামত না। পাকা হল ধর্মের শাসনে। বলা হল, এক-একটা জাতির এক-একটা কাজ তার ধর্মেরই অঙ্গ।

ধর্ম আমাদের কাছে ত্যাগ দাবি করে। সেই ত্যাগে আমাদের দৈন্য নয়, আমাদের গৌরব। ধর্ম আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই কিছু-না-কিছু ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে। ব্রাহ্মণকেও অনেক ভোগ বিলাস ও প্রলোভন পরিত্যাগ করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রচুর সম্মান পেয়েছিল। না পেলে সমাজে সে নিজের কাজ করতেই পারত না। শূদ্রও যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছে, কিন্তু সমাদর পায় নি। তবুও, সে কিছু পাক আর না পাক, ধর্মের খাতিরে হীনতা স্বীকার করার মধ্যেও তার একটা আত্মপ্রসাদ আছে।

বস্তুত জীবিকানির্বাহকে ধর্মের শ্রেণীতে ভুক্ত করা তখনই চলে যখন নিজের প্রয়োজনের উপরেও সমাজের প্রয়োজন লক্ষ্য থাকে। ব্রাহ্মণ ভাতে-ভাত খেয়ে বাহ্য দৈন্য স্বীকার করে নিয়ে সমাজের আধ্যাত্মিক আদর্শকে সমাজের মধ্যে বিশুদ্ধ যদি রাখে তবে তার দ্বারা তার জীবিকানির্বাহ হলেও সেটা জীবিকানির্বাহের চেয়ে বড়ো, সেটা ধর্ম। চাষী যদি চাষ না করে তবে একদিনও সমাজ টেঁকে না। অতএব চাষী আপন জীবিকাকে যদি ধর্ম বলে স্বীকার করে তবে কথাটাকে মিথ্যা বলা যায় না। অথচ এমন মিথ্যা সান্ত্বনা তাকে কেউ দেয় নি যে, চাষ করার কাজ ব্রাহ্মণের কাজের সঙ্গে সম্মানে সমান। যে-সব কাজে মানুষের উচ্চতর বৃত্তি খাটে, মানবসমাজে স্বভাবতই তার সম্মান শারীরিক কাজের চেয়ে বেশি, এ কথা সুস্পষ্ট।

যে দেশে জীবিকা-অর্জনকে ধর্মকর্মের সামিল করে দেখে না সে দেশেও নিম্নশ্রেণীর কাজ বন্ধ হলে সমাজের সর্বনাশ ঘটে। অতএব সেখানেও অধিকাংশ লোককেই সেই কাজ করতেই হবে। সুযোগের সংকীর্ণতাবশত সেরকম কাজ করবার লোকের অভাব ঘটে না, তাই সমাজ টিকে আছে। আজকাল মাঝে-মাঝে যখন সেখানকার শ্রমজীবীরা সমাজের সেই গরজের কথাটা মাথা নাড়া দিয়ে সমাজের নিষ্কর্মা বা পরাসক্ত বা বুদ্ধিজীবীদের জানান দেয় তখন সমাজে একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। তখন কোথাও-বা কড়া রাজশাসন, কোথাও-বা তাদের আর্জি-মঞ্জুরির দ্বারা সমাজরক্ষার চেষ্টা হয়।

আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্মশাসনের অন্তর্গত করে দেওয়াতে এরকম অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করে জাতিগত কর্মধারাগুলির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে কি না ভেবে দেখবার বিষয়।

যে-সকল কাজ বাহ্য অভ্যাসের নয়, যা বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হতে পারে, তা ব্যক্তিগত না হয়ে বংশগত হতেই পারে না। যদি তাকে বংশে আবদ্ধ করা হয় তা হলে ক্রমেই তার প্রাণ মরে গিয়ে বাইরের ঠাটটাই বড়ো হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের যে সাধনা আন্তরিক তার জন্যে ব্যক্তিগত শক্তি ও সাধনার দরকার, যেটা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক সেটা সহজ। আনুষ্ঠানিক আচার বংশানুক্রমে চলতে চলতে তার অভ্যাসটা পাকা ও দম্ভটা প্রবল হতে পারে, কিন্তু তার আসল জিনিসটি মরে যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হয়ে উঠে জীবনপথের বিঘ্ন ঘটায়। উপনয়নপ্রথা এক সময়ে

আর্যদ্বিজদের পক্ষে সত্য পদার্থ ছিল— তার শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য, গুরুগৃহবাস, সমস্তই তখনকার কালের ভারতবর্ষীয় আর্যদের মধ্যে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে গ্রহণ করবার পক্ষে উপযোগী ছিল। কিন্তু যে-সকল উচ্চ আদর্শ আধ্যাত্মিক, যার জন্যে নিয়তজাগরূক চিৎশক্তির দরকার, সে তো মৃত পদার্থের মতো কঠিন আচারের পৈতৃক সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করে রাখবার নয়, সেইজন্যেই স্বভাবতই উপনয়নপ্রথা এখন প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ, উপনয়ন যে আদর্শের বাহন ও চিহ্ন সেই আদর্শই গেছে সরে। ক্ষত্রিয়েরও সেই দশা ; কোথায় যে সে, তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। যারা ক্ষত্রিয়বর্ণ বলে পরিচিত, জাতকর্ম বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময়েই তারা ক্ষত্রিয়ের কতকগুলি পুরাতন আচার পালন করে মাত্র।

এ দিকে শাস্ত্রে বলছেন : স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। এ কথাটার প্রচলিত অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, যে বর্ণের শাস্ত্রবিহিত যে ধর্ম তাকে তাই পালন করতে হবে। এ কথা বললেই তার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, ধর্ম-অনুশাসনের যে অংশটুকু অন্ধভাবে পালন করা চলে তাই প্রাণপণে পালন করতে হবে, তার কোনো প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্, তাতে অকারণে মানুষের স্বাধীনতার খর্বতা ঘটে ঘটুক, তার ক্ষতি হয় হোক। অন্ধ আচারের অত্যাচার অত্যন্ত বেশি তার কাছে ভালোমন্দর আন্তরিক মূল্যবোধ নেই। তাই যে শুচিবায়ুগ্রস্ত মেয়ে কথায় কথায় স্নান করতে ছোটে সে নিজের চেয়ে অনেক ভালো লোককে বাহ্যশুচিতার ওজনে ঘৃণাভাজন মনে করতে দ্বিধা বোধ করে না। বস্তুত তার পক্ষে আন্তরিক সাধনার কঠিনতর প্রয়াস অনাবশ্যক। এইজন্যে অহংকার ও অন্যের প্রতি অবজ্ঞায় তার চিত্তের অশুচিতা ঘটে। এই কারণে আধুনিক কালে যারা বুদ্ধিবিচার জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজকর্তাদের মতে স্বধর্ম পালন করে তাদের ঔদ্ধত্য এতই দুঃসহ, অথচ এত নিরর্থক।

অথচ জাতিগত স্বধর্ম পালন করা খুবই সহজ যেখানে সেই স্বধর্মের মধ্যে চিত্তবৃত্তির স্থান নেই। বংশানুক্রমে হাঁড়ি তৈরি করা, বা ঘানির থেকে তেল বের করা, বা উচ্চতর বর্ণের দাস্যবৃত্তি করা কঠিন নয়— বরং তাতে মন যতই মরে যায় কাজ ততই সহজ হয়ে আসে। এই-সকল হাতের কাজেরও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে চিত্ত চাই। বংশানুক্রমে স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে তার উপযুক্ত চিত্তও বাকি থাকে না, মানুষ কেবল যন্ত্র হয়ে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। যাই হোক, আজ ভারতে বিশুদ্ধভাবে স্বধর্মে টিকে আছে কেবল শূদ্রেরা। শূদ্রত্বে তাদের অসন্তোষ নেই। এইজন্যেই ভারতবর্ষের-নিমকে-জীর্ণ দেশে-ফেরা ইংরেজ-গৃহিণীর মুখে অনেকবার শুনেছি, স্বদেশে এসে ভারতবর্ষের চাকরের অভাব তারা বড়ো বেশি অনুভব করে। ধর্মশাসনে পুরুষানুক্রমে যাদের চাকর বানিয়েছে তাদের মতো চাকর পৃথিবীতে কোথায় পাওয়া যাবে। লাথিঝাঁটা-বর্ষণের মধ্যেও তারা স্বধর্মরক্ষা করতে কুণ্ঠিত হয় না। তারা তো কোনোকালে সম্মানের দাবি করে নি, পায়ও নি, তারা কেবল শূদ্রধর্ম অত্যন্ত বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছে। আজ যদি তারা বিদেশী শিক্ষায় মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয় তবে সমাজপতি তাদের স্পর্ধা সম্বন্ধে আক্রোশ প্রকাশ করে।

স্বধর্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সব চেয়ে বেশি, তাই এক দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ শূদ্রধর্মেরই দেশ। তার নানা প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া গেছে। এই অতি প্রকাণ্ড শূদ্রধর্মের জড়ত্বের ভারাকর্ষণে ভারতের সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের মাথা হেঁট হয়ে আছে। বুদ্ধিসাধ্য জ্ঞানসাধ্য চারিত্রশক্তিসাধ্য যে-কোনো মহাসম্পদ্‌লাভের সাধনা আমরা আজ করতে চাই তা এই প্রবল শূদ্রত্বভার ঠেলে তবে করতে হবে— তার পরে সেই সম্পদকে রক্ষা করবার ভারও এই অসীম অন্ধতার হাতে সমর্পণ করা ছাড়া আর উপায় নেই। এই কথাই আমাদের ভাববার কথা।

এই শূদ্রপ্রধান ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড়ো দুর্গতির যে ছবি দেখতে পাই সেই পরম আক্ষেপের কথাটা বলতে বসেছি।

প্রথমবারে যখন জাপানের পথে হংকঙের বন্দরে আমাদের জাহাজ লাগল, দেখলুম সেখানে ঘাটে একজন পাঞ্জাবি পাহারাওয়ালা অতি তুচ্ছ কারণে একজন চৈনিকের বেণী ধরে তাকে লাথি মারলে। আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। নিজের দেশে রাজভৃত্যের-লাঞ্ছন-ধারী কর্তৃক স্বদেশীর এরকম

অত্যাচার-দুর্গতি অনেক দেখেছি, দূর সমুদ্রতীরে গিয়েও তাই দেখলুম। দেশে বিদেশে এরা শূদ্রধর্মপালন করছে। চীনকে অপমানিত করবার ভার প্রভুর হয়ে এরা গ্রহণ করেছে, সে সম্বন্ধে এরা কোনো বিচার করতেই চায় না ; কেননা এরা শূদ্রধর্মের হাওয়ায় মানুষ। নিমকের সহজ দাবি যতদূর পৌঁছায় এরা সহজেই তাকে বহু দূরে লঙ্ঘন করে যায় ; তাতে আনন্দ পায়, গর্ব বোধ করে।

চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যখন হংকঙ কেড়ে নিতে গিয়েছিল তখন এরাই চীনকে মেরেছে। চীনের বুকে এদেরই অস্ত্রের চিহ্ন অনেক আছে— সেই চীনের বুকে যে চীন আপন হৃদয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ধারণ করেছিল, সেই ইৎসিং হিউয়েন্‌সাঙের চীন।

মানববিশ্বের আকাশে আজ যুদ্ধের কালো মেঘ চার দিকে ঘনিয়ে এসেছে। এ দিকে প্যাসিফিকের তীরে ইংরেজের তীক্ষ্ণচঞ্চু খরনখরদারুণ শ্যেনতরণীর নীড় বাঁধা হচ্ছে। পশ্চিম মহাদেশে দিকে দিকে রব উঠেছে যে, এসিয়ার অস্ত্রশালায় শক্তিশেল তৈরি চলছে, য়ুরোপের মর্মের প্রতি তার লক্ষ। রক্তমোক্ষণক্লান্ত পীড়িত এসিয়াও ক্ষণে ক্ষণে অস্থিরতার লক্ষণ দেখাচ্ছে। পূর্বমহাদেশের পূর্বতম প্রান্তে জাপান জেগেছে, চীনও তার দেওয়ালের চার দিকে সিঁধ কাটার শব্দে জাগবার উপক্রম করছে। হয়তো একদিন এই বিরাটকায় জাতি তার বন্ধন ছিন্ন করে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে, হয়তো একদিন তার আফিমে আবিষ্ট দেহ বহুকালের বিষ ঝেড়ে ফেলে আপনার শক্তি উপলব্ধি করতে পারবে। চীনের থলিঝুলি যারা ফুটো করতে লেগেছিল তারা চীনের এই চৈতন্যলাভকে য়ুরোপের বিরুদ্ধে অপরাধ বলেই গণ্য করবে। তখন এসিয়ার মধ্যে এই শূদ্র ভারতবর্ষের কী কাজ। তখন সে য়ুরোপের কামারশালায় তৈরি লোহার শিকল কাঁধে করে নির্বিচারে তার প্রাচীন বন্ধুকে বাঁধতে যাবে। সে মারবে, সে মরবে। কেন মারবে, কেন মরবে, এ কথা প্রশ্ন করতে তার ধর্মে নিষেধ। সে বলবে ; স্বধর্মে হননং শ্রেয়ঃ; স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। ইংরেজ-সাম্রাজ্যের কোথাও সে সম্মান চায়ও না, পায়ও না— ইংরেজের হয়ে সে কুলিগিরির বোঝা বয়ে মরে, যে বোঝার মধ্যে তার অর্থ নেই, পরমার্থ নেই ; ইংরেজের হয়ে পরকে সে তেড়ে মারতে যায়, যে পর তার শত্রু নয় ; কাজ সিদ্ধ হবা মাত্র আবার তাড়া খেয়ে তোষাখানার মধ্যে ঢোকে। শূদ্রের এই তো বহু যুগের দীক্ষা। তার কাজে স্বার্থও নেই, সম্মানও নেই, আছে কেবল 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' এই বাণী। নিধনের অভাব হচ্ছে না ; কিন্তু তার চেয়েও মানুষের বড়ো দুর্গতি আছে যখন সে পরের স্বার্থের বাহন হয়ে পরের সর্বনাশ করাকেই অনায়াসে কর্তব্য বলে মনে করে। অতএব এতে আশ্চর্যের কথা নেই যে, যদি দৈবক্রমে কোনোদিন ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায় তা হলে নিশ্বাস ফেলে বলবে : I miss my best servant.

অগ্রহায়ণ ১৩৩২

বৃহত্তর ভারত

বৃহত্তর ভারত পরিষদ্‌ -কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিদায়সম্বর্ধনা উপলক্ষে

যবদ্বীপ যাবার পূর্বাহ্ণে যে অভিনন্দন আপনারা আমাকে দিলেন তাতে আমার মনে বল সঞ্চার করবে। আমরা চার দিকের দাবির দ্বারা আমাদের প্রাণশক্তি আবিষ্কার করি। যার যা দেবার তা বাইরের নেবার ইচ্ছা থেকে আমরা দিতে সক্ষম হই। দাবির আকর্ষণ যদি থাকে তবে আপনি সহজ হয়ে যায় দেওয়ার পথ।

বাইরে যেখানে দাবি সত্য হয় অন্তরে সেখানেই দানের শক্তি উদ্‌বোধিত হয়ে ওঠে। দানের সামগ্রী আমাদের থাকলেও আমরা দিতে পারি নে, সমাজে যতক্ষণ প্রত্যাশা না সজীব হয়ে ওঠে। আজ একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে জেগেছে যে আকাঙ্ক্ষা ভারতের বাইরেও ভারতকে বড়ো করে

সন্ধান করতে চায়। সেই আকাঙ্ক্ষাই বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছে। সেই আকাঙ্ক্ষাই আপন প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে অভিনন্দন করছে। এই প্রত্যাশা আমার চেষ্টাকে সার্থক করুক।

বর্বরজাতীয় মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, তার আত্মবোধ সংকীর্ণসীমাবদ্ধ। তার চৈতন্যের আলো উপস্থিত কাল ও বর্তমান অবস্থার ঘেরটুকুকেই আলোকিত করে রাখে বলে সে আপনাকে তার চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রে জানে না। এইজন্যেই জ্ঞানে কর্মে সে দুর্বল। সংস্কৃত শ্লোকে বলে : যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। অর্থাৎ, ভাবনাই হচ্ছে সাধনার সৃষ্টিশক্তির মূলে। নিজের সম্বন্ধে, নিজের দেশ সম্বন্ধে বড়ো করে ভাবনা করবার দরকার আছে, নইলে কর্মে জোর পৌঁছয় না এবং অতি ক্ষীণ আশা ও অতি ক্ষুদ্র সিদ্ধি নিয়ে অকৃতার্থ হতে হয়। নিজের কাছে নিজের পরিচয়টাকে বড়ো করবার চেষ্টাই সভ্যজাতির ইতিহাসগত চেষ্টা। নিজের পরিচয়কে সংকীর্ণ দেশকালের ভূমিকা থেকে মুক্তিদানই হচ্ছে এই চেষ্টার লক্ষ্য।

যখন বালক ছিলুম ঘরের কোণের বাতায়নে বসে দেশের প্রাকৃতিক রূপকে অতি ছোটো পরিধির মধ্যেই দেখেছি। বাইরের দিক থেকে দেশের এমন কোনো মূর্তি দেখি নি যার মধ্যে দেশের ব্যাপক আবির্ভাব আছে। বিদেশী বণিকের হাতে গড়া কলকাতা শহরের মধ্যে ভারতের এমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না যা সুগভীর ও সুদূরবিস্তৃত। সেই শিশুকালে কোণের মধ্যে অত্যন্ত বেশি অবরুদ্ধ ছিলাম বলেই ভারতবর্ষের বৃহৎ স্বরূপ চোখে দেখবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল।

এমন সময়ে আমার আট-নয় বছর বয়সে গঙ্গাতীরের এক বাগানে কিছু কালের জন্যে বাস করতে গিয়েছিলাম। গভীর আনন্দ পেলাম। গঙ্গানদী ভারতের একটি বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহু দেশ বহু কাল ও বহু চিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়বাণী আছে। হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী। সে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো, ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞানধর্মতপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র।

তার পর আর কয়েক বৎসর পরেই পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয় পর্বতে নিয়ে যান। আমার পিতাকে এই প্রথম নিকটে দেখেছি, আর হিমালয় পর্বতকে। উভয়ের মধ্যেই ভাবের মিল ছিল। হিমালয় এমন একটি চিরন্তন রূপ যা সমগ্র ভারতের, যা এক দিকে দুর্গম, আর-এক দিকে সর্বজনীন। আমার পিতার মধ্যেও ভারতের সেই বিদ্যা—চিন্তায় পূজায় কর্মে প্রত্যহ প্রাণময় হয়ে দেখা যাচ্ছিল, যা সর্বকালীন, যার মধ্যে প্রাদেশিকতার কার্পণ্যমাত্র নেই।

তার পর অল্প বয়সে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়তে শুরু করলাম। তখন আলেকজান্দার থেকে আরম্ভ করে ক্লাইভের আমল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষ বার বার কিরকম পরাস্ত অপমানিত হয়ে এসেছে এই কাহিনীই দিন ক্ষণ তারিখ ও নামমালা-সমেত প্রত্যহ কণ্ঠস্থ করেছি। এই অগৌরবের ইতিহাসমরুতে রাজপুতদের বীরত্বকাহিনীর ওয়েসিস থেকে যেটুকু ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব তাই নিয়ে স্বজাতির মহত্ত্ব-পরিচয়ের দারুণ ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করা হত। সকলেই জানেন, সে সময়কার বাংলা কাব্য নাটক উপন্যাস কিরকম দুঃসহ ব্যগ্রতায় টডের রাজস্থান দোহন করতে বসেছিল। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, দেশের মধ্যে আমাদের পরিচয়-কামনা কিরকম উপবাসী হয়ে ছিল। দেশ বলতে কেবল তো মাটির দেশ নয়, সে যে মানবচরিত্রের দেশ। দেশের বাহ্য প্রকৃতি আমাদের দেহটা গড়ে বটে, কিন্তু আমাদের মানবচরিত্রের দেশ থেকেই প্রেরণা পেয়ে আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে। সেই দেশটাকে যদি আমরা দীন বলে জানি তা হলে বিদেশী বীরজাতির ইতিহাস পড়ে আমাদের দীনতাকে তাড়াবার শক্তি অন্তরের মধ্যে পাই নে।

ঘরের কোণে আবদ্ধ থেকে ভারতের দৃশ্যরূপটাকে বড়ো করে দেখবার পিপাসা যেমন মনের মধ্যে প্রবল হয়েছিল, তেমনি তখনকার পাঠ্য ভারত-ইতিহাসের অগৌরব-অধ্যায়ের অন্ধকার কোণের মধ্যে বসে বসে ভারতের চারিত্রিক মহিমার বৃহৎ পরিচয় পাবার জন্য মনের মধ্যে একটা ক্ষুধার পীড়ন ছিল। বস্তুত এই অসহ্য ক্ষুধাই আমাদের মনকে তখন নানা হাস্যকর অত্যুক্তি ও অবাস্তবতা নিয়ে তৃপ্তির

স্বপ্নমূলক উপকরণ-রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল। আজও সেদিন যে একেবারে চলে গেছে তা বলতে পারি নে।

যে তারার আলো নিবে গেছে নিজের মধ্যেই সে সংকুচিত। নিজের মধ্যে একান্ত বদ্ধ থাকবার বাধ্যতাকেই বলে দৈন্য। এই দৈন্যের গণ্ডির মধ্যেও তার প্রতি-মুহূর্ত-গত কাজ হয়তো কিছু আছে, কিন্তু উদার নক্ষত্রমণ্ডলীর সভায় তার সম্মানের স্থান নেই। সে অজ্ঞাত, অখ্যাত, পরিচয়হীন। এই অপরিচয়ের অবমাননাই কারাবাসের মতো। এর থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় আলোকের দ্বারা। অর্থাৎ, এমন কোনো প্রকাশের দ্বারা যাতে করে বিশ্বের সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে, এমন সত্যের দ্বারা যা নিখিলের আদরণীয়।

আমাদের শাস্ত্রে বার বার বলেছে, যিনি নিজের মধ্যে সর্বভূতকে এবং সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। অর্থাৎ অহংসীমার মধ্যে আত্মার নিরুদ্ধ অবস্থা আত্মার সত্য অবস্থা নয়। ব্যক্তিগত মানুষের জীবনের সাধনায় এ যেমন একটা বড়ো কথা, নেশনের ঐতিহাসিক সাধনাতেও সেইরকম। কোনো মহাজাতি কী করে আপনাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করতে পারে এই তপস্যাই তার তপস্যা। যে পারলে না বিধাতা তাকে বর্জন করলেন। মানবসভ্যতার সৃষ্টিকার্যে তার স্থান হল না। রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধন করেছিলেন তখন কাঠবেড়ালিরও স্থান হয়েছিল সেই কাজে। সে তখন শুধু গাছের কোটরে নিজের খাদ্যান্বেষণে না থেকে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েই দুই তটভূমির বিচ্ছেদসমুদ্রের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজে যোগ দিয়েছিল। সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করাই পৃথিবীতে সকল মহৎ সাধনার রূপক। সেই সীতাই ধর্ম ; সেই সীতা জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি ; সেই সীতা সুন্দরী ; সেই সীতা সর্বমানবের কল্যাণী। নিজের কোটরের মধ্যে প্রভূত খাদ্যসঞ্চয়ের ঐশ্বর্য নিয়ে এই কাঠবেড়ালির সার্থকতা ছিল না, কিন্তু সীতা-উদ্ধারের মহৎ কাজে সে যে নিজেকে নিবেদন করেছিল এইজন্যেই মানবদেবতা তার পিঠে আশীর্বাদরেখা চিহ্নিত করেছিলেন। প্রত্যেক মহাজাতির পিঠে আমরা সেই চিহ্ন দেখতে চাই, সেই চিহ্নের দ্বারাই সে আপন কোটরকোণের অতীত নিত্যলোকে স্থান লাভ করে।

ভারতবর্ষের যে বাণী আমরা পাই সে বাণী যে শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয়। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা ; সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়। গৌরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির কাহিনীকে বড়ো বড়ো অক্ষরে আপন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে অঙ্কিত করে নি।

আমাদের দেশেও দিগ্‌বিজয়ের পতাকা হাতে পরজাতির দেশ জয় করবার কীর্তি হয়তো সেকালে অনেকে লাভ করে থাকবেন, কিন্তু ভারতবর্ষ অন্য দেশের মতো ঐতিহাসিক জপমালায় ভক্তির সঙ্গে তাঁদের নাম স্মরণ করে না। বীর্যবান দস্যুদের নাম ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয় নি।

অহংকেই যে মানুষ পরম ও চরম সত্য বলে জানে সেই বিনাশ পায় ; সকল দুঃখ সকল পাপের মূল এই অহমিকায়। বিশ্বের প্রতি মৈত্রীভাবনাতেই এই অহংভাব লুপ্ত হয়, এই সত্যটি আত্মার আলোক। এই আলোকদীপ্তি ভারবর্ষ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখতে পারে নি। এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূখণ্ডসীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল। সুতরাং এইটিই হচ্ছে ভারতের সত্য পরিচয়। এই পরিচয়ের আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি তা হলেই আমরা ধন্য! আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তিমন্ত্রের ভারতবর্ষে, সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষে। এই কথাটি যদি ধ্রুব করে মনে রাখতে পারি তা হলে আমাদের সকল কর্ম বিশুদ্ধ হবে, তা হলে আমরা নিজেকে বিশেষ করে ভারতবাসী বলতে পারব, সেজন্য আমাদের নতুন করে ধ্বজা নির্মাণ করতে হবে না।

ক্ষুধা হলেই মানুষ অন্নের স্বপ্ন দেখে। আজকাল আমাদের দেশে পোলিটিকাল আত্মপরিচয়ের ক্ষুধাটাই নানা কারণে সব চেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। এইজন্যে নিরন্তর তারই ভোজটাই স্বপ্নে দেখছি। তার চেয়ে বড়ো কথাগুলিকেও অপ্রাসঙ্গিক বলে উপেক্ষা করবার তর্জন আজকাল প্রায় শোনা যায়।

কিন্তু এই পোলিটিকাল আত্মপরিচয়ের ধারা খুঁজতে গিয়ে বিদেশী ইতিহাসে গিয়ে পৌঁছতে হয়। সেই ব্যগ্রতার তাড়নায় আপনাকে স্বপ্নে-গড়া ম্যাট্‌সিনি, স্বপ্নে-গড়া গারিবাল্‌ডি, কাল্পনিক ওয়াশিংটন বলে ভাবনা করতে হয়। অর্থতত্ত্বেও তাই ; এখানে আমাদের কারও কারও কল্পনা বল্‌শেভিজ্‌ম্‌ কারও সিন্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ কারও বা সোস্যালিজ্‌ম্‌-এর গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ-সমস্তই মরীচিকার মতো, ভারতবর্ষের চিরকালীন জমির উপরে নেই—আমাদের দুর্ভাগ্যতাপদগ্ধ হাল আমলের তৃষার্ত দৃষ্টির উপরে স্বপ্ন রচনা করছে। এই স্বপ্ন-সিনেমার কোণে কোণে মাঝে মাঝে Made in Europe-এর মার্কা ঝলক মেরে এর কারখানাঘরের বৃত্তান্তটি জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

অজানা পথে অবাস্তবের পিছনে আমরা যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি সেখানে অভিভূতিবিহ্বলতার মধ্যে আমাদের নিজের পরিচয় নেই। অথচ, পূর্বেই বলেছি নিজের ব্যক্তিস্বরূপের সত্য পরিচয়ের ভিত্তির উপরেই আমরা সিদ্ধিকে গড়ে তুলতে পারি। পলিটিক্‌স্‌-ইকনমিক্‌স্‌'এর বাইরেও আমাদের গৌরবলোক আছে, এ কথা যদি আমরা জানি তবে সেইখানেই আমাদের ভবিষ্যৎকে আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। বিশ্বাসহীনের মতো নিজের সত্যে অশ্রদ্ধা করে হাওয়ায় হাওয়ায় আকাশকুসুম চাষ করবার চেষ্টা করলে ফল পাব না।

ভারতবর্ষ যে কোন্‌খানে সত্য, নিজের লোহার সিন্ধুকের মধ্যে তার দলিল সে রেখে যায় নি। ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার দ্বারাই তার প্রকাশ। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ যা তার কুলোয় নি তাতেই তার পরিচয়। অন্যকে সত্য করে দিতে পারার মূলেই হচ্ছে অন্যকে আপন করে উপলব্ধি। আপন সীমার বাধা যে ভাঙতে পেরেছে বাইরের দুর্গম ভৌগোলিক বাধাও সে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। এইজন্যেই ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে [জানতে] হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।

চীনে গেলাম, দেখলাম জাত হিসাবে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাকে চোখে ভাষায় ব্যবহারে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিলই নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন একটি গভীর আত্মীয়তার যোগ অনুভব করা গেল যা ভারতবর্ষীয় অনেকের সঙ্গে করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই যোগ রাজশক্তির দ্বারা স্থাপন করা হয় নি, এই যোগ উদ্যত তরবারির জোরেও নয়, এই যোগ কাউকে দুঃখ দিয়ে নয়— নিজে দুঃখস্বীকার করে। অত্যন্ত পরের মধ্যেও [যে] সত্যের বলে অত্যন্ত আত্মীয়তা স্বীকার করা সম্ভব হয় সেই সত্যের জোরেই চীনের সঙ্গে সত্য ভারতের চিরকালের যোগবন্ধন বাঁধা হয়েছে। এই সত্যের কথা বিদেশী পলিটিক্‌সের ইতিহাসে স্থান পায় নি বলে আমরা একে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি নে। কিন্তু একে বিশ্বাস করবার প্রমাণ ভারতের বাইরে সুদূর দেশে আজও রয়ে গেছে।

জাপানে প্রতিদিনের ব্যবহারে জাপানির সুগভীর ধৈর্য, আত্মসংযম, তার রসবোধের বিচিত্র পরিচয়ে যখন বিস্মিত হতেছিলাম তখন এ কথা কতবার শুনেছি যে, এই-সকল গুণের প্রেরণা অনেকখানি বৌদ্ধধর্মের যোগে ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। সেই মূল প্রেরণা স্বয়ং ভারতবর্ষ থেকে আজ লুপ্ত প্রায় হল। সত্যের যে বন্যা একদিন ভারতবর্ষের দুই কূল উপ্‌চিয়ে দেশে দেশে বয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের প্রবাহিণীতে আজ তা তলায় নেমে আসছে, কিন্তু তার জলসঞ্চয় আজও দূরের নানা জলাশয়ে গভীর হয়ে আছে। এই কারণেই সেই-সকল জায়গা আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থস্থান। কেননা ভারতবর্ষের ধ্রুব পরিচয় সেই-সব জায়গাতেই।

মধ্যযুগে মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মবিরোধ ঘটেছিল। সেই সময় ধারাবাহিকভাবে সাধুসাধকদের জন্ম হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলেন, যাঁরা আত্মীয়তার সত্যের দ্বারা ধর্মবিরোধের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে বসেছিলেন। তাঁরা পোলিটিশান ছিলেন না, প্রয়োজনমূলক পোলিটিকাল ঐক্যকে তাঁরা সত্য বলে কল্পনাও করেন নি। তাঁরা একেবারে সেই গোড়ায় গিয়েছিলেন

যেখানে সকল মানুষের মিলনের প্রতিষ্ঠা ধ্রুব। অর্থাৎ, তাঁরা ভারতের সেই মন্ত্রই গ্রহণ করেছিলেন যাতে আছে, যারা সকলকে আপনার মধ্যে এক করে দেখে তারাই সত্য দেখে। তখনকার দিনের অনেক যোদ্ধা অনেক লড়াই করেছেন, বিদেশী-ছাঁচে-ঢালা ইতিহাসে তাঁদেরই নাম ও কীর্তি লিখিত হয়েছে। সে-সব যোদ্ধারা আজ তাঁদের কৃত কীর্তিস্তম্ভের ভগ্নশেষ ধূলিস্তূপের মধ্যে মিশিয়ে আছেন। কিন্তু আজও ভারতের প্রাণস্রোতের মধ্যে সেই-সকল সাধকের অমরবাণী-ধারা প্রবাহিত আছে; সেখান থেকে আমাদের প্রাণের প্রেরণা যদি আমরা নিতে পারি তা হলে তারই জোরে আমাদের রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি কর্মনীতি সবই বল পেয়ে উঠতে পারে।

সত্যবাণী যখন আমাদের প্রাণকে গভীর ভাবে উদ্‌বোধিত করে তখন সেই প্রাণ সকল দিকেই নিজের প্রকাশকে সার্থক করে। তখন সেই প্রাণ সৃষ্টির উদ্যমে পূর্ণ হয়ে ওঠে। চিত্তের উপর সত্যের সংঘাতের প্রমাণ হচ্ছে এই সৃষ্টিশক্তির সচেষ্টতা।

বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন দেখি তারই প্রবর্তনায় গুহাগহ্বরে চৈত্যবিহারে বিপুলশক্তিসাধ্য শিল্পকলা অপর্যাপ্ত প্রকাশ পেয়ে গেছে তখন বুঝতে পারি, বৌদ্ধধর্ম মানুষের অন্তরতম মনে এমন একটি সত্যবোধ জাগিয়েছে যা তার সমস্ত প্রকৃতিকে সফল করেছে, যা তার স্বভাবকে পঙ্গু করে নি। ভারতের বাহিরে ভারতবর্ষ যেখানে তার মৈত্রীর সোনার কাঠি দিয়ে স্পর্শ করেছে সেখানেই শিল্পকলার কী প্রভূত ও পরমাশ্চর্য বিকাশ হয়েছে। শিল্পসৃষ্টিমহিমায় সে-সকল দেশ মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

অথচ সেখানকার লোকের সমজাতীয়দের দেখো, দেখবে তারা নরঘাতক, তারা শিল্পসম্পদহীন। এমন-সকল নিরালোক চিত্তে আলো জ্বাললে দয়াধর্ম ত্যাগধর্ম মৈত্রীধর্মের মহতী বাণীর দ্বারা। সেখানকার লোকে সামান্য বেশভূষা-ভাষার পরিবর্তনের দ্বারা স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে তা নয়; সৃষ্টি করবার সুপ্ত শক্তি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে— সে কী পরমাদ্ভুত সৃষ্টি। এই-সকল দ্বীপেরই আশেপাশে আরো তো অনেক দ্বীপ আছে, সেখানে আমরা 'বরবুদর' দেখি নে কেন, সে-সব জায়গায় 'আঙ্করবট'-এর সমতুল্য বা সমজাতীয় কিছু নেই কেন। সত্যের জাগরণমন্ত্র যে সেখানে পৌঁছায় নি। মানুষকে অনুকরণে প্রবৃত্ত করার মধ্যে গৌরব নেই, কিন্তু মানুষের সুপ্ত শক্তিকে মুক্তিদান করার মতো এত বড়ো গৌরবের কথা আর কি কিছু আছে।

লোকে যখন দরিদ্র হয় তখন বাইরের দিকে গৌরব খুঁজে বেড়ায়। তখন কথা বলে গৌরব করতে চায়, তখন পুঁথি থেকে শ্লোক খুঁটে খুঁটে গৌরবের মালমসলা ভগ্নস্তূপ থেকে সঞ্চয় করতে থাকে। এমনি করে সত্যকে ব্যবহার থেকে দূরে রেখে যদি গলার জোরে পুরাতন গৌরবের বড়াই করতে বসি তবে আমাদের ধিক্। অহংকার করবার জন্যে সত্যের ব্যবহার সত্যের অবমাননা। আমার মনের একান্ত প্রার্থনা এই যে, সত্যবাণীকে কাঁধে ঝুলিয়ে জয়ঢাক করে তাকে যেন বাজিয়ে না বেড়াই, বাইরের লোককে চমক লাগাবার জন্যে যেন তাকে অলংকার মাত্র না করি, যেন নিজেরই একান্ত আন্তরিক প্রয়োজনের জন্যেই তার সন্ধান ও সাধনা করতে পারি।

জাভায় যখন যাব তখন মনকে অহংকারমুক্ত করে সত্যের অমৃতমন্ত্রের ক্রিয়াটি দেখে যেন নম্র হতে পারি। সেই মৈত্রীর মহামন্ত্রটি নিজের মধ্যেই পাওয়া চাই, তা হলেই আমার চিত্তে যেখানে অরণ্য সেখানে মন্দির উঠবে, যেখানে মরুভূমি সেখানে সৌন্দর্যের রসবৃষ্টি হবে, জীবনের তপস্যা জয়যুক্ত হয়ে সার্থক হয়ে উঠবে।

শ্রাবণ ১৩৩৪

হিন্দুমুসলমান

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে লিখিত

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

ঘোর বাদল নেমেছে। তাই আমার মনটা মানব-ইতিহাসের শতাব্দীচিহ্নিত বেড়ায় ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে। আকাশরঙ্গভূমিতে জল-বাতাসের মাতনের যুগযুগান্তরবাহিত স্মৃতিস্পন্দন আজ আমার শিরায় শিরায় মেঘমল্লারের মীড় লাগিয়েছে। আমার কর্তব্যবুদ্ধি কোথায় ভেসে গেল, সম্প্রতি আমি আমার সামনেকার ঐ সারবন্দী শালতাল-মহুয়াছাতিমের দলে ভিড়ে গেছি। প্রাণরাজ্যে ওদের হল বনেদি বংশ, ওরা কোন্ আদিকালের রৌদ্রবৃষ্টির উত্তরাধিকার পুরোপুরি ভোগ করে চলেছে। ওরা মানুষের মতো আধুনিক নয়, সেইজন্যে ওরা চিরনবীন। মানবজাতির মধ্যে কেবল কবিরাই সভ্যতার অপব্যয়ের চোটে তাদের আদিকালের উত্তরাধিকার একেবারে ফুঁকে দিয়ে বসে নি। তাই তরুলতার আভিজাত্য কবিদের নিতান্ত মানুষ বলে অবজ্ঞা করে না। এইজন্যেই বর্ষে বর্ষে বর্ষার সময় আমাকে এমন করে উতলা করে দেয়, আমাকে সকল দায়িত্ববন্ধন থেকে বিরাগি করে প্রাণের খেলাঘরে ডাকতে থাকে— আমাদের মর্মের মধ্যে যে ছেলেমানুষ আছে, যে হচ্ছে আমাদের সব চেয়ে প্রাচীন পূর্বজ, সেই আমার কর্মশালাটি দখল করে বসে। সেইজন্যেই বর্ষা পড়ে অবধি আমি হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বসে গেছি, কাজকর্ম ছেড়ে গান তৈরি করছি— সেই সূত্রে মানুষের মধ্যে আমি সব চেয়ে কম মানুষ হয়েছি— আমার মন ঘাসের মতো কাঁপছে, পাতার মতো ঝিল্‌মিল্ করছে। কালিদাস এই উপলক্ষেই বলেছিলেন ; মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যবৃত্তি-চেতঃ। অন্যথাবৃত্তি হচ্ছে মানববৃত্তির গণ্ডির বাইরের বৃত্তি। এই বৃত্তি আমাদের সেই সুদূর কালে নিয়ে যায় যখন প্রাণের খেলা চলছে, মনের মাস্টারি শুরু হয় নি— আজ যেখানে ইস্কুলের মোটা থাম উঠেছে সেখানে যখন ঘাসের ফুলে ফুলে প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। যাই হোক, এই সময়টাতে ঘনমেঘে মধ্যাহ্ন ছায়াবৃত্ত, মাঠে মাঠে বাদল-হাওয়া ভেঁপু বাজিয়ে চলেছে, আর ছোটো ছোটো চঞ্চল জলধারা ইস্কুলছাড়া ছাত্রীদের অকারণ হাসির মতো চার দিকে খিলখিল করছে। আজ ৭ই আষাঢ় কৃষ্ণা একাদশী তিথি, আজ অম্বুবাচী আরম্ভ হল। নামটা সার্থক হয়েছে, সমস্ত প্রকৃতি আজ জলের ভাষায় মুখর হয়ে উঠল। ঘনমেঘের চন্দ্রাতপের ছায়ায় আজ অম্বুবাচীর গীতিকবিতার আসর বসেছে— তৃণসভার গায়েনের দল ঝিল্লিরাও নিমন্ত্রণ পেয়েছে, আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে মত্তদাদুরী। এ আসরে আমার আসন পড়ে নি যে তা মনেও কোরো না। মেঘের ডাকের জবাব না দিয়ে চুপ করে যাব, আমি এমন পাত্র নই। মেঘের পর মেঘের মতো আমারও গান চলেছে দিনের পর দিন ; তার কোনো গুরুত্ব নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই, মেঘ যেমন 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ' সেও তেমনি নিরর্থক উপাদানে তৈরি। ঠিক যখন আমার জানলার ধারে বসে গুঞ্জনধ্বনিতে গান ধরেছি—

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
আমার মনে,
আমার ভাবনা যত উতল হল
অকারণে—

ঠিক এমন সময় সমুদ্রপার হতে তোমার প্রশ্ন এল, ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমান-সমস্যার সমাধান কী। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মানবসংসারে আমার কাজ আছে— শুধু মেঘমল্লারে মেঘের ডাকের জবাব দিয়ে চলবে না, মানব-ইতিহাসের যে-সমস্ত মেঘমন্দ্র প্রশ্নাবলী আছে তারও উত্তর ভাবতে হবে। তাই অম্বুবাচীর আসর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হল।

পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র— সে হচ্ছে খৃস্টান আর মুসলমান -ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই। খৃস্টানধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন ; তাদের মন মধ্যযুগের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই। এইজন্যে অপরধর্মাবলম্বীদেরকে তারা ধর্মের বেড়ার দ্বারা সম্পূর্ণ বাধা দেয় না। য়ুরোপীয় আর খৃস্টান এই দুটো শব্দ একার্থক নয়। 'য়ুরোপীয় বৌদ্ধ' বা 'য়ুরোপীয় মুসলমান' শব্দের মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা নেই। কিন্তু ধর্মের নামে যে জাতির নামকরণ ধর্মমতেই তাদের মুখ্য পরিচয়। 'মুসলমান বৌদ্ধ' বা 'মুসলমান খৃস্টান' শব্দ স্বতই অসম্ভব। অপর পক্ষে হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ, তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়— অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non-violent non-co-operation। হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমানধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারি কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের এক প্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য-আচার-অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দুমুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে ; ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল ; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে। এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো, সে 'হিন্দু'-যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ— এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল। একটা কথা মনে ছিল না, কোনো প্রাণবান জিনিসকে একেবারে আটঘাট বন্ধ করে সামলাতে গেলে তাকে মেরে ফেলা হয়। যাই হোক, মোট কথা হচ্ছে, বিশেষ এক সময়ে বৌদ্ধযুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে বিশেষ অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে পরকীয় সংস্রব ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যেই আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলেছিল— এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। সকল-প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয় নি। এই বাধা কেবল হিন্দুমুসলমানে তা নয়। তোমার আমার মতো মানুষ যারা আচারে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই, আমরাও পৃথক, বাধাগ্রস্ত। সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়। মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্মকে কবরের মতো তৈরি করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারও সঙ্গে কারও মেলবার উপায় নেই। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনোরকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে— ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে— তার পরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দুমুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের

অপেক্ষায় আছে। কিন্তু এ কথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই : কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে ; গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব ; যদি না আসি তবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ইতি ৭ই আষাঢ় ১৩২৯

শ্রাবণ ১৩২৯

নারী

মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী। নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষণ করে।

পৃথিবীকে জীবের বাসযোগ্য করবার জন্যে অনেক যুগ গেছে ঢালাই পেটাই করা মিস্ত্রির কাজে। সেটা আধখানা শেষ হতে না-হতেই প্রকৃতি শুরু করলেন জীবসৃষ্টি, পৃথিবীতে এল বেদনা। প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে, নারীর হৃদয়ে। জীবপালনের সমস্ত প্রবৃত্তিজাল প্রবল করে জড়িত করেছেন নারীর দেহমনের তন্তুতে তন্তুতে। এই প্রবৃত্তি স্বভাবতই চিত্তবৃত্তির চেয়ে হৃদয়বৃত্তিতেই স্থান পেয়েছে গভীর ও প্রশস্ত ভাবে। এই সেই প্রবৃত্তি নারীর মধ্যে যা বন্ধনজাল গাঁথছে নিজেকে ও অন্যকে ধরে রাখবার জন্যে প্রেমে, স্নেহে, সকরুণ ধৈর্যে। মানবসংসারকে গড়ে তোলবার, বেঁধে রাখবার এই আদিম বাঁধুনি। এই সেই সংসার যা সকল সমাজের সকল সভ্যতার মূলভিত্তি। সংসারের এই গোড়াকার বাঁধন না থাকলে মানুষ ছড়িয়ে পড়ত আকারপ্রকারহীন বাষ্পের মতো ; সংহত হয়ে কোথাও মিলনকেন্দ্র স্থাপন করতে পারত না। সমাজবন্ধনের এই প্রথম কাজটি মেয়েদের।

প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া গভীর গোপন, তার স্বতঃপ্রবর্তনা দ্বিধাবিহীন। সেই আদিপ্রাণের সহজ প্রবর্তনা নারীর স্বভাবের মধ্যে। সেইজন্য নারীর স্বভাবকে মানুষ রহস্যময় আখ্যা দিয়েছে। তাই অনেক সময়ে অকস্মাৎ নারীর জীবনে যে সংবেগের উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায় তা তর্কের অতীত— তা প্রয়োজন-অনুসারে বিধিপূর্বক খনন করা জলাশয়ের মতো নয়, তা উৎসের মতো যার কারণ আপন অহৈতুক রহস্যে নিহিত।

প্রেমের রহস্য, স্নেহের রহস্য অতি প্রাচীন এবং দুর্গম। সে আপন সার্থকতার জন্যে তর্কের অপেক্ষা রাখে না। যেখানে তার সমস্যা সেখানে তার দ্রুত সমাধান চাই। তাই গৃহে নারী যেমনি প্রবেশ করেছে কোথা থেকে অবতীর্ণ হল গৃহিণী, শিশু যেমনি কোলে এল মা তখনই প্রস্তুত। জীবরাজ্যে পরিণত বুদ্ধি এসেছে অনেক পরে। সে আপন জায়গা খুঁজে পায় সন্ধান ক'রে, যুদ্ধ ক'রে। দ্বিধা মিটিয়ে চলতে তার সময় যায়। এই দ্বিধার সঙ্গে কঠিন দ্বন্দ্বেই সে সবলতা ও সফলতা লাভ করে। এই দ্বিধাতরঙ্গের ওঠাপড়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়, সাংঘাতিক ভ্রম জমে উঠে বার বার মানুষের ইতিহাসকে দেয় বিপর্যস্ত করে। পুরুষের সৃষ্টি বিনাশের মধ্যে তলিয়ে যায়, নূতন করে বাঁধতে হয় তার কীর্তির ভূমিকা। পালটিয়ে পালটিয়ে পরীক্ষায় পুরুষের কর্ম কেবলই দেহপরিবর্তন করে। অভিজ্ঞতার এই নিত্যপরিক্রমণে যদি তাকে অগ্রসর করে তবে সে বেঁচে যায়, যদি ত্রুটিসংশোধনের অবকাশ না পায় তবে জীবন-বাহনের ফাটল বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে তাকে টানে বিলুপ্তির কবলের মধ্যে। পুরুষের রচিত সভ্যতার আদিকাল থেকে এইরকম ভাঙা-গড়া চলছে। ইতিমধ্যে, নারীর মধ্যে প্রেয়সী, নারীর মধ্যে জননী-প্রকৃতির দৌত্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন কাজ করে চলেছে। এবং প্রবল আবেগের সংঘর্ষে আপন সংসারের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ড করেও আসছে। সেই প্রলয়াবেগ যেন বিশ্বপ্রকৃতির প্রলয়লীলারই মতো, ঝড়ের মতো, দাবদাহের মতো— আকস্মিক, আত্মঘাতী।

পুরুষ তার আপন জগতে বারে বারে নূতন আগন্তুক। আজ পর্যন্ত কতবার সে গড়ে তুলেছে আপন বিধিবিধান। বিধাতা তাকে তার জীবনের পথ বাঁধিয়ে দেন নি ; কত দেশে কত কালে তাকে আপন পথ বানিয়ে নিতে হল। এক কালের পথ বিপথ হয়ে উঠল আর-এক কালে, উলটিয়ে গেল তার ইতিহাস, করলে সে অন্তর্ধান।

নব নব সভ্যতার উলট-পালটের ভিতর দিয়ে নারীর জীবনের মূলধারা চলেছে এক প্রশস্ত পথে। প্রকৃতি তাকে যে হৃদয়সম্পদ দিয়েছেন নিত্যকৌতূহলপ্রবণ বুদ্ধির হাতে তাকে নূতন নূতন অধ্যবসায়ে পরখ করতে দেওয়া হয় নি। নারী পুরাতনী।

পুরুষকে নানা দ্বারে নানা আপিসে উমেদারিতে ঘোরায়। অধিকাংশ পুরুষই জীবিকার জন্যে এমন কাজ মানতে বাধ্য হয় যার প্রতি তার ইচ্ছার তার ক্ষমতার সহজ সম্মতি নেই। কঠিন পরিশ্রমে নানা কাজের শিক্ষা তার করা চাই— তাতে বারো-আনা পুরুষই যথোচিত সফলতা পায় না। কিন্তু গৃহিণীরূপে জননীরূপে মেয়েদের যে কাজ সে তার আপন কাজ, সে তার স্বভাবসংগত।

নানা বিঘ্ন কাটিয়ে অবস্থার প্রতিকূলতাকে বীর্যের দ্বারা নিজের অনুগত করে পুরুষ মহত্ত্ব লাভ করে। সেই অসাধারণ সার্থকতায় উত্তীর্ণ পুরুষের সংখ্যা অল্প। কিন্তু হৃদয়ের রসধারায় আপন সংসারকে শস্যশালা করে তুলেছে এমন মেয়েকে প্রায় দেখা যায় ঘরে ঘরে। প্রকৃতির কাছ থেকে তারা পেয়েছে অশিক্ষিতপটুত্ব, মাধুর্যের ঐশ্বর্য তাদের সহজে লাভ করা। যে মেয়ের স্বভাবের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সহজ রসটি না থাকে, কোনো শিক্ষায়, কোনো কৃত্রিম উপায়ে সংসারক্ষেত্রে সে সার্থকতা পায় না।

যে সম্বল অনায়াসে পাওয়া যায় তার বিপদ আছে। বিপদের এক কারণ অন্যের পক্ষে তা লোভনীয়। সহজ-ঐশ্বর্যবান দেশকে বলবান নিজের একান্ত প্রয়োজনে আত্মসাৎ করে রাখতে চায়। অনুর্বর দেশের পক্ষে স্বাধীন থাকা সহজ। যে পাখির ডানা সুন্দর ও কণ্ঠস্বর মধুর তাকে খাঁচায় বন্দী করে মানুষ গর্ব অনুভব করে ; তার সৌন্দর্য সমস্ত অরণ্যভূমির, এ কথা সম্পত্তিলোলুপরা ভুলে যায়। মেয়েদের হৃদয়মাধুর্য ও সেবানৈপুণ্যকে পুরুষ সুদীর্ঘকাল আপন ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে কড়া পাহারায় বেড়া দিয়ে রেখেছে। মেয়েদের নিজের স্বভাবেই বাঁধন-মানা প্রবণতা আছে, সেইজন্যে এটা সর্বত্রই এত সহজ হয়েছে।

বস্তুত জীবপালনের কাজটাই ব্যক্তিগত। সেটা নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের কোঠায় পড়ে না, সেই কারণে তার আনন্দ বৃহৎ তত্ত্বের আনন্দ নয় ; এমন-কি, মেয়েদের নৈপুণ্য যদিও বহন করেছে রস, কিন্তু সৃষ্টির কাজে আজও যথেষ্ট সার্থক হয় নি।

তার বুদ্ধি, তার সংস্কার, তার আচরণ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার দ্বারা বহু যুগ থেকে প্রভাবান্বিত। তার শিক্ষা, তার বিশ্বাস বাহিরের বৃহৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যতা লাভ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায় নি। এইজন্যে নির্বিচারে সকল অপদেবতাকেই সে অমূলক ভয় ও অযোগ্য ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে আসছে। সমস্ত দেশ জুড়ে যদি দেখতে পাই তবে দেখা যাবে এই মোহমুগ্ধতার ক্ষতি কত সর্বনেশে, এর বিপুল ভার বহন করে উন্নতির দুর্গম পথে এগিয়ে চলা কত দুঃসাধ্য। আবিলবুদ্ধি মূঢ়মতি পুরুষ দেশে যে কম আছে তা নয়, তারা শিশুকাল থেকে মেয়ের হাতে গড়া এবং তারাই মেয়েদের প্রতি সব চেয়ে অত্যাচারী। দেশে এই যে-সব আবিল মনের কেন্দ্রগুলি দেখতে দেখতে চারি দিকে গড়ে উঠেছে, মেয়েদের অন্ধ বিচারবুদ্ধির উপরেই তাদের প্রধান নির্ভর। চিত্তের বন্দীশালা এমনি করে দেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে, এবং প্রতিদিন তার ভিত্তি হয়ে উঠছে দৃঢ়।

এ দিকে প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই মেয়েরা আপন ব্যক্তিগত সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে আসছে। আধুনিক এসিয়াতেও তার লক্ষণ দেখতে পাই। তার প্রধান কারণ সর্বত্রই সীমানা-ভাঙার যুগ এসে পড়েছে। যে-সকল দেশ আপন আপন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক প্রাচীরের মধ্যে একান্ত বদ্ধ ছিল তাদের সেই বেড়া আজ আর তাদের তেমন করে ঘিরে রাখতে পারে না— তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। স্বতই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে, দৃষ্টিসীমা চিরাভ্যস্ত দিগন্ত পেরিয়ে

গেছে। বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে, নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচার-বিচারের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ছে।

আমাদের বাল্যকালে ঘরের বাইরে যাতায়াতের আবশ্যকে মেয়েদের ছিল পালকির যুগ। মানী ঘরে সেই পালকির উপরে পড়ত ঘটাটোপ। বেথুন স্কুলে যে মেয়েরা সর্বপ্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন তার মধ্যে অগ্রণী ছিলেন আমার বড়দিদি। তিনি দ্বারখোলা পালকিতে ইস্কুলে যেতেন, সেদিনকার সম্ভ্রান্তবংশের আদর্শকে সেটা অল্প পীড়া দেয় নি। সেই একবস্ত্রের দিনে সেমিজ পরাটা নির্লজ্জতার লক্ষণ ছিল। শালীনতার প্রচলিত রীতি রক্ষা করে রেলগাড়িতে যাতায়াত করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

আজ সেই ঢাকা পালকির যুগ বহু দূরে চলে গেছে। মৃদুপদে যায় নি, দ্রুতপদেই গেছে। বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ পরিবর্তন আপনিই ঘটেছে— এ নিয়ে কাউকে সভাসমিতি করতে হয় নি। মেয়েদের বিবাহের বয়স দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল, সেও হয়েছে সহজে। প্রাকৃতিক কারণে নদীতে জলধারার পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তবে তার তটভূমির সীমা আপনিই হটে যেতে থাকে। মেয়েদের জীবনে আজ সকল দিক থেকেই স্বতই তার তটের সীমা দূরে চলে যাচ্ছে। নদী উঠছে মহানদী হয়ে।

এই-যে বাহিরের দিকে ব্যবহারের পরিবর্তন এ তো বাইরেই থেকে যায় না। অন্তরপ্রকৃতির মধ্যেও এর কাজ চলতে থাকে। মেয়েদের যে মনোভাব বদ্ধ সংসারের উপযোগী, মুক্ত সংসারে সে তো অচল হয়ে থাকতে পারে না। আপনিই জীবনের প্রশস্ত ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তার মন বড়ো করে চিন্তা করতে, বিচার করতে আরম্ভ করে। তার পূর্বতন সংস্কারগুলিকে যাচাই করার কাজ আপনিই শুরু হতে থাকে। এই অবস্থায় সে নানারকম ভুল করতে পারে, কিন্তু বাধায় ঠেকতে ঠেকতে সে ভুল উত্তীর্ণ হতে হবে। সংকীর্ণ সীমায় পূর্বে মন যেরকম করে বিচার করতে অভ্যস্ত ছিল সে অভ্যাস আঁকড়ে থাকলে চারি দিকের সঙ্গে পদে পদে অসমাঞ্জস্য আনতে থাকবে। এই অভ্যাস-পরিবর্তনে দুঃখ আছে, বিপদও আছে, কিন্তু সেই ভয় করে আধুনিক কালের স্রোতকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

গৃহস্থালির ছোটো পরিধির মধ্যে মেয়েদের জীবন যখন আবদ্ধ ছিল তখন মেয়েলি মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি নিয়ে সহজেই তাদের কাজ চলে যেত। এজন্যে তাদের বিশেষ শিক্ষার দরকার ছিল না বলেই একদিন স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে এতই বিরুদ্ধতা এবং প্রহসনের সৃষ্টি হয়েছে। তখন পুরুষেরা নিজে যে-সব সংস্কারকে উপেক্ষা করত, যে-সব মত বিশ্বাস করত না, যে-সকল আচরণ পালন করত না, মেয়েদের বেলায় সেগুলিকে সযত্নে প্রশ্রয় দিয়েছে। তার মূলে তাদের সেই মনোবৃত্তি ছিল যে মনোবৃত্তি একেশ্বর শাসনকর্তাদের। তারা জানে, অজ্ঞানের অন্ধ সংস্কারের আবহাওয়ায় যথেচ্ছ শাসনের সুযোগ রচনা করে ; মনুষ্যোচিত স্বাধিকার বিসর্জন দিয়েও সন্তুষ্টচিত্তে থাকবার পক্ষে এই মুগ্ধ অবস্থাই অনুকূল অবস্থা। আমাদের দেশের অনেক পুরুষের মনে আজও এই ভাব আছে। কিন্তু কালের সঙ্গে সংগ্রামে তাদের হার মানতেই হবে।

কালের প্রভাবে মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র এই-যে স্বতই প্রসারিত হয়ে চলেছে, এই-যে মুক্ত সংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়ছে, এতে করে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্যে তাদের বিশেষ করে বুদ্ধির চর্চা, বিদ্যার চর্চা, একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল। তাই দেখতে দেখতে এর বাধা দূর হয়ে চলেছে। নিরক্ষরতার লজ্জা আজ ভদ্রমেয়েদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা, পূর্বকালে মেয়েদের ছাতা জুতো ব্যবহারের যে লজ্জা ছিল এ তার চেয়ে বেশি, বাটনা-বাটা কোটনা-কোটা সম্বন্ধে অনৈপুণ্যের অখ্যাতি তার কাছে কিছুই নয়। অর্থাৎ, গার্হস্থ্য বাজার-দরেই মেয়েদের দর, এমন কথা আজকের দিনে বিয়ের বাজারেও ষোলো-আনা খাটছে না। যে বিদ্যার মূল্য সার্বভৌমিক, যা আশু প্রয়োজনের ঐকান্তিক দাবি ছাড়িয়ে চলে যায়, আজ পাত্রীর মহার্ঘতা-যাচাইয়ের জন্যে অনেক পরিমাণে সেই বিদ্যার সন্ধান নেওয়া হয়।

এই প্রণালীতেই আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের মন ঘরের সমাজ ছাড়িয়ে প্রতিদিন বিশ্বসমাজে উত্তীর্ণ হচ্ছে।

প্রথম যুগে একদিন পৃথিবী আপন তপ্ত নিশ্বাসের কুয়াশায় অবগুণ্ঠিত ছিল, তখন বিরাট আকাশের গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে আপন স্থান সে উপলব্ধি করতেই পারে নি। অবশেষে একদিন তার মধ্যে সূর্যকিরণ প্রবেশের পথ পেল। তখনই সেই মুক্তিতে আরম্ভ হল পৃথিবীর গৌরবের যুগ। তেমনিই একদিন আর্দ্র হৃদয়ালুতার ঘন বাষ্পাবরণ আমাদের মেয়েদের চিত্তকে অত্যন্ত কাছের সংসারে আবিষ্ট করে রেখেছিল। আজ তা ভেদ করে সেই আলোকরশ্মি প্রবেশ করছে যা মুক্ত আকাশের, যা সর্বলোকের। বহু দিনের যে-সব সংস্কারজড়িমাজালে তাদের চিত্ত আবদ্ধ বিজড়িত ছিল যদিও আজ তা সম্পূর্ণ কেটে যায় নি, তবু তার মধ্যে অনেকখানি ছেদ ঘটেছে। কতখানি যে, তা আমাদের মতো প্রাচীন বয়স যাদের তারাই জানে।

আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন এই বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব তাদের স্বীকার করতেই হবে ; নইলে তাদের লজ্জা, তাদের অকৃতার্থতা।

আমার মনে হয়, পৃথিবীতে নূতন যুগ এসেছে। অতিদীর্ঘকাল মানবসভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল পুরুষের হাতে। এই সভ্যতার রাষ্ট্রতন্ত্র অর্থনীতি সমাজশাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ। মেয়েরা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরালে থেকে কেবল করেছিল ঘরের কাজ। এই সভ্যতা হয়েছিল একঝোঁকা। এই সভ্যতায় মানবচিত্তের অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে ; সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয়ভাণ্ডারে কৃপণের জিম্মায় আটকা পড়ে ছিল। আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে।

তরুণ যুগের মানুষহীন পৃথিবীতে পঙ্কস্তরের উপর যে অরণ্য ছিল বিস্তৃত সেই অরণ্য বহুলক্ষ বৎসর ধরে প্রতিদিন সূর্যতেজ সঞ্চয় করে এসেছে আপন বৃক্ষরাজির মজ্জায়। সেই-সব অরণ্য ভূগর্ভে তলিয়ে দিয়ে রূপান্তরিত অবস্থায় বহুযুগ প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই পাতালের দ্বার যেদিন উদ্‌ঘাটিত হল, অকস্মাৎ মানুষ শত শত বৎসরের অব্যবহৃত সূর্যতেজকে পাথুরে কয়লার আকারে লাভ করল আপন কাজে ; তখনই নূতন বল নিয়ে বিশ্ববিজয়ী আধুনিক যুগ দেখা দিল।

একদিন এ যেমন ঘটেছে সভ্যতার বাহিরের সম্পদ নিয়ে, আজ তেমনি অন্তরের সম্পদের একটি বিশেষ খনিও আপন সঞ্চয়কে বাহিরে প্রকাশ করল। ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই উপলক্ষে মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে এই-যে নূতন চিত্তের যোগ, সভ্যতায় এ আর-একটি তেজ এনে দিলে। আজ এর ক্রিয়া প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে চলছে। একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় যে ভারসামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাধাবার লক্ষণ আনে, আজ আশা করা যায় ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে। প্রচণ্ড ভূমিকম্প বার বার ধাক্কা লাগাচ্ছে পুরাতন সভ্যতার ভিত্তিতে। এই সভ্যতায় বিপত্তির কারণ অনেক দিন থেকে সঞ্চিত হয়ে উঠছিল, অতএব ভাঙনের কাজ কেউ বন্ধ করতে পারবে না। একটিমাত্র বড়ো আশ্বাসের কথা এই যে, কল্পান্তের ভূমিকায় নূতন সভ্যতা গড়বার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে— প্রস্তুত হচ্ছে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই। তাদের মুখের উপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয়— যে ঘোমটার আবরণে তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সেই মনের ঘোমটাও তাদের খসছে। যে মানবসমাজে তারা জন্মেছে সেই সমাজ আজ সকল দিকেই সকল বিভাগেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তাদের দৃষ্টির সম্মুখে। এখন অন্ধসংস্কারের কারখানায় গড়া পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করা আর তাদের সাজবে না। তাদের স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি, কেবল ঘরের লোককে নয়, সকল লোককে রক্ষার জন্যে কায়মনে প্রবৃত্ত হবে।

আদিকাল থেকে পুরুষ আপন সভ্যতাদুর্গের ইঁটগুলো তৈরি করেছে নিরন্তর নরবলির রক্তে— তারা নির্মমভাবে কেবলই ব্যক্তিবিশেষকে মেরেছে কোনো একটা সাধারণ নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে ; ধনিকের ধন উৎপন্ন হয়েছে শ্রমিকের প্রাণ শোষণ করে ; প্রতাপশালীর প্রতাপের আগুন জ্বালানো রয়েছে অসংখ্য দুর্বলের রক্তের আহুতি দিয়ে ; রাষ্ট্রস্বার্থের রথ চালিয়েছে প্রজাদের তাতে রজ্জুবদ্ধ করে। এ সভ্যতা ক্ষমতার দ্বারা চালিত, এতে মমতার স্থান অল্প। শিকারের আমোদকে জয়যুক্ত করে এ সভ্যতা বধ করে এসেছে অসংখ্য নিরীহ নিরুপায় প্রাণী ; এ সভ্যতায় জীবজগতে মানুষকে সকলের

চেয়ে নিদারুণ করে তুলেছে মানুষের পক্ষে এবং অন্য জীবের পক্ষে। বাঘের ভয়ে বাঘ উদ্‌বিগ্ন হয় না, কিন্তু এ সভ্যতায় পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পান্বিত। এইরকম অস্বাভাবিক অবস্থাতেই সভ্যতা আপন মুষল আপনি প্রসব করতে থাকে। আজ তাই শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে ভীত মানুষ শান্তির কল বানাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, কিন্তু কলের শান্তি তাদের কাজে লাগবে না শান্তির উপায় যাদের অন্তরে নেই। ব্যক্তিহননকারী সভ্যতা টিকতে পারে না।

সভ্যতাসৃষ্টির নূতন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই আহ্বান আমদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধরক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহমুক্ত মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকলপ্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে। ফললাভের কথা পরে আসবে— এমন-কি, না আসতেও পারে— কিন্তু যোগ্যতা-লাভের কথা সর্বাগ্রে। শান্তিনিকেতন। ২ অক্টোবর ১৯৩৬

অগ্রহায়ণ ১৩৪৩

সংযোজন

কর্মযজ্ঞ

হিতসাধন-মণ্ডলীর প্রথম সভাধিবেশনে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম

সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার জাতকর্ম-উৎসব করতে হয় ; কিন্তু, মানুষের কোনো শুভানুষ্ঠানের বেলায় আমরা এ নিয়ম পালন করি না— তার জন্মের পূর্বে আশার সঞ্চারটুকু নিয়েই আমরা উৎসব করি। আজকের অনুষ্ঠানপত্রে লেখা আছে যে, হিতসাধন-মণ্ডলীর উদ্যোগে এ সভা আহূত, কিন্তু বস্তুত কোনো মণ্ডলী তো এখনো গড়া হয় নি— আজকের সভা কেবলমাত্র আশার আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছে। তর্ক যুক্তি বিচার বিবেচনা সে-সমস্ত পথে চলতে চলতে হবে— কিন্তু যাত্রার আরম্ভে পাথেয় সংগ্রহ করা চাই, আশাই তো সেই পাথেয়।

দীর্ঘকাল নৈরাশ্যের মধ্যে আমরা যাপন করেছি। অন্যান্য দেশের সৌভাগ্যের ইতিহাস আমাদের সামনে খোলা। তারা কেমন করে উন্নতির দিকে চলেছে সে সমস্তই আমাদের জানা। কিন্তু তার থেকে আমাদের মনে কোনো আশার সঞ্চার হয় নি ; উলটে আমরা জেনেছিলুম যে, যেহেতু তারা প্রবল তাই তারা প্রবল, যেহেতু আমরা দুর্বল তাই আমরা দুর্বল, এর আর নড়চড় নেই। এই বিশ্বাস অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে অবসাদে আমাদের অকর্মণ্য করে তুলেছে। দেশ জুড়ে কাজের ক্ষেত্র অথচ আমরা উদাসীন— তার কারণ এ নয় যে, আমাদের স্বাভাবিক দেশপ্রীতি নেই। বেদনায় বুক ভরে উঠেছে— তবু যে প্রতিকারের চেষ্টা করি নে তার একমাত্র কারণ, মনে আশা নেই।

কী পরিমাণ কাজ আমাদের সামনে আছে তার তালিকাটি আজ দেখা গেল, ভালোই হল। তার পরে দেশের মধ্যে কারা সেবক আছেন এবং তাঁরা কিরকম সাড়া দিলেন যদি জানতে পারি সেও ভালো। কিন্তু সব চেয়ে যেটি বোঝা গেল সেটি হচ্ছে এই যে, সমস্ত দেশের অন্তরের আশা আজ বাহিরে আকারগ্রহণের জন্য ব্যাকুল। সম্মুখে দুর্গম পথ। সেই পথের বাধা অতিক্রম করবার মতো পাথেয় এবং উপায় এই নূতন উদ্যোগের আছে কি নেই, তা আমি জানি না। কিন্তু প্রাণের ভিতরে আশা বলছে— না, মরব না, বাঁচবই এবং বাঁচাবই। এ আশা তো কোনোমতেই মরবার নয়, সে যে একেবারে প্রাণের মর্মনিহিত। যদিচ মরবার লক্ষণই দেখছি— হিন্দুর জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, দুঃখদুর্গতির ডালপালা বাড়ছে, তবু প্রাণের ভিতর আশা এই যে, বাঁচব, বাঁচতেই হবে, কোনোমতেই মরব না।

জীবনের আরম্ভ বড়ো ক্ষীণ। যে-সব জিনিস নির্জীব তাকে এক মুহূর্তেই ফরমায়েশমত ইঁট-কাঠ জোগাড় করে প্রকাণ্ড করে তোলা যেতে পারে, কিন্তু প্রাণের উপরে তো সে হুকুম চলে না। প্রাণ পরমদুর্বলরূপেই আপনার প্রথম পরিচয় দিয়ে থাকে— সে তো অণু আকারেই দেখা দেয়, অথচ তারই মধ্যে অনন্তকালের সত্তা লুকিয়ে থাকে। অতএব আজ আমাদের আয়োজন কতটুকুই বা, কজন লোকেরই বা এতে উৎসাহ— এ-সব কথা বলবার কথা নয়। কেননা, বাইরের আয়োজন ছোটো, অন্তরের আশা বড়ো। আমরা কতবার এরকম সভাসমিতির আয়োজন করেছি এবং কতবারই অকৃতার্থ হয়েছি— এ কথাও আলোচ্য নয় ; ফিরে ফিরে যে এরকম চেষ্টা নানা আকারে দেখা দিয়েছে তার মানেই আমাদের আশা মরতে চায় না, তারও মানে প্রাণ আছে। প্রতিদিন আমাদের কত শুভচেষ্টা মরেছে এ কথা প্রত্যক্ষ হলেও কখনোই সত্য নয় ; সত্য এই যে শুভচেষ্টা মরে নি, এবং কোনো কালে মরতে পারে না। এক রাজার পর আর-এক রাজা মরে, কিন্তু রাজার মৃত্যু নেই।

রামানন্দবাবু আমাদের সামনে কর্তব্যের যে তালিকা উপস্থিত করেছেন সে বৃহৎ। আমাদের সামর্থ্য যে কত অল্প তা তো আমরা জানি। যদি বাইরের হিসেব খতিয়ে দেখতে চাই, তা হলে কোনো ভরসা থাকে না। কিন্তু প্রাণের বেহিসাবি আনন্দে সমস্ত অবসাদকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই আনন্দই হচ্ছে শক্তি— নিজের ভিতরকার সেই আনন্দময় শক্তির উপর আমাদের ভরসা রাখতে হবে। আপনার প্রতি আমাদের রাজভক্তি চাই। আমাদের অন্তরের মধ্যে যে রাজা আছেন তাঁকে শ্রদ্ধা করি না বলেই

তো তাঁর রাজত্ব তিনি চালাতে পারছেন না। তাঁর কাছে খাজানা নিয়ে এসো ; বলো, হুকুম করো তুমি, প্রাণ দেব তোমার কাজে, প্রাণ দিয়ে প্রাণ পাব। আপনার প্রতি সেই রাজভক্তি প্রকাশ করবার দিন আজ উপস্থিত।

পৃথিবীর মহাপুরুষেরা জীবনের বাণী দিয়ে এই কথাই বলে গিয়েছেন যে, বাইরের পর্বতপ্রমাণ বাধাকে বড়ো করে দেখো না, অন্তরের মধ্যে যদি কণা-পরিমাণ শক্তি থাকে তার উপর শ্রদ্ধা রাখো। বিশ্বের সব শক্তি আমার, কিন্তু আমার নিজের ভিতরকার শক্তি যতক্ষণ না জাগে ততক্ষণ শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগ হয় না। পৃথিবীতে শক্তিই শক্তিকে পায়। বিশ্বের মধ্যে যে পরম শক্তি সমস্ত সৃষ্টির ভিতর দিয়ে, ইতিহাসের ভিতর দিয়ে, আপনাকে বিচিত্ররূপে উদ্‌ঘাটিত করে সার্থক করে তুলছেন, সেই শক্তিকে আপনার করতে না পারলে, সমস্ত জগতে এক শক্তিরূপে যিনি রয়েছেন তাঁকে সুস্পষ্টরূপে স্পর্শ করতে না পারলে, নৈরাশ্য আর যায় না, ভয় আর ঘোচে না। বিশ্বের শক্তি আমারই শক্তি এই কথা জানো। এই দুটোমাত্র ছোটো চোখ দিয়ে লোকলোকান্তরে-উৎসারিত আলোকের প্রস্রবণধারাকে গ্রহণ করতে পারছি, তেমনি আপন খণ্ড-শক্তিকে উন্মীলিত করবা মাত্রই সকল মানুষের মধ্যে যে পরমা শক্তি আছে সে শক্তি আমারই মধ্যে দেখব।

আমরা এতদিন পর্যন্ত নানা ব্যর্থ চেষ্টার মধ্য দিয়ে চলেছি। চেষ্টারূপে যে তার কোনো সফলতা নেই তা বলছি না। বস্তুত অবাধ সফলতায় মানুষকে দুর্বল করে এবং ফলের মূল্য কমিয়ে দেয়। আমাদের দেশ যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, গলা ভেঙে ডাকাডাকি করে মরছে, লক্ষ্যস্থানে গিয়ে পৌঁছে উঠতে পারছে না— এর জন্য নালিশ করব না। এই বারংবার নিষ্ফলতার ভিতর দিয়েই আমাদের বের করতে হচ্ছে কোন জায়গায় আমাদের যথার্থ দুর্বলতা। আমরা এটা দেখতে পেলাম যে, যেখানেই আমরা নকল করতে গিয়েছি সেইখানেই ব্যর্থ হয়েছি। যে-সব দেশ বড়ো আকারে আমাদের সামনে রয়েছে সেখানকার কাজের রূপকে আমরা দেখেছি, কাজের উৎসকে তো দেখি নি। তাই মনে কেবল আলোচনা করছি, অন্য দেশ এইরকম করে অমুক বাণিজ্য করে ; এইরকম আয়োজনে অমুক প্রতিষ্ঠান গড়ে ; অন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এত টাকাকড়ি, এত ঘরবাড়ি, এই নিয়ম ও পদ্ধতি— আমাদের তা নেই— এইজন্যই আমরা মরছি। আমরা আলাদিনের প্রদীপের উপর বিশ্বাস করি ; মনে করি যে, অন্য দেশের আয়োজনগুলোকে, সম্পদগুলোকে কোনো উপায়ে সশরীরে হাজির করলেই বুঝি আমরাও সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠব। কিন্তু জানি না, আলাদিনের প্রদীপ আস্ত জিনিসগুলো তুলে এনে কী ভয়ংকর বোঝা আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দেবে— তখন তার ভার বইবে কে। বহিশ্চক্ষু মেলে অন্য দেশের কর্মরূপকে আমরা দেখেছি, কিন্তু কর্তাকে দেখি নি— কেননা নিজের ভিতরকার কর্তৃশক্তিকে আমরা মেলাতে পারি নি। কর্মের বোঝাগুলোকে পরের কাছ থেকে ধার করে এনে বিপন্ন ও ব্যর্থ হতেই হবে ; কর্তাকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারলেই তখন কাজের উপকরণ খাঁটি, কাজের মূর্তি সত্য ও কাজের ফল অমোঘ হবে।

আলাদিনের প্রদীপের ব্যাপার আমাদের এখানে অনেক দেখেছি, সেইজন্যে এ দেশে যে জিনিসটা গোড়াতেই বড়ো হয়ে দেখা দেয় তাকে বিশ্বাস করি নে। আমরা যেন আকৃতিটাকে চক্ষের পলকে জাদুকরের গাছের মতো মস্ত করে তোলবার প্রলোভনকে মনে স্থান না দিই। সত্য আপন সত্যতার গৌরবেই ছোটো হয়ে দেখা দিতে লজ্জিত হয় না। বড়ো আয়তনকে গ্রহণ করতে হলে, সেটাকে মিথ্যার কাছ থেকে পাছে ধার নিতে হয় এই তার বিষম ভয়। লোকের চোখ ভোলাবার মোহে গোড়াতেই যদি মিথ্যার সঙ্গে তাকে সন্ধি করতে হয়, তা হলে এক রাত্রের মধ্যে যত বৃদ্ধিই তার হোক, তিন রাত্রের মধ্যে সে 'সমূলেন বিনশ্যতি'। ঢাক-ঢোল বায়না দেবার পূর্বে এবং কাঠ-খড় জোগাড়ের গোড়াতেই, এ কথাটা যেন আমরা না ভুলি। যিনি পৃথিবীর একার্ধকে ধর্মের আশ্রয় দান করেছেন তিনি আস্তাবলে নিরাশ্রয় দারিদ্র্যের কোলে জন্মেছিলেন। পৃথিবীতে যা-কিছু বড়ো ও সার্থক তার যে কত ছোটো জায়গায় জন্ম, কোন্ অজ্ঞাত লগ্নে যে তার সূত্রপাত, তা আমরা জানি নে— অনেক সময় মরে গিয়ে সে আপনার শক্তিকে প্রকাশমান করে। আমার এইটে বিশ্বাস যে, যে দরিদ্র সেই দারিদ্র্য জয়

করবে— সেই বীরই সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের বাহিরে জীর্ণ কন্থার 'পরে জন্মগ্রহণ করেছে। যে সূতিকাগৃহের অন্ধকার কোণে জন্মেছে সেখানে আমরা প্রবেশ করে তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি নি, কিন্তু সেখানকার শঙ্খধ্বনি বাইরের বাতাসকে স্পন্দিত করে তুলেছে। আমরা তাকে চক্ষে দেখলুম না কিন্তু আমাদের এই আনন্দ যে, তার অভ্যুদয় হয়েছে। আমাদের এই আনন্দ যে, আমরা তার সেবার অধিকারী।

আমরা জোড়হাত করে তাকিয়ে আছি ; বলছি— তুমি এসেছ। তুমি অনেক দিনের-প্রতীক্ষিত, অনেক দুঃখের ধন, তুমি বিধাতার কৃপা ভারতে অবতীর্ণ।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে, য়ুরোপে আজকাল কথা উঠেছে যে মানুষের উন্নতিসাধন ভালোবেসে নয়, বৈজ্ঞানিক নিয়মের জাঁতায় পিষে মানুষের উৎকর্ষ। অর্থাৎ, যেন কেবলমাত্র পুড়িয়ে-পিটিয়ে কেটে-ছেঁটে জুড়ে-তেড়ে মানুষকে তৈরি করা যায়। এইজন্যেই মানুষের প্রাণ পীড়িত হয়ে উঠেছে। যন্ত্রকে প্রাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার মতো দৌরাত্ম্য আর-কিছুই হতে পারে না। তার পরিচয় বর্তমান যুদ্ধে দেখতে পাচ্ছি। কলিযুগের কলদৈত্য স্বর্গের দেবতাদের নির্বাসিত করে দিয়েছে, কিন্তু আবার তো স্বর্গকে ফিরে পেতে হবে। শিবের তৃতীয় নেত্র অগ্নি উদ্‌গীরণ না করলে কেমন করে সেই মঙ্গল ভূমিষ্ঠ হবে যা দৈত্যের হাত থেকে স্বর্গকে উদ্ধার করবে।

কিন্তু, আমাদের দেশে আমরা একেবারে উল্টো দিক থেকে মরছি— আমরা শয়তানের কর্তৃত্বকে হঠাৎ প্রবল করতে গিয়ে মরি নি ; আমরা মরছি ঔদাসীন্যে, আমরা মরছি জরায়। প্রাণের প্রতি প্রাণের যে সহজ ও প্রবল আকর্ষণ আছে আমরা তা হারিয়েছি ; আমরা পাশের লোককেও আত্মীয় বলে অনুভব করি না, পরিবার-পরিজনের মধ্যেই প্রধানত আমাদের আনন্দ ও সহযোগিতা, সেই পরিধির বাইরে আমাদের চেতনা অস্পষ্ট। এইজন্যই আমাদের দেশে দুঃখ, মৃত্যু, অজ্ঞান, দারিদ্র্য। তাই আমরা এবার যৌবনকে আহ্বান করছি। দেশের যৌবনের দ্বারে আমাদের আবেদন— বাঁচাও, দেশকে তোমরা বাঁচাও। আমাদের ঔদাসীন্য বহুদিনের, বহুযুগের ; আমাদের প্রাণশক্তি আচ্ছন্ন আবৃত, একে মুক্ত করো ! কে করবে। দেশের যৌবন— যে যৌবন নূতনকে বিশ্বাস করতে পারে, প্রাণকে যে নিত্য অনুভব করতে পারে।

জরার ব্যক্তিত্ব পঞ্চত্বে বিলীন হবার দিকে যায়। এইজন্য কোনো জায়গায় ব্যক্তিত্বের স্ফূর্তি সে সইতে পারে না। ব্যক্তি মানে প্রকাশ। চারি দিকে যেটা অব্যক্ত সেই বৃহৎ যখন একটা কেন্দ্রকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায় তখনই ব্যক্তিত্ব। সংকীর্ণের মধ্যে বিকীর্ণের ক্রিয়াশীলতাই ব্যক্তিত্ব। আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আমাদের জাতির মধ্যে বিশ্বমানবের আবির্ভাব কেমন করে জাগবে। দেবদানবকে সমুদ্র মন্থন করতে হয়েছিল তবে অমৃত জেগেছিল যে অমৃত সমস্তের মধ্যে ছড়ানো ছিল। কর্মের মন্থনদণ্ডের নিয়তাড়নায় তবেই আমাদের সকলের মধ্যে যে শক্তি ছড়িয়ে আছে তাকে আমরা ব্যক্ত আকারে পাব ; তাতেই আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব অমর হয়ে উঠবে, আমাদের চিন্তা বাক্য এবং কর্ম সুনির্দিষ্টতা পেতে থাকবে। ইংরাজিতে যাকে বলে sentimentalism সেই দুর্বল অস্পষ্ট ভাবাতিশয্য আমাদের জীবনকে এতদিন জীর্ণ করেছে। কিন্তু এই ভাবাবেশের হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। কাজে লাগলেই তর্ককীটের আক্রমণ ও পাণ্ডিত্যের পণ্ডতা থেকে রক্ষা পাব।

সেই কর্মের ক্ষেত্রে মিলনের জন্য আগ্রহবেগ দেশের ভিতরে জাগ্রত হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেশে আজ প্রচণ্ড শক্তি শিশুবেশে এসেছে। আমরা তা অন্তরে অনুভব করছি। যদি তা না অনুভব করি তবে বৃথা জন্মেছি এই দেশে, বৃথা জন্মেছি এই কালে। এমন সময়ে এ দেশে জন্মেছি যে সময়ে আমরা একটা নূতন সৃষ্টির আরম্ভ দেখতে পাব। এ দেশের নব্য ইতিহাসের সেই প্রথম প্রত্যূষে, যখন বিহঙ্গের কলকাকলিতে আকাশ ছেয়ে যায় নি, তখন আমরা জেগেছি। কিন্তু অরুণলেখা তো পূর্বগগনে দেখা দিয়েছে— ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই। মায়ের পক্ষে তার সদ্যোজাত কুমারকে দেখবার আনন্দ যেমন, তেমনি সৌভাগ্য তেমনি আনন্দ আজ আমাদের। দেশে যখন বিধাতার

আলোক অতিথি হয়ে এল তখন আমরা চোখ মেললুম। এই ব্রাহ্মমুহূর্তে, এই সৃজনের আরম্ভে, তাই প্রণাম করি তাঁকে যিনি আমাদের এই দেশে আহ্বান করেছেন— ভোগ করবার জন্য নয়, ত্যাগ করবার জন্য। আজ পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী জাতিরা ঐশ্বর্য ভোগ করছে, কিন্তু তিনি আমাদের জন্ম দিয়েছেন জীর্ণ কন্থার উপরে— আমাদের তিনি ভার দিয়েছেন দুঃখ দারিদ্র্য দূর করবার। তিনি বলেছেন, অভাবের মধ্যে তোমাদের পাঠালুম, অজ্ঞানের মধ্যে পাঠালুম, অস্বাস্থ্যের মধ্যে পাঠালুম, তোমরা আমার বীর পুত্র সব। আমরা দরিদ্র বলেই নিজের সত্য শক্তিকে আমাদের নিতান্তই স্বীকার করতে হবে। আমরা যে এত স্তূপাকার অজ্ঞান রোগ দুঃখ দারিদ্র্য মুগ্ধসংস্কারের দুর্গদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি, আমরা ছোটো নই। আমরা বড়ো, এ কথা হবেই প্রকাশ— নইলে এ সংকট আমাদের সামনে কেন। সেই কথা স্মরণ করে যিনি দুঃখ দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম, যিনি অপমান দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম, যিনি দারিদ্র্য দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম।

ফাল্গুন ১৩২১

স্বাধিকারপ্রমত্তঃ

দেড়শো বৎসর পার হইয়া গেল, ইংরেজ-শাসন ভারতবর্ষকে আগাগোড়া দখল করিয়া বসিয়াছে। এ শাসনে ভারতের কল্যাণ হইয়াছে কি না, তার ধনসম্পদ শিল্পবাণিজ্য পূর্বের চেয়ে বাড়িয়াছে কিংবা তার আত্মশক্তির ও আত্মশাসনের সুযোগ বিস্তৃত হইয়াছে কি না, সে তর্কে আমাদের কোনো লাভ নাই, কারণ এ তর্কে অতীত মুছিবে না এবং বর্তমানের দুঃখ ঘুচিবে না। ঐতিহাসিক কৌতূহলের তরফ হইতেও ইহার মূল্য খুব বেশি নয়। কারণ, অনেক তথ্য আছে যাহা গোপনে এবং নীরবে ছাড়া স্মরণ করিয়া রাখিবার হুকুম আমাদের নাই। অতএব এমন আলোচনায় আমার দরকার কী যার পরিণাম শুভ বা সন্তোষজনক না হইতে পারে।

কিন্তু একটা কথা আছে যার সম্বন্ধে কোনো ঢাকাঢাকি নাই। এ কথা সকল পক্ষেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, এতকালের সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম মেলে নাই, বরং তাদের মাঝখানের ফাঁক বাড়িয়াই চলিল। যখন দুই জাতি পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করিতে বাধ্য অথচ উভয়ের মধ্যে সত্যকার মিলন অসম্ভব, তখন এ সংস্রব হইতে যত উপকারই পাই ইহার বোঝা বড়ো ভারী। অতএব যখন আমরা বলি যে এই অস্বাভাবিক বিচ্ছেদের জড়ভারে চাপা পড়িয়া আমাদের হাড়ে-মাসে এক হইল, তখন সে কথা আমাদের শাসনতন্ত্রের অভিপ্রায় বা প্রণালীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ভাবে বলি না। আজকের দিনে সে কথাটা আমাদের ভারতবর্ষের ভালোমন্দকে ছাড়াইয়াও অনেক দূর প্রসারিত। আমাদের নিজের ব্যথা হইতে বুঝিতে পারি, আজ এমন একটা প্রবল সভ্যতা জগৎ জুড়িয়া আপন জাল বিস্তার করিতেছে যা শোষণ করিতে পারে, শাসন করিতে পারে, কিন্তু যার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি নাই যে শক্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলাইয়া দেয়। যে সভ্যতা অবজ্ঞার সহিত বাহির হইতে আমাদের মাথার উপর উপকার বর্ষণ করে অথচ আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা উদ্ধতভাবে দাবি করিতে থাকে, অর্থাৎ যাহা দানের সঙ্গে হৃদয় দেয় না অথচ প্রতিদানের সঙ্গে হৃদয়ের মূল্য চাহিয়া বসে।

অতএব এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সভ্যতার মধ্যে বুদ্ধিসম্পদ যথেষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে এমন একটি সত্যের কমতি আছে যে সত্য মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। এইজন্যই যে-সব জাত এই আধুনিক সভ্যতার হাতে গড়িয়া উঠিল তারা কোনো মুশকিলে ঠেকিলেই প্রথমেই বাহিরের দিকে হাতড়ায়; মনে করে তাদের আপিসে, তাদের কার্যপ্রণালীতে একটা-কিছু

লোকসান ঘটিয়াছে, মনে করে সেই প্রণালীটাকেই সারিয়া লইলে তারা উদ্ধার পাইবে। তাদের বিশ্বাস মানুষের সংসারটা একটা শতরঞ্চ খেলা, বড়েগুলোকে বুদ্ধিপূর্বক চালাইলেই বাজি মাৎ করা যায়। তারা এটা বুঝিতে পারে না যে, এই বুদ্ধির খেলায় যাকে জিৎ বলে মানুষের পক্ষে সেইটেই সব চেয়ে বড়ো হার হইতে পারে।

মানুষ একদিন স্পষ্ট হউক অস্পষ্ট হউক এই একটি বিশ্বাসে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল যে, কোনো-একটি সত্তা আছেন যাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকাতেই আমাদের পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধ সত্য হইয়াছে। সেইদিন হইতেই তার ইতিহাস শুরু হইয়াছে। য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি বলে, এই বিশ্বাসের গোড়া ভূতের বিশ্বাসে। কিন্তু আমরা জানি, ওটা একেবারেই বাজে কথা। মানুষের পরস্পরের মধ্যে একটি গভীর ঐক্য আছে, সেই ঐক্যবোধের ভিতরেই ঐ বিশ্বাসের মূল, এবং এই ঐক্যবোধেই মানুষের কর্তব্যনীতির ভিত্তি। এই একটি সত্যের উপলব্ধিই মানুষের সমস্ত সৃজনীশক্তির মধ্যে প্রাণ ও জ্যোতি সঞ্চার করিয়াছে, ইহাতেই সে আপন আত্মানুভূতির মধ্যে অসীমের স্পর্শ লাভ করিল।

স্বভাবতই ইতিহাসের আরম্ভে মানুষের ঐক্যবোধ এক-একটি জাতির পরিধির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। যেমন বড়ো খেতের মধ্যে চারা রোপণ করিবার আগে ছোটো খেতের মধ্যে বীজ বপন করিতে হয়, এও ঠিক তেমনি। এইজন্য গোড়ায় মানুষ আপন দেবতাকে স্বজাতির বিশেষ দেবতা বলিয়াই গণ্য করিত, এবং তার কর্তব্যের দায়িত্ব বিশেষভাবে তার স্বজাতির সীমার মধ্যেই সংকীর্ণ ছিল। আর্যরা যখন ভারতে আসিলেন তখন তাঁরা যে দেবতা ও যে পূজাবিধি সঙ্গে আনিলেন সে যেন তাঁদের নিজের বিশেষ সম্পত্তির মতোই ছিল। অনার্যদের সঙ্গে তাঁদের লড়াই বাধিল— সে লড়াই কিছুতেই মিটিতে চায় না, অবশেষে যখন আর্যসাধক সর্বভূতের মধ্যে সর্বভূতাত্মাকে উপলব্ধি ও প্রচার করিলেন তখনই ভিতরের দিক হইতে বিরোধের গোড়া কাটা পড়িল। হৃদয়ের মধ্যে মনীষা না জাগিলে বিভেদের মধ্যে মিলন আসে কী করিয়া।

মুসলমান যখন ভারতে রাজত্ব করিতেছিল তখন আমাদের রাষ্ট্রীয় চাঞ্চল্যের ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক উদ্‌বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো মোগল সম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয় একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এইজন্যই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল অন্তরাত্মার দিকে পরম সত্যের আলোকে সেখানে সত্য অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল।

ভারতে সেই আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধের সাধনা আজিকার দিনেও নিশ্চেষ্ট হয় নাই। তাই এ কথা জোর করিয়া বলা যায় যে, রামমোহন রায়ের জন্ম এবং তাঁহার তপস্যা আধুনিক ভারতের সকল ঘটনার মধ্যে বড়ো ঘটনা ; কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম আপন অবিচ্ছিন্নতা অনুভব করিবে, আজ পৃথিবীতে ইহার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর। পশ্চিম যখন ভারতের দ্বারে আঘাত করিল তখন ভারত সর্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়াই সেই আঘাতের সত্যকার সাড়া দিয়াছিল। তিনি ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই, অর্থাৎ পরমাত্মায় সকল আত্মার ঐক্য এই বিশ্বাসের মধ্যেই, সর্বমানবের মিলনের সভ্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

আরো অনেক বড়ো লোক এবং বুদ্ধিমান লোক আমাদের কালে দেখিয়াছি। তাঁরা পশ্চিমের গুরুর কাছে শিক্ষা পাইয়াছেন। এই পশ্চিমের বিদ্যালয়ে নিজের জাতির সত্তাকে অত্যন্ত তীব্র করিয়া অনুভব করিতে শেখায়— এই শিক্ষায় যে স্বাদেশিকতা জন্মে তার ভিত্তি অন্য জাতির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ পার্থক্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য এই শিক্ষা জগতের যেখানেই পৌঁছিয়াছে সেইখানেই পরজাতির প্রতি সন্দেহসংকুল বিরুদ্ধতা জাগিয়াছে ; সেইখানেই মানুষ অন্য দেশের মানুষকে ছলে বলে ঠেলিয়া পৃথিবীর সমস্ত সুযোগ নিজে পুরা দখল করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তিকে উদ্যত

করিয়া তুলিতেছে। এই-যে একটা প্রকাণ্ড ব্যূহবদ্ধ অহংকার ও স্বার্থপরতার চর্চা, এই-যে মানুষকে সত্য করিয়া দেখিবার দৃষ্টিকে ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করিবার চেষ্টা, ইহা আজ বিলিতি মদ এবং আর-এক পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে ভারতেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই শিক্ষায় বিপুল ও প্রবল মিথ্যার মধ্যে যেটুকু সত্য আছে সেটুকু আমাদিগকে লইতে হইবে ; নহিলে আমাদের প্রকৃতি একঝোঁকা হইয়া পড়িবে। কিন্তু সেইসঙ্গে এই কথাও মনে রাখা চাই যে, ভারত যদি এমন কোনো সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকে যাহার অভাবে অন্য দেশের সভ্যতা আপন সামঞ্জস্য হারাইয়া টলিয়া পড়িতেছে, তবে আজ সেই সত্যকে বলের সঙ্গে প্রকাশ করাই তার সকলের চেয়ে বড়ো কাজ।

আজ পশ্চিম মহাদেশের লোক হঠাৎ পৃথিবীর সকল জাতির সংস্রবে আসিয়া পড়িয়াছে। এই মহৎ ঘটনার জন্য তার ধর্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। তাই ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য আজ বিধ্বস্ত, চীন বিষে জীর্ণ, পারস্য পদদলিত ; তাই কঙ্গোয় য়ুরোপীয় বণিকের দানবলীলা এবং পিকিনে বক্সার যুদ্ধে য়ুরোপীয়দের বীভৎস নিদারুণতা দেখিয়াছি। ইহার কারণ, য়ুরোপীয়েরা স্বজাতিকেই সব চেয়ে সত্য বলিয়া মানিতে শিখিয়াছে। ইহাতে কিছুদূর পর্যন্ত তাহাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে পার করিবে না। বালকবয়সে একপ্রকার দুর্দান্ত আত্মম্ভরিতা তেমন অসংগত হয় না, কিন্তু বয়স হইলে সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করিবার সময় আসে ; তখনো যদি মানুষ পরের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে না শেখে তবে তাহাতে অন্যেরও অসুবিধা ঘটে এবং তাহারও চিরদিন সুবিধা ঘটে না।

আজ তাই এমন দিন আসিয়াছে যখন পশ্চিমের মানুষ নিজের ঘরের মধ্যেই বেশ করিয়া বুঝিতেছে স্বাজাতিকতা বলিতে কী বুঝায়। এতদিন যে স্বাজাতিকতার সমস্ত সুবিধাটুকু ইহারা নিজে ভোগ করিয়াছে এবং সমস্ত অসুবিধার বোঝা অন্য জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া আসিয়াছে আজ তাহার ধাক্কা ইহাদের নিজের গৃহপ্রাচীরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

এতদিন মানুষ বলিতে ইহারা মুখ্যত আপনাদিগকেই বুঝিয়াছে। তাহাতে ইহাদের আত্মোপলব্ধি এই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে প্রচণ্ডরূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং এই সীমার বাহিরে নিজের সুবিধা এবং অসুবিধা অনুসারে নিজের লাভক্ষতির পরিমাণ বুঝিয়া ইহারা ধর্মবুদ্ধিকে কমাইয়া বাড়াইয়া বেশ সহজ করিয়া আনিতে পারিয়াছে।

কিন্তু সুবিধা মাপে সত্যকে ছাঁটিতে গেলে সত্যও আমাদিগকে ছাঁটিতে আসে। কিছুদিন ও কিছুদূর পর্যন্ত সে অবজ্ঞা সহ্য করিয়া যায়। তার পরে একদিন হঠাৎ সে সুদে-আসলে আপনার পাওনা আদায় করিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এমন সময়ে আসে যেটা অত্যন্ত অসুবিধার সময়, এমন উপলক্ষে আসে যেটা হয়তো অত্যন্ত তুচ্ছ। তখন সেটাকে আমরা বিধাতার অবিচার মনে করি। অধর্মের টাকায় ভদ্র সমাজে যে মানুষ গৌরবে বয়স কাটাইল হঠাৎ একদিন যদি তার খাতা ধরা পড়ে তবে সেটাকে সে অন্যায় অত্যাচার বলিয়াই মনে করে। বড়ো বড়ো সভ্য জাতি তেমনি আপন সমৃদ্ধিকে এমনি স্বাভাবিক এবং সুসংগত বলিয়া মনে করে যে, দুর্দিন যখন তার সেই সমৃদ্ধির ইতিহাস লইয়া কৈফিয়ত তলব করে তখন সেটাকে সে সুবিচার বলিয়া মনেই করিতে পারে না।

এইজন্য দেখিতে পাই, য়ুরোপ যখন কঠিন সংকটে পড়ে তখন বিধাতার রাজ্যে এত দুঃখ কেন ঘটে তা লইয়া সে ভাবিয়া কূল পায় না। কিন্তু পৃথিবীর অন্য অংশের লোকেরাই বা কেন দুঃখ এবং অপমান ভোগ করে, সে কথা লইয়া বিধাতাকে কিংবা নিজেকে তেমন জোরের সঙ্গে এরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। তা হউক, এই সহজ সত্যটুকু তার ভালো করিয়াই জানা দরকার ছিল যে, মনুষ্যত্ব জিনিস একটা অখণ্ড সত্য, সেটা সকল মানুষকে লইয়াই বিরাজ করিতেছে। সেটাকে যখন কেহ স্বার্থের বা স্বজাতির খাতিরে খণ্ডিত করে তখন শীঘ্রই হোক বিলম্বেই হোক তার আঘাত একদিন নিজের বক্ষে আসিয়া পৌঁছে। ঐ মনুষত্বের উপলব্ধি কী পরিমাণে সত্য হইয়াছে ইহা লইয়াই সভ্যতার বিচার হইবে— নহিলে, তার আমদানি, রফতানির প্রাচুর্য, তার রণতরীর দৈর্ঘ্য, তার অধীন দেশের বিস্তৃতি, তার রাষ্ট্রনীতির চাতুরী, এ লইয়া বিচার নয়। ইতিহাসের এই বিচারে আমরা পূর্বদেশের

লোকেরা প্রধান সাক্ষী। আমাদিগকে অসংকোচে সত্য বলিতে হইবে, তার ফল আমাদের পক্ষে যত কঠিন এবং অন্যদের পক্ষে যত অপ্রিয় হউক। আমাদের বাণী প্রভুত্বের বাণী নয়, তার পশ্চাতে শস্ত্রবল নাই। আমরা সেই উচ্চ রাজতক্তে দাঁড়াই নাই যেখান হইতে দেশবিদেশ নতশিরে আদেশ গ্রহণ করে। আমরা রাজসভার বাহিরে সেই পথের ধারে ধুলার উপরে দাঁড়াইয়া আছি যে পথে যুগযুগান্তের যাত্রা চলিতেছে ; যে পথে অনেক জাতি প্রভাতে জয়ধ্বজা উড়াইয়া দিগ্‌দিগন্তে ধুলা ছড়াইয়া বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যাবেলায় তারা ভগ্ন দণ্ড এবং জীর্ণ কন্থায় যাত্রা শেষ করিল ; কত সাম্রাজ্যের অহংকার ঐ পথের ধুলায় কালের রথচক্রতলে চূর্ণ হইয়া গেল, আজ তার সন-তারিখের ভাঙা টুকরাগুলা কুড়াইয়া ঐতিহাসিক উলটা-পালটা করিয়া জোড়া দিয়া মরিতেছে। আমাদের বাণী বেদনার বাণী— সত্যের বলে যার বল, একদিন যাহা অন্য-সকল কলগর্জনের ঊর্ধ্বে ইতিহাসবিধাতার সিংহাসনতলে আসিয়া পৌঁছিবে।

একদিন ছিল যখন য়ুরোপ আপন আত্মাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। তখন নানা চিত্তবিক্ষেপের মধ্যেও সে এ কথা বুঝিয়াছিল যে, বাহিরের লাভের দ্বারা নয়, কিন্তু অন্তরের সত্য হইয়া মানুষ আপন চরম সম্পদ পায়। সে জানিত, এ লাভের মূল্য কেবল আমাদের মনগড়া নয়, কিন্তু ইহার মূল্য সেই পরম প্রেমের মধ্যে যাহা চিরদিন মানুষের সংসারের মধ্যে সচেষ্ট হইয়া আছে। তার পরে এমন দিন আসিল যখন বিজ্ঞান বহির্জগতের মহিমা প্রকাশ করিয়া দিল এবং য়ুরোপের নিষ্ঠাকে আত্মার দিক হইতে বস্তুর দিকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল।

মানুষের পক্ষে বিজ্ঞানের খুব একটা বড়ো তাৎপর্য আছে। প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের সহযোগিতা আছে, বিজ্ঞান ইহাই প্রমাণ করে। প্রকৃতির নিয়মের সাহায্যে প্রাকৃতিকই নির্বাচনের অধীনতা কাটাইয়া মানুষ আপন ধর্মবিবেকের স্বাধীন নির্বাচনের গৌরব লাভ করিতে পারে, ইহাই বিজ্ঞানের শিক্ষা। প্রকৃতি যে মানুষের পরিপূর্ণতালাভের পথে অন্তরায় নহে, প্রকৃতির সহিত সত্য ব্যবহার করিয়া তবেই আমাদের চিন্ময়কে রূপদান করিয়া তাহার বাস্তুপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি, য়ুরোপের প্রতি এই সত্য প্রচারের ভার আছে।

বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব -মোচনের কাজে লাগে, যেখানে তার দান বিশ্বজনের কাছে গিয়া পৌঁছায়, সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু, যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত হয় সেখানেই তার ভয়ংকর পতন। কারণ, ইহার প্রলোভন এত অত্যন্ত প্রকাণ্ড রূপে প্রবল যে আমাদের ধর্মবুদ্ধি তার কাছে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নামের বর্ম পরিয়া নিজেরই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া লড়াই করে। ইহাতে আজ জগতের সর্বত্র এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির সম্বন্ধ দুর্বলের দিকে দলন-বন্ধনের দ্বারা ভারগ্রস্ত এবং প্রবলের দিকে হিংস্রতার অন্তহীন প্রতিযোগিতায় উদ্ধত হইয়া উঠিতেছে ; সকল দেশে যুদ্ধ ও যুদ্ধের উদ্‌যোগ নিত্য হইয়া উঠিয়াছে এবং পোলিটিকাল মহামারীর বাহন যে রাষ্ট্রনীতি তাহা নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনার অন্তরে অন্তরে কলুষিত হইতে থাকিল।

তথাপি এই আশা করি, য়ুরোপের এতদিনের তপস্যার ফল আজ বস্তুলোভের ভীষণ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া পায়ের তলায় ধুলা হইয়া যাইবে না। আজিকার দিনের প্রচণ্ড সংকটের বিপাকে য়ুরোপ আর-কোনো একটা নূতন প্রণালী, আর-একটা নূতন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু বারংবার মৃত্যুর পাঠশালায় শিক্ষালাভের পরে য়ুরোপকে আজ না হয় তো আর-একদিন এ কথা মানিতেই হইবে যে, কেবল কার্যপ্রণালীর পিরামিড-নির্মাণের প্রতি আস্থা রাখা অন্ধ পৌত্তলিকতা ; তাহাকে এ কথা বুঝিতে হইবে, বাহিরের প্রণালীকে নয়, অন্তরের সত্যকে পাওয়া চাই ; এ কথা বুঝিতে হইবে যে, ক্রমাগতই বাসনা-হুতাগ্নির হব্য সংগ্রহ করিতে থাকিলে একদিন জগদব্যাপী অগ্নিকাণ্ড না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। একদিন জাগিয়া উঠিয়া য়ুরোপকে তার লুব্ধতা এবং উন্মত্ত অহংকারের সীমা বাঁধিয়া দিতে হইবে ; তার পরে সে আবিষ্কার করিতে পারিবে যে, উপকরণই যে সত্য তাহা নয়,

অমৃতই সত্য।

ঈর্ষার অন্ধতায় য়ুরোপের মহত্ত্ব অস্বীকার করিলে চলিবে না। তার স্থানসন্নিবেশ, তার জলবায়ু, তার জাতিসমবায়, এমনভাবে ঘটিয়াছে যে, সহজেই তার ইতিহাস শক্তি সৌন্দর্য এবং স্বাতন্ত্র্যপরতায় সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে। সেখানকার প্রকৃতিতে কঠোরতা এবং মৃদুতার এমন একটি সামঞ্জস্য আছে যে, তাহা এক দিকে মানবের সমগ্র শক্তিকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়া আনে, আর-এক দিকে তাহার চিত্তকে অভিভূত করিয়া নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদে দীক্ষিত করে না। এক দিকে তাহা য়ুরোপের সন্তানদের চিত্তে এমন তেজের উদ্রেক করিয়াছে যে তাহাদের উদ্যম ও সাহসের কোথাও আপন দাবির কোনো সীমা স্বীকার করিতে চায় না ; অপর দিকে তাহাদের বুদ্ধিতে অপ্রমাদ, তাহাদের কল্পনাবৃত্তিতে সুসংযম, তাহাদের সকল রচনায় পরিমিতি এবং তাহাদের জীবনের লক্ষ্যের মধ্যে বাস্তবতাবোধের সঞ্চার করিয়াছে। তাহারা একে একে বিশ্বের গূঢ়রহস্যসকল বাহির করিতেছে, তাহাকে মাপিয়া ওজন করিয়া আয়ত্ত করিতেছে ; তাহারা প্রকৃতির মধ্যে অন্তরতর যে-একটি ঐক্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ধ্যানযোগে বা তর্কের বলে নয়— তাহা বাহিরের পর্দা ছিন্ন করিয়া, বৈচিত্র্যের প্রাচীর ভেদ করিয়া। তাহারা নিজের শক্তিতে রুদ্ধ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া প্রকৃতির মহাশক্তিভাণ্ডারের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং লুব্ধ হস্তে সেই ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতেছে।

নিজের এই শক্তি সম্বন্ধে য়ুরোপের দম্ভ অত্যন্ত বাড়িয়াছে বলিয়াই কোথায় যে তার ন্যূনতা তাহা সে বিচার করে না। বাহ্যপ্রকৃতির রূপ যে দেশে অতিমাত্র বৃহৎ বা প্রচণ্ড সে দেশে যেমন মানুষের চিত্ত তাহার কাছে অভিভূত হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় তেমনি মানুষ নিজকৃত বস্তুসঞ্চয় এবং বাহ্যরচনার অতিবিপুলতার কাছে নিজে মোহাবিষ্ট হইয়া পরাস্ত হইতে থাকে। বাহিরের বিশালতার ভারে অন্তরের সামঞ্জস্য নষ্ট হইতে হইতে একদিন মানুষের সমৃদ্ধি ভয়ংকর প্রলয়ের মধ্যে ধুলায় লুটাইয়া পড়ে। রোম একদিন আপন সাম্রাজ্যের বিপুলতার দ্বারাই আপনি বিহ্বল হইয়াছিল। বস্তুর অপরিমিত বৃহত্ত্বের কাছে তার সত্য যে প্রতিদিন পরাভূত হইতেছিল তাহা সে নিজে জানিতেই পারে নাই। অথচ সেদিন য়িহুদি ছিল রাষ্ট্রব্যাপারে পরতন্ত্র, অপমানিত। কিন্তু, সেই পরাধীন জাতির একজন অখ্যাতনামা অকিঞ্চন যে সত্যের সম্পদ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল তাহাই তো স্তূপাকার বস্তুসঞ্চয়ের উপরে জয়লাভ করিল। য়িহুদি উদ্ধত রোমকে এই কথাটুকু মাত্র স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল যে, আপন আত্মাকে তুমি আপন ধনের চেয়ে বড়ো করিয়া জানো। এই কথাটুকুতেই পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন যুগ আসিল।

দরিদ্রের কথায় আপনার উপর মানুষের শ্রদ্ধা জন্মিল, আত্মাকে লাভ করিবার জন্য সে বাহির হইল। বাহিরে তাহার বাধা বিস্তর, তবু নিজের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে অমৃতলোকের দিব্যসম্পদ অর্জন করিবার জন্য সে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময়ে তাহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য বাহিরের দিক হইতে আবার আসিল প্রলোভন। বাহিরের জগৎকে তার হাতে তুলিয়া দিবার জন্য বিজ্ঞান তার সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। য়ুরোপ আবার আত্মার চেয়ে আপন বস্তুসংগ্রহকে বড়ো করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বস্তু চারি দিকে বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু, ইহাই অসত্য। যেমন করিয়া যে নাম দিয়াই এই বাহিরকে মহীয়ান করিয়া তুলি না কেন, ইহা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইহা ক্রমাগতই সন্দেহ, ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতারণা, অন্ধ অহংকার এবং অবশেষে অপঘাতমৃত্যুর মধ্যে মানুষকে লইয়া যাইবেই ; কেননা মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য এই যে : তদেতৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা। অন্তরতর এই-যে আত্মা, বাহিরের সকল বিত্তের চেয়ে ইহা প্রিয়।

য়ুরোপে ইতিহাস একদিন নূতন করিয়া আপনাকে যে সৃষ্টি করিয়াছিল, কোনো নূতন কার্যপ্রণালী, কোনো নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে তাহার মূলভিত্তি ছিল না। মানুষের আত্মা অন্য সব-কিছুর চেয়ে সত্য, এই তত্ত্বটি তাহার মনকে স্পর্শ করিবামাত্র তাহার সৃজনীশক্তি সকল দিকে জাগিয়া উঠিল। অদ্যকার ভীষণ দুর্দিনে য়ুরোপকে এই কথাই আর-একবার স্মরণ করিতে হইবে। নহিলে একটার পর আর-একটা মৃত্যুবাণ তাহাকে বাজিতে থাকিবে।

আর আমরা আজ এই মৃত্যুশেলবিদ্ধ পশ্চিমের কাছ হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষা করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই মুমূর্ষু, আমাদিগকে কী দিতে পারে। পূর্বে এক রকমের রাষ্ট্রতন্ত্র ছিল, তাহার বদলে আর-এক রকমের রাষ্ট্রতন্ত্র ? কিন্তু মানুষ কি কোনো সত্যকার বড়ো জিনিস একের হাত হইতে অন্যের হাতে তুলিয়া লইতে পারে। মানুষ যে-কোনো সত্যসম্পদ লয় তাহা মনের ভিতরেই লয়, বাহিরে না। ভিক্ষার দানে আমরা স্বাধীন হইব না— কিছুতেই না। স্বাধীনতা অন্তরের সামগ্রী।

য়ুরোপ কেন আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না। যেহেতু তাহার নিজের মন মুক্তি পায় নাই। তার লোভের অন্ত কোথায়। যে হাত দিয়া সে কোনো সত্যবস্তু দিতে পারে লোভে তাহার সে হাতকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে— সত্য করিয়া তার দিবার সাধ্যই নাই, সে যে রিপুর দাস। যে মুক্ত সেই মুক্তি দান করে।

যদি সে বিষয়বুদ্ধির পরামর্শ পাইয়া আমাদিগকে কিছু দিতে আসে তবে সে নিজের দানকে নিজে কেবলই খণ্ডিত করিবে। এক হাত দিয়া যত দিবে আর-এক হাত দিয়া তার চেয়ে বেশি হরণ করিবে। স্বার্থের দানকে পরীক্ষা করিয়া লইবার বেলা দেখিব তাহাতে এত ছিদ্র যে, সে আমাদিগকে ভাসাইয়া রাখিবে কি, তাহাকে ভাসাইয়া রাখাই শক্ত।

তাই এই কথা বলি, বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, এমন ভুল যদি মনে আঁকড়িয়া ধরি তবে বড়ো দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন ; যে হাত দিতে পারে সেই হাতই নিতে পারে। আপনার দেশকে আমরা অতি সামান্যই দিতেছি, সেইজন্যই আপনার দেশকে পাই নাই। বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব, এ কথা যে বলে সে লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না। আপন লোককে দুঃখ দিই, অপমান করি, অবজ্ঞা করি, বঞ্চনা করি, বিশ্বাস করি না— সেইজন্যই আপন পর হইয়াছে, বাহিরের কোনো আকস্মিক কারণ হইতে নয়।

য়িহুদি যখন পরাধীন ছিল তখন রোমের হাত হইতে দক্ষিণাস্বরূপ তাহারা স্বাধীনতা পায় নাই। পরে এমন ঘটিয়াছে যে, য়িহুদি দেশছাড়া হইয়া বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার রাষ্ট্র নাই, রাষ্ট্রতন্ত্রও নাই। কিন্তু তাহার ইতিহাসে এইটেই সকলের চেয়ে গুরুতর কথা নয়। ইহার চেয়ে অনেক বড়ো কথা এই যে, তাহার কাছ হইতে প্রাণের বীজ উড়িয়া আসিয়া য়ুরোপকে নূতন মনুষ্যত্ব দান করিয়াছে। সে যাহা দিয়াছে তাহাতেই তাহার সার্থকতা। যাহা হারাইয়াছে, যাহা পায় নাই, সেটা সত্ত্বেও সে বড়ো, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ হইয়াছে।

বাহিরের পরিমাণে মানুষের পরিমাণ নহে, এ কথা আমরা বার বার ভুলি কিন্তু তবু ইহা বার বার মনে করিতে হইবে। চীনদেশকে য়ুরোপ অস্ত্রবলে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে, সেটা বড়ো কথা নয়। কিন্তু বড়ো কথা এই যে, ভারত একদিন বিনা অস্ত্রবলে চীনকে অমৃত পান করাইয়াছিল। ভারত আজ যদি সমুদ্রের তলায় ডুবিয়া যায় তবু যাহা সে দান করিয়াছে তাহার জোরেই সে মানুষের চিত্তলোকে রহিল। যাহা সে ভিক্ষা করিয়াছিল, চুরি করিয়াছিল, স্তূপাকার করিয়াছিল, তাহার জোরে নয়।

তপস্যার বলে আমরা সেই দানের অধিকার পাইব, ভিক্ষার অধিকার নয়, এ কথা যেন কোনো প্রলোভনে না ভুলি। মানুষ যেহেতু মানুষ এই হেতু বস্তুর দ্বারা সে বাঁচে না, সত্যের দ্বারাই সে বাঁচে। এই সত্যই তাহার যে : তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়— তাঁহাকে জানিয়াই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহার উদ্ধারের অন্য কোনো উপায় নাই। এই সত্যকে দান করিবার জন্য আমাদের উপর আহ্বান আছে। মণ্টেগুর ডাক খুব বড়ো ডাক, আজ এই কথা বলিয়া ভারতের সভা হইতে সভায়, সংবাদপত্র হইতে সংবাদপত্রে ঘোষণা চলিতেছে। কিন্তু এই ভিক্ষার ডাকে আমরা মানুষ হইব না। আমাদের পিতামহেরা অমরলোক হইতে আমাদের আহ্বান করিতেছেন, বলিতেছেন : তোমরা যে অমৃতের পুত্র এই কথা জানো এবং এই কথা জানাও ; মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীকে এই সত্য

দান করো যে, কোনো কর্মপ্রণালীতে নয়, রাষ্ট্রতন্ত্রে নয়, বাণিজ্যব্যবস্থায় নয়, যুদ্ধ-অস্ত্রের নিদারুণতায় নয়—

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

মাঘ ১৩২৪

চরকা

চরকা-চালনায় উৎসাহ প্রকাশ করি নি অপবাদ দিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাকে ছাপার কালিতে লাঞ্ছিত করেছেন। কিন্তু দণ্ড দেবার বেলাতেও আমার 'পরে সম্পূর্ণ নির্মম হতে পারেন না বলেই আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকেও আমার সঙ্গে এক কলঙ্কের রসায়নে মিল করিয়েছেন।

এতে আমার ব্যথা দূর হল, তা ছাড়া একটা অত্যন্ত পুরোনো কথার নতুন প্রমাণ জুটল এই যে, কারও সঙ্গে কারও বা মতের মিল হয়, কারও সঙ্গে বা হয় না। অর্থাৎ, সকল মানুষে মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধবে, বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি। কিন্তু সমাজবিধাতারা কখনো কখনো সেইরকম ইচ্ছা করেন। তাঁরা কাজকে সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা ছাঁটাই-কলের মধ্যে মানুষ-বনস্পতিকে চালিয়ে দিয়ে ঠিক সমান মাপের হাজার হাজার সরু সরু দেশলাই কাঠি বের করে আনেন। বনাদ্রব্যকে এরকম পণ্যদ্রব্য করলে বনদেবতারা চুপ করে থাকেন, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিকে কাজের খাতিরে মৌমাছির বুদ্ধি করে তুললে নারায়ণের দরবারে হিসাবনিকাশের দিনে জরিমানায় দেউলে হবার ভয় আছে। ছোটো বয়সে জগন্নাথের ঘাটে জলযাত্রার প্রয়োজনে যখন যেতেম, নানা পান্সির মাঝি হাত ধরে টানাটানি করত। কিন্তু কোনো একটার 'পরে যখন অভিরুচির পক্ষপাত প্রকাশ করা যেত তখন সেজন্যে কারও কাছ থেকে শাসনভয় ছিল না। কেননা পান্সি ছিল অনেক, যাত্রী ছিল অনেক, তাদের গম্যস্থানও ছিল অনেক। কিন্তু, যদি দেশের উপর তারকেশ্বরের এমন একটা স্বপ্ন থাকত যে, তারণের জন্যে শুধু একটিমাত্র পান্সিই পবিত্র, তবে তাঁর প্রবল পাণ্ডাদের জবরদস্তি ঠেকাত কে। এ দিকে মানবচরিত্র ঘাটে দাঁড়িয়ে কেঁদে মরত, ওরে পালোয়ান, কূল যদি-বা একই হয়, ঘাট যে নানা— কোনোটা উত্তরে কোনোটা দক্ষিণে।

শাস্ত্রে বলেন, ঈশ্বরের শক্তি বহুধা। তাই সৃষ্টিব্যাপারে পাঁচ ভূতে মিলে কাজ করে। মৃত্যুতেই বিচিত্র ভূত দৌড় মারে ; প্রলয়ে সব একাকার। মানুষকে ঈশ্বর সেই বহুধা শক্তি দিয়েছেন, তাই মানবসভ্যতার এত ঐশ্বর্য। বিধাতা চান মানবসমাজে সেই বহুকে গেঁথে গেঁথে সৃষ্টি হবে ঐক্যের ; বিশেষফললুব্ধ শাসনকর্তারা চান, সেই বহুকে দ'লে ফেলে পিণ্ড পাকানো হবে সাম্যের। তাই সংসারে এত অসংখ্য এককলের মজুর, এক-উর্দি-পরা সেপাই, এক দলের দড়িতে বাঁধা কলের পুতুল। যেখানে মানুষের মনুষ্যত্ব জুড়িয়ে হিম হয়ে যায় নি সেখানেই এই হামানদিস্তায়-কোটা সমীকরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছেই। কোথাও যদি সেই বিদ্রোহের লক্ষণ না থাকে, যদি দেখি সেখানে হয় প্রভুর চাবুকে নয় গুরুর অনুশাসনে মানুষকে অনায়াসেই একই ধূলিশয়নে অতি ভালোমানুষের মতো নিশ্চল শায়িত রাখতে পারে, তা হলে সেই 'দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিমকলেবর' দেশের জন্যে শোকের দিন এসেছে বলেই জানব।

আমাদের দেশে অনেকদিন থেকেই সমীকরণের অলক্ষণ বলবান। এই মরণের ধর্মই আমাদের দেশে প্রত্যেক জাতের প্রত্যেক মানুষের 'পরেই এক-একটি বিশেষ কাজের বরাত দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে এই মন্ত্র যে, সৃষ্টির প্রথম দরবারে তাদের আদিপুরুষ একটিমাত্র বিশেষ মজুরির বায়না নিয়ে তাদের চিরকালকে বাঁধা দিয়ে বসে আছে। সুতরাং কাজে ইস্তফা দিতে গেলেই সেটা হবে অধর্ম।

এইরকমে পিঁপড়ে-সমাজের নকলে খুচরো কাজ চালাবার খুব সুবিধে, কিন্তু মানুষ হবার বিশেষ বাধা। যে মানুষ কর্তা, যে সৃষ্টি করে, এতে তার মন যায় মারা, যে মানুষ দাস, যে মজুরি করে, তারই দেহের নৈপুণ্য পাকা হয়। তাই বহুকাল থেকে ভারতবর্ষে কেবলই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। এবং সেই পুনরাবৃত্তির জাঁতা চালিয়ে চালিয়েই অস্তিত্বের প্রতি ভারতের এত বিতৃষ্ণা। তাই সে জন্ম-জন্মান্তরের পুনরাবর্তন-কল্পনায় আতঙ্কিত হয়ে সকল কর্ম ও কর্মের মূল মেরে দেবার জন্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করবার কথা ভাবছে। এই পুনরাবৃত্তির বিভীষিকা সে আপন প্রতিদিনের অভ্যাস-জড় কর্মচক্রের ঘুরপাকের মধ্যেই দেখেছে। লোকসান শুধু এইটুকু নয়, এমনি করে যারা কল বনে গেল তারা বীর্য হারালো, কোনো আপদকে ঠেকাবার শক্তিই তাদের রইল না। যুগ যুগ ধরে চতুর তাদের ঠকাচ্ছে, গুরু তাদের ভোলাচ্ছে, প্রবল তাদের কান-মলা দিচ্ছে। তারা এর কোনো অন্যথা কল্পনামাত্র করতে পারে না, কারণ তারা জানে মেরে রেখেছেন বিধাতা ; সৃষ্টির আদিকাল চতুর্মুখ তাদের চাকায় দম দিয়ে বসে আছেন, সে দম সৃষ্টির শেষকাল পর্যন্ত ফুরোবে না। একঘেয়ে কাজের জীবনমৃত্যুর ভেলার মধ্যে কালস্রোতে তাদের ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সনাতন শাস্ত্র যাই বলুন-না, সৃষ্টির গোড়ায় ব্রহ্মা মানুষকে নিয়ে যে কাণ্ড করেছিলেন এর সঙ্গে তার সম্পূর্ণই তফাত। মানুষের খোলের মধ্যে ঘূর্ণিচাকার মোটর-কল না বসিয়ে মন ব'লে অত্যন্ত ছট্‌ফটে একটা পদার্থ ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই বালাইটাকে বিদায় করতে না পারলে মানুষকে কল করে তোলা দুঃসাধ্য। ঐহিক বা পারত্রিক ভয়ে বা লোভে বা মোহমন্ত্রে এই মনটাকে আধমরা করে তবে কর্তারা এক দলের কাছে কেবলই আদায় করছেন তাঁতের কাপড়, আর-এক দলের কাছে কেবলই ঘানির তেল ; এক দল কেবলই জোগাচ্ছে তাঁদের ফরমাশের হাঁড়ি, আর-এক দল বানাচ্ছে লাঙলের ফাল ; তার পরে যদি দরকার হয় মনুষ্যোচিত কোনো বড়ো কাজে তাদের মন পেতে তারা ব'লে বসে, 'মন ? সেটা আবার কোন্ আপদ। হুকুম করো-না কেন। মন্ত্র আওড়াও।'

গাছ বসিয়ে বেড়া তৈরি করতে গেলে সব গাছকেই সমান খাটো করে ছাঁটতে হয়। তেমনি করে আমাদের এই ছাঁটা মনের মুল্লুকে মানুষের চিত্তধর্মকে যুগে যুগে দাবিয়ে রেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকেকার অবাধ্যতার যুগে এ দিকে ও দিকে তার গোটাকতক ডালপালা বিদ্রোহী হয়ে সাম্যসৌষম্যকে অতিক্রম করে যদি বেরিয়ে পড়বার দুষ্টলক্ষণ দেখায়, যদি সকলেরই মন আজ আঁধার রাতের ঝিল্লিধ্বনির মতো মৃদু গুঞ্জনে একটিমাত্র উপদেশমন্ত্রের সমতান-অনুকরণ না করে, তা হলে কেউ যেন উদ্‌বিগ্ন বা বিরক্ত না হন ; কেননা স্বরাজের জন্যে আশা করা তখনই হবে খাঁটি।

এইজন্যেই কবুল করতে লজ্জা হচ্ছে না (যদিও লোকভয় যথেষ্ট আছে) যে, এ পর্যন্ত চরকার আন্দোলনে আমার মন ভিতর থেকে দোল খায় নি। অনেকে সেটাকে আমার স্পর্ধা বলে মনে করবেন, বিশেষ রাগ করবেন। কেননা বেড়জালে যখন অনেক মাছ পড়ে, তখন যে মাছটা ফস্‌কে যায় তাকে গাল না পাড়লে মন খোলসা হয় না। তথাপি আশা করি, আমার সঙ্গে প্রকৃতিতে মেলে এমন লোকও অনেক আছেন। তাঁদের সকলকে বাছাই করে নেওয়া শক্ত ; কেননা চরকা সম্বন্ধে তাঁদের সকলের হাত চলে না, অথচ মুখ খুব মুখর বেগেই চলে।

যে-কোনো সমাজেই কর্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের উপরে বসিয়েছে, সেইখানেই মানুষের সকল বিষয়ে পরাভব।

বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে ভারতের মধ্যযুগের সাধু সাধক যাঁদেরই দেখি, যাঁরাই এসেছেন পৃথিবীতে কোনো মহাবার্তা বহন করে, তাঁরা সকলেই অমনস্ক যান্ত্রিক বাহ্যিক আচারের বিরোধী। তাঁরা সব বাধা ভেদ করে কথা কয়েছিলেন মানুষের অন্তরাত্মার কাছে। তাঁরা কৃপণের মতো, হিসাবি বিজ্ঞলোকের মতো এমন কথা বলেন নি যে, আগে বাহ্যিক, তার পরে আন্তরিক ; আগে অন্নবস্ত্র, তার পরে আত্মশক্তির পূর্ণতা। তাঁরা মানুষের কাছে বড়ো দাবি করে তাকে বড়ো সম্মান দিয়েছিলেন ; আর সেই বড়ো সম্মানের বলেই তার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন সম্পদ বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যে, গানে, নানা কারুকলায় সমাজকে সমৃদ্ধিশালী করেছিল। তাঁরা মানুষকে দিয়েছিলেন আলো, দিয়েছিলেন

জাগরণ ; অর্থাৎ তাকে দিয়েছিলেন তার আপন আত্মারই উপলব্ধি— তাতেই সব দেওয়া পূর্ণ হয়।

আজ সমস্ত দেশ জুড়ে আমাদের যদি দৈন্য এসে থাকে তা হলে জানা চাই, তার মূল আছে আমাদের ভিতরের দিকে। সেই মূল দুর্গতির একটিমাত্র বাহ্য লক্ষণ বেছে নিয়ে দেশসুদ্ধ সকলে মিলে তার উপরে একটিমাত্র বাহ্যিক প্রক্রিয়া নিয়ে পড়লে শনিগ্রহ ভয় পান না। মানুষ পাথরের মতো জড়পদার্থ হলে বাইরে হাতুড়ি ঠুকে তার মূর্তি বদল করা যেত ; কিন্তু মানুষের মূর্তিতে বাহির থেকে দৈন্য দেখা দিলে ভিতরে প্রাণশক্তির দিকে মন দেওয়া চাই— হাতুড়ি চালাতে গেলে সেই প্রাণটার উপরেই ঘা পড়বে।

একদিন মোগল-পাঠানের ধাক্কা যেই লাগল হিন্দুরাজত্বের ছোটো ছোটো আলগা পাট্‌কেলের কাঁচা ইমারত চার দিক থেকে খান্‌খান্ হয়ে ভেঙে পড়ল। দেশে তখন সুতোর অভাব ছিল না, কিন্তু সেই সুতো দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে ভাঙন বন্ধ করা যায় নি। রাজার সঙ্গে তখন আর্থিক বিরোধ ছিল না, কেননা তাঁর সিংহাসন ছিল দেশেরই মাটিতে। যেখানে ছিল গাছ তার পাকা ফল পড়ত সেইখানেই গাছতলায়। আজ আমাদের দেশে রাজা এক-আধজন নয়, একেবারে রাজার বন্যা ভারতের মাটি ধুয়ে তার ফসল ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রপারে। জমি তাতে ফলও হারায়, উর্বরতাও হারায়। এবারকার এ আঘাতও যে ঠেকাতে পারি নি তার কারণ এ নয় যে, আমাদের যথেষ্ট সুতো নেই ; কারণ এই যে, আমাদের মিল নেই, প্রাণ নেই।

কেউ কেউ বলেন, মোগল-পাঠানের আমলে আমাদের নিঃশক্তি ছিল বটে, কিন্তু অন্নবস্ত্রও তো ছিল। নদীতে জলধারা যখন কম তখনো বাঁধ দিয়ে ছোটো ছোটো কুণ্ডে হাতের কাছে দিনের কাজ চালাবার মতো জল ধরে রাখা যায়। এ দিকে বাঁধ ভেঙেছে যে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে দেনাপাওনা বন্ধ করে লুকিয়ে থাকি এমন দিন আর নেই, কখনো আসবেও না। তা ছাড়া সেরকম অবরোধই সব চেয়ে বড়ো দৈন্য। এমন অবস্থায় বিশ্বের সঙ্গে ব্যাপারের যোগ্য মনের শক্তি যদি না জাগাতে পারি, তা হলে ফসল খেয়ে যাবে অন্যে, তুঁষ পড়ে থাকবে আমাদের ভাগে। ছেলে-ভোলানো ছড়ায় বাংলাদেশে শিশুদেরই লোভ দেখানো হয় যে, হাত ঘুরোলে লাড়ু পাবার আশা আছে ; কিন্তু কেবল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত-চালানোর দ্বারা মনের নিশ্চলতার অভাব পূর্ণ হয়ে দৈন্য দূর হবে, স্বরাজ মিলবে, এমন কথা বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের বলা চলে না। বাইরের দারিদ্র্য যদি তাড়াতে চাই তা হলে অন্তরেরই শক্তি জাগাতে হবে বুদ্ধির মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে, সহযোগিতা-প্রবর্তক হৃদ্যতার মধ্যে।

তর্ক উঠবে, কাজ বাইরের থেকেও মনকে তো নাড়া দেয়। দেয় বটে, কাজের মধ্যেই যদি মনের অভিমুখে কোনো একটা চিন্তার ব্যঞ্জনা থাকে। কেরানির কাজে এটা থাকে না, এ কথা আমাদের কেরানিগিরির দেশে সকলেই জানে। সংকীর্ণ অভ্যাসের কাজে বাহ্য নৈপুণ্যই বাড়ে, আর বদ্ধ মন ঘানির অন্ধ বলদের মতো অভ্যাসের চক্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এইজন্যেই, যে-সব কাজ মুখ্যত কোনো-একটা বিশেষ শারীরিক প্রক্রিয়ার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি সকল দেশেই মানুষ তাকে অবজ্ঞা করেছে। কার্লাইল খুব চড়া গলায় dignity of labour প্রচার করেছেন ; কিন্তু বিশ্বের মানুষ যুগে যুগে তার চেয়ে অনেক বেশি চড়া গলায় indignity of labour সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। যারা মজুরি করে তারা নিতান্ত দায়ে পড়েই সমাজের বা প্রভুর, প্রবলের বা বুদ্ধিমানের, লোভে বা শাসনে নিজেদের যন্ত্র বানিয়ে তোলে। তাদেরই মন্ত্র : সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। অর্থাৎ, না খেয়ে যখন মরতেই বসেছে তখন মনটাকে বাদ দিয়েই হাত চালিয়ে পেট চালানো। তাই ব'লে মানুষের প্রধানতর অর্ধেকটা বাদ দেওয়াতেই তার dignity, এমন কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া তাকে বিদ্রূপ করা। বস্তুত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকেই এই যন্ত্রীভবনের পঙ্গুতা থেকে বাঁচাবে কিসে, এইটেই হয়েছে মস্ত সমস্যা। আমার বিশ্বাস সব বড়ো সভ্যতাই হয় মরেছে নয় জীবন্মৃত হয়েছে, অল্প লোকের চাপে বহু লোককে মন-মরা করে দেওয়াতেই। কেননা মনই মানুষের সম্পদ। মনোবিহীন মজুরির আন্তরিক অগৌরব থেকে মানুষকে কোনো বাহ্য সমাদরে বাঁচাতে পারা যায় না। যারা নিজের কাছেই নিজে ভিতর থেকে খাটো হয়ে গেছে, অন্যেরা তাদেরই খাটো করতে পারে। য়ুরোপীয়

সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চার সামনে যদি কোনো বড়ো নৈতিকসাধনা থাকে সে হচ্ছে বাহ্য প্রকৃতির হাতের সবরকম মার থেকে মানুষকে বাঁচানো, আর হচ্ছে মানুষেরই মনটাকে যন্ত্রে না বেঁধে প্রাকৃতিক শক্তিকেই যন্ত্রে বেঁধে সমাজের কাজ আদায় করা। এ কথা নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতে দূর হতে পারে না। মানুষের জানা এগিয়ে চলবে না, কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এত বড়ো কুলিগিরির সাধনা আর কিছুই নেই।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ যেদিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল সেদিন তার এক মহা দিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবা মাত্র, যে বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশই পড়ল জড়ের কাঁধে। সেই তো ঠিক, কেননা জড়ই তো শূদ্র। জড়ের তো বাহিরের সত্তার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সত্তা নেই; মানুষের আছে, তাই মানুষ মাত্রই দ্বিজ। তার বাহিরের প্রাণ অন্তরের প্রাণ, উভয়কেই রক্ষা করতে হবে। তাই জড়ের উপর তার বাহ্য কর্মভার যতটাই সে না চাপাতে পারবে, ততটাই চাপাতে হবে মানুষের উপর। সুতরাং ততটা পরিমাণেই মানুষকে জড় করে শূদ্র করে তুলতেই হবে, নইলে সমাজ চলবে না। এই-সব মানুষকে মুখে dignity দিয়ে কেউ কখনোই dignity দিতে পারবে না। চাকা অসংখ্য শূদ্রকে শূদ্রত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই চাকাই চরকায়, কুমোরের চাকে, গাড়ির তলায়, স্থূল সূক্ষ্ম নানা আকারে মানুষের প্রভূত ভার লাঘব করেছে। এই ভারলাঘবতার মতো ঐশ্বর্যের উপাদান আর নেই, এ কথা মানুষ বহুযুগ পূর্বে প্রথম বুঝতে পারলে যেদিন প্রথম চাকা ঘুরল। ইতিহাসের সেই প্রথম অধ্যায়ে যখন চরকা ঘুরে মানুষের ধন-উৎপাদনের কাজে লাগল ধন তখন থেকে চক্রবর্তী হয়ে চলতে লাগল, সেদিনকার চরকাতেই এসে থেমে রইল না। এই তথ্যটির মধ্যে কি কোনো তত্ত্ব নেই। বিষ্ণুর শক্তির যেমন একটা অংশ পদ্ম তেমনি আর-একটা অংশ চক্র। বিষ্ণুর সেই শক্তির নাগাল মানুষ যেই পেলে অমনি সে অচলতা থেকে মুক্ত হল। এই অচলতাই হচ্ছে মূল দারিদ্র্য। সকল দৈবশক্তিই অসীম, এইজন্য চলনশীল চক্রের এখনো আমরা সীমায় এসে ঠেকি নি। এমন উপদেশ যদি মেনে বসি যে, সুতো কাটার পক্ষে আদিমকালের চরকাই শেষ তা হলে বিষ্ণুর পূর্ণ প্রসন্নতা কখনোই পাব না, সুতরাং লক্ষ্মী বিমুখ হবেন। বিজ্ঞান মর্তলোকে এই বিষ্ণুচক্রের অধিকার বাড়াচ্ছে এ কথা যদি ভুলি, তা হলে পৃথিবীতে অন্য যে-সব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে তাদের চক্রান্তে আমাদের মরতে হবে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাচক্রের যে বিরাট শক্তিরূপ দেখা যায় সেটাকে যখন ভুলি, যখন কোনো এক বিশেষ কালের বিশেষ চরকাকেই সুতো কাটবার চরম উপাদান রূপে দেখি ও অভ্যস্তভাবে ব্যবহার করি, তবে চরকা ভিতরের দিক থেকে আমাদের কাছে বোবা হয়ে থাকে, তখন যে চরকা মানুষকে একদিন শক্তির পথে ধনের পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে সে আর এগোবার কথা বলে না। কানের কাছে আওয়াজ করে না তা নয়, কিন্তু মনের সঙ্গে কথা কয় না।

আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, চরকা ছাড়া আর কোনো কাজ কোরো না এমন কথা তো আমরা বলি নে। তা হতে পারে, কিন্তু আর কোনো কাজ করো এ কথাও তো বলা হয় না। সেই না-বলাটাই কি প্রবল একটা বলা নয়। স্বরাজসাধনায় একটিমাত্র কাজের হুকুম অতি নির্দিষ্ট আর তার চার দিকেই নিঃশব্দতা। এই নিঃশব্দতার পটভূমিকার উপরে চরকা কি অত্যন্ত মস্ত হয়ে দেখা দিচ্ছে না। বস্তুত সে কি এতই মস্ত। ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি লোক স্বভাবস্বাতন্ত্র্যনির্বিচারে এই ঘূর্ণ্যমান চরকার কাছে যে যতটা পারে আপন সময় ও শক্তির নৈবেদ্য সমর্পণ করবে— চরকার কি প্রকৃতই সেই মহিমা আছে। একই পূজাবিধিতে একই দেবতার কাছে সকল মানুষকে মেলবার জন্যে আজ পর্যন্ত নানা দেশে বারে বারে ডাক পড়ল। কিন্তু, তাও কি সম্ভব হয়েছে। পূজাবিধিই কি এক হল, না দেবতাই হল একটি। দেবতাকে আর দেবার্চনাকে সব মানুষের পক্ষে এক করবার জন্য কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুর অত্যাচার পৃথিবীতে চলে আসছে। কিছুতেই কিছু হল না, শুধু কি স্বরাজতীর্থের সাধনমন্দিরে একমাত্র চরকা-দেবীর কাছেই সকলের অর্ঘ্য এসে মিলবে। মানবধর্মের প্রতি এত অবিশ্বাস? দেশের লোকের

'পরে এত অশ্রদ্ধা ?

গুপী বলে আমাদের এক পশ্চিমদেশী বেহারা ছিল। ছেলেবেলায় তার কাছে গল্প শুনেছিলুম যে, যখন সে পুরীতীর্থে গিয়েছিল, জগন্নাথের কাছে কোন্ খাদ্য ফল উৎসর্গ করে দেবে এই নিয়ে তার মনে বিষম ভাবনা উপস্থিত হল। সে বার বার মনে মনে সকলরকম খাবার যোগ্য ফলের ফর্দ আউড়িয়ে যেতে লাগল। কোনোটাতেই তার মন সায় দিলে না। অবশেষে হঠাৎ মনে পড়ে গেল বিলিতি বেগুন। তখনই তার দ্বিধা গেল ঘুচে, জগন্নাথকে দিয়ে এল বিলিতি বেগুন, শেষ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে তার পরিতাপ রইল না।

সব চেয়ে সহজ দেবতার কাছে সব চেয়ে কম দেওয়ার দাবি মানুষের প্রতি সব চেয়ে অন্যায় দাবি। স্বরাজসাধনের নাম করে তেত্রিশ কোটি লোককে চরকা কাটতে বলা জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দেওয়া। আশা করি, ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি গুপী নেই। বড়ো যখন ডাক দেন তখন বড়ো দাবি করেন, তখন মানুষ ধন্য হয়। কেননা, মানুষ তখন আপন তুচ্ছতার মাঝখানে চমকে জেগে ওঠে, বুঝতে পারে সে বড়ো।

আমাদের দেশ আচারনিষ্ঠতার দেশ বলেই দেবতার চেয়ে পাণ্ডার পা-পুজোর 'পরে আমাদের ভরসা বেশি। বাহিরকে ঘুষ দিয়ে অন্তরকে তার দাবি থেকে বঞ্চিত করতে পারি, এমনতরো বিশ্বাস আমাদের ঘোচে না। আমরা মনে করি, দড়ির উপরে যদি প্রাণপণে আস্থা রাখি তা হলেই সে নাড়ী হয়ে ওঠে। এই বাহ্যিকতার নিষ্ঠা মানুষের দাসত্বের দীক্ষা। আত্মকর্তৃত্বের উপর নিষ্ঠা হারাবার এমন সাধনা আর নেই। এমন দেশে দেশ-উদ্ধারের নাম করে এল চরকা। ঘরে ঘরে বসে বসে চরকা ঘোরাচ্ছি আর মনে মনে বলছি, স্বরাজ-জগন্নাথের রথ এগিয়ে চলছে।

ঘোর পুরাতন কথাটাকে আজ নতুন করে বলতে হচ্ছে যে, স্বরাজের ভিত বাহ্য সাম্যের উপর নয়, অন্তরের ঐক্যের উপর। জীবিকার ক্ষেত্রে এই আন্তরিক ঐক্যের মস্ত একটা জায়গা আছে। বস্তুত ঐক্যটা বড়ো হতে গেলে জায়গাটা মস্ত হওয়াই চাই। কিন্তু, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা থেকে তার একটিমাত্র ভগ্নাংশকে ছাড়িয়ে তারই উপর বিশেষ ঝোঁক দিলে সুতোও মিলবে, কাপড়ও মিলবে, কেবল মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবনের মিল লক্ষের বাইরে পড়ে থাকবে।

ভারতবর্ষে ধর্মের ক্ষেত্রে সকলের মিল হওয়া সম্ভব নয় ; আর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকলেই মিলবে এমন চর্চা এখানে কোনোদিন ছিল না, সবে এর আরম্ভ হয়েছে— সাধারণের মনকে সত্য ভাবে অধিকার করতে অনেক দেরি হবে। এইজন্যেই জীবিকার ভিতের উপরে একটা বড়ো মিলের পত্তন করবার দিকেই আমাদের মন দিতে হবে। জীবিকার ক্ষেত্র সব চেয়ে প্রশস্ত, এখানে ছোটো-বড়ো জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলেরই আহ্বান আছে— মরণেরই ডাকের মতো এ বিশ্বব্যাপী। এই ক্ষেত্র যদি রণক্ষেত্র না হয়— যদি প্রমাণ করতে পারি, এখানেও প্রতিযোগিতাই মানবশক্তির প্রধান সত্য নয়, সহযোগিতাই প্রধান সত্য— তা হলে রিপুর হাত থেকে, অশান্তির হাত থেকে মস্ত একটা রাজ্য আমরা অধিকার করে নিতে পারি। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষে গ্রামসমাজে এই ক্ষেত্রে মেলবার চর্চা আমরা করেছি। সেই মিলনের সূত্র যদি-বা ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, তবু তাকে সহজে জোড়া দেওয়া চলে, কেননা আমাদের মনের স্বভাবটা অনেকটা তৈরি হয়ে আছে।

ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যেমন জীবিকা, তেমনি বিশেষ দেশগত মানুষের পক্ষে তার রাষ্ট্রনীতি। দেশের লোকের বা দেশের রাষ্ট্রনায়কদের বিষয়বুদ্ধি এই রাষ্ট্রনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে। বিষয়বুদ্ধি হচ্ছে ভেদবুদ্ধি। এ পর্যন্ত এমনিই চলছে। বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্র একান্তভাবে স্বকীয় স্বার্থসাধনের যে আয়োজনে ব্যাপৃত সেই তার রাষ্ট্রনীতি। তার মিথ্যা দলিল আর অস্ত্রের বোঝা কেবলই ভারী হয়ে উঠছে। এই বোঝা বাড়াবার আয়োজনে পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলেছে ; এর আর শেষ নেই, জগতে শান্তি নেই। যেদিন মানুষ স্পষ্ট করে বুঝবে যে, সর্বজাতীয় রাষ্ট্রিক সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন সম্ভব, কেননা পরস্পর নির্ভরতাই মানুষের ধর্ম, সেইদিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্যসাধনার ক্ষেত্র হবে। সেইদিনই সামাজিক মানুষ যে-সকল ধর্মনীতিকে সত্য বলে স্বীকার করে,

রাষ্ট্রিক মানুষও তাকে স্বীকার করবে। অর্থাৎ, পরকে ঠকানো, পরের ধন চুরি, আত্মশ্লাঘার নিরবচ্ছিন্ন চর্চা, এগুলোকে কেবল পরমার্থের নয়, ঐক্যবদ্ধ মানুষের স্বার্থেরও অন্তরায় বলে জানবে। League of Nations-এর প্রতিষ্ঠা হয়তো রাষ্ট্রনীতিতে অহমিকামুক্ত মনুষ্যত্বের আসন-প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্‌যোগ।

রাষ্ট্রনীতি যেমন একান্ত নেশন-স্বাতন্ত্র্যে, জীবিকাও তেমনি একান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ। এখানে তাই এত প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, মানুষের এত হীনতা। কিন্তু, মানুষ যখন মানুষ তখন তার জীবিকাও কেবল শক্তিসাধনার ক্ষেত্র না হয়ে মনুষ্যত্বসাধনার ক্ষেত্র হয়, এইটেই উচিত ছিল। জীবিকার ক্ষেত্রেও মানুষ কেবল আপন অন্ন পাবে তা নয় আপন সত্য পাবে, এই তো চাই। কয়েক বছর পূর্বে যেদিন সমবায়মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনে জটিল সমস্যার একটা গাঁট যেন অনেকটা খুলে গেল। মনে হল, যে জীবিকার ক্ষেত্রে স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য মানুষের সত্যকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছিল, সেখানে স্বার্থের সম্মিলন সত্যকে আজ প্রমাণ করবার ভার নিয়েছে। এই কথাই বোঝাতে বসেছে যে, দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার সম্মিলনে। সকল দিকেই মানবসভ্যতার এইটেই গোড়াকার সত্য— মনুষ্যলোকে এ সত্যের কোথাও সীমা থাকতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করি নে।

জীবিকায় সমবায়তত্ত্ব এই কথা বলে যে, সত্যকে পেলেই মানুষের দৈন্য ঘোচে, কোনো-একটা বাহ্য কর্মের প্রক্রিয়ায় ঘোচে না। এই কথায় মানুষ সম্মানিত হয়েছে। এই সমবায়তত্ত্ব একটা আইডিয়া, একটা আচার নয় ; এইজন্য বহু কর্মধারা এর থেকে সৃষ্ট হতে পারে। মনের সঙ্গে পদে পদেই এর মুকাবিলা। ইংরাজি ভাষায় যাকে আঁধা গলি বলে, জীবিকাসাধনার পক্ষে এ সেরকম পথ নয়। বুঝেছিলুম, এই পথ দিয়ে কোনো-একটি বিশেষ আকারের অন্ন নয়, স্বয়ং অন্নপূর্ণা আসবেন, যাঁর মধ্যে অন্নের সকলপ্রকার রূপ এক সত্যে মিলেছে।

আমার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায়তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময় আয়র্লন্ডের কবি ও কর্মবীর A. E.-রচিত National Being বইখানি আমার হাতে পড়ল। সমবায়জীবিকার একটা বৃহৎ বাস্তব রূপ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলুম। তার সার্থকতা যে কত বিচিত্র, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রাকে কেমন করে সে পূর্ণ করতে পারে, আমার কাছে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্নব্রহ্মও যে ব্রহ্ম, তাকে সত্য পন্থায় উপলব্ধি করলে মানুষ যে বড়ো সিদ্ধি পায়— অর্থাৎ কর্মের মধ্যে বুঝতে পারে যে, অন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদেই তার বন্ধন, সহযোগেই তার মুক্তি— এই কথাটি আইরিশ কবি-সাধকের গ্রন্থে পরিস্ফুট।

নিশ্চয় অনেকে আমাকে বলবেন, এ-সব শক্ত কথা। সমবায়ের আইডিয়াটাকে বৃহৎভাবে কাজে খাটানো অনেক চেষ্টায়, অনেক পরীক্ষায়, অনেক ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে অনেক দিনে যদি সম্ভব হয়। কথাটা শক্ত বৈকি। কোনো বড়ো সামগ্রীই সস্তা দামে পাওয়া যায় না। দুর্লভ জিনিসের সুখসাধ্য পথকেই বলে ফাঁকির পথ। চরকায় স্বরাজ পাওয়া যায় এ কথা অনেকে বলছেন, অনেকে বিশ্বাসও করছেন, কিন্তু যিনি স্পষ্ট করে বুঝেছেন এমন লোকের সঙ্গে আজও আমার দেখা হয় নি। কাজেই তর্ক চলে না ; দেশে তর্ক চলছেও না, রাগারাগি চলছে। যাঁরা তর্কে নামেন তাঁরা হিসাব করে দেখিয়ে দেন, কত চরকায় কত পরিমাণ সুতো হয়, আর কত সুতোয় কতটা পরিমাণ খদ্দর হতে পারে। অর্থাৎ, তাঁদের হিসাব-মতে দেশে এতে কাপড়ের দৈন্য কিছু ঘুচবে। তা হলে গিয়ে ঠেকে দৈন্য দূর করার কথায়।

কিন্তু, দৈন্য জিনিসটা জটিল মিশ্র জিনিস। আর, এ জিনিসটার উৎপত্তির কারণ আছে আমাদের জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির ত্রুটিতে, প্রথার দোষে ও চরিত্রের দুর্বলতায়। মানুষের সমস্ত জীবনযাত্রাকে এক করে ধরে তবে ভিতরে বাহিরে এর প্রতিকার করা যেতে পারে। কাজেই প্রশ্ন কঠিন হলে তার উত্তরটা সহজ হতে পারে না। যদি গোরা ফৌজ কামান বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করে, তবে দিশি সেপাই তীর ধনুক দিয়ে তাদের ঠেকাতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন, কেন পারবে না। দেশসুদ্ধ লোক

মিলে গোরাদের গায়ে যদি থুথু ফেলে তবে কামান বন্দুক -সমেত তাদের ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই থুথু-ফেলাকে বলা যেতে পারে দুঃখগম্য তীর্থের সুখসাধ্য পথ। আধুনিক কালের বিজ্ঞানাভিমানী যুদ্ধপ্রণালীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের পক্ষে এমন নিখুঁত অথচ সরল উপায় আর নেই, এ কথা মানি। আর এও না-হয় আপাতত মেনে নেওয়া গেল যে, এই উপায়ে সরকারি থুতকার-প্লাবনে গোরাদের ভাসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয় ; তবু মানুষের চরিত্র যারা জানে তারা এটাও জানে যে, তেত্রিশ কোটি লোক একসঙ্গে থুথু ফেলবেই না। দেশের দৈন্য-সমুদ্র সেঁচে ফেলবার উদ্দেশে চরকা-চালনা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে।

আয়র্লণ্ডে সার হরেস প্ল্যাঙ্কেট যখন সমবায়জীবিকা-প্রবর্তনে প্রথম লেগেছিলেন তখন কত বাধা কত ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, কত নূতন নূতন পরীক্ষা তাঁকে করতে হয়েছিল ; অবশেষে বহু চেষ্টার পরে সফলতার কিরকম শুরু হয়েছে National Being বই পড়লে তা বোঝা যাবে। আগুন ধরতে দেরি হয়, কিন্তু যখন ধরে তখন ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। শুধু তাই নয়, আসল সত্যের স্বরূপ এই যে, তাকে যে দেশের যে কোণেই পাওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করা যায় সকল দেশেরই সমস্যা সে সমাধান করে। সার হরেস প্ল্যাঙ্কেট যখন আয়র্লণ্ডে সিদ্ধিলাভ করলেন তখন তিনি একই কালে ভারতবর্ষের জন্যেও সিদ্ধিকে আবাহন করে আনলেন। এমনি করেই কোনো সাধক ভারতবর্ষের একটিমাত্র পল্লীতেও দৈন্য দূর করবার মূলগত উপায় যদি চালাতে পারেন, তা হলে তিনি তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীকেই চিরকালের সম্পদ দিয়ে যাবেন। আয়তন পরিমাপ করে যারা সত্যের যাথার্থ্য বিচার করে তারা সত্যকে বাহ্যিক ভাবে জড়ের সামিল করে দেখে ; তারা জানে না যে, অতি ছোটো বীজের মধ্যেও যে প্রাণটুকু থাকে সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করবার পরোয়ানা সে নিয়ে আসে।

এইমাত্র আমার একজন বন্ধু বললেন যে, দেশের সাধারণ দৈন্যদূর বা স্বরাজলাভ বললে যতখানি বোঝায় তোমার মতে চরকায় সুতো কাটার লক্ষ ততদূর পর্যন্ত নাও যদি পৌঁছয়, তাতেই বা দোষ কী। চাষের কাজ যখন বন্ধ থাকে তখন চাষীর এবং গৃহকাজ প্রভৃতি সেরেও গৃহস্থর হাতে যে উপরি সময় বাকি থাকে, তাকে সকলে মিলে কোনো সর্বজনসাধ্য লাভবান কাজে লাগালে সাধারণের অবস্থার অনেক উন্নতি হতে পারে, দেশে চরকা চলিত করার এই শুভ ফলটুকুই ধরে নাও-না কেন। মনে আছে, এইজাতীয় আর-একটা কথা পূর্বে শুনেছিলুম। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেই ভাতের ফেন ফেলে দিয়ে থাকে। তার দ্বারা সমস্ত ভারত জুড়ে যে পুষ্টিকর খাদ্য নষ্ট হয়, তা সকলে মিলেই যদি রক্ষা করি তা হলে মোটের উপরে অনেকটা অন্নকষ্ট দূর হতে পারে। কথাটার মধ্যে সত্য আছে। ফেন-সমেত ভাত খেতে পেলে অভ্যস্ত রুচির কিছু বদল করা চাই, কিন্তু ফলের প্রতি লক্ষ করে দেখলে সেটা দুঃসাধ্য হওয়া উচিত নয়। এইরকম এমন আরো অনেক জিনিস আছে যাকে আমাদের দৈন্যলাঘব-উপায়ের তালিকার মধ্যে ধরা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে যাঁরা যেটা ভালো বোঝেন চালাতে চেষ্টা করুন-না, তার কোনোটাতে ধন বাড়বে, কোনোটাতে তার সঙ্গে পুষ্টিও বাড়বে, কোনোটাতে কিছু পরিমাণে আলস্যদোষ কেটে যাবে। কিন্তু দেশে স্বরাজ-লাভের যে-একটা বিশেষ উদ্‌যোগ চলছে, দেশসুদ্ধ সকলে মিলে ভাতের ফেন না ফেলাকে তার একটা সর্বপ্রধান অঙ্গস্বরূপ করার কথা কারও তো মনেও হয় না। তার কি কোনো কারণ নেই। এ সম্বন্ধে আমার কথাটা পরিষ্কার করবার জন্যে ধর্মসাধনার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এই সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার উপলক্ষেই যদি বিশেষ জোর দিয়ে হাজারবার করে বলা হয় যে, যার-তার কুয়ো থেকে জল খেলে ধর্মভ্রষ্টতা ঘটে, তবে তার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, এমন উপদেশে ধর্মসাধনার নৈতিক পন্থার মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়। যার-তার কুয়োতে মলিনতা থাকার আশঙ্কা আছে, সেই মলিনতায় স্বাস্থ্য ক্লিষ্ট হয়, স্বাস্থ্যের বিকারে চিত্তের বিকার ঘটে, সেই বিকারে ধর্মহানি হওয়ার আশঙ্কা আছে— এ-সব কথাই সত্য বলে মানলেও তবু বলতেই হবে, অপ্রধানকে পরিমাণ-অতিরিক্ত মূল্য দিলে তাতে প্রধানের মূল্য কমে যায়। সেইজন্যেই আমাদের দেশে এমন অসংখ্য লোক আছে, মুসলমান যাদের কুয়ো থেকে জল তুলতে এলে মুসলমানকে মেরে খুন করতে যারা কুণ্ঠিত হয় না। ছোটোকে বড়োর সমান আসন দিলে সে সমান

থাকে না, সে বড়োকে ছাড়িয়ে যায়। এইজন্যেই জলের শুচিতা-রক্ষার ধর্মবিধি মানুষের প্রাণহিংসা না করার ধর্মবিধিকে অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। আমাদের দেশে নিত্যধর্মের সঙ্গে আচারধর্মকে মিলিয়ে দেওয়ার দ্বারা এরকম দুর্গতি যে কত ঘটছে, তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের এই মজ্জাগত সনাতন অভ্যাসেরই জোরে আজ চরকা খদ্দর সর্বপ্রধান স্বারাজিক ধর্মকর্মের বেশে গদা হাতে বেড়াতে পারল, কেউ তাতে বিশেষ বিস্মিত হল না। এই প্রাধান্যের দ্বারাতেই সে অনিষ্ট করছে, আমাদের দেশে বহুযুগসঞ্চারী দুর্বলতার আর-একটা নতুন খাদ্য জুগিয়ে দিচ্ছে। এর পরে আর-একদিন আর-কোনো বলশালী ব্যক্তি হয়তো স্বারাজ্য-সিংহাসন থেকে প্রচার করবেন যে, ভাতের ফেন যে ফেলে দেয় সেই অন্নঘাতীকে মন্ত্রণাসভায় ঢুকতে দেব না। তাঁর যদি যথেষ্ট জোর থাকে এবং তাঁর শাসন যদি বেশি দিন চলে তবে আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে একদিন সাধুলোকে নিজেদের শুচিতারক্ষার জন্যে ভাতের ফেন-পাত উপলক্ষে মানুষের রক্তপাত করতে থাকবে। বিদেশী কাপড় পরায় অশুচিতা ঘটে এই নিষেধ যদি দেশের অধিকাংশ লোকে গ্রহণ করে, এবং অন্ন জল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অশুচিতা বোধের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কারগত হয়ে ওঠে, তা হলে সেদিন ঈদের দিনে কলকাতায় যেরকম মাথা-ফাটাফাটি হয়েছে এ নিয়েও একদিন ম্লেচ্ছ ও অম্লেচ্ছদের মধ্যে তেমনি সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব বেধে যাবে। যে আচারপরায়ণ সংস্কারের অন্ধতা থেকে আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতারীতির উৎপত্তি সে অন্ধতাই আজ রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে চরকা-খাদ্দরিক অস্পৃশ্যতা-তত্ত্ব জাগিয়ে তুলছে।

কেউ কেউ বলবেন, তুমি যে সমবায়জীবিকার কথা বলছ সকলে মিলে চরকা কাটাই তো তাই। আমি তা মানি না। সমস্ত হিন্দুসমাজে মিলে কুয়োর জলের শুচিতা রক্ষা করলেও সেটা জীবাণুতত্ত্বমূলক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হয়ে ওঠে না ; ওটা একটা কর্ম, ওটা একটা সত্য নয়। এইজন্যেই কুয়োর জল যখন শুচি থাকছে পুকুরের জল তখন মলিন হচ্ছে, ঘরের কানাচের কাছে গর্তয় ডোবায় তখন রোগের বীজাণু অপ্রতিহত প্রভাবে যমরাজের শাসন প্রচার করছে। আমাদের দেশে কাসুন্দি তৈরি করবার সময় আমরা অত্যন্ত সাবধান হই— এই সাবধানতার মূলে প্যাস্টার-আবিষ্কৃত তত্ত্ব আছে, কিন্তু যেহেতু তত্ত্বটা রোগের বীজাণুর মতোই অদৃশ্য আর বাহ্য কর্মটা পরিস্ফীত পিলেটারই মতো প্রকাণ্ড সেইজন্যেই এই কর্মপ্রণালীতে কেবলমাত্র কাসুন্দিই বাঁচছে, মানুষ বাঁচছে না। একমাত্র কাসুন্দি তৈরি করবার বেলাতেই বিশ্বসুদ্ধ লোকে মিলে নিয়ম মানার মতোই, একমাত্র সুতো তৈরির বেলাতেই তেত্রিশ কোটি লোকে মিলে বিশেষ আচার রক্ষা। তাতে সুতো অনেক জমবে, কিন্তু যুগে যুগে যে অন্ধতা জমে উঠে আমাদের দারিদ্র্যকে গড়বন্দী করে রেখেছে তার গায়ে হাত পড়বে না।

মহাত্মাজির সঙ্গে কোনো বিষয়ে আমার মতের বা কার্যপ্রণালীর ভিন্নতা আমার পক্ষে অত্যন্ত অরুচিকর। বড়ো করে দেখলে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তবু সব সময়ে মন মানে না। কেননা, যাঁকে প্রীতি করি, ভক্তি করি, তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার মতো আনন্দ আর কী হতে পারে। তাঁর মহৎ চরিত্র আমার কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়। ভারতের ভাগ্যবিধাতা তাঁর হাত দিয়ে একটি দীপ্যমান দুর্জয় দিব্যশক্তি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই শক্তি ভারতবাসীকে অভিভূত না করুক, বলশালী করুক ; তাকে নিজের মন দিয়ে চিন্তা করতে, সংকল্প করতে, ত্যাগ করতে শিক্ষা দিক— এই আমার কামনা। যে কারণ ভিতরে থাকাতে রামমোহন রায়ের মতো অত বড়ো মনস্বীকেও মহাত্মা বামন বলতে কুণ্ঠিত হন নি— অথচ আমি সেই রামমোহনকে আধুনিক যুগের মহত্তম লোক বলেই জানি— সেই আভ্যন্তরিক মনঃপ্রকৃতিগত কারণেই মহাত্মাজির কর্মবিধিতে এমন রূপ ধারণ করেছে যাকে আমার স্বধর্ম আপন বলে গ্রহণ করতে পারছে না। সেজন্যে আমার খেদ রয়ে গেল। কিন্তু, সাধনার বিচিত্র পথই বিধাতার অভিপ্রেত, নইলে প্রকৃতিভেদ জগতে কেন থাকবে। ব্যক্তিগত অনুরাগের টানে মহাত্মাজির কাছ থেকে চরকায় দীক্ষা নেবার প্রবল ইচ্ছা বারে বারে আমার মনে এসেছে। কিন্তু, আমার বুদ্ধিবিচারে চরকার যতটুকু মর্যাদা তার চেয়ে পাছে বেশি স্বীকার করা হয়, এই ভয়ে অনেক দ্বিধা করে নিরস্ত হয়েছি। মহাত্মাজি আমাকে ঠিক বুঝবেন জানি, এবং পূর্বেও বার বার

আমার প্রতি যেমন ধৈর্য রক্ষা করেছেন আজও করবেন ; আচার্য রায়মশায়ও জনাদর নিরপেক্ষ মত-স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করেন, অতএব মাঝে মাঝে বক্তৃতাসভায় যদিচ মুখে তিনি আমাকে অকস্মাৎ তাড়না করে উঠবেন, তবু অন্তরে আমার প্রতি নিষ্করুণ হবেন না। আর, যাঁরা আমার দেশের লোক, যাঁদের চিত্তস্রোত বেয়ে উপকার আর অপকার উভয়েরই কত স্মৃতি অতলের মধ্যে তলিয়ে গেল, তাঁরা আজ আমাকে যদি ক্ষমা না করেন কাল সমস্তই ভুলে যাবেন। আর যদি-বা না ভোলেন, আমার কপালে তাঁদের হাতের লাঞ্ছনা যদি কোনোদিন নাও ঘোচে, তবে আজ যেমন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথকে লাঞ্ছনার সঙ্গী পেয়েছি কালও তেমনি হয়তো এমন কোনো কোনো স্বদেশের অনাদৃত লোককে পাব যাঁদের দীপ্তি দ্বারা লোকনিন্দা নিন্দিত হয়।

ভাদ্র ১৩৩২

স্বরাজসাধন

আমাদের দেশে বিজ্ঞ লোকেরা সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন যে, যত খুশি কথায় বলো, লেখায় লিখো না। আমি এ উপদেশ মানি নি, তার ভূরি প্রমাণ আছে। কিছু পরিমাণে মেনেওছি, সে কেবল উত্তর লেখা সম্বন্ধে। আমার যা বলবার তা বলতে কসুর করি নে ; কিন্তু বাদ যখন প্রতিবাদে পৌঁছয় তখন কলম বন্ধ করি। যতরকম লেখার বায়ু আছে ছন্দে এবং অছন্দে সকলেরই প্রভাব আমার উপর আছে— কেবল উত্তরবায়ুটাকে এড়িয়ে চলি।

মত বলে যে-একটা জিনিস আমাদের পেয়ে বসে সেটা অধিকাংশ স্থলেই বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে গড়া নয়, তার মধ্যে অনেকটা অংশ আছে যেটাকে বলা যায় আমাদের মেজাজ। যুক্তি পেয়েছি বলে বিশ্বাস করি, সেটা অল্প ক্ষেত্রেই, বিশ্বাস করি বলেই যুক্তি জুটিয়ে আনি, সেইটেই অনেক ক্ষেত্রে। একমাত্র বৈজ্ঞানিক মতই খাঁটি প্রমাণের পথ দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছয় ; অন্য জাতের মতগুলো বারো-আনাই রাগ-বিরাগের আকর্ষণে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে।

এ কথাটা খুবই খাটে, যখন মতটা কোনো ফললাভের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর সেই লোভ যখন বহুসংখ্যক লোকের মনকে অধিকার করে। সেই বহু লোকের লোভকে উত্তেজিত করে তাদের তাড়া লাগিয়ে কোনো একটা পথে প্রবৃত্ত করতে যুক্তির প্রয়োজন হয় না ; কেবল পথটা খুব সহজ হওয়া চাই, আর চাই দ্রুত ফললাভের আশা। খুব সহজে এবং খুব শীঘ্র স্বরাজ পাওয়া যেতে পারে, এই কথাটা কিছুদিন থেকে দেশের মনকে মাতিয়ে রেখেছে। গণমনের এইরকম ঝোড়ো অবস্থায় এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ উত্তর-প্রত্যুত্তর কেবলমাত্র বাগ্‌বিতণ্ডার সাইক্লোন আকার ধরে ; সেই হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে কোনো মতকে কোনো বন্দরে পৌঁছিয়ে দেওয়া সহজ নয়। বহুকাল থেকে আমাদের ধারণা ছিল স্বরাজ পাওয়া দুর্লভ ; এমন সময়ে যেই আমাদের কানে পৌঁছল যে, স্বরাজ পাওয়া খুবই সহজ এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাওয়া অসাধ্য নয় তখন এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে বিচার করতে লোকের রুচি রইল না। তামার পয়সাকে সন্ন্যাসী সোনার মোহর করে দিতে পারে এ কথায় যারা মেতে ওঠে তারা বুদ্ধি নেই বলেই যে মাতে তা নয়, লোভে পড়ে বুদ্ধি খাটাতে ইচ্ছে করে না বলেই তাদের এত উত্তেজনা।

অল্প কিছুদিন হল, স্বরাজ হাতের কাছে এসে পৌঁচেছে বলে দেশের লোক বিচলিত হয়ে উঠেছিল। তার পরে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কথা উঠল, শর্ত পালন করা হয় নি বলেই আমরা বঞ্চিত হয়েছি। এ কথা খুব অল্প লোকেই ভেবে দেখলেন যে, আমাদের সমস্যাই হচ্ছে শর্ত-প্রতিপালন নিয়ে। স্বরাজ পাবার শর্ত আমরা পালন করি নে বলেই স্বরাজ পাই নে, এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধ। হিন্দু-মুসলমানে যদি আত্মীয়ভাবে মিলতে পারে তা হলে স্বরাজ পাবার একটা বড়ো ধাপ তৈরি হয়, কথাটা বলাই বাহুল্য।

ঠেকছে ঐখানেই যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলন হল না ; যদি মিলত তবে পাঁজিতে প্রতি বৎসরে যে ৩৬৫ দিন আছে সব কটা দিনই হত শুভদিন। এ কথা সত্য যে, পাঁজিতে দিন স্থির করে দিলে নেশা লাগে, তাই বলে নেশা লাগলেই যে পথ সহজ হয় তা বলতে পারি নে।

পাঁজির নির্দিষ্ট দিন অনেক কাল হল ভেসে চলে গেছে, কিন্তু নেশা ছোটে নি। সেই নেশার বিষয়টা এই যে, স্বরাজিয়া সাধন হচ্ছে সহজিয়া সাধন। একটি বা দুটি সংকীর্ণ পথই তার পথ। সেই পথের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে চরকা।

তা হলেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়, স্বরাজ জিনিসটা কী। আমাদের দেশনায়কেরা স্বরাজের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নি। স্বাধীনতা শব্দটার মানে বিস্তৃত। নিজের চরকায় নিজের সুতো কাটার স্বাধীনতা আমাদের আছে। কাটি নে তার কারণ কলের সুতোর সঙ্গে সাধারণত চরকার সুতো পাল্লা রাখতে পারে না। হয়তো পারে, যদি ভারতের বহু কোটি লোক আপন বিনা মূল্যের অবসরকাল সুতো কাটায় নিযুক্ত করে চরকার সুতোর মূল্য কমিয়ে দেয়। এটা যে সম্ভবপর নয় তার প্রমাণ এই যে, বাংলাদেশে যাঁরা চরকার পক্ষে লেখনী চালাচ্ছেন তাঁরা অনেকেই চরকা চালাচ্ছেন না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, দেশে সকলে মিলে চরকা চালালে অর্থকষ্ট কিছু দূর হতে পারে। কিন্তু সেও স্বরাজ নয়। না হোক, সেটা অর্থ বটে তো। দারিদ্র্যের পক্ষে সেই বা কম কী। দেশের চাষীরা তাদের অবসরকাল বিনা উপার্জনে নষ্ট করে ; তারা যদি সবাই সুতো কাটে তা হলে তাদের দৈন্য অনেকটা দূর হয়।

স্বীকার করে নেওয়া যাক, এও একটা বিশেষ সমস্যা বটে। চাষীদের উদ্‌বৃত্ত সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে। কথাটা শুনতে যত সহজ তত সহজ নয়। এই সমস্যার সমাধানভার যদি নিতেই হয়, তবে এ সম্বন্ধে বুদ্ধির দুরূহ সাধনা দরকার। সংক্ষেপে বলে দিলেই হল না— ওরা চরকা কাটুক।

চাষী চাষ করা কাজের নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা আপনার মনকে ও দেহকে একটা বিশেষ প্রবণতা দিয়েছে। চাষের পথই তার সহজ পথ। যখন সে চাষ করে তখনই সে কাজ করে, যখন চাষ করে না তখন কাজ করে না। কুঁড়ে বলে কাজ করে না, এ অপবাদ তাকে দেওয়া অন্যায়। যদি সংবৎসর তার চাষ চলতে পারত, তা হলে বছর ভরেই সে কাজ করত।

চাষ প্রভৃতি হাতের কাজের প্রকৃতিই এই যে, তাতে চালনার অভাবে মনকে নিশ্চেষ্ট করে দেয়। একটা চিরাভ্যস্ত কাজের থেকে আর-একটা ভিন্ন প্রকৃতির কাজে যেতে গেলেই মনের সক্রিয়তা চাই। কিন্তু চাষ প্রভৃতি মজুরির কাজ লাইন-বাঁধা কাজ। তা চলে ট্রামগাড়ির মতো। হাজার প্রয়োজন হলেও লাইনের বাইরে নতুন পথ তার পক্ষে সহজ নয়। চাষীকে চাষের বাইরে যে কাজ করতে বলা যায় তাতে তার মন ডিরেল্‌ড্‌ হয়ে যায়। তবু ঠেলেঠুলে তাকে হয়তো নড়ানো যেতে পারে, কিন্তু তাতে শক্তির বিস্তর অপব্যয় ঘটে।

বাংলাদেশের অন্তত দুই জেলার চাষীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অভ্যাসের বাঁধন তাদের পক্ষে যে কত কঠিন তার অভিজ্ঞতা আমার আছে। এক জেলা এক-ফসলের দেশ। সেখানে ধান উৎপন্ন করতে চাষীরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। তার পরে তাদের ভিটের জমিতে তারা অবসরকালে সব্‌জি উৎপন্ন করতে পারত। উৎসাহ দিয়েছিলুম, ফল পাই নি। যারা ধান চাষের জন্য প্রাণপণ করতে পারে, তারা সব্‌জি চাষের জন্য একটুও নড়ে বসতে চায় না। ধানের লাইন থেকে সব্‌জির লাইনে তাদের মনকে ঠেলে তোলা কঠিন।

আর-এক জেলায় চাষী ধান পাট আখ সর্ষে প্রভৃতি সকলরকম চাষেই লেগে আছে। কিন্তু যে জমিতে এ-সব শস্য সহজে হয় না সে জমি তাদের বৃথা পড়ে থাকে, তার খাজনা বহন করে চলে। অথচ বৎসরে বৎসরে পশ্চিম অঞ্চল থেকে চাষী এসে এই জমিতেই তরমুজ খরমুজ কাঁকুড় প্রভৃতি ফলিয়ে যথেষ্ট লাভ করে নিয়ে দেশে ফিরে যায়। তবু স্থানীয় চাষী এই অনভ্যস্ত ফসল ফলিয়ে অবস্থার উন্নতি করতে বিমুখ। তাদের মন সরে না। যে চাষী পাটের ফলন করে তাকে স্বভাবত অলস বলে বদনাম দেওয়া চলে না। শুনেছি পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও কোথাও পাট উৎপন্ন করা কঠিন নয়,

কিন্তু সেখানকার লোকেরা পাট প্রস্তুত করার দুঃসাধ্য দুঃখ বহন করতে নারাজ। বাংলাদেশে যে পাট একচেটে তার একমাত্র কারণ এখানকার জমিতে নয়, এখানকার চাষীতে। অথচ আমি দেখেছি, এই চাষীই তার বালুজমিতে তরমুজ ফলিয়ে লাভ করবার দৃষ্টান্ত বৎসর বৎসর স্বচক্ষে দেখাসত্ত্বেও এই অনভ্যস্ত পথে যেতে চায় না।

যখন কোনো-একটা সমস্যার কথা ভাবতে হয় তখন মানুষের মনকে কী করে এক পথ থেকে আর-এক পথে চালানো যায় সেই শক্ত কথাটা ভাবতে হয়, কোনো-একটা সহজ উপায় বাহ্যিকভাবে বাতলিয়ে দিলেই যে কাজ হাসিল হয় তা বিশ্বাস করি নে— মানুষের মনের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করাই হল গোড়ার কাজ। হিন্দু-মুসলমানের মিলন হোক, বাহিরের দিক্‌ থেকে এই পরোয়ানা জাহির করা কঠিন নয়। এই উপলক্ষে হিন্দুরা খিলাফৎ-আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, কেননা সেরকম যোগ দেওয়া খুবই সহজ। এমন-কি, নিজেদের আর্থিক সুবিধাও মুসলমানদের জন্য অনেক পরিমাণে ত্যাগ করতে পারে; সেটা দুরূহ সন্দেহ নেই, তবু "এহ বাহ্য"। কিন্তু, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উদ্দেশে পরস্পরের মনের চিরাগত সংস্কারের পরিবর্তন করা সহজ নয়। সমস্যাটা সেইখানেই ঠেকেছে। হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি, আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের— স্বরাজপ্রাপ্তির লোভেও এ কথাটা ভিতর থেকে উভয় পক্ষের কেউ তুলতে পারে না। আমি একজন ইংরেজিনবিশের কথা জানতেম, হোটেলের খানার প্রতি তাঁর খুব লোভ ছিল। তিনি আর-সমস্তই রুচিপূর্বক আহার করতেন, কেবল গ্রেট-ইস্টার্নের ভাতটা বাদ দিতেন; বলতেন, মুসলমানের রান্না ভাতটা কিছুতেই মুখে উঠতে চায় না। যে সংস্কারগত কারণে ভাত খেতে বাধে সেই সংস্কারগত কারণেই মুসলমানের সঙ্গে ভালো করে মিলতে তাঁর বাধবে। ধর্মনিয়মের আদেশ নিয়ে মনের যে-সকল অভ্যাস আমাদের অন্তর্নিহিত সেই অভ্যাসের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের দৃঢ়তা আপন সনাতন কেল্লা বেঁধে আছে; খিলাফতের আনুকূল্য বা আর্থিক ত্যাগস্বীকার সেই অন্দরে গিয়ে পৌঁছয় না।

আমাদের দেশের এই-সকল সমস্যা আন্তরিক বলেই এত দুরূহ। বাধা আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আছে; সেটা দূর করবার কথা বললে আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই কারণে একটা অত্যন্ত সহজ বাহ্যিক প্রণালীর কথা শুনলেই আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ঠিক পথে অর্থ-উপার্জনের বাধা যার অন্তরের মধ্যে আছে সেই ব্যক্তিই জুয়ো খেলে রাতারাতি বড়োমানুষ হবার দুরাশায় নিজের সর্বনাশ করতেও প্রস্তুত হয়।

চরকা কাটা স্বরাজ-সাধনার প্রধান অঙ্গ এ কথা যদি সাধারণে স্বীকার করে তবে মানতেই হয়, সাধারণের মতে স্বরাজটা একটা বাহ্য ফললাভ। এইজন্যই দেশের মঙ্গলসাধনে আত্মপ্রভাবের যে-সকল চরিত্রগত ও সামাজিক প্রথাগত বাধা আছে সেই প্রধান বিষয় থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে এনে চরকা-চালনার উপরে তাকে অত্যন্ত নিবিষ্ট করলে লোকে বিস্মিত হয় না, বরঞ্চ আরাম পায়। এমন অবস্থায় ধরেই নেওয়া যাক যে, চাষীরা তাদের অবসরকাল যদি লাভবান কাজে লাগায় তা হলে আমাদের স্বরাজ-লাভের একটা প্রধান অন্তরায় দূর হতে পারে; ধরেই নেওয়া যাক, এই বাহ্যিক ব্যাপারটাই আমাদের দেশে সব চেয়ে আজ পরম চিন্তনীয়।

তা হলে দেশনায়কদের ভাবতে হবে, চাষীদের অবকাশকালকে সম্যক্‌রূপে কী উপায়ে খাটানো যেতে পারে। বলা বাহুল্য, চাষের কাজে খাটাতে পারলেই ঠিক রাস্তাটা পাওয়া যায়। আমার যদি কঠিন দৈন্যসংকট ঘটে তবে আমার পরামর্শদাতা হিতৈষীকে এই কথাই সর্বাগ্রে চিন্তা করতে হবে যে, আমি দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যরচনাতেই অভ্যস্ত। বাগ্‌ব্যবসায়ের প্রতি তাঁর যতই অশ্রদ্ধা থাক্‌, আমার উপকার করতে চাইলে এ কথা তিনি উড়িয়ে দিতে পারবেন না। তিনি হয়তো হিসাব খতিয়ে আমাকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারেন যে, ছাত্রদের জন্যে কলেজ-পাড়ায় যদি চায়ের দোকান খুলি তা হলে শতকরা ৭৫ টাকা হারে মুনফা হতে পারে। হিসাব থেকে মানুষের মনটাকে বাদ দিলে লাভের অঙ্কটাকে খুব বড়ো করে দেখানো সহজ। চায়ের দোকান করতে গিয়ে আমি যে নিজেকে সর্বস্বান্ত করতে পারি তার কারণ এ নয় যে, সুযোগ্য চা-ওয়ালার মতো আমার বুদ্ধি নেই, তার কারণ

চা-ওয়ালার মতো আমার মন নেই। অতএব হিতৈষী বন্ধু যদি আমাকে ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখতে বা স্কুলকলেজ-পাঠ্য বিষয়ের নোট লিখতে বলেন, তবে নিতান্ত দায়ে ঠেকলে হয়তো সেটা চেষ্টা দেখতে পারি। আমার বিশ্বাস, চায়ের দোকান খোলার চেয়ে তাতে আমার সর্বনাশের সম্ভাবনা কম হবে। লাভের কথায় যদি-বা সন্দেহ থাকে, অন্তত এ কথা নিশ্চিত যে, সাহিত্যিকের মনটাকে কাব্যের লাইন থেকে ডিটেক্‌টিভ গল্পের লাইনে সুইচ করে দেওয়া দুঃসাধ্য নয়।

চিরজীবন ধরে চাষীর দেহমনের যে শিক্ষা ও অভ্যাস হয়েছে তার থেকে তাকে অকস্মাৎ ঠেলে ফেলে দিয়ে তাকে সুখী বা ধনী করা সহজ নয়। পূর্বেই বলেছি, মনের চর্চা যাদের কম গোঁড়ামি তাদের বেশি, সামান্য পরিমাণ নূতনত্বেও তাদের বাধে। নিজের প্ল্যানের অত্যন্ত সহজত্বের প্রতি অনুরাগ-বশত মনস্তত্ত্বের এই নিয়মটা গায়ের জোরে লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করলে তাতে মনস্তত্ত্ব অবিচলিত থাকবে, প্ল্যানটা জখম হবে।

চাষীকে চাষের পথে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে চরিতার্থ করবার চেষ্টা অন্যান্য কোনো কোনো কৃষিক্ষেত্রবহুল দেশে চলেছে। সে-সব জায়গায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ চাষের বিস্তর উন্নতি করেছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, তারা তাদের জমি থেকে আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ চারগুণ বেশি ফসল আদায় করছে। এই জ্ঞানালোকিত পথ সহজ পথ নয়, সত্য পথ। এই পথ-আবিষ্কারে মনুষ্যত্বের প্রমাণ হয়। চাষের উৎকর্ষ-উদ্ভাবনের দ্বারা চাষীর উদ্যমকে ষোলো-আনা খাটাবার চেষ্টা না করে তাকে চরকা ঘোরাতে বলা শক্তিহীনতার পরিচয়। আমরা চাষীকে অলস বলে দোষ দিই, কিন্তু তার অবস্থার উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে আমরা যখন তাকে চরকা ধরতে পরামর্শ দিই তখন সেটাতে আমাদেরই মানসিক আলস্যের প্রমাণ হয়।

এতক্ষণ এই যা আলোচনা করা গেল এটা এই মনে করেই করেছি যে, সুতো ও খদ্দর বহুল পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হলে তাতে একদল শ্রমিকের অর্থকষ্ট দূর হবে। কিন্তু, সেও মেনে-নেওয়া কথা। এ সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেও থাকেন ; আমার মতো আনাড়ির সে তর্কে প্রবেশ করে কাজ নেই। আমার নালিশ এই যে, চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত করে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

দেশের কল্যাণ বলতে যে কতখানি বোঝায় তার ধারণা আমাদের সুস্পষ্ট হওয়া চাই। এই ধারণাকে অত্যন্ত বাহ্যিক ও অত্যন্ত সংকীর্ণ করার দ্বারা আমাদের শক্তিকে ছোটো করে দেওয়া হয়। আমাদের মনের উপর দাবি কমিয়ে দিলে অলস মন নির্জীব হয়ে পড়ে। দেশের কল্যাণসাধনায় চরকাকে প্রধান স্থান দেওয়া অবমানিত মনকে নিশ্চেষ্ট করে তোলবার উপায়। দেশের কল্যাণের একটা বিশ্বরূপ মনের সম্মুখে উজ্জ্বল করে রাখলে, দেশের লোকের শক্তির বিচিত্র ধারা সেই অভিমুখে চলবার পথ সমস্ত হৃদয় ও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা খনন করতে পারে। সেই রূপটিকে যদি ছোটো করি আমাদের সাধনাকেও ছোটো করা হবে। পৃথিবীতে যারা দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে দুঃসাধ্য ত্যাগস্বীকার করেছে তারা দেশের বা মানুষের কল্যাণছবিকে উজ্জ্বল আলোয় বিরাটরূপে ধ্যাননেত্রে দেখেছে। মানুষের ত্যাগকে যদি চাই তবে তার সেই ধ্যানের সহায়তা করা দরকার। বহুল পরিমাণ সুতো ও খদ্দরের ছবি দেশের কল্যাণের বড়ো ছবি নয়। এ হল হিসাবি লোকের ছবি ; এতে সেই প্রকাণ্ড বেহিসাবি শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে না যা বৃহতের উপলব্ধিজনিত আনন্দে কেবল যে দুঃখকে মৃত্যুকেও স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় তা নয়, লোকের প্রত্যাখ্যান ও ব্যর্থতাকেও গ্রাহ্য করে না।

শিশু আনন্দের সঙ্গে ভাষা শিক্ষা করে। কেননা সে আপন বাপের মুখে মায়ের মুখে সর্বদাই ভাষার সমগ্র রূপটা দেখতে পায়। যখন সে স্পষ্ট করে বুঝতেও পারে না, তখনো এইটেই তাকে কেবলই আকর্ষণ করে। তাই এই প্রকাশের পূর্ণতা লাভের জন্য নিয়তই তার একটি আনন্দময় চেষ্টা জেগে থাকে। শিশুর মনকে বেষ্টন করে যদি এই পরিপূর্ণ ভাষা সর্বদাই বিরাজ না করত, যদি তার চার দিকে কেবলই ঘুরতে থাকত মুগ্ধবোধব্যাকরণের সূত্র, তা হলে বেতের চোটে কাঁদিয়ে তাকে মাতৃভাষা শেখাতে হত, এবং তাও শিখতে লাগত বহু দীর্ঘকাল।

এই কারণে আমি মনে করি, দেশকে যদি স্বরাজসাধনায় সত্য ভাবে দীক্ষিত করতে চাই তা হলে সেই স্বরাজের সমগ্র মূর্তি প্রত্যক্ষগোচর করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। অল্পকালেই সেই মূর্তির আয়তন যে খুব বড়ো হবে এ কথা বলি নে ; কিন্তু তা সম্পূর্ণ হবে, সত্য হবে, এ দাবি করা চাই। প্রাণবিশিষ্ট জিনিসের পরিণতি প্রথম থেকেই সমগ্রতার পথ ধরে চলে। তা যদি না হত তা হলে শিশু প্রথমে কেবল পায়ের বুড়ো আঙুল হয়ে জন্মাত ; তার পরে সেটা ধীরে ধীরে হত হাঁটু পর্যন্ত পা ; তার পরে ১৫।২০ বছরে সমগ্র মানবদেহটা দেখা দিত। শিশুর মধ্যে সমগ্রতার আদর্শ প্রথম থেকেই আছে, তাই তার মধ্যে আমরা এত আনন্দ পাই। সেই আনন্দে তাকে মানুষ করে তোলবার কঠিন দুঃখও মা-বাপ স্বীকার করতে পারে। নইলে যদি একখানা আজানু পা নিয়েই তাদের চার-পাঁচ বছর কাটাতে হত, তা হলে সেই আংশিকের দাসত্ব তাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠত।

স্বরাজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকায় সুতো আকারেই দেখতে থাকি তা হলে আমাদের সেই দশাই হবে। এইরকম অন্ধ সাধনায় মহাত্মার মতো লোক হয়তো কিছুদিনের মতো আমাদের দেশের একদল লোককে প্রবৃত্ত করতেও পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের 'পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে। এইজন্যে তাঁর আদেশ পালন করাকেই অনেকে ফললাভ বলে গণ্য করে। আমি মনে করি, এরকম মতি স্বরাজলাভের পক্ষে অনুকূল নয়।

স্বদেশের দায়িত্বকে কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোটো ছোটো আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেকগুলি ব্যাপারের সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের একটাকে পৃথক করে নিলে ফল পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে। স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই। সহস্র উপদেশের চেয়ে তাতে আমরা কাজ পাব। বিশেষ বিশেষ লোকালয়ে সাধারণের কল্যাণসাধনের দায়িত্ব প্রত্যেকে কোনো না-কোনো আকারে গ্রহণ করে একটি সুস্থ জ্ঞানবান শ্রীসম্পন্ন সম্মিলিত প্রাণযাত্রার রূপকে জাগিয়ে তুলেছে, এমন-সকল দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ধরা দরকার। নইলে স্বরাজ কাকে বলে সে আমরা সুতো কেটে, খদ্দর 'পরে, কথার উপদেশ শুনে কিছুতেই বোঝাতে পারব না। যে জিনিসটাকে সমস্ত ভারতবর্ষে পেতে চাই ভারতবর্ষের কোনো-একটা ক্ষুদ্র অংশে তাকে যদি স্পষ্ট করে দেখা যায়, তা হলে সার্থকতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জন্মাবে। তা হলে আত্মপ্রভাবের যে কী মূল্য তা বুঝতে পারব ; ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, বুঝব তার সাক্ষাৎ দর্শনের দ্বারা। ভারতবর্ষের একটিমাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্মশক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন করতে পারে তা হলেই স্বদেশকে স্বদেশরূপে লাভ করবার কাজ সেইখানেই আরম্ভ হবে। জীবজন্তু স্থানবিশেষে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু জন্মগ্রহণের দ্বারাই দেশ তার হয় না। মানুষ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টির কাজে ও রক্ষণের কাজে দেশের লোকের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, আর সেই সৃষ্টিকরা দেশকে তারা প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতে পারে। আমাদের দেশের মানুষ দেশে জন্মাচ্ছে মাত্র, দেশকে সৃষ্টি করে তুলছে না ; এইজন্যে তাদের পরস্পর মিলনের কোনো গভীর উপলক্ষ নেই, দেশের অনিষ্টে তাদের প্রত্যেকের অনিষ্টবোধ জাগে না। দেশকে সৃষ্টি করার দ্বারাই দেশকে লাভ করবার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে। সেই সৃষ্টির বিচিত্র কর্মে মানুষের বিচিত্র শক্তির প্রয়োজন ; নানা পথে এক লক্ষ্য-অভিমুখে সেই বিচিত্র শক্তির প্রয়োগের দ্বারাই আমরা আপনাকে দেশের মধ্যে উপলব্ধি করি। এই দেশসৃষ্টির সাধনা কাছের থেকে আরম্ভ করে ক্রমে দূরে প্রসারিত করলে তবেই আমরা ফল পাব। যদি এইরকম উদ্‌যোগকে আমরা আয়তনে ছোটো বলে অবজ্ঞা করি তবে গীতার সেই কথাটা যেন মনে আনি— স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। সত্যের জোর আয়তনে নয়, তার আপনাতেই।

সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার

অভাব— আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে, তখন দেশের জনসংঘের এই চিত্তদৈন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে এ দেশে স্বরাজ কায়েম হতে পারে, এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, সিদ্ধিই সিদ্ধিকে টানে— তেমনি স্বরাজই স্বরাজকে আবাহন করে আনে। বিশ্বে বিধাতার যে অধিকার আছে সেই হচ্ছে তাঁর স্বরাজ, অর্থাৎ বিশ্বকে সৃষ্টি করবার অধিকার। আমাদেরও স্বরাজ হচ্ছে সেই ঐশ্বর্য, অর্থাৎ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে তোলবার অধিকার। সৃষ্টি করার দ্বারাই তার প্রমাণ হয়, এবং তার উৎকর্ষসাধন হয়। বেঁচে থাকবার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে আমার প্রাণ আছে। কেউ কেউ হয়তো বলতেও পারেন যে, সুতো কাটাও সৃষ্টি। তা নয়। তার কারণ, চরকায় মানুষ চরকারই অঙ্গ হয়; অর্থাৎ যেটা কল দিয়ে করা যেত সে সেইটেই করে। সে ঘোরায়। কল জিনিসটা মনোহীন বলেই সে একা, নিজের বাইরে তার কিছুই নেই। তেমনি যে মানুষ সুতো কাটছে সেও একলা; তার চরকার সূত্র অন্য কারও সঙ্গে তার অবশ্যযোগের সূত্র নয়। তার প্রতিবেশী কেউ যে আছে, এ কথা তার জানবার কোনো দরকারই নেই। রেশমের পলু যেমন একান্তভাবে নিজের চার দিকে রেশমের সুতো বোনে, তারও কাজ সেইরকম। সে যন্ত্র, সে নিঃসঙ্গ, সে বিচ্ছিন্ন। কন্‌গ্রেসের কোনো মেম্বর যখন সুতো কাটেন তখন সেইসঙ্গে দেশের ইকনমিক্‌স্‌-স্বর্গের ধ্যান করতেও পারেন, কিন্তু এই ধ্যানমন্ত্রের দীক্ষা তিনি অন্য উপায়ে পেয়েছেন— চরকার মধ্যেই এই মন্ত্রের বীজ নেই। কিন্তু, যে মানুষ গ্রাম থেকে মারী দূর করবার উদ্‌যোগ করছে তাকে যদি-বা দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ একলাও কাজ করতে হয়, তবু তার কাজের আদিতে ও অন্তে সমস্ত গ্রামের চিন্তা নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই কাজের দ্বারাই নিজের মধ্যে সমগ্র গ্রামকে সে উপলব্ধি করে। গ্রামেরই সৃষ্টিতে তার সজ্ঞান আনন্দ। তারই কাজে স্বরাজসাধনার সত্যকার আরম্ভ বটে। তার পরে সেই কাজে যদি সমস্ত গ্রামের লোক পরস্পর যোগ দেয় তা হলেই বুঝব, গ্রাম নিজেকে নিজে সৃষ্টি করার দ্বারাই নিজেকে নিজে যথার্থরূপে লাভ করবার দিকে এগোচ্ছে। এই লাভ করাকেই বলে স্বরাজলাভ। পরিমাণ হিসেবে কম হলেও সত্য হিসাবে কম নয়। অর্থাৎ শতকরা একশোর হারে লাভ না হলেও হয়তো শতকরা একের হারে লাভ; এই লাভই শতকরা একশোর সগোত্র, এমন-কি সহোদর ভাই। যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-উপার্জনে আনন্দবিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে। তার পরে একটা দীপের থেকে আর-একটা দীপের শিখা জ্বালানো কঠিন হবে না; স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণপথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে।

আশ্বিন ১৩৩২

রায়তের কথা

শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী কল্যাণীয়েষু

আমাদের শাস্ত্রে বলে, সংসারটা ঊর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ। উপরের দিক থেকে এর শুরু, নীচে এসে ডালপালা ছড়িয়েছে; অর্থাৎ নিজের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, উপরের থেকে ঝুলছে। তোমার 'রায়তের কথা' পড়ে আমার মনে হল যে, আমাদের পলিটিক্‌স্‌ও সেই জাতের। কন্‌গ্রেসের প্রথম উৎপত্তিকালে দেখা গেল, এই জিনিসটি শিকড় মেলেছে উপরওয়ালাদের উপর মহলে— কি আহার কি আশ্রয় উভয়েরই জন্যে এর অবলম্বন সেই ঊর্ধ্বলোকে।

যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের রাজগদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটিক্স্। সেই পলিটিক্সে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিশান্তি উভয় ব্যাপারই বক্তৃতামঞ্চে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাষা—কখনো অনুনয়ের করুণ কাকলি, কখনো-বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা। আর দেশে যখন এই প্রগল্ভ বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা-রচনায় নিযুক্ত তখন দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্ছে মরছে, চাষ করছে, কাপড় বুনছে, নিজের রক্তে মাংসে সর্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্ছে, যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হন মন্দির-প্রাঙ্গণের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে, মাতৃভাষায় কাঁদছে হাসছে, আর মাথার উপর অপমানের মুষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত করে বলছে 'অদৃষ্ট'। দেশের সেই পোলিটিশান্ আর দেশের সর্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।

সেই পলিটিক্স্ আজ মুখ ফিরিয়েছে, অভিমানিনী যেমন করে বল্লভের কাছ থেকে মুখ ফেরায়। বলছে, কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী। তখন ছিল পূর্বরাগ ও অভিসার, এখন চলছে মান এবং বিচ্ছেদ। পালা বদল হয়েছে, কিন্তু লীলা বদল হয় নি। কাল যেমন জোরে বলেছিলেম 'চাই', আজ তেমনি জোরেই বলছি 'চাই নে'। সেইসঙ্গে এই কথা যোগ করেছি বটে যে, পল্লীবাসী জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করাতে চাই। অর্থাৎ, এরাই আমার আপন, ওরা আমার পর। কিন্তু 'চাই নে' 'চাই নে' বলবার হুহুংকারেই গলার জোর গায়ের জোর চুকিয়ে দিই। তার সঙ্গে যেটুকু 'চাই' জুড়ি তার আওয়াজ বড়ো মিহি। যে অছিলাতেই অর্থ কিছু সংগ্রহ করি ভদ্রসমাজের পোলিটিকাল বারোয়ারি জমিয়ে তুলতেই তা ফুরিয়ে যায়, তার পরে অর্থ গেলে শব্দ যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু থাকে পল্লীর হিতের জন্যে। অর্থাৎ, আমাদের আধুনিক পলিটিক্সের শুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশপ্রেমের চর্চা করেছি দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চার অর্থ যাঁরা জোগান তাঁদের কারও বা আছে জমিদারি, কারও বা আছে কারখানা ; আর শব্দ যাঁরা জোগান তাঁরা আইনব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাসী কোনো জায়গাতেই নেই ; অর্থাৎ আমরা যাকে দেশ বলি সেই প্রতাপাদিত্যের প্রেতলোকে তারা থাকে না। তারা অত্যন্ত প্রতাপহীন—কি শব্দসম্বলে কি অর্থসম্বলে। যদি দেওয়ানি অবাধ্যতা চলত তা হলে তাদের ডাকতে হত বটে, সে কেবল খাজনা বন্ধ করে মরবার জন্যে। আর, যাদের অদ্য-ভক্ষ্য-ধনুর্গুণ তাদের এখনো মাঝে মাঝে ডাক পাড়া হয় দোকান বন্ধ করে হরতাল করবার জন্যে, উপরওয়ালাদের কাছে আমাদের পোলিটিকাল বাঁকা ভঙ্গিটাকে অত্যন্ত তেড়া করে দেখাবার উদ্দেশ্যে।

এই কারণেই রায়তের কথাটা মুলতুবিই থেকে যায়। আগে পাতা হোক সিংহাসন, গড়া হোক মুকুট, খাড়া হোক রাজদণ্ড, ম্যাঞ্চেস্টার পরুক কোপ্‌নি— তার পর সময় পাওয়া যাবে রায়তের কথা পাড়বার। অর্থাৎ, দেশের পলিটিকস আগে, দেশের মানুষ পরে। তাই শুরুতেই পলিটিকসের সাজ-ফরমাশের ধুম পড়ে গেছে। সুবিধা এই যে, মাপ নেবার জন্যে কোনো সজীব মানুষের দরকার নেই। অন্য দেশের মানুষ নিজের দেহের বহর ও আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে বার বার কেটে-ছেঁটে বদলে জুড়ে যে সাজ বানিয়েছে ঠিক সেই নমুনাটা দর্জির দোকানে চালান করলেই হবে। সাজের নামও জানি— একেবারে কেতাবের পাতা থেকে সদ্য-মুখস্থ— কেননা, আমাদের কারখানাঘরে নাম আগে, রূপ পরে। ডিমোক্রেসি, পার্লেমেন্ট, কানাডা অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার রাষ্ট্রতন্ত্র ইত্যাদি, এর সমস্তই আমরা চোখ বুজে কল্পনা করতে পারি ; কেননা গায়ের মাপ নেবার জন্যে মানুষকে সামনে রাখবার বালাই একেবারেই নেই। এই সুবিধাটুকু নিষ্কণ্টকে ভোগ করবার জন্যেই বলে থাকি, আগে স্বরাজ, তার পরে স্বরাজ যাদের জন্যে তারা। পৃথিবীতে অন্য সব জায়গাতেই দেশের মানুষ নিজের প্রকৃতি শক্তি ও প্রয়োজনের স্বভাবিক প্রবর্তনায় আপনিই আপনার স্বরাজ গড়ে তুলেছে ; জগতে আমরাই কেবল পঞ্জিকার কোনো-একটি আসন্ন পয়লা জানুয়ারিতে আগে স্বরাজ পাব, তার পরে স্বরাজ্যের লোক ডেকে যেমন করে হোক সেটাকে তাদের গায়ে চাপিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া

আছে, মারী আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মহাজন আছে, জমিদার আছে, পুলিসের পেয়াদা আছে, গলায়-ফাঁস-লাগানো মেয়ের বিয়ে, মায়ের শ্রাদ্ধ, সহস্রবাহু সমাজের ট্যাক্‌সো আর আছে ওকালতির দংষ্ট্রাকরাল সর্বস্বলোলুপ আদালত।

এই-সব কারণে আমাদের পলিটিক্‌সে তোমার 'রায়তের কথা' স্থানকালপাত্রোচিত হয়েছে কি না সন্দেহ করি। তুমি ঘোড়ার সামনের দিকে গাড়ি জোতবার আয়োজনে যোগ দিচ্ছ না ; শুধু তাই নয়, ঘোড়াটাকে জোতবার উদ্‌যোগ বন্ধ রেখে খবর নিতে চাও সে দানা পেলে কি না, ওর দম কতটুকু বাকি। তোমার মন্ত্রণাদাতা বন্ধুদের মধ্যে এমন কী কেউ নেই যে তোমাকে বলতে পারে— আগে গাড়ি টানাও, তা হলেই অমুক শুভ লগ্নে গম্যস্থানে পৌঁছবই ; তার পরে পৌঁছবা মাত্রই যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে খবর নেবার জন্যে যে ঘোড়াটা সচল না অচল, বেঁচে আছে না মরেছে। তোমার জানা উচিত ছিল, হাল আমলের পলিটিক্‌সে টাইম্‌টেব্‌ল তৈরি, তোরঙ্গ গুছিয়ে গাড়িতে চড়ে বসাই প্রধান কর্তব্য। অবশেষে গাড়িটা কোনো জায়গাতেই পৌঁছয় না বটে, কিন্তু সেটা টাইম্‌টেব্‌লের দোষ নয় ; ঘোড়াটা চললেই হিসেব ঠিক মিলে যেত। তুমি তার্কিক ; এত বড়ো উৎসাহে বাধা দিয়ে বলতে চাও, ঘোড়াটা যে চলে না বহুকাল থেকে সেইটেই গোড়াকার সমস্যা। তুমি সাবেক ফ্যাশানের সাবধানী মানুষ, আস্তাবলের খবরটা আগে চাও। এ দিকে হাল ফ্যাশানের উৎসাহী মানুষ কোচ্‌বাক্সে চড়ে বসে অস্থিরভাবে পা ঘষছে ; ঘরে আগুন লাগার উপমা দিয়ে সে বলেছে, অতি শীঘ্র পৌঁছনো চাই, এইটেই একমাত্র জরুরি কথা। অতএব ঘোড়ার খবর নেওয়া নিছক সময় নষ্ট করা। সব আগে দরকার গাড়িতে চড়ে বসা। তোমার 'রায়তের কথা' সেই ঘোড়ার কথা, যাকে বলা যেতে পারে গোড়ার কথা।

কিন্তু ভাবনার কথা এই যে, বর্তমান কালে একদল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে শুরু করেছেন। সব আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্ছেন। বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজির পেয়েছেন। আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে তখনো দেখা যায়, সেই আড়ম্বরের সমস্ত মালমসলার গায়ে ছাপ মারা আছে 'Made in Europe'। য়ুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোশ্যালিজ্‌ম্, কম্যুনিজ্‌ম্, সিন্ডিক্যালিজ্‌ম্ প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্তনের পরখ করছে। কিন্তু আমরা যখন বলি, রায়তের ভালো করব, তখন য়ুরোপের বাঁধি বুলি ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠছে। তারা সব ছোটো ছোটো এক-একটি রক্তপাতের ধ্বজা। বলছে, পিষে ফেলো, দলে ফেলো ; অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক। যেন জবরদস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠি মারলে সে মরে। এ কেমন, যেন বৌয়ের দল বলছে, শাশুড়িগুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গাযাত্রা করাও, তা হলেই বধূরা নিরাপদ হবে ! ভুলে যায় যে, মরা শাশুড়ির ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শাশুড়িতর শাশুড়িতম করে তুলতে দেরি করে না। আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, বাইরের থেকে আত্মহত্যা করে ম'লেই ভববন্ধন ছেদন করা যায় না— স্বভাবের ভিতর থেকে বন্ধনের মূলচ্ছেদ করতে হয়। য়ুরোপের স্বভাবটা মারমুখো। পাপকে ভিতর থেকে মারতে সময় লাগে— তাদের সে তর সয় না, তারা বাইরে থেকে মানুষকে মারে।

একদিন ইংরেজের নকল করে আমাদের ছেঁড়া পলিটিক্‌স্ নিয়ে পার্লামেন্টীয় রাজনীতির পুতুলখেলা খেলতে বসেছিলেম। তার কারণ, সেদিন পলিটিক্‌সের আদর্শটাই য়ুরোপের অন্য সব-কিছুর চেয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর ছিল।

তখন য়ুরোপীয় যে সাহিত্য আমাদের মন দখল করেছে তার মধ্যে মাট্‌সিনি গারিবাল্‌ডির সুরটাই ছিল প্রধান। এখন সেখানে নাট্যের পালা বদল হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডে ছিল রাজবীরের জয়, ছিল

দানবের হাত থেকে সীতার মুক্তির কথা। উত্তরকাণ্ডে আছে দুর্মুখের জয়, রাজার মাথা হেঁট, প্রজার মন জোগাবার তাগিদে রাজরানীকে বিসর্জন। যুদ্ধের দিনে ছিল রাজার মহিমা, এখন এল প্রজার মহিমা। তখন গান চলছিল, বাহিরের বিরুদ্ধে ঘরের জয় ; এখনকার গান, ইমারতের বিরুদ্ধে আঙিনার জয়। ইদানীং পশ্চিমে বলশেভিজ্‌ম্‌ ফাসিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি যে-সব উদ্‌যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্যকারণ তার আকার-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয় ; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকলনিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সব চেয়ে বড়ো করে দেখতে বসেছে। বরাহ-অবতার পঙ্কনিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলায় উপরে তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। এ কথা ভাববার অবকাশও নেই সাহসও নেই যে, গোঁয়ার্তুমির দ্বারা উপর ও নীচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। সেইজন্যেই আজকের দিনের নীচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে, কালকের দিনের উপরের থাকটা নীচের দিকে পূর্বের মতোই চাপ লাগাবে। রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বল্‌শেভিক তন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া। পূর্বে যে ফোড়াটা বাঁ হাতে ছিল আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে যদি তাণ্ডবনৃত্য করা যায়, তা হলে সেটাকে বলতেই হবে পাগলামি। যাদের রক্তের তেজ বেশি, এক-এক সময়ে মাথায় বিপরীত রক্ত চড়ে গিয়ে তাদের পাগলামি দেখা দেয়— কিন্তু সেই দেখাদেখি নকল পাগলামি চেপে বসে অন্য লোকের, যাদের রক্তের জোর কম ; তাকেই বলে হিসটিরিয়া। আজ তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইশারা চলছে, মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনই বুঝতে পারলুম, এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালির অসাধারণ নকলনৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেন্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত পা ছোঁড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।

৩

আমি নিজে জমিদার, এইজন্য হঠাৎ মনে হতে পারে, আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তা হলে দোষ দেওয়া যায় না— ওটা মানবস্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি ; অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয় তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়তো শিকারের বিষয়-পরিবর্তন হবে, কিন্তু দাঁত-নখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরনের হবে না। আজ অধিকার কাড়বার বেলা তারা যে-সব উচ্চ-অঙ্গের কথা বলে তাতে বোঝা যায় তাদের 'নামে রুচি' আছে, কিন্তু কাল যখন 'জীবে দয়া'র দিন আসবে তখন দেখব আমিষের প্রতি জিহ্বার লেলিহান চাঞ্চল্য। কারণ, নামটা হচ্ছে মুখে আর লোভটা হচ্ছে মনে। অতএব, দেশের চিত্তবৃত্তির মাটিতে আজ যে জমিদার দেখা দিয়েছে সে যদি নিছক কাঁটাগাছই হয়, তা হলে তাকে দ'লে ফেললেও সেই মরা গাছের সারে দ্বিতীয় দফা কাঁটাগাছের শ্রীবৃদ্ধিই ঘটবে। কারণ, মাটিবদল হল না তো।

আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক ; সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্যভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়— এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোটো হাতের মাপে রাজা বলে কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে। 'রায়তের কথা'য় পুরাতন দপ্তর ঘেঁটে তুমি সেই সুখস্বপ্নেও বাদ সাধতে বসেছ। তুমি প্রমাণ করতে চাও যে, আমরা ইংরেজ- রাজসরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা। আমরা এদিকে রাজার নিমক খাচ্ছি— রায়তদের বলছি 'প্রজা', তারা আমাদের বলছে 'রাজা'— মস্ত একটা ফাঁকির

মধ্যে আছি। এমন জমিদারি ছেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু, কাকে ছেড়ে দেব। অন্য এক জমিদারকে ? গোলাম-চোর খেলার গোলাম যাকেই গতিয়ে দিই, তার দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠেকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব ? তখন দেখতে দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্তপিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারি নে। তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে। জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে ? এ কথা মোটের উপর বলা চলে যে, বই তারই হওয়া উচিত যে মানুষ বই পড়ে। যে মানুষ পড়ে না অথচ সাজিয়ে রেখে দেয়, বইয়ের সদ্‌ব্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে। কিন্তু, বই যদি পটলডাঙার দোকানে বিক্রি করতে কোনো বাধা না থাকে তা হলে যার বইয়ের শেল্‌ফ্‌ আছে, বুদ্ধি বিদ্যা নেই, সে যে বই কিনবে না এমন ব্যবস্থা কী করে করা যায়। সংসারে বইয়ের শেল্‌ফ্‌ বুদ্ধির চেয়ে অনেক সুলভ ও প্রচুর। এই কারণে অধিকাংশ বইয়ের গতি হয় শেল্‌ফের থাকে, বুদ্ধিমানের ডেস্কে নয়। সরস্বতীর বরপুত্র যে ছবি রচনা করে লক্ষ্মীর বরপুত্র তাকে দখল করে বসে। অধিকার আছে ব'লে নয়, ব্যাঙ্কে টাকা আছে ব'লে। যাদের মেজাজ কড়া, সম্বল কম, এ অবস্থায় তারা খাপ্পা হয়ে ওঠে। বলে, মারো টাকাওয়ালাকে, কাড়ো ছবি। কিন্তু, চিত্রকরের পেটের দায় যতদিন আছে, ছবি যতদিন বাজারে আসতে বাধ্য, ততদিন লক্ষ্মীমানের ঘরের দিকে ছবির টান কেউ ঠেকাতে পারবে না।

৪

জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই তা হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই ; যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে, এ কথাও সত্য। কারণ, উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাকবে, চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্প-স্বত্ব হবেই ; কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চলবে। এমনি করে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ত আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্ব-সমাসে তা আর টেঁকে না। আমার অনেক রায়তকে এই চরম অকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি জমিহস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করি নি, কিন্তু তাকে রফা করতে বাধ্য করেছি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারে অসম্ভব হয়েছে, তাদের কান্না আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোনো খেসারত পাবে কি না সে তত্ত্ব এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

নীলচাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ছিল তখন জমিদার রায়তকে বাঁচিয়েছে। নিষেধ-আইনের বাঁধ যদি সেদিন না থাকত তা হলে নীলের বন্যায় রায়তি জমি ডুবে একাকার হত। মনে করো, আজ কোনো কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি যদি মাড়োয়ারি দখল-স্থাপনের উদ্দেশে ক্রমশ প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তা হলে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তারা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিঙড়ে নিতে পারে। এমন মতলব এদের কারও মাথায় যে কোনোদিন আসে নি, তা মনে করবার হেতু নেই। যে-সব ব্যবসায়ে এরা আজ নিযুক্ত আছে তার মুনফায় বিঘ্ন ঘটলেই আবদ্ধ মূলধন এই-সব খাতের সন্ধান খুঁজবেই। এখন কথা হচ্ছে, ঘরের দিকে বেনো জল ঢোকাবার অনুকূল খালখনন কি রায়তের পক্ষে ভালো। মূল কথাটা এই— রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ংকর জীব আর নেই। রায়ত-খাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে প্রণালীর

ভিতর দিয়ে স্ফীত হতে হতে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল, জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-তছরূপ— কোনো বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই। জেলখানায় যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠতে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যাবসাকে গিলে ফেলে বড়ো বড়ো ব্যাবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ত ক্রমে জমিদার হয়ে উঠতে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় নিজে জমি চাষ করেছে, নিজের গোরুর গাড়িতে মাল তুলে হাটে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অন্য চাষীর সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু, যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে অমনি হাতের লাঙল খসে গিয়ে গদার আবির্ভাব হয়। পেটের প্রত্যন্তসীমা প্রসারিত হতে থাকে, পিঠের দিকে লাগে তাকিয়া, মুলুকের মিথ্যা মকদ্দমা-পরিচালনার কাজে পসার জমে, আর তার দাবরাব-তর্জন-গর্জন-শাসন-শোষণের সীমা থাকে না। বড়ো বড়ো জালের ফাঁক বড়ো, ছোটো মাছ তার ভিতর দিয়ে পালাবার পথ পায় ; কিন্তু ছোটো ছোটো জালে চুনোপুঁটি সমস্তই ছাঁকা পড়ে— এই চুনোপুঁটির ঝাঁক নিয়েই রায়ত।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকেই নিজের অনুকূল করে নেওয়া মকদ্দমার জুজুৎসু খেলা। আইনের যে আঘাত মারতে আসে সেই আঘাতের দ্বারাই উলটিয়ে মারা ওকালতি-কুস্তির মারাত্মক প্যাঁচ। এই কাজে বড়ো বড়ো পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ত যতদিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে ততদিন 'উচল' আইনও তার পক্ষে 'অগাধ জলে' পড়বার উপায় হবে।

এ কথা বলতে ইচ্ছা করে না, শুনতেও ভালো লাগে না যে, জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্তব্য। এক দিক থেকে দেখতে গেলে ষোলো-আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু ততবড়ো স্বাধীনতার অধিকার তারই যার শিশুবুদ্ধি নয়। যে রাস্তায় সর্বদা মোটর-চলাচল হয় সে রাস্তায় সাবালক মানুষকে চলতে বাধা দিলে সেটাকে বলা যায় জুলুম ; কিন্তু অত্যন্ত নাবালককে যদি কোনো বাধা না দিই তবে তাকে বলে অবিবেচনা। আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশে মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে। তোমার লেখার মধ্যে এই অংশে আমার মনে যে সংশয় আছে তা বললেম।

৫

আমি জানি, জমিদার নির্লোভ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা আছে জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশি আটক পড়ে। আমাদের দেশে মেয়ের বিবাহের সীমা সংকীর্ণ, সেই বাধাটাই বরপক্ষের আয়ের উপায়। এও তেমনি। কিন্তু দেখতে দেখতে চাষীর জমি সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে তাতে জমিদারের লোকসান আছে বলে আনন্দ করবার কোনো হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশি কড়া— যদি তাও না মান এটা মানতে হবে, সেটা আর-একটা উপ্‌রি মুষ্টি।

রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, এ কথা খুব সত্য। রাজসরকারের সঙ্গে দেনা-পাওনায় জমিদারের রাজস্ববৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতিস্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়বিরুদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা জমির উন্নতিসাধন সম্বন্ধে স্বাভাবিক উৎসাহের একটা মস্ত বাধা ; সুতরাং কেবল চাষী নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তা ছাড়া গাছ কাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণীখনন প্রভৃতির অন্তরায়গুলো কোনোমতেই সমর্থন করা চলে না।

কিন্তু এ-সব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই-যে বাঁচাবার শক্তি তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো-একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরকায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার-আনা ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

কেমন করে সেটা হবে সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভালো জবাব দিয়ে যেতে পারব কি না জানি নে— জবাব তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি, এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত খুচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যে। নইলে তালি দিতে দিতে দিন বয়ে যাবে ; যার জন্যে এত জোড়াতাড়া সে ততকাল পর্যন্ত টিকবে কি না সন্দেহ।

আষাঢ় ১৩৩৩

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আমাদের দেশে যাঁরা সত্যের ব্রত গ্রহণ করবার অধিকারী এবং সেই ব্রতকে প্রাণ দিয়ে যাঁরা পালন করবার শক্তি রাখেন তাঁদের সংখ্যা অল্প বলেই দেশের এত দুর্গতি। এমন চিত্তদৈন্য যেখানে, সেখানে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতো অতো বড়ো বীরের এমন মৃত্যু যে কতদূর শোকাবহ তার বর্ণনায় প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে একটি কথা এই আছে যে, তাঁর মৃত্যু যতই শোচনীয় হোক, সে মৃত্যুতে তাঁর প্রাণ তাঁর চরিত্র ততই মহীয়ান হয়েছে। বারে বারে ইতিহাসে দেখা যায়, নিজের সমস্ত দিয়ে যাঁরা কল্যাণব্রতকে গ্রহণ করেছেন অপমান ও অপমৃত্যু তাঁদের ললাটে জয়তিলক এমনি করেই এঁকেছে। মহাপুরুষরা আসেন প্রাণকে মৃত্যুর উপরেও জয়ী করতে, সত্যকে জীবনের সামগ্রী করে তুলতে। আমাদের খাদ্যদ্রব্যে প্রাণ দেবার যা উপকরণ রয়েছে তা বায়ুতে আছে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারেও আছে। কিন্তু, যতক্ষণ তা উদ্ভিদে প্রাণীতে জৈব আকার না ধারণ করে ততক্ষণ প্রাণের পুষ্টি হয় না। সত্য সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। শুধুমাত্র বাক্যের হাওয়া থেকে আকর্ষণ করে নিয়ে তাকে জীবনগত করবার শক্তি ক'জনারই বা আছে। সত্যকে জানে অনেক লোকে, তাকে মানে সেই মানুষ যে বিশেষ শক্তিমান ; প্রাণ দিয়ে তাকে মানার দ্বারাই সত্যকে আমরা সকল মানুষের করে দিই। এই মানতে পারার শক্তিটাই মস্ত জিনিস। এই শক্তির সম্পদ যাঁরা সমাজকে দেন তাঁদের দান মহামূল্য ; সত্যের প্রতি সেই নিষ্ঠার আদর্শ শ্রদ্ধানন্দ এই দুর্বল দেশকে দিয়ে গেছেন। তাঁর সাধনা-পরিচয়ের উপযোগী যে নাম তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেই নাম তাঁর সার্থক। সত্যকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন। এই শ্রদ্ধার মধ্যে সৃষ্টিশক্তি আছে। সেই শক্তির দ্বারা তাঁর সাধনাকে রূপমূর্তি দিয়ে তাকে তিনি সজীব করে গেছেন। তাই তাঁর মৃত্যুও আলোকের মতো হয়ে উঠে তাঁর শ্রদ্ধার সেই ভয়হীন ক্ষয়হীন ক্লান্তিহীন অমৃতচ্ছবিকে উজ্জ্বল করে প্রকাশ করেছে। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধার এই ভূমানন্দকে তাঁর চরিত্রের মধ্যে আজ আমরা যেন সার্থক আকারে দেখতে পারি। এই সার্থকতা বাহ্য ফলে নয়, নিজেরই অকৃত্রিম বাস্তবতায়।

অপঘাতের এই যে আঘাত শুধু মহাপুরুষেরাই একে সহ্য করতে পারেন, শুধু তাঁদের পক্ষেই এর কোনো অর্থ নেই। যাঁরা মরণকে ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে তুলতে পেরেছেন জীবন থাকতেই তাঁরা অমৃতলোকে উত্তীর্ণ। কিন্তু, মৃত্যুর গুপ্তচর তো শ্রদ্ধানন্দের আয়ু হরণ করেই ফিরে যাবে না। ধর্মবিদ্রোহী ধর্মান্ধতার কাঁধে চড়ে রক্তকলুষিত যে বীভৎসতাকে নগরের পথে পথে সে বিস্তার করেছিল অনতিকাল পূর্বেই, সে তো আমরা দেখেছি। সে যাদের নষ্ট করেছে তাদের তো কিছুই

অবশেষ থাকে নি। তাদের মৃত্যু যে নিরতিশয় মৃত্যু, তাদের ক্ষতি যে চরম ক্ষতি।

তাদের ঘরে সন্তানহীন মাতার ক্রন্দনে সান্ত্বনা নেই, বিধবার দুঃখে শান্তি নেই। এই-যে নিষ্ঠুরতা যা সমস্তকে নিঃশেষে চিতাভস্মে সমাধা করে, তাকে তো সহ্য করতে পারা যায় না। দুর্বল স্বল্পপ্রাণ যারা, যাদের জনসাধারণ বলি, তারা এত বড়ো হিংসার বোঝা বইবে কী করে। এখন দেখতে পাচ্ছি, আবার যমরাজের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হল, আবার প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে হত্যার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। এর দুঃখ সইবে কে।

বিধাতা যখন দুঃখকে আমাদের কাছে পাঠান তখন সে একটি প্রশ্ন নিয়ে আসে। সে আমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমরা আমাকে কী ভাবে গ্রহণ করবে। বিপদ আসবে না এমন হতে পারে না— সংকটের সময় উপস্থিত হয়, আশু উদ্ধারের উপায় থাকে না, কিন্তু, কী ভাবে বিপদকে আমরা ব্যবহার করি তারই উপরে প্রশ্নের সদুত্তর নির্ভর করে। এই-যে পাপ কালো হয়ে দেখা দিল, এর ভয়ে ভীত হব না এর কাছে মাথা নত করব ? না সে পাপের বিরুদ্ধে পাপকে দাঁড় করাব ? মৃত্যুর আঘাত, দুঃখের আঘাতের উপর রিপুর উন্মত্ততাকে জাগ্রত করব ! শিশুর আচরে দেখা যায়, সে যখন আছাড়া খায় তখন মেজেকে আঘাত করতে থাকে। যতই আঘাত করে মেজে ততই সে আঘাত ফিরিয়ে দেয়। এ শিশুর ধর্ম। কিন্তু, যদি কোনো বয়স্ক লোক হোঁচট খায় তবে সে চিন্তা করে, বাধাটা কোথায়— বাধা যদি থাকে তো সেটা লঙ্ঘন বা সেটাকে অপসারণ করতে হবে। সচরাচর দেখতে পাই বাহির থেকে আকস্মিক আঘাতের চমকে মানুষের শিশুবুদ্ধি ফিরে আসে। সে তখন মনে করে, ধৈর্য অবলম্বন করাই কাপুরুষতা, ক্রোধের প্রকাশ পৌরুষ। আজকের দিনে স্বভাবতই ক্রোধের উদয় হয়ে থাকবে, সে কথা স্বীকার করি। মানবধর্ম তো একেবারে ছাড়তে পারি নে। কিন্তু ক্রোধদ্বারা যদি অভিভূত হই তবে সেও মানবধর্ম নয়। আগুন লেগে পাড়া যদি নিরুপায়ে ভস্ম হয়ে যায় তবে আগুনের রুদ্রতা নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। তখন যদি দোষ কাউকে দিতে হয় তো আগুনকে যেন না দিই। বিপদের কারণ সর্বত্রই থাকে, তার প্রতিকারের উপায় যারা রাখে না তারাই দোষী। যাদের ঘর পুড়েছে তারা যদি বলতে পারে যে, কূপ খনন করে রাখি নি সেই অপরাধের শাস্তি পেলেম, তা হলে ভবিষ্যতে তাদের ঘর পোড়ার আশঙ্কা কমে। আমাদেরও আজকে তাই বলতে হবে। অপরাধের গোড়ার কথাটা ভাবা চাই। শুনে হয়তো লোকে বলবে, না, এ তো ভালো লাগছে না, একটা প্রলয়-ব্যাপার বাধিয়ে দিতে পারলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গলপ্রচেষ্টা সফল হবে, তা হলে বড়োই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকি তিনটে কড়িকে মানবই না, এটা বিরক্তির কথা হতে পারে, কিন্তু ছাদ-রক্ষার পক্ষে সুবুদ্ধির কথা নয়। আমাদের সব চেয়ে বড়ো অমঙ্গল বড়ো দুর্গতি ঘটে যখন মানুষ মানুষের পাশে রয়েছে, অথচ পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নেই অথবা সে সম্বন্ধ বিকৃত। বিদেশীর রাজ্যে রাজপুরুষদের সঙ্গে আমাদের একটা বাহ্য যোগ থাকে, অথচ আন্তরিক সম্বন্ধ থাকে না। বিদেশীয় রাজত্বে এইটেই আমাদের সব চেয়ে পীড়া দেয়। গায়ে-পড়া যোগটা দুর্বলতা ও অপমান আনে। বিদেশী শাসন সম্পর্কে যদি এ কথা খাটে তবে স্বদেশীয়দের সম্বন্ধে সে আরো কত সত্য। এক দেশে পাশাপাশি থাকতে হবে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্বন্ধ থাকবে না, হয়তো-বা প্রয়োজনের থাকতে পারে— সেইখানেই যে ছিদ্র— ছিদ্র নয়, কলির সিংহদ্বার। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে যেখানে এতখানি ব্যবধান সেখানেই আকাশ ভেদ করে ওঠে অমঙ্গলের জয়তোরণ। আমাদের দেশে কল্যাণে রথযাত্রায় যখনই সকলে মিলে টানতে চেষ্টা করা হয়েছে কংগ্রেস প্রভৃতি নানা প্রচেষ্টা-দ্বারা, সে রথ কোথায় এসে থেমে যায়, ভেঙে পড়ে ? যেখানে গর্তগুলো হাঁ করে আছে হাজার বছর ধরে।

আমাদের দেশে যখন স্বদেশী-আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলেম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয় নি, বিরুদ্ধ ছিল ; জননায়কেরা কেউ কেউ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ওদের একেবারে অস্বীকার করা যাক। জানি, ওরা যোগ দেয় নি। কিন্তু, কেন দেয় নি।

তখন বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে এত প্রবল যোগ হয়েছিল যে সে আশ্চর্য ! কিন্তু, এত বড়ো আবেগ শুধু হিন্দুসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল, মুসলমানসমাজকে স্পর্শ করল না ! সেদিনও আমাদের শিক্ষা হয় নি। পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ডোবাটাকে আমরা সমাজের দোহাই দিয়ে গভীব করে রেখেছি। সেটাকে রক্ষা করেও লাফ দিয়ে সেটা পার হতে হবে, এমন আবদার চলে না। এমন কথা উঠতে পারে যে, ডোবা তো সনাতন ডোবা, কিন্তু আজ তার মধ্যে যে দুশ্চিকিৎস্য বিভ্রাট ঘটছে সেটা তো নূতন, অতএব হাল আমলের কোনো একটা ভূত আমাদের ঘাড় ভাঙবার গোপন ফন্দি করেছে, ডোবার কোনো দোষ নেই— ওটা ব্রহ্মার বুড়ো আঙুলের চাপে তৈরি। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, ভাঙা গাড়িকে যখন গাড়িখানায় রাখা যায় তখন কোনো উপদ্রব হয় না। সেটার মধ্যে শিশুরা খেলা করতে পারে, চাই কি মধ্যাহ্নের বিশ্রামবাসও হতে পারে। কিন্তু, যখনই তাকে টানতে যাই তখন তার জোড়ভাঙা অংশে অংশে সংঘাত উপস্থিত হয়। যখন চলি নি, রাষ্ট্রসাধনার পথে পাশাপাশি রয়েছি, গ্রামের কর্তব্য পালন করেছি, তখন তো নাড়া খাই নি। আমি যখন আমার জমিদারি সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানায় এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিজ্ঞেস করলেম 'এ কেন' তখন জবাব পেলেম, যে-সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। এক তক্তপোশে বসাতে হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ প্রথা তো অনেকদিন ধরে চলে এসেছে ; অনেকদিন মুসলমান এ মেনে এসেছে, হিন্দুও মেনে এসেছে। জাজিম-তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম-পাতা আসনে অন্যে বসেছে। তার পর ওদের ডেকে একদিন বলেছি, 'আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে।' তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টক্‌টকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, আমরা পৃথক। আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়। বাধা ঐ জাজিম-তোলা আসনে বহুদিনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোটো নয়। ওখানে অকূল অতল কালাপানি। বক্তৃতামঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না।

আজকের দিনে রাষ্ট্রশক্তির উদ্‌বোধন হয়েছে বলেই যত ভেদ, যত ফাঁক, সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেইজন্যই মার খাচ্ছি। এই মার নানা রূপে আসে— কিন্তু, আজ বড়ো করে দেখা দিল এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে। মহাপুরুষেরা এই মারকে বক্ষে গ্রহণ করে এর একান্ত বীভৎসতার পরিচয় দেন। তাতেই আমাদের চৈতন্য হয়। এই-যে চৈতন্য এসেছে, রিপুর বশবর্তী হয়ে কি এই শুভ অবসরকে নষ্ট করব, না, শুভবুদ্ধিদাতাকে বলব, যেখানেই ভেদ ঘটিয়েছি সেখানেই পাপের বেদি গেঁথেছি, তার থেকেই বাঁচাও !

এই-যে রুদ্রবেশে পাপ দেখা দিল এ তো ভালোই হয়েছে এক ভাবে। আজকে না ভেবে উপায় নেই যে, কী করে একে চিরকালের মতো পরাভূত করা যেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আশু আমরা কোন্ উপায় অবলম্বন করব ! সহসা এ প্রশ্নের একটা পাকারকম উত্তর দিই এমন শক্তি আমার নেই। পরীক্ষা-আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে সে উপায় একদিন পাবই। আজকে সেই পরীক্ষা-আরম্ভের আয়োজন। আজকে দেখতে হবে, আমাদের হিন্দুসমাজের কোথায় কোন্ ছিদ্র, কোন পাপ আছে, অতি নির্মমভাবে তাকে আক্রমণ করা চাই। এই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে আজ হিন্দুসমাজকে আহ্বান করতে হবে ; বলতে হবে, পীড়িত হয়েছি আমরা, লজ্জিত হয়েছি, বাইরের আঘাতের জন্য নয়, আমাদের ভিতরের পাপের জন্য ; এসো সেই পাপ দূর করতে সকলে মিলি। আমাদের পক্ষে এ বড়ো সহজ কথা নয়। কেননা, অন্তরের মধ্যে বহুকালের অভ্যস্ত ভেদবুদ্ধি, বাইরেও বহুদিনের গড়া অতি কঠিন ভেদের প্রাচীর। মুসলমান যখন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমানসমাজকে ডাক দিয়েছে, সে কোনো বাধা পায় নি— এক ঈশ্বরের নামে 'আল্লাহো আকবর' বলে সে ডেকেছে। আর আজ আমরা যখন ডাকব 'হিন্দু এসো' তখন কে আসবে। আমাদের মধ্যে কত ছোটো ছোটো সম্প্রদায়, কত গণ্ডী, কত প্রাদেশিকতা— এ উত্তীর্ণ হয়ে কে আসবে। কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হই নি। বাহির

থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয় নি। তার পর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনো একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি। কখনো কখনো ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করে অন্য প্রমাণ পাবার চেষ্টা করি বটে ; বলি, শিখরা তো একসময় বাধা ঘুচিয়েছিল। শিখরা যে বাধা ঘুচিয়েছিল সে তো শিখধর্ম দ্বারাই। পাঞ্জাবে কোথাকার জাঠ, কোথাকার কোন্‌ জাতি সব, শিখধর্মের আহ্বানে একত্র হতে পেরেছিল ; বাধাও দিতে পেরেছিল ; ধর্মকেও রক্ষা করতে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিবাজি একসময় ধর্মরাজ্যস্থাপনের ভিত গেড়েছিলেন। তাঁর যে অসাধারণ শক্তি ছিল তদ্‌দ্বারা তিনি মারাঠাদের একত্র করতে পেরেছিলেন। সেই সম্মিলিত শক্তি ভারতবর্ষকে উপদ্রুত করে তুলেছিল। অশ্বের সঙ্গে অশ্বারোহীর যখন সামঞ্জস্য হয় কিছুতেই সে অশ্ব থেকে পড়ে না ; শিবাজির হয়ে সেদিন যারা লড়েছিল তাদের সঙ্গে শিবাজির তেমনি সামঞ্জস্য হয়েছিল। পরে আর সে সামঞ্জস্য রইল না ; পেশোয়াদের মনে ও আচরণে ভেদবুদ্ধি, খণ্ড খণ্ড স্বার্থবুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে ক্ষণকালীন রাষ্ট্রবন্ধনকে টুকরো টুকরো করে দিলে। আমার কথা এই যে, আমাদের মধ্যে এই-যে পাপ পুষে রেখেছি এতে কি শুধু আমাদেরই অকল্যাণ, সে পাপে কি আমরা প্রতিবেশীদের প্রতি অবিচার করি নে, তাদের মধ্যে হিংসা জাগিয়ে তুলি নে ? যে দুর্বল সেই প্রবলকে প্রলুব্ধ করে পাপের পথে টেনে আনে। পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। অতএব যদি মুসলমান মারে আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাই— তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা। আপনার জন্যেও, প্রতিবেশীর জন্যেও আমাদের নিজেদের দুর্বলতা দূর করতে হবে। আমরা প্রতিবেশীদের কাছে আপিল করতে পারি, তোমরা ক্রূর হোয়ো না, তোমরা ভালো হও, নরহত্যার উপরে কোনো ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না— কিন্তু সে আপিল যে দুর্বলের কান্না। বায়ুমণ্ডলে বাতাস লঘু হয়ে এলে ঝড় যেমন আপনিই আসে, ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে— কেউ বাধা দিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো একটা উপলক্ষ নিয়ে পরস্পরের কৃত্রিম বন্ধুতাবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি, কিন্তু চিরকালের জন্য তা হয় না। যে মাটিতে কণ্টকতরু ওঠে সে মাটিকে যতক্ষণ শোধন না করা হয় ততক্ষণ তো কোনো ফল হবে না।

আপনার লোককেও যে পর করেছে, পরের সঙ্গেও যার আত্মীয়তা নেই, সে তো ঘাটে এসেছে, তার ঘর কোথায়। আর, তার শ্বাসই বা কতক্ষণ। আজ আমাদের অনুতাপের দিন, আজ অপরাধের ক্ষালন করতে হবে। সত্যিকার প্রায়শ্চিত্ত যদি করি তবেই শত্রু আমাদের মিত্র হবে, রুদ্র আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন।

মাঘ ১৩৩৩

‘রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত’

যখন খবর পাই রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি সম্বন্ধে আমার বিশেষ মত কী তা আমার রচনা থেকে কেউ উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন তখন নিশ্চিত জানি, আমার মতের সঙ্গে তাঁর নিজের মত মিশ্রিত হবে। দলিলের সাক্ষ্যের সঙ্গে উকিলের ব্যাখ্যা জড়িত হয়ে যে জিনিসটা দাঁড়ায় সেটাকে প্রমাণ বলে গণ্য করা চলে না। কেননা, অন্য পক্ষের উকিলও সেই একই দলিলকে বিপরীত কথা বলিয়ে থাকেন ; তার কারণ, বাছাই-করা বাক্যের বিশেষ অর্থ নির্ভর করে বিশেষরূপে বাছাই করার উপরেই।

রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আমার মত আলোচনা করে সম্প্রতি ইংরেজি ভাষায় একখানি বই[১] লেখা হয়েছে। ব্যক্তিগত দিক থেকে আমি লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ; তিনি আমার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন নি; শ্রদ্ধা করেই লিখেছেন। আমার প্রতি তাঁর মনের অনুকূল ভাব থাকাতেই আমার মতকে অনেক অংশে প্রচলিত মতের অনুকূল করে সাজিয়ে আমাকে সাধারণের প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।

বইখানি আমাকে পড়তে হল। কেননা, আমার রাষ্ট্রনৈতিক মত কোনো পাঠকের কাছে কিরকম প্রতীত হয়েছে তা জানবার কৌতূহল সামলাতে পারি নি। আমি জানি, আমার মত ঠিক যে কী তা সংগ্রহ করা সহজ নয়। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যেহেতু বাক্য রচনা করা আমার স্বভাব সেইজন্যে যখন যা মনে এসেছে তখনি তা প্রকাশ করেছি। রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে সেই-সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত। যেমন এ কথা চলে না যে, ব্রাহ্মণ আদি চারিবর্ণ সৃষ্টির আদিকালেই ব্রহ্মার মুখ থেকে পরিপূর্ণ স্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন স্বীকার করতেই হবে আর্যজাতির সমাজে বর্ণভেদের প্রথা কালে কালে নানা রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে পরিণত, তেমনি করেই অন্তত আমার সম্বন্ধে জানা চাই যে, রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি— জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোনটা তৎসাময়িক, কোন্টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।

বইখানি পড়ে আমি নিজের মতের ঠিক চেহারাটা পেলুম না। মন বাধা পেল। বাধা পাবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটা কারণ এই যে, এর মধ্যে অনেক তর্জমা আছে যার ভাষা আমার নয়, অথচ আমার যে নয় তার নিদর্শন নেই। ভাষার ইঙ্গিত অনেকখানি কথা কয়। সেটা যখন বাদ পড়ে তখন কথার অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা মারা পড়ে। আর যাই হোক, নিজের ভাষার দায়িত্ব নিজেকে নিতেই হয় কিন্তু অন্যের ভাষার দায়িত্ব নেওয়া চলে না।

তবু এই ত্রুটিকেও উপেক্ষা করা চলে— কিন্তু এ কথা বলতেই হল যে, নানা লেখা থেকে বাক্য চয়ন করে আমার মতের যে একটা মূর্তি দেওয়া হয়েছে তাতে অংশত হয়তো সব কথাই আছে কিন্তু সমগ্রত মোট কথাটা প্রকাশ পায় নি। এরকমটা হওয়াটা বোধ করি অবশ্যম্ভাবী। কোন্ কথাটার গুরুত্ব বেশি কোনটার কম, লেখক সেটা স্বভাবত নিজের অভিমত ও রুচির দ্বারা স্থির করেন এবং সেইভাবেই সমস্তটাকে গড়ে তোলেন।

এই উপলক্ষে আমার সমস্ত চিন্তার ক্ষেত্রের উপর নিজেকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করতে হল। রাষ্ট্রিক সমস্যা সম্বন্ধে আমি কী ভেবেছি কী বলতে চেয়েছি তা নিজেই কুড়িয়ে এনে সংক্ষেপে আঁটি বাঁধবার চেষ্টা করা ভালো মনে করি। এজন্যে দলিল ঘাঁটব না, নিজের স্মৃতির উপরিতলে স্পষ্ট হয়ে যা জেগে আছে তারই অনুসরণ করব।

বালককালের অনেক প্রভাব জীবনপথে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হয়ে থাকে; প্রত্যক্ষ না থাকলেও তাদের প্রণোদনা থেকে যায়। আমাদের ব্রাহ্ম-পরিবার আধুনিক হিন্দুসমাজের বাহ্য আচার-বিচার ক্রিয়া-কর্মের নানা আবশ্যিক বন্ধন থেকে বিযুক্ত ছিল। আমার বিশ্বাস, সেই কিছু-পরিমাণ দূরত্ব-বশতই ভারতবর্ষের সর্বজনীন সর্বকালীন আদর্শের প্রতি আমার গুরুজনদের শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত

১ Sachindranath Sen, *Political Philosophy of Rabindranath*

প্রবল। সেই গৌরববোধ সেদিন নানা আকারে আমাদের বাড়ির অন্তঃপ্রকৃতি ও বাইরের ব্যবহারকে অধিকার করেছে। তখনকার দিনে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের প্রতি যাঁদের আস্থা বিচলিত হত, তাঁদের মনকে হয় য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ ছাঁদের নাস্তিকতা অথবা খৃষ্টান-ধর্ম-প্রবণতা পেয়ে বসত। কিন্তু এ কথা সকলের জানা যে, সেকালে আমাদের পরিবারে ভারতেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসরণ করে ভারতের ধর্ম সংস্কার করবার উৎসাহ সর্বদা জাগ্রত ছিল।

বলা বাহুল্য, বালককালে স্বভাবতই সেই উৎসাহ আমার মনকে একটি বিশেষ ভাবে দীক্ষিত করেছে।

সেই ভাবটি এই যে, জীবনের যা-কিছু মহত্তম দান তার পূর্ণ বিকাশ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য থেকেই। আমাদের স্বভাবসীমার বাইরে শ্রেষ্ঠ জিনিসের অভাব নেই, লোভনীয় পদার্থ অনেক আছে, সে-সমস্তকে আমরা গ্রহণ করতে পারি নে যদি না আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তাদের আত্মসাৎ করি। যখন আমরা বাইরের কিছুতে মুগ্ধ হই তখন লুব্ধ মন অনুকরণের মরীচিকা-বিস্তারের দ্বারা তাকে নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়। অনুকরণ প্রায় অতিকরণে পৌঁছয়; তাতে রঙ চড়াই বেশি, তার আওয়াজ হয় প্রবল, তার আস্ফালন হয় অত্যুগ্র, অত্যন্ত জোর করে নিজের কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করি জিনিসটা আমারই— অথচ নানা দিক থেকে তার ভঙ্গুরতা তার আত্মবিরোধ প্রকাশ পেতে থাকে। বাইরের জিনিসকে যখন আপন অন্তরের করি তখন তার ভাবটা বজায় থাকতে পারে তবু তার প্রকাশটা হয় নিজের মতো। কিন্তু যতক্ষণ সেটা আমাদের বাইরে জোড়া থাকে, ভিতরে মিলে না যায়, ততক্ষণ সেটা হয় মোটা কলমে দাগাবোলানো অক্ষরের মতো, মূলের চেয়ে আকারে বড়ো, কিন্তু একেবারে তার গায়ে গায় সংলগ্ন। তার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সে অক্ষর লেখকের আপন বাক্যে লেখকের আপন চিন্তিত ভাবকে লিপিবদ্ধ করতে পারে না। আমাদের রাষ্ট্রীয় চেষ্টায়, বাইরে থেকে, ইস্কুলে পড়ার বই থেকে আমরা যা পেয়েছি তা আমাদের প্রাণে সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে নি বলেই অনেক সময় তার বাইরের ছাঁদটাকেই খুব আড়ম্বরের সঙ্গে রেখায় রেখায় মেলাবার গলদ্‌ঘর্ম চেষ্টা করি— এবং সেই মিলটুকু ঘটিয়েই মনে করি, যা পাবার তা পেয়েছি, যা করবার তা করা হল।

'সাধনা' পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি। তাতে আমি এই কথাটার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি। তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গবর্মেন্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতেম। আমাদের দেশে পোলিটিকাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনের তরুণেরা ঠিকমত কল্পনা করতেই পারবেন না। তখনকার পলিটিক্‌সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মিলনীতে, গ্রাম্যজনমণ্ডলীসভাতে, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারতেন না। রাজসাহী-সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলাভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন। বিদ্রূপ ও বাধা আমার জীবনের সকল কর্মেই আমি প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছি, এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। পর বৎসর রুগ্‌ণ শরীর নিয়ে ঢাকা-কনফারেন্‌সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্‌যোগ করেছি। বাঙালির ছেলের পক্ষে যে গালি সব চেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানি নে। এত বড়ো দুঃসহ লাঞ্ছনা আমি নীরবে সহ্য করেছিলুম তার একটা কারণ, ইংরেজিভাষা-শিক্ষায় বাল্যকাল থেকে আমি সত্যই অবহেলা করেছি; দ্বিতীয় কারণ, পিতৃদেবের শাসনে তখনকার দিনেও আমাদের পরিবারে পরস্পর পত্র লেখা প্রভৃতি ব্যাপারে ইংরেজিভাষা ব্যবহার অপমানজনক বলে গণ্য হত।

ইতিমধ্যে কার্জন লাটের হুকুমে দিল্লির দরবারের উদ্‌যোগ হল। তখন রাজশাসনের তর্জন স্বীকার করেও আমি তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলুম। সেই প্রবন্ধ যদি হাল আমলের পাঠকরা পড়ে দেখেন তবে দেখবেন, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক সম্বন্ধের বেদনা ও অপমানটা যে কোথায় আমার সেই লেখায় কতকটা প্রকাশ করেছি। আমি এই বলতে চেয়েছিলুম, দরবার জিনিসটা প্রাচ্য— পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়। প্রাচ্য অনুষ্ঠানের প্রাচ্যতা কিসে। সে হচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ স্বীকার করা। তরবারির জোরে প্রতাপের যে সম্বন্ধ সে হল বিরুদ্ধ সম্বন্ধ, আর প্রভূত দাক্ষিণ্যের দ্বারা যে সম্বন্ধ সেইটেই নিকটের। দরবারে সম্রাট আপন অজস্র ঔদার্য প্রকাশ করবার উপলক্ষ পেতেন— সেদিন তাঁর দ্বার অবারিত, তাঁর দান অপরিমিত। পাশ্চাত্য নকল দরবারে সেই দিকটাতে কঠিন কৃপণতা, সেখানে জনসাধারণের স্থান সংকীর্ণ, পাহারাওয়ালার অস্ত্রে শস্ত্রে রাজপুরুষদের সংশয়বুদ্ধি কণ্টকিত— তার উপরে এই দরবারের ব্যয় বহনের ভার দববারের অতিথিদেরই 'পরে। কেবলমাত্র নতমস্তকে রাজার প্রতাপকে স্বীকার করাবার জন্যেই এই দরবার। উৎসবের সমারোহ-দ্বারা পরস্পরের সম্বন্ধের অন্তর্নিহিত অপমানকেই আড়ম্বর করে বাইরে প্রকাশ করা হয়। এই কৃত্রিম হৃদয়হীন আড়ম্বরে প্রাচ্যহৃদয় অভিভূত হতে পারে, এমন কথা চিন্তা করার মধ্যেও অবিমিশ্র ঔদ্ধত্য এবং প্রজার প্রতি অপমান। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভুত্ব তার আইনে, তার মন্ত্রগৃহে, তাব শাসনতন্ত্রে ব্যাপ্তভাবে আছে কিন্তু সেইটেকে উৎসবের আকার দিয়ে উৎকট করে তোলার কোনো প্রয়োজন মাত্রই নেই।

বরঞ্চ এইরকম কৃত্রিম উৎসবে স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দেওয়া হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ খুব কঠিন হয়ে আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের মানব সম্বন্ধ নেই, যান্ত্রিক সম্বন্ধ। এ দেশের সঙ্গে তার লাভের যোগ আছে, ব্যবহারের যোগ আছে, হৃদয়ের যোগ নেই। কর্তব্যের জালে দেশ আবৃত, সেই কর্তব্যের নৈপুণ্য এবং উপকারিতা স্বীকার করলেও আমাদের মানবপ্রকৃতি স্বভাবতই সেই প্রাণহীন শাসনতন্ত্রে পীড়া বোধ করে।

এই বেদনাই মনে নিয়ে আমার লেখায় আমি বিশেষ করে এবং বার বার করে বলেছি যে, ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষের সকলপ্রকার হিতকর দান কোনো একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাত দিয়েই চিরদিন গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়, তা হলে তার সুবিধা সুযোগ যতই থাক, তার চেয়ে দুর্গতি আমাদের আর হতেই পারে না। সরকারবাহাদুর-নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাবনিবারণের আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই এইরকম ধারণা মনে বদ্ধমূল হতে দেওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে নিজে যথার্থভাবে হারাই। আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয় নি তার প্রধান কারণ এ নয় যে, এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে, যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা-দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলি নি— একে অধিকার করতে পারি নি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি ; তারই 'পরে অন্যায় আমরা মরে গেলেও সহ্য করতে পারি নে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের দেশ পরাধীন বলেই তার সেবা সম্বন্ধে দেশের লোক উদাসীন। এমন কথা শোনবার যোগ্য নয়। সত্যকার প্রেম অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই সেবার ভিতর দিয়ে স্বতই আত্মত্যাগ করতে উদ্যত হয়। বাধা পেলে তার উদ্যম বাড়ে বৈ কমে না। আমরা কন্‌গ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি, কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধসংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টা-দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্‌যোগ করি নি। কেবলই নিজেকে এবং অন্যকে এই বলেই ভোলাই যে, যেদিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এমনি করে কর্তব্যকে সুদূরে ঠেকিয়ে রাখা, অকর্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ত রচনা করা, নিরুৎসুক নিরুদ্যম দুর্বল চিত্তেরই

পক্ষে সম্ভব।

আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে কেউই কেড়ে নিতে পারে না, এবং সেই দেশকে বাইরে থেকে দয়া করে কেউ আমাদের হাতে তুলে দেবে এমন শক্তি কারও নেই। দেশের 'পরে নিজের স্বাভাবিক অধিকারকে যে পরিমাণে আমরা ত্যাগ করেছি সেই পরিমাণেই অন্যে তাকে অধিকার করেছে। এই চিন্তা করেই একদিন আমি 'স্বদেশী সমাজ' নাম দিয়ে একটি বক্তৃতা করেছিলুম। তার মর্মকথাটা আর-একবার সংক্ষেপে বলবার প্রয়োজন আছে।

চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা ; গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশের উপর দিয়ে রাজ্য-সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজায় রাজায় নিয়তই রাজত্ব নিয়ে হাত-ফেরাফেরি চলল. বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন-কাড়াকাড়ি করতে লাগল— লুঠপাট অত্যাচারও কম হল না— কিন্তু তবু দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে, তার অন্নবস্ত্র ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের, রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান, সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে। কিন্তু চীন ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে— তার কারণ, সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত।

পাশ্চাত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল রাজশাসন তাকে অধিকার করলে। যখন থেকে এই অধিকার পাকা হয়ে উঠল তখন থেকে গ্রামে গ্রামে দিঘিতে গেল জল শুকিয়ে ; জীর্ণ মন্দিরে, শূন্য অতিথিশালায় উঠল অশথ গাছ ; জাল-জালিয়াতি মিথ্যা-মকদ্দমাকে বাধা দেবার কিছু রইল না ; রোগে তাপে দৈন্যে অজ্ঞানে অধর্মে সমস্ত দেশ রসাতলে তলিয়ে গেল।

সকলের চেয়ে বিপদ হল এই যে, দেশ দেশের লোকের কাছে কিছু চাইলে আর সাড়া পায় না। জলদান অন্নদান বিদ্যাদান সমস্তই সরকার-বাহাদুরের মুখ তাকিয়ে। এইখানেই দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েছে। দেশের লোকের সঙ্গে দেশ যথার্থভাবে সেবার সম্বন্ধসূত্রে যুক্ত, সেইখানেই ঘটেছে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ। আগে স্বরাজ পেলে তবে সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলতে থাকবে এ কথা বলাও যা আর আগে ধনলাভ হবে তার পরে ছেলে মাকে স্বীকার করবে এ কথা বলাও তাই। দারিদ্র্যের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলা উচিত— বস্তুত সেই অবস্থায় সম্বন্ধের দাবি বাড়ে বৈ কমে না। 'স্বদেশী সমাজে' তাই আমি বলেছিলুম, ইংরেজ আমাদের রাজা কিংবা আর-কেউ আমাদের রাজা এই কথাটা নিয়ে বকাবকি করে সময় নষ্ট না করে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, নিজের দেশকে নিজে সত্যভাবে অধিকার করবার চেষ্টা সর্বাগ্রে করতে হবে। দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে কেমন করে দেশে বিস্তীর্ণ করা যেতে পারে 'স্বদেশী সমাজে' আমি তারই আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলুম। খদ্দর-পরা দেশই যে সমগ্র দেশের সম্পূর্ণ আদর্শ এ কথা আমি কোনোমতেই মানতে পারি নে ; যখন দেশের আত্মা সজাগ ছিল তখন সে যে কেবলমাত্র আপন তাঁতে বোনা কাপড় আপনি পরেছে তা নয়, তখন তার সমাজে তার বহুধা শক্তি বিচিত্র সৃষ্টিতে আপনাকে সার্থক করেছে। আজ সমগ্রভাবেই সেই শক্তির দৈন্য ঘটেছে, কেবলমাত্র চরকায় সুতো কাটবার শক্তির দৈন্য নয়।

আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা— এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ সে তো কোনো বাহ্য প্রক্রিয়ার অন্ধ পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে

পারে না। তার জন্যে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদবোধন— সে কি এই চরকা-চালনায়। চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই কি এতকাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে কর্মকে আড়ষ্ট করে রাখি নি। আমাদের দেশের সব চেয়ে বড়ো দুর্গতিব কারণ কি তাই নয়। আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাই নে, বিদ্যা চাই নে, প্রীতি চাই নে, পৌরুষ চাই নে, অন্তরপ্রকৃতির মুক্তি চাই নে, সকলের চেয়ে বড়ো করে একমাত্র করে চাই চোখ বুজে মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন চালানো হয়েছিল তারই অনুবর্তন ক'রে। স্বরাজ-সাধনযাত্রায় এই হল রাজপথ ? এমন কথা বলে মানুষকে কি অপমান করা হয় না।

বস্তুত যখন সমগ্রভাবে দেশের বুদ্ধিশক্তি কর্মশক্তি উদ্যত থাকে তখন অন্য দেশ থেকে কাপড় কিনে পরলেও স্বরাজের মূলে আঘাত লাগে না। গাছের গোড়ায় বিদেশী সার দিলেই গাছ বিদেশী হয় না, যে মাটি তার স্বদেশী তার মূলগত প্রাধান্য থাকলে ভাবনা নেই। পৃথিবীতে স্বরাজী এমন কোনো দেশই নেই যেখানে অন্য দেশের আমদানি জিনিস বহুল পরিমাণে ব্যবহার না করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তারা নানা চেষ্টায় আপন শক্তিকেও সার্থক করছে— কেবল এক দিকে নয়, কেবল বণিকের মতো পণ্য-উৎপাদনে নয়, বিদ্যা-অর্জনে, বুদ্ধির আলোচনায়, লোকহিতে, শিল্পসাহিত্য-সৃষ্টিতে, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে। সে দিকে যদি আমাদের দেশে অভাব থাকে তবে নিজের হাত দুটোকে মনোবিহীন কল-আকারে পরিণত করে আমরা যতই সুতো কাটি আর কাপড় বুনি আমাদের লজ্জা যাবে না, আমরা স্বরাজ পাব না।

আম প্রথম থেকে রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারংবার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করি নে। আপন পক্ষের কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে আছি বলেই অপর পক্ষের কথা নিয়ে এত অত্যন্ত অধিক করে আমরা আলোচনা করে থাকি। তাতে শক্তিহ্রাস হয়। স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই। সে পরিচয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত। দেশের সেবার মধ্যে দেশের প্রতি প্রীতির প্রকাশ কোনো বাহ্য অবস্থান্তরের অপেক্ষা করে না, তার নির্ভর একমাত্র আন্তরিক সত্যের প্রতি। আজ যদি দেখি সেই প্রকাশ অলস উদাসীন, তবে বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ পেলেই অন্তরের সেই জড়তা দূর হবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে। আগে আমাদের বাহিরের বাধা দূর হবে, তার পরে আমাদের দেশপ্রীতি অন্তরের বাধা ভেদ করে পরিপূর্ণ শক্তিতে দেশের সেবায় নিযুক্ত হবে, এমন আত্মবিড়ম্বনার কথা আমরা যেন না বলি। যে মানুষ বলে 'আগে ফাউন্টেন-পেন পাব তার পরে মহাকাব্য লিখব' বুঝতে হবে তার লোভ ফাউন্টেন-পেনের প্রতিই, মহাকাব্যের প্রতি নয়। যে দেশাত্মবোধী বলে, 'আগে স্বরাজ পেলে তার পরে স্বদেশের কাজ করব' তার লোভ পতাকা-ওড়ানো উর্দি-পরা স্বরাজের রঙকরা কাঠামোটার 'পরেই। একজন আর্টিস্টকে জানি, তিনি অনেক দিন থেকে বলে এসেছিলেন, 'রীতিমত স্টুডিয়ো আমার অধিকারে না পেলে আমি হাতের কাজ দেখাতে পারব না।' তাঁর স্টুডিয়ো জুটল, কিন্তু হাতের কাজ আজও এগোয় না। যতদিন স্টুডিয়ো ছিল না ততদিন ভাগ্যকে ও অন্য সকলকে কৃপণ বলে দোষ দেবার সুযোগ তাঁর ছিল, স্টুডিয়ো পাবার পর থেকে তাঁর হাতও চলে না, মুখও চলে না। স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথাও তেমনিই সত্যহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

হিন্দু-মুসলমান

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল সমাজের ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত এক মহাজাতিকে জাগিয়ে তুলে একচ্ছত্র আসন রচনা করব বলে দেশনেতারা পণ করেছেন।

ঐ আসন জিনিসটা অর্থাৎ যাকে বলে কন্‌স্টিট্যুশ্যান, ওটা বাইরের, রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থায় আমাদের পরস্পরের অধিকার-নির্ণয় দিয়ে সেটা গড়েপিটে তুলতে হবে। তার নানা রকমের নমুনা নানা দেশের ইতিহাসে দেখেছি, তারই থেকে যাচাই বাছাই করে প্ল্যান ঠিক করা চলছে। এই ধারণা ছিল, ওটাকে পাকা করে খাড়া করবার বাধা বাইরে, অর্থাৎ বর্তমান কর্তৃপক্ষদের ইচ্ছার মধ্যে। তারই সঙ্গে রফা করবার, তকরার করবার কাজে কিছুকাল থেকে আমরা উঠে পড়ে লেগেছি।

যখন মনে হল কাজ এগিয়েছে, হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে দেখি, মস্ত বাধা নিজেদের মধ্যেই। গাড়িটাকে তীর্থে পৌঁছে দেবার প্রস্তাবে সারথি যদি-বা আধ-রাজি হল ওটাকে আস্তাবল থেকে ঠেলে বের করবার সময় হুঁশ হল, এক্কা গাড়িটার দুই চাকায় বিপরীত রকমের অমিল, চালাতে গেলেই উলটে পড়বার জো হয়।

যে বিরুদ্ধ মানুষটার সঙ্গে আমাদের বাইরের সম্বন্ধ, বিবাদ করে একদিন তাকে হটিয়ে বাহির করে দেওয়া দুঃসাধ্য হলেও নিতান্ত অসাধ্য নয়, সেখানে আমাদের হারজিতের মামলা। কিন্তু ভিতরের লোকের বিবাদে কোনো এক পক্ষ জিতলেও মোটের উপর সেটা হার, আর হারলেও শান্তি নেই। কোনো পক্ষকে বাদ দেবারও জো নেই, আবার দাবিয়ে রাখতে গেলেও উৎপাতকে চিরকাল উত্তেজিত করে রাখাই হবে। ডান পাশের দাঁত বাঁ পাশের দাঁতকে নড়িয়ে দিয়ে যদি বড়াই করতে চায় তবে অবশেষে নিজে অনড় থাকবে না।

এতদিন রাষ্ট্রসভায় বরসজ্জাটার 'পরেই একান্ত মন দিয়েছিলুম, আসনটা কেমন হবে এই কথা ভেবেই মুগ্ধ। ওটা মহামূল্য ও লোভনীয়। প্রতিবেশীরা যারা কিংখাবের আসন বানিয়েছে তাদের আসরের ঘটা দেখে ঈর্ষা হয়। কিন্তু হায় রে, স্বয়ং বরকে বরণ করবার আন্তরিক আয়োজন বহুকাল থেকে ভুলেই আছি। আজ তাই পণ নিয়ে বরযাত্রীদের লড়াই বাধে। শুভকর্মে অশুভ গ্রহের শান্তির কথাটায় প্রথম থেকেই মন দিই নি, কেবল আসনটার মালমসলার ফর্দ নিয়ে বেলা বইয়ে দিয়েছি।

রাষ্ট্রিক মহাসন-নির্মাণের চেয়ে রাষ্ট্রিক মহাজাতি-সৃষ্টির প্রয়োজন আমাদের দেশে অনেক বড়ো, এ কথা বলা বাহুল্য। সমাজে ধর্মে ভাষায় আচারে আমাদের বিভাগের অন্ত নেই। এই বিদীর্ণতা আমাদের রাষ্ট্রিক সম্পূর্ণতার বিরোধী ; কিন্তু তার চেয়ে অশুভের কারণ এই যে, এই বিচ্ছেদে আমাদের মনুষ্যত্ব-সাধনার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে ; মানুষে মানুষে কাছাকাছি বাস করে তবু কিছুতে মনের মিল হয় না, কাজের যোগ থাকে না, প্রত্যেক পদে মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়, এটা বর্বরতার লক্ষণ। অথচ আমরা যে আত্মশাসনের দাবি করছি সেটা তো বর্বরের প্রাপ্য নয়। যাদের ধর্মে সমাজে প্রথায়, যাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে, এমন একটা মজ্জাগত জোড়-ভাঙানো দুর্যোগ আছে যে তারা কথায় কথায় একখানাকে সাতখানা করে ফেলে, সেই ছত্রভঙ্গের দল ঐকরাষ্ট্রিক সত্তাকে উদ্ভাবিত করবে কোন্‌ যন্ত্রের সাহায্যে।

যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে।

ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে, যখন কোনো মহাজাতি নবজীবনের প্রেরণায় রাষ্ট্রবিপ্লব প্রবর্তন করেছে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার ধর্মবিদ্বেষ। দেড়শত বৎসর পূর্বকার ফরাসি বিপ্লবে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সোভিয়েট রাশিয়া প্রচলিত ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি

স্পেনেও এই ধর্মহননের আগুন উদ্দীপ্ত। মেক্সিকোয় বিদ্রোহ বারে বারে রোমক চার্চকে আঘাত করতে উদ্যত।

নব্য তুর্কী যদিও প্রচলিত ধর্মকে উন্মূলিত করে নি, কিন্তু বলপূর্বক তার শক্তি হ্রাস করেছে। এর ভিতরকার কথাটা এই যে, বিশেষ ধর্মের আদিপ্রবর্তকগণ দেবতার নামে মানুষকে মেলাবার জন্যে, তাকে লোভ দ্বেষ অহংকার থেকে মুক্তি দেবার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলেন। তার পরে সম্প্রদায়ের লোক মহাপুরুষদের বাণীকে সংঘবদ্ধ করে বিকৃত করেছে, সংকীর্ণ করেছে ; সেই ধর্ম দিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মার মেরেছে এমন বিষয়বুদ্ধি দিয়েও নয় ; মেরেছে প্রাণে মানে বুদ্ধিতে শক্তিতে, মানুষের মহোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যকে ছারখার করেছে। ধর্মের নামে পুরাতন মেক্সিকোয় স্পেনীয় খৃস্টানদের অকথ্য নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই। পৃথিবীতে অপ্রতিহত প্রভুত্ব নিয়ে রাজা যেমন কতবার দুর্দান্ত অরাজকতায় মত্ত হয়েছে, প্রজার রক্ষাকর্তা নাম নিয়ে প্রজার সর্বনাশ করতে কুণ্ঠিত হয় নি, এবং অবশেষে সেই কারণেই আজকের ইতিহাসে রাজ্য থেকে রাজার কেবলই বিলুপ্তি ঘটছে, ধর্ম সম্বন্ধেও অনেক স্থলে সেই একই কারণে ধর্মতন্ত্রের নিদারুণ অধার্মিকতা দমন করবার জন্যে, মানুষকে ধর্মপীড়া থেকে বাঁচাবার জন্যে অনেকবার চেষ্টা দেখা গেল। আজ সেই সেই দেশেই প্রজা যথার্থ স্বাধীনতা পেয়েছে যে দেশে ধর্মমোহ মানুষের চিত্তকে অভিভূত করে এক-দেশ-বাসীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঔদাসীন্য বা বিরোধকে নানা আকারে ব্যাপ্ত করে না রেখেছে।

হিন্দুসমাজে আচার নিয়েছে ধর্মের নাম। এই কারণে আচারের পার্থক্যে পরস্পরের মধ্যে কঠিন বিচ্ছেদ ঘটায়। মৎস্যাশী বাঙালিকে নিরামিষ প্রদেশের প্রতিবেশী আপন বলে মনে করতে কঠিন বাধা পায়। সাধারণত বাঙালি অন্য প্রদেশে গিয়ে অভ্যস্ত আচারের ব্যতিক্রম উপলক্ষে অবজ্ঞা মনের মধ্যে পোষণ করে। যে চিত্তবৃত্তি বাহ্য আচারকে অত্যন্ত বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে তার মমত্ববোধ সংকীর্ণ হতে বাধ্য। রাষ্ট্রসম্মিলনীতেও এই অভাব কথায় কথায় ধরা পড়ে এবং দেখা যায়, আমরা যে অলক্ষ্য ব্যবধান সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াই তা সংস্কারগত, অতি সূক্ষ্ম এবং সেইজন্য অতি দুর্লঙ্ঘ্য। আমরা যখন মুখে তাকে অস্বীকার করি তখনো নিজের অগোচরেও সেটা অন্তঃকরণের মধ্যে থেকে যায়। ধর্ম আমাদের মেলাতে পারে নি, বরঞ্চ হাজারখানা বেড়া গড়ে তুলে সেই বাধাগুলোকে ইতিহাসের অতীত শাশ্বত বলে পাকা করে দিয়েছে। ইংরেজ নিজের জাতকে ইংরেজ বলেই পরিচয় দেয়। যদি বলত খৃস্টান তা হলে যে ইংরেজ বৌদ্ধ বা মুসলমান বা নাস্তিক তাকে নিয়ে রাষ্ট্রগঠনে মাথা ঠোকাঠুকি বেধে যেত। আমাদের প্রধান পরিচয় হিন্দু বা মুসলমান। এক দলকে বিশেষ পরিচয়কালে বলি বটে হিন্দুস্থানি, কিন্তু তাদের হিন্দুস্থান বাংলার বাইরে।

কয়েক বছর পূর্বে আমার ইংরেজ বন্ধু এন্ড্রুজকে নিয়ে মালাবারে ভ্রমণ করছিলুম। ব্রাহ্মণপল্লীর সীমানায় পা বাড়াতেই টিয়া-সমাজ-ভুক্ত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে দৌড় দিলেন। এন্ড্রুজ বিস্মিত হয়ে তাঁকে গিয়ে ধরলেন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে জানলেন, এ পাড়ায় তাঁদের জাতের প্রবেশ নিষেধ। বলা বাহুল্য, হিন্দুসমাজবিধি-অনুসারে এন্ড্রুজের আচার বিচার টিয়া-ভদ্রলোকের চেয়ে অনেক গুণে অশাস্ত্রীয়। শাসনকর্তার জাত বলে তাঁর জোর আছে, কিন্তু হিন্দু বলে হিন্দুর কাছে আত্মীয়তার জোর নেই। তার সম্বন্ধে হিন্দুর দেবতা পর্যন্ত জাত বাঁচিয়ে চলেন, স্বয়ং জগন্নাথ পর্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শনীয় নন। বৈমাত্র সন্তানও মাতার কোলের অংশ দাবি করতে পারে— ভারতে বিশ্বমাতার কোলে এত ভাগ কেন। অনাত্মীয়তাকে অস্থিমজ্জায় আমরা সংস্কারগত করে রেখেছি, অথচ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাদের আত্মীয়তা না পেলে আমরা বিস্মিত হই। শোনা গিয়েছে, এবার পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও হিন্দুর প্রতি উৎপাতে নমশূদ্ররা নির্দয়ভাবে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ভাবতে হবে না কি, ওদের দরদ হল না কেন, আত্মীয়তার দায়িত্বে বাধা পড়ল কোথায়।

এই অনাত্মীয়তার অসংখ্য অন্তরাল বহু যুগ ধরে প্রকাশ্যে আমাদের রাষ্ট্রভাগ্যকে ব্যর্থ করেছে এবং আজও ভিতরে ভিতরে আমাদের দুঃখ ঘটাচ্ছে। জোর গলায় যেখানে বলছি আমরা এক, সূক্ষ্ম সুরে সেখানে অন্তর্যামী আমাদের মর্মস্থানে বসে বলছেন, 'ধর্মে-কর্মে আচারে-বিচারে এক হবার মতো ঔদার্য

তোমাদের নেই।' এর ফল ফলছে— আর রাগ করছি ফলের উপরে, বীজবপনের উপরে নয়।

যখন বঙ্গবিভাগের সাংঘাতিক প্রস্তাব নিয়ে বাঙালির চিত্ত বিক্ষুব্ধ তখন বাঙালি অগত্যা বয়কট-নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছিল। বাংলার সেই দুর্দিনের সুযোগে বোম্বাই-মিলওয়ালা নির্মমভাবে তাঁদের মুনফার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টাকে প্রতিহত করতে কুণ্ঠিত হন নি। সেইসঙ্গে দেখা গেল, বাঙালি মুসলমান সেদিন আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। সেই যুগেই বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানে লজ্জাজনক কুৎসিত কাণ্ডের সূত্রপাত হল। অপরাধটা প্রধানত কোন পক্ষের এবং এই উপদ্রব অকস্মাৎ কোথা থেকে উৎসাহ পেলে, সে তর্কে প্রয়োজন নেই। আমাদের চিন্তা করবার বিষয়টা হচ্ছে এই যে, বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলে বাঙালিজাতের মধ্যে যে পঙ্গুতার সৃষ্টি হত সেটা বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের এবং বস্তুত সমস্ত ভারতবর্ষেরই পক্ষে অকল্যাণকর, এটা যথার্থ দরদ দিয়ে বোঝবার মতো একাত্মতা আমাদের নেই বলে সেদিন বাঙালি হিন্দুর বিরুদ্ধে অনাত্মীয় অসহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্রপ্রতিমার কাঠামো গড়বার সময় এ কথাটা মনে রাখা দরকার। নিজেকে ভোলানোর ছলে বিধাতাকে ভোলাতে পারব না।

এই ব্যাপারে সেদিন অনেকেই রাগারাগি করেছিলেন। কিন্তু ফুটো কলসিতে জল তুলতে গেলে জল যে পড়ে যায়, তা নিয়ে জলের উপরে বা কলসির উপরে চোখ রাঙিয়ে লাভ কী। গরজ আমাদের যতই থাক, ছিদ্রটা স্বভাবত ছিদ্রের মতোই ব্যবহার করবে। কলঙ্ক আমাদেরই আর সে কলঙ্ক যথাসময়ে ধরা পড়বেই, দৈবের কৃপায় লজ্জা-নিবারণ হবে না।

কথা হয়েছে, ভারতবর্ষে একরাষ্ট্রশাসন না হয়ে যুক্তরাষ্ট্রশাসননীতির প্রবর্তন হওয়া চাই। অর্থাৎ একেবারে জোড়ের চিহ্ন থাকবে না এতটা দূর মিলে যাবার মতো ঐক্য আমাদের দেশে নেই, এ কথাটা মেনে নিতে হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রসমস্যার এ একটা কেজো রকমের নিষ্পত্তি বলে ধরে নেওয়া যাক। কিন্তু তবু একটা কঠিন গ্রন্থি রয়ে গেল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ ও বিরোধ। এই বিচ্ছেদটা নানা কারণে আন্তরিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রলেপ দিয়ে এর ফাটল নিবারণ করা চলবে না, কোনো কারণে একটু তাপ বেড়ে উঠলেই আবার ফাটল ধরবে।

যেখানে নিজেদের মধ্যে সত্যকার ভেদ সেখানেই রাষ্ট্রিক ক্ষমতার হিস্যা নিয়ে স্বতন্ত্র কোঠায় স্বতন্ত্র হিসাব চলতে থাকে। সেখানে রাষ্ট্রিক সম্পদে সকলেরই অখণ্ড স্বার্থের কথাটা স্বভাবতই মনে থাকে না। এমন দুর্গ্রহে একই গাড়িকে দুটো ঘোড়া দু দিকে টানবার মুশকিল বাধায়। এখন থেকেই অধিকারের ভাগ-বখরা নিয়ে হট্টগোল জেগেছে। রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়বুদ্ধির যোগে গোল-টেবিল পেরিয়েও এই গোল উত্তরোত্তর বাড়বে বৈ কমবে এমন আশা আছে কি। বিষয়বুদ্ধির আমলে সহোদর ভাইদের মধ্যেও বচসা বেধে যায়। শেষকালে গুণ্ডাদের হাতেই লাঠিসড়কির যোগে যমের দ্বারে চরম নিষ্পত্তির ভার পড়ে।

একদল মুসলমান সম্মিলিত নির্বাচনের বিরুদ্ধে, তাঁরা স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতি দাবি করেন এবং তাঁদের পক্ষের ওজন ভারী করবার জন্যে নানা বিশেষ সুযোগের বাটখারা বাড়িয়ে নিতে চান। যদি মুসলমানদের সবাই বা অধিকাংশ একমত হয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতির দাবি করেন এবং নিজেদের পক্ষের ওজন বাড়িয়ে নিতে চান, তা হলে এমনতরো দাবি মেনে নিয়েও আপস করতে মহাত্মাজি রাজি আছেন বলে বোধ হল। তা যদি হয়, তাঁর প্রস্তাব মাথা পেতে নেওয়াই ভালো। কেননা, ভারতবর্ষের তরফে রাষ্ট্রিক যে অধিকার আমাদের জয় করে নিতে হবে তার সুস্পষ্ট মূর্তি এবং সাধনার প্রণালী সমগ্রভাবে তাঁরই মনে আছে। এপর্যন্ত একমাত্র তিনিই সমস্ত ব্যাপারটাকে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে প্রবল বাধার বিরুদ্ধে অগ্রসর করে এনেছেন। কাজ-উদ্ধারের দিকে দৃষ্টি রাখলে শেষ পর্যন্ত তাঁরই হাতে সারথ্যভার দেওয়া সংগত। তবু, একজনের বা একদলের ব্যক্তিগত সহিষ্ণুতার প্রতি নির্ভর করে এ কথা ভুললে চলবে না যে, অধিকার-পরিবেশনে কোনো এক পক্ষের প্রতি যদি পক্ষপাত করা হয় তবে সাধারণ মানবপ্রকৃতিতে সেই অবিচার সইবে না, এই নিয়ে একটা অশান্তি নিয়তই মারমুখো হয়ে থেকে যাবে। বস্তুত এটা পরস্পরের বিবাদ মেটাবার পন্থা নয়। সকলেই যদি একজোট হয়ে প্রসন্নমনে

একঝোকা আপস করতে রাজি হয় তা হলে ভাবনা নেই। কিন্তু মানুষের মন ' তার কোনো-একটা তারে যদি অত্যন্ত বেশি টান পড়ে তবে সুর যায় বিগড়ে, তখন সংগীতের দোহাই পাড়লেও সংগত মাটি হয়। ঠিক জানি না কী ভাবে মহাত্মাজি এ সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। হয়তো গোল-টেবিল-বৈঠকে আমাদের সম্মিলিত দাবির জোর অক্ষুণ্ণ রাখাই আপাতত সব চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হতে পারে। দুই পক্ষই আপন আপন জিদে সমান অটল হয়ে বসলে কাজ এগোবে না। এ কথা সত্য। এ ক্ষেত্রে এক পক্ষে ত্যাগ স্বীকার করে মিটমাট হয়ে গেলে উপস্থিত রক্ষা হয়। একেই বলে ডিপ্লোম্যাসি। পলিটিকসে প্রথম থেকেই ষোলো-আনা প্রাপ্যের উপর চেপে বসলে ষোলো-আনাই খোয়াতে হয়। যারা অদূরদর্শী কৃপণের মতো অত্যন্ত বেশি টানাটানি না করে আপস করতে জানে তারাই জেতে। ইংরেজের এই গুণ আছে, নৌকোডুবি বাঁচাতে গিয়ে অনেকটা মাল ইংরেজ জলে ফেলে দিতে পারে। আমার নিজের বিশ্বাস, বর্তমান আপসের প্রস্তাবে ইংরেজের কাছে আমরা যে প্রকাণ্ড ক্ষতি-স্বীকার দাবি করছি সেটা য়ুরোপের আর-কোনো জাতির কাছে একেবারেই খাটত না—তারা আগাগোড়াই ঘুষি উঁচিয়ে কথাটা সম্পূর্ণ চাপা দেবার চেষ্টা করত। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে ইংরেজের সুবুদ্ধি বিখ্যাত। ইংরেজ সবখানির দিকে তাকিয়ে অনেকখানি সহ্য করতে পারে। এই বুদ্ধির প্রয়োজন যে আমাদের নেই, এ কথা গোঁয়ারের কথা; আখেরে গোঁয়ারের হার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রিক অধিকার সম্বন্ধে একগুঁয়ে ভাবে দর-কষাকষি নিয়ে হিন্দু মুসলমানে মন-কষাকষিকে অত্যন্ত বেশিদূর এগোতে দেওয়া শত্রুপক্ষের আনন্দবর্ধনের প্রধান উপায়।

আমার বক্তব্য এই যে, উপস্থিত কাজ-উদ্ধারের খাতিরে আপাতত নিজের দাবি খাটো করেও একটা মিটমাট করা সম্ভব হয় তো হোক, কিন্তু তবু আসল কথাটাই বাকি রইল। পলিটিকসের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু তালি-দেওয়া মিল হতে পারে সে মিলে আমাদের চিরকালের প্রয়োজন টিঁকবে না। এমন-কি, পলিটিকসেও এ তালিটুকু বরাবর অটুট থাকবে এমন আশা নেই, ঐ ফাঁকির জোড়টার কাছে বারে বারেই টান পড়বে। যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলতে হবে সেই গোড়ায়, নইলে কিছুতে কল্যাণ নেই।

এতদিন সেই গোড়ার দিকে এক রকমের মিল ছিল। পরস্পরের তফাত মেনেও আমরা পরস্পর কাছাকাছি ছিলুম। সম্প্রদায়ের গণ্ডীর উপর ঠোকর খেয়ে পড়তে হত না, সেটা পেরিয়েও মানুষে মানুষে মিলের যথেষ্ট জায়গা ছিল। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল, দুই পক্ষই আপন ধর্মের অভিমানকে উঁচিয়ে তুলতে লেগেছে। যতদিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ সহজ ছিল ততদিন গোঁড়ামি থাকা সত্ত্বেও কোনো হাঙ্গাম বাধে নি। কিন্তু, এক সময়ে যে কারণেই হোক, ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে। আমরাও মসজিদের সামনে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় কিছু অতিরিক্ত জিদের সঙ্গে ঢাকে কাঠি দিলুম, অপর পক্ষেও কোরবানির উৎসাহ পূর্বের চেয়ে কোমর বেঁধে বাড়িয়ে তুললে, সেটা আপন আপন ধর্মের দাবি মেটাবার খাতির নিয়ে নয়, পরস্পরের ধর্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্ধা নিয়ে। এই-সমস্ত উৎপাতের শুরু হয়েছে শহরে, যেখানে মানুষে মানুষে প্রকৃত মেলামেশা নেই বলেই পরস্পরের প্রতি দরদ থাকে না।

ধর্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে, এ কথা মানতেই হবে। অতএব আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে, তৎসত্ত্বেও ভালোরকম করে মেলা চাই। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ আমাদের না হলে নয়। কিন্তু এর একান্ত আবশ্যকতার কথা আমাদের সমস্ত হৃদয়মন দিয়ে আজও ভাবতে আরম্ভ করি নি। একদা খিলাফতের সমর্থন করে মহাত্মাজি মিলনের সেতু নির্মাণ করতে পারবেন মনে করেছিলেন। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। এটা গোড়াকার কথা নয়, এই খেলাফত সম্বন্ধে মতভেদ থাকা অন্যায় মনে করি নে, এমন-কি, মুসলমানদের মধ্যেই যে থাকতে পারে তার প্রমাণ হয়েছে।

নানা উপলক্ষে এবং বিনা উপলক্ষে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ-আলাপ চাই। যদি

আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তা হলেই দেখতে পাব, মানুষ বলেই মানুষকে আপন বলে মনে করা সহজ। যাদের সঙ্গে মেলামেশা নেই তাদের সম্বন্ধেই মত প্রভৃতির অনৈক্য অত্যন্ত কড়া হয়ে ওঠে, বড়ো হয়ে দেখা দেয়। যখনই পরস্পর কাছাকাছি আনাগোনার চর্চা হতে থাকে তখনই মত পিছিয়ে পড়ে, মানুষ সামনে এগিয়ে আসে। শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো প্রভেদ অনুভব করি নি এবং সখ্য ও স্নেহসম্বন্ধ-স্থাপনে লেশমাত্র বাধা ঘটে নি। যে-সকল গ্রামের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধ তার মধ্যে মুসলমান গ্রাম আছে। যখন কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা দত-সহযোগে কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে চলেছে তখন বোলপুর-অঞ্চলে মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করা হয়েছিল যে, হিন্দুরা মসজিদ ভেঙে দেবার সংকল্প করছে, এইসঙ্গে কলকাতা থেকে গুণ্ডার আমদানিও হয়েছিল। কিন্তু, স্থানীয় মুসলমানদের শান্ত রাখতে আমাদের কোনো কষ্ট পেতে হয় নি, কেননা তারা নিশ্চিত জানত আমরা তাদের অকৃত্রিম বন্ধু।

আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোরবানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত বলে মনে করি নি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে তারা তখনই তা মেনে নিলে। আমাদের সেখানে এপর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটে নি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন।

এ কথা আশা করাই চলে না যে, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্মকর্মের মতবিশ্বাসের ভেদ একেবারেই ঘুচতে পারে। তবুও মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা করতেই হবে আমাদের মধ্যে মিল হবে। পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে মিল আপনিই সহজ হতে পারবে। সঙ্গের দিক থেকে আজকাল হিন্দু-মুসলমান পৃথক হয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে, মনুষ্যত্বের মিলটাকে দিয়েছে চাপা। আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানের ত্রুটিবিচারটা থাক— আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্যে যেন লজ্জা স্বীকার করি। অল্পবয়সে যখন প্রথম জমিদারি সেরেস্তা দেখতে গিয়েছিলুম তখন দেখলুম, আমাদের ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে তক্তপোষে গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে এক ধারে জাজিম তোলা, সেই জায়গাটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্যে, আর জাজিমের উপর বসে হিন্দু প্রজারা। এইটে দেখে আমার ধিক্কার জন্মেছিল। অথচ এই ম্যানেজার আধুনিক দেশাত্মবোধী দলের। ইংরেজরাজের দরবারে ভারতীয়ের অসম্মান নিয়ে কটুভাষাব্যবহার তিনি উপভোগ করে থাকেন, তবু স্বদেশীয়কে ভদ্রোচিত সম্মান দেবার বেলা এত কৃপণ। এই কৃপণতা সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে অনেকদূর পর্যন্ত প্রবেশ করেছে ; অবশেষে এমন হয়েছে যেখানে হিন্দু সেখানে মুসলমানের দ্বার সংকীর্ণ, যেখানে মুসলমান সেখানে হিন্দুর বাধা বিস্তর। এই আন্তরিক বিচ্ছেদ যতদিন থাকবে ততদিন স্বার্থের ভেদ ঘুচবে না এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক পক্ষের কল্যাণভার অপর পক্ষের হাতে দিতে সংকোচ অনিবার্য হয়ে উঠবে। আজ সম্মিলিত নির্বাচন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব বেধে গেছে তার মূল তো এইখানেই। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে যখন আমরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠি তখন এর স্বাভাবিক কারণটার কথা ভেবে দেখি না কেন।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অকথ্য বর্বরতা বারে বারে আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। জার-শাসনের আমলে এইরকম অত্যাচার রাশিয়ায় প্রায় ঘটত। বর্তমান বিপ্লবপ্রবণ পলিটিক্যাল যুগের পূর্বে আমাদের দেশে এরকম দানবিক কাণ্ড কখনো শোনা যায় নি। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে বহু গৌরবের law and order পদার্থটা বড়ো বড়ো শহরে পুলিস-পাহারার জাগ্রত দৃষ্টির সামনে স্পর্ধাসহকারে উপরি উপরি অবমানিত হতে লাগল ঠিক এই বিশেষ সময়টাতেই। মারের দুঃখ কেবল আমাদের পিঠের উপর দিয়েই গেল না, ওটা প্রবেশ করেছে বুকের ভিতরে। এটা এমন সময়ে ঘটল ঠিক যখন হিন্দু-মুসলমান কণ্ঠ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারলে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হত, বিশ্বসভার কাছে আমাদের মাথা হেঁট হত না। এইরকমের অমানুষিক ঘটনায় লোকস্মৃতিকে চিরদিনের মতো বিষাক্ত করে তোলে,

দেশের ডান হাতে বাঁ হাতে মিল করিয়ে ইতিহাস গড়ে তোলা দুঃসাধ্য হয়। কিন্তু, তাই বলেই তো হাল ছেড়ে দেওয়া চলে না; গ্রন্থি জটিল হয়ে পাকিয়ে উঠেছে বলে ক্রোধের বেগে সেটাকে টানাটানি করে আরো আঁট করে তোলা মূঢ়তা। বর্তমানের ঝাঁজে ভবিষ্যতের বীজটাকে পর্যন্ত অফলা করে ফেলা স্বাজাতিক আত্মহত্যার প্রণালী। নানা আশু ও সুদূর কারণে, অনেকদিনের পুঞ্জিত অপরাধে হিন্দু-মুসলমানের মিলনসমস্যা কঠিন হয়েছে, সেইজন্যেই অবিলম্বে এবং দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তার সমাধানে প্রবৃত্ত হতে হবে। অপ্রসন্ন ভাগ্যের উপর রাগ করে তাকে দ্বিগুণ হন্যে করে তোলা চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো।

বর্তমান রাষ্ট্রিক উদযোগে বোম্বাই প্রদেশে আন্দোলনের কাজটা সব চেয়ে সবেগে চলতে পেরেছিল তার অন্যতম কারণ, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বাধিয়ে দেবার উপকরণ যথেষ্ট ছিল না। পার্সিতে হিন্দুতে দুই পক্ষ খাড়া করে তোলা সহজ হয় নি। কারণ, পার্সি-সমাজ সাধারণত শিক্ষিতসমাজ, স্বদেশের কল্যাণ সম্বন্ধে পার্সিরা বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করতে জানে, তা ছাড়া তাদের মধ্যে ধর্মোন্মত্ততা নেই। বাংলাদেশে আমরা আছি জতুগৃহে, আগুন লাগাতে বেশিক্ষণ লাগে না। বাংলাদেশে পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যখনই নামি ঠিক সেই সময়টাতেই নিজের ঘর সামলানো অসাধ্য হয়ে ওঠে। এই দুর্যোগের কারণটা আমাদের এখানে গভীর করে শিকড় গেড়েছে, এ কথাটা মেনে নিতেই হবে। এ অবস্থায় শান্তমনে বুদ্ধিপূর্বক পরস্পরের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের উপায় উদভাবনে যদি আমরা অক্ষম হই, বাঙালি-প্রকৃতি-সুলভ হৃদয়াবেগের ঝোঁকে যদি কেবলই জেদ জাগিয়ে স্পর্ধা পাকিয়ে তুলি, তা হলে আমাদের দুঃখের অন্ত থাকবে না এবং স্বাজাতিক কল্যাণের পথ একান্ত দুর্গম হয়ে উঠবে।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ চোখ বুজে বলেন, সবই সহজ হয়ে যাবে যখন দেশটাকে নিজের হাতে পাব। অর্থাৎ, নিজের বোঝাকে অবস্থাপরিবর্তনের কাঁধে চাপাতে পারব এই ভরসায় নিশ্চেষ্ট থাকবার এই ছুতো। কথাটা একটু বিচার করে দেখা যাক।

ধরে নেওয়া গেল গোল-বৈঠকের পরে দেশের শাসনভার আমরাই পাব। কিন্তু, দেশটাকে হাত-ফেরাফেরি করবার মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ সন্ধিক্ষণ আছে। সিভিল-সার্ভিসের মেয়াদ কিছুকাল টিকে থাকতে বাধ্য। কিন্তু, সেইদিনকার সিভিল-সার্ভিস হবে ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো। মন তার গরম হয়ে থাকবার কথা। সেই সময়টুকুর মধ্যে দেশের লোক এবং বিদেশের লোকের কাছে কথাটা দেগে দেগে দেওয়া তার পক্ষে দরকার হবে যে, ব্রিটিশরাজের পাহারা আলগা হবামাত্রই অরাজকতার কালসাপ নানা গর্ত থেকে বেরিয়ে চারি দিকেই ফণা তুলে আছে, তাই আমরা স্বদেশের দায়িত্বভার নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাদের আপন লোকদেরকে দিয়েও এ কথা কবুল করিয়ে নেবার ইচ্ছা তার স্বভাবতই হবে যে, আগেকার আমলে অবস্থা ছিল ভালো। সেই যুগান্তরের সময়ে যে যে গুহায় আমাদের আত্মীয়বিদ্বেষের মারগুলো লুকিয়ে আছে সেই সেইখানে খুব করেই খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।

শ্রাবণ ১৩৩৮

হিজলি ও চট্টগ্রাম

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে। কর্তৃপক্ষদের কৃত কোনো অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাই নে। এই-যে হিজলির গুলি চালানো ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা-কিছু আমার বলবার সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।

এতবড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদভ্রান্তিজনক, কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষকনামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা-দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।

যখন দেখা যায় জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয় তখন ধরে নিতেই হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায়-প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাদের 'পরে সেই-সব শাসনকর্তা এবং তাদেরই আত্মীয়-কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

এই সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক-না কেন আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করানো রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন শক্তি। এ কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজার অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমি আজ উগ্র উত্তেজনাবাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাই নে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তারা যেন এই কথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতই আপন কলঙ্কলাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যে উচ্চে ধরে আছে অত ঊর্ধ্বে আমাদের ধিক্কারবাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছতেই পারবে না। এ কথাও মনে রাখতেই হবে যে, আমরা নিজের চিত্তে সেই গম্ভীর শান্তি যেন রক্ষা করি যাতে করে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথা চিন্তা করবার স্থৈর্য আমাদের থাকে এবং আমাদের নির্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর কঠিন দুঃখস্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিনতর দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

উপসংহারে শোকতপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আমাদের আন্তরিক বেদনা নিবেদন করি এবং সেইসঙ্গে এ কথাও জানাই যে, এই মর্মভেদী দুর্যোগের একদা সম্পূর্ণ অবসান হলেও দেশবাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদিমূলে পুণ্যশিখার উজ্জ্বল দীপ্তি দান করবে।

কার্তিক ১৩৩৮

২

হিজলি কারার যে রক্ষীরা সেখানকার দুজন রাজবন্দীকে খুন করেছে তাদের প্রতি কোনো একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদপত্র[১] খৃস্টোপদিষ্ট মানবপ্রেমের পুনঃপুনঃ ঘোষণা করেছেন। অপরাধকারীদের প্রতি দরদের কারণ এই যে, লেখকের মতে, নানা উৎপাতে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের 'পরে এত বেশি অসহ্য চাড় লাগে যে, বিচারবুদ্ধিসংগত স্থৈর্য তাদের কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না। এই-সব অত্যন্ত-চড়া-নাড়ী-ওয়ালা ব্যক্তিরা স্বাধীনতা ও অক্ষুণ্ণ আত্মসম্মান ভোগ করে থাকে; এদের বাসা আবামের, আহারবিহার স্বাস্থ্যকর; এরাই একদা রাত্রির অন্ধকারে নরঘাতক অভিযানে সকলে মিলে চড়াও হয়ে আক্রমণ করলে সেই-সব হতভাগ্যদেরকে যারা বর্বরতম প্রণালীর বন্ধনদশায় অনির্দিষ্টকালব্যাপী অনিশ্চিত ভাগ্যের প্রতীক্ষায় নিজেদের স্নায়ুকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করছে। সম্পাদক তাঁর সকরুণ প্যারাগ্রাফের স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রয়োগ করে সেই হত্যাকারীদের পীড়িত চিত্তে সান্ত্বনা সঞ্চার করেছেন।

অধিকাংশ অপরাধেরই মূলে আছে স্নায়বিক অভিভূতি এবং লোভ ক্লেশ ক্রোধের এত দুর্দম উত্তেজনা যে তাতে সামাজিক দায়িত্ব ও কৃতকার্যের পরিণাম সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেয়। অথচ এরকম অপরাধ স্নায়ুপীড়া বা মানসিক বিকার থেকে উদভূত হলেও আইন তার সমর্থন করে না; করে না বলেই মানুষ আত্মসংযমের জোরে অপরাধের ঝোঁক সামলিয়ে নিতে পারে। কিন্তু, করুণার পীযূষকে যদি বিশেষ যত্নে কেবল সরকারি হত্যাকারীদের ভাগেই পৃথক করে জোগান দেওয়া হয় এবং যারা প্রথম হতেই অন্তরে নিঃশাস্তির আশা পোষণ করছে, যারা বিধিব্যবস্থার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েও বিধিব্যবস্থাকে স্পর্ধিত আস্ফালনের সঙ্গে ছারখার করে দিল, যদি সুকুমার স্নায়ুতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তাদেরই জন্যে একটা স্বতন্ত্র আদর্শের বিচারপদ্ধতি মঞ্জুর হতে পারে, তবে সভ্যজগতের সর্বত্র ন্যায়বিচারের যে মূলতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে তাকে অপমানিত করা হবে এবং সর্বসাধারণের মনে এর যে ফল ফলবে তা অজস্র রাজদ্রোহ-প্রচারের দ্বারাও সম্ভব হবে না।

পক্ষান্তরে এ কথা মুহূর্তের জন্যেও আশা করি নে যে, আমাদের দেশে রাষ্ট্রনৈতিক যে-সব গোঁড়ার দল যথারীতি-প্রতিষ্ঠিত আদালতের বিচারে দোষী প্রমাণিত হবে তারা যেন ন্যায়দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পায়— এমন-কি, যদিও বা চোখের সামনে রোমহর্ষক দৃশ্যে ও কাপুরুষ অত্যাচারীদের বিনা শাস্তিতে পরিত্রাণে তাদের স্নায়ুপীড়ার চরমতা ঘটে থাকে। বিধর্ষিত আত্মীয়স্বজন ও নিজেদের লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে যদি তারা কোনো কঠোর দায়িত্ব কল্পনা করে নেয়, তবে সেইসঙ্গে এ কথাও যেন মনে স্থির রাখে যে সেই দায়িত্বের পুরো মূল্য তাদের দিতেই হবে। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, আমাদের দেশের ছাত্রেরা য়ুরোপীয় ইস্কুলমাস্টারদের যোগেই পাশ্চাত্য দেশে স্বাধীনতালাভের ইতিহাসটিকে বিধিমতে হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছে, এবং এও বলা বাহুল্য যে, সেই ইতিহাস রাজা প্রজা উভয়পক্ষের দ্বারা প্রকাশ্যে বা গোপনে অনুষ্ঠিত আইনবিগর্হিত বিভীষিকায় পরিকীর্ণ— অনতিকাল পূর্বে আয়র্লান্ডে তার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত।

তথাপি বে-আইনি অপরাধকে অপরাধ বলেই মানতে হবে এবং তার ন্যায়সংগত পরিণাম যেন অনিবার্য হয় এইটেই বাঞ্ছনীয়। অথচ এ কথাও ইতিহাসবিখ্যাত যে, যাদের হাতে সৈন্যবল ও রাজপ্রতাপ অথবা যারা এই শক্তির প্রশ্রয়ে পালিত তারা বিচার এড়িয়ে এবং বলপূর্বক সাধারণের কণ্ঠরোধ করে ব্যাপকভাবে এবং গোপন প্রণালীতে দুর্বৃত্ততার চূড়ান্ত সীমায় যেতে কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু মানুষের সৌভাগ্যক্রমে এরূপ নীতি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারে না।

পরিশেষে আমি বিশেষ ভাবে গবর্মেন্টকে এবং সেইসঙ্গে আমার দেশবাসিগণকে অনুরোধ করি যে, অন্তহীন চক্রপথে হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডবনৃত্য এখনই শান্ত হোক। ক্রোধ ও বিরক্তি

১ The Statesman

-প্রকাশকে বাধামুক্ত করে দেওয়া সাধারণ মানবপ্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা শাসক শাসয়িতা কারও পক্ষেই সুবিজ্ঞতার লক্ষণ নয়। এরকম উভয়পক্ষে ক্রোধমত্ততা নিরতিশয় ক্ষতিজনক— এর ফলে আমাদের দুঃখ ও ব্যর্থতা বেড়েই চলবে এবং এতে শাসনকর্তাদের নৈতিক পৌরুষের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসহানি ঘটবে, লোকসমাজে এই পৌরুষের প্রতিষ্ঠা তার ঔদার্যের দ্বারাই সপ্রমাণ হয়।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

নবযুগ

আজ অনুভব করছি, নূতন যুগের আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশের পুরাতন ইতিহাস যদি আলোচনা করি তা হলে দেখতে পাই যে, এক-একটি নূতন নূতন যুগ এসেছে বৃহতের দিকে, মিলনের দিকে নিয়ে যাবার জন্য সমস্ত ভেদ দূর করবার দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দিতে। সকল সভ্যতার আরম্ভেই সেই ঐক্যবুদ্ধি। মানুষ একলা থাকতে পারে না। তার সত্যই এই যে, সকলের যোগে সে বড়ো হয়, সকলের সঙ্গে মিলতে পারলেই তার সার্থকতা ; এই হল মানুষের ধর্ম। যেখানে এই সত্যকে মানুষ স্বীকার করে সেখানেই মানুষের সভ্যতা। যে সত্য মানুষকে একত্র করে, বিচ্ছিন্ন করে না, তাকে যেখানে মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছে সেখানেই মানুষ বেঁচে গেল। ইতিহাসে যেখানে মানুষ একত্র হয়েছে অথচ মিলতে পারে নি, পরস্পরকে অবিশ্বাস করেছে, অবজ্ঞা করেছে, পরস্পরের স্বার্থকে মেলায় নি, সেখানে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে নি।

আমি যখন জাপানে গিয়েছিলেম তখন একজন জাপানি বৌদ্ধ আমাকে বলেছিলেন যে, বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুসারে তিনি বিশ্বাস করেন যে, মৈত্রী কেবল একটা হৃদয়ের ভাব নয়, এ একটি বিশ্বসত্য, যেমন সত্য এই আকাশের আলোক ; এ তো কেবল কল্পনা নয়, ভাব নয়। আলোক একান্ত সত্য বলেই তরুলতা জীবজন্তু প্রাণ পেয়েছে, সমস্ত শ্রী সৌন্দর্য সম্ভব হয়েছে। এই আলোক যেমন সত্য তেমনি সত্য এই মৈত্রী, প্রেম। আমার অন্তরেও সত্য, বাহিরেও সত্য। তিনি বললেন, আমি জানি, এই-যে গাছপালা নিয়ে আমি আছি এ কাজ মালীও করতে পারত ; কিন্তু সে ঐ প্রেমের সত্যটিকে স্বীকার করতে পারত না ; সে কেবল তার কর্তব্য করে যেত, ভালোবাসার সত্য থেকে সে গাছকে বঞ্চিত করত। যে একটি সত্য আছে বিশ্বের অন্তরে ভালোবাসার দ্বারা আমি তার উদ্রেক করছি, তাইতে আমার কাজ পূর্ণ হয়েছে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে বলে পঞ্চশীল সে শুধু 'না' এর সমষ্টি ; কিন্তু সকল বিধিনিষেধের উপরে ও অন্তরে আছে ভালোবাসা, সে 'না' নয়, 'হাঁ'। মুক্তি তার মধ্যেই। সকল জীবের প্রতি প্রেম যখন অপরিমেয় হবে, প্রতিদিন সকল অবস্থায় যখন কামনা করব সকলের ভালো হোক, তাকেই বুদ্ধ বলেছেন ব্রহ্মবিহার, অর্থাৎ বৃহৎ সত্য যিনি তাঁকে পাওয়া। এইটিই সদর্থক, কেবলমাত্র পঞ্চশীল বা দশশীল নঙর্থক। মানুষের জীবনে যেখানে প্রেমের শক্তি, ত্যাগের শক্তি সচেষ্ট সেখানেই সে সার্থক ; নইলে সে আপন নিত্যরূপ পায় না, পদে পদে ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীর্ণ হয়ে পড়ে। যেখানে সমাজের কেন্দ্রস্থল থেকে সেই প্রেম নানা কর্মে সেবায় আপনাকে প্রকাশ করে সেখানেই মানুষের সমাজ কল্যাণে শক্তিতে সুন্দর ; যেখানে প্রেমের অভাব সেখানেই বিনাশ।

ভারতবর্ষে এক সময়ে আর্য ও অনার্যের সংগ্রামে মানুষের সত্য পীড়িত হয়েছিল ; ভারতবর্ষ তখনো প্রতিষ্ঠালাভ করে নি। তার পরে আর-একটা যুগ এল। রামায়ণে আমরা তার আভাস পাই, তখন আর্য-অনার্যের যুদ্ধের অবসান হয়ে মিলনের কাল এসেছে। শ্রীরামচন্দ্র সেই মিলনের সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন, এমন অনুমান করবার হেতু আছে। আমরা আরো দেখেছি, এক সময় যে

আনুষ্ঠানিক ধর্ম কর্মকাণ্ড আকারে প্রধান হয়ে উঠেছিল অন্য সময়ে সে জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করে বিশ্বভৌমিকতাকে বরণ করেছে। তখন এই বাণী উঠল যে, নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধন নয়, আত্মপীড়ন নয়, সত্যই তপস্যা, দান তপস্যা, সংযম তপস্যা। ক্রিয়াকাণ্ড স্বভাবতই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ, সে সকলের নয়, সে বিশেষ দলের অনুষ্ঠান, সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান। যে ধর্ম শুধু বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে শৃঙ্খলিত তাতে কার কী প্রয়োজন। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আপনার প্রাণ আহুতি দিয়ে ব্যক্তিবিশেষ যে অদ্ভুত কর্ম করল তাতে কার কী এল গেল। কিন্তু, যিনি সত্যাকার যোগী সকলের সঙ্গে যোগে তিনি বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত; তিনি বললেন, যা-কিছু মঙ্গল, যা সকলের ভালোর জন্য, তাই তপস্যা। তখন বন্ধ দুয়ার খুলে গেল। দ্রব্যময় যজ্ঞে মানুষ শুধু নিজের সিদ্ধি খোঁজে; জ্ঞানযজ্ঞে সকলেরই আসন পাতা হল, সমস্ত মানুষের মুক্তির আয়োজন সেইখানে। এই কথা স্বীকার করবামাত্র সভ্যতার নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। ভগবদ্গীতায় আমরা এই নূতনের আভাস পাই, যেখানে ত্যাগের দ্বারা কর্মকে বিশুদ্ধ করবার কথা বলা হয়েছে, নিরর্থক অনুষ্ঠানের মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখতে বলে নি। ইহুদিদের মধ্যেও দেখি, ফ্যারিসিরা সংস্কার ও অনুষ্ঠানকেই বড়ো স্থান দিয়ে আসছিল। যীশু বললেন, এ তো বড়ো কথা নয়— কী খেলে কী পরলে তা দিয়ে তো লোক শুচি হয় না, অন্তরে সে কী তাই দিয়ে শুচিতার বিচার। এ নূতন যুগের চিরন্তন বাণী।

আমাদের যদি আজ শুভবুদ্ধি এসে থাকে তবে সকলকেই আমরা সম্মিলিত করবার সাধনা করব। আজ ভাববার সময় এল। মানুষের স্পর্শে অশুচিতার আরোপ করে অবশেষে সেই স্পর্শে দেবতারও শুচিতানাশ কল্পনা করি। এ বুদ্ধি হারাই যে, তাতে দেবতার স্বভাবকে নিন্দা করা হয়। তখন আমরা সম্প্রদায়ের মন্দিরে অর্ঘ্য আনি, বিশ্বনাথের মন্দিরের বিশ্বদ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে তাঁর অবমাননা করি। মানুষকে লাঞ্ছিত করে হীন করে রেখে পুণ্য বলি কাকে!

আমি এক সময় পদ্মাতীরে নৌকোয় ছিলেম। একদিন আমার কানে এল, একজন বিদেশী রুগণ হয়ে শীতের মধ্যে তিন দিন নদীর ধারে পড়ে আছে। তখন কোনো একটা যোগ ছিল। সেই মুমূর্ষুর ঠিক পাশ দিয়েই শত শত পুণ্যকামী বিশেষ স্থানে জলে ডুব দিয়ে শুচি হবার জন্য চলেছে। তাদের মধ্যে কেউ পীড়িত মানুষকে ছুঁল না। সেই অজ্ঞাতকুলশীল পীড়িত মানুষের সামান্য মাত্র সেবা করলে তারা অশুচি হত, শুচি হবে জলে ডুব দিয়ে। জাত বলে একটা কোন পদার্থ তাদের আছে মানব-জাতীয়তার চেয়েও তাকে বড়ো বলে জেনেছে। যদি কারও মনে দয়া আসত, সেই দয়ার প্রভাবে সে যদি তার বারুণীস্নান ত্যাগ করে ঐ মানুষটিকে নিজের ঘরে নিয়ে সেবা করত, তা হলে সমাজের মতে কেবল যে বারুণীর স্নানের পুণ্য সে হারাত তা নয়, সে দণ্ডনীয় হত, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তার ঘরে এসে রোগী যদি মরত তা হলে সমাজে সে বিষম বিপন্ন হয়ে পড়ত। যে মানবধর্ম সকল নিরর্থক আচারের বহু ঊর্ধ্বে তাকে দণ্ড মেনে নিতে হবে আচারীদের হাতে।

একজন প্রাচীন অধ্যাপক আমাকে বললেন, তাঁর গ্রামের পথে ধূলিশায়ী আমাশয়-রোগে-পীড়িত একজন বিদেশী পথিককে তিনি হাটের টিনের চালার নীচে স্থান দিতে অনুরোধ করেছিলেন। যার সেই চালা সে বললে, পারব না। তিনিও লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করলেন যে, তিনিও সমাজের দণ্ডের ভয়েই তাকে আশ্রয় দিতে পারেন নি। অর্থাৎ মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যসাধন শাস্তির যোগ্য। তিনি হোমিওপ্যাথি জানতেন, পথের ধারেই তাকে কিছু ওষুধপত্র দিয়েছিলেন। আরোগ্যের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় রাত্রে শিলাবৃষ্টি হল; পরদিন সকালে দেখা গেল, সে মরে পড়ে আছে। পাপপুণ্যের বিচার এত বড়ো বীভৎসতায় এসে ঠেকেছে। মানুষকে ভালোবাসায় অশুচিতা, তাকে মনুষ্যোচিত সম্মান করায় অপরাধ। আর জলে ডুব দিলেই সব অপরাধের ক্ষালন। এর থেকে মনে হয়, যে অভাব মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো অভাব সে প্রেমের অভাব। সে প্রেমের অভাবকে হৃদয়ে নিয়ে আমরা যাকে শুচিতা বলে থাকি তাকে রক্ষা করতে পারি, কিন্তু মনুষ্যত্বকে বাঁচাতে পারি নে।

আশা করি, দুর্গতির রাত্রি-অবসানে দুর্গতির শেষ সীমা আজ পেরোবার সময় এল। আজ নবীন যুগ এসেছে। আর্যে-অনার্যে একদা যেমন মিলন ঘটেছিল, শ্রীরামচন্দ্র যেমন চণ্ডালকে বুকে বেঁধেছিলেন,

সেই যুগ আজ সমাগত। আজ যদি আমাদের মধ্যে প্রেম না আসে, কঠিন কঠোর নিষ্ঠুর অবজ্ঞা মানুষের থেকে মানুষকে দূর করে রাখে তবে বাঁচব কী করে। রাউন্ড টেবিলে গিয়ে, ভোটের সংখ্যা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে? পশুর প্রতি আমরা যে ব্যবহার করি মানুষকে যদি তার চেয়েও অধম স্থান দিই তবে সেই অধমতা কি আমাদের সমস্ত সমাজেরই বুকের উপর চেপে বসবে না।

মানুষকে কৃত্রিম পুণ্যের দোহাই দিয়ে দূরে রেখেছি, তারই অভিশাপে আজ সমস্ত জাতি অভিশপ্ত। দেশজোড়া এতবড়ো মোহকে যদি আমরা ধর্মের সিংহাসনে স্থির-প্রতিষ্ঠ করে বসিয়ে রাখি তবে শত্রুকে বাইরে খোঁজবার বিড়ম্বনা কেন।

নবযুগ আসে বড়ো দুঃখের মধ্য দিয়ে। এত আঘাত এত অপমান বিধাতা আমাদের দিতেন না যদি এর প্রয়োজন না থাকত। অসহ্য বেদনায় আমাদের প্রায়শ্চিত্ত চলছে, এখনো তার শেষ হয় নি। কোনো বাহ্য পদ্ধতিতে পরের কাছে ভিক্ষা করে আমরা স্বাধীনতা পাব না; কোনো সত্যকেই এমন করে পাওয়া যায় না। মানবের যা সত্যবস্তু সেই প্রেমকে আমরা যদি অন্তরে জাগরূক করতে পারি তবেই আমরা সব দিকে সার্থক হব। প্রেম থেকে যেখানে ভ্রষ্ট হই সেখানেই অশুচিতা, কেননা সেখান থেকে আমাদের দেবতার তিরোধান। আমাদের শাস্ত্রেও বলছেন, যদি সত্যকে চাও তবে অন্যের মধ্যে নিজেকে স্বীকার করো। সেই সত্যেই পুণ্য এবং সেই সত্যের সাহায্যেই পরাধীনতার বন্ধনও ছিন্ন হবে। মানুষের সম্বন্ধে হৃদয়ের যে সংকোচ তার চেয়ে কঠোর বন্ধন আর নেই।

মানুষকে মানুষ বলে দেখতে না পারার মতো এত বড়ো সর্বনেশে অন্ধতা আর নেই। এই বন্ধন এই অন্ধতা নিয়ে কোনো মুক্তিই আমরা পাব না। যে মোহে আবৃত হয়ে মানুষের সত্য রূপ দেখতে পেলুম না সেই অপ্রেমের অবজ্ঞার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক, যা যথার্থভাবে পবিত্র তাকে যেন সত্য করে গ্রহণ করতে পারি।

৭ পৌষ ১৩৩৯

প্রচলিত দণ্ডনীতি

আজ একটি বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে বন্দীদের দুঃখে দরদ জানাবার জন্যে তোমরা সভা আহ্বান করেছ। সম্প্রতি আমাদের দেশে বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ দিনে দল বেঁধে আন্দোলন করবার একটা রীতি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাতে কিছুক্ষণের জন্যে নিজেদের নালিশ উপভোগ করবার একটা নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। সেটার রাষ্ট্রীয় সার্থকতা যদি কিছু থাকে তো থাক, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে এইরকম পোলিটিকাল দশা পাওয়ার উত্তেজনা উদ্রেক করা আমাদের এখানকার কাজের ও ভাবের সঙ্গে সংগত হয় বলে আমি মনে করি নে।

দেশের বিশেষ অনুরোধে ও প্রয়োজনে আমার যা বলবার সে আমি আশ্রমের বাইরে যথোচিত জায়গায় বলেছি, আজ আমার এখানে কিছু যদি বলতে হয় তবে আমি বলব, প্রচলিত দণ্ডনীতি সম্বন্ধে আমার সাধারণ মন্তব্য।

মনে আছে, ছেলেবেলায় পুলিসকে একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা-বিভাগের অন্তর্গত বলে মনে করতুম। যেমন স্বাভাবিক মানবজীবনের সঙ্গে দৈত্যদানব-ভূতপ্রেতের সহজ সামঞ্জস্য নেই, এ যেন সেইরকম। তাই তখন মনে করতুম, চোরও বুঝি মানুষ-জাতির স্বভাবগণ্ডির অত্যন্ত বাইরেকার বিকৃতি। এমন সময় চোরকে স্বচক্ষে দেখলুম, আমাদেরই বাড়ি থেকে অত্যন্ত ত্রস্ত হয়ে দারোয়ানদের লক্ষ্য এড়িয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বিস্মিত হয়ে দেখলুম, সে নিতান্ত সাধারণ মানুষেরই মতো, এমন-কি, তার চেয়ে দুর্বল।

আমার সেদিনকার চমক আজও ভাঙবার সময় আসে নি। যারা যে কারণেই হোক আইন ভেঙে অপরাধীর শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে তাদের সম্বন্ধে এমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তাদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করতে মন বাধা পায় না। ধরে রেখেছি তারা আমাদের মতো নয়; আর যারা আমাদের মতো নয় তাদের প্রতি আচরণ অত্যাচার হয়ে উঠলে সমস্ত সমাজেরই যেন সমর্থন পাওয়া যায়; সমাজের গূঢ় অন্তরে যে নির্দয় প্রবৃত্তি আছে তাই চরিতার্থ করবার উপলক্ষ হয়ে ওঠে এরা।

আমার আর-একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি, এ ঘটেছিল পরের বয়সে। একদিন কোলকাতার রাস্তায় যেতে যেতে দেখলুম, পুলিস একজন আসামীকে— সে অপরাধ করে থাকতেও পারে, নাও পারে— কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে সমস্ত রাস্তার জনতার মাঝখান দিয়ে। মানুষকে এমন জন্তুর মতো করে বেঁধে নিয়ে যাওয়া, এতে আমাদের সকলেরই অপমান। আমার মনে এটা এত যে লেগেছিল তার একটা কারণ, এরকম কুদৃশ্য আমি ইংলণ্ডে বা য়ুরোপের আর-কোথাও দেখি নি। এর মধ্যে দুটো আঘাত একত্রে ছিল— এক হচ্ছে মানুষের প্রতি অপমান; আর-এক, বিশেষভাবে আমার দেশের লোকের প্রতি অপমান— এক হচ্ছে আইনভাঙা অপরাধীর প্রতি নির্দয়তা; আর-এক, আমাদের স্বদেশীয় অপরাধীর প্রতি অবজ্ঞা। সুতরাং সেই অবজ্ঞার ভাগী আমরা সকলেই। আমাদের দেশেই বিধিনির্দিষ্ট দণ্ডপ্রয়োগের অতিরিক্ত অপমান-প্রয়োগ সমস্ত জাতকে লাঞ্ছিত করে।

নির্দয় প্রণালী যে কার্যকরী, এই ধারণা বর্বর প্রবৃত্তির স্বভাবসংগত। পাঠশালা থেকে আরম্ভ করে পাগলাগারদ পর্যন্ত এর ক্রিয়া দেখা যায়। এর প্রধান কারণ, মানুষের মনে যে বর্বর মরে নি নির্দয়তায় সে রস পায়। সভ্য দেশে সেই রসসম্ভোগের স্থান সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। তার কারণ, কালক্রমে মানুষ খানিকটা সভ্য হয়েছে, সেই খানিকটা-সভ্য মানুষ আপনার ভিতরকার বর্বর মানুষকে লজ্জা দেয় এবং সংযত করে। যেখানে সেই সংযমের দাবি নেই সেখানে বর্বর সম্পূর্ণ ছাড়া পায়, নির্দয়তাই বৈধ হয়ে ওঠে। জেলখানায় মনুষ্যত্বের আদর্শ বর্বরের দ্বারা প্রতিদিন পীড়িত হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই।

সমাজের দুষ্ট প্রবৃত্তি শোধনের কর্তব্যতা অনেক বেশি অতিক্রম করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার বর্বর ধর্ম যদি জেলখানা আশ্রয় করে না থাকত, তা হলে ওখান থেকে দণ্ডবিধির দুর্বিষহ উগ্রতা লজ্জিত হয়ে চলে যেত। পাপকে সমাজের যে-কোনো জায়গাতেই ছোটো-বড়ো যে-কোনো আকারেই প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তলে তলে সে আপন সীমা বাড়িয়ে চলতে থাকে। তারই কুৎসিত দৃষ্টান্ত দেখতে পাই আধুনিক য়ুরোপে। সেখানে সভ্যনামধারী বড়ো বড়ো দেশে শাস্তিদানের দানবিক দন্তবিকাশ নির্মম স্পর্ধার সঙ্গে সর্বত্র সভ্যতাকে যেরকম বিদ্রূপ করতে উদ্যত হয়েছে, তার মূল রয়েছে সকল দেশের সব জেলখানাতেই। অনেক কাল থেকে অনেক খরচ করে সয়তানকে মানুষের রক্ত খাইয়ে পুষে রাখবার জন্যে বড়ো বড়ো পিঞ্জর রাখা হয়েছে। হিংস্রতার ঠগিধর্ম-উপাসক ফাসিজমের জন্মভূমিই হচ্ছে সভ্যতার আত্মবিরোধী এই-সব জেলখানায়।

এই-সব শাসনকেন্দ্র আপন আশেপাশে মনুষ্যত্বের কিরকম বিকৃতি ঘটাতে থাকে তার একটা দৃষ্টান্ত অনেক দিন পরে আমি আজও ভুলতে পারি নি। চীনযাত্রাকালে আমাদের জাহাজ পৌঁছল হংকং বন্দরে। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলুম, একজন চীনা ফেরিওয়ালা জাহাজের যাত্রীদের কাছে পণ্য বিক্রি করবার চেষ্টায় তীরে এসেছিল। তাদের নিষেধ করবার নিয়ম হয়তো ছিল। সেই কর্তব্য পালনের উপলক্ষে দেখলুম, আমাদের স্বদেশীয় শিখ কনস্টেবল তার বেণী ধরে টেনে অনায়াসে তাকে লাথি মারলে। কড়তা করবার ঔদ্ধত্যের যে আনন্দ আদিম অসংস্কৃত বুদ্ধির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে দণ্ডনীতির অসভ্যতাই তাকে অবারিত করার সুযোগ দেয়।

মনে মনে কল্পনা করলুম, একজন য়ুরোপীয়— সে ফেরিওয়ালা নয়, হয়তো সে চোর, সে প্রতারক, সে দুর্বৃত্ত— তাকে ঐ শিখ কনস্টেবল গ্রেফতার করত, কর্তব্যের অনুরোধে মাথায় এক ঘা লাঠিও বসাতে পারত, কিন্তু তাকে কানে ধরে লাথি মারতে পারত না। ঐ কনস্টেবল নিষেধ করেছিল ফেরিওয়ালাকে, লাথি মেরেছিল সমস্ত জাতকে। অবজ্ঞাভাজন জাতির মানুষ কেবল যে অপমান ভোগ করে তা নয়, সহজেই তার সম্বন্ধে দণ্ডের কঠোরতা প্রবল হয়ে ওঠে। হয় যে, তার কারণ

মানুষের গূঢ় দুষ্প্রবৃত্তি এই-সকল ক্ষেত্রে বর্বরতার রসসম্ভোগের সুযোগ পায়।

বেণী ধরে টেনে লাথি মারতে যারা অকুণ্ঠিত সেই-শ্রেণীয় রাজানুচর।এ দেশে নিঃসন্দেহ অনেক আছে। যে কারণে চীনে তাদের দেখেছি সেই কারণ এখানেও প্রবল। সেই অবজ্ঞা এবং তার আনুষঙ্গিক নিষ্ঠুরতা স্থায়ীভাবে এ দেশের আবহাওয়াকে ব্যাধিগ্রস্ত করেছে, এ কথা আমরা অনুভব করি।

এই প্রসঙ্গে আর-এক দিনের কথা আমি বলব। তখন শিলাইদহে ছিলুম। সেখানকার জেলেদের আমি ভালোরকম করেই জানুতম। তাদের জীবিকা জলের উপর। ডাঙার অধিকার যেমন পাকা, জলের অধিকার তেমন নয়। জলের মালেকরা তাদের উপর যেমন তেমন অত্যাচার করতে পারত; এই হিসাবে চাষীদের চেয়েও জেলেরা অসহায়। একবার জলকলের কর্তার কর্মচারী এসে অনধিকারে কোনো নৌকা থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ তুলে নিল নিজের ডিঙিতে। এরকম ঘটনা সর্বদাই ঘটত। অন্যায় সহ্য করে যাওয়াই যার পক্ষে বাঁচবার সহজ উপায় এইবার সে সইতে পারল না, দিলে সেই কর্মচারীর কান কেটে। তার পরে রাত্রি তখন দু'পহর হবে, জেলেদের কাছ থেকে আমার বোটে লোক এল; বললে, সমস্ত জেলেপাড়ায় পুলিস লেগেছে। বললে, কঠোর আচরণ থেকে আমাদের মেয়েদের ছেলেদের রক্ষা করুন। তখনই একটি ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিলুম। সরকারি কাজে বাধা দেবার জন্যে নয়, কেবল উপস্থিত থাকবার জন্যে। তার অন্য শক্তি নেই, কিন্তু ভদ্র ব্যবহারে আদর্শ আছে। উপস্থিতি-দ্বারা সেই আদর্শকে প্রকাশ করেই অন্যায়ের সে প্রতিবাদ করতে পারবে।

আমাদের দেশের কারাবাসীদের সম্বন্ধেও তার বেশি আমাদের কিছু করবার নেই। আমরা জানাতে পারি কোনটা ভদ্র কোনটা ভদ্র নয়, মানবধর্মের দোহাই দিতে পারি। কিন্তু জানাব কাকে, দোহাই দেব কার সামনে দাঁড়িয়ে। জানাতে হবে তাদেরই যারা বেণী ধরে টান দেবার দলে, যারা মধ্যবর্তী, যারা বিদেশী রাজ্যশাসনের আধারে স্বদেশীর প্রতি অসম্মান ভরে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, কোনো অপরাধীকে দণ্ড দেবার পূর্বে আইনে বাঁধা অত্যন্ত সতর্ক বিচারের প্রণালী আছে। এই সভ্যনীতি আমরা পেয়েছি ইংরেজের কাছ থেকে। এই নীতির 'পরে আমাদের দাবি অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এক সময়ে সরাসরি কাজির বিচার প্রচলিত ছিল। ব্যক্তিগত আন্দাজের উপর, পক্ষপাতের উপর যে বিচার-প্রণালীর ভিত্তি ছিল তাকে আমরা অশ্রদ্ধা করতে শিখেছি। এ কথা আজ আমাদের কাছে সহজ হয়েছে যে, অপরাধের অপবাদ-আরোপের পর থেকেই কোনো অভিযুক্তের প্রতি অন্যায় করা সহজ ছিল যে যুগে সে যুগের দণ্ডনীতি সভ্য আদর্শের ছিল না; মানুষের স্বাধীনতার অধিকার তখন অনিশ্চিত ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল। সভ্যদেশে এ কথাও স্বীকৃত হয়েছে যে, অপরাধের নিঃসংশয় প্রমাণের জন্য প্রমাণতত্ত্বের অনুশাসনের ভিতর দিয়ে বৈধ সাক্ষ্যের সন্ধান ও বিশ্লেষণের জন্য অভিজ্ঞ বিচারক ও বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর প্রয়োজন আছে। এই বিশ্বাসের 'পরে যদি আস্থা না রাখি তা হলে আইন-আদালতকে প্রকাণ্ড অপব্যয়ের খেলা বলতে হবে। এই ব্যবস্থার মধ্যে নির্বিশেষে সকল মানুষের 'পরে যে সম্মান আছে এতদিন ধরে সেই নীতিকে শ্রদ্ধা করতে শিখছি। এও জানি, এত সাবধান হয়েও অনেক ঘটনায় অপরাধের শেষ মীমাংসা হয় নি। বহু নির্দোষী দণ্ডভোগ করেছে।

তবু যদি স্থির হয় যে বিশেষ স্থলে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে গোপনে সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে আন্দাজে বিচার ও আশু শাস্তিদান অনিবার্য, তবে তা নিয়ে তর্ক করতে চাই নে, কিন্তু এ কথা বলতেই হবে এমন স্থলে শাস্তির পরিমাণ দুঃসহ না হওয়াই উচিত, এমন হওয়া চাই যাতে বিচারের ভুলে নিরপরাধের প্রতি শাস্তি অতি কঠোর হয়ে অনুতাপের কারণ না ঘটে। কেবলমাত্র বন্দীদশাই তো কম দুঃখকর নয়, তার উপরে শাসনের ঝালমসলা প্রচুর করে তুলে তার তীব্রতা বাড়িয়ে তোলাকে তো কোনোমতেই সভ্যনীতি বলতে পারি নে। ঝালমসলা যে কটুজাতীয়, বাহির থেকে তার আন্দাজ করতে পারি মাত্র। যখন বৈধ উপায়ে নিঃসন্দেহে দোষ-প্রমাণ-চেষ্টার অসুবিধা আছে বলে মনে করা হয়, অন্তত তখন এই সংশয়ের ক্ষেত্রে করুণার স্থান রাখা চাই।

কারাগার থেকে অন্তিম মুহূর্তে যাদের মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে যক্ষ্মারোগে মরবার জন্যে তারা সকলেই এই বিলম্বিত মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগের নিশ্চিত যোগ্য— এমন কথা বিনা বিচারে তোমরা কি নিঃসংশয়ে বলতে পার, হে আমার দেশবাসীর স্বদেশী প্রতিনিধি !

বহুদিনসঞ্চিত একটা দুঃখের কথা কি আজ বলব। অল্প কালের মধ্যে দেশে অনেক বড়ো বড়ো মারকাট খুনোখুনি হয়ে গেছে। যাঁরা চক্ষে দেখেছেন, আত্মীয়স্বজনসহ তাঁরা অসহ্য দুঃখ পেয়েছেন। যাঁরা ভিতরের কথা জানেন তাঁদের যোগে যে-সব জনশ্রুতি দেশে রাষ্ট্র হয়েছে, দেশের লোক তাকে বিশ্বাস করবার যুক্তিসংগত কারণ পেয়েছেন। কিন্তু, কর্তৃপক্ষ এই নির্দয় ব্যাপারকে পোলিটিকাল অপরাধের শ্রেণীতে গণ্য করেন নি বলে অনুমানকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বিনা জবাবদিহিতে কারও কোনো দণ্ডবিধান করেন নি। অপর ক্ষেত্রে তাই করেছেন এবং দেশের প্রতিনিধিরা একে ন্যায্য বলে সমর্থনও করেন। পলিটিক্‌সে খুনজখম লুঠপাটের জন্যে যারা দায়ী তারা ঘৃণ্য, অপর ক্ষেত্রেও যারা দায়ী তারা কম ঘৃণ্য নয়। এক ক্ষেত্রে গোপন সন্ধানে তাদের আবিষ্কার করা সহজ, অপর ক্ষেত্রে সহজ নয়, এমন অদ্ভুত কথা বলা চলে না। উভয় ব্যাপারেই শাসনের প্রয়োজন আছে। হয়তো গুপ্ত পাপচক্রান্তের বিধিনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়— তবুও পাপের হেয়তা ও পরিমাণ কোনো পক্ষেই কম নয়।

পূর্বেই বলেছি, দণ্ডপ্রয়োগের অতিকৃত রূপকে আমি বর্বরতা বলি। আমি কোনো পক্ষেই হিংসার মূল্য হিংস্রতা দিয়ে দিতে চাই নে; কিন্তু সমাজ ও রাজার তরফ থেকে ধিক্কারের দ্বারা বিচারের প্রয়োজন আছে, উভয় পক্ষেই। নির্জন কারাকক্ষবাস বা আন্দামানে নির্বাসন আমি কোনোপ্রকার অপরাধীর জন্য সমর্থন করি নে, যাঁরা দেশবাসীর প্রতিনিধির পদে উচ্চ শাসনমঞ্চে সমাসীন তাঁরা যদি করেন আমি নীচে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতিবাদ করব।

শ্রাবণ ১৩৪৪

গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনা-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য বর্তমান গ্রন্থপরিচয়ে পাওয়া যাইবে। কোনো কোনো রচনার পাণ্ডুলিপিতে, সাময়িক পত্রে, এবং প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ-কালে, এক রূপ পাঠ দেখা যায় না। প্রয়োজনবোধে, সেরূপ পাঠভেদ-সম্পর্কিত কিছু কিছু তথ্য এখানে সংকলিত হইল। কোনো কোনো রচনার প্রসঙ্গ ধরিয়া কবির যে-সব প্রণিধেয় উক্তি পাওয়া যায় তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে।

বিশ্বভারতী-প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ খণ্ড বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইল।

প্রহাসিনী

'প্রহাসিনী' ১৩৪৫ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের 'খাপছাড়া' অংশ বাদ দেওয়া হইল। উক্ত কবিতা তিনটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর একবিংশ (সুলভ একাদশ) খণ্ডে 'খাপছাড়া' গ্রন্থের সংযোজনাংশে (৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় ১, ২, ৩ সংখ্যক কবিতা দ্রষ্টব্য) ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই প্রথমে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রকাশসূচী প্রদত্ত হইল—

আধুনিকা	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৪১
নারীপ্রগতি	বিচিত্রা। মাঘ ১৩৪১
রঙ্গ	বঙ্গলক্ষ্মী। কার্তিক ১৩৪২
পরিণয়মঙ্গল	বিচিত্রা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২
ভাইদ্বিতীয়া	প্রবাসী। পৌষ ১৩৪৩
ভোজনবীর	পরিচয়। বৈশাখ ১৩৩৯
গবঠিকানি	প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৪৫
অনাদৃতা লেখনী	বিচিত্রা। বৈশাখ ১৩৪৪
পলাতকা	বিচিত্রা। চৈত্র ১৩৪১
গৌড়ী রীতি	পরিচয়। বৈশাখ ১৩৩৯

১৩৪১ সালেব মাঘের 'বিচিত্রা'য় 'নারীপ্রগতি' কবিতাটি বাহির হইলে 'অপরাজিতা দেবী' রবীন্দ্রনাথকে অনুরূপ ছন্দে একটি উত্তর লিখিয়া পাঠান। 'আধুনিকা' কবিতাটি তাহারই প্রত্যুত্তরে রচিত। অপরাজিতা দেবীর উত্তর 'সে-কালিনী ও আধুনিকা' এবং রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর ১৩৪১ সালে চৈত্রের 'প্রবাসী'তে (পৃ. ৮২৯-৩৪) একত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

'রঙ্গ' কবিতাটি যে পুবাতন ছড়ার অনুকরণে লিখিত রবীন্দ্রনাথ তাহা 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থেব অন্তর্গত 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছেন। উক্ত ছড়াটি নিম্নে আগাগোড়া মুদ্রিত হইল—

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ॥
কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ ॥

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
চার ধলো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।।
বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস ।
তাহার অধিক ধলো, কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ ।।

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
চার রাঙা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।।
জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুমফুল ।
তাহার অধিক রাঙা, কন্যে, তোমার মাথার সিঁদুর ।।

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।।
নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল ।
তাহার অধিক তিতো, কন্যে, বোন-সতিনের ঘর ।।

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ ।
চার হিম দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।।
হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি ।
তাহার অধিক হিম, কন্যে, তোমার বুকের ছাতি ।।

উদ্‌ধৃত ছড়াটি সম্বন্ধে কৌতুকজনক বিস্তৃত আলোচনাও উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে পৃ· ৫৯৫-৯৬ (সুলভ তৃতীয় পৃ ৭৬০) দ্রষ্টব্য।

'পরিণয়মঙ্গল' কবিতাটি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা জয়শ্রী দেবী ও কুলপ্রসাদ সেনগুপ্তের বিবাহ ('জয়া-মটরু-শুভসম্মিলন') উপলক্ষে রচিত হয়।

বরাহনগরের পারুল দেবী রবীন্দ্রনাথকে নাতনিরূপে কয়েকবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ফোঁটা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠাইয়াছিলেন। 'ভাইদ্বিতীয়া' কবিতাটি ১৩৪৩ সালের (ইং ১৯৩৬) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আশীর্বাদস্বরূপ পারুল দেবীকে প্রেরিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী ১৯৩৭ সালের ১৪ জানুয়ারি তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তাহার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আলোচ্য কবিতা-প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—

বাংলাদেশের সমস্ত দিদিজাতীয়ার স্তবগানকে তোমার বন্দনাগানের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছি। এটা তোমার পছন্দ হয় নি। তবু বরনাগরিকাই অগ্রগণ্যা হয়ে রইল এটা তুমি উপলব্ধি করলে না কেন? দেবীর কোপ দূর হোক প্রসন্ন হয়ে তিনি বরদানস্বরূপে বড়ি দান করুন এই আমার প্রত্যাশা।…

—'রবীন্দ্রনাথের চিঠি পারুল দেবীকে' কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ, শ্রাবণ ১৩৯৪, পৃ· ৫১-৫২

রাধারানী দেবীর দৌত্যে রবীন্দ্রনাথ 'অপরাজিতা দেবী'র ১৬ জুন ১৯৩৮ তারিখের একটি কবিতায়-লেখা নাতিদীর্ঘ পত্র পান। পত্রটির শেষাংশে লেখিকা জানাইয়াছিলেন—

রবিরাগ জানি, কবি, বাদলেও ফিকা না—
তাই চাই উত্তর। (না জানিয়ে ঠিকানা)।

'অপরাজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' স্বাক্ষরে 'গরঠিকানি' কবিতাটি উক্ত পত্রের জবাবে লিখিয়া নিম্নোদ্‌ধৃত 'পত্রদূতী' কবিতা-সহ রবীন্দ্রনাথ উহা রাধারানী দেবীকে পাঠান। ১৩৪৫ সালের আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে (পৃ. ৭৬০-৬৫) অপরাজিতা দেবীর 'নাৎনির পত্র' এবং রবীন্দ্রনাথের 'পত্রদূতী' ও 'গর-ঠিকানী' একত্র প্রকশিত হয়।—

পত্রদূতী

শ্রীমতী রাধারানী দেবীর প্রতি

গর-ঠিকানিয়া বন্ধু তোমার ছন্দে লিখেছে পত্র,
ছন্দেই তার ইনিয়ে-বিনিয়ে জবাব লিখেছি অত্র।
যন্ত্রের যুগে মেঘদূত তার পদ করিয়াছে নষ্ট,
তাই মাঝে প'ড়ে।খামখা।অকাজে তোমারে দিলেম কষ্ট।
আজি আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে মন যেন উড়ো পক্ষী,
বাদলা-হাওয়ায় কোথা উড়ে যায় অজানা কাদেরে লক্ষি।
ঠিকানা তাদের রঙিন মেঘেতে লিখে দেয় দূর শূন্য,
খামে-ভরা চিঠি না যদি পাঠাই হয় না তাহারা ক্ষুণ্ণ।
তাহাদের চিঠি আন্‌মনাদের আসে জানালার পার্শ্বে,
যে পড়িতে জানে সেই বোঝে মানে— চিঠিখানি সবাকার সে।
উত্তর তার কখনো কখনো গেয়েছি আমারি ছন্দে,
গুঞ্জন তারি ছড়িয়ে গেয়েছে সিক্ত মাটির গন্ধে।
অচিন মিতার সাথে কারবার সে তো কবিদেরই জন্য,
সে অধরা দেয় সংগীতে ধরা, কিন্তু তারা যে অন্য।
জানা-অজানার মাঝখানটাতে নাৎনি করেছে সন্ধি,
কবির সাধ্য নাই তারে করে পোস্টাফিসের বন্দী।
মর্তের দেহে মেনে যে নিয়েছে বাঁধন পাঞ্চভৌত্যে,
তুমি ছাড়া কারে লাগাব তাহার চার পয়সার দৌত্যে ?
জানি এ সুযোগে চাও কিছু কিছু হাল খবরের অংশ,
হায় রে আয়ুতে খবরের কোঠা প্রায়ে হয়ে এল ধ্বংস।
সেদিন ছিলাম সাতাশ-আটাশ, আশি আজি সমাসন্ন;
আমার জীবনে এই সংবাদ সবার অগ্রগণ্য।

গৌরীপুর ভবন, কালিম্পঙ
৫ আষাঢ় ১৩৪৫

পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির নিম্নোদধৃত কয়েকটি বর্জিত ছত্র পাওয়া যায়—

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২১ পৃষ্ঠায় 'হিস্‌টিরিয়ায় পাওয়া' ছত্রটির পর

তলোয়ার থাকে সংক্ষেপে তার খাপে,
গদার গুরুতা শুধু তার মোটা মাপে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২১ পৃষ্ঠায় 'ছাপিয়ে যে ওর দাম' ছত্রটির পর

'রবি' নাম যদি বলি নাম নহে ওটা,
ললাটের 'পরে জয়তিলকের ফোঁটা,

তা হলে শোনাবে অহংকার সে কত,
'অপরাজিতা'ও নহে কি তাহারি মতো।
ঝগড়া বাধিয়ে এইখানে লিখি ইতি,
সন্দেহ কবি, ভালো নহে এই রীতি—
শান্তিভঙ্গ করে দেবে এই ভাষা,
পুরো শান্তির চেয়ে তারি 'পরে আশা।

'অনাদৃতা লেখনী' কবিতার পঞ্চম হইতে দশম ছত্র পর্যন্ত অংশ ১৪ মাঘ ১৩৪৩ তারিখে স্বতন্ত্র আকারে প্রথম রচিত হয়। কবিতাটির 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত (বৈশাখ ১৩৪৪) প্রাক্তন পাঠে উক্ত ছয়টি ছত্র পাওয়া যায় না।

পলাতকা' কবিতাটি নন্দিতা দেবীর উদ্দেশে রচিত। পাণ্ডুলিপিতে পত্রের আকারে উহার আরম্ভে সম্বোধন 'বৃদ্ধা', এবং পত্রশেষের স্বাক্ষর 'দাদামশায়'। কবিতাটির 'পুনশ্চ' অংশ 'দাদামশায়ের চিঠি' নামে ১৯৩৬ নভেম্বরের 'শ্রীহর্ষ' পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

'কাপুরুষ' কবিতাটি, পাণ্ডুলিপি অনুসারে, শান্তিনিকেতন হইতে রানী মহলানবীশকে 'কবিসম্রাট' স্বাক্ষরে লেখা হইয়াছিল।

'গৌড়ী রীতি' কবিতাটি ১৩৩৯ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পূর্বে নিম্নোদধৃত সংক্ষিপ্ত আকারে ১৩৩৬ চৈত্রের 'বিচিত্রা'য় (পৃ ৪৫৪) বিনা স্বাক্ষরে বাহির হয়—

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই ফুঁকে দেয় তার থলে,
লোকে তার 'পরে মহা রাগ করে হাতি দেয় নাই ব'লে।
বহু সাধনায় বিড়াল যে পায় ফুকারে সে "ওহো ওহো",
বলে আঁখি মেজে, "যথেষ্ট এ যে, পরম অনুগ্রহ।"
বিপুল ভোজনে মণের ওজনে ছটাক যদি বা কমে,
সেই ছটাকের চাঁটিতে ঢাকের গালাগালি-বোল জমে।
সমুখে আসিয়া পকেট ঠাসিয়া স্তবের লম্বা দৌড়,
পিছনে গোপন নিন্দা-রোপণ— ধন ধন্য গৌড়।

কবিতাটির আরম্ভের দুই স্তবক বস্তুত আরো কয়েক বৎসর পূর্বের রচনা। ১৯২৬ সালে য়ুরোপ-প্রবাস-কালে বেলগ্রেড হইতে রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়কে যে-পত্র লেখেন, ১৩৩৮ সালের রবীন্দ্রজয়ন্তী-সংখ্যা 'বাতায়ন' হইতে তাহা এই প্রসঙ্গে মুদ্রিত হইল—

বেলগ্রেড
৭ নভেম্বর ১৯২৫[১]

কল্যাণীয়বরেষু

মন্টু, তোমার চিঠিখানা পড়ে, খুব খুশি হলুম। সাধারণ তো আমাকে অহংকৃত এবং হৃদ্যতাবিহীন বলেই মনে করে। সেই জন্যেই জনসমাজে আমি যত প্রশংসা পেয়েছি তত প্রীতি পাই নি। আর সেই জন্যেই লোকে আমার ন্যায্য প্রাপ্য থেকেও যতটা পারে দাম কমাতে চেষ্টা করে। এর ঠিক কারণটা কী আমি তো ভালো বুঝতেই পারি নে। আমি যদি স্বভাবতই কঠিনহৃদয় ও স্নেহসম্পদে কৃপণ হতুম তা হলে কবি হতেই পারতুম না। অন্তরে যার রসের অভাব সে কখনোই রসসাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু, যখন অনেক লোকের একই ধারণা হচ্ছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তখন বলতেই হবে যে, আমার মধ্যে একটা কিছু অভাব আছে যাতে করে আমার দেশের লোক আমার হৃদয় স্পষ্ট দেখতে পায় না। সম্ভবত আমাদের দেশে

১ তারিখ সম্ভবত— ১৭ নভেম্বর ১৯২৬

হৃদয়াবেগ-প্রকাশের যে বিশেষ রীতি ও ভঙ্গী সাধারণে প্রচলিত আমার তা অভ্যাস নেই। তার দুটো কারণ আছে। প্রথমত আমাদের পরিবার একঘরে, সমাজের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা ঘটতেই পারে নি। দ্বিতীয়ত ছেলেবেলা থেকে আমি আমাদের পরিবারের কোণে কোণে অত্যন্ত লাজুক ও মুখচোরা ভাবেই কাটিয়েছি। আমাদের আত্মীয়বন্ধুর পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ, তা ছাড়া আমাদের বাড়ির রীতি পদ্ধতি ব্যবহারে একটা স্বভাবসিদ্ধ বিশেষত্ব দাঁড়িয়ে গেছে কেননা আমরা সমাজের বহির্বর্তী। এইজন্যে আমাদের দেশে আত্মীয়তা-প্রকাশের যে-সব গলাগলি কোলাকুলি ধরন আছে তাতে আমার হাত পাকে নি। এই-সব কারণে দেশে জনসাধারণ যদি আমাকে ভুল বোঝে সে আমার ভাগ্যের দোষ। কিন্তু, একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো। বঙ্কিম একদিন সাহিত্যে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু, আমি তো জানি তাঁর কাছে ঘেঁষতে কেউ সাহস করত না— আমরা কেউ কেউ তাঁর কাছ থেকে কিছু প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, কিন্তু তাঁর গা-ঘেঁষা হবার জো ছিল না। কিন্তু, আমার ঘরে চড়াও হয়ে উপদ্রব করতে না পারে এমন অপোগণ্ড বা নগণ্য ব্যক্তি তো বাংলাদেশে কেউ নেই। অথচ বঙ্কিমকে কেউ উদ্ধত বা কঠিনহৃদয় বলে নি। কেননা যাঁর কাছে কেউ সহজে কিছুই পায় না তাঁর অনুগ্রহের কণা পেলেও লোকে কৃতার্থ হয়। কিন্তু, যার কাছে কোনো বাধা নেই তার কাছেই দাবির ষোলো আনা পূরণ করতে না পারলে আটা আনারও রসিদ পাওয়া যায় না।

নাহি চাহিতেই	ঘোড়া দেয় যেই	ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার 'পরে	ভারি রাগ করে	হাতি দেয় নাই বলি।
বহু সাধনায়	যার কাছে পায়	কালো বেড়ালের ছানা
লোকে তারে বলে	নয়নের জলে,	'দাতা বটে ষোলো আনা।'

—বাতায়ন, রবীন্দ্রজয়ন্তী ১৩৩৮

'অটোগ্রাফ' কবিতাটি শ্রীমান অভিজিৎ চন্দের প্রতি 'দাদু' রবীন্দ্রনাথের স্নেহোপহার।

সংযোজন

'প্রহাসিনী'র রচনাবলী-সংস্করণে 'সংযোজন' অংশে বিভিন্ন সাময়িকপত্র হইতে সংকলন করিয়া কতকগুলি নূতন কবিতা যোগ করা হইল। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতেও দুইটি কবিতা গ্রহণ করা হইয়াছে। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতাগুলির প্রকাশকাল নিম্নে প্রদত্ত হইল—

নাসিক হইতে খুড়ার পত্র	ভারতী। ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৩
পত্র	ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩১২
সুসীম চা-চক্র	শান্তিনিকেতন। শ্রাবণ ১৩৩১
চাতক	বিশ্বভারতী পত্রিকা। কার্তিক-পৌষ ১৩৫০
নাতবউ	বিচিত্রা। অগ্রহায়ণ ১৩৩৮
মিষ্টান্বিতা	পরিচয়। শ্রাবণ ১৩৪২
নামকরণ	প্রবাসী। পৌষ ১৩৪৬
ধ্যানভঙ্গ	বঙ্গলক্ষ্মী। ভাদ্র ১৩৪৬
রেলেটিভিটি	অলকা। ভাদ্র ১৩৪৬
নারীর কর্তব্য	অলকা। অগ্রহায়ণ ১৩৪৬
মধুসন্ধায়ী	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৪৭
মাছিতত্ত্ব	শনিবারের চিঠি। চৈত্র ১৩৪৬

কালান্তর	যুগান্তর। শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪৭
তুমি	নিরুক্ত। আশ্বিন ১৩৪৭
মিলের কাব্য	কবিতা। চৈত্র ১৩৪৭
মশকমঙ্গল গীতিকা	বঙ্গলক্ষ্মী। অগ্রহায়ণ ১৩৪৭

'নিমন্ত্রণ' (পৃ ৩৯) ও 'লিখি কিছু সাধ্য কী' (পৃ· ৫৫) কবিতা দুইটি পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি 'বাঁশরি' নাটকে (অগ্রহায়ণ ১৩৪০) ব্যবহার করা হইয়াছে।

'পত্র' কবিতাটি প্রথম সংস্করণ 'পূরবী'র 'সঞ্চিতা' অংশে ১৩৩২ সালে প্রথম সংকলিত হইয়াছিল। (পরবর্তী সংস্করণে 'সঞ্চিতা' অংশ 'পূরবী' হইতে সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে।) রচনাস্থান-নির্দেশক 'বনক্ষেত্র' শব্দটি Woodfield-এর কবিকৃত বঙ্গানুবাদ।

'সুসীম চা-চক্র' কবিতাটির সম্পর্কে অধুনালুপ্ত 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা' হইতে (শ্রাবণ ১৩৩১) 'সুসীম চা-চক্র প্রবর্তনা'র বর্ণনাটুকু উদধৃত হইল—

পূজনীয় গুরুদেব চীন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া একটি চা-বৈঠকের প্রবর্তনা করিয়াছেন— ইহার নাম সুসীম চা-চক্র। সু-সুমো নামে বিশ্বভারতীর একজন বিশিষ্ট চীনীয় বন্ধু আশ্রমে একটি চা বৈঠক স্থাপনের জন্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহারই নাম অনুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে।

পূজনীয় গুরুদেব প্রথমে এই চক্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। প্রথমত, ইহা আশ্রমের কর্মী ও অধ্যাপকগণের অবসরসময়ে একটি মিলনের ক্ষেত্রের মতো হইবে— যেখানে সকলে একত্র হইয়া আলাপ-আলোচনায় পরস্পরের যোগসূত্র দৃঢ় করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়ত, চীনদেশে চা-পান একটি আর্টের মধ্যে গণ্য। সেখানে ইহা আমাদের দেশের মতো যেমন-তেমন ভাবে সম্পন্ন হয় না। তিনি আশা করেন, চীনের এই দৃষ্টান্ত আমাদের ব্যবহারের মধ্যে একটি সৌষ্ঠব ও সুসংগতি দান করিবে।

বর্ষাঋতুর জন্য শ্রীযুত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চা-চক্রের চক্রবর্তী পদে অভিষিক্ত হইলেন। তৎপরে গুরুদেবের নবরচিত একটি গান হয়। ইহার পরে সমাগত নিমন্ত্রিতগণ চীন হইতে আনীত খাদ্য আনন্দের সহিত ভোজন করেন।

'সুসীম চা-চক্র' উল্লিখিত সেই 'নবরচিত গান'—সুরে গেয়, অথচ সংস্কৃতের ন্যায় স্বরবর্ণের লঘু গুরু উচ্চারণ-সহ কবিতারূপেও পাঠের যোগ্য।

'চাতক' কবিতা প্রসঙ্গে, 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় কবিতাটির পরিচয়স্বরূপ মুদ্রিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয়ের বক্তব্যটুকু প্রণিধানযোগ্য—

এ কবিতাটি গুরুদেব যে প্রসঙ্গে লেখেন তাহা আমার মনে আছে। অধ্যাপকেরা বিদ্যাভবনের বারাণ্ডায় চা পান করিতেন। গুরুদেব মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতেন, এবং বলাই বাহুল্য তাহাতে আনন্দের মাত্রা বাড়িয়া উঠিত। আমি বিদ্যাভবনে আমার কাজ নিয়া থাকিতাম, অত কাছে থাকিলেও আমি খুব কমই ঐ 'চা-চক্রে' বসিতাম, চা পান তো করিতামই না। একদিন অধ্যাপকেরা 'চা চক্রে'র জন্য আমার নিকট হইতে ১৫ আদায় করেন। ইহাতে আমার ঐ বন্ধু 'চা-চাতক'গণ (এ নাম গুরুদেবেরই দেওয়া) 'চা চক্রে'র এক বিশেষ ব্যবস্থা করেন। আর, গুরুদেব সেদিন 'চক্রেশ্বর' হইয়া এই আলোচ্য কবিতাটি পাঠ করেন।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক পৌষ ১৩৫০, পৃ· ১৩৮

'মিষ্টান্বিতা' কবিতাটি শ্রীমতী পারুল দেবীকে পত্রাকারে লিখিত হয়। কবিতার শেষ স্তবকটুকু রহস্যচ্ছলে প্রথমবারে প্রেরিত হয় না। ১৯৩৫ সালের ৫ জুন তারিখে নিম্নোদ্‌ধৃত ভূমিকার পর উক্ত অংশ প্রেরিত হয়—

আমি আশা করেই ছিলুম যে তুমি আমার উপর খুব রাগ করবে, কেননা রাগটা সকল ক্ষেত্রে মন্দ জিনিস নয়— না রাগ করা ঔদাসীন্যের লক্ষণ। তোমাকে রাগাব বলেই কবিতাটির শেষ

দুটো শ্লোক তোমাকে পাঠাই নি— উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, অতএব এখন পাঠাই। কবিতার প্রথম অংশের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে পাঠ কোরো।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, পৌষ ১৩৪৯, পৃ. ৩৭৫

'নামকরণ' কবিতার দ্বিতীয় স্তবক 'গল্পসল্প' গ্রন্থের 'চণ্ডী' গল্পে ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের 'চন্দনী' গল্পের শেষে যে কবিতা আছে তাহা এই কবিতার শেষ স্তবকটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত নূতনরূপ।

'নারীর কর্তব্য' কবিতাটি 'আন্নাকালী পাকড়াশী'র ছদ্ম-স্বাক্ষরে 'অলকা' পত্রিকায় বাহির হয়। এই উপলক্ষে অন্য বহু ছদ্মনামও ভাবা হইয়াছিল। এই কবিতা সম্পর্কে কিছু তথ্য 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' (বৈশাখ ১৩৬৪) গ্রন্থের ২১০-১১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

'মধুসন্ধায়ী' কবিতা কয়টি 'মংপু-নিবাসিনী মৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত'। আলোচ্য কবিতাধারার পরিশেষ-স্বরূপ নিম্নমুদ্রিত কবিতাটি মৈত্রেয়ী দেবী -কর্তৃক সম্পাদিত 'পঁচিশে-বৈশাখ' হইতে সংকলন করা হইল—

বিবিধজাতীয় মধু গেল যদি পাওয়া
তবুও রয়েছে কিছু বাকি দাবি-দাওয়া।
এখন স্বয়ং যদি আসিবারে পার'
তা হলে মাধব ঋণ বেড়ে যাবে আরো।
আহারের কালে মধু রহে বটে পাতে,
কিন্তু কোথা, দান করেছিলে যেই হাতে!
ডাকযোগে সাড়া পাই, থাক দূরদেশী—
মোকাবিলা দেখাশোনা দাম ঢের বেশি।
পদ্যশিখরেব পানে কবি মধু-সখা
উড়েছিল মধুগন্ধে, গদ্য উপত্যকা
করিবে আশ্রয় আজি স্পষ্টভাষণের
প্রয়োজনে। দুরারোহ তব আসনের।
ঠাঁই-বদলের আমি করিতেছি আশা,
সংশয় না থাকে কিছু তাই এই ভাষা।

১১ মার্চ ১৯৪০

'মিলের কাব্য' নিম্নোদ্‌ধৃত গদ্য ভূমিকা-সহ 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—

১৯।১।৪১ তারিখের কথা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বসে আছি শয়নকক্ষে কেদারায় হেলান দিয়ে। আমি ঠাট্টা করে বলে থাকি, আমার জীবনের প্রথম পালা কল্যাণরাগে, তখন সুস্থ শরীরে চলাফেরা চলত; দ্বিতীয় পালা এই কেদারা রাগিণীতে অচল ঠাটে বাঁধা। আকাশ ছিল মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, বৃষ্টি হচ্ছে টিপ টিপ করে। সুধাকান্ত বসে আছে পাশের চৌকিতে। হঠাৎ আমাকে বকুনি পেয়ে বসল। একটা কথা শুরু করলুম অকারণে, বলে গেলুম:

যখন মনে ভাবি কিছু একটা হল, সুখদুঃখের তীব্রতা নিয়ে এমন করে হল যে কোনো কালে তার ক্ষয় হবে বলে ধারণাই হয় না, ঠিক সেই মুহূর্তেই মহাকাল পিছনে ব'সে ব'সে মুখ ঢেকে তার চিহ্নগুলো মুছতে শুরু করে দিয়েছেন। কিছুকাল পরে দেখি, সাদা হয়ে গেছে; মনে যদি বা স্মৃতি থাকে তবু যে-অনুভূতি তার সত্যতার প্রমাণ আজ লেশমাত্র তার বেদনা নাই। তা হলে যেটা হল শেষ পর্যন্ত সেটা কী। সংস্কৃত শ্লোকে প্রশ্ন আছে, রঘুপতির অযোধ্যাপুরী গেল কোথায়। রঘুপতির অযোধ্যা বহু লোকের বহু কালের নানাবিধ সুস্পষ্ট অনুভূতিতেই প্রতিষ্ঠিত, সেই বিপুল অনুভূতি গেল শূন্য হয়ে। তা হলে যা ছিল সে কী ছিল। মস্ত একটা 'না' প্রকাণ্ড

একটা 'হাঁ'য়ের আকার ধরেছিল। নাস্তিত্ব সে অস্তিত্বের জাল গেঁথেই চলেছে, আবার সে জাল গুটিয়ে নিচ্ছে নিজের মধ্যে। এই দুর্বোধ রহস্যকে বাস্তব বলব কেমন করে। এই যে ইন্দ্রজাল এর মধ্যে দুইয়ের মিল চলেইছে, তাই একে মিত্রাক্ষর কাব্য বলতে হবে— একের উপাদানে সৃষ্টি হয়ই না। সৃষ্টি জোড়-মিলনের কাব্য।

গদ্যের ধারা শেষকালে মুখে মুখে ছড়ার ছন্দে লাইনে লাইনে গাঁট বেঁধে চলল। অসুস্থ শরীরেও আমার একটা অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ হয়ে উঠেছে। সুধাকান্ত এরই ফলের প্রত্যাশায় বসে থাকেন। আজ বাদলসন্ধ্যায় হাজরে দেওয়া তিনি কাজে লাগিয়েছেন তার প্রমাণ দিই···

—কবিতা, চৈত্র ১৩৪৭, পৃ· ১

কবিতাটির শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি মুখ্যত কবির স্বহস্তে লেখা; ১৩৪৭ চৈত্রের কবিতা পত্রে নাই এমন দুটি ছত্র :

দিদিমণি, বাস্তব নও নিশ্চয় তা জেনো।
বিশ্বকবির স্বপ্ন বললে রাগ কোরো না যেন॥

তাহাতে পাওয়া যায়। রচনার সমসময়ে যে টাইপ-কপি প্রস্তুত করা হয় অতিরিক্ত ঐ দুই ছত্র তাহাতেও বর্তমান। কবিতা পত্রের 'কপি'তে "ছাড়" হয় অথবা কবি পরে ঐ দুটি ছত্র যোগ করেন নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও সম্পূর্ণ যে পাঠ বর্তমানে পাওয়া যায়, তাহা প্রহাসিনী স্বতন্ত্র গ্রন্থের ১৩৯১ বৈশাখ সংস্করণে সংকলিত। রচনার স্থান-কালও সংরক্ষিত কপি অনুসারে।

আকাশপ্রদীপ

'আকাশপ্রদীপ' ১৩৪৬ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে মুদ্রণপ্রমাদের ফলে প্রকাশকাল '১৩৪৫' ছাপা হইয়াছিল। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি প্রভৃতির সাহায্যে কয়েকটি কবিতায় রচনার কাল ও স্থান সংযোজিত, এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধিত হইয়াছে; 'বেজি' কবিতা দ্রষ্টব্য।

১৩৪৪ সালের গ্রীষ্মে আলমোড়ায় অবস্থানকালে রচিত 'যাত্রাপথ' কবিতাটি বাদে 'আকাশপ্রদীপ'এর অন্যান্য প্রায় সমস্ত কবিতা ১৩৪৫ সালের আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্যন্ত সাত মাস কালের মধ্যে শান্তিনিকেতনে রচিত। অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক পত্রে প্রথম প্রচারিত না হইয়া একেবারে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। চারটিমাত্র কবিতার পত্রিকায় প্রকাশের সূচী নিম্নে দেওয়া হইল—

জানা-অজানা	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৪৫
পাখির ভোজ	প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩৪৫
সময়হারা	প্রবাসী। মাঘ ১৩৪৫
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে'	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৪৬

'যাত্রাপথ', 'স্কুল-পালানে', 'ধ্বনি', 'বধূ', 'জল', 'শ্যামা', 'কাঁচা আম'— এই কয়টি কবিতা প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'র আরম্ভের কয়েক পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড : সুলভ নবম খণ্ড দ্রষ্টব্য) ও 'ছেলেবেলা' গ্রন্থটির কোনো কোনো অংশ বিশেষভাবে তুলনীয়।

'বধূ' কবিতার প্রথম ছত্রটির পূর্ববর্তী কোনো-এক পাঠে পাণ্ডুলিপিতে 'ঠাকুরমা' স্থলে 'মুখুজ্জে' পাওয়া যায়। 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লিখিত খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্যের ছড়া বলার বিবরণটুকু এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

সেই কৈলাস মুখুজ্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুত বেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই-যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত। আপাদমস্তক তাহার যে বহুমূল্য অলংকারের তালিকা পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোৎসবের যে অভূতপূর্ব সমারোহের বর্ণনা শুনা যাইত, তাহাতে অনেক প্রবীণবয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত— কিন্তু বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানা বর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য সুখচ্ছবি দেখিতে পাইত তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা।

—জীবনস্মৃতি, শিক্ষারম্ভ অধ্যায়

'শ্যামা' ও 'কাঁচা আম' কবিতা দুইটি তথ্যের বিচারে জুড়ি কবিতা। এই প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে বধূসমাগমের সংক্ষিপ্ত বিবরণটুকু তুলনীয়—

তাহার পরে গলায় সোনার হারটি পরিয়া বাড়িতে যখন নববধূ আসিলেন তখন অন্তঃপুরের রহস্য আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, যাঁহাকে কিছুই জানি না অথচ যিনি আপনার, তাঁহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত।

—জীবনস্মৃতি, প্রত্যাবর্তন অধ্যায়

পাণ্ডুলিপিতে 'শ্যামা' কবিতার ষষ্ঠ ও সপ্তম পঙক্তির নিম্নরূপ আদিপাঠ পাওয়া যায়—

তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে,
বারো ছিল বয়স আমার।

'জানা-অজানা' কবিতার 'প্রবাসী'তে-প্রকাশিত পাঠে সর্বশেষ দুইটি অতিরিক্ত ছত্র মুদ্রিত হইয়াছিল—

তাহাতে আভাসে থাকে চরমের কথা,
অস্তগিরিশিখরের নক্ষত্রের রহস্যাবরতা।

'যাত্রা' কবিতাটিতে যে স্মৃতিচিত্র বর্ণিত হইয়াছে সেই প্রসঙ্গে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড বা ভ্রমণের ডায়ারির (বিচিত্র প্রবন্ধ : য়ুরোপ-যাত্রী) 'শুক্রবার। ২২শে আগস্ট ১৮৯০' তারিখের অংশটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর সুলভ প্রথম খণ্ডে ৮৩৫-৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

'সময়হারা' কবিতার 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত পাঠের সূচনায় ছিল—

ডাক্তারেতে বলে যখন 'মরেছে এই লোক'
তাহার তরে মিথ্যা করা শোক,
কিন্তু যখন বলে 'জীবনমৃত'
সেটা শোনায় তিতো।
আমার ঘটল তাই,
নালিশ তবু নাই।

বর্তমান গ্রন্থের ৮৫ পৃষ্ঠার 'কখনো বা হিসাব ভুলে' ইত্যাদি ২৮-৩১ সংখ্যক ছত্র 'প্রবাসী'তে নাই ; অপর পক্ষে ৮৭ পৃষ্ঠার ৩০ ছত্রে য়ে-স্তবকের শেষ তাহার অনুবৃত্তিস্বরূপ পাওয়া যায়—

শোচনীয় এই যে খবরখানা
আছে শুধু এক মহলেই জানা।
বাকি রইল অনেক অবোধ যাদের আশা আছে,
ঘোরে আমার আনাচে-কানাচে।

ইংরেজি ১৯৩৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে অমলকৃষ্ণ গুপ্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রের একটি অংশ আলোচ্য কবিতাটির প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য : আমার 'সময়হারা' কবিতাটি কোনো পক্ষর সঙ্গে ঝগড়া করতে লিখি নি, ওটা যে একটা সকৌতুক কবিতা সে কথাটা প্রায় সকলেরই দৃষ্টি এড়িয়েছে।

'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' কবিতাটি প্রকাশের পর, যে পুরাতন ছড়া অবলম্বনে উহা রচিত তাহার ঢাকা-ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত পাঠ 'প্রবাসী'তে (আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ· ৩৭৩) সংগ্রহের চেষ্টা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে উহার একটি পাঠ বহুকাল পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া ১৩০১-০২ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশ করিয়াছিলেন। আলোচ্য কবিতা প্রসঙ্গে কবির সংগৃহীত সেই ছড়া রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ড (পৃ· ৬২৭) হইতে (সুলভ তৃতীয়, পৃ· ৭৮৪) নিম্নে সংকলিত হইল।

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে।
সুন্দরীরে বিয়া দিলাম ডাকাতের মেলে॥
ডাকাত আলো মা।
পাট কাপড় দিয়ে বেড়ে নিলে
দেখতে দিলে না॥
আগে যদি জানতাম।
ডুলি ধরে কানতাম॥

'কাঁচা আম' কবিতার শেষ স্তবকে যে ঘটনাটির উল্লেখ আছে সেই প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের নিম্নোদধৃত রবীন্দ্র-বাক্যটুকু প্রণিধানযোগ্য—

জানো, একবার মাত্র জীবনে গয়না পরেছিলুম, আংটি। নতুন বৌঠান দিয়েছিলেন, গাজিপুরে গঙ্গায় চান করতে গিয়ে জলে পড়ে গেল, খুব দুঃখ হয়েছিল।

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, ১ম সংস্করণ, পৃ ২০৫

নবজাতক

'নবজাতক' ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে ইহার অধিকাংশ কবিতা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রকাশসূচী যথাসম্ভব সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাঙ্কসহ মুদ্রিত হইল—

নবজাতক	পাঠশালা। কার্তিক ১৩৪৫।৮৯
উদ্‌বোধন	শতদল। [কষ্টিপাথর : প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭।২২১]
প্রায়শ্চিত্ত	প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৪৫।১৯৭
বুদ্ধভক্তি	পরিচয়। ফাল্গুন ১৩৪৪।৭০৫
কেন	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৪৫।৭৭৯
হিন্দুস্থান	প্রবাসী। পৌষ ১৩৪৪।৩০১
রাজপুতানা	প্রবাসী। মাঘ ১৩৪৫।৫৯৯
ভাগ্যরাজ্য	পরিচয়। শ্রাবণ ১৩৪৪।১
ভূমিকম্প	নাচঘর। ৩০ চৈত্র ১৩৪০

পক্ষীমানব	বিচিত্রা । জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯।৫৭১
রাতের গাড়ি	জয়শ্রী । জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭
মৌলানা জিয়াউদ্দীন	প্রবাসী । শ্রাবণ ১৩৪৫।৫৮০
এপারে-ওপারে	প্রবাসী । শ্রাবণ ১৩৪৬।৪৫৫
মংপু পাহাড়ে	পরিচয় । শ্রাবণ ১৩৪৫।১
ইস্‌টেশন	কবিতা । আশ্বিন ১৩৪৫।১
জবাবদিহি	প্রবাসী । বৈশাখ ১৩৪৭।৪৮
প্রবাসী	'জন্মদিন' : প্রবাসী । জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬।২৭১
জন্মদিন	প্রবাসী । আষাঢ় ১৩৪৬।৩১১
রোম্যান্টিক	কবিতা । পৌষ ১৩৪৬।১
ক্যান্ডীয় নাচ	প্রবাসী । শ্রাবণ ১৩৪৪।৪৭৫
অবর্জিত	প্রবাসী । শ্রাবণ ১৩৪২।৪৫৭
শেষ হিসাব	কবিতা । আশ্বিন ১৩৪৬।১
জয়ধ্বনি	প্রবাসী । পৌষ ১৩৪৬।২৯৯
প্রজাপতি	প্রবাসী । বৈশাখ ১৩৪৬।৪
প্রবীণ	প্রবাসী । পৌষ ১৩৪৫।৩৪৫
রাত্রি	প্রবাসী । মাঘ ১৩৪৬।৪৩৫

'নবজাতক' কবিতা শ্রীমান্ কিশোরকান্ত বাগচীর উদ্দেশে লিখিত তাহা পাণ্ডুলিপি হইতে জানা যায়। অপিচ দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ৯, পৃ. ৪২৪ ও ৪৩০।

'উদ্‌বোধন' কবিতাটির যে পাঠ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ছিল। উক্ত পাঠ অনুসারে, নিম্নোদ্‌ধৃত নূতন চারিটি ছত্রের অনুবৃত্তিস্বরূপ নবজাতকে মুদ্রিত পাঠের দ্বিতীয় স্তবক (পৃ. ১০৬) পড়িতে হইবে—

শুকতারকার প্রথম প্রদীপ হাতে
অরুণ-আভাস-জড়ানো ভোরের রাতে
আমি এসেছিনু তোমারে জাগাব ব'লে
তরুণ আলোর কোলে—

কবিতাটির আরম্ভের কুড়িটি ছত্র, রবীন্দ্রসদনে-রক্ষিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে, ১৯৩৮ সালের ১৩ অক্টোবর তারিখে শান্তিনিকেতনে স্বতন্ত্র কবিতা-আকারে প্রথম লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেই আকারে উহা দ্বিতীয়সংস্করণ গীতবিতানের 'ভূমিকা' রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল।

'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটির পূর্বতন একটি পাঠ রবীন্দ্রসদনের পাণ্ডুলিপিতে নিম্নরূপ পাওয়া যায়—

বহু শত শত বৎসর ব্যাপি
শত শত দিনে রাতে
দৈন্যের আর স্পর্ধার সংঘাতে
ধিকি ধিকি করে ব্যাপ্ত হয়েছে
পাপের দহনজ্বালা
সভ্যনামিক পাতালপুরীতে যেখানে যক্ষশালা।
মাঝে মাঝে তারি ঝলক লেগেছে
আতিশয্যের 'পরে,
ভাগ্যের তাহা মহিমা বলিয়া
জেনেছে গর্বভরে

সুখস্বপ্নের নিশীথে উঠিল ভূমিকম্পের রোল—
জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে লাগিল দারুণ দোল।
অহংকারের ফাটিল হর্ম্যচূড়া,
লুণ্ঠিত ধনভাণ্ডার হল গুঁড়া।
বিদীর্ণ হল প্রমোদভবনতল,
তারি গহ্বর ভেদিয়া উঠিল
নাগনাগিনীর দল।
বিষ-উদ্‌গারে দুলিল লক্ষ ফণা,
প্রলয়শ্বাসে ছুটিল অগ্নিকণা।
রক্তমাতাল যমদূত সবে বীভৎস উৎসবে
ধরণীর বুক চিরিতে লাগিল অট্টহাস্যরবে।
নিরর্থ হাহাকারে
দিয়ো না দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে।
পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের উদ্দাম বেগে আগে হয়ে যাক ক্ষয়।
অসহ দুঃখে ব্রণের পিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তার
কলুষপুঞ্জ করে দিক উদ্‌গার।
দানবের ভোগে বলি এনেছিল যারা
সেই ভীরুদের দলিত জীবনে উঠুক মৃত্যুধারা।
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতাব রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন
ফেলুক তাহারে গ্রাসি।
ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু কারা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।
দুর্বলাত্মা মনে জানে ওরা
ভীত প্রার্থনারবে
শান্তি আনিবে ভবে।
তার বেশি কিছু দিতে নাহি মন, শুধু বাণীকৌশলে
জিনিবে ধরণীতলে।
বহু দিবসের পুঞ্জিত লোভ
বক্ষে রাখিয়া জমা
কেবল শাস্ত্রমন্ত্র পড়িয়া
বিধাতার লবে ক্ষমা।
সবে না দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি ভক্তির।
যদি এ ভুবনে থাকে কোনো তেজ
কল্যাণশক্তির—

ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।

বিজয়াদশমী
১৩৪৫

'বুদ্ধভক্তি' কবিতার গদ্যচ্ছন্দে লিখিত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি রূপ পত্রপুট গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে বা উহার পুনরমুদ্রণে সতেরো-সংখ্যক কবিতার আকারে মুদ্রিত আছে। আলোচ্য প্রসঙ্গে বিংশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর ৫১ পৃষ্ঠা ও গ্রন্থপরিচয় (সুলভ দশম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

'কেন' কবিতার মিল-বিহীন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পাঠ পাণ্ডুলিপিতে রহিয়াছে, কবিতাটির উহাই সম্ভবত আদি পাঠ। সমগ্র কবিতাটি নিম্নে মুদ্রিত হইল—

শুনিলাম জ্যোতিষীর কাছে
তপনের আত্মদান-মহাযজ্ঞ হতে
যে জ্যোতি-উৎসর্গ হয় নৈবেদ্যের মতো
এ বিশ্বের মন্দিরমণ্ডপে,
অতি তুচ্ছ অংশ তার
ধরা পড়ে পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের তলে।
অবশিষ্ট অমেয় আলোকরশ্মিধারা
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে লক্ষ্যহারা দ্যুলোকে দ্যুলোকে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে অপার তিমির-তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে
তেজোদীপ্ত অক্ষৌহিণী।
এ কি সর্বত্যাগী অপব্যয়
সর্বগ্রাসী ব্যর্থতার নিঃসীম অতলে।
কিংবা এ কি মহাকাল
এক হাতে দান করে, ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে।
যুগে যুগে বারংবার হিসাব মেলানো।
প্রকাণ্ড সঞ্চয়ে অপচয়ে?
কিন্তু কেন।

তার পরে চেয়ে দেখি মানুষের চৈতন্যজগতে।
ভেসে চলে কত চিন্তা কত-না কল্পনা, কত পথে
কত কীর্তি রূপে রসে— তীব্র বেগে
অমরত্ব সন্ধানের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে উঠে জেগে
ক্লান্তিহীন চেষ্টা কত।
জ্বলে ওঠে কোথাও বা বাতি
সংসারের যাত্রাপথে তপস্যার তেজে।
কোথাও বা সভ্যতার চিতাবহ্নিদাহ
নিঃস্বতার ভস্মশেষ রেখে।

লক্ষ লক্ষ ঝরিছে নির্ঝর
নিরুদ্দেশ প্রাণস্রোতে বহু ইচ্ছা বহু স্মৃতি লয়ে।
নিত্য নিত্য এমনি কি
অফুরান আত্মহত্যা মানবলোকের।
যুগে যুগান্তরে
মানুষের চিত্ত নিয়ে
মহাকাল কেবলি কি করে দ্যূতখেলা
আপনারি বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে।
কিন্তু কেন।

একদিন প্রথম বয়সে
এ প্রশ্নই জেগেছিল মনে।
শুধায়েছি এ বিশ্বের কোন্ কেন্দ্রস্থলে
মিলিতেছে নিরন্তর
অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের উল্লোলগর্জন,
ঝটিকার বজ্রমন্দ্র,
দিবসের রজনীর মর্মস্থলে
বেদনাবীণাব তারে চেতনার মিশ্রিত ঝংকার,
নিদ্রার মর্মরধ্বনি,
বসন্তের বরষার ঋতু-সভাঙ্গনে
জীবনের মরণের অবিশ্রাম কীর্তনকল্লোল,
আলোকের নিঃশব্দ চরণধ্বনি
মহা-অন্ধকারে।
বালকের কল্পনায় দেখেছিনু প্রতিধ্বনিলোক
গুপ্ত আছে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরকন্দরে।
সেথায় বিশ্বের ভাষা চতুর্দিক হতে
নিত্য সম্মিলিত।
সেথা হতে প্রতিধ্বনি নূতন সৃষ্টির ক্ষুধা লয়ে
ফিরে দিকে দিকে।
বহু যুগযুগান্তের বিশ্বনিখিলের ধ্বনিধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি আমাতে নিয়েছে আজি রূপ
নিবিড় সংহত প্রতিধ্বনি।
আজি শুধাইনু পুনরায়—
আবার কি সূত্র তার ছিন্ন হয়ে যাবে,
রূপহারা গতিবেগ
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্যযাত্রাপথে
ভেঙে ফেলে দিয়ে তার
স্বল্প-আয়ু বেদনার কমণ্ডলু।
কিন্তু কেন।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৮।৯।৩৮

'রাজপুতানা' কবিতাটির রচনা -প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ হইতে রবীন্দ্রনাথের কয়েক ছত্র উক্তি উদ্‌ধৃত করা হইল—

... ঐ যে বইটা দিয়েছে না, স্টেটসম্যানের 'সুন্দর ভারত', ওব মধ্যে দেখছিলাম রাজপুতানার ছবি। দেখেই মনে হল, হায় হায় এই কি সেই রাজপুতানা ? মৃত্যুর বোঝা বহন ক'রে তবু বেঁচে আছে। এর চেয়ে তাব ধ্বংস ছিল ভালো। কোনো একরকমের জীবনের চাইতে মরণই মঙ্গল, মরণই সম্মানের।

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। প্রথম মুদ্রণ, পৃ· ৩৭

১৩৪০ সালে বিহার-ভূমিকম্পের দুর্গতদের সাহায্য-কল্পে প্রধানত প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর অভিনয় হইয়াছিল। 'ভূমিকম্প' কবিতাটি সেই উপলক্ষে রচিত ও প্রেরিত হয়।

মৌলানা জিয়াউদ্দীন বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে ইস্‌লামীয় সংস্কৃতিব অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটিলে শান্তিনিকেতনে শোকসভায় রবীন্দ্রনাথের যে ভাষণ প্রদত্ত হয় তাহার অনুলিপি 'মৌলানা জিয়াউদ্দীন' কবিতার পরিপূরক-স্বরূপ ১৩৪৫ শ্রাবণের প্রবাসী হইতে নিম্নে মুদ্রিত হইল—

মৌলানা জিয়াউদ্দীন

আজকের দিনে একটা কোনো অনুষ্ঠানের সাহায্যে জিয়াউদ্দীনের অকস্মাৎ মৃত্যুতে আশ্রমবাসীদের কাছে বেদনা প্রকাশ করব, এ কথা ভাবতেও আমার কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে। যে অনুভূতি নিয়ে আমরা একত্র হয়েছি তার মূলকথা কেবল কর্তব্যপালন নয়, এ অনুভূতি আরো অনেক গভীর।

জিয়াউদ্দীনের মৃত্যুতে যে স্থান শূন্য হল তা পূরণ করা সহজ হবে না, কারণ তিনি সত্য ছিলেন। অনেকেই তো সংসারের পথে যাত্রা করে, কিন্তু মৃত্যুর পরে চিহ্ন রেখে যায় এমন লোক খুব কমই মেলে। অধিকাংশ লোক লঘুভাবে ভেসে যায় হালকা মেঘের মতো। জিয়াউদ্দীন সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না ; আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি যে স্থান পেয়েছেন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে একদিন একেবারে বিলীন হয়ে যাবে এ কথা ভাবতে পারি নে। কারণ, তাঁর সত্তা ছিল সত্যের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আশ্রম থেকে বাইরে গিয়েছিলেন তিনি ছুটিতে, তাঁর এই ছুটিই যে শেষ ছুটি হবে অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর লীলা মন মেনে নিতে চায় না। তিনি আজ পৃথিবীতে নেই সত্য, কিন্তু তাঁর সত্তা ওতপ্রোত ভাবে আশ্রমের সব-কিছুর সঙ্গে মিশে রইল।

তিনি প্রথমে আশ্রমে এসেছিলেন বালক বয়সে ছাত্র হিসাবে, তখন হয়তো তিনি ঠিক তেমন ক'রে মিশতে পারেন নি এই আশ্রমিক জীবনের সঙ্গে যেমন পরিপূর্ণ ভাবে মিশেছিলেন পরবর্তী কালে। কেবল যে আশ্রমের সঙ্গে তাঁর হৃদয় ও কর্মপ্রচেষ্টার সম্পূর্ণ যোগ হয়েছিল তা নয়, তাঁর সমস্ত শক্তি এখানকার আবহাওয়ায় পরিণতি লাভ করেছিল। সকলের তা হয় না। যাঁরা পরিণতির বীজ নিয়ে আসেন তাঁরাই কেবল আলো থেকে হাওয়া থেকে পরিপক্বতা আহরণ করতে পারেন। এই আশ্রমে যা সত্য যা শ্রেষ্ঠ সেটুকু জিয়াউদ্দীন এমনি করেই পেয়েছিলেন। এই শ্রেষ্ঠতা হল মানবিকতার, আর এই সত্য হল আপনাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত ক'রে দেবার শক্তি। ধর্মের দিক থেকে এবং কর্মের দিকে অনেকের সঙ্গেই হয়তো তাঁর মূলগত প্রভেদ ছিল, কিন্তু হৃদয়ের বিচ্ছেদ ছিল না। তাঁর চলে যাওয়ার বিশ্বভারতীর কর্মক্ষেত্রে যে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল, সেটা পূরণ করা যাবে না। আশ্রমের মানবিকতার ক্ষেত্রে তাঁর জায়গায় একটা শূন্যতা চিরকালের জন্যে রয়ে গেল। তাঁর অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতা, তাঁর মতো তেমনি ক'রে কাছে আসা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না, সংকোচ এসে পরিপূর্ণ সংযোগকে বাধা দেয়। কর্মের ক্ষেত্রে যিনি কর্মী, হৃদয়ের দিক থেকে যিনি ছিলেন বন্ধু, আজ তাঁরই অভাবে আশ্রমের দিক থেকে ও ব্যক্তিগত ভাবে আমরা একজন পরম সুহৃদকে হারালাম।

প্রথমে বয়সে তাঁর মন বুদ্ধি ও সাধনা যখন অপরিণত ছিল, তখন ধীরে ধীরে ক্রমপদক্ষেপে তিনি আশ্রমের জীবনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এখন তাঁর সংযোগের পরিণতি মধ্যাহ্নসূর্যের মতো দীপ্যমান হয়েছিল, আমরা তাঁর পূর্ণ বিকাশকে শ্রদ্ধা করেছি এবং আশা ছিল আরো অনেক কিছু তিনি দিয়ে যাবেন। তিনি যে বিদ্যার সাধনা গ্রহণ করেছিলেন সেই স্থান তেমন ক'রে আর কে নেবে, আশ্রমের সকলের হৃদয়ে তিনি যে সৌহার্দের আসন পেয়েছেন সে আসন আর কী ক'রে পূর্ণ হবে।

আজকের দিনে আমরা কেবল বৃথা শোক করতে পারি। আমাদের আদর্শকে যিনি রূপ দান করেছিলেন তাঁকে অকালে নিষ্ঠুরভাবে নেপথ্যে সরিয়ে দেওয়ায় মনে একটা অক্ষম বিদ্রোহের ভাব আসতে পারে। কিন্তু আজ মনকে শান্ত করতে হবে এই ভেবে যে, তিনি যে অকৃত্রিম মানবিকতার আদর্শ অনুসরণ ক'রে গেছেন সেটা বিশ্বভারতীতে তাঁর শাশ্বত দান হয়ে রইল। তাঁর সুস্থ চরিত্রের সৌন্দর্য, সৌহার্দের মাধুর্য ও হৃদয়ের গভীরতা তিনি আশ্রমকে দান ক'রে গেছেন, এটুকু আমাদের পরম সৌভাগ্য। সকলকে তো আমরা আকর্ষণ করতে পারি না। জিয়াউদ্দীনকে কেবল যে আশ্রম আকর্ষণ করেছিল তা নয়, এখানে তিনি তৈরি হয়েছিলেন; এখানকার হাওয়া ও মাটির রসসম্পদে, এখানকার সৌহার্দে তাঁর হৃদয়মন পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। তিনি যে সম্পদ দিয়ে গেলেন তা আমাদের মনে গাঁথা হয়ে রইবে, তাঁর দৃষ্টান্ত আমরা ভুলব না।

আমার নিজের দিক থেকে কেবল এই কথাই বলতে পারি যে, এরকম বন্ধু দুর্লভ। এই বন্ধুত্বের অঙ্কুর একদিন বিরাট মহীরুহ হয়ে তার সুশীতল ছায়ায় আমায় শান্তি দিয়েছে— এ আমার জীবনের একটা চিরস্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকল। অন্তরে তাঁর সন্নিধির উপলব্ধি থাকবে, বাইরের কথায় সে গভীর অনুভূতি প্রকাশ করা যাবে না।

শান্তিনিকেতন
৮।৭।৩৮

'ইসটেশন' কবিতার কেবলমাত্র দীর্ঘতর স্তবকগুলি প্রথমে রচিত হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ উহা ১৯৩৭ সালের ২৯ মে তারিখে আলমোড়ায় বাসকালে রচনা করেন। কবিতাটির গ্রন্থে মুদ্রিত তারিখ ও স্থান, বলা বাহুল্য, শেষ সংশোধনের হিসাবে বসানো হইয়াছে। কবিতাটির উক্ত প্রথম পাঠ পাণ্ডুলিপি হইতে নিম্নে উদধৃত হইল—

ইসটেশনে

সকাল বিকাল ইস্টেশনে আস,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাস।
ব্যস্ত হয়ে ওরা টিকিট কেনে,
কেউ বা চড়ে ভাঁটির ট্রেনে কেউ বা উজান ট্রেনে।
সকাল থেকে কেউ বা থাকে বসে,
কেউ বা গাড়ি ফেল করে তার শেষ মিনিটের দোষে।
চলচ্ছবির এই-যে মূর্তিখানি
মনেতে দেয় আনি
লোকজনের এই নিত্যভোলার মুহূর্তদের ভাষা
কেবল যাওয়া আসা।
এ সংসারে পরে পরে ভিড় জমা হয় কত,
খানিক বাদে ঘণ্টা বাজে কে কোথা হয় গত।

এর পিছনে সুখদুঃখ ক্ষতিলাভের তাড়া
দেয় সবল-নাড়া।
কিন্তু তাদের থাকায়
আর কিছু নেই, ছবির পরে তারা ছবি আঁকায়।
চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি।
এই কথাটাই নিলেম মনে জানি—
কর্মকারের নয় এ গড়া-পেটা,
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়, দেখার জিনিস এটা
কালের পরে যায় চলে কাল, হয় না কভু হারা
ছবির বাহন চলাফেরার ধারা।
দুবেলা সেই এ সংসারের চলতি ছবি দেখা
এই নিয়ে রও যাওয়া-আসার ইস্টেশনে একা।

আলমোড়া
২৯ মে ১৯৩৭

'সাড়ে নটা' কবিতাটি সম্বন্ধে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' (প্রথম মুদ্রণ, পৃ· ৯২-৯৩) গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সর্বপ্রথমে উহা সানাই গ্রন্থে মুদ্রিত 'মানসী' ('মনে নেই বুঝি হবে অগ্রহান মাস') -নামক কবিতার সহিত যুক্ত আকারে রচিত হইয়াছিল এবং পরবর্তী সংশোধন ও পরিবর্তনের ফলে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র আকার লাভ করিয়াছে।

'প্রবাসী' কবিতার প্রসঙ্গে সাময়িক পত্রে মুদ্রিত মন্তব্যটি এইরূপ : লাহোরে কবির জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানের উদ্যোগীরা অমিয় চক্রবর্তীর মারফত নূতন কবিতার জন্য কবিকে অনুরোধ করেন, তদুপলক্ষে রচিত।

'অবর্জিত' কবিতাটি, প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত পাঠ অনুসারে, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্দেশে রচিত হইয়াছিল।

'প্রজাপতি' কবিতার দুইটি পূর্বপাঠ রবীন্দ্রনাথের একাদশখণ্ড চিঠিপত্রের ১০৮ ও ১০৯-সংখ্যক পত্ররূপে প্রকাশিত। ১০৮-সংখ্যক পত্রে কবিতাটি সম্বন্ধে মন্তব্যও আছে।

সানাই

'সানাই' ১৩৪৭ সালের শ্রাবণ মাসে[১] প্রথম প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ কবিতা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত। নিম্নে প্রকাশসূচী সম্ভাব্যস্থলে পৃষ্ঠাঙ্কসহ মুদ্রিত হইল—

দূরের গান	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৪৬।৮০১
কর্ণধার	'লীলা' : প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৪৬।১৬১
আসা-যাওয়া	কবিতা। আষাঢ় ১৩৪৭।১
বিপ্লব	কবিতা। চৈত্র ১৩৪৬।১
জ্যোতির্বাষ্প	দেশ। ২৮ বৈশাখ ১৩৪৭

১ গ্রন্থে প্রথম প্রকাশের কাল 'আষাঢ়' মুদ্রিত হইয়াছিল ; ঐ মাসেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু পরে নবরচিত আর কয়েকটি কবিতা কবি যোগ করেন। গ্রন্থশেষে মুদ্রিত শ্রাবণ মাসে লেখা কবিতা-কয়টি দ্রষ্টব্য।

জানালায়	প্রবাসী । জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭।১৪৬
ক্ষণিক	কবিতা । আষাঢ় ১৩৪৭।২
নতুন রঙ	'গোধূলি' : জয়শ্রী । চৈত্র ১৩৪৬
সানাই	প্রবাসী । ফাল্গুন ১৩৪৬।৫৭১
স্মৃতির ভূমিকা	প্রবাসী । ভাদ্র ১৩৪৬।৫৯৯
মানসী	'ছিন্নস্মৃতি' : পরিচয় । শ্রাবণ ১৩৪৬।১
সার্থকতা	প্রবাসী । জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭।১৪৫
মায়া	প্রবাসী । শ্রাবণ ১৩৪৫।৪৬৫
অদেয়	প্রবাসী । জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬।১৫৭
রূপকথায়	'গান' : বঙ্গলক্ষ্মী । পৌষ ১৩৪৬
অধীরা	বিচিত্রা । বৈশাখ ১৩৪৫।৪২৫
বাসাবদল	প্রবাসী । আশ্বিন ১৩৪৬।৭৪৩
শেষ কথা	পরিচয় । বৈশাখ ১৩৪৬
মুক্তপথে	কবিতা । পৌষ ১৩৪৩।১
আধোজাগা	রূপ ও রীতি । বৈশাখ ১৩৪৭
যক্ষ	প্রবাসী । শ্রাবণ ১৩৪৫।৪৬৩
পরিচয়	প্রবাসী । কার্তিক ১৩৪৬।১
নারী	চতুরঙ্গ । আশ্বিন ১৩৪৫
গানের স্মৃতি	'তোমারে কি চিনিতাম আগে' : বিচিত্রা । অগ্রহায়ণ ১৩৪৫
অবশেষে	'পালাশেষ' : জয়শ্রী । আষাঢ় ১৩৪৬
সম্পূর্ণ	পরিচয়'। চৈত্র ১৩৪৫
উদ্‌বৃত্ত	'গান' : বৈজয়ন্তী । কার্তিক ১৩৪৬
অত্যুক্তি	পরিচয় । জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬।৪৬৭
হঠাৎ মিলন	বিচিত্রা । শ্রাবণ ১৩৪৫।১
দূরবর্তিনী	'অলস মিলন' : কবিতা । আশ্বিন ১৩৪৪।১
গান	বঙ্গলক্ষ্মী । বৈশাখ ১৩৪৬
বাণীহারা	'গান' : জয়শ্রী । অগ্রহায়ণ ১৩৪৬
অনসূয়া	প্রবাসী । বৈশাখ ১৩৪৭।৬৩
শেষ অভিসার	সমসাময়িক । আষাঢ় ১৩৪৭
বিমুখতা	প্রবাসী । ভাদ্র ১৩৪৭।৫৫৭
অসময়	সাহানা । জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭
অপঘাত	প্রবাসী । শ্রাবণ ১৩৪৭।৪৭০
মানসী	প্রবাসী । শ্রাবণ ১৩৪৭।৪২১

তারিখের নির্দেশ সংযোজিত হইয়াছে।

'কর্ণধাব' কবিতাটির প্রথম রচনা ও উহার ক্রমবিবর্তনের পরিচয়-স্বরূপ 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক কিয়দংশ নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল—

একদিন সুন্দব বোদ উঠেছে, আকাশে অল্প অল্প শরৎকালের [?] মেঘ,— মংপুব পক্ষে দিনটা ঈষৎ গবম বলা যেতে পারে। এখানকাব কুয়াসার বন্ধন মোচন ক'বে যেদিন রোদ উঠত উনি [ববীন্দ্রনাথ] খুব

খুশি হয়ে উঠতেন। যথারীতি বারান্দার বড় চৌকিটাতে বসে আছেন। আমরা খাবার ঘর থেকে গুন গুন গান শুনতে পাচ্ছি। খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে বারান্দায় এলাম আমরা।

"আজ চমৎকার দিনটি হয়েছে। কেবল কুঁড়েমি করতে ইচ্ছে করছে, তাই এই চৌকিতে হেলান দিয়ে বসেই আছি, বসেই আছি।" গান গেয়ে যেতে লাগলেন— "হে তরুণী তুমি আমার ছুটির কর্ণধার।— আজ সমস্ত দিনটা যেন ছুটিতে পাওয়া। কাজের দিন নয় এ, তাই বসে বসে গাইছি— হে তরুণী, তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার, অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি নিয়ে যাবে কর্মনদীর পার। হে তরুণী—" সে সুর মনে আছে। ইসারায় বল্লেন—কলমটা দাও। প্যাড আর কলম এগিয়ে দিলুম। গান গেয়ে লিখে চল্লেন—

হে তরুণী তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার
অলস হাওয়ায় বাইচো স্বপনতরী
নিয়ে যাবে কর্মনদীর পার।

প্যাডটা নিয়ে গুন গুন করে গেয়ে চললেন। বিকেলবেলা যখন ফিরে এলুম, দেখি লেখাটা প্রায় সবই বদল হয়ে গেছে এবং বিচিত্রিত ভাবে আগেকার লেখাটিকে কালির আচ্ছাদনে মণ্ডিত ক'রে আঁকা হয়েছে সুন্দর একটি ছবি, তার ফাঁকে ফাঁকে নূতন যে লেখাটা পড়া যাচ্ছে—

কে অদৃশ্য ছুটির কর্ণধার
অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি
কর্মনদীর পার।
দিগন্তরের কুঞ্জবনে
অশ্রুত কোন গুঞ্জরণে
বাতাসেতে জাল বুনে দেয়
মদির তন্দ্রার।
নীল নয়নের মৌনখানি
সেই সে দূরের আকাশবাণী
দিনগুলি মোর ওরি ডাকে
যায় ভেসে যায় বাঁকে বাঁকে
উদ্দেশহীন অকর্মণ্যতার।

মংপু[৩]
২৩।৫।৩২

প্যাডটা ফেলে দিলেন— "লও, কপি কর খাতায়।" তার পরদিন সকালবেলায় খাতাটা দিয়ে বল্লেন— "হে তরুণী, আর একবার কপি করতে হচ্ছে।" তখন দেখি কবিতাটা আরো অনেক বদলে গেছে, তার প্রথম লাইনটা হয়েছে— "কে অসীমের লীলার কর্ণধার।" এমনি ক'রে পরিবর্তিত পারবর্ধিত হতে হতে বেশ কয়েকদিন পরে সে এক সম্পূর্ণ অন্য কবিতা হয়ে দাঁড়াল—

ছুটির কর্ণধার
দখিন হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি
কর্মনদীর পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী
মন্থর দিন তারি ডাকে
যায় ভেসে যায় বাঁকে বাঁকে

৩ কবিতাটির এই পাঠের রচনার স্থানকালনির্দেশ মূল পাণ্ডুলিপি হইতে উদধৃত হইল।

ভাটার স্রোতে উদ্দেশহীন
কর্মহীনতার
তুমি তখন ছুটির কর্ণধার
শিরায় শিরায় বাজিয়ে তোলো
নীরব ঝংকার— ইত্যাদি।

কয়েক মাস পরে যে তার সংস্করণ 'সানাই'-তে প্রকাশ হ'ল তাকে আর চেনবার জো নেই।

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। পৃ· ১৭৭-৭৯

সানাই প্রকাশের পূর্বে ১৩৪৬ অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে 'লীলা' নামে উক্ত কবিতাটির আর-একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল—

লীলা

ওগো কর্ণধার
সৃষ্টি তোমার ভাসান খেলায়
লীলার পারাবার।
আলোক-ছায়া চমকিছে
ক্ষণেক আগে, ক্ষণেক পিছে,
পূর্ণিমারে ফুটিয়ে তোলে
অমার অন্ধকার।
ছুটির খেলা খেলাও কর্ণধার,
ডাইনে বাঁয়ে দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মিথ্যার।

লীলার কর্ণধার
জীবন নিয়ে মৃত্যুভাঁটায়
চলেছে কোন পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী,
গান করে দিন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
তুমি ওগো লীলার কর্ণধার
রক্তে বাজাও রহস্যময়
মন্ত্রের ঝংকার।

অলস ক্ষেতের পোড়ো ভূমে
আগাম ফসল মগন ঘুমে।
অগোচরে মাটির নীচে
সোনার স্বপন অঙ্কুরিছে,
আলোর পানে কান্না ওঠে
খবর না পাই তার।
তুমি করো লীলার কর্ণধার
শ্যামল ঢেউয়ের তাল-সাধনা
দিগন্ত-দোলার।

তাকিয়ে থাকে নিমেষহারা
দিনশেষের প্রথম তারা
ছায়াঘন কুঞ্জবনে
মন্দমৃদু গুঞ্জরণে
বাতাসেতে জাল বুনে দেয়
মদির তন্দ্রার।
তুমি তখন লীলার কর্ণধার
গোধূলিতে পাল তুলে দাও
ধূসরচ্ছন্দার।

অস্তরবির ছায়ার সাথে
লুকিয়ে আঁধার আসন পাতে।
ঝিল্লিরবে গগন কাঁপে,
দিগঙ্গনা কী জপ জাপে,
হাওয়ায় লাগে মোহপরশ
রজনীগন্ধার।
তুমি তখন লীলার কর্ণধার
নীরব সুরে বেহাগ বাজাও
বিধুর সন্ধ্যার।

রাতের শঙ্খকুহর ব্যেপে
ওঙ্কাররব ওঠে কেঁপে।
বিশ্বকেন্দ্রগুহা হতে
প্রতিধ্বনি অলখ স্রোতে
শূন্যে করে নিঃশবদের
তরঙ্গ বিস্তার।
তুমি তখন লীলার কর্ণধার
তারার ফেনা ফেনিয়ে তোলো
আকাশগঙ্গার।

মংপু
১৪।১০।৩৯

আলোচ্য কবিতার সানাইয়ে মুদ্রিত পাঠের অন্তিম স্তবকটি সর্বশেষে সংযোজিত হয়। তৎপূর্বে 'উদীচী ২৫।১।৪০' তারিখের রচনা অনুযায়ী (পাণ্ডুলিপি) কবিতাটি প্রথম পাঁচ স্তবকে সমাপ্ত ছিল।

'আসা-যাওয়া' কবিতার সহিত তুলনীয় সমকালীন একটি রচনা কৌতূহলী পাঠকদের জন্য পাণ্ডুলিপি হইতে উদধৃত হইল। ইহাকে আলোচ্য কবিতার পূর্বপাঠ বলা সমীচীন না হইলেও ভাবের বিচারে পূর্বাভাস বলা চলে—

নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে কেন এলে,
দুয়ারে মম স্বপ্নের ধন সম এ যে দেখি
তব কণ্ঠের মালা এ কী গেছ ফেলে,
জাগালে না শিয়রে দীপ জ্বেলে

এলে ধীরে ধীরে নিদ্রার তীরে তীরে
চামেলির ইঙ্গিত আসে
যে বাতাসে লজ্জিত গন্ধ মেলে।
বিদায়ের যাত্রাকালে পুষ্প-ঝরা বকুলের ডালে
দক্ষিণ পবনের প্রাণে
রেখে গেলে বল নি যে কথা কানে কানে,
বিরহবারতা
অরুণ আভার আভাসে রাঙায়ে গেলে।

উদয়ন
চৈত্র ১৩৪৬

নিম্নোদধৃত গানটিও[৪] এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

প্রেম এসেছিল
নিঃশব্দ চরণে
তাই স্বপ্ন মনে হল তারে
দিই নি তাহারে আসন।
বিদায় নিল যবে শব্দ পেয়ে
গেনু ধেয়ে—
সে তখন স্বপ্ন কায়াবিহীন
নিশীথতিমিরে বিলীন,
দূর পথে দীপশিখা
রক্তিম মরীচিকা।

উদয়ন
২৮ চৈত্র ১৩৪৬

'বিপ্লব' কবিতার সংক্ষিপ্ত একটি পূর্বপাঠ পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

নির্দয়া

ডমরুতে নটরাজ বাজালেন যে নাচের তাল
হে নটিনী
সে কি ছিন্ন করে নাই ঐ তব ঝংকৃত কিঙ্কিণী।
তোমার কুন্তলজাল
বেণীর বন্ধনমুক্ত উদ্দাম উচ্ছ্বাসে
উচ্ছৃঙ্খল উড়ে নি কি ঝঞ্ঝার বাতাসে।
বিদ্যুৎ-আঘাতে দীর্ণ হল ঐ তমিস্রাযামিনী
তোমার দিগন্তে হে নটিনী।

৪ ইহা দ্বিতীয়সংস্করণ গীতবিতানের প্রথম বা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয় নাই; পরবর্তী এবং প্রচলিত গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে বা অখণ্ড গীতবিতানে সংকলিত এবং তৎপূর্বে সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকার ১৩৫০ কার্তিক-সংখ্যার ১৭২ পৃষ্ঠায় স্বরলিপিসহ মুদ্রিত হয়। উক্ত পত্রিকায় গানের পঞ্চম ছত্রে 'নিল যবে' স্থলে 'দিনু যারে' এবং সপ্তম ছত্রে 'তখন' স্থলে 'তখনো' মুদ্রিত হইয়াছে।

নিষ্ঠুর চরণপাতে মুগ্ধদের গাঁথা ফুলমালা
বিস্রস্ত দলিত দলে বিতীর্ণ করেছ রঙ্গশালা।
মোহমদিরায় পূর্ণ কানায় কানায়
যে পাত্রখানায়
উচ্ছলি পড়িত রসধারা
আজ তার পালা হল সারা।
বাজে ডঙ্কা, শঙ্কা লাগে মনে
হে নির্দয়া, কী সংকেত স্ফুরে তব কঙ্কণে কঙ্কণে।

উদীচী। শান্তিনিকেতন
১৬।১।৪০

'মানসী' (পৃ ৮৭) কবিতা রচনার ইতিহাস নবজাতক গ্রন্থের 'সাড়ে নটা' (পৃ ৪১) কবিতার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই প্রসঙ্গে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের নিম্নোদধৃত বিবরণ প্রণিধানযোগ্য—

সকাল সাড়ে নটা দশটার সময় খাওয়া হয়ে গেলে বসবার ঘরে এসে বসতেন একটা চৌকিতে, হাতে থাকত একটা বই বা কোনো মাসিক পত্র— রেডিওতে বাজত সুশ্রাব্য অশ্রাব্য মেশানো প্রোগ্রাম, কিছু শুনতেন, কিছু শুনতেন না। "ইয়োরোপের সংগীত শুনছিলুম গো আর্যে, কী আশ্চর্য এই যন্ত্রটা। কোন্ সুদূর থেকে কত রাজ্য পার হয়ে ভেসে আসছে এই সুরধ্বনি। সে দেশে এখন কত কাণ্ডই চলেছে, মারামারি হানাহানি, সব পার হয়ে আসছে একখানি সুর, তার মধ্যে একটুও ছায়া পড়ে নি সেখানকার জীবনের। যেখানে এই গান গাওয়া হচ্ছে সেখানেও তো নানা রকম ব্যাপার চলেছে, নানা রকম ঘটনাপ্রবাহ। কত লোক আসছে যাচ্ছে— যে গান গাইছে তারও একটা অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সে সমস্তকে বাদ দিয়ে একটি সকল সম্পর্ক-রহিত নিরাসক্ত সুরের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে। মনে পড়ে যখন বোটে বসে লিখতুম, চারিদিকে জল বয়ে চলেছে মৃদু কলধ্বনিতে, দূরে দেখা যায় বালির চর ধূ ধূ করছে, আমি লিখেই চলেছি লিখেই চলেছি "মানসী" (মানসসুন্দরী)। যখন শুরু করেছিলাম তখন ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর, তার পরে ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল আলো, আকাশ রঙীন ক'রে অস্ত গেল সূর্য। একটি মাত্র চাকর বোটে থাকত আমার নীরব সঙ্গী, সে কখন নীরবে মিটমিটে প্রদীপ রেখে চলে গেল। আমি লিখেই চলেছি— মানসী। আজ কোনো কাজ নয়, সব ফেলে দিয়ে ছন্দ-বন্ধ-গ্রন্থ-গীত এসো তুমি প্রিয়ে! কোথায় গেল সেই দিন! সেই পদ্মার চর, ধূ ধূ করে সোনালী বালি সেই মিটমিটে শিখার ম্লান আলো, সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে গেছে, শুধু আছে মানসী, তার যে পরিবেশ ছিল সে তো লুপ্ত হয়ে গেল— এমন কি তার থেকে সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গেছে তার কবিও। চারিদিকের সমস্ত সূত্র তার ছিন্ন, সে শুধু একখানি সূত্রছিন্ন বাণী।… তোমার এই রেডিওর গান শুনছি আর এই সব ভাবছি।"

সেই দিন একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখেছিলেন এ বিষয় নিয়ে। তারপর পরিবর্তন করতে করতে একটা কবিতা থেকে দুটো কবিতা হয়। তার একটি 'সাড়ে নটা' নামে নবজাতকে, আর একটি 'মানসী' নামে সানাইয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। পৃ ৯১-৯৩

'সার্থকতা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে প্রেরিত মৈত্রেয়ী দেবীর একটি কবিতার উত্তরে প্রথম লিখিত হইয়াছিল, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' (পৃ· ৬৩-৬৫) গ্রন্থে এইরূপ লেখা হইয়াছে।

'রূপকথায়' ১৩৪৬ সালে শান্তিনিকেতনে 'ডাকঘর' অভিনয়ের অসমাপ্ত এক আয়োজন উপলক্ষে গান রূপে প্রথম রচিত হয়। নাটকটির তৃতীয় দৃশ্যে "ফকিরবেশী ঠাকুরদা"র ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ইহা গাহিবার কথা ছিল।

'বাসাবদল' কবিতার একটি পূর্ববর্তী পাঠে পাণ্ডুলিপিতে সূচনাংশ নিম্ন মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়—

এল এবার জিনিস প্যাকের দিন।
বালিগঞ্জে বাসা ছেড়ে যাব ব্যারাকপুরে।
অবিনাশের আনুকূল্য এই দশাতেই জোটে
চাইতে না চাইতেই,
কাজ পেলে সে ভাগ্য বলেই মানে,
খাটে মুটের মতো;
আর সবারে বোঝা তো নয় সহজ ব্যাপার,
কেবল জানি এই অবিনাশ নিতান্ত নিশ্চিত
সময় অসময়ে।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি
শুনি নাকি ধর্ম কেবল থাকে
আর এই অবিনাশ।
জিনিসপত্র ছড়াছড়ি,
লাগল ক'ষে আস্তিন গুটিয়ে।
ওডিকলন মুড়ে নিল পুরোনো এক আনন্দবাজারে
ইত্যাদি।

তৎপূর্বের অন্য একটি পাণ্ডুলিপিতে 'বাসাবদল' (পৃ ১৭৩) ও 'পরিচয়' (পৃ ১৮০) এই উভয় কবিতার গদ্যছন্দে-লিখিত একটি অবিচ্ছিন্ন আদিপাঠ পাওয়া গিয়াছে। অপ্রকাশিতপূর্ব এই রচনাটির নাটকীয় সুসম্পূর্ণতা কবিতা দুইটির রসগ্রহণে পাঠকদের সবিশেষ সাহায্য করিবে বলিয়া মনে হয়—

নমস্কার কবি। চিনতুম না তোমাকে, চেয়েছিলুম চিনতে, চেনা হয়ে গেছে, আর বেশি সইত না, দাঁড়ি পড়েছে ঠিক জায়গায়।

বাঙালীর মেয়ে, অত্যন্ত করে জানি ঘরের লোকদের। লোভ ছিল অজানা জগতের পরিচয়ে। বয়স ছিল কাঁচা, সদ্য বেরিয়েছি কলেজের মধ্যপথ থেকে। আমার বিশ্ববৃত্তান্তে সব চেয়ে অজানা রহস্য কবি।

তখনো চোখে দেখি নি, অনিলবাবু, তোমাকে। পড়েছি তোমার লেখা, ছবি এসেছে মনে, স্বপ্নের ঘোড়ায় চড়ে তুমি খুঁজতে বেরিয়েছ তোমার মানসীকে। রূপকথার রাজপুত্তুর তুমি— জগতে একটিমাত্র আছে রাজকন্যা, বিদেশী সমুদ্রের ওপারে, সে আছে তোমারই জন্যে।

তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধতে বাঁধতে এমন কথা যদি মনে করে থাকি যেন আমিই সেই রাজকন্যা তবে হেসো না। দেখা হবার আগেই ছুঁইয়েছিলে রুপোর কাঠি, জাগিয়েছিলে সুপ্ত প্রাণকে। ঐ বয়সে অনেক মেয়ে মনে করেছিল ঐ একই কথা। তারা চিঠি লিখেছিল, ঠিকানা দেয় নি।

খেয়াল, মাঝ বসন্তের খেয়াল। ওরই আড়ালে কতদিন আবছা হয়ে গেছে দুপুরবেলাকার পরীক্ষার পড়া, বুকের মধ্যে হঠাৎ উছলে উঠেছে একটা যৌবনের ঢেউ।

একেই বলে রোম্যান্স, নবীন বয়সে আপনা-ভোলানোর শিল্পকলা। মনের দেহলিতে এঁকেছি আলপনা, কার পা ফেলবার পথে। আরো কিছুদিন যেত, বয়েস পেরিয়ে যেত বিশের কোঠা, গোটাকতক মর্ডান নভেল পড়া হত শেষ, চোখের ঘোর যেতে কেটে, হাসতুম নিজের কচিমেয়েপনায়। তার দৃষ্টান্ত দেখেছি কত।

সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ের দল আছে আই· এ· ক্লাসের শেষ সীমানায়, চশমা চোখে পড়ছে কীট্‌সের কবিতা, না-দেখা নাইটেঙ্গেলের না-শোনা সুরে ব্যথিয়েছে তাদের বুকের পাঁজর, হৃদয়বাতায়নের ঝরোকা খুলে গেছে ফেনায়িত সমুদ্রের জনশূন্যতায় উজাড় কোন্ পরীস্থানে। অনিলবাবু, তোমার সঙ্গে শুভদৃষ্টির লগ্ন ছিল সেই আলো-আঁধারের ঝিকিমিকিতে ; তখন কত দিন দুলেছে কত ঘরের কোণে তোমার কলামূর্তি তরুণীর আর্তচিত্তের রহস্যদোলায়।

তার পরে দেখি, দেখতে দেখতে সেই মেয়েদের সময় বয়ে যায়। এসে পড়ে যুগান্তর, ছেঁড়া মোজা সেলাইয়ের, নতুন বাজারে সওদা করতে পাঠাবার ফর্দ লেখার, চায়ের সভার হাঁটুজল বন্ধুত্বের।

আমার ভাগ্যে রোম্যান্‌সের ঘনসজল আষাঢ়ে দিন তখনো ফুরোয় নি— সেই রসাভিষিক্ত বাদল-বেলায় আলাপ হল তোমার সঙ্গে। অচেনাকে চেনা হল শুরু রোমাঞ্চিত মনে।

চেনার প্রথম অধ্যায়েই ধরা পড়ল তুমি একেবারেই দুর্লভ নও। মায়ার টান তো দেখি আমাদেরই দিকে। লক্ষ্যসন্ধানের আগেই ধরা পড়বার মতো তোমার ভাব। এত সহজ মৃগয়ায় পরীক্ষাই হয় না ব্যাধের গুণপনার।

উলটে গেল পালা। পথ চেয়ে বসেছিলুম ধরা দেব বলে, ধরবার খেলা হল শুরু। দুঃখ এই তুমি দুর্লভ নও। হায় আমার রাজপুত্র, একটু স্পর্শ লাগতেই তোমার মুকুট পড়ল খসে ধুলোয় আমার পায়ের কাছে, সংকোচে চাইলুম পা সরিয়ে নিতে— তুমি বললে, থাক্ থাক্।

সেদিন আমার ফাঁদ পাতা ছিল বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে— কলকণ্ঠের কাকলিতে, মান-অভিমানের ছলনায়, অকারণ হাসির কল্লোলে। বসে রঙে এ ঘরের বেড়াজাল ছিল ঠাসবুনুনি করা। তুমি তোমার দিগ্বিজয়ী চালের মন্থর ভঙ্গীতে পা ফেললে ঠিক তার মাঝখানটাতে। বারে বারে চেয়ে দেখলুম কটাক্ষে, মনে মনে হাসলুম তোমার দুই চক্ষুর বিহ্বলতায়।

কোন্ ফাঁকে এসে পড়ল আর-এক মায়াবিনী— রণিতা। আমরা এক ব্যবসায়ের ব্যবসায়িনী। দেখলুম তাঁর ফাঁসটাতে অল্প-একটু টান দিতেই বন্দী তখনি এক দিক থেকে আর-এক দিকে পড়ল হেলে। ভোজের বাহুল্যে ওর ক্ষুধা হয়েছিল অলস, সেই শিথিল অবস্থায় পথ্য ছিল তড়িদবেগে এক চুমুকের সুধারস। সেটা বুঝে নিয়েছিল যাদুকরী।

বোধ হয় জান না মেয়েতে মেয়েতে বাজি রাখা পণ আছে ভিতরে ভিতরে। রণিতা এল আমার দরজায়। আমার মুখে সে চাইলে, আমি চাইলুম তার মুখে। পাশা ফেলল তার হাতের এক ঘুরুনিতেই, এক দানেই হল জিত। তুমি গেলে চলে, মনেও পড়ল না একটা সামান্য রকম অছিলায় করে যেতে।

হাসতে চেষ্টা করি সঙ্গিনীরা যখন শুধায় হল কী। রণিতাকেও একদিন জবাব দিতে হবে ঐ প্রশ্নেরই শুকনো হাসি দিয়ে। বেশি দেরি নেই।

পালা ফুরল, এবার প্যাক করতে হবে। অনাহূত সাহায্য করতে এল রমেশ— ঐটুকুই তার লাভ। লেগে গেল আস্তিন গুটিয়ে। কাঁচের শিশি মুড়তে লাগল খবরের কাগজে, কিছু বা জড়িয়ে দিল ছেঁড়া মোজায়। চামড়ার বাক্সোয় সাবধানে সাজিয়ে দিলে হাত-আয়না, রুপোর বাঁধানো চিরুনি, নখ-কাটা কাঁচি, চুলের তেল, ওটেনের মলম, পাউডারের কৌটো, সাবানের বাটি। অবসাদের ভারে অচল ছিল আমার মন, গা লাগছিল না কিছুতে হাত লাগাতে, কেবল বসে বসে ছিঁড়ছিলুম কুটিকুটি ক'রে পুরনো চিঠিগুলো। ব্যবহার-করা শাড়িগুলো নানা নিমন্ত্রণদিনের ফিকে গন্ধ মিলিয়ে দিল ঘরের হাওয়ায়। সেগুলো বিছিয়ে বিছিয়ে দুই হাতে চেপে চেপে পাট করে দিতে অসম্ভব সময় নিচ্ছিল রমেশ। আমার জরির-কাজ-করা স্লিপারের এক-একটা পাটি নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুছে দিচ্ছিল কোঁচার কাপড়ে, কোনো আবশ্যক ছিল না। চৌকির উপর দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে সে খসিয়ে নিল ছবিগুলো। মোটা কার্পেটটা গুটিয়ে-সুটিয়ে

দিলে সরিয়ে ঘরের এক ধারে। মেঝের উপর ছড়িয়ে রইল ছেঁড়া চিঠির টুকরো। এল কুলির দল, আসবাবগুলো তুলে দিল মালগাড়িতে।

শূন্য হয়ে গেল ঘর, কোথায় মিলিয়ে গেল তার স্বপ্নরূপ, তার রঙিন মায়া। যে-কেউ কোথাও নেই তার দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যাকাসে দেয়াল অবুঝের মতো।

আমাকে ট্যাক্সিতে তুলে দেবার জন্যে শেষ পর্যন্ত রইল রমেশ। বললে, চিঠি লিখো কেমন থাক।

আমার রোম্যানসটুকু স্বল্প মাপের পেয়ালায়। এখনো তলায় কিছু রস আছে বাকি, আর কিছু আছে ব্যথা। আর দেরি হলে হাসির লেশও থাকত না, চোখের জলও যেত শুকিয়ে।

ভাবছি মনে এসব কী বকচি। ভারতচন্দ্রে আছে 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর'।

এতক্ষণ বিস্তব কথা বলা হল শেষকালে দাঁড়াল সব তার মিছে। কী করে বললুম, তোমাকে চিনেছি। তোমাকে ভোলাতে বসলুম, আপনাকে ভোলালুম, এই কি চেনবার রাস্তা। যে বিস্ময়দৃষ্টি দিয়ে তুমি দেখেছ এই জগৎকে সেই দৃষ্টি দিয়ে যদি আমি চাইতুম তোমার দিকে তা হলেই দেখতুম তোমার সত্যকে। ঢাকা দিলুম তোমাকে মায়া দিয়ে, তোমার বিশ্বনিখিল থেকে সরিয়ে এনে কেটে ছেঁটে ছোটো করে তোমাকে ধরাতে চাইলুম আমার এই আড়াইশো-টাকা-ভাড়া ফ্ল্যাটটাতে। আজ আমার চেয়ে তোমাকে দেখাচ্ছে ছোটো, আর বলছি তোমাকে চিনেছি।

—রবীন্দ্রসদনস্থ পাণ্ডুলিপি

উপরের রচনাটির প্রথমার্ধ অনেক সংশোধন ও সম্মার্জন করিয়া রবীন্দ্রনাথ উহা পরে প্রতিমা দেবীকে আলমোড়ায় পাঠাইয়াছিলেন। কৌতূহলী পাঠক প্রতিমা দেবীর 'চিত্রলেখা' গ্রন্থের ভূমিক ও 'মন্দিরার উক্তি' লেখাটি এই প্রসঙ্গে দেখিতে পারেন। সেখানে 'অনিলবাবু'কে বদলাইয়া 'নরেশবাবু' করা হইয়াছে।

'নারী' (পৃ. ১৮৪) কবিতার সাময়িক পত্রে প্রকাশিত পাঠে কিছু কিছু পাঠান্তব পাওয়া যায়। প্রথম দিকে 'সেই আদি···· সংগোপনে' পাঠ সাময়িক পত্রে এইরূপ ছিল—

তাহাবি সংকল্পচ্ছবি বিধাতার মনে
আছে তাঁর তপস্যার সংগোপনে।
সেই আদি ধ্যানমূর্তিটিরে
সন্ধান করিছে ফিরে ফিবে
রূপকাব।

অন্যান্য পাঠান্তব— 'বঙ্কিম হিল্লোল' স্থলে 'মদিব হিল্লোল'। 'শাস্ত্রবচনের ঘেব' স্থলে 'বচনের ঘের'। 'সকলি ফেলিয়া দূরে' স্থলে 'সকলি করিয়া দূর'। পরের ছত্রে 'সুরে' স্থলে 'সুর'। 'ভুবনমোহিনী' স্থলে 'ভুবনমোহন'। 'মর্তের মদিরা-মাঝে' স্থলে 'মর্ত্যেব রূপের মাঝে'।

শেষ অংশের ('আদিস্বর্গলোক··· সহচরী') পাঠ এইরূপ ছিল—

যেন সর্ব পুরুষের নির্বাসিত মন
রূপ আর অরূপের ঘটায় মিলন।
মনে পড়ে যেন কবে ছিল অন্যলোকে
অপূর্ব আলোকে।
তারি ছবি আনে ধ্যানে ধরি
সেথায় যে ছিল তার চিরসহচরী।

'নামকরণ' (পৃ· ১৯৭) কবিতার একটি পূর্বতন পাঠ পাণ্ডুলিপি হইতে নিম্নে মুদ্রিত হইল—

নামকরণ

পাড়ার সবাই তারে ডাকে
আদরের নামে সুনয়নী,
বানান বদল ক'রে দিয়ে
আমি তারে ডাকি শুনায়নী।
বাদল-বেলায় গৃহকোণে
রেশমে পশমে জামা বোনে,
নীরবে আমার লেখা শোনে
তাই সে আমার শোনা-মনি ;
কাব্য বোঝে কি নাই বোঝে,
শোনে, তাই ডাকি শুনায়নী।
প্রচলিত ডাক নয় এ যে
দরদীর মুখে ওঠে বেজে,
পণ্ডিতে দেয় নাই মেজে,
অশুদ্ধ ভাষা এর খনি
ভদ্ররীতির অভিধানে
মেলে না কোনোই এর মানে,
বর্বর ঠেকে তার কানে
ভাষায় যে কড়া সনাতনী।
নূতন চোখে যে ওরে দেখি,
সাধুভাষা সে দেখাতে ঠেকি
আদবের টানে গেছে বেঁকি
নিয়েছে নূতনতরো ধ্বনি।
সেও জানে আর জানি আমি
এ মোর নেহাত পাগলামি,
এ ডাকে চকিত তার দেহে
কঙ্কণ উঠে কনকনি।
সে হাসে আমিও তাই হাসি,
জবাবে ঘটে না কোনো বাধা—
ব্যাকরণ-বর্জিত ব'লে
মানে আমাদেব কাছে সাদা।
কেহ নাহি জানে কোন খনে
কবিতার ছন্দের সাথে
পশমের শিল্প তোমার
মিলে যায় সুকুমার হাতে
শুনায়নী, ওগো সুনয়নী।

'বিমুখতা'র (পৃ· ১৯৮) অন্য দুইটি পাঠ পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়—

বিমুখ

হঠাৎ-প্লাবনী যে মন নদীর প্রায়
অভাবিত পথে সহসা বাঁকিয়া যায়।
সে তার সহজ গতি,
এ বিমুখতায় যার হোক যত ক্ষতি।
বাঁধা পথে তারে বাঁধিয়া রাখিবে যদি
বর্ষা নামিবে যবে, অবাধ্য নদী
বারে বারে ফিরে ভাঙিয়া ফেলিবে কূল,
সে ভাঙন সাথে ভাঙিবে তোমার ভুল ;
স্বেচ্ছাপ্রবাহবেগে
দুর্দাম তার ফেনিল হাস্য
উচ্ছ্বসি উঠে জেগে ;
প্রাণের প্রচুর পণ্য আহরি
ভাসাইয়া দিলে ভঙ্গুর তরী,
উচ্ছ্বাসে তারে পাষাণে আছড়ি
করিবে সে পরিহাস,
খেলার ছলেতে ঘটাবে সর্বনাশ।
এ খেলারে যদি খেলা বলে মান,
এ হাসিতে যদি হাসিবারে জান,
তবেই তোমার জয়
সহজের স্রোতে সহজ মনেই
ভাসিয়া চলিতে হয়।
মূল্য যাহার আছে একটুও
সাবধান হয়ে দূরে তারে থুয়ো,
এ স্রোতের সাথে বাঁধা পড়িয়ো না
পণ্যের ব্যবহারে।
ঘাটে ফিরে এসে তবে হাঁফ ছেড়ো
শান-বাঁধা তার ধারে।
যদি পার তবে কাটিয়ো সাঁতার,
সাধ করিয়ো না তলিয়ে যাবার,
নিজেরে ভাসায়ে রাখিতে না জান
বসে থেকো দূর পারে।

বিমুখতা

যে মন হঠাৎ-প্লাবনী নদীর প্রায়
অভাবিত পথে কখন বাঁকিয়া যায়
সে তার সহজ গতি,
এ বিমুখতায় হোক-না যতই ক্ষতি।
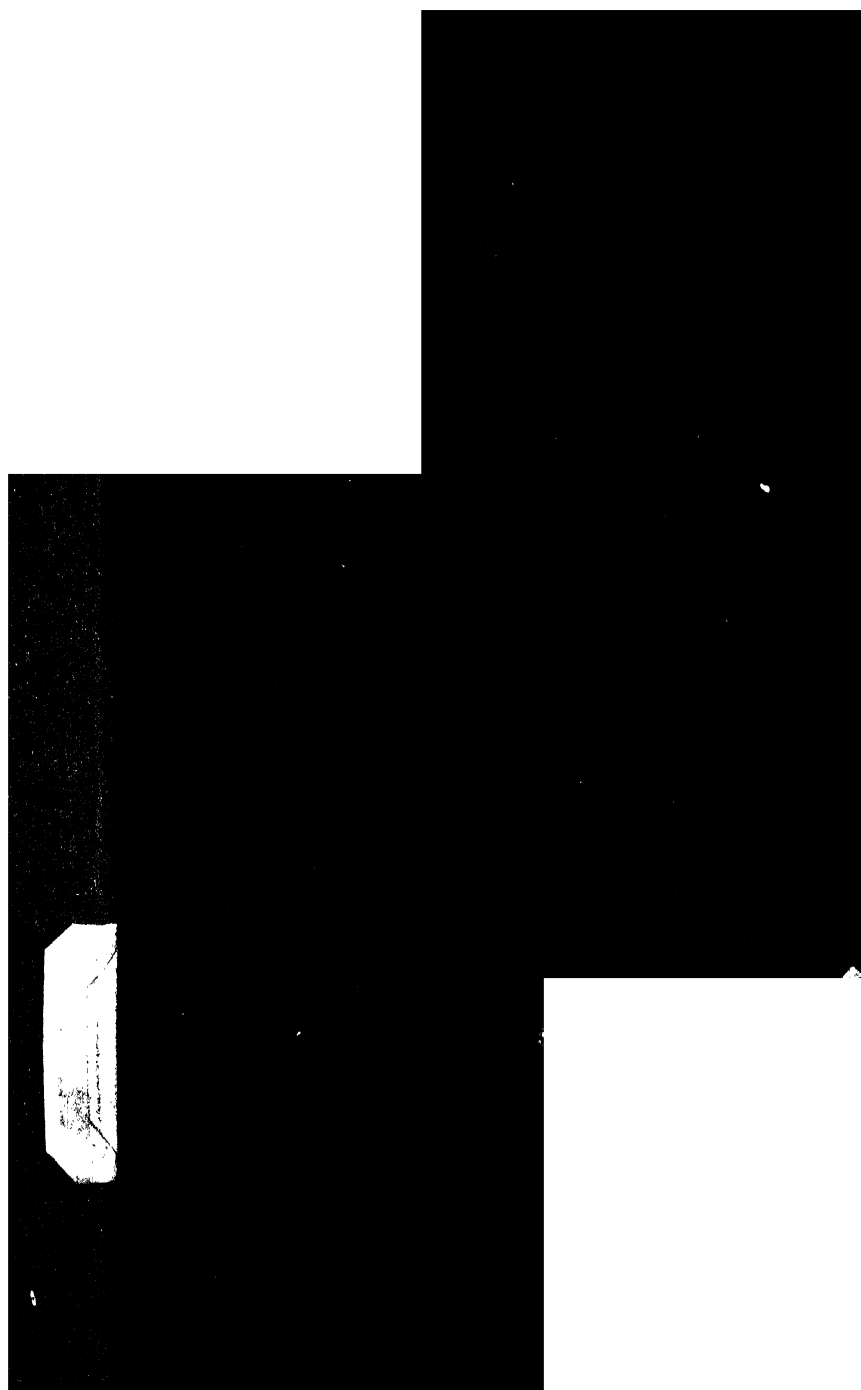
কবিতা	গীতিকপান্তরের প্রথম ছত্র	রচনাকাল
নতুন রঙ	ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি	
এবং	ধূসব জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি	
গানের খেয়া	আমি যে গান গাই জানি নে সে কার উদ্দেশে	
অধরা	অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে	
ব্যথিত	ওরে জাগায়ো না, ও যে বিরাম মাগে	
বিদায়	বসন্ত সে যায় তো হেসে, যাবার কালে	
যাবার আগে	এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে	
পূর্ণা	ওগো তুমি পঞ্চদশী	
কৃপণা	এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে	
ছায়াছবি	আমার প্রিয়ার ছায়া	২৫।৮।১৯৩৮
দেওয়া-নেওয়া	বাদলদিনের প্রথম কদমফুল পুনশ্চ :	৩০।৭।১৯৩৯
আহ্বান	এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও	১।৮।১৯৩৯
দ্বিধা	এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে	
আধোজাগা	স্বপ্নে আমার মনে হল	
উদবৃত্ত	যদি হায়, জীবনপূরণ নাই হল	
ভাঙন	তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে সুপ্তরাতে	
গানের জাল	দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে	
মরিয়া	আজি মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায়	
গান	যে ছিল আমার স্বপনচারিণী	৮।১২।১৯৩৮
বাণীহারা	বাণী মোর নাহি	
আত্মছলনা	দোষী করিব না, করিব না তোমারে	

চণ্ডালিকা

'চণ্ডালিকা' নাটিকাটি ১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ভাদ্রের শেষে কলিকাতায় ম্যাডান থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ উহা আগাগোড়া আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন। ইহার আখ্যান-অংশ রাজেন্দ্রলাল মিত্র -কর্তৃক সম্পাদিত *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (Published by the Asiatic Society of Bengal, 57, Park Street 1882) গ্রন্থের ২২৩-২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিবরণ হইতে গৃহীত। 'ভূমিকা'য় গল্পটির যে-অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন তাহা প্রথমার্ধমাত্র। গল্পের শেষার্ধ মূল গ্রন্থ হইতে কৌতূহলী পাঠকদের জন্য নিম্নে মুদ্রিত হইল—

Matters, however, did not progress so satisfactorily as could be wished. The girl, disappointed at night, rose early the next morning, put on her finest apparel, and stood on the road by which Ananda daily went to the city for alms. Ananda came, and she followed him to every house he went for alms. This caused a great scandal, and Ānanda, followed by the girl, ran back to the hermitage, and reported the occurence to the Lord. The Lord was then called upon to exercise diplomacy to save the character of his disciple. He said to Prakriti, "You want to marry Ānanda. Have you got the permission of your parents? Go, and get their permission." This afforded but slight respite, for Prakriti soon returned from the city with her parents' permission. The Lord then said, "Should you wish to marry

Ananda, you must put on the same kind of ochre-coloured vestment which he uses." She agreed, and thereupon her head was shaved, she was made to put on ochre-coloured cloth, divested of her vicious motives, and had all her former sins removed by the mantra called sarva durgati-sodhana-dharani, the destroyer of all evils. Thus did the Lord convert her into a Bhikshuni.

প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই বৌদ্ধ উপাখ্যান অবলম্বনেই পরলোকগত কবি সতীশচন্দ্র রায় 'চণ্ডালী' নামে সুদীর্ঘ একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (মাঘ ১৩১০, পৃ ৪৪৯-৫৪) কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

'চণ্ডালিকা' প্রকাশের প্রায় চার বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ উহাকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন; ১৩৪৪ সালের ফাল্গুনে 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য' প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী পঞ্চবিংশ খণ্ডে (সুলভ ত্রয়োদশ) 'চণ্ডালিকা'র উক্ত রূপান্তর মুদ্রিত হইয়াছে।

তাসের দেশ

'তাসের দেশ' বাংলা ১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসে, চণ্ডালিকার সহিত একই সময়ে, প্রথম বাহির হয়। উক্ত সংস্করণে মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নাটিকাটির সমসাময়িক অভিনয়-সংবাদটুকুও মুদ্রিত হইয়াছিল—

প্রথম অভিনয়
ম্যাডান থিয়েটার
২৭শে ২৮শে ও ৩০শে ভাদ্র
১৩৪০

১৩৪৫ সালের মাঘ মাসে 'তাসের দেশ'এর যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহা বহুল পরিমাণে 'সংশোধিত ও পরিবর্ধিত' সংস্করণ। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে নাটিকাটির অধুনাপ্রচলিত উক্ত পরিবর্ধিত পাঠই মুদ্রিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ 'তাসের দেশ' সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গীকৃত হয়।

প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকা' অংশ দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত আকারে 'প্রথম দৃশ্যে' পরিণত হইয়াছে। পত্রলেখা চরিত্র (বর্তমান গ্রন্থের পৃ ২৩৬) নূতন সংযোজিত হইয়াছে। রাজপুত্রের 'আমার মন বলে চাই চাই গো' (পৃ ২৩৮) গানটি প্রথম সংস্করণে 'তোমার মন বলে চাই চাই গো' ইত্যাদি পাঠান্তরে রাজপুত্রের মায়ের গানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে, সম্পূর্ণ তৃতীয় দৃশ্যটি এবং নিম্নে নির্দেশিত আটটি গান নূতন যোগ করা হয়—

১ খর বায়ু বয় বেগে
২ গোপন কথাটি রবে না গোপনে
৩ তোলন নামন (তাসের কাওয়াজ)
৪ বলো, সখী বলো তারি নাম
৫ অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে
৬ কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়
৭ গগনে গগনে ধায় হাঁকি
৮ বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও

রাজার মুখের ছড়া বা 'শাস্ত্রের ছন্দ'টিও ('শান্ত যেই জন' পৃ ২৫৫) নূতন। প্রথম সংস্করণে

ব্যবহৃত এই চারটি গান দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হইয়াছে—

১। হারে রে রে রে রে
২। হে মাধবী, দ্বিধা কেন
৩। হে নিরুপমা
৪। তুমি কোন্ পথে যে এলে, পথিক

১৭৪ পৃষ্ঠার শেষে মুদ্রিত রাজপুত্রের স্তবগানটি প্রথম সংস্করণে পূর্ণতর আকারে এইরূপ ছিল—

জয় জয় তাসবংশ-অবতংস।
ক্রীড়াসরসীনীরে রাজহংস।
তাম্রকূট-ঘন-ধূম-বিলাসী,
তন্দ্রাতীরনিবাসী—
সব-অবকাশ-ধ্বংস
যমরাজেরই অংশ ॥

'তাসের দেশ' রচনাটি, ১২৯৯ আষাঢ়ের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত ও 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'একটা আষাঢ়ে গল্প' অবলম্বনে রচিত। রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডের ১৭২-৮০ পৃষ্ঠা (সুলভ নবম খণ্ডের পৃ ৩১১-১৬) দ্রষ্টব্য।

বাঁশরি

'বাঁশরি' ১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে ১৩৪০ সালে ভারতবর্ষ পত্রিকার কার্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় উহা ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল।

গল্পগুচ্ছ

বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত প্রথম দশটি গল্পের মধ্যে 'সবুজ পত্র' মাসিক পত্রিকায় যথাক্রমে ১৩২১ সনের বৈশাখ-কার্তিক সাত মাসে এবং বাকি তিনটি ১৩২৪ সনের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এবং পৌষ মাসে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সাতটি গল্প প্রথমত গল্পসপ্তক (১৩২৩) গ্রন্থে সংকলন করা হয় এবং পয়লা নম্বর (১৩২৭) গ্রন্থে সংকলিত হয় 'তপস্বিনী' ও 'পয়লা নম্বর'। 'পাত্র ও পাত্রী'র প্রথম সংকলন বিশ্বভারতীসংস্করণ গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডে (১৩৩৩); উহাতে পূর্বোক্ত নয়টি গল্পও পুনর্মুদ্রিত হয়।

'স্ত্রীর পত্র' প্রকাশিত হইলে উহা বঙ্গসাহিত্যসমাজে বিশেষ আন্দোলনের কারণ হইয়াছিল; তৎকালীন নারায়ণ প্রভৃতি পত্রে তাহার নিদর্শন আছে।

'শেষের রাত্রি' গল্পটিকে 'গৃহপ্রবেশ' (১৩৩২) নামে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরূপ দান করিয়াছেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ড (সুলভ নবম) দ্রষ্টব্য।

'বোষ্টমী' গল্পের বোষ্টমীর উল্লেখ রবীন্দ্রসাহিত্যে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়; রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস সম্পূর্ণই কল্পনাপ্রসূত না বাস্তবে তাহার কিছু মূল আছে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু কোনো পাঠিকার প্রশ্নোত্তরে লিখিত এই পত্রখণ্ড এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—

বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। এই বোষ্টমী স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প বলত। শেষ অংশটায় কিছু বদল করেচি। বোষ্টমী গুরুকে যে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয়— সংসার ত্যাগ করেছিল বটে।

—পত্রধারা, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ ৪৫১

পরবর্তী পাঁচটি গল্প প্রবাসী সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রকাশসূচী দেওয়া গেল—

নামঞ্জুর গল্প	প্রবাসী । অগ্রহায়ণ ১৩৩২
সংস্কার	প্রবাসী । আষাঢ় ১৩৩৫
বলাই	প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৫
চিত্রকর	প্রবাসী কার্তিক ১৩৩৬
চোরাই ধন	ছোটগল্প ১১ কার্তিক ১৩৪০

বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত গল্পগুচ্ছ তৃতীয় খণ্ডের বিভিন্ন মুদ্রণে এই গল্পগুলি সংকলন করা হইয়াছে, বর্তমানে সব গল্পই তৃতীয় খণ্ড গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত।

'বলাই' ও 'চিত্রকর' গল্প দুইটি "শান্তিনিকেতনে বর্ষা-উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত" ও রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পঠিত হয়।

বর্তমান মুদ্রণে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে ৪১১ পৃষ্ঠার ২১ ছত্রে 'ছবি কোথায় লুকোবে তার জায়গা পায় না। বড়োবাবু' সংযোজিত হইয়াছে এবং মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধিত হইল : পৃ ৪০৯। ছত্র ১১ 'পিতৃব্য' স্থলে 'পৈত্রিব্য' এবং পৃ· ৪১০ ছত্র ২৩ 'আনতেন' স্থলে 'আনাতেন'।

সাহিত্যের পথে

'সাহিত্যের পথে' বাংলা ১৩৪৩ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৫২ সালের চৈত্র মাসে গ্রন্থটির যে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে সেই অনুসারে রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণে প্রবন্ধগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশের কালানুক্রমে মুদ্রিত হইল; সাময়িক পত্রে প্রবন্ধগুলির প্রকাশের সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বাস্তব	সবুজ পত্র । শ্রাবণ ১৩২১
কবির কৈফিয়ত	সবুজ পত্র জ্যৈষ্ঠ ১৩২২
সাহিত্য	বঙ্গবাণী বৈশাখ ১৩৩১
তথ্য ও সত্য	বঙ্গবাণী । ভাদ্র ১৩৩১
সৃষ্টি	বঙ্গবাণী । কার্তিক ১৩৩১
সাহিত্যধর্ম	বিচিত্রা । শ্রাবণ ১৩৩৪
সাহিত্যে নবত্ব[৫]	প্রবাসী । অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
সাহিত্যবিচার	প্রবাসী । কার্তিক ১৩৩৬
আধুনিক কাব্য	পরিচয় । বৈশাখ ১৩৩৯
সাহিত্যতত্ত্ব	প্রবাসী বৈশাখ ১৩৪১
সাহিত্যের তাৎপর্য	প্রবাসী । ভাদ্র ১৩৪১

'বাস্তব' ও 'কবির কৈফিয়ত' প্রবন্ধ দুইটির প্রথমসংস্করণে-মুদ্রিত চলতি ভাষার পাঠের পরিবর্তে 'সবুজ পত্র' মাসিকে প্রকাশিত সাধুভাষায়-লিখিত মূলপাঠ সংকলিত হইয়াছে। 'বাস্তব' প্রবন্ধের আরম্ভের নূতন অনুচ্ছেদটিও 'সবুজ পত্র' হইতে। উক্ত প্রবন্ধটির গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ

৫ 'প্রবাসী'তে প্রবন্ধের মূল নাম 'যাত্রীর ডায়ারি'

বলিয়াছেন যে, "আজকাল বাংলাদেশে কবিরা যে-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না" এমন কথা "একেবারে আমারই নাম ধরিয়া" কেহ কেহ প্রয়োগ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত (জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, পৃ· ১৯৫-২০৩) 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' এবং 'সবুজ পত্র' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত (মাঘ ১৩২১, পৃ· ৬৯৮-৭১০) 'সাহিত্যে বাস্তবতা' প্রবন্ধ দুইটি দ্রষ্টব্য।[৬] 'প্রবাসী'র প্রবন্ধটিতে লেখক সুস্পষ্ট অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, "রবীন্দ্র-সাহিত্য সার্বজনীন নহে"; "রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়াছেন। তিনি দৈন্যের মধ্যে 'বিশ্বাসের ছবি' আঁকিয়াছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে সংগীত, জনসাধারণকে, সমগ্র জাতিকে, স্পর্শ করিতে পারে নাই।"

'সাহিত্য', 'তথ্য ও সত্য' এবং 'সৃষ্টি'— এই তিনটি প্রবন্ধ ১৩৩০ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ ফাল্গুন তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতা। সেনেট হলে বক্তৃতা হইবার অব্যবহিত পরে প্রথম দুইটি বক্তৃতার অনুলিখন 'সাহিত্যের মূলতত্ত্ব' ও 'সাহিত্যের রসতত্ত্ব' নামে ১৩৩০ ফাল্গুনের 'পরিচারিকা' পত্রিকায় সর্বাগ্রে বাহির হয়। তৃতীয় বক্তৃতাটি 'সাহিত্য' নামে ১৩৩১ বৈশাখের 'পল্লীশ্রী'তে প্রকাশিত হয়। ১৩৩১ সালে 'প্রবাসী'র জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় 'কষ্টিপাথর' অংশ (পৃ· ২০১-০৩ ও ৩৪৮-৫২) এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। সম্ভবত উক্ত অনুলিখন যথাযথ হয় নাই বিবেচনা করিয়া 'বঙ্গবাণী'র জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বক্তৃতা তিনটি লিখিয়া দিয়াছিলেন। 'সাহিত্য' প্রবন্ধটির কয়েকটি বর্জিতাংশ 'বঙ্গবাণী' হইতে নিম্নে মুদ্রিত হইল।—

সূচনাংশ

আমি অনেকদিন থেকেই প্রতিশ্রুত আছি যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়মন্দিরে কিছু বলব। এতদিন সেই প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করতে পারি নি, তার কারণটা আমার প্রকৃতিগত।

আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে, বাল্যকাল হতেই আমি স্কুল পালিয়ে বেড়িয়েছি, পারৎপক্ষে বিদ্যামন্দিরের সীমানায় ধরা দিতে চাই নি। এখন আমার এই বয়সে যখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরা পড়বার সম্ভাবনা হল তখন দিনের পর দিন কেবলই আমার প্রতিশ্রুতির দিন পিছিয়ে দিচ্ছি— ওটা সুদ্ধ ভীরুতাবশত।

আজকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বলতে হলে শ্রোতা ও বক্তার সম্মান-রক্ষার্থে লিখে বলাই উচিত। নিজে নানা দিক থেকে চিন্তা ক'রে, আর এই বিষয়ে অন্য অন্য সবাই কে কী বলেছেন তা সংগ্রহ ও তুলনা ক'রে, আলোচনাটা বেশ ভালো রকম ক'রে করা উচিত। এই-সব নানা কথা ভেবেই তো আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছি।

ক্রমশই দেখছি, লেখার বয়স চলে যাচ্ছে। কতকাল থেকে ক্রমাগত লেখনী চালাচ্ছি, এখন লিখে লিখে একটা ক্লান্তি আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলেছে। তা ছাড়া আমি কর্মজালে বিজড়িত হয়ে পড়েছি।

এবার যখন সুদূর চীন-যাত্রা করবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি, তখন বহুমানভাজন আমাদের সভাপতি-মশায়[৭] আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন আমার প্রতিশ্রুতির কথা। তিনি জানালেন যে, আমার তিনটি বক্তৃতার মধ্যে অন্তত একটা যেন বলে যাই। আমি তখন বললেম, 'আমার যা বলবার তা যদি আপনারা মুখে বলতে দেন তবে হয়তো আমি চেষ্টা করতে পারি।' তিনি তাতেই

৬ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত
৭ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সম্মতি দিলেন। তাই আজ সাহস ক'রে আপনাদের কাছে দাঁড়িয়েছি, আপনাদের কাছে মুখে বলবার স্পর্ধা আমার স্বভাব-সংগত নয়।

মনে করেছিলেম, আমি তরুণ ছাত্রমণ্ডলীর সঙ্গে ব'সে ব'সে কিছু বলব। হয়তো দুই-তিনশো ছাত্র হবে— তাদের মোকাবিলায় সাহিত্যপ্রসঙ্গ নিয়ে সহজভাবে কিছু আলাপ ক'রে যাব। তাই সাহস ক'রে রাজি হয়েছিলেম।

যখন মুখে বলি তখন অনেক সময়ই চিন্তা ক'রে বলতে পারি নে— তার কারণ আমার স্মরণশক্তির দুর্বলতা। লোকে যাকে পয়েন্ট্ বা ব্যাখ্যানসূচি বলে সে-সব আমি মনে ধারণ করে রাখতে পারি নে। বলবার সময় সূচিগুলি হারিয়ে তার পরে সেই হারাধনের পিছনে পিছনে মনকে হঠাৎ দৌড় করতে পাঠালে, আসল কাজটার বড়ো ব্যাঘাত ঘটে। তাই দুর্দৈবক্রমে বক্তৃতাসভায় আমার ডাক পড়লে আমার রসনাকে আমার ভাগ্যের হাতে সমর্পণ ক'রে দিই। অর্থাৎ, সেই সময় যেমন চিন্তার ধারা আসে তারই অনুবর্তন করে যাই। এ ছাড়া অন্য উপায় আমার হাতে নেই।

আজ আমার বলবার বিষয়টি হচ্ছে সাহিত্য। আর-কিছু না হোক, অন্তত পঞ্চাশ বছর ধরে বাল্যকাল থেকেই হাতে-কলমে সাহিত্য নিয়েই আছি। এই সম্বন্ধে অন্য মনীষীদের আলোচিত উপদেশে যদিও কিছু শিক্ষা করতে পারি নি, তবু ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার আছে। নিরন্তর সাহিত্যপ্রবাহ ব'য়ে ব'য়ে আমার অন্তর-প্রকতির মধ্যে যে-পথ তৈরি হয়েছে সেই পথ দিয়ে আজকার দিনের আলোচনা হয়তো একটা ধারাবাহিক রূপ ধারণ করতেও পারে। আপনা হতেই সেটা হবে এই আশাতেই আজ এখানে এসেছি।

অল্প কিছুদিন হল একটি ছাত্র— ভারতেরই একটু পশ্চিমের কোনো কলেজের ছাত্র— হঠাৎ একদিন আমার প্রভাতভ্রমণের সময় আমার সঙ্গ ধরলেন। তিনি বললেন, একটি প্রশ্ন আছে। ব'লে ইংরেজিতে শুরু করলেন : Is art too good for human nature's daily food?

বুঝলেম এই প্রশ্নের মূলে বহুলোকের মধ্যে প্রচলিত একটি তর্ক আছে। সে তর্কটি এই যে, যে-সকল সাহিত্য বা শিল্পরচনার প্রয়াস আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার আনুকূল্য করে, মানুষকে ভালো করে বা সমৃদ্ধ করে বা সুদক্ষ করে, তার সামাজিক বা অন্য কোনোপ্রকার সমস্যাপূরণের সহায়তা করে, সেই আর্টই শ্রেষ্ঠ কি না। অর্থাৎ, কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনই আর্টের উৎকর্ষের আদর্শ কি না। সেই ছাত্রটির এই প্রশ্নই আমি আজকের সভায় মনের মধ্যে ক'রে নিয়ে এসেছি। এই প্রশ্নের সূত্রটিকেই অবলম্বন ক'রে, চিন্তা ও ব্যাখ্যা ক'রে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে।

এর উত্তর দিতে গেলে আর্ট সম্বন্ধে আমার সাধ্যমত গোড়া ঘেঁষে কথাটা বলতে হবে। নইলে কোনো ছোটো নিষ্পত্তিতে চলবে না। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কলাকারু সম্বন্ধে মানুষের এত বিচিত্র প্রয়াসের তাৎপর্যটা কোথায় আছে। যুগযুগান্তর থেকে মানব এই যে-সকল রূপরচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আছে, যে-রচনা চিরকাল ধ'রে সকলের বহুপুরস্কৃত, মানবের সেই চেষ্টার মূল উৎস কোথায়। তা যদি ঠিকমত নির্ণয় করতে পারি তা হলেই বুঝতে পারব, আর্টের সঙ্গে মানবজীবনের সম্বন্ধ কী এবং মানুষের প্রাণধারণের চেষ্টার পক্ষে তার উপযোগিতা কতটুকু।

এই মূল অনুসরণ করতে গেলে মধ্যপথে থামবার জো নেই, একেবারে তত্ত্বজ্ঞানের কোঠায় গিয়ে পৌঁছতে হয় এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় অসীমের রাজ্যে। সত্যের সন্ধানে অসীমের পথে অভিযান আমাদের ভারতীয় প্রকৃতিগত। হয়তো কোনো ইংরেজ শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে আর্ট সম্বন্ধে আলোচনাকে এত সুদূরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতে আমার সংকোচ হত। যদি-বা সাহস ক'রে এ কাজে প্রবৃত্ত হতেম তা হলে গোড়াতেই 'ওরিএন্ট্যাল মিস্টীসিজম' নামধারী এক স্বরচিত কুহেলিকার অন্তরাল থেকে হয়তো আমার কথাগুলিকে তাঁরা কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহলের সঙ্গে অস্পষ্ট ক'রে শুনতেন। কিন্তু, বর্তমান ক্ষেত্রে আমার ভরসার কারণ এই যে,

আমাদের পিতামহেরা আমাদের সমস্ত সম্বন্ধকেই একটি চিরন্তন সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে দেখতে চেষ্টা করেছেন।

এই অনুশীলনায় তাঁদের সাহসের অন্ত ছিল না। যে-কোনো অভিব্যক্তি কলায় সংগীতে সাহিত্যে উদঘাটিত হয়েছে তাকে অনন্ততত্ত্বের পটভূমিকার উপর রেখে দেখতে পারলেই সত্যকে পাওয়া যায়— এই কথাটি গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন নয়।

মানবীয় সত্যকে তিনভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। সেই তিন বিভাগের শাশ্বত ভিত্তি সন্ধান করতে গেলেই উপনিষদের বাণীকে আশ্রয় করা ছাড়া আমাদের পক্ষে আর কোনো উপায় নেই।

—বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ· ৩০৩-০৫

রচনাবলী পৃ· ৪৩৪, প্রথম অনুচ্ছেদের শেষাংশ

এই শেষোক্ত কথাটি আজ বিশেষভাবে আলোচ্য। যিনি বলেন, আর্টের পরিচয় মানবের সংসারযাত্রার সঙ্গে একান্তভাবে সংগত, অর্থাৎ 'আমি আছি' এই ভাবের সূত্রটিই তার প্রধান অবলম্বন— তাঁর এ কথাটি কি গ্রহণ করা চলে। প্রাত্যহিক প্রাণধারণ-ব্যাপারের সঙ্গে সংগত ক'রে দেখলেই কি তাকে সত্যরূপে দেখা হয়।

—বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ· ৩০৫

রচনাবলী পৃ· ৪৩৪, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের সূচনাংশ

প্রাত্যহিক প্রাণধারণের নানা ব্যাপারের সঙ্গে যে আর্ট মেলে না— এ কথা বলা চলে না। পূর্বেই বলেছি, সত্যের তিন ভাগের মধ্যে আদান-প্রদানের ঐক্যপথ আছে। অর্থাৎ, তাদের মিলের মধ্যে সত্য আছে। তেমনি আবার তাদের বিভাগের মধ্যেও সত্য আছে। আমাদের জ্ঞান এক দিকে আমাদের প্রাণধারণ-ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। টিকে থাকবার জন্যই আমাদের অনেক কিছু জানা চাই। কিন্তু, তাই ব'লে এ কথা বলতে পারি নে যে, যে-সকল জানা আমাদের টিকে থাকার পক্ষে একান্ত উপযোগী নয় সেই-সকল জানা নিকৃষ্ট। বস্তুত...

—বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ· ৩০৫-০৬

রচনাবলী পৃ· ৪৩৪, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পরে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ

ব্রহ্মকে যে অনন্তস্বরূপ বলা হয়েছে মানুষের মধ্যে তারও পরিচয় আছে। এই পরিচয়ের দ্বারা মানুষ আপনার প্রয়োজনের গণ্ডি উত্তীর্ণ হয়।

—বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ· ৩০৬

রচনাবলী পৃ· ৪৩৪, তৃতীয় অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় বাক্যের পর

এমন-কি, 'যেমন ক'রে হোক আমি নিজে টিকব', 'অন্যের যা হয় হোক'— এ ইচ্ছাটা থাকে না।

—বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ· ৩০৬

রচনাবলী পৃ· ৪৩৪, তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষাংশ

পৃথিবীতে যে-মানুষ বলেছে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম', সেই কৃপণ দীর্ঘজীবী হতে পারে, ধনী হতে পারে, কৃচ্ছ্রসাধনে আশ্চর্য শক্তি দেখাতে পারে— কিন্তু সে কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। ভূমা আমাদের ঐক্যবোধের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, যে-সত্যের সমৃদ্ধিকে প্রভূত ও সমুজ্জ্বল করে তোলে সেই সত্য-ক্ষেত্রেই আর্টের ফসল ফলে।

—বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ· ৩০৬

রচনাবলী পৃ· ৪৩৪, শেষ অনুচ্ছেদের শেষাংশ

আপনাদের মধ্যে কোনো কোনো পরিহাসরসিকের মুখে ঈষৎ হাসির চিহ্ন দেখছি— তবু উপনিষদের বাণী আমি এড়াতে পারলেম না। উপায় যে নেই। বহু শতাব্দীর এই-সব মহামন্ত্র, ভারতবর্ষের সমস্ত ভাব ও সাধনার বীজমন্ত্র, আজও যে এরা আমার প্রাণের আশ্রয়। সেই উপনিষদ ব্রহ্মের আর-একটি স্বরূপের উল্লেখ ক'রে বলেছেন— অনন্তম। এইখানেই আছে প্রকাশতত্ত্ব।

—বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ· ৩০৭

রচনাবলী পৃ· ৪৩৫, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষাংশ

এই জগতে আওরঙজেব একদা সুদীর্ঘকাল প্রবল প্রতাপে রাজত্ব ক'রে ভারতকে কম্পান্বিত ক'রে দিয়ে গেছে; কিন্তু তাকে কি কেউ গ্রহণ করেছে। তা হলে পুঁথির কালো অক্ষরের কীট-দংষ্ট্রার নিত্যদংশনের মধ্যে ছাড়া আর কোথায় সে আছে? কিন্তু তার যে ভাই দারাকে অকালে বধ ক'রে নিজের সিংহাসনের সোপানকে সে রক্তকলঙ্কিত করেছে তাকে যে আমরা আমার ব'লে আমাদের অশ্রুসিক্ত হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছি। সেই দারার জীবনটিই কি কাব্য নয়, সংগীত নয়। কেন তাকে কাব্যের সঙ্গে, সংগীতের সঙ্গে তুলনা করছি। কেননা, তার আসন যে নিখিলের করুণার মধ্যে।

—বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ· ৩০৮

রচনাবলী পৃ· ৪৩৮, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষে

যদি হয় তো হোক সেটা অবান্তর কথা। তাতে যদি লজ্জা পাবার কোনো কারণ থাকে তবে সে লজ্জা কবির নয়, রূপদক্ষের নয়, সে লজ্জা তাঁরই যিনি অনন্তং, আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি— সেই লজ্জা পরমসুন্দরের— সেই লজ্জায় বিশ্বের প্রকাশ!

—বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ· ৩১২

বর্তমান গ্রন্থে ৪৩৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি (অমৃতের দুটি অর্থ ইত্যাদি) 'বঙ্গবাণী'র। প্রথম সংস্করণে উক্ত অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোদ্‌ধৃত অনুচ্ছেদটি সংযোজিত হইয়াছিল—

এই ঝড়ের মূর্তি তো মিলিয়ে গেল। একদা আমার স্মৃতিও লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, সেদিন বিরাট আকাশপটে যে-প্রমত্ততার প্রলয়চিত্র রচিত হয়েছিল, সে বাহ্যত যত স্বল্পস্থায়ী হোক, সেই ক্ষণকালের মধ্যেই ছিল অমৃতের প্রকাশ। চটকলের পাশে যে নোংরা বসতি আছে সময়ের পরিমাপে সে বড়ো হলেও সে মরেই আছে।

—সাহিত্যের পথে, প্রথম সংস্করণ, পৃ· ৯

৪৩৭ পৃষ্ঠার ১ম অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ জাপানযাত্রার পথে যে 'দারুণ ঝড়ে'র উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সমসাময়িক বিবরণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর ঊনবিংশ খণ্ডে (সুলভ দশম) ৩২৯ পৃষ্ঠায় (জাপানযাত্রী। ৯ই জ্যৈষ্ঠ) পাওয়া যাইবে। চীনসমুদ্রে উক্ত ঝড়ের প্রেরণাতেই তিনি 'তোমার ভুবন-জোড়া আসনখানি' গানটি রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তোসামারু জাহাজ হইতে ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ তারিখে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের কিয়দংশ উদ্‌ধৃত হইল—

কাল রাত্রে ঘোরতর বৃষ্টিবাদল শুরু হল— ডেকে কোথাও শোবার জো রইল না। অল্প একটুখানি শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে অর্ধেক রাত্রি কেটে গেল। প্রথমে ধরলুম, 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝ'রে, পড়ুক ঝ'রে', তার পরে 'বীণা বাজাও', তার পরে 'পূর্ণ আনন্দ'— কিন্তু বৃষ্টি আমার সঙ্গে সমান টক্কর দিয়ে চলল, তখন একটা নতুন গান

বানিয়ে গাইতে শুরু করলুম, শেষকালে আকাশের কাছে হার মেনে রাত্রি দেড়টার সময় ক্যাবিনে এসে শুলুম। গানটা সকালেও মনে ছিল। সেটা নীচে লিখে দিচ্ছি। বেহাগ, তেওরা।

—প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪২, পৃ. ৮৫৪

'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে (আষাঢ় ১৩৩৪) পূর্বদ্বীপপুঞ্জ-ভ্রমণে বাহির হইবার অব্যবহিত পূর্বে রচনা করেন। ইহার কয়েক মাস আগে (ডিসেম্বর ১৯২৬) দিল্লিতে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে অমলচন্দ্র হোম তাঁর পঠিত অভিভাষণে 'অতি আধুনিক বাংলাকথাসাহিত্য' সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে সাহিত্যিক মহলে নানা দিক হইতে উহার সমালোচনা হয়। এই প্রসঙ্গে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' (বিচিত্রা, ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ. ৩৮৩-৯০) ও 'কৈফিয়ৎ' (বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ. ৮৯২-৯৫), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যের রীতিনীতি' (বঙ্গবাণী, আশ্বিন ১৩২৪, পৃ. ২৩৭-৪৬), এবং দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর 'সাহিত্যধর্মের সীমানা-বিচার' (বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৪, পৃ. ৫৮৭-৬০৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের অব্যবহিত পরের রচনা। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিবার পর উহা প্রকাশিত হইলেও (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪), প্রবন্ধটি বিদেশে জাভা হইতে বালি যাইবার পথে প্লানসিউজ জাহাজে 'যাত্রীর ডায়ারি' আকারে ১৩৩৪ সনের ভাদ্র মাসেই লিখিত। এটি এক হিসাবে 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের পরিপূরক। 'প্রবাসী' হইতে কয়েকটি বর্জিত অনুচ্ছেদ উদ্‌ধৃত হইল—

রচনাবলী পৃ. ৪৫৫, প্রবন্ধের সূচনাংশ

শাস্ত্রে আছে, এক বললেন বহু হব— সৃষ্টির মূলবাণী এই।

কিন্তু, এই বলার মধ্যেই আছেন দুই— যিনি বললেন আর যিনি শুনলেন, সৃষ্টিকর্তার নিজের অন্তরেই এই বলিয়ে আর এই শুনিয়ে, দু পারে দুজন— মাঝখানে সৃষ্টিরচন।

মর্তলোকের লেখার মধ্যেও সেই একই কথা। সামনা-সামনি আছে দুজনে— একজন বলে, একজন শোনে। যে শোনে তারই দাবির ছাঁচে বলার আকৃতি প্রকৃতি অনেকখানিই ঢালাই হয়, তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা শক্ত। যদি পুঁইশাকের খেতের মালিক তার ঝুড়ি নিয়ে ঘাটে এসে দাঁড়ায় তা হলে ব্যাবসাদার কখনো জাহাজের কাপ্তেনকে খবর দেবার কথা মনেই আনতে পারে না; তার দাবি আপনিই হাটে যাবার ডিঙি বা ডোঙার তলব করে।

—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ. ২১৫

রচনাবলী পৃ. ৪৫৬, ৩৯ ছত্রে 'যথার্থ যে বীর' ইত্যাদির পূর্বে

তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল সাধারণের কাছে ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করেছেন। এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলছি এইজন্যে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোকা পাঁয়তাড়া-মারা পালোয়ানি নেই।

—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ. ২১৭

রচনাবলী পৃ. ৪৫৭, ২০ ছত্রের পর স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ

শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র-জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেইসঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে ব'লেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্যঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম ক'রে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকে নি। 'নবযুগের সাহিত্যে নতুন একটা কাণ্ড করছি' জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার

দাপট আমি তাঁর দেখি নি— দরিদ্রনারায়ণের পূজারির মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যে-সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডারি ভঙ্গিটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয় নি।

—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ· ২১৭

পূর্বদ্বীপপুঞ্জ হইতে দেশে ফিরিয়া ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ তারিখে দিলীপকুমার রায়কে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্র লেখেন ; প্রাসঙ্গিকবোধে উহার শেষাংশ নিম্নে সংকলিত হইল—

'সাহিত্যধর্ম' ব'লে একটা প্রবন্ধ লিখেছি। তার কর্মফল চলছে। তার ভোগ ফুরোতে না ফুরোতেই 'সাহিত্যে নবত্ব' ব'লে আরো একটা লেখা হয়েছে। তোমার সঙ্গে বাক্যালোচনাতেও সাহিত্যতত্ত্বচর্চা কিছু পরিমাণে আছে— এতে ক'রে যে একটা আলোড়ন জাগিয়েছে তাতে ক্ষতি নেই। কেননা, পূর্বেই বলেছি, সাহিত্যলোকে চাঞ্চল্যটার খুব প্রয়োজন আছে। সিদ্ধান্তে পৌঁছনোটা খুব বেশি দরকারি নয়— দেখতেই পাচ্ছি, এক যুগের সিদ্ধান্ত আর-এক যুগে উলট-পালট হয়ে যায়, কেবল মনের মধ্যে নিয়তচিন্তার চাঞ্চল্যটাই থাকে। মানুষের মন শেষ কথায় যখন এসে পৌঁছয় তখন নীরবতার সমুদ্র। সেখানে তার কথার কারবার বন্ধ করতে মানুষের আপত্তি আছে ; কেননা, মনটা নাড়া না পেলে একেবারে সে বেকার। এইজন্যে বারে বারে সত্য সিদ্ধান্তকেও মানুষ তার সংশয়ের খোঁচা মেরে বিপর্যস্ত ক'রে তোলে— যুগে যুগে তাই চলছে। আমরা সত্যকে পেতে চাই শুধু কেবল পাওয়ার জন্যে নয়, চাওয়ার জন্যেও। এই কারণে আমাদের ভালোবাসার মধ্যে ঝগড়ার স্থানটা খুব বড়ো, হারানোটা পাওয়ার প্রধান বন্ধু— কেননা, ফিরে ফিরে না পেতে থাকলে সম্পূর্ণ পাওয়া হয় না। অতএব, সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে সাবেক কালের সঙ্গে হাল আমলের যে ঝগড়া চলছে তার মূলে মানুষের এই স্বভাবটাই কাজ করছে, যাকে আশ্রয় করে তাকে সে আঘাত ক'রে সন্দেহ করে— তার পরে আবার দ্বিগুণ জোরের সঙ্গে তার কাছে ফিরে আসে।

—অনামী, পত্রগুচ্ছ, পৃ· ৩৪৩

'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধটি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্রপরিষৎ-সভায় প্রদত্ত মৌখিক ভাষণের কবির স্বকৃত স্মৃতিলেখন। প্রবন্ধটির বর্জিত আরম্ভভাগ 'প্রবাসী' হইতে সংকলিত হইল—

রবীন্দ্রপরিষৎ সভায় 'সাহিত্যবিচার' সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি, সেইটি লিখে দেবার জন্যে আমার 'পরে অনুরোধ আছে। মুখে-বলা কথা লিখে বলায় নূতন আকার ধারণ করে। তা ছাড়া আমার মতো অসাধারণ বিস্মৃতি-শক্তিশালী লোক এক দিনের কথিত বাণীকে অন্য দিনে যথাযথরূপে অনুলেখনে অক্ষম। অতএব সেদিনকার বাক্যের ইতিহাস অনুধাবনের বৃথা চেষ্টা না ক'রে বক্তব্য বিষয়টার প্রতিই লক্ষ করব।

প্রথমে বলে রাখি, যাকে সাধারণত আমরা সাহিত্য-সমালোচনা বলি সাহিত্যবিচার শব্দটাকে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করেছি। আলোচনা অর্থে বুঝি পরিক্রমা, বিষয়টির উপর পায়চারি করে বেড়ানো, আর বিচারটি হল পরিচয়— তাকে যাচাই করা। বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যবিচারের লক্ষ্য। কিন্তু, পরিচয় তো অনেকরকম আছে। আমরা প্রায়ই ভুল করি, এক পরিচয়ের জায়গায় আর-এক পরিচয় দাখিল করি। যেখানে এক গ্লাস জল আনা আবশ্যক সেখানে তাড়াতাড়ি এনে দিই আধখানা বেল। জলের চেয়ে বেলে ভার আছে, সার আছে, সেই কারণে বাজারে তার দামও বেশি, কিন্তু যে তৃষার্ত মানুষ জল চায় সে মাথায় হাত দিয়ে পড়ে।

সাহিত্যবিচারে পরিচয়টি সাহিত্যিক পরিচয় হওয়া চাই, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, ভাগ্যদোষে আমাদের দেশে বাহুল্য নয়। কল্পনা করা যাক, আমাদের সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ

দাসগুপ্ত মহাশয় সাহিত্যের বিষয়। পরিচয় দেবার উপলক্ষে বিচারক হয়তো গর্ব ক'রে বলে উঠবেন, জাতিতে উনি বৈদ্য। জিজ্ঞাসু বলবেন, 'এহ বাহ্য'। তখন বিচারক আবার গর্ব করে বলতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি অধ্যাপনা করেন, তার পদগৌরব এবং অর্থগৌরব প্রচুর। জিজ্ঞাসু আবার বলবেন, 'এহ বাহ্য'। তখন বিচারক সুর আরো চড়িয়ে বলবেন, উনি তত্ত্বশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। হায় রে, এও সেই আধখানা বেল। ঐতিহাসিক সাহিত্যে এ-সব তথ্য সযত্নে সংগ্রহ করা চাই, কিন্তু রসসাহিত্যে এগুলিকে সযত্নেই বর্জন করতে হবে। উৎসাহী হোমিওপ্যাথ বাল্মীকিকে প্রশ্ন করে যে, বনবাসকালে নিঃসন্দেহ মাঝে মাঝে রামচন্দ্রের ম্যালেরিয়া হয়েছে তখন তিনি নিজের কিরকম চিকিৎসা করতেন। বাল্মীকি তাঁর জটাশ্মশ্রু নিয়ে চুপ ক'রে থাকেন, কোনো উত্তর দেন না। ঐতিহাসিক রামচরিতে রামচন্দ্রের সমর্থিত চিকিৎসাপদ্ধতি মূল্যবান তথ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহিত্যিক রামচরিতে ওকে স্থান দেওয়া অসম্ভব। এমনতরো বহুসহস্র অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই রামায়ণ সম্ভবপর হয়েছে, তথাপি সেটা সপ্ত কাণ্ডর কম হল না।

আমি যে-কথাটি বলতে গিয়েছি সে হচ্ছে এই যে, সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত নয়।

—প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৬, পৃ· ১৩১

এই গ্রন্থের ৪৫৯ পৃষ্ঠার ৩৫ ছত্রের পরে একটি অতিরিক্ত বাক্য 'প্রবাসী'তে পাওয়া যায় ; তৃষ্ণার্তের জন্য আধখানা বেলের প্রভূত আয়োজন।

—প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৬, পৃ· ১৩২

এই গ্রন্থের ৪৬০ পৃষ্ঠার প্রথম যে অনুচ্ছেদ শেষ হইয়াছে তাহার অনুবৃত্তিস্বরূপ 'প্রবাসী'তে পাওয়া যায়—

কথা যখন উঠল, নিজের অভিজ্ঞতার কথাটা বললে আশা করি কেউ দোষ নেবেন না। কিছুদিন পূর্বে একটি প্রবন্ধে পাওয়া গেল, আমার কবিতায় সত্ত্ব রজঃ এবং তম এই তিন গুণের মধ্যে রজোগুণটাই সাহিত্যিক ল্যাবরেটরিতে অধিক পরিমাণে ধরা পড়েছে। এরকম তাত্ত্বিক কাকুক্তি প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু অস্পষ্ট বলেই সেটা শুনতে হয় খুব মস্ত। এ-সব কথা ভারী ওজনের কথা। আমাদের শাস্ত্রমানা দেশে এতে ক'রে লোকেও স্তম্ভিত হয়। আমার আপত্তি এই যে, সাহিত্যবিচারে এ-সব শব্দের কোনো স্থান নেই। তবু যদি গুণের কথা উঠলই, তা হলে এ কথা মানতেই হবে আমি ত্রিগুণাতীত নই, দ্বিগুণাতীতও নই, সম্ভবত সাধারণ মানুষের মতো আমার মধ্যে তিন গুণেরই স্থান আছে। নিশ্চয়ই আমার লেখার কোথাও দেখা দেয় তম, কোথাও বা রজ, কোথাও বা সত্ত্ব। পরিমাণে রজটাই সব চেয়ে বেশি এ কথা প্রমাণ করতে যাঁরা কোমর বাঁধেন তাঁরা এ লেখা ও লেখা, এ লাইন ও লাইন থেকে তার প্রমাণ ছেঁটে কেটে আনতে পারেন। আবার যিনি আমার কাব্যকে সাত্ত্বিক ব'লে প্রমাণ করতে চান তিনিও বেছে বেছে সাত্ত্বিক লাইনের সাক্ষী সারবন্দী ক'রে দাঁড় করাতে যদি চান মিথ্যা সাক্ষ্য সাজাবার দরকার হবে না। কিন্তু, সাহিত্যের তরফে এ তর্কে লাভ কী। উপাদান নিয়ে সাহিত্য নয়, রসময় ভাষারূপ নিয়েই সাহিত্য। ম্যাকবেথ নাটকে তমোগুণ বেশি কিংবা রজোগুণ বেশি, কিংবা সাংখ্যদর্শনের সব গুণেরই তাতে আবির্ভাব কিংবা অভাব এ কথা উত্থাপন করা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তাত্ত্বিক যে-কোনো গুণই তাতে থাক বা না থাক সবসুদ্ধ মিলে ঐ রচনা একটি পরিপূর্ণ নাটক হয়ে উঠেছে। প্রতিভার কোন মন্ত্রবলে তা হল তা কেউ বলতে পারে না। সৃষ্টি আপনাকে আপনিই প্রমাণ করে, উপাদানবিশ্লেষণ দ্বারা নয়, নিজের সমগ্র সম্পূর্ণ রূপটি প্রকাশ ক'রে। রজোগুণের চেয়ে সত্ত্বগুণ ভালো, এ নিয়ে মুক্তিতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় তর্ক চলতে পারে ; কিন্তু সাহিত্যে সাহিত্যিক ভালো ছাড়া অন্য কোনো ভালো নেই।

কাঁটাগাছে গোলাপ ফোটে, এটাতে বোধ করি রজোগুণের প্রমাণ হয়। গোলাপগাছের

প্রকৃতিটা অস্ত্রধারী, জগতে শত্রু আছে এ কথা সে ভুলতে পারে না। এই সন্দেহচঞ্চল ভাবটা সাত্ত্বিক শান্তির বিরোধী, তবুও গোলাপকে ফুল হিসাবে নিন্দা করা যায় না ; নিষ্কণ্টক অতিশুভ্র ব্যাঙের ছাতার চেয়ে সে যে রমণীয়তায় হেয় এ কথা তত্ত্বজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ বলবে না। ভুঁইচাঁপা ওঠে মাটি ফুঁড়ে, থাকে মাটির কাছে, কিন্তু ফুলের সমজদার এই রজো বা তমোগুণের লক্ষণটা স্মরণ করিয়ে তাকে সাংখ্যতত্ত্বের শ্রেণীভুক্ত করবার চেষ্টা করে না।

আমার কাব্য সম্বন্ধে উপরিলিখিত বিশেষ তর্কটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু, আমাদের সাহিত্য-সমালোচনায় যে-দোষটা সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় এটা তারই একটা নিদর্শন। আমরা সহজেই ভুলি ইত্যাদি

—প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৬, পৃ. ১৩৩

'সাহিত্যতত্ত্ব' ও 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধ দুইটি রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রবন্ধটি ১৩৪০ সালের শেষে (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪) এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ১৩৪১ সালের আরম্ভে (১৬ জুলাই ১৯৩৪) পঠিত হয়।

'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধটির 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত পাঠের কয়েকটি অংশ গ্রন্থপ্রকাশকালে প্রথম সংস্করণে বর্জিত হইয়াছিল। বর্তমানে স্বতন্ত্র সংস্করণে এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীতে প্রবন্ধটির পূর্ণতর পাঠ মুদ্রিত।

পরিশিষ্ট

'সাহিত্যের পথে'র প্রথম সংস্করণে 'পরলোকগত লোকেন পালিতকে লিখিত' রবীন্দ্রনাথের চারখানি পত্রের কিয়দংশমাত্র 'পরিশিষ্ট' আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৯৮-৯৯ সালে প্রথম বর্ষের 'সাধনা' পত্রিকায় লোকেন্দ্রনাথ পালিতের পত্রোত্তর সহ উক্ত 'সাহিত্য' সম্বন্ধে চিঠিপত্র'গুলি মাসে মাসে প্রকাশিত হয় (সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮ হইতে ভাদ্র ও আশ্বিন ১২৯৯ দ্রষ্টব্য)। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টম (সুলভ চতুর্থ) খণ্ডে (পৃ. ৪৬৩-৮৮) 'সাহিত্য' গ্রন্থের পরিশিষ্টে পত্রগুলির 'সাধনা'য় প্রকাশিত সম্পূর্ণতর পাঠ 'পত্রালাপ' নামে ইতিপূর্বেই সংকলিত হইয়াছে বলিয়া বর্তমান সংস্করণে সেগুলি বর্জিত হইল।

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির সমসাময়িক কয়েকটি সাহিত্য-বিষয়ক রচনা, অভিভাষণ ও আলোচনার বিবরণ, বিভিন্ন পত্রিকা হইতে সংকলন করিয়া রচনাবলী-সংস্করণে নূতন পরিশিষ্ট যোগ করা হইল। সাময়িক পত্রে উহাদের প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে মুদ্রিত হইল—

সভাপতির অভিভাষণ	শান্তিনিকেতন। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০
সভাপতির শেষ বক্তব্য	শান্তিনিকেতন। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০
সাহিত্যসম্মিলন	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৩
কবির অভিভাষণ	প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩৩৪
সাহিত্যরূপ	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৫
সাহিত্য-সমালোচনা	প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫
পঞ্চাশোর্ধ্বম	বিচিত্রা। ফাল্গুন ১৩৩৬
বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ	বিচিত্রা। মাঘ ১৩৪১

'সভাপতির অভিভাষণ' ও 'সভাপতির শেষ বক্তব্য'— কাশীতে উত্তরভারতীয় বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের কথিত বক্তৃতার প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক 'আংশিক অনুলিখন'। বক্তৃতা দুইটি ইংরেজি ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে যথাক্রমে ৩ ও ৪ তারিখে প্রদত্ত হয়।

১৩৩২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের সিউড়ি-অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হইবেন, এইরূপ কথা হইয়াছিল। 'সাহিত্যসম্মিলন' সেই উপলক্ষে রচিত হয়।

'কবির অভিভাষণ' প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদের সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের অভ্যর্থনার উত্তরে বলা হইয়াছিল। আলোচ্য রচনাটি উক্ত মৌখিক অভিভাষণের কবির স্বকৃত অনুলেখন। ১ নং 'রবীন্দ্র-পরিষদ-নিষ্ক্রান্তি'-রূপে 'রবীন্দ্রপরিষদে কবির অভিভাষণ' নামে উহা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

'সাহিত্যরূপ' ও 'সাহিত্য-সমালোচনা' বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভার দুইটি বিশেষ অধিবেশনের রবীন্দ্রনাথ লিখিত বিবরণ। 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে সাহিত্যিকদের মধ্যে যে-আলোড়ন জাগিয়েছিল (দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পূর্বসংকলিত পত্র দ্রষ্টব্য) তাহাব পরিণামে বাংলার প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের একত্রে আলোচনার উদ্দেশ্যে এই সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। ১৩৩৪ সালের চৈত্র মাসে যথাক্রমে ৪ ও ৭ তারিখে বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর উপরোক্ত দুইটি অধিবেশন জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রাভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচনায় সূত্রধারের কর্তব্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্পাদন করেন।

'পঞ্চাশোর্ধ্বম্' বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনেব কলিকাতায় ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত ঊনবিংশ অধিবেশনের জন্য (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০) লিখিত অভিভাষণ। সে সময়ে বাংলার বাহিরে ব্যস্ত থাকায় রবীন্দ্রনাথ উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে বা অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই। রচনাটি অনতিবিলম্বে 'বিচিত্রা'য় বাহির হয়।

'বাংলাসাহিত্যেব ক্রমবিকাশ' কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনের (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫) উদবোধন অভিভাষণ।

কালান্তর

'কালান্তর' ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টাদশ খণ্ডে (সুলভ নবম) ইতিপূর্বে মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া কালান্তরের বর্তমান সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হইল না।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশেব সূচী দেওয়া গেল:

কালান্তর	পবিচয়। শ্রাবণ ১৩৪০
বিবেচনা ও অবিবেচনা	সবুজ পত্র। বৈশাখ ১৩২১
লোকহিত	সবুজ পত্র। ভাদ্র ১৩২১
লড়াইয়ের মূল	সবুজ পত্র। পৌষ ১৩২১
ছোটো ও বড়ো	প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩২৪
বাতায়নিকের পত্র	প্রবাসী। আষাঢ় ১৩২৬
শক্তিপূজা	প্রবাসী। কার্তিক ১৩২৬
সত্যের আহ্বান	প্রবাসী। কার্তিক ১৩২৮
সমস্যা	প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৩০
সমাধান	প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৩০
শূদ্রধর্ম	প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৩২
বৃহত্তর ভারত	প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৪
হিন্দুমুসলমান	শান্তিনিকেতন পত্র। শ্রাবণ ১৩২৯
নারী	প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৪৩

'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে, বর্তমান খণ্ডের ৫৬২ পৃ· ৭ ছত্রে 'ছোটো ইংরেজের জোর কত' ইত্যাদি বাক্যের পূর্বে, এই অতিরিক্ত রচনাংশ প্রবাসীতে ছিল—

দৃষ্টান্তগুলো একবার আবৃত্তি করিয়া দেখা যাক। ধরিয়া লও আনি বেসান্ট অপরাধী। কিন্তু আনি বেসান্টকে বড়ো ইংরেজ ক্ষমা করিয়াছেন। ছোটো-ইংরেজ তাই লইয়া আজও গর্জাইতেছে। অপ্রিয় হইলেও accomplished factকে শেলের মতো বুকে বিঁধাইয়া গোপালের মতো চুপ করিয়া থাকিতে মর্লি আমাদিগকে পার্টিশেনের সময় উপদেশ দিয়াছিলেন। ছোটো-ইংরেজকে ইস্কুলমাস্টারের গম্ভীর গলায় সে উপদেশ দিতে কেহ সাহসই করে না। তাই তাঁরা এই ক্ষমার কথা লইয়া পার্লামেন্টে পর্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প বাধাইতেছেন। ইঁহারা ক্ষমা করার অপরাধ কোনোমতেই ভুলিতে পারেন না, কিন্তু নির্বিচারে শাস্তি দিবার জন্য ইঁহারা কারও কৈফিয়ত তলব করেন না। তাঁরা বলেন শাস্তি যখন দেওয়া হইয়াছে তখন ধরিয়া লইতে হইবে অপরাধ আছেই। যে তাহাতে আপত্তি করে সে extremist। আবার দেখো, পাঞ্জাবের ছোটোলাট বড়োলাট-সভার রাজতক্তের পাশে দাঁড়াইয়া ভারতের প্রজাদের সম্বন্ধে মুখ সামলাইয়া কথা কহেন নাই, সেজন্য কর্তপক্ষ খুব মৃদুস্বরে তাঁকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহারই খেদ ছোটো-ইংরেজ কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। অথচ মন্টেগ্যু সাহেব তাঁর বর্তমান পদপ্রাপ্তির পূর্বে ভারত-আমলাতন্ত্র সম্বন্ধে দুই-চারটে স্পষ্ট কথা বলিয়াছিলেন, তাই লইয়া কেবল যে গালিগালাজের সাইক্লোন বহিতেছে তা নয়, মন্টেগ্যু সাহেবের শক্তি ও স্বাধীনতার চূড়া ভাঙিয়া গিয়াছে।

—প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩২৪, পৃ· ১২৭-২৮

উক্ত প্রবন্ধে, বর্তমান খণ্ডের ৫৬৮ পৃ ১২ ছত্রে 'আমাদিগকে নিজের শক্তিতেই' ইত্যাদি বাক্যের পূর্বে, প্রবাসীতে পাওয়া যায়—

তাহাই সকলের চেয়ে কঠোর বিচ্ছেদ। যে সাম্রাজ্যগঠনে আমরা ইটকাঠের মতো কেবল উপকরণ মাত্র সে সাম্রাজ্য আমাদের নহে। যে সাম্রাজ্যগঠনে আমাদিগকেও কারিগর নিযুক্ত করা হইবে তাহাই আমাদের। সেই সাম্রাজ্যে আমরা প্রাণ পাইব এবং সেই সাম্রাজ্যের জন্য আমরা প্রাণ দিব।

—প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩২৪, পৃ ১৩৪

'সত্যের আহ্বান' (ও 'শিক্ষার মিলন') প্রবন্ধ দুইটি কলিকাতার জনসভায় পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছিল সে সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত দেশবাসীকে জ্ঞাপন করেন। 'সমস্যা' প্রবন্ধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিয়াছেন—

'সমস্যা' বক্তৃতাটাকে বহুল পরিমাণে মেজে ঘষে জনসভায় একদিন পড়েছিলুম। অধিকাংশ লোক বলছে কিছু বোঝা গেল না— সেটা একেবারে বাজে কথা— আসলে, ওদের বুঝতে ভালো লাগছে না। কেউ কেউ বলে আম্যর কথাগুলো কবির মতো, শুনতে ভালো, কাজে ভালো নয়। আর কিছুদিন পরে এই কথাগুলো তারা আওড়াবে— অম্লানবদনে বলবে ওগুলো তাদেরই চিরদিনের নিজের ভাবা কথা।

২৪ আশ্বিন ১৩৩০ —শারদীয়া সংখ্যা, দৈনিক বসুমতী ১৩৫৪

'সমাধান' প্রবন্ধটির উপসংহার প্রবাসীতে অন্যরূপ ছিল। বর্তমান খণ্ডে ৬১১ পৃ· ২৫ ছত্রের অনুক্রমে ছিল—

এইখানে গীতার উপদেশ আমাদের মনে করিয়ে দিতে হয় যে, কাজেরই অধিকার আমাদের, ফলের অধিকার নয়। আশুফলের প্রতি অতিশয় লোভ করেই আমরা জাদুকরের শরণাপন্ন হই; ফলের বদলে ফলের মরীচিকা দেখে নৃত্য করতে থাকি। তাতে সময়ও নষ্ট নয়, বুদ্ধিও নষ্ট হয়,

ফলও নষ্ট হয়। তাতে বর্তমানকে ভোলাতে গিয়ে ভবিষ্যৎকে মাটি করি।

—প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৩০, পৃ. ১৬০

গ্রন্থে-মুদ্রিত 'সমাধান' প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদের (পৃ. ৬১১) পরে প্রবাসীতে ছিল—

সৌভাগ্যক্রমে অনেক কাল পরে একটা সদ্দৃষ্টান্ত আমাদের হাতের কাছে এসেছে। সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করলে আমার কথাটা পরিষ্কার হবে।— বাংলা দেশ ম্যালেরিয়ায় মরছে। সে মার কেবল দেহের মার নয়, এই রোগে সমস্ত দেশটাকে মন-মরা করে দিয়েছে। আমাদের মানসিক অবসাদ, চারিত্রিক দৈন্য, অধ্যবসায়ের অভাব এই রোগজীর্ণতার ফল। ম্যালেরিয়া থেকে যদি আমরা উদ্ধার পাই তা হলে কেবল-যে আমরা সংখ্যা হিসাবে বাড়ব তা নয়, শক্তি হিসাবে বেড়ে উঠব। তখন কেবল-যে দুইজনের কাজ একজনে করতে পারব তাও নয়, এমন প্রকৃতির কাজ এমন ধরনে করতে পারব যা এখন পারি নে। অর্থাৎ, কেবল যে কাজের পরিমাণ বাড়বে তা নয়, কাজের উৎকর্ষ বাড়বে। তাতে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এ কথা সকলেই জানি, সকলেই মানি— কিন্তু সেই সঙ্গে এতকাল এই কথাই মনে লেগে রয়েছে যে, বাংলা দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূর করে দেওয়া বা এই রোগের হ্রাস করা অসম্ভব। বাংলা দেশ ক্রমে ক্রমে নির্মানুষ হতে পারে, কিন্তু নির্মশক হবে কী করে। অতএব অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

এমন সময়ে একজন সাহসিক বলে উঠলেন, দেশ থেকে মশা তাড়াবার ভার আমি নিলুম। এত বড়ো কথা বলবার ভরসাকেই তো আমি যথেষ্ট মনে করি। এই গুরু-মানা অবতার-মানা দেশে এত বড়ো বুকের পাটা তো দেখতে পাওয়া যায় না। এক-একটি গ্রাম নিয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করেছেন। একটি গ্রামেও যদি তিনি ফল পান তা হলে সমস্ত দেশব্যাপী ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত করা হবে।

এইটুকুমাত্র কাজই তাঁর যথার্থ কাজ, মহৎ কাজ। কোনো একটিমাত্র জায়গায় যদি তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন যে বিশেষ উপায়ে রোগের বাহনকে দূর করে দেওয়া যেতে পারে তা হলেই হল।

স্বহস্তে তিনি নিজের চেষ্টায় সমস্ত অলস দেশকে নীরোগ করে দেবেন এটা কল্যাণকর নয়। দৃষ্টান্তদ্বারা তিনি যেটা প্রমাণ করবেন সেইটেকে দেশ স্বয়ং গ্রহণ করলে তবেই সে উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবে এবং ভাবী বিপদের বিরুদ্ধে চিরকালের মতো প্রস্তুত হবে। নইলে বারে বারে নূতন নূতন 'ডাক্তার গোপাল চাটুজ্জে'র জন্যে তাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হবে, আর ইতিমধ্যে তার পিলে-যকৃতের সাংঘাতিক উন্নতিসাধনে সে পৃথিবীর সকল দেশকে ছাড়িয়ে যাবে।

ম্যালেরিয়া যেমন শরীরের, অবুদ্ধি তেমনি মনের একটা বিষম ব্যাধি। এতে মানুষের মূল্য কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ গুনতি হিসাবে তার পরিমাণ বাড়লেও গুণের হিসাবে অত্যন্ত কমে যায়। স্বরাজ বল, সভ্যতা বল, মানুষের যা-কিছু মূল্যবান ঐশ্বর্য সমস্তই এই গুণের হিসেবের উপরেই নির্ভর করে। বালুর পরিমাণ যতই বেশি হোক-না কেন, তাতে মাটির গুণ নেই বলেই ফসল ফলাতে পারে না। ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি মানুষের মন পরিমাণ হিসাবে প্রভূত, কিন্তু যোগ্যতা হিসাবে কতই স্বল্প। এই অযোগ্যতার এই অবুদ্ধির জগদ্দল পাথরটাকে ভারতবর্ষের মনের উপর থেকে ঠেলে না ফেললে বিধাতা আমাদের কোনো বর দিলেও তা সফল হবে না এ যদি সত্য হয় তবে আমাদের কোমর বেঁধে বলতেই হবে, এই আমাদের কাজ। এ কাজ প্রত্যেক কর্মীকে তাঁর হাতের কাছ থেকেই শুরু করতে হবে। যেখানেই যতটুকুই সফলতা লাভ করবেন সেই সফলতা সমস্ত দেশের। আয়তন থেকে যাঁরা সফলতার বিচার করেন তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন, সত্যতা থেকে যাঁরা বিচার করেন তাঁরা জানেন যে, সত্য বামনরূপে এসে বলির কাছ থেকে ত্রিভুবন অধিকার করে নিতে পারেন।

আজকের দিনে জার্মানির কতখানি দুর্গতি হয়েছে, সকল দিক থেকে সে কত দুর্বল হয়ে পড়েছে, তা সকলেরই জানা আছে। এই জার্মানিতে এই দুঃখের দিনে, যখন তার সত্যই ঘরে আগুন লেগেছে, তখন জার্মানি আগুন নেবাবার নানা উপায়ের মধ্যে কোন-একটা বিশেষ উপায়কে প্রাধান্য দিয়েছে সে কথা আমাদেরও আলোচনার যোগ্য। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবার জন্যে যে প্রচেষ্টা আজ সেখানে প্রবর্তিত হয়েছে সে সম্বন্ধে একটি চটি বই বেরিয়েছে। তার নাম Newer Adult Education in Germany। তার থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিই—

There are two forms of ruin— the sudden calamity of an earthquake and the slow, certain, steady advance of general decay that nothing seems able to impede. This latter is now the fate of Germany. A small percentage of the population may still make a display of wealth; but the structure of the country, its general welfare, its healthiness and growth are irretrievably stunted. The people face this. They know that for them there is no hope left, unless they have sufficient courage and vitality to build up with their own hands. The youth of Germany knows that it has no future unless it can build up one, and it is certain that this building will be of far-reaching influence in the entire structure of European civilization. Adult education is going to be one of the pillars of this structure.

এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে কয়েকটি ভাববার কথা আছে। প্রথম হচ্ছে, জার্মানির অবস্থা নিতান্তই নৈরাশ্যজনক, কিন্তু তবুও সেখানকার লোকে সেটাকে চরম বলে মেনে নিয়ে ভাগ্যের নিন্দা করছে না; তার কারণ, তারা সত্যের বর পাবার জন্যে বরাবর বাস্তব পথ অবলম্বন করতে অভ্যস্ত। তারা বুদ্ধিকে মানে বলেই নিজেকে মানে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এরা এ কথা নিঃসন্দেহ জানে যে ভাবী কালের জন্যে যখন উন্নতির নূতন ভিত বসাতে হবে তখন সেটা একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই সম্ভবপর। এই উন্নতির দ্বারা তারা যে নিজের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বড়ো হবে তা নয়, সমগ্র য়ুরোপের সভ্যতার সঙ্গে আপন প্রভাবের দ্বারা সম্মিলিত হবে। তৃতীয় কথা হচ্ছে এই, অবস্থা যতই শোচনীয় হোক, ব্যাপারটা যতই দুঃসাধ্য হোক, তবু এটা করাই চাই।

এ কথা বলা বাহুল্য, প্রধানত মানুষ শিক্ষার দ্বারাই তৈরি হয়— 'মানুষ করে তোলা' কথাটার মধ্যে এই অর্থ আছে। প্রকৃতির ক্রিয়া জন্তুকে জন্তু করে, মানুষের শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে তোলে। আজকের দিনে যে মানসিক অবস্থায় আমরা এসে পৌঁচেছি— সেটা ভালোই হোক আর মন্দই হোক, সে অবস্থা আমাদের পূর্বকালীন শিক্ষার দ্বারাই ঘটেছে। এই অবস্থা পাকা করবার জন্যে কত শাস্ত্র কত উপদেশ কত ব্যবস্থা আছে তার সীমা নেই। যে বর্তমান অবস্থা এই শিক্ষার ফল, সেটা হচ্ছে ভিতর দিক থেকে মনের স্বাতন্ত্র্যহীনতার অবস্থা। এই অবস্থা কোনোমতেই বাইরের দিকে স্বরাজপ্রতিষ্ঠার অনুকূল হতেই পারে না। অতএব যদি স্বরাজকে প্রার্থনীয় বলেই মনে করি তা হলে আগেকার শিক্ষাকে অতিক্রম করে এমন কোনোরকম শিক্ষা দেশে চালাতে হবে যাতে দেশের লোকের মন বুদ্ধিবৃত্তির স্বরাজের প্রতি আস্থাবান হতে পারে। যে শিক্ষায় আমাদের বর্তমানটা গড়ে উঠেছে সেই শিক্ষাতেই যদি আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে, তা হলে সে আমাদের এই বর্তমানেরই পুনরাবৃত্তি হবে।

আজ জার্মানি এ কথা চিন্তা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে যে, তার পূর্বতন শিক্ষাবিধির মধ্যে একটা দোষ ছিল।—

Germans feel that the well-oiled and smoothly running machine like system of pre-war days was a system that was losing its substance,

producing a mechanical form of culture— a culture that was lacking in essentials, a culture that seemed to turn out human beings with most extraordinarily cultivated brains but somehow out of touch with the human heart— science as apart from life, art, craft, learning, recreation, all in separate compartments, and disharmony as a summary of all.

সার্বভৌম শিক্ষার সমগ্রতার দ্বারাই জার্মানির অধিবাসী মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতা লাভ করবে, এই চিন্তা সে দেশে আগুন লাগাব রূপকের জোরে উপেক্ষিত হয় নি। অথচ সেখানে অন্নাভাব বস্ত্রাভাব আমাদের দেশেব চেয়েও প্রবলতর। আগে সুতো কাটব, কাপড বুনব, খাব এবং তদ্দারায় স্বরাজ পাব, তার পরে উপযুক্ত অবকাশ নিয়ে মনের দিক থেকে মানুষ হব, এ কথা মানুষের কথাই নয়। প্রাণের যেমন একটা সমগ্রতা আছে, তা ইট সাজিয়ে ক্রমে ক্রমে টুকরো টুকরো ক'রে গড়া নয়, মনুষ্যত্বেরও তেমনি সমগ্রতা আছে। তার দেহ পরবে বস্ত্র, আর তার মন থাকবে উলঙ্গ, এ সয় না— কোনো প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে তার পূর্ণতাকে কিছুকাল ধরেও খণ্ডিত করলে সে ক্ষতি হয়তো কোনোকালে আর পূরণ হবে না। যদি বলি যতদিন স্বরাজ না পাব ততদিন দেশে শিল্পকার্যকে প্রশ্রয় দেব না, কেননা 'শিল্পকার্য অবশ্যপ্রয়োজনীয়' নয়, তা শৌখিন, তা হলে স্বরাজ কবে পাব জানি নে, কিন্তু যে শিল্প শত শত বৎসরের সাধনায় প্রাণলাভ করেছে স্বল্পকালের অনাদরে চিরদিনের জন্যে তা লুপ্ত হতে পারে। দেশে এমন লোকেব অভাব নেই যাঁরা বলবেন, নাহয় তাই হল। আমি এই বলি, মানুষকে এক দিকে অসম্পূর্ণ করে আর-এক দিকে তাকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে কলসীর এক দিক থেকে ছিদ্র করে আর-এক দিক থেকে তাতে জল ঢালা। মানুস আপন সম্পূর্ণতা প্রকাশ করবাব অবসর পাবে এইজন্যই মানুষের স্বাধীনতা। স্পার্টা আপন পূর্ণ মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে বাহুবলেব সাধনা করেছিল, তাতে কোনো ফল পায় নি; এথেন্স তার কোনো একটা বিশেষ শক্তিকে সংকীর্ণ করতে চায় নি, মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণতাকে চেয়েছিল, এইজন্যে সকল শক্তির সঙ্গে যোগেই সে বাহুবলকে পেয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে, মনুষ্যত্বের প্রাণময় অখণ্ডতাই মানুষের পরম সত্য, কোনো আশু প্রয়োজনেব লোভে তাকে খণ্ডিত করলে সমস্তটাকেই ক্লিষ্ট করা হয়।

সেই চটি বই থেকে আর-একটি অংশ উদধৃত করে আমার এই লেখা শেষ করি।—

Everywhere, certainly, there is good will and courage in the face of insuperable difficulty. Those who have not experienced it, cannot realise what it means to be under-fed, under-paid, over-worked, and yet to go on unswervingly with the work of the education of the people. Through the straining of every nerve many thousand marks may be collected for this purpose, while the sum dwindles as it is held in the hand to mere nothingness through the uncontrollable depreciation of the currency.

This material side of the question cannot be overlooked, as the instability of conditions ruins all effort. A thousand marks to-day are a hundred in a couple of days' time and the educator of the people of one week may be working in a factory the next in order to provide for his wife and his child as well as for his own livelihood. If the State were to appoint adult teachers as it does school teachers, salaries would rise to meet the depreciation, but the State stringently refuses to swell the budget by financing any new educational enterprise, and leaves the adult educational movement to struggle on almost unaided. It is extraordinary

enough that ways and means can be found to continue at all, and this obviously is due solely to the keenness and self-sacrificing devotion of those working in the cause of bringing education within reach of the people. It will take many years before Germany sees clearly where the moulding of her efforts in adult education has led to, but what can be more absorbing and instructive than to study its growth ?

এই দুটি প্যারাগ্রাফ থেকে আমাদের শিক্ষার ও চিন্তার বিষয় যেটুকু আছে সে হচ্ছে এই যে, কাজের বাধা অতি কঠিন, কাজের ফল অতি নিকট নয়, অথচ কাজের অধ্যবসায় দুর্দমনীয়।

—প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৩০, পৃ· ১৬০-১৬৩

'শূদ্রধর্ম' প্রবন্ধ বর্তমান সংস্করণে যেখানে শেষ হইয়াছে (পৃ· ৬১৪) প্রবাসীতে তাহার অনুবৃত্তিস্বরূপ নীচের অংশটুকু পাওয়া যায়—

সাংঘাই শহরে চীনীয়দের যে ধর্মঘট চলছে তার সম্বন্ধে একজন আমেরিকান লেখক আমেরিকার The Nation পত্রে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। তাতে একজন চীন ভদ্রলোকের যে সাক্ষ্য প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নে উদ্‌ধৃত করি :

8 A Chinese Graduate of Glasgow. His English is faultless. His labor library is the best I have seen in the East. His pictures are hung in international exhibitions.

I am a pacifist But I shall tell you a story that will show you how I fell about this strike. It will show you how hard it is to be a pacifist in China to-day.

There is a park here in Shanghai which is paid for chiefly by Chinese taxpayers, but no Chinese person is allowed to enter it. One day I was walking by this park when I saw a Sikh policeman chase away a group of ricksha men from the gate, curse them and deliberately tip over one of the rickshas. He had lost his temper because one of the men had come too close to the forbidden territory. He took the license of one of the ricksha men away from him while the poor fellow stood here in the road with the tears streaming down his face. I walked over to the Sikh policeman and said :

"If I were hired by the British to police India for them, I would never treat your countrymen as you are treating these ricksha men."

He cooled down very quickly and was about to give the license back to the ricksha man when two Englishmen came up. They said to me

"What are you doing here interfering with this policeman ? Don't argue with us. You have no business here. You're nothing but a damned Chinaman. Get out of here."

They said that to me in China. —প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৩২, পৃ· ২১৫

১৯২৭ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ পূর্বদ্বীপপুঞ্জ-অভিমুখে যাত্রা করিবার প্রাক্‌কালে 'বৃহত্তরভারতপরিষদ'-কর্তৃক তাঁহার বিদায়সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। 'বৃহত্তর ভারত' অভিভাষণটির উহাই উপলক্ষ।

'নারী' নিখিলবঙ্গ-মহিলা কর্মীসম্মিলন উপলক্ষে লিখিত ও পঠিত হইয়াছিল।

সংযোজন

কালান্তরের প্রবন্ধগুলির সমসাময়িক, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য অধিকাংশ সমাজ ও রাজনীতি -বিষয়ক রচনা বর্তমান খণ্ডের সংযোজনাংশে মুদ্রিত হইয়াছে। বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে সংকলিত এই রচনাগুলির প্রথম প্রকাশের আনুপূর্বিক সূচী নিম্নে দেওয়া হইল—

কর্মযজ্ঞ[৮]	সবুজ পত্র। ফাল্গুন ১৩২১
স্বাধিকারপ্রমত্তঃ	প্রবাসী। মাঘ ১৩২৪
চরকা	সবুজ পত্র। ভাদ্র ১৩৩২
স্বরাজসাধন	সবুজ পত্র। আশ্বিন ১৩৩২
রায়তের কথা	সবুজ পত্র। আষাঢ় ১৩৩৩
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ	প্রবাসী। মাঘ ১৩৩৩
'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'	প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৩৬
হিন্দু-মুসলমান	প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৮
হিজলি ও চট্টগ্রাম ১	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৩৮[৯]
হিজলি ও চট্টগ্রাম ২	প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৩৮[১০]
নবযুগ	প্রবাসী। মাঘ ১৩৩৯
প্রচলিত দণ্ডনীতি	প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৪৪

'কর্মযজ্ঞ' ১৩২১ সালের ১ ফাল্গুন তারিখে কলিকাতায় সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী'র প্রাবন্ধিক "সভাধিবেশনে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম"।

'রায়তের কথা' প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'রায়তের কথা' গ্রন্থের [অগস্ট ১৯২৬] 'ভূমিকা' রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল—

> আমার লেখা 'রায়তের কথা' যখন সবুজপত্রে প্রকাশিত হয় (১৩২৬ ফাল্গুন), তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিলেতে। এই কারণে সে প্রবন্ধটি সেকালে তাঁর চোখে পড়ে নি। সম্প্রতি তিনি আমার অনুরোধে সেটি প'ড়ে এ বিষয়ে তাঁর মতামত সম্বলিত একখানি পত্র আমাকে লেখেন। এ পত্র অবশ্য লেখা হয়েছে ছাপবার জন্য।
>
> এ লেখা টীকা-সমেত 'রায়তের কথা'র ভূমিকাস্বরূপ প্রকাশ করবার অনুমতি রবীন্দ্রনাথ আমাকে দিয়েছেন।
>
> —বিজ্ঞপ্তি, রায়তের কথা

রবীন্দ্রসদনে-সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সহিত মিলাইয়া বর্তমান গ্রন্থের পাঠ নির্ধারণ করা হইয়াছে।

'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' -শীর্ষক প্রবন্ধটি শচীন সেন -কর্তৃক লিখিত Political Philosophy of Rabindranath প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য।

হিজলি ও চট্টগ্রামের নৃশংস ঘটনাবলীর প্রতিবাদে ১৯৩১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার গড়ের মাঠে অকটারলোনি মনুমেন্টের পাদদেশে যে বিরাট সভা হয় "তাহাতে আনুমানিক এক লক্ষ লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন"। ঐ সভায় সভাপতি রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ পাঠ করেন বর্তমান খণ্ডের 'হিজলি ও চট্টগ্রাম' প্রবন্ধের তাহাই প্রথমার্ধ। উহা

৮ পরে পল্লীপ্রকৃতি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, মাঘ ১৩৬৮

৯ বিবিধ প্রসঙ্গ 'চট্টগ্রাম ও হিজলীর ব্যাপার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ১৪৩-৪৪

১০ বিবিধ প্রসঙ্গ : 'হিজলীর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ৩০৪-০৫

ঐদিনই সায়ংকালে এবং পরদিনও বিভিন্ন দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ-কৃত উহার ইংরেজি রূপও ঐ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।[১১]

উক্ত নির্মম ঘটনা প্রসঙ্গে কলিকাতার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকা 'স্টেটসম্যান' বন্দীনিবাসের খুনী ওয়ার্ডার বা রক্ষীদের প্রতি সহানুভূতি-পূর্ণ যে মতামত প্রকাশ করেন তাহার জবাবে রবীন্দ্রনাথ স্টেটসম্যান-সম্পাদককে ইংরেজিতে এক পত্র লেখেন। সম্পাদক অ্যালফ্রেড এইচ. ওয়াট্সন অমল হোমকে পত্রখানি ফেরত পাঠাইয়া (৩ নভেম্বর ১৯৩১) মন্তব্য করেন—

I must definitely refuse to publish from Dr. Rabindranath Tagore or any body else a letter which accuses men of murder who have never been tried on that count. I return the letter to you.

—The Calcutta Municipal Gazette (Tagore Memorial Special Supplement), 13 September 1941, pp. xl-xli

হিজলির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সেই পুনশ্চ বক্তব্য পরে অন্যান্য বহু ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত হইয়াছিল।[১২] প্রবাসীর জন্য তাঁহার সেই বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ বাংলায় লিখিয়া দিয়াছিলেন; 'হিজলি ও চট্টগ্রাম' প্রবন্ধের শেষার্ধরূপে তাহা মুদ্রিত হইল।

'নবযুগ', ১৩৩৯ সালের পৌষ মাসে শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে কথিত ভাষণের রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অনুমোদিত অনুলেখন।

'প্রচলিত দণ্ডনীতি', শান্তিনিকেতনে আন্দামানস্থ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রায়োপবেশন উপলক্ষে আহূত সভায় কথিত "গত ২৯শে শ্রাবণ [১৩৪৪] শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর অধ্যাপক এবং ছাত্রী ও ছাত্রদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি এই প্রবন্ধের আকারে লিখিয়া দিয়াছেন।" (প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৪৪, পৃ. ৭৬৬)

[১১] যথা Call of the Victims, Amritabazar Patrika, 26 September 1931

[১২] যথা, Crimes are Crimes Poet Tagore wants justice for Hijli wrongs:

—Amritabazar Patrika, 4 November 1931

বর্ণানুক্রমিক সূচী